মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নঈম সিদ্দিকী

মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নঈম সিদ্দিকী

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আকরাম ফারূক

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

E-mail : shotabdipro@yahoo.com

www.moudoodiacademy.org

আমাদের কথা

'মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ' সা. গ্রন্থখানা মূলত এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদ নঈম সিদ্দীকির উর্দু ভাষায় রচিত 'মুহসিনে ইনসানিয়াত' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থখানা Human Benefactor শিরোনামে ইংরেজি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

এ গ্রন্থখানা চিরাচরিত পন্থায় রচিত রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কোনো জীবনী গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থে মূলত রসূলে পাক সা. যে অনুপম সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন এবং সুণিপুন কারিগরের মতো যে অনন্য সাধারণ মানব দল ও মানব সমাজ নির্মাণ করেছিলেন, সেই নির্মাণ কাজেরই এক অপূর্ব বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষণীয় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাই এটি একাধারে রসূলে পাকের সীরাত এবং ইসলামী সমাজ বিপ্লব সংঘটনের প্রতিবেদন। ইসলামী সমাজ গড়ার সাধ যারা পোষণ করেন, এটি তাদের জন্যে খুবই উপকারী গ্রন্থ।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে গ্রন্থটির বংগানুবাদ করেছে। অত্যন্ত উচ্চাংগের সাহিত্যিক উর্দু ভাষায় লেখা গ্রন্থটির প্রশংসনীয় বংগানুবাদ করেছেন সুসাহিত্যিক হাফেজ আকরাম ফারূক। অনুবাদের পর আমি পুরো গ্রন্থটি সম্পাদনা করে দিয়েছি।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কিছু আর্থিক সহযোগিতা প্রকাশনার কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। এ জন্যে তাদের মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ গ্রন্থটিকে কবুল করুন। গ্রন্থকার এবং এটিকে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা জড়িত আল্লাহ্ পাক তাঁদের সকলকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।
০৪-১১-৯৮ ইং

গ্রন্থকারের কথা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেতিহাসকে নতুন পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। ইসলামের আন্দোলনমুখী চেতনা ও প্রেরণা থেকেই এই তাগিদটা অনুভূত হচ্ছিল। সেই নতুন পদ্ধতিটা এমন হওয়া আবশ্যক, যেন রসূল সা. এবং এ যুগের মানুষের মধ্যে আড়াল হয়ে থাকা সমস্ত পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়। সেই পবিত্র জীবন নিছক এক ব্যক্তির জীবন কাহিনী নয়। বরং তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার গৌরবমন্ডিত আন্দোলনের প্রতীক। এই জীবন কাহিনীর মাধ্যমেই আমরা কুরআনের অনুবাদ বাস্তবে ও হাতে কলমে পড়তে পারি এবং তারই আলোকে আমরা সমাজ বিপ্লবের দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারি। একমাত্র এই পথ ধরেই মানব জাতি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ইহকালীন জান্নাতে পৌঁছাতে পারে।

আমার সমমনা মুরব্বী ও সহযোগীদের মত এই তাগিদটা সব সময় আমাকেও প্রেরণা যোগাতে থাকে। কিন্তু নিজের সম্পর্কে এ কথা কখনো আমার কল্পনায়ও আসেনি যে, এত ক্ষুদ্র জ্ঞান ও সীমিত যোগ্যতা নিয়ে এই ক্ষেত্রে আদৌ কোন কার্যকর অবদান রাখতে পারবো। আমি এখানে যেটুকু লিখে পেশ করতে পেরেছি সেটা নিছক আল্লাহর সাহায্য ও তওফীকের বলেই করতে পেরেছি।

আশা করি এই গ্রন্থখানা পড়ার মাধ্যমে রসূল সা. এর পবিত্র জীবনেতিহাসের একটা সামগ্রিক অধ্যয়ন সম্পন্ন হয়ে যাবে। এতে ঘটনাবলী এমন ধারাবাহিকতার সাথে আবর্তিত হয়েছে যে, পাঠক স্বয়ং এতে অংশীদার হয়ে যাবেন এবং নিজেকে হক ও বাতিলের দ্বন্দে জড়িত বলে অনুভব করবেন। তারপর সে এই পরিবেশ থেকে যখন ফিরে আসবেন, তখন ঈমান ও চরিত্রের নতুন উদ্দীপনা সাথে নিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমার এই চেষ্টাকে কবুল করুন এবং একে মুসলমানদের ও সব মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণের উৎসে পরিণত করুন।

নঈম সিদ্দিকী

লাহোর, ১লা জানুয়ারী ১৯৬০

প্রত্যয়ন

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামের নিয়ামত প্রত্যেক যুগেই মানুষের কাছে দুটো জিনিসের মাধ্যমে এসে থাকে। এক, আল্লাহর কালাম, দুই, নবীদের ব্যক্তিত্ব। নবীগণকে আল্লাহ পাক শুধু যে, নিজের কালাম বা বাণীর বাহক, প্রচারক, শিক্ষক ও ব্যাখ্যা দাতা বানিয়েছেন তা নয়। বরং সেই সাথে বাস্তব নেতৃত্বদান ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব ও তাঁদের ওপর অর্পণ করেছেন, যাতে করে তাঁরা আল্লাহর বাণীর প্রকৃত ও সঠিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষকে ও সামষ্টিকভাবে গোটা সমাজকে সংশোধন করতে পারেন এবং মানব জীবনের বিকৃত বিধি ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করে তাকে পুনর্গঠিত করতে পারেন।

এই দুটো জিনিস চিরকাল পরস্পরের সাথে এমন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে মানুষ কখনো না পেয়েছে ইসলামের সঠিক বুঝ, না লাভ করেছে হেদায়াত। আল্লাহর কিতাবকে যদি নবী থেকে আলাদা করে দেয়া হয়, তা হলে তা নিছক একখানা মাঝিবিহীন নৌকার আকার ধারন করে। এ নৌকায় আরোহন করে একজন আনাড়ী যাত্রী, জীবন সমুদ্রে যতই উদভ্রান্ত হয়ে দিক থেকে দিগন্তে ছুটে বেড়াক, গন্তব্যস্থলে কখনো পৌছতে পারেনা। আবার নবীকে কিতাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে দেখবেন, মানুষ আল্লাহর পথের সন্ধান পাওয়ার পরিবর্তে নৌকার মাঝিকেই খোদা বানিয়ে নেয়। এই দুটো বিষময় ফলই অতীতের জাতিগুলো ভোগ করেছে। হিন্দুরা তাদের নবীদের জীবনেতিহাস হারিয়ে ফেলে শুধু কিতাবগুলো নিয়ে বসে গেল। এর ফল হলো এই যে, কিতাব তাদের জন্য ধাঁধায় পরিণত হলো। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কিতাব ও হারিয়ে বসলো। খৃস্টানরা কিতাবকে বাদ দিয়ে নবীর ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখতে আরম্ভ করলো। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, তাদের চোখে আল্লাহর দাস এবং নবী হয়ে গেলেন আল্লাহর ছেলে। এমনকি এক সময় তিনি স্বয়ং আল্লাহ হিসেবেই বন্দনা পেতে লাগলেন। এ পরিণতি হওয়া ছিল অবধারিত। প্রাচীন যুগের মত এখন এই নতুন যুগের মানুষেরও ইসলামকে জানা বুঝার দুটো মাধ্যমই রয়েছে এবং তা আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। এক, আল্লাহর বাণী, যা এখন শুধুমাত্র কোরআনের আকারেই বিদ্যমান। দুই, নবীর জীবনী, যা এখন শুধু মুহাম্মদ সা.-এর সীরাতের আকারেই সংরক্ষিত। আবহমান কালের ন্যায় আজও মানুষের ইসলামের সঠিক বুঝ অর্জনের একমাত্র উপায় হলো, কোরআনকে মুহাম্মদ সা. এর জীবন দেখে এবং মুহাম্মদ সা. এর জীবনকে কোরআন পড়ে উপলব্ধি করতে হবে। যে এই দুটোর একটাকে দেখে অপরটা শিখবে, সে যথার্থই ইসলামকে সঠিকভাবে শিখতে পারবে। অন্যথায় ইসলাম সংক্রান্ত বুঝ থেকে সে থাকবে বঞ্চিত। আর সেই সাথে হেদায়াত থেকেও থাকবে বঞ্চিত।

এছাড়া কোরআন ও মুহাম্মদ সা. উভয়েরই যেহেতু একটা মিশন তথা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, তাই কোরআন ও মুহাম্মদ সা. কে বুঝা নির্ভর করে আমরা উভয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতখানি বুঝি তার ওপর। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে দেখলে কোরআনকে সাহিত্যের একটা ভান্ডার এবং রসূলের জীবনীকে ঘটনা দুর্ঘটনার এক বিরাট সমাবেশ মনে হবে। ভাষা বর্ণনা ও জ্ঞান গবেষণার সাহায্যে তাফসীরের এক বিরাট স্তুপ তৈরী করা সম্ভব। তেমনি ঐতিহাসিক গবেষণার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রসূল সা. এর জীবন ও তার যুগ সম্পর্কে নির্ভুল ও নিখুঁত তথ্যের এক বিরাট ভান্ডার ও গড়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের প্রাণ শক্তির ধারে কাছেও যাওয়া যাবেনা। কেননা এই প্রাণ শক্তির সম্পর্ক ভাষা, সাহিত্য ও ঘটনাবলীর সাথে নয়, বরং যে উদ্দেশ্যের সাথে যার জন্য কোরআন নাযিল করা হয়েছে এবং মুহাম্মদ সা. কে যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য সংক্রান্ত উপলব্ধি যত নির্ভুল হবে, কোরআন ও সীরাত সংক্রান্ত বুঝও ততই বিশুদ্ধ হবে। আর ওটা যত ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হবে, ততই ত্রুটিপূর্ণ হবে কোরআন ও সীরাতের উপলব্ধি।

এটা একটা অকাট্য সত্য কথা যে, কোরআন ও রসূলের সীরাত উভয়ই অথৈ সমুদ্র বিশেষ। কোন মানুষ এই দুটো জিনিসের সমস্ত তত্ত্ব, তথ্য মর্ম ও কল্যাণ অর্জন করে ফেলবে সেটা কখনো সম্ভব নয়। কেবল এটুকুই সম্ভব যে, মানুষ উভয়টিকে বুঝবার এবং তার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি ও তার প্রাণ শক্তিকে আয়ত্ব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

এই কথাগুলো বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য নঈম সিদ্দিকী সাহেবের পুস্তক খানার ওপর কোন সমালোচনা বা প্রশংসা লেখা নয়। তিনি যতখানি ও যে ধরনের প্রশংসা ও কৃতিত্ব পাওয়ার যোগ্য, সেটা তার পাঠকরা স্বতস্ফূর্তভাবেই তাকে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আমার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, নঈম সাহেব দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে রসূল সা. এর সীরাতের যে নির্ভেজাল তথ্যবহুল পুস্তক জনগণকে উপহার দিতে চেষ্টা করেছেন, তাতে সামান্য কিছু অংশ নিয়ে আমিও কিছুটা সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। এই পুস্তক পড়ার আগে প্রত্যেক পাঠকের ভালো ভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, রসূলের জীবনী কোন্ উদ্দেশ্যে ও কোন্ দৃষ্টি কোণ থেকে পড়া উচিত। এটা বুঝে নিতে পারলে আমি আশা করি, নঈম সাহেবের সাধনার এই ফসল দ্বারা জনগণ আরো বেশী উপকৃত হবে।

আবুল আ'লা

লাহোর

১৮ মে ১৯৬০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পূর্ব কথা

মানবতার বন্ধু
মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ
সা.

১

*

আগমনের উদ্দেশ্য
আহ্বান
এবং
ঐতিহাসিক অবস্থান

*

মহানবী সা.-এর জীবন চরিত অধ্যয়নের আগে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। যে মহান কাজটি সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব মানবতার এই মহোপকারী বন্ধু পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যভেদী সংগ্রামের সফল সমাপ্তি সাধনের জন্য গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই কাজটি কী ছিল, তা আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আসলে রসূলের সা. জীবনেতিহাস একটি আস্ত মানবীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের অক্লান্ত সংগ্রামের ইতিহাস। রসূলের জীবন কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব ও কর্মময় বিশ্লেষণ। রসূলের জীবন হযরত আদম আ. ইবরাহীম আ. মূসা আ. ঈসা আ. ও অন্যান্য নবীগণ নিজ নিজ যুগে যে পবিত্র বাণীর মশাল জ্বালিয়েছিলেন সেই বাণীরই পরিপূরক। মহানবীর কাজের ধরন ও প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও তার পরিমণ্ডলের বিশালতাকে দৃষ্টিপথে না রেখে আমরা নবী জীবনকে সুসংবদ্ধ করতে পারিনা, নবী জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে পারিনা, তাঁর জীবন চরিত অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারিনা এবং তাঁর জীবন চরিত থেকে যা কিছু অর্জন করা দরকার তা অর্জন করতেও পারিনা।

মানব জাতির ত্রাণকর্তা

সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সেখানে নানা রকমের সংস্কারকের সাক্ষাত পাই। দেখতে পাই অনেক মিষ্টভাষী অথবা অনলবর্ষী বক্তা, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ, বিশাল সাম্রাজ্যের স্থপতি, রাজা মহারাজা ও সম্রাট, বিশ্বিজয়ী বীর, বড় বড় দল ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, মানব সভ্যতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহানায়ক, সমাজ কাঠামোতে বারবার তোলপাড় সৃষ্টিকারী দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বিপ্লবী, সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত নিত্য নতুন ধর্মমতের প্রবর্তক এবং নৈতিক সংস্কারক ও আইন প্রণেতা। কিন্তু যখন তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের রেখে যাওয়া কীর্তি ও অবদান এবং তাঁদের চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতার সার্বিক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দেই, তখন কোথাও কোন পূর্ণাংগ কল্যাণ ও সুফল দেখতে পাইনা। যেটুকু কল্যাণ ও সুফল চোখে পড়ে তা নিতান্তই আংশিক, এক পেশে ও ক্ষণস্থায়ী। সেই সুফলগুলো জীবনের কোন একটা অংশে দৃশ্যমান হয়, অতঃপর তার সাথে নানা ধরনের কুফলের মিশ্রণ ঘটে। নবীগণের ব্যক্তিত্ব ব্যতীত ইতিহাসে আর কোন উপকরণ ও উপাদান এমন দেখা যায় না, যা সমগ্র মানব সমাজকে ভেতর থেকে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। মসজিদ থেকে বাজার পর্যন্ত, বিদ্যালয় থেকে আদালত পর্যন্ত এবং গৃহ থেকে রণাঙ্গণ পর্যন্ত সমগ্র সমাজ ও সভ্যতাকে আল্লাহর একই রং এ রঞ্জিত করা এবং সমগ্র মানব সমাজের ভেতর থেকে আমূল পরিবর্তন সাধন করাই ছিল মুহাম্মদ রসূল সা. -এর দাওয়াতের সাফল্য। আর তাঁর জীবনের আসল কৃতিত্ব এটাই। তাঁর দাওয়াতে মানুষের মনমগজ বদলে গেল, চিন্তাধারা পাল্টে গেল, দৃষ্টিভংগী বদলে গেল, রীতিপ্রথা ও আদত অভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে গেল, অধিকার ও কর্তব্যের বন্টন রীতি পাল্টে গেল, ন্যায় ও অন্যায়ের এবং হালাল ও হারামের মানদণ্ড বদলে গেল, নৈতিক মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটালো, আইন ও সংবিধানের পরিবর্তন ঘটলো, যুদ্ধ ও সন্ধির নিয়মকানুনের রদবদল হলো, বিয়েশাদী ও সমাজ পদ্ধতি পাল্টে গেল। মোটকথা সভ্যতার এক একটি অংগের ও এক একটি প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো। এই সর্বাত্মক পরিবর্তনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও কল্যাণ ও মংগল ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয়না। এর কোন অংশেই অকল্যাণ নেই, কোন অংগনে দুষ্কৃতি নেই, নেই কোথাও কোন

বিকৃতি। সর্বত্র কেবল কল্যাণ, চতুর্দিকে কেবল গঠনমূলক তৎপরতা এবং উন্নতি ও প্রগতি। প্রকৃত পক্ষে মহানবীর হাতে সাধিত হয়েছিল মানব জাতির সর্বাত্মক পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবন। সত্য ও ন্যায়ের এক স্বর্ণোজ্বল প্রভাতের অভ্যুদয় ঘটিয়ে তিনি সভ্যতার আকাশকে করেছিলেন মেঘমুক্ত। তিনি উদ্বোধন করেছিলেন ঐতিহাসিক যুগের। বিশ্ব ইতিহাসে এটা এত বড় কীর্তি ও কৃতিত্ব, যার কোন নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মানব জাতির ত্রাণকর্তা বিশ্বনবীর সা. আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন সমগ্র মানবজাতি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কোথাও চলছিল পাশবিকতা ও হিংস্রতার যুগ। কোথাও শেরক ও পৌত্তলিকতার অভিশাপ সভ্য জীবনের সর্বনাশ সাধন করছিল। মিশর, ভারত, ব্যাবিলন, নিনোভা, গ্রীস ও চীনে সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র রোম ও পারস্যে সভ্যতার পতাকা উড়ছিল। সেই রোমক ও ইরানী সভ্যতার বাহ্যিক জাঁকজমক চোখ ঝলসে দিত। অথচ সেসব নয়নাভিরাম প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলতো লোমহর্ষক যুলুম ও নির্যাতন। জীবনের ক্ষতস্থান থেকে বেরুত উৎকট দুর্গন্ধ। রাজা ও সম্রাটগণ শুধু খোদার অবতারই ছিলনা, বরং তারাই খোদা হয়ে জেঁকে বসেছিল। তাদের সাথে আঁতাত করে জনগণের ওপর প্রভুত্ব চালাতো ভূমি মালিক ও ধর্মযাজক শ্রেণী। রোম ও ইরান উভয় সাম্রাজ্যের এই নিদারুণ শোষণ নিষ্পেষণে সাধারণ মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছিল। তারা জনগণের কাছ থেকে মোটা মোটা দাগের কর, খাজনা, ঘুষ ও নজরানা আদায় করত। উপরন্তু তাদেরকে পশুর মত খাটুনী খাটতে বাধ্য করা হতো। অথচ এদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবত নিয়ে না ছিল তাদের কোন ভাবনা, না ছিল কোন সহানুভূতি, আর না ছিল এ সবের সমাধান বা প্রতিকার। এই সব কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর ভোগ বিলাস ও প্রকৃতিপূজা তাদের নৈতিক সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাজা বাদশাহদের ক্ষমতার পালাবদল ও উত্থান-পতন, নিত্যনতুন বিজেতাদের আবির্ভাব এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের কারণে পরিস্থিতির যে সাময়িক পরিবর্তন ঘটতো, তাতেও সাধারণ মানুষের জন্য কোন মুক্তির পথ উন্মুক্ত হতোনা। প্রত্যেক পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষ আরো বেশী করে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হতো। যে শক্তিই ক্ষমতার রংগমঞ্চে আবির্ভূত হতো, সে সাধারণ মানুষকেই শোষণের হাতিয়ার বানিয়ে, তাদেরই রক্তকে পুঁজি করে এবং তাদেরই শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতো এবং বিজয় ও কর্তৃত্ব অর্জনের পর সে পূর্বসূরীদের চেয়েও বড় যুলুমবাজ ও বড় শোষকে পরিণত হতো। স্বয়ং রোম ও ইরান সাম্রাজ্য দ্বয়ের মধ্যেও ক্রমাগত সংঘাত-সংঘর্ষ লেগে থাকতো। বিভিন্ন অঞ্চল কখনো এক সাম্রাজ্যের দখলে যেত, কখনো আরেক সাম্রাজ্য তাকে গ্রাস করতো। কিন্তু প্রতিবার বিজয়ী শক্তি প্রজাদের কোন না কোন গোষ্ঠীকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইরানী সাম্রাজ্যভুক্ত কোন জায়গা রোম সাম্রাজ্যের পদানত হলে সেখানকার অগ্নিকুণ্ডগুলো নিভিয়ে তদস্থলে গীর্জা নির্মাণ করা হতো, আবার রোম সাম্রাজ্যভুক্ত কোন জায়গা ইরানীদের দখলে গেলে সেখানকার সমস্ত গীর্জা পর্যবসিত হতো অগ্নিকুন্ডে। দুনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল থাকতো অরাজকতার কবলে। প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ, সংঘাত

সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। ধর্মীয় উপদলগুলো পরস্পরের রক্ত ঝরাতো। আর এইসব দাংগা হাংগামায় দলিত মথিত হতো মানুষের মানবিক মর্যাদা। লাঞ্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত হতো তার মনুষ্যত্ব। অমানুষিক পরিশ্রম করেও সে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতোনা। শত যুলুম নির্যাতনের মুখেও সে সামান্যতম প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারতোনা। চরম তিক্ত অনুভূতিও তাকে নীরবে হজম করতে হতো। বিবেক ও মন এমন কঠিন দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতো যে, টু শব্দটি করার স্বাধীনতাও তার থাকতোনা। কী সাংঘাতিক লোহার খাঁচায় সে আবদ্ধ থাকতো এবং কত হতাশা ও ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে যে তার আকাশ–বাতাস ভারী হয়ে থাকতো, কে তার খোঁজ রাখতো। সেই লোহার খাঁচায় কোন দিকে একটি জানালাও খোলা ছিল না এবং মানুষের সামনে ক্ষীণতম আশার আলো বয়ে আনার মত কোন মতবাদ বা দর্শনের একটি জোনাকীও জ্বলতোনা। তার আত্মা আর্তনাদ করতো। কিন্তু কোন দিক থেকে সে আর্তনাদে কেউ সাড়া পর্যন্ত দিত না। কোন ধর্ম তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসতোনা। কেননা নবীদের শিক্ষা বিকৃতি ও অপব্যাবহারে অতল তলে তলিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের নামে আর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাকে ধর্মীয় মহল ব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত করেছিল। সমকালীন যালেম ও শোষক মহলের সাথে তারা গাঁটছড়া বেঁধে নিয়েছিল। গ্রীস দর্শনের কথাই বলুন। কনফুসিয়াস ও মনুসংহিতার কথাই বলুন, কিংবা বেদ বেদান্ত, বৌদ্ধ ধর্ম বা জাষ্টীনান ও সোলুনের আইনের কথাই বলুন, সবই হয়ে পড়েছিল নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রীয়। কোন দিক থেকেই কোন আলোক রশ্মী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলনা। পৃথিবীর কোথাও যখনই এমন অবস্থা হয় যে, মানুষ একটা লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে যায় এবং কোন দিক থেকেই কোন আশার আলো পরিদৃষ্ট হয়না, তখন সমাজ ব্যবস্থায় সংকট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়।[১] তাই যখন সারা বিশ্ব জুড়ে ইতিহাসের ভয়াবহতম বীভৎসতম অরাজকতা দেখা দিল, তখন সেই অরাজকতার ঘুটঘুটে অন্ধকারে আকস্মিকভাবে জ্বলে উঠলো মানবতার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু বিশ্বনবীর আলোর মশাল। সে মশাল সমকালীন সামাজিক বিপর্যয়ের অন্ধকারের বুক চিরে চতুর্দিক করলো উদ্ভাসিত।

আরবের নিকটতম অঞ্চল ছিল রসূল সা. এর প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র। সেখানে যে কি সাংঘাতিক অবস্থা বিরাজ করছিল তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আ'দ ও সামুদ জাতির আমলে কিংবা সাবা ও ইয়েমেনের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের আওতায় এক সময় খানিকটা সভ্যতার আলোকচ্ছটা যদি বা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাও নিভে গিয়েছিল বহুকাল আগে। আরবের বাদবাকী অঞ্চলগুলো তখনো প্রাগ–সভ্যতার প্রগার অন্ধকারেই ডুবেছিল। সভ্যতার সূর্য তখনো ওঠেনি এবং মানব জাতি আদিম জাহেলিয়াতের ঘুম থেকে তখনো জেগে ওঠেনি। চার দিকে বিরাজ করছিল প্রবল উত্তেজনা। মানুষে মানুষে সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও লুটপাটের তান্ডব চলছিল। মদ, ব্যভিচার ও জুয়ার সমন্বয়ে জাহেলী সংস্কৃতি

---

১. মানবজাতির এই ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে কুরআন অতি সংক্ষেপে এমন পর্যালোচনা করেছে, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না ঃ

"পৃথিবীর জলভাগে ও স্থলভাগে বিপর্যয় এসেছে শুধু মানুষের কৃতকর্মের কারণে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছুটা কর্মফল ভোগ করাতে চান। হয়তো তারা সৎপথে ফিরে আসবে।" (রূম-৪১)

তুংগে উঠেছিল। কুরাইশরা শেরক ও পৌত্তলিকতাযুক্ত ধর্ম নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল পবিত্র কা'বার মোতাওয়াল্লিগিরীর রমরমা ব্যবসায়। ইহুদীরাও পাল্লা দিয়ে বিকৃত ধর্ম ব্যবসায়ের দোকান খুলে রেখেছিল। বাদবাকী আরবরা ডুবেছিল চিন্তার নৈরাজ্যে। মক্কা ও তায়েফের মহাজনরা সুদী ব্যবসার জাল পেতে রেখেছিল। দাস ব্যবসার অভিশপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মহা ধুমধামের সাথে চলছিল। মোটকথা, মানুষ প্রবৃত্তির গোলামীর সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়ে হিংস্র হায়েনা ও চতুষ্পদ জন্তুর মত জীবন যাপন করছিল।[২] শক্তিমানরা দুর্বলদেরকে ছাগল ও ভেড়ার পালের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো। দুর্বলেরা শক্তিমানদের পদতলে লুটিয়ে থাকতো।

এহেন পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ সা. আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের আহ্বান নিয়ে একাকী ময়দানে নামলেন। এমন হতাশা ব্যঞ্জক পরিবেশে আর কেউ হলে হয়তো লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যেত। অতীতে অনাচারকে ঘৃণা করার মত সৎ ও সংবেদনশীল লোক যে পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি তা নয়। বিপুল সংখ্যায় পাওয়া গেছে। কিন্তু অনাচারের মোকাবেলা করা ও প্রতিকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা নিজ নিজ জীবনের নিরাপত্তার জন্য সমাজ ও লোকালয় ছেড়ে বনে জংগলে ও পর্বতগুহায় আশ্রয় নিত এবং যোগী সন্যাসী হয়ে যেত। কিন্তু রসূল সা. বিপন্ন মানবতাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তা করেননি। বরং অন্যায় ও দুষ্কৃতির সাথে লড়াই করে সমগ্র মানব জাতির জন্য মুক্তির পথ খুলে দিয়েছিলেন। সভ্যতার নৌকার হাল ধরে তাকে সঠিক গন্তব্যের পথে চালিত করেছিলেন।

রোম ও ইরানের দুই যুদ্ধমান পরাশক্তি তৎকালে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তা ভাংগার জন্য তিনি তৃতীয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হলেন। ধীরে ধীরে এই তৃতীয় শক্তি যখন নিজ পায়ের ওপর দাঁড়ালো, তখন তা রোম ও ইরান উভয় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলো। উভয়ের পরাক্রমশালী নেতৃত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করলো এবং জনগণকে বিভীষিকাময় সভ্যতার খাঁচা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন পরিবেশে বিচরণের সুযোগ করে দিল[৩]। আদম সন্তানদের সামনে একটি মুক্তির পথ উন্মুক্ত হলো এবং ডাকাতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মানুষের কাফেলাটি উন্নতি ও সমৃদ্ধির মনযিলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

মোটকথা রসূল সা. সমগ্র জগতবাসীর জন্য মুক্তিদূতও ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।

আবির্ভাবের স্থান কাল ও মানবীয় উপাদান

মানবজাতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মহান আল্লাহ একদিকে যেমন রসূল সা. এর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বকে বাছাই করলেন, অপর দিকে তেমনি সেকালে নিকৃষ্টতম পরিস্থিতির বিরাজ করা সত্ত্বেও রসূল সা. এর জন্য উৎকৃষ্টতম সময়, দাওয়াতের জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্থান এবং প্রথম সম্বোধন করার জন্য সর্বোত্তম জাতিকেও নির্বাচিত করলেন।

---

[২] কুরআনের সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে : তারা যেন পশুর মত, বরং পশুর চেয়েও বিপথগামী।" (আয়াত–৪২)

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে সময়টাকে এই হিসাবে সবচেয়ে উপযোগী মনে করা যায় যে, তখন গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার সময় শেষ হয়ে আন্তর্জাতিকতার যুগ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস অল্প কয়েকটা বাঁক ঘুরতেই বিজ্ঞানের যুগে পদার্পন করতে যাচ্ছিল। রসূল সা. এর আবির্ভাবের যুগটি ছিল আসলে উল্লিখিত দুটো যুগের মাঝে সীমানা চিহ্নিতকারী। ভবিষ্যতের ব্যাপকতর ও উজ্জ্বলতর যুগের উদ্বোধন করার জন্য পূর্ববর্তী নবীদের দাওয়াতকে পুনর্ব্যক্ত করা, তার প্রাণশক্তিকে তুলে ধরা, আল্লাহর আনুগত্য ভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তি মজবুতভাবে স্থাপন করা এবং ইসলামের সাম্য ও ন্যায় বিচার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগভাবে উপস্থাপন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল, যাতে করে রসূল সা. -এর এই কীর্তির আলোক রশ্মীতে পরবর্তী যুগগুলি আলোকিত হয়ে যেতে পারে। এই যুগটা এ হিসাবেও সবচাইতে উপযোগী ছিল যে, মানুষের সামনে আর কোন আশা ভরসার স্থল অবশিষ্ট ছিলনা, তাই তাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়া সহজতর ছিল।

দাওয়াতের স্থানের দিকে যদি দৃষ্টি দেই, তবে দেখতে পাই আরব একটা উষর মরুময় দেশ হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সভ্য দুনিয়ার কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও উত্তর দিক থেকে আগত সকল বাণিজ্যিক পথগুলো আরব ভূখন্ডের সাথে এসে মিলিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের মাঝে যতটা বহির্বাণিজ্য চলতো, তা আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই চলতো। আম্মান ও ইয়েমেন, সানা ও মক্কা, জেদ্দা ও ইয়াম্বু, এবং মদীনা ও দুমাতুল জানদালের মাঝে বাণিজ্যিক কাফেলার আনাগোনা ছিল। এ সব কাফেলা আরব নেতৃবৃন্দ তথা কুরাইশদের অনুমতি ও গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলোর ছাড়পত্র ছাড়া নিরাপদে চলাচলই করতে পারতোনা। এভাবে আরব ভূখন্ড, বিশেষত মক্কা, তায়েফ, মদীনা, ইয়াম্বু ও দুমাতুল জানদালের যোগাযোগ ভারত, চীন, ইরান, ইরাক, মিশর, রোম ও ইথিওপিয়ার সকল অঞ্চলের সাথে ছিল। এখানে কোন সামষ্টিক দাওয়াত ও প্রচারের কেন্দ্র অন্য যে কোন অঞ্চলের চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতো। তা ছাড়া আরব বিশ্বে মক্কা ও মদীনার গুরুত্ব ছিল সর্বোচ্চ। ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিরোধ্য।

আরব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনগ্রসরতা, উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থার দরুণ যদিও কয়েকটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এর একটা মস্ত বড় উপকারিতাও ছিল। সেটি হলো, আরব দেশ বহিরাগত আধিপত্য থেকেও অনেকাংশে মুক্ত ছিল। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ পর্যায়েও এমন ক্ষমতা কারো ছিলনা যে, সারা দেশের ওপর নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং তারপর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আইন ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে একটা বিশেষ কাঠামোর ওপর দাঁড়

---

৩. এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখের দাবী রাখে ঃ

"আমাকে আদম সন্তানদের রকমারি যুগের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ যুগে পাঠানো হয়েছে," (বুখারী) "আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধরের মধ্য থেকে কিনানাকে, কিনানার বংশধরের মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশের মধ্য থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।" (মুসলিম) "আল্লাহ যখন জগত সৃষ্টি করেন তখন আমাকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর, অতঃপর গোত্রের অতঃপর শ্রেষ্ঠ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাই আমি ব্যক্তি হিসাবেও শ্রেষ্ঠ এবং পরিবার হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।" (তিরমিযী)

করাতে পারে। এমন ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থাকলে সে ইসলামী আন্দোলনকে খতম করে দিতে পারতো, যেমন অতীতের বিভিন্ন যালেম বাদশাহ নবীদের দাওয়াতকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছার আগেই থামিয়ে দিত। কুরাইশদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং তারা সর্বশক্তি নিয়ে বাধা দিয়েছেও বটে। তবে কুরাইশদের সমগ্র আরবের ওপর কোন নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিলনা। তাদের ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক প্রভাব যতই গভীর হোক না কেন তারা কখনো একটা সুসংগঠিত সরকারের বিকল্প হওয়ার মতো ছিলনা।

ধর্মীয় দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এ ভূখণ্ডের চারদিকে পূর্ববর্তী নবীদের দাওয়াতের স্মৃতি ছিল অম্লান। সেকালের জাতিগুলোর যে পরিণতি হয়েছিল, তার আলামতগুলিও সবার চোখের সামনে বিরাজ করতো। উত্তরে ছিল হযরত ইবরাহীমের জন্মস্থান উর। তারই কাছে ছিল হযরত নূহ,, হযরত লূত ও হযরত সালেহ আ.-এর অঞ্চল। বনী ইসরাঈলের উত্থান পতন ও ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের স্থান ফিলিস্তীন এবং জেরুজালেমও পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। দক্ষিণে ছিল আ'দ ও সামুদের বাসস্থান এবং মারেব বাঁধের এলাকা ও সাবার রাজ্য। সাগরের ওপারে রয়েছে মিশর। সেখানে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) তাওহীদের কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। সেখানে তাঁরা ইবাদত ও অনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আল্লাহর আনুগত্য, তাওহীদ ও মানবতার সংস্কার ও বিকাশের জন্য এর চেয়ে উত্তম এলাকা আর কোন্‌টা হতে পারতো? এখানে ইসলামের দাওয়াতের আওয়ায তুললে সহজেই মানুষের মনে সাবেক নবীগণের রেখে যাওয়া নিদর্শনাবলী পুনরুজ্জীবিত হয়ে দেখা দেবার মতো অবস্থা বিরাজ করছিল।

মানবীয় উপাদানও আরবে যা ছিল, তা ছিল সর্বোত্তম। এই উপাদানটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল এই যে, এর ক্ষমতা ও যোগ্যতার উৎস তখনো পর্যন্ত অব্যবহৃত ও সুরক্ষিত ছিল। রোম ও ইরানের পাশবিক সভ্যতা যেসব ধ্বংসাত্মক রোগের জন্ম দিয়েছিল, আরবরা তা থেকে তখনো মুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে হিংস্র জীবন যাপন পদ্ধতি জনিত দোষত্রুটি বিদ্যমান থাকলেও তার ভালো গুণাবলীও নেহাত কম ছিলনা। বেদুইন হওয়ার কারণে তাদের মেযাজে ছিল স্বভাবসুলভ সরলতা। কৃত্রিমতা থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীকে তাদের খুব নিকট থেকে দেখার সুযোগ ছিল। তাই বিশ্ব চরাচরে মহাসত্যের নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। গরম আবহাওয়া, মরুঝড়ের ঝাপটা, রাত দিনের কষ্টকর সফর, ক্ষুধা ও পিপাসার অভিজ্ঞতা এবং প্রতিদিনকার হত্যা ও লুটতরাজের কারণে তাদের মধ্যে দুর্ধর্ষতা ও দুঃসাহসিকতার জন্ম হতো এবং তা বীরত্বের প্রেরণা উজ্জীবিত করার কাজে সহায়ক হতো। একটা দুনিয়া জোড়া আন্দোলন পরিচালনার কাজে যে ধরনের একদল সাহসী বীরের প্রয়োজন ছিল, তারা ঠিক তেমনই ছিল। তাদের মধ্যে দানশীলতা বিদ্যমান ছিল। এত বড় কাজ করার জন্য কৃপণ ধরনের মানুষ মানানসই হতোনা। আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। নিজেদের বংশ পরম্পরা তো বটেই,এমনকি তারা তাদের ঘোড়ার বংশ পরম্পরাও মুখস্থ রাখতো। একটি জীবন ব্যবস্থার নীতিমালাকে গ্রহণ করা এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এ ধরনের লোকেরাই সর্বোত্তম কর্মী হতে সক্ষম ছিল। তাদের মধ্যে

আত্মসম্ভ্রমবোধ পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এজন্য আত্মমর্যাদা রক্ষার কাজটি সমাধা করা তাদেরই আয়ত্বাধীন ছিল। তাদের ভাষাও ছিল একটা উচ্চমানের, বিশাল ও বিকাশমান ভাষা। সে ভাষার লালিত্য ও অলংকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কাজে তারা সহজেই সামনে অগ্রসর হতে পারতো। অন্যদেরকে একটা বিপ্লবী বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করতেও তারা অধিকতর সফলকাম হতো।

আরবরা ছিল সংকল্পে দৃঢ় ও অনমনীয়। এমনকি অন্যায় পথে চললেও তারা মনের পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিবেকের অটুট প্রত্যয় নিয়েই চলতো। সব রকমের বাধা ও বিরোধিতা মোকাবিলা করে তারা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেত। তবে তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করা হলে সে ক্ষেত্রেও তারা হতো অবিচল ও নির্ভীক। এ ধরনের আরো অনেক বৈশিষ্ট তাদের ছিল। যার ভিত্তিতে স্বীকার না করেই পারা যায়না যে, রাসূল সা. নিজে ব্যক্তিগতভাবে যেমন লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতম নেতা ও আহ্বায়ক ছিলেন, তেমনি সর্বোত্তম মানের জনশক্তিও তাকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, এই মানব সম্পদ সকল দিক দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনে ব্যাকুল ছিল। জাহেলী আরব সমাজের মেধাবী ও চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে ধর্মীয় দিক দিয়েও অস্থিরতা ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ মহাসত্যের সন্ধান ও বিশ্ব বিধাতার নির্দেশনা লাভের জন্য ব্যগ্র ও উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়েও তাদের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। মক্কা ও মদীনার মত শহরগুলোতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল। কোন না কোন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পন্ন একটা নগররাষ্ট্রের খানিকটা অগোছালো রূপরেখা তৈরী হচ্ছিল। তাছাড়া আরবের অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের স্বল্পতার দরুণ জনসংখ্যা মরু এলাকার বাইরে সম্প্রসারিত হতে বাধ্য হচ্ছিল। চলমান সভ্যতায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে এবং নেতৃত্ব নিস্ক্রীয় হয়ে পড়লে নতুন কোন যাযাবর গোষ্ঠীকে সভ্যতার চালকের মসনদে বসানো আল্লাহর স্বতসিদ্ধ চিরাচরিত নীতি। এই নীতি অনুসারেই আল্লাহ ফেরাউনী শক্তির পতন ঘটিয়ে তার স্থলে বণী ইসরাঈলকে ক্ষমতাসীন করেছিলেন।

এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে আরবরাই ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনশক্তি। মানব সমাজে একটা মৌলিক ও সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করার জন্যে এই জনশক্তিই সবচেয়ে উপযোগী।

বিপ্লবী কলেমা

এ কথা ভাববার কোনই অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী সা. কোন আকীদা- বিশ্বাস, মতাদর্শ, বা পরিকল্পনা ছাড়াই সংস্কার ও বিনির্মাণের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি নিছক একটা অস্পস্ট চেতনা, লক্ষ্যহীন আবেগ এবং অপরিপক্ক উন্মাদনা দ্বারা তাড়িত হয়ে এ কাজ শুরু করেননি। বরং তিনি মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যের মশাল হাতে নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে বছরের পর বছর ধরে জীবনের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। হেরা গুহার নির্জন প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকাল ব্যাপী নিজের অন্তর্জগত ও বহির্জগত নিয়ে ধ্যান করেছেন। সভ্যতার কল্যাণ ও অকল্যাণ কিসে হয়, তার নীতিমালা বুঝবার জন্য তিনি অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ

ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ পাক তাঁর হৃদয়কে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য তাঁর সামনে উদঘাটিত হয়েছে। সেই শ্রেষ্ঠতম সত্য হলো, মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা ও প্রভু আছেন এবং মানুষ তাঁরই গোলাম ও দাস। এই সত্য কলেমাই ছিল বিশ্বনবীর সূচিত বিপ্লবের বীজ। এই বীজ থেকেই জন্ম নিয়েছিল সৎ জীবন ও নিষ্কলুষ সভ্যতার সেই পবিত্র বৃক্ষ, যার শেকড় মাটির অনেক গভীরে উপ্ত এবং যার ডালপালা উচ্চ আকাশে বিস্তৃত।

বিশ্বনবীর ঘোষিত এই কলেমা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিপ্লবাত্মক কলেমা। আমরা সবাই জানি, এই কলেমা হলো "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"। শাব্দিকভাবে এটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত গভীর। "এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ" ইলাহ সেই শক্তি বা সত্তাকে বলা হয়, যার গোলামী করা যায়, যার জন্য মানুষ নিজেকে ও নিজের যথাসর্বস্বকে অকাতরে উৎসর্গ করতে পারে, যার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে উপাসনা করে, যার সর্বাত্মক প্রশংসা, গুণগান, পবিত্রতা ঘোষণা, ও বন্দনা করে। যার জন্য মান্নত মানে, যার কাছে সর্ব প্রকারের কল্যাণের আশা করে, যার পাকড়াওকে ভয় করে, যার কাছে সৎকাজের পুরস্কারের আশা ও অসৎকাজের শাস্তির আশংকা করে, যাকে নিজের নিরংকুশ মালিক মোখতার মনে করে, যাকে শাসক ও আইনদাতা মানে, যার আদেশ অনুযায়ী কাজ করে ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, যার দেয়া নীতিমালাকে নিজের জীবনের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে, যার হালাল ও হারামের বিধিকে বিনা বাক্য ব্যয়ে কার্যকরী করে, যাকে নিজের জন্য হেদায়াতের উৎস মনে করে, যার ইচ্ছা ও মর্জী অনুযায়ী জীবন বিধান তৈরী করে, যার প্রিয়জনদেরকে সম্মান ও বিরোধীদেরকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং যার সন্তুষ্টি অর্জন তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। একটি মাত্র শব্দ ইলাহের মধ্যে এই ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত ছিল।

মানব সমাজ ইলাহ্‌র এই অধিকারগুলোকে এক আল্লাহর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভাগ বাটোয়ারা করে রেখেছিল। ফলে সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে জেঁকে বসেছিল অসংখ্য ইলাহ। মানুষের নিজের প্রকৃতি ও তার কামনা বাসনা, পরিবার ও গোত্রের রসম রেওয়াজ, বর্ণ, বংশ ও জাতিগত সংঘবদ্ধতার ঐতিহ্য, জমীদার ও ধর্মযাজকদের আধিপত্য, রাজপরিবার ও পরিষদবর্গের দাম্ভিকতা, ইত্যাদি তাদের ইলাহ হয়ে বসেছিল। এ সব ইলাহ্‌র নাম নিয়ে সমাজের এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শাসন শোষণ করতো, লুটে পুটে খেত। "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" ("আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।") কথাটা এই সমস্ত খোদার খোদায়ীর ওপর একই সাথে প্রচন্ড আঘাত হানতো। এই কলেমার উচ্চারণকারী প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করতো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভুত্ব আমি মানিনা, কারো কর্তৃত্ব ও আধিপত্য মানিনা, কারো রচিত আইন কানুন আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারো অর্জিত আতিমানবীয় অধিকার বৈধ নয়, কারো সামনে মাথা নোয়ানো হবেনা, কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করা হবেনা, কারো আংগুলের ইশারায় জীবন চলবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল খোদার খোদায়ী ভেংগে চুরমার করে দেয়া হবে। বস্তুত, এই কলেমা ছিল মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা।

এই কলেমার দ্বিতীয় অংশে এই মর্মে অংগীকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, মানবজাতির

হেদায়াত তথা মুক্তি ও কল্যাণের পথের সন্ধান দান এবং সভ্যতা ও সংস্কার সংশোধনের একমাত্র পথ হলো আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসূলগণের দেখানো পথ। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আসল ও নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো ওহী। এ থেকেই মানবীয় বিবেক চিন্তা করার মূলনীতি কী জানতে পারে। মুহাম্মদ সা. রিসালাতের এই ধারাবাহিকতার পূর্ণতাদানকারী সর্বশেষ নবী ও রসূল। জীবনের সঠিক পথের সন্ধান তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে এবং তাঁর নেতৃত্বেই বিশ্ব মানবতা কল্যাণ ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম।

এই কলেমার এই গুরুত্বের কারণেই তার স্বীকৃতি ইসলাম গ্রহণের পয়লা শর্তে পরিণত হয়েছে। এই কলেমাকে মুয়াযযিনগণ আযান দেয়ার সময় উচ্চ স্বরে পাঠ করে থাকে এবং তাকে শ্রেষ্ঠ যিকর বলে আখ্যায়িত ও নামাযের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট কথা, এ কলেমা সর্ব দিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

রসূল সা.-এর এই বিপ্লবাত্মক কলেমা যার অন্তরেই প্রবেশ করেছে, তার ভেতরে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এ কলেমা যার জীবনেই ঢুকেছে, তার নকশা পাল্টে গেছে। এ বীজ থেকে নতুন মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে এবং লালিত পালিত ও বিকশিত হয়েছে।

সমাজ সংস্কারে রসূল সা. এর লক্ষ্য

রসূল সা.-এর জীবনী থেকে যথার্থ উপকারিতা অর্জনের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার জবাব জানা জরুরী, তা হলো, রসূল সা. এর সামনে ইপ্সিত পরিবর্তনের পরিধি কতদূর এবং তাঁর কাজের মানদণ্ড কী ছিল? সমাজ ব্যবস্থায় তিনি কি কোন আংশিক পরিবর্তন চাইতেন, না সর্বাত্মক পরিবর্তন? তাঁর দাওয়াত কি নিছক ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কারের মধ্যে সীমিত ছিল, না রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্নও ছিল? অন্য কথায়, সামাজিক পরিমন্ডলে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য কী ছিল?

এ প্রশ্নের জবাব খোদ কুরআনে খুব সুষ্ঠভাবেই দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভংগীতে বারবার ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য জানানো হয়েছে। এখানে আমি শুধু দুটো আয়াতের উল্লেখ করছি। এক জায়গায় সকল নবী ও রসূলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"আমি আমার রসূলগণকে কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি এবং তাদের ওপর কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি, যাতে মানবজাতি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

কথাটা একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামের দাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা। একই উদ্দেশ্যে লোহার অস্ত্র

শস্ত্র ব্যবহার করার ইংগিত আয়াতের পরবর্তী অংশে রয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী বিধিব্যবস্থার বাস্তবায়ন, সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনের জন্য সামরিক শক্তিও অনিবার্য।

স্বয়ং মুহাম্মদ সা. নবী হিসাবে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার বলা হয়েছে। যেমন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

" তিনিই আল্লাহ, যিনি স্বীয় রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এই সত্য দ্বীনকে অন্য সমস্ত ধর্মমত ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। চাই তা মোশরেকদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।" (সূরা আস সফ ঃ ৯)

অর্থাৎ কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য মোশরেকরা তো নিজেদের জাহেলী জীবন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেই। জায়েলিয়াতের বিরুদ্ধে যে আওয়াজই তোলা হোক, তা তাদের কাছে অপসন্দ হবেই। কিন্তু এইসব পসন্দ অপসন্দের তোয়াক্কা না করে এবং তাদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে রসূল সা. কে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের কাজটা সুসম্পন্ন করতেই হবে। ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য যদি এটা না হতো, তাহলে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, জেহাদ ও হিজরতের অবকাশ কোথা থেকে হতো? জান ও মালের কুরবানীর আহ্বান কেন জানানো হলো? কী উদ্দেশ্যে "আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও" এই উদাত্ত আহ্বান জানানো হলো? কী উদ্দেশ্যে "আল্লাহর দল" গঠিত হয়? কোন্ লক্ষ্যে শহীদদেরকে বাছাই করা হয়? বস্তুতঃ ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য অন্তরে বদ্ধমূল না করে কুরআন ও সীরাত এই দুটোর কোনটাই বুঝা যাবেনা।

এবার আসুন, রসূল সা.-এর জীবনেতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় পর্যালোচনা করে অনুসন্ধান চালানো যাক যে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য কী ছিল?

রসূল সা. প্রাথমিক স্তরেই বনু হাশেম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটি বৈঠক আহ্বান করেন নিজের দাওয়াত পেশ করার জন্য। সেখানে তিনি সংক্ষেপে বলেন যে, এই দাওয়াত দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এর অনেক দিন পরে এক কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করার সময় তিনি ঐ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ

فَاِنْ تَقْبَلُوْا مِنِّىْ مَا جِئْتُكُمْ بِه فَهُوَ حَظُّكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ

"আমি যে দাওয়াত পেশ করছি তা যদি তোমরা গ্রহণ করে নাও, তাহলে তাতে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম জিল্‌দ, পৃঃ ৩১৬)

'দুনিয়ার কল্যাণ' এই সহজ সরল শব্দ দুটিকে কোন আংশিক কল্যাণের অর্থে গ্রহণ করা একেবারেই অযৌক্তিক। আংশিক কল্যাণ তো প্রত্যেক দাওয়াতেই থাকে। প্রত্যেকটা খারাপ ব্যবস্থায়ও কিছু না কিছু ভালো জিনিস থাকে। আসলে দুনিয়ার কল্যাণের অর্থ হলো দুনিয়ার জীবনটা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়া। সমাজ ব্যবস্থাটা নিষ্কলুষ ও নিখুঁত হওয়া। 'ন্যায় বিচারের স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পবিত্র ও নির্মল জীবনের অধিকারী হওয়া।

কুরাইশদের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে আরো একবার রসূল সা. এর সাথে তাদের আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও তিনি বলেন ঃ

كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَعْطُوْنِيْهَا تَمْلِكُوْنَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنَ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ

"একটি মাত্র কথা যদি তোমরা আমাকে দাও, তবে তা দ্বারা তোমরা সমগ্র আরব জাতির ওপর আধিপত্য লাভ করবে এবং যত অনারব জাতি পৃথিবীতে আছে তারা সব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম জিলদ, পৃঃ ৩১৬)

প্রতিটি মেলা ও হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন গোত্রের শিবিরে শিবিরে গিয়েও তিনি এই বক্তব্য প্রত্যেক গোত্রপতির কাছে রাখতেন। তাদেরকে বলতেন! "আমাকে সাথে নিয়ে চলুন। আমাকে কাজ করার সুযোগ দিন, এবং আমার সাথে সহযোগিতা করুন, যেন আমি সেই বার্তাটা জনগণের কাছে স্পষ্ট করে পেশ করতে পারি, যার জন্য আমাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।"[৪] এই বক্তব্য শুনে ও রসূল সা. এর আবেগ উদ্দীপনা দেখে বনু আমের গোত্রের গোত্রপতি বুখাইয়া বিন ফিরাস এত অভিভূত হলেন যে, তিনি নিজের ঘনিষ্ট জনদের কাছে বললেন ঃ এই যুবককে হাতে পেলে আমি সমগ্র আরবকে গ্রাস করে ফেলতে পারবো।" রসূল সা.-এর দাওয়াতের লক্ষ্য ও তাঁর তৎপরতার সম্ভাব্য ফলাফল এই বিচক্ষণ আরব সরদার বুঝে ফেলেছিলেন। তাই তিনি রসূলের সাথে একটা দর কষাকষি করতে চাইলেন। তিনি রসূল সা. কে জানালেন যে, তিনি একটি শর্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সেটি হলো, আপনি যখন আপনার বিরোধীদের ওপর বিজয় লাভ করবেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন, তখন আপনার পরে আমরা ক্ষমতাসীন হব।" বুখাইরা যে অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রসূল সা. যদি সংকীর্ণ অর্থে নিছক ধর্মীয় প্রচারক ও ওয়ায নসীহতকারী হতেন, এবং কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য তাঁর একেবারেই না থাকতো, তাহলে পরিষ্কার বলে দিতেন যে, আরে ভাই, আমি তো আল্লাহ ওয়ালা মানুষ। ক্ষমতার বখরা দিয়ে আমার কী কাজ? রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? কিন্তু রসূল সা. এভাবে জবাব দেননি। তিনি বললেন ঃ

"ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। ওটা তিনি যাকে দিতে চান তাকেই দেবেন।"

---

৪. বনু আমের গোত্রের যারা হজ্জ করতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে জানিয়েছেঃ
"মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে অনুরোধ করেছিল আমরা যেন তার নিরাপত্তা বিধান করি, তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং আমাদের এলাকায় তাকে নিয়ে আসি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় জিল্দ, পৃঃ ৩৪)

এ কথা বলেই তিনি বুখায়রার শর্ত ও ক্ষমতা ভাগাভাগির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় জিল্‌দ পৃঃ ২৩)

রসূল সা. এর নেতৃত্বে আন্দোলন চলাকালে "আরব ও অনারবদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ" -এর বিষয়টি এত খ্যাতি লাভ করে যে, ওটা যেন ইসলামী আন্দোলনের শ্লোগানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শিশুরা পর্যন্ত ওটা বলাবলি করতো। বিরোধিরা এটাকে একটা উপহাসের ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ করেছিল। দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর যে সব যুবক ইসলাম গ্রহণ করতো এবং কুরাইশদের অত্যাচার নির্যাতনে পিষ্ট হতো, তাদেরকে দেখলেই কুরাইশরা তাদের দিকে ইংগিত দিয়ে দিয়ে বলতোঃ "এই হুজুরদের কথা কি আর বলবো, এঁরা নাকি আরব-আজমের শাসক হবেন!"

বিদ্রুপ, উপহাস, বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মাত্রা যতই বাড়ুক, কুরাইশ গোত্রের বিচক্ষণ লোকেরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে নির্ঘাত উপলব্ধি করছিল যে, এ আন্দোলন কোন মামুলী জিনিস নয়, বরং এর অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ফলাফল দেখা দিতে বাধ্য। একবার মক্কার শীর্ষ স্থানীয় কুরাইশ নেতারা উতবাকে রসূলুল্লাহর সা. সাথে আলাপ আলোচনার জন্য পাঠালো। উৎবা সরকারী পদ, ধন-সম্পদ ও দুনিয়াবী স্বার্থ সংক্রান্ত সম্ভাব্য সব রকমের লাভনজক জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখালো, যাতে রসূল সা. কোন রকমে এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করতে রাযী হয়ে যান। তবে জনাব রসূল সা. উৎবাকে সূরা হামীমের প্রথম কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে দিলেন। এর ফলে উৎবার চেহারাই বিবর্ণ হয়ে গেল। সে গিয়ে বললোঃ এ দাওয়াত তো একটা বিরাট পরিবর্তনের ইংগিতবহ। একটা বিপ্লব ঘনিয়ে আসবে এবং সমাজ জীবনের সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাবে। তাই সে পরামর্শ দিল যে, মুহাম্মদকে সা. তোমরা কিছু বলোনা। সে যা করছে তা করতে দাও। বাধা দিও না। আরবের জনগণ যদি তাকে মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা তার থেকে এমনিতেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে। আর যদি সে বিজয়ী হয়, তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার মর্যাদা তোমাদেরই মর্যাদা হবে, এবং তোমরা বিশ্বে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হবে।" অর্থাৎ কিনা উৎবার মত লোকও বুঝে ফেলেছিল যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে একটা সাম্রাজ্য লুকিয়ে রয়েছে। এবং এর পরিণতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। সে যখন টের পেয়েছে, তখন রসূল সা. ও তার সংগী সাথীরা কিভাবে টের না পেয়ে থাকবেন? (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম জিল্‌দ, পৃঃ ৩১৪)

একবার যখন মুসলমানরা প্রচণ্ড সহিংসতা ও নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হচ্ছিল, তখন রসূল সা.-এর সাথীরা তাঁর কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং ঐ অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য দোয়া চাইলেন। রসূল সা. প্রথমে তো তাঁদের বুঝালেন যে, আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে পদে পদে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অতীতে যারা এ দায়িত্ব পালন করেছে তাদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে। অতঃপর পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাদেরকে সুসংবাদ শুনালেন যে, "আল্লাহর কসম, এ কাজকে আল্লাহ একদিন অবশ্যই চূড়ান্ত সাফল্য দান করবেন।' অতঃপর এই সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

"এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ একাকী সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয়ে সে ভীত থাকবেনা।"[৫] অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন এক ইনসাফপূর্ণ সমাজ ও কল্যাণময় যুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং এমন শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা চালু হবে যে, আজ যেখানে ডাকাতি, রাহাজানি হত্যা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে মানব সন্তানকে দিনে দুপুরে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং প্রকাশ্যে নারীর সতীত্ব পর্যন্ত লুণ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে একজন ভ্রমণকারী সম্পূর্ণ একাকী নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে যত্রতত্র ভ্রমণ করতে পারবে। কেউ তার জান মাল ও মান সম্ভ্রমকে স্পর্শ করার দুঃসাহস দেখাবে না। আর একবার রসূল সা. বলেছিলেন যে, এমন একটা যুগ প্রায় আসন্ন, যখন লোকেরা নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই মক্কায় যাতায়াত করবে।[৬]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেরূপ পরিস্কার ও উজ্জ্বল ধারণা এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা সত্যিই অতুলনীয়।

একবার রসূল সা. কা'বার চাবির রক্ষক উসমান বিন তালহাকে কা'বার দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করলে উসমান সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। সে সময় দৃশ্যত চরম নৈরাজ্যজনক ও প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। তথাপি রসূল সা. বললেন, 'সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন এই চাবি আমাদের হাতে থাকবে এবং আমরা যাকে দিতে চাইবো দেবো।[৭]

আকাবা নামক স্থানে মদীনার আনসারদের কাছ থেকে যে ঐতিহ্যসিক অংগীকার বা বায়আত নেয়া হয়েছিল, তা অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রচারজনিত বিরোধ ও সংঘাত যে কত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী হয়, তা আনসাররাও উপলব্ধি করেছিলেন। তারা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই বিরোধের চূড়ান্ত ফায়সালা পরবর্তীতে যুদ্ধের ময়দানেই হবে। এই অংগীকারের মধ্য দিয়ে একদিকে আনসারগণ রসূল সা.-এর সমর্থনে প্রয়োজনে সারা বিশ্বের সাথে যুদ্ধ করারও প্রতিশ্রুতি দেন এবং নিজেদের সরদারদের ধ্বংস ও জানমালের বিনাশকেও স্বাগত জানান। অপরদিকে রসূল সা. এর কাছ থেকেও তারা প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, আল্লাহ যখন আপনাকে বিজয়ী করবেন, তখন যেন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন না। এই যে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি, ত্যাগ ও কুরবানীর সংকল্প এবং বিজয়ের স্বপ্ন - এ সবের মধ্যে কি রসূলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি?[৮]

হিজরতের জন্য যাত্রা শুরু করার আগে তাকে যে দোয়া শোখানো হয় তার শেষাংশ হলো, "আর তোমার পক্ষ থেকে কোনো রাষ্ট্র শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।"[৯]

এ আয়াতে তাঁকে 'সহায়ক শক্তি' প্রার্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই পবিত্র

---

৫. সীরোতে ইবনে হিশাম - প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩১৪ (মূল আরবী পুস্তক)
৬. শিবলী নোমানী ঃ সীরাতুন্নবী, ২য় খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা
৭. আল মাওয়াহিবুল লাদুনীয়া, কাসতালানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮
৮. সীরাতে ইবনে হিশাম- (আরবী) ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০, ৫১, যাদুল মায়াদ (আরবী) ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০, ৫১
৯. সূরা বাণী ইসরাঈল, আয়াত ৮০,

মিশনের পৃষ্ঠপোষকতা ও এই মহতী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শাসন ক্ষমতার প্রয়োজন বিধায় শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

চাচা আবু তালেবের ওপর রসূল সা.-এর সাহায্য ও সমর্থন পরিত্যাগ করার জন্য যখন চাপ সৃষ্টি করা হলো, তখন তিনি রসূল সা. কে বললেন, আমার জন্য সমস্যার সৃষ্টি করোনা। এই সময় রসূল সা. যে জবাব দেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি আমার এ লক্ষ্য পরিত্যাগ করবো না।" তাঁর জবাবের শেষ কথাটা ছিল এই, "হয় আল্লাহ আমার এ লক্ষ্যকে বিজয়ী করবেন, নচেত এ কাজ করতে করতেই আমি মৃত্যু বরণ করবো।"১০.

এখানে তিনি 'বিজয়ী করবেন' বলেছেন, 'সম্পূর্ণ করবেন' বলেননি। 'বিজয়ী শব্দটার মধ্যেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারণা বিদ্যমান। আর তাঁর শেষ বাক্যটি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের তীব্রতা ছিল জীবনের ঝুঁকি পর্যায়ের।

হিজরতের পর আদী ইবনে হাতেম রসূল সা.-এর কাছে এসে তাঁর ব্যক্তিত্ব পরখ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর দাওয়াতের ধারণা কী জানতে চেষ্টা করলেন এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর চলন বলন পর্যবেক্ষণ করলেন। আর এ কাজ করতে গিয়েই তার হৃদয় হয়ে পড়লো অভিভূত ও মুগ্ধ। আগন্তুকের চিন্তাধারার সাথে সংগতি রেখে তিনি তাকে জানালেন যে, ভবিষ্যতে বাবেলের সাদা ভবনগুলো ইসলামের অধীনে চলে আসবে, এখানে বিপুল ধনসম্পদ বিরাজ করবে এবং মুসলমানরা অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতাপের অধিকারী হবে। সেই সাথে তিনি তাকে ইসলামী ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট সম্পর্কেও অবহিত করলেন যে, অচিরেই তুমি দেখবে, এক মহিলা সুদূর কাদেসিয়া থেকে একাকী একটি উটে সওয়ার হয়ে এই মসজিদ অভিমুখে রওনা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছেছে। বাহ্যত একেবারেই নিস্ব অবস্থায় হিজরতের সফরে যে নবীর দৃষ্টি সুরাকার হাতে পারস্য সম্রাটের কংগন শোভা পেতে দেখেছে, তাঁর সম্পর্কে এ কথা কিভাবে বলা যায় যে, নিজের আন্দোলনের শেষ পরিণতি ও নিজের সূচিত নতুন সমাজ ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না? এ কথা কিভাবে কল্পনা করা সম্ভব যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তার জন্য প্রস্তুতি ও সংগ্রাম করা হয়নি এবং তা নিছক পুরস্কার হিসাবে আকস্মিকভাবে রসূল সা. এর সংগঠনকে দেওয়া হয়েছে? বলতে চাইলে বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, কেবল পার্থিব স্বার্থ ও ব্যক্তিগত প্রতাপ ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করতে চাননি। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা, ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা, মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করা এবং সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কাম্য ছিল না, একথা কেমন করে বলা যায়?

আসলে শুধু আকীদাগত ও নৈতিক বিপ্লব সাধনই রসূল সা. এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সেই সাথে পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনও তাঁর লক্ষ্য ছিল। ব্যক্তির

১০. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৭৮

সংশোধনের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। অন্য কথায় বলা যায়, রসূল সা. মানুষকে একটা সামষ্টিক সত্তা বা সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। এবং তার সকল সামাজিক সম্পর্ক সহ তাকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। রসূল সা. মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ব্যক্তি হিসাবেও বিবেচনা করেননি। এবং তাঁর দাওয়াতকেও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি। এই বিষয়টি যদি স্মরণ রাখা হয় এবং রসূল সা. এর আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যদি তার সমস্ত ব্যাপকতা সহকারে অন্তরে বদ্ধমূল করা হয়, তাহলে সীরাতের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হবে এবং প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রতিটি উদ্যোগের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অন্যথায় সীরাতের রহস্যও উদঘাটিত হবে না, এবং পবিত্র কোরআনের বক্তব্যও স্পষ্ট হবে না।

একটি দীন একটি আন্দোলন

দর্শনের গণ্ডী যতখানি, চিন্তার গণ্ডীও ঠিক ততখানি। জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এবং ইতিহাসের চড়াই উতরাই-এর সাথে দার্শনিকের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকেনা। দার্শনিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি-পরিবেশের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বটে; কিন্তু ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য কোন কার্যকর চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন না। প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম বলতে যা বুঝানো হয়, তার গণ্ডী আরো একটু প্রশস্ত এবং তার দৌড় আরো একটু দীর্ঘ। সে কিছু আকীদা-বিশ্বাস দেয়ার সাথে সাথে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা করে একটা নৈতিক শিক্ষাও দেয়। তবে ধর্মের পথ সমাজ ব্যবস্থার বাইরে বাইরে দিয়েই অতিক্রান্ত হয়। সে দেশের রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে যেমন মাথা ঘামায়না, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কোন ব্যাপক পরিবর্তন চায়না, এবং চলমান শাসন ব্যবস্থাকেও চ্যালেঞ্জ করেনা। ধর্মের দাওয়াত সব সময় ওয়ায নসিহত ও উপদেশ দানের পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। একজন ওয়ায়েয মিষ্টি মধুর কিছু উপদেশ দিয়েই বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর শ্রোতারা কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে আছে কিনা, ইসলাম বিরোধী কুচক্রী মহল কোন আপত্তিকর তৎপরতা দ্বারা তাদের মানসিকতা ও চরিত্রকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে কিনা, দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি তাদের চরিত্রে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলছে কিনা, তাঁর সদুপদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে কি কি মতাদর্শ ও চিন্তাধারা কোন্ কোন্ দিক থেকে কতখানি প্রভাব ফেলছে, তাঁর দেয়া ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত পরম ধর্মপ্রাণ ও খোদাভীরু লোকগুলো কোন অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে আছে কিনা, -সে সব বিষয় নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা থাকেনা। তাঁর মধ্যে কোন সামষ্টিক লক্ষ্য থাকে না। পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা থাকেনা। রাজনৈতিক ও নেতাসুলভ প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশে আংশিক সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা সৃষ্টি করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব, তা করা হয়। তারপর অবশিষ্ট বিস্তীর্ণ ময়দানে বাতিল ও অপশক্তি মহানন্দে আপন পতাকা ওড়াতে থাকলো কিনা, তা নিয়ে তাঁরা আর মাথা ঘামায় না।

রসূল সা. একজন দার্শনিক ছিলেন না যে, স্রেফ উচ্চাংগের কিছু ধ্যান ধারণা পেশ করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং বাস্তব অবস্থা নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা তাঁকে করতে হবে

না। তিনি নিছক একজন ওয়ায়েযও ছিলেন না যে, সর্বব্যাপী নৈরাজ্য ও উচ্ছৃংখলতা থেকে একেবারে চোখ বুজে কেবল ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সম্বোধন করবেন, মিষ্টি মধুর উপদেশ বিতরণ করবেন এবং তার পরিণতি কী হতে পারে, তা আদৌ ভেবেই দেখবেন না। মানব জাতির ত্রাণকর্তা এই মহামানব পরিপূর্ণ সমাজ সচেতনতা সহকারে মানব জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধনকেই নিজের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি সামষ্টিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে, এমন প্রতিটি শক্তির সাথে পরিচিত হয়েছেন। জাহেলী সমাজ ও সভ্যতার চালক নেতৃবৃন্দের ওপর নজর রেখেছেন। যুক্তিপ্রমাণ সহকারে তাদেরকে দাওয়াতও দিয়েছেন। তাদের সমালোচনাও করেছেন। এমনকি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত করেছেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ওপর দৃষ্টি রেখেছেন। ঘটনা প্রবাহ ও পরিস্থিতির প্রতিটি তরংগের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রতিটি ঘটনাকে নেতাসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে যাচাই ও পরখ করেছেন যে তা কোন্ দিক দিয়ে সংস্কারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ও কোন্ দিক দিয়ে ক্ষতিকর? সমাজের সকল ধরনের মানুষের যোগ্যতা ও গুণাগুণ জানতে চেষ্টা করেছেন এবং তার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন যে, দাওয়াতের কাজে কখন কার কাছ থেকে কী সাহায্য আশা করা যায়। তিনি নিজের শক্তি ও গতিকে প্রতিপক্ষের শক্তি ও গতির সাথে তুলনা করতেন। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্যের সাথে প্রহর গুণতেন। উপযুক্ত সময়টা এসে যাওয়া মাত্রই সাহসের সাথে পদক্ষেপ নিতেন। জনমতের ওঠানামা কিভাবে হয়, তা যথাযথভাবে বুঝতেন এবং বিরোধীদের প্রতিটি অপপ্রচারের মোকাবিলা করে তাদের প্রভাব খর্ব করতেন। যখন দেখলেন, ইসলাম বিরোধী কবিতা ও বক্তৃতার একটা আসর তৈরী হয়ে গেছে, তখন তার পাল্টা আসর গড়ে তুললেন ইসলামী কবি ও গণবক্তাদের দ্বারা। ইসলামী নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন বটে, তবে চোখ বুঁজে নয়। বরং পরিস্থিতি ও পরিবেশের দিকে দৃষ্টি রাখতেন, সময়ের চাহিদা বুঝতেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করতেন। যেখানে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত, এগিয়ে যেতেন। এগিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে না হলে অগ্রাভিযান থেকে বিরত থাকতেন। এক সাথে দুটো বিপদের সম্মুখীন হলে একটা থেকে আত্মরক্ষা করে অপরটার মোকাবিলা করতেন। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে নিঃসংকোচে গ্রহণ করতেন। সন্ধির সুযোগ সৃষ্টি হলে অকুণ্ঠ চিত্তে সন্ধির হাত বাড়িয়ে দিতেন। সর্বোপরি, এই সব চেষ্টা সাধনায় আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য এবং নৈতিক মূল্যবোধকে শুধু সংরক্ষণই করতেন না, বরং তার ক্রমাগত উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করতেন। এই গোটা কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতিকে যদি কোরআন ও সীরাত (মুহাম্মদ সা.-এর নবী জীবনের ইতিহাস)-এর পাতা থেকে একত্রিত করে সামনে রাখা হয়, তাহলে ব্যক্তিগত পূজা-উপাসনা, জপতপ ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রচলিত পরিভাষার 'ধর্ম' এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য বোধক 'আদ-দ্বীন' -এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। জানা যাবে ওয়ায নসিহত ও বৈপ্লবিক আহবানের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান!

যেহেতু রসূল সা. একটা পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক জীবন বিধান বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, তাই তিনি এক এক করে সেই সব ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করেছিলেন, যারা স্বভাবগতভাবে সৎ। তারপর যার হৃদয়ে সত্যের আলো জ্বলে উঠেছে, তাকেই একটা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তাকে নিজের সাথে অগ্নি-পরীক্ষায় অংশীদার করেছেন। তারপর যে স্তরে যতটুকু সংঘবদ্ধ শক্তি অর্জিত হয়েছে, তাকে আপন নেতৃত্বে বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইতে শামিল করেছেন। এ লড়াই যেমন চলেছে চিন্তার ময়দানে, তেমনি চলেছে রাজনৈতিক ময়দানে এবং সর্বশেষে রণাঙ্গনেও।

রসূল সা. এর পার্শ্বে যারা সমবেত হন, তাদেরকে তিনি সুফী ও দরবেশ বানিয়ে দেননি, যোগী সন্যাসী রূপে গড়ে তোলেননি, তাদের মধ্যে দুষ্কৃতি থেকে কেবল নিজেকে রক্ষা করা, বিজয়ী বাতিল শক্তির ভয়ে ভীত থাকা, এবং ক্ষমতাধর ও বিত্তশালীদের দেখে ভড়কে যাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করেননি। তারা নির্বোধ পর্যায়ের সরলও ছিলেন না, নিষ্ক্রিয় পর্যায়ের দুনিয়া ত্যাগীও ছিলেন না। তারা ছিলেন নির্ভিক ও সাহসী, সচেতন ও প্রাজ্ঞ, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও আত্মাভিমানী, সুচতুর ও বিচক্ষণ, কর্মঠ ও নিরলস এবং অগ্রগামী ও দ্রুতগামী। তারা পাদ্রী ও সাধুদের মত কর্মবিমুখ ছিলেন না। বরং সদা কর্মচঞ্চল ছিলেন এবং সব রকমের সদগুণাবলী ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

এভাবে সর্বোত্তম স্বভাবের মানুষগুলো উৎকৃষ্টতম প্রশিক্ষণ পেয়ে, উৎকৃষ্টতম সাংগঠনিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং সর্বোত্তম নেতৃত্বের অধীনে সমবেত হয়ে এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হন। এ কারণেই তারা একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু হয়েও সমগ্র আরবের বিপুল সংখ্যাগুরু জনতাকে নিজেদের অধীনে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হন। মক্কায় যখন ইসলামী সংগঠনের লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ জন, তখন মক্কা ও তার আশপাশের গোটা জনপদে তারা এক সার্বক্ষণিক চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করেন। এর পর বছরের পর বছর ব্যাপী ঘরে ঘরে ও অলিতে গলিতে সবচেয়ে বহুল আলোচিত বিষয় যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা ছিল রসূল সা. ও তাঁর সংগীদের দাওয়াতী তৎপরতা। মদীনায় গিয়ে যখন ইসলামী আন্দোলনের নিশানবাহীদের সংখ্যা কয়েকশোর বেশী হয়নি, এবং অমুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হলো।

রসূল সা. ও তাঁর ইসলামী সংগঠনের নীতি এরূপ ছিলনা যে, আগে সমগ্র আরব সমাজ ইসলাম গ্রহণ করুক, অথবা অধিকাংশ লোকদের চরিত্র সংশোধন সম্পন্ন হোক, তারপর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয়া যাবে। তাঁদের দৃষ্টিভংগী এ রকমও ছিলনা যে, দাওয়াতের কাজ চলতে থাকুক, এবং চিন্তা ও আকীদা বিশ্বাসের সংস্কার ও সংশোধন হতে থাকুক। অবেশষে একদিন একটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আপনা আপনিই তৈরী হয়ে যাবে, অথবা পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী করে দেবেন। সেখানে ইতিহাসের এই চিরায়ত সত্যকে অনুসরণ করা হয়েছিল যে, জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চিরদিনই অজ্ঞ ও নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশই থাকে সক্রিয়। এই সক্রিয় অংশের এক ভাগ সংস্কার ও বিপ্লবের দাওয়াত নিয়ে মাঠে নামে, আর অপর অংশ তাতে বাধা দেয়। সমাজের সক্রিয় অংশের এই দুই ভাগের মধ্যেই চলে আসল দ্বন্দ্ব

ও সংঘাত। এই সংঘাতের যখন ফায়সালা হ'য়ে যায়, তখন জনগণ আপনা আপনি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা জানতেন যে, জনগণের পথে যতক্ষণ কোন ভ্রষ্ট নেতৃত্ব বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং তাদের জীবনকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালাতে থাকে, অথবা অন্ততপক্ষে তাদেরকে অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে ফেলে রাখে, ততক্ষণ তারা ব্যাপকভাবে কোন দাওয়াতকে গ্রহণ করতেও পারেনা এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে কোন পরিবর্তন আনতেও সক্ষম হয়না। এমনকি যারা দাওয়াতকে গ্রহণ করে, তাদের পক্ষেও সম্ভব হয়না যে, তারা বিকারগ্রস্ত নেতা ও শাসকদের তৈরী করা নোংরা পরিবেশে নিজেদের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলবে। বরঞ্চ পরিবর্তন আনতে যদি অনেক বেশী দেরী হয়ে যায়, তবে অনেক সময় সেই মান বজায় রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যে মানে সত্যের আহবায়করা দীর্ঘ দিনের চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কেননা প্রতিকূল পরিবেশ মানুষকে পেছনে ঠেলে দিতে ক্রমাগত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। সুতরাং কোন সামাজিক আন্দোলনের স্বাভাবিক কর্মপন্থা এটাই হয়ে থাকে যে, সমাজের সক্রিয় অংশ থেকে সৎ স্বভাবের লোকগুলোকে বাছাই ক'রে যত বেশী সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হয় এবং সেই শক্তিকে সংঘর্ষে নিয়োজিত করে প্রতিপক্ষের নেতৃত্বের জোর চূর্ণ করে দিতে হয়। ইতিহাস সাক্ষী যে, এ যাবতকাল সংঘটিত প্রতিটি বিপ্লব সক্রিয় সংখ্যালঘুদের হাতেই সংঘটিত হয়েছে।

যেহেতু যে কোন সংস্কার ও গঠনমূলক আহবান সমাজের সক্রিয় অংশের মধ্য থেকে কেবল সৎ স্বভাব সম্পন্ন লোকদেরকেই আকৃষ্ট করে থাকে, তাদের মধ্যে একটা ইতিবাচক আবেগ ও প্রেরণার সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের নৈতিক বল বাড়িয়ে দেয়, তাই প্রতিপক্ষ প্রচুর শক্তি, প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষেত্র বিশেষ সংখ্যাধিক্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে থাকে। এর একটা উল্লেখযোগ্য ও অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে বদর যুদ্ধ। সুতরাং যখন রসূল সা. এর চার পাশে আরবীয় সমাজের সক্রিয় অংশের মধ্য থেকে সৎ স্বভাব সম্পন্ন লোকেরা এত অধিক সংখ্যায় সমবেত হয়ে গেল যে, তারা নৈতিক শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে জাহেলী নেতৃত্ব ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম, তখন তিনি নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্য অভিমুখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হলেন না।

মক্কা বিজয়ের তাৎপর্য এটাই যে, এর মাধ্যমে জাহেলী নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে উৎখাত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে থেকে সকল বাধা অপসারিত হওয়ায় তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্তও এমন নেই যে, সত্যভ্রষ্ট নেতৃত্বের অধীনে কোন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ছাড়াই নিছক ওয়ায-নসিহত, তাবলীগ ও ব্যক্তিগত সংশোধনমূলক কাজ দ্বারা কোন বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যেতে পেরেছে। নচেত বিগত তেরো শতাব্দীতে খেলাফাতে রাশেদার পর ওয়ায-নসিহত, তাবলীগ প্রচার এবং তা'লীম ও আত্মশুদ্ধির নামে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ সমূহের আওতায় প্রচুর চেষ্টাসাধনা চলেছে এবং আজও আলেম, সুফী, পীর মাশায়েখ, মাদ্রাসা শিক্ষক ও লেখকগণ মুখ ও লেখনি মাধ্যমে এত ব্যাপক ও বিপুল

পরিমাণ প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন, যা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু তা সত্বেও ইপ্সিত সংখ্যক লোকের আত্মশুদ্ধিও হতে পারলোনা। সমাজ সংস্কারের কাজও এতটা এগুলোনা যে, এর কল্যাণে সমাজ ব্যবস্থাটা পাল্টে যাবে এবং রসূল মুহাম্মাদ সা. এর বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি হবে। পরিস্কার বুঝা যায় যে, এ যাবতকার চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি ও বিপ্লবী মতাদর্শে বড় রকমের কোন খুঁত ছিল। আর সেই খুঁত এই যে, নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু লোককে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাওয়াত দেয়া ও সংশোধন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাটা তো আসল লক্ষ্য ছিলনা, বরং আকস্মিকভাবে আল্লাহর পুরস্কার হিসাবে এসে গিয়েছিল। কিন্তু তারা যখন এ কথাটা বলে, তখন রসূল সা. এর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ও প্রাণান্তকর সংগ্রামের শুধু অবমূল্যায়নই করেনা, বরং কালিমা লেপন করে। একটু ভাবুন তো, এই মহান ব্যক্তিত্ব কত কষ্ট করে মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে একটা সাংবিধানিক চুক্তির আওতাভুক্ত করে ফেরলেন, কত কাঠখড় পুড়িয়ে মদীনার পার্শবর্তী গোত্রসমূহের সাথে মিত্রতা ও সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন, কত দক্ষতার সাথে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমানদেরকে নিয়ে একটা দুর্ভেদ্য সামরিক বাহিনী গড়ে তুললেন এবং নিয়মিত সামরিক টহলের ব্যবস্থা করলেন। কত চেষ্টা সাধনা দ্বারা কোরায়েশদের বাণিজ্যিক পথ অবরোধ করলেন। কত দৃঢ়তার সাথে কোরায়েশদের আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করলেন। কেমন চাতুর্যের সাথে ইহুদী ও মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করলেন। কত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলেন। কী দুরন্ত সাহসিকতা নিয়ে ইহুদীদের যোগসাজশের সব ক'টি ঘাটি একে একে সমূলে উৎপাটিত করলেন, এবং কেমন সজাগ মস্তিষ্ক নিয়ে তিনি অসংখ্য দুর্ধর্ষ গোত্রের আঞ্চলিক বিদ্রোহের অবসান ঘটালেন। এহ সব পদক্ষেপে তাঁর রাষ্টনায়ক সুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতা এবং সুণিপুন কর্মকুশলতার যে বিস্ময়কর নজীর বিদ্যমান, তা কেমন করে এ সব লোকের দৃষ্টি এড়ায়, বুঝে আসে না। এই সব কিছুকে আল্লাহর পুরস্কার বলা সম্পূর্ণ সত্য কথা। কেননা প্রত্যেক ভালো জিনিসই আল্লাহর পুরস্কার হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ কোন পুরস্কার তখনই পায় যখন সে তার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা সাধনা যথাসাধ্য বুদ্ধিমতা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে করে দেখায়। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে আল্লাহর পুরস্কার বলার মাধ্যমে কেউ যদি রসূল সা. এর সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম, দক্ষতা, কুশলতা, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে অস্বীকার করতে চায়, তবে সে মস্ত বড় অবিচার করে।

দুর্ভাগ্যবশত, রসূল সা. এর অবদানের রাজনৈতিক দিকটা এত অস্পষ্ট রয়ে গেছে যে, আজ তাঁর দাওয়াত ও লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা কঠিন হয়ে গেছে। অথচ এই দিকটা সমগ্র নবী জীবনী অধ্যয়নের সময় সামনে না থাকলে ধর্মের প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণা ও দ্বীনের সর্বব্যাপী ধারণার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, সেটা বুঝা সম্ভব নয়। রসূল সা. একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান বা দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন, সেই সত্য ও নির্ভুল দ্বীনের ভিত্তিতে সমগ্র জীবনের কার্যবিধি ও আচরণবিধি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এবং আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়িত ও কার্যকরী করতে এসেছিলেন। কাজেই আমাদের

৩—

এটা উপলব্ধি করা চাই যে, রসূল সা. পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার ও পুণর্গঠনের আন্দোলন চালাতে এসেছিলেন। আর এই আন্দোলন চালানোর জন্য তাঁর মধ্যে ছিল সর্বোত্তম রাষ্ট্রনায়কসুলভ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, মনীষা ও অন্তর্দৃষ্টি, এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা ও বুদ্ধিমত্তা। অন্য কোন দিক দিয়ে যেমন রসূল সা.-এর সমকক্ষ কেউ নেই, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই যেমন অনুকরণীয় আদর্শ, তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামও চেষ্টা সাধনায়ও একমাত্র তাঁর জীবনই আদর্শ।

রসূল সা. এর কীর্তি ও অবদান এই যে, তিনি সততার দাওয়াত দিয়েছেন, সত্য ও ন্যায়ের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং একটা পূর্ণাংগ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ধর্মের সীমিত ও সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে এত বড় ও বিশাল কাজের স্থান সংকুলান হতে পারেনা। সুতরাং এটা ছিল দ্বীন তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, নিছক 'ধর্ম' নয়। এটা ছিল এক সর্বাত্মক আন্দোলন- নিছক কোন আধ্যাত্মিক যোগ সাধনা নয়।

জীবনের অবিভাজ্য পূর্ণাঙ্গতা

মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ সা. এর মহান আন্দোলন এক অনন্য বিপ্লব সংঘটিত করার মাধ্যমে যে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্টব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, তার বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তার মূল কলেমার চেতনা ও প্রেরণা জীবনের প্রতিটি বিভাগে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোটা সমাজ ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ একাত্মতা ও সমন্বয় বিরাজ করতো। সকল প্রতিষ্ঠান ছিল একই রংগে রঞ্জিত ও একই ভাবধারায় উজ্জীবিত। মসজিদের চার দেয়ালের মাঝে যে আল্লাহর এবাদত করা হতো, সেই আল্লাহরই আনুগত্য করা হতো বাজারে ও ক্ষেত খামারে। যে কোরআন নামাযে পড়া হতো, সেই কোরআনেরই আইন অনুসারে মোকদ্দমার ফায়সালা হতো আদালতে। যে নৈতিক নীতিমালা সীমিত পাবিবারিক পরিবেশে কার্যকর ছিল। আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডেও অনুসৃত হতো সেই একই নীতিমালা। যে সত্য ঘোষিত হতো মসজিদের মিম্বর থেকে, সেই একই সত্য অনুসারে চলতো সরকারী প্রশাসন। যে আকীদা বিশ্বাস প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল করানো হতো, সেই আকীদা বিশ্বাসই কার্যকর থাকতো সামগ্রিক অবকাঠামোতে। যে চিন্তাধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় সক্রিয় থাকতো, সে অনুসারেই রূপায়িত হতো সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। আল্লাহর সন্তুষ্টি যেমন নামায রোযায় কাম্য থাকতো, তেমিন রণাঙ্গনে অসি চালনা ও তীরবিদ্ধ হওয়ার সময়ে সক্রিয় থাকতো সেই একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এ ছিল এমন এক সমন্বিত বিধান, যার আওতায় সমগ্র মানবজীবন একই খোদায়ী নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হতো। জীবনের এক এক বিভাগে এক এক রকম মূল্যবোধ ও নির্দেশ চলতোনা। এ বিধানে কোন স্ববিরোধিতা ছিলনা। এর একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক ছিলনা। এর বিভিন্ন অংশে কোন জটিলতা, অস্পষ্টতা জোড়াতালি বা জগাখিচুড়ি ছিলনা। এ জন্যই এর আওতায় মানবজাতি যেরূপ দ্রুত গতিতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল, ইতিহাসে তা নজীরবিহীন।

বিপ্লবের প্রাণশক্তি

মানবতার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য সম্ভবত এটাই যে, ইতিহাসে যখনই কোনো ব্যক্তি ক্ষমতার মসনদে আসীন হবার সুযোগ পেয়েছে,- তা সে তরবারীর বলে, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে, কিংবা কোন আকস্মিক ঘটনাচক্রে, যেভাবেই হোক না কেন সে নিজেকে এরূপ ভাবতে শুরু করেছে যে, সে মানুষের শুধু শাসক নয়, বরং মানুষের শিক্ষক ও সমাজের সংস্কারকও বটে। এ ধরনের স্বকল্পিত শিক্ষক ও সংস্কারকের হাতে যখন শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তখন সে সর্বেসর্বা ও সর্বময় ভাগ্য বিধাতা হয়ে জেঁকে বসে। নিজেকে সে পৃথিবীর সেরা চিন্তাবিদ ভাবে। সে জ্ঞানের প্রতিটি উৎসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং সমাজের সর্বোত্তম সচেতন ও প্রজ্ঞাবান লোকদের দূরে সরিয়ে রেখে নির্বিচারে এমন সব বিস্ময়কর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে যে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ এক একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তারা সহিংস পদ্ধতিতে মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং ডান্ডা মেরে সব কিছুকে ঠান্ডা করতে চায়। বিপ্লব ও সংস্কারের এই সব স্বঘোষিত দাবীদার অনেক সময় মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির খোঁজ খবরই রাখেনা। জীবনের ভাঙ্গাগড়া কী কী কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার প্রাথমিক জ্ঞানও তাদের থাকেনা। তারা কখনো জানতেই চেষ্টা করেনা যে, মানুষকে মনুষ্যত্ব শেখানোর সঠিক পন্থা কী, বিকার ও বিভ্রান্তির উৎসটা কোথায়? তার সংশোধন ও প্রতিকারের কাজটা কোথা থেকে শুরু এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়? তারা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শুরু করে। তারা পরামর্শ ও সমালোচনার দুয়ার বন্ধ করে দেয়, যাতে তাদের কোন হিতাকাংখী ও কোন মানব প্রেমিক তাদের ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে বাধা দিতে না পারে। তারা সকল রোগের একটাই ধন্বন্তরি ওষুধ চিনে। সেটা হচ্ছে বলপ্রয়োগ ও সহিংসতা। অর্থাৎ কড়া কড়া আইন প্রণয়ন ও নিত্য নতুন কঠোর বিধি জারী করা। মানুষের চারপাশে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়া এবং বারবার কঠোর শাস্তি দিয়ে তাদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়া।

মানবতার মুক্তিদূত বিশ্বনবী সা. যে বিপ্লব সংঘটিত করেন, তার প্রাণশক্তি হিংস্রতা ও বলপ্রয়োগ ছিলনা, বরং হিতকামনা ও ভালোবাসাই ছিল তার চালিকা শক্তি। তিনি মানুষের প্রতি যারপর নাই দয়ার্দ্র ছিলেন। আদম সন্তানদের প্রতি তাঁর ছিল সত্যিকার দরদ ও ভালোবাসা। নিজের দাওয়াতকে তিনি এরূপ উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তোমরা পতংগের মত আগুনের গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, আর আমি তোমাদেরকে ধরে ধরে তা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ জন্যই কোরআন তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ বলে অভিহিত করেছে। একটু ভেবে দেখুন, তিনি অত বড় বিপ্লব সংঘটিত করলেন, অথচ তাতে বলপ্রয়োগ ও সহিংসতার একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়না। রসূল সা. যে দশ বছর মদীনায় কাটান, তার পুরো সময়টাই ছিল সাংঘাতিক রকমের জরুরী অবস্থার আওতাধীন। প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের ভয় লেগেই থাকতো। কোরায়েশরা তিন তিনবার বড় ধরনের আক্রমণ চালিয়েছে। এখানে সেখানে ছোটখাট যুদ্ধ ও সীমান্ত সংঘর্ষ তো নিত্যকার ব্যাপারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মদীনার বাইরে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্র মদীনার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য নানা সময় নানা দিক থেকে মাথাচাড়া দিয়ে

উঠতো। টহল দেয়া বা উপদ্রব নির্মূল করার জন্য মদীনা থেকে ছোট ছোট সেনাদল পাঠানো হতো। রাতের বেলা সামরিক প্রহরা বসানো হতো। এক কথায় বলা যায়, সামরিক শিবিরের মত জীবন যাপন করা হতো। তদুপরি ইহুদী ও মোনাফেকদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র জনজীবনকে করে তুলতো দুর্বিষহ। কখনো যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র, কখনো মুসলিম সমাজকে খন্ড বিখণ্ড করা ও মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বাধানোর ষড়যন্ত্র, কখনো রসূল সা. এর নেতৃত্বকে ব্যর্থ ও বিফল করার ষড়যন্ত্র, এমনকি কখনো কখনো স্বয়ং রসূল সা. কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও পাকানো হতো। এর চেয়ে মারাত্মক জরুরী অবস্থা আর কী হতে পারে। কিন্তু রসূল সা. কখনো একনায়কসুলভ ভূমিকাও পালন করেননি। কোন জরুরী অবস্থা সুলভ আইনও জারী করেননি। কোন স্বেচ্ছাচারমূলক বিধিও চালু করেননি। কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনের অধীনে কারাগারেও পাঠাননি। জরুরী অবস্থাকালীন সংক্ষিপ্ত আদালতও বসাননি। চাবুক মেরে মেরে মানুষের চামড়াও তোলেননি। কারো ওপর জরিমানাও আরোপ করেননি। কোন নাগরিকের ওপর আল্লাহর আইনের অতিরিক্ত বোঝাও চাপাননি। সমালোচনা ও ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকারও হরণ করেননি। এবং কারো ওপর কোন বিধিনিষেধও আরোপ করেননি। এমনকি আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর মত ভয়ংকর কুচক্রী গৃহশত্রুর বিরুদ্ধেও তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। নিজের দাওয়াতের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং নিজের চরিত্রের পবিত্রতার ওপরই তিনি পুরোপুরি নির্ভর করতেন। না কাউকে ভয়ভীতি দেখিয়েছেন, না কারো মনুষ্যত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন, আর না অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন। বরঞ্চ এমন লোকদের ঔদ্ধত্য ও অহংকারকেও ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেছেন, যারা বাহ্যত আষ্ফালন করলেও আসলে ছিল দুর্বল ও অসহায়। একারণেই শত্রুদের মনও তিনি অনায়াসে জয় করে ফেলতেন, সাথীরা যে কোন নতুন ও পুরানো আইনকে স্বাগত জানাতে সদা প্রস্তুত থাকতেন এবং বিরোধীরা তাঁর সামনে নিজেদেরকে অত্যন্ত নীচ ও হীন মনে করতো। তারপর যখন তারা তাঁর নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার সামনে মাথা নত করে ইসলাম গ্রহণ করতো তখন তাদের মধ্যে সূচিত হতো সর্বাত্মক ও আমূল পরিবর্তন।

রসূল সা.-এর অন্তরে যে খোদাপ্রেম সক্রিয় ছিল, তারই আরেক রূপ ছিল প্রগাঢ় মানব প্রেম। তাঁর এই মানব প্রেমের সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে একয়টি ঘটনা দ্বারাই তা লাভ করা যায়। তাহলো, মক্কাবাসী তাঁকে মদীনায় গিয়েও শান্তিতে বাস করতে দেয়নি তারা যখন দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো, তখন তাদেরকে তিনি খাদ্য শস্য পাঠিয়ে সাহায্য করলেন এবং পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা নগদ পাঠালেন। বদরের যুদ্ধবন্দীদের 'উহ' 'আহ' শব্দ কানে যাওয়া মাত্র তার ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া এবং তৎক্ষণাত তাদের বাধন ঢিল করে দেয়ার ঘটনা থেকেও তাঁর মানবদরদী স্বভাব আঁচ করা যায়। বনু হাওয়াযেন গোত্রের ছয় হাজার যুদ্ধবন্দীকে যে একটি মাত্র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রসূল সা.-এর নির্দেশে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল, সেটিও ছিল তাঁর মহানুভবতার জ্বলন্ত উদাহরণ। এরপর রসূল সা.-এর মানব দরদী মনের আরো কোন পরিচয় যদি পেতে হয়, তবে মক্কা বিজয়ের সময় তার অভাবনীয় আত্ম প্রকাশ লক্ষ্য করুন। মানবতার এই মুক্তিদূত একজন পরিপূর্ণ বিজেতা হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যারা বিশ বছর ধরে লড়েছে তারা তাঁর

সামনে একেবারেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। অন্য কেউ হলে প্রতিটি আক্রমণের প্রতিশোধ নিত। ব্যাপক গণহত্যার নির্দেশ দিত এবং রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে তবে ছাড়তো। লাশের স্তুপ না ফেলে কিছুতেই যেতনা। আরব সমাজের সর্বজন স্বীকৃত রীতিপ্রথার কথাই বলুন, নৈতিকতার কথাই বলুন অথবা আইন কানুনের কথাই বলুন, সব কিছুর বিচারেই মক্কাবাসী ছিল ঘোরতর অপরাধী। ধর্ম ও রাজনীতি উভয় দিক দিয়েই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল প্রাণদন্ড। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে রসূল সা.-এর হৃদয় মানবপ্রেমে বিগলিত হয়ে গেল এবং কোরেশদের অত্যাচার নির্যাতনের গোটা ইতিহাসকে ক্ষমার আওতাভুক্ত করে ঘোষণা করলেনঃ

"তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আর কোন অভিযোগ নেই। তোমরা যেতে পার। তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।"

উপরন্তু তিনি তাদের মন জয় করতে তাদেরকে ধন সম্পদ দান করলেন এবং তাদেরকে অপমান ও প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলেন ও বুকে টেনে নিলেন। রসূল সা. এর কাছে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল যে, যে বিপ্লব প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করে, তা আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়। আর যে বিপ্লব ক্ষমা ও মহানুভবতা প্রয়োগ করে, তা শত্রুকেও বশীভূত করে এবং প্রতিরোধকারীদেরকে সেবকে পরিণত করে।

শুধুমাত্র কুরাইশদের বাড়াবাড়ির কারণেই রসূল সা. এতটুকু কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন, যাতে তাদের রক্তপিপাসু তরবারীর ধার ভোতা হয়ে যায়। তারা তাঁর কাঁধের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মহানবী এমন সমরনীতি ও এমন প্রতিরক্ষা কৌশল উদ্ভাবন করেন, যাতে ন্যূনতম প্রাণহানি ও ন্যূনতম রক্তপাত হয় এবং রণাঙ্গনেও মনুষ্যত্বের মর্যাদা সমুন্নত থাকে।

মানব প্রেমের এমন উজ্জ্বল ও ব্যাপক দৃষ্টান্ত অন্য কোন বিপ্লবে পাওয়া যায়না। রসূল সা. এর বিপ্লব ছিল একটা নির্ভেজাল শিক্ষামূলক বিপ্লব এবং তার ভিত্তি ছিল মানবতার কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নতুন মানুষ

অসংখ্য সংস্কারমূলক, গঠনমূলক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের নজীর আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু এর কোন একটি আন্দোলনই মানুষকে বদলায়নি। প্রতিটি আন্দোলন যেমন আছে তেমন রেখে শুধু বাইরের পরিবেশটা বদলাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এমন প্রতিটি পরিবর্তন মানব জীবনের আসল সমস্যাবলী সমাধানে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে, যা মানুষকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করতে পারেনি। বিশ্বনবীর সা. কৃতিত্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো, মানুষ ভেতর থেকে বদলে গিয়েছিল। শুধু বদলে যায়নি বরং তার জীবনে সংঘটিত হয়েছিল আমূল পরিবর্তন। মানুষের আকৃতিতে যে প্রবৃত্তি পুজারী পশুরা ঘুরে বেড়াতো, একটি মাত্র সত্য কলেমার প্রভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সাথে সাথে তাদের ধ্বংস স্তুপ থেকে আবির্ভূত হলো এক আল্লাহভক্ত সৎ মানুষ। এই নতুন মানুষের

চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য দেখলে চোখ ঝলসে যায়। হযরত ওমর যিনি ছিলেন মক্কার এক উচ্ছৃংখল মদখোর যুবক– তাঁর জীবনে যখন পরিবর্তন এলো, তখন কেমন পরিবর্তন এলো তা ভেবে দেখুন তো। ফুযালার মধ্যে যখন পরিবর্তন এলো, তখন সেটাই বা কেমন অভাবনীয় পরিবর্তন ছিল ভাবুন তো! যুল বিজাদাইনকে দেখুন কিভাবে নিজের বিলাসী জীবনের মুখে পদাঘাত করে দরবেশের জীবন যাপন করতে শুরু করলেন। হযরত আবু যরকে দেখুন, কী বিপ্লবী উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে কা'বার সামনে দাঁড়িয়ে জাহেলিয়াতকে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং গণপিটুনি খেলেন। কা'ব ইবনে মালেক ও আবু খাসীমার অবস্থা দেখুন। লুবায়না ও সুমাইয়ার ন্যায় ক্রীতদাসীদের বৈপ্লবিক বীরত্ব ও মনোবল দেখুন। মাগের বিন মালেক আসলামী ও গামেদী গোত্রের মহিলাটির দিকে লক্ষ্য করুন। নাজ্জাশীর দরবারে জাফর তাইয়ারের বীরত্ব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। ইরানী সেনাপতির দরবারে রবী' বিন আমেরের বেপরোয়া আলাপচারীতা থেকে প্রেরণা অর্জন করুন। নক্ষত্ররাজির এই সমারোহের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে ঈমানী জ্যোতিতে ঝিকমিক করছেনা ?

এহেন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়েই সেই সমাজটা গড়ে উঠেছিল এবং এহেন নেতা ও কর্মীদের নিয়েই সেই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, যার প্রতিটি নির্দেশ জারী হওয়া মাত্রই বাস্তবায়িত হতো। এদিকে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে, ওদিকে তৎক্ষণাত ঠোঁটে লাগানো পানপাত্র পর্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং উৎকৃষ্টমানের মদের মটকা ভেংগে রাজপথ ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এদিকে নারীদের মাথা ও বুক ঢাকার নির্দেশ জারী হয়েছে, ওদিকে তৎক্ষণাত ওড়না বানিয়ে ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে জেহাদের ডাক এসেছে ওদিকে সংগে সংগেই অল্প বয়স্ক কিশোর পর্যন্ত পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের জেহাদে যাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু করেছে। একদিকে জেহাদের জন্য সাহায্য চাওয়া হয়েছে, অপর দিকে হযরত ওসমানের ন্যায় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পণ্য বোঝাই গোটা উটের বহর এনে হাজির করেছেন, হযরত আবু বকরের ন্যায় ত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহের যাবতীয় সহায় সম্বল আন্দোলনের নেতার সামনে স্তুপ করে রেখে দিয়েছেন এবং এমনকি এক একজন দিনমজুর পর্যন্ত সারা দিনের শ্রমের মজুরী বাবদ প্রাপ্ত খেজুরগুলিও এনে ঢেলে দিয়েছে। এদিকে মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্য আনসারদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে, ওদিকে তার সাথে সাথেই আনসারগণ নিজেদের ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার ও বাগবাগিচা আধা আধি বন্টন করে ভ্রাতৃত্বের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যখন দায়িত্বশীল পদগুলোতে চাকুরির মনোভাবের উর্দ্ধে ওঠে কাজ করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আহ্বান করা হয়েছে, তখন দৈনিক এক দিরহাম ভাতার বিনিময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তার দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সেনাপতির কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তা এমন নিখুঁতভাবে পালন করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সৈনিক একটা সুঁচ পর্যন্ত নিজ নিজ সেনাপতির কাছে জমা দিয়েছে। ইতিহাসে এ ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যে, মাদায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটা মূল্যবান রত্ন আমের নামক একজন সিপাহীর হস্তগত হলে তিনি তার কথা ঘূর্ণাক্ষরেও কাউকে জানতে না দিয়ে

রাতের আঁধারেই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে গোপনে নিজ সেনাপতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই সব লোকই সেই পুত পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে অপরাধ ছিল অত্যন্ত বিরল ঘটনা। রসূল সা. এর মক্কী জীবনের পুরো এক দশকে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র অভিযোগ আদালতে এসেছিল। এটি ছিল এমন এক নির্মল নিষ্কলুষ সমাজ, যেখানে কোন গোয়েন্দা পুলিশ নিয়োগ করা হয়নি, বরং মানুষের বিবেকই তাদের প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিয়োজিত ছিল। এই ছিল মুহাম্মদ সা. এর বিপ্লব। এ বিপ্লব শুধু বাইরের পরিবেশই বদলে দেয়নি, বরং ভেতর থেকে মনমগজকেও পাল্টে দিয়েছে এবং নতুন চরিত্র গড়ে তুলেছে। তাই এ বিপ্লব ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সমস্ত মৌলিক ও প্রকৃত সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সমকালীন সভ্যতার সংকট থেকে মুক্তির পথ সৃষ্টি হয়।

বিশ্বনবীর অসাধারণ আত্মত্যাগ

এ বিপ্লব আরো এক দিক দিয়ে নজীর বিহীন। সেটি হলো, যিনি এ বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন, তিনি যদিও অবর্ণনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে এর পূর্ণতা সাধন করেছিলেন, কিন্তু তিনি এর জন্য কোনই পুরস্কার ও প্রতিদান গ্রহণ করেননি। মানবতার কল্যাণের জন্য নিজের সমস্ত সহায় সম্বল অকাতরে বিলিয়ে দিলেন, অথচ তার বিনিময়ে যতটুকু প্রতিদান গ্রহণ করা যুক্তি, আইন, নৈতিকতা ও সমাজরীতি– কোন দিক দিয়েই অন্যায় বা অবৈধ হতোনা, ততটুকুও গ্রহণ করলেননা। এত বড় কীর্তি ও অবদান রাখার পর সামান্য কিছু বিনিময় গ্রহণ করলে স্বার্থপরতার বিন্দুমাত্র কলংকও তাকে স্পর্শ করতোনা। তবুও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। এমন ত্যাগের তুলনা কোথাও আছে কি?

প্রথমে অর্থনৈতিক দিকটি বিবেচনা করা যাক। রসূল সা. নিজের লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্যকে কুরবানী করলেন, তা থেকে উপার্জিত সমস্ত পুঁজি এই মহৎ কাজের জন্য উৎসর্গ করলে। আর যখন সাফল্যের যুগ এল, তখন অঢেল ধন সম্পদ স্বহস্তে বিলিবন্টন করলেন এবং নিজের জন্য ক্ষুধা, দারিদ্র ও অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিলেন। নিজের পরিবার পরিজনের জন্য একটুও সঞ্চয় রেখে গেলেন না, এক টুকরো জমিও রেখে গেলেন না, তাদের কোন অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন না, তাদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে কোন স্থায়ী ক্ষমতার গদিও রেখে গেলেন না, এবং চাকর, নকর, পাইক পেয়াদা, রংবেরং এর বাহন জন্তু ও বিলাসী সামগ্রী দিয়ে বাড়ী ভরে তুললেন না।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, তিনি নিজের জন্য কোন অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি, কারো বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্দেশ ও নির্ধারিত সীমা লংঘন করে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি, এবং নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে উঁচু করে তুলে ধরার জন্য কোন স্বৈরাচারী আইন জারী করেননি। মদীনায় সব সময় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করতো। ইহুদী ও মোনাফেকদের নিত্য নতুন চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হতো। তবুও কাউকে তিনি গ্রেফতার করেননি। কারো চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী কোন আদেশ জারী করেননি। কোন সংক্ষিপ্ত আদালত বসাননি। আর বেত্রাঘাত করেও কারো চামড়া খসাননি। বরঞ্চ মানুষকে সমালোচনা করা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন, ভিন্ন মত অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাঁর মহৎ

পরামর্শকে গ্রহণ না করার অধিকারও দিয়েছেন। এ সব অধিকার কেবল কাগুজে অধিকার ছিলনা। লোকেরা এ সব অধিকারকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। অনেক সময় রসূল সা. নিজের মূল্যবান মত পরিত্যাগ করে ভিন্ন মতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কাউকে কোন স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা দিতে চাইলে নিজের সহযোগীদের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, নিজের জামাই আবুল আস যুদ্ধবন্দী হয়ে এলে তার মুক্তিপণ হিসাবে হযরত যয়নব যে হার পাঠান, তা ছিল হযরত খাদীজার স্মৃতি। ঐ হার ফেরত দেওয়ার জন্য রসূল সা. সাহাবায়ে কেরামের অনুমতি চান। অনুরূপভাবে আবুল আসের জিনিসপত্র গণীমত (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) হিসাবে হাজির করা হলে তাও তিনি সাহাবাদের অনুমতি নিয়ে ফেরত পাঠান। জা'রানা নামক স্থানে হোনায়েনের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করার আবেদন জানাতে একটা প্রতিনিধি দল এল এবং রসূল সা. এর দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন জানালো। ততক্ষণে যুদ্ধবন্দীদের ভাগবাটোয়ারা সম্পন্ন হয়ে গেছে। রসূল সা. নিজ গোত্র বনু হাশেমের অংশের বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু অবশিষ্টদের সম্পর্কে বললেন যে, সাহাবাদের প্রকাশ্য সমাবেশে তোমরা আবেদন জানাও। সাহাবাগণ যখন জানতে পারলেন যে, রসূল সা. নিজ গোত্রের অংশের বন্দীদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সবাই বন্দীদেরকে ছেড়ে দিল। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কখনো চাপ প্রয়োগ বা জবরদস্তিমূলকভাবে কাজ সম্পন্ন করতেন না।

সামাজিক ও বৈঠকি দিক দিয়ে দেখা যায়, তিনি নিজের জন্য সমানাধিকারই পসন্দ করতেন। কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা পসন্দ করতেন না। পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদে ও বাসস্থানে নিজের জন্য কোন অসাধারণ বা অভিজাত সুলভ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেননি। মজলিসে নিজের জন্য তিনি কোন স্বতন্ত্র বসার জায়গাও মনোনীত করেননি। লোকেরা তার সামনে ভক্তিভরে উঠে দাঁড়াক, কিংবা প্রভু, বা স্যার ইত্যাদি বলে সম্বোধন করুক, তাও তাঁর মনোপুত ছিলনা। যুদ্ধ কালে ও প্রবাসে ট্রেঞ্চ খনন ও মসজিদ নির্মাণের জন্য সংগীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাটি কাটা, মাটি তোলা, পাথর ভাঙ্গা, এবং কাঠ চেরাইয়ের কাজ তিনি স্বহস্তেই করতেন। পাওনা পরিশোধের জন্য তার ওপর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে ঋণদাতা যাতে কুণ্ঠিত না হয়, সে জন্য তাকে তিনি অনুমতি দিতেন। এমনকি প্রকাশ্য জনসমাবেশে নিজেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আমি কারো ওপর কোন যুলুম করে থাকলে সে যেন এসে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

আমাদের অবস্থান কোথায়?

এই ছিল রসূল সা. সূচিত মহান বিপ্লব। আমাদেরকে এই বিপ্লবেরই প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। এটি ছিল সেই মহান বাণী, যার জন্য আমাদেরকে 'মানবজাতি'র কাছে 'সাক্ষী' এবং 'মধ্যমপন্থী উম্মাহ' বানানো হয়েছে। এ পদটা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোচ্চ পদ। এই ছিল সেই সত্য কলেমা, যার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। ন্যস্ত করার উদ্দেশ্য, রসূল সা. এর প্রতিনিধি হিসাবে আমরা যেন কেয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তিদূত হই। যখনই মানবজীবন সমস্যা ও সংকটে পতিত হবে এবং মানব সভ্যতা ঘোরতর অরাজকতার কবলে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন যেন আমরা তার সহায়ক

হই। কিন্তু কার্যত আমরা তা হতে পারিনি। এই সত্য কলেমার মশাল প্রজ্জ্বলিত রাখতে আমরা উদাসীনতা দেখিয়েছি এবং আমরা নিজেদের হাতেই এই সত্য বিধানের সর্বনাশ সাধন করেছি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, এ যুগের চিন্তাশীল মহল যখন বিপথগামী হতে আরম্ভ করলো, তখন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করার যোগ্য থাকলামনা। আর আজ আমাদেরই অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে গোটা মানবজীবন সংকট ও অরাজকতার শিকার। পরস্পর বিরোধী বস্তুবাদী মতবাদ সমূহের সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সংঘাত বিশ্ববাসীর মানসিক শান্তি বিনষ্ট করে চলেছে। বিশ্ব নেতৃত্ব আল্লাহ বিমুখ শক্তির হাতে নিবদ্ধ এবং আমরা এখন এই সব শক্তিরই মুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছি। প্রতিকূল অবস্থার সাথে প্রতিনিয়ত ঠোকর খেয়েও আমরা সম্বিত ফিরে পাইনি। ক্রমাগত অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েও আমাদের মধ্যে অনুতাপ ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়নি। মুসলিম বিশ্বের কলহ কোন্দল ও বিবাদ বিসম্বাদ এবং মানবতার শোচনীয় দুর্যোগ দুর্বিপাক দেখেও আমরা এই আসল করণীয় কাজটির প্রতি মনোযোগী হতে পারিনি।

আসুন বিচার বিবেচনা করে দেখি, মানব জাতি এখন ইতিহাসের কোন্ স্তর অতিক্রম করছে এবং আমাদের অবস্থানটা কোথায়?

আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনকালে নিজেকে, নিজের সন্নিহিত পরিবেশের মানুষকে এবং গোটা দুনিয়ার মানুষকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এক ধরনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, সংকট ও ভীতি জনিত পরিস্থিতির শিকার দেখতে পেয়েছি। গৃহ থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ পর্যন্ত সর্বত্র অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ, উত্তেজনা, অবনিবনা, দ্বন্দ্ব কলহ, ও সংঘাতের পরিবেশ বিরাজ করতে দেখেছি। এই গোটা সময়টা জুড়ে আমার মনে হয়েছে যেন ইতিহাস জ্বলন্ত চুলোর ওপরের ফুটন্ত হাড়ির ন্যায় ক্রমাগত উদ্বেলিত হচ্ছে। এই হাড়িতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ন্যায় আমিও যেন একটা ক্ষুদ্র চাল বা ডালের ন্যায় ওলট পালট হচ্ছি। আমাদের এই পৃথিবী পর পর দুটো বিশ্ব যুদ্ধে পিষ্ট হয়ে এবং অসংখ্য আঞ্চলিক যুদ্ধে দলিত মথিত হয়ে এখানো সামলে উঠতে পারেনি। অথচ আরো একটা প্রলয়ংকরী যুদ্ধের তরবারী তার মাথার ওপর ঝুলছে। এই ক্ষুদ্র সময়ে কত যে ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা চোখে পড়লো, কত যে অভ্যুত্থানের প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যেতে দেখলাম, কত যে সাম্রাজ্যের পতন ও আবির্ভাব ঘটতে দেখলাম, কত যে মতবাদের সংঘাত, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে দেখলাম, কত দেশ ও অঞ্চলকে খন্ড বিখন্ড হতে এবং লক্ষ কোটি জনতাকে বাস্তুচ্যুত হতে দেখলাম, তার ইয়ত্তা নেই। খোদ এই উপমহাদেশে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে মাথার ওপর দিয়ে রক্তের সয়লাব বয়ে যেতে দেখেছি, আর এই সয়লাবে মানুষের জানমাল সম্ভ্রম এবং মূল্যবান ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ভেসে যেতে দেখেছি।

বিশ্বব্যাপী চলমান জড়বাদী সভ্যতার জমকালো পর্দার আড়ালে উঁকি দিয়ে দেখলে মানবতার এমন শোচনীয় দৃশ্য চোখে পড়ে যে, মানুষ মাত্রেরই আত্মা কেঁপে ওঠে। সমগ্র মানব জাতি গুটিকয় কামনা বাসনার অক্টোপাস বন্ধনে আবদ্ধ। সর্বত্র সম্পদ ও গদির জন্য যুদ্ধ চলছে। মনুষ্যত্বের নৈতিক চেতনার দীপ শিখা নিভে গেছে। নগর সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে অপরাধ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। মনস্তাত্বিক অস্থিরতা প্রবল হয়ে

উঠেছে এবং মানসিক শান্তি একেবারেই উধাও হয়ে গেছে। মানুষের মনমগজে ও চরিত্রে এমন মৌলিক বিকৃতি জন্ম নিয়েছে যে, জীবনের কোন দিক এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। দর্শন থেকে সত্যের প্রাণশক্তি বেরিয়ে গেছে। আকীদা বিশ্বাস ও মতাদর্শগুলো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোর বিলুপ্তি ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় আইন কানুনে ন্যায় বিচারের অস্তিত্ব নেই। রাজনীতিতে সেবামূলক মানসিকতার পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ঢুকে পড়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শোষক ও শোষিত নামে দুটি শ্রেণী জন্ম নিয়েছে। ললিত কলায় সৌন্দর্যের যে সব বিচিত্র প্রকাশভংগি রয়েছে, তার সবগুলোকে যৌন সুড়সুড়ি ও অরুচিকর ভাবভংগি দিয়ে ভরে তোলা হয়েছে। সভ্যতার জগতে সর্বত্র পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘাত বিরাজ করছে এবং গোটা ইতিহাস একটা ভয়াল নাটকে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিমানদের নির্বুদ্ধিতা এখনো আমাদেরকে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে চলেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কত নতুন নতুন শাখা আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু এর লালিত অজ্ঞতা ও মূর্খতা আদম সন্তানকে অতিষ্ট করে তুলেছে। অঢেল ধন সম্পদ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। অথচ মানুষ ক্ষুধা ও বঞ্চনার আযাব ভোগ করে চলেছে। হাজারো রকমের সংগঠন, রাজনৈতিক সংস্থা, আদর্শগত ঐক্য ও চুক্তিভিত্তিক বন্ধন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নেই, আছে কেবল হিংস্র জন্তু সুলভ সম্পর্ক। বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার উন্নয়নের পক্ষে অনেক গালভরা বুলি আওড়ানো হয়। অথচ নির্যাতন ও নিপীড়নের চরম হঠকারী ও ঘৃণ্য কৌশল মানব জাতির বিরুদ্ধে আজও বাস্তবায়িত হচ্ছে। গোটা পৃথিবী আজ এক মল্লযুদ্ধের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কোথাও সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা প্রেমিকদের মধ্যে, কোথাও কম্যুনিজম ও পুঁজিবাদের মধ্যে, কোথাও গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে, কোথাও ব্যক্তি ও সামষ্টিকতার মধ্যে এবং প্রাচ্যবাদ ও পাশ্চাত্যবাদের মধ্যে ঘোরতর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে।

এহেন পৃথিবীতে আমরা জীবন যাপন করছি। কৃত্রিম উপগ্রহ ও ক্ষেপণাস্ত্রের এই যুগে বিজ্ঞান আলাদীনের আশ্চার্য প্রদীপের আজ্ঞাবহ জিনের মত মানুষের এক এক ইশারায় বস্তুগত শক্তির নতুন নতুন ভান্ডার প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে চলেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে অর্গলবদ্ধ প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চাবি দিয়ে উন্মোচিত হচ্ছে। বিস্ময়কর দ্রুতগতি সম্পন্ন যানবাহন ও যোগাযোগ যন্ত্র মানুষকে স্থান ও কালের ওপর ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিচ্ছে। আনবিক শক্তি সর্বনাশা দানবদের এক বিরাট বাহিনীকে বশীভূত করে মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখছে। তারা কেবল একটা চোখের ইশারার অপেক্ষায় রয়েছে। অপর দিকে স্বয়ং মানুষের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সে শয়তানী শক্তি ও নাশকতাবাদী শক্তি সমূহের মুঠোর মধ্যে আগের চেয়েও বেশী অসহায় অবস্থায় রয়েছে। এই শক্তিগুলো তাকে বারবার নিজেরই বিরুদ্ধে লড়াই করতে উস্কে দিয়ে আসছে। এ সব শক্তি যুগে যুগে তার বড় বড় কীর্তিগুলোকে এবং তার চমকপ্রদ সভ্যতাগুলোকে স্বয়ং তারই হাত দিয়ে ধ্বংস করিয়ে ছেড়েছে।

এমন একটা কাফেলার কথা কল্পনা করুন, যে কাফেলা একটা পাহাড়ের চূড়ার ওপর শিবির স্থাপন করেছে। জমকালো শামিয়ানার নীচে তারা পানাহারে, নাচগানে ও মদ্যপানে

বিভোর। অধিকন্তু তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক পণ্য, নগদ অর্থ, যানবাহন ও গবাদিপশুও রয়েছে। অথচ তাদের শিবিরের মেঝের মাত্র কয়েক ফুট নীচে এক ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি লাভা উদগীরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটু পরেই গোটা পাহাড় বিস্ফোরিত হবে এবং দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দেবে। আমাদের বর্তমান সভ্যতার কাফেলাটির অবস্থা অনেকটা এ রকম। ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে যে পাহাড়ের ওপর তার অবস্থান, তার অভ্যন্তরে সবচেয়ে ভয়াবহ সংকট ও দুর্যোগের লাভার উদগীরণ আসন্ন।

অদৃষ্ট আমাদেরকে এক বিরাট বিশ্ব সংকটের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এ সংকট থেকে পাশ কাটিয়ে পেছনে পালানোর সুযোগ নেই। আর এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার যোগ্যতাও বর্তমান সভ্যতার ও তার নির্মিত মানুষের নেই। নতুন কোন দর্শনেরও উদ্ভব হচ্ছেনা, যা অন্তত সাময়িক সান্ত্বনার উপায় হতে পারে। কোন দিকেই কোন পথ উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা।

অস্থিরতার এই ক্রান্তি লগ্নে আমি যখন চার দিকে দৃষ্টি দিই, তখন দেখি যেন অন্ধকারের এক অথৈ সমুদ্র সর্বদিক থেকে আমাকে ঘেরাও করে রেখেছে। এই মহা সমুদ্রে অনেক দূরে, চৌদ্দ শো' বছরের দূরত্বে, একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু জ্বল্ জ্বল্ করতে দেখতে পাই।

এটা আর কিছু নয়– মানবতার সবচেয়ে বড় বন্ধু, সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক, এবং সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর মশাল। এটা সেই প্রদীপ যার জ্যোতিকে আমরা তাঁর উম্মাত হয়েও নিজেদের উদভ্রান্ত চিন্তা ও উচ্ছৃংখল কর্মের আবর্জনার মধ্যে হারিয়ে বসে আছি।

সীরাত অধ্যয়নের দৃষ্টিভংগি

আমার মতে, রসূল সা. এর জীবনী অধ্যয়নের উদ্দেশ্য একটাই। সেটি হলো, রসূলের সা. বানীর মশাল আর একবার আমাদেরকে ও সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোকিত করুক। মানব সমাজ এ যুগের অন্ধকারের মধ্যে সেই মুক্তির পথের সন্ধান পাক, যেমন পেয়েছিল খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সংকট উত্তরণের পথ।

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এই ইপ্সিত দৃষ্টিভংগী ও প্রেরণা নিয়ে রসূল সা. এর জীবনী অধ্যয়ন করতে খুব কমই সফল হচ্ছি। রসূলের জীবনী থেকে জীবন যাপনের একটা পদ্ধতি খুঁজে নিয়ে তদনুসারে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে– এরূপ মনোভাব দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছিনা; বরং এর মাঝে অন্যান্য মনোভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

এমন মুসলমানদের সংখ্যা নেহাত কম নয় যারা শুধু সওয়াব হাসিল করার জন্যই সীরাত তথা রসূলের সা. জীবনী চর্চার আগ্রহ পোষণ করে থাকে। (অবশ্য রসূল সা. এর নৈকট্য অর্জনের প্রতিটি চেষ্টাই যে আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং তার জন্য সওয়াব পাওয়ার আশা করা উচিত, তা অস্বীকার করা যায়না। কিন্তু এ ধরনের প্রতিটি চেষ্টার উদ্দেশ্য যে জীবনকে আরো সুন্দর করে সাজানোও হওয়া উচিত, তা কেমন করে অস্বীকার করা যায়?) খুবই ধুমধামের সাথে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা এরূপ

বিশ্বাসের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে যে, ঐ সব মাহফিলে রসূল সা. এর জ্যোতির্ময় আত্মা উপস্থিত হয় এবং ভক্তদের ভক্তি ও ভালোবাসার প্রকাশ দেখে প্রীত হয়। কোথাও মিষ্টি মন্ডা বিতরণ, কোথাও ফুলের ছড়াছড়ি, কোথাও আগরবাতি ও আতর-লোবানের মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি, এবং কোথাও বিচিত্র আলোক সজ্জা দ্বারা উক্ত বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি ঘটে। মীলাদুন্নবী বা সীরাতুন্নবীর প্রতি এ ধরনের ভক্তির বাড়াবাড়িতে যে ভাবমূর্তি প্রতিফলিত হয়, তা কোন রক্তমাংসের তৈরী মানুষের ভাবমূর্তি নয়, বরং এক অতি মানবিক জ্যোতির্ময় সত্তার ভাবমূর্তি। এ সত্তার দেহের কোন ছায়া থাকেনা, তাঁর যাবতীয় কর্মকান্ড মোজেযা তথা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক, তাঁর সমস্ত কাজ ফেরেশতারা সমাধা করে, এবং তাঁর প্রতিটি জিনিস রহস্যময়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রসূল সা. এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা সমগ্র মানবজাতির চেয়ে বহুগুণ বেশী। তাঁর জীবনে অতি প্রাকৃতিক অনেক কিছু ছিল, তাঁর বহু মোজেযাও ছিল। অনেক সময় ফেরেশতারাও তাঁর সাথে নানা কর্মকান্ডে শরীক হতো। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, তাঁর এই পুণ্যময় জীবন একজন মানুষেরই জীবন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণই এই যে, মানুষ হয়েও তিনি এমন অতুলনীয় জীবনের নমুনা পেশ করেছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সমাজ ও সভ্যতার রীতিনীতির আওতার মধ্যেই তাঁর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হতো। আর সাফল্যের পথের প্রতি ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কুরবানী ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হতো। সে জীবন একজন মানুষের জীবন ছিল বলেই তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে এবং এই সুবাদেই তাঁর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আদর্শ রয়েছে। তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর কাছ থেকে আমরা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার শিক্ষা নিতে পারি, নীতি ও আদর্শের আনুগত্য এবং দায়িত্ব সচেতনতার শিক্ষা নিতে পারি, মানবতার সেবার প্রেরণা সঞ্চয় করতে পারি, এবং দুস্কৃতিকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য একটা জোরদার উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারি। রসূলের জীবনীকে যদি পুরোপুরি মোজেযায় পরিণত করা হয় এবং তাকে একটা অতিমানবিক কীর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষদের জন্য তাতে আদর্শ কী থাকবে? এ ধরনের ব্যক্তিত্বের সামনে মানুষ হতবুদ্ধি ও অভিভূত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নিজের মধ্যে তার কোন প্রভাব প্রতিফলিত করতে পারেনা। তার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারে, কিন্তু তার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারেনা। এ জন্যই দেখা যায়, যেখানে যেখানে এই বিশেষ ধরনের ভক্তির উদ্ভব হয়েছে এবং সেখানে এটা যত গভীর হতে থাকে, সেখানে বাস্তব জীবন নবীর অনুসরণ থেকে ততই মুক্ত হতে থাকে। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, জঘন্যতম সামাজিক অপরাধে যারা লিপ্ত, তারা এরূপ সস্তা ভক্তির মহড়া দেখিয়ে নিজেদের অস্থির চিত্তকে এই বলে খানিকটা সান্তনা দেয় যে,

"আমরা যা-ই হয়ে থাকিনা কেন, তোমার প্রিয় নবীর উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত।"

অপরদিকে আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য থেকে আসা অন্য একটা প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যাকে বলা হয় ব্যক্তিপূজা। এ প্রবণতা মূলত জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও প্রেরণা থেকে উৎসারিত। এটা এক ধরনের জাতীয় অহমবোধের প্রকাশ, যা অন্যদের সামনে নিজেদের অতীতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের প্রদর্শনী করায়। এ প্রবণতার বক্তব্য হলো,

দেখ, আমাদের কাছে কত বড় বড় ব্যক্তিত্ব রয়েছে, আমাদের ইতিহাসে কত বড় বড় মর্যাদাবান নেতা অতিক্রান্ত হয়েছেন, এবং তারা অমুক অমুক স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন, যা আমাদের গৌরবজনক উত্তরাধিকার। এই প্রবণতার আলামত হলো, এগুলো সব সময় অন্তসারশূন্য হয়ে থাকে। এর আওতায় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস এবং অন্যান্য স্মরণীয় দিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করে থাকে। অথচ এ দিনগুলো কোথাও ঐ সব মহান ব্যক্তিত্বের জীবন থেকে জাতির শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়না। মানবতার নমুনা স্বরূপ যে সব ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত গর্বের সাথে তুলে ধরা হয়, তাদের নীতি ও আদর্শের কোন ছাপ উদযাপনকারীদের জীবনে দেখা যায়না এবং এরূপ ছাপ গ্রহণ করার কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়না। এই প্রবণতার অধীন রসূল সা. এর স্মৃতি জাগরূক করার জন্য যে সব উৎসবাদি পালন করা হয়, সেখানে ও সব সময় একই ধরনের কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে। অথচ বক্তা ও উদ্যোক্তাদের জীবনে তার কোন প্রভাব চোখে পড়েনা।

তৃতীয় ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগি হলো, রসূল সা.-এর বাণীকে একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় একটা ধর্ম মনে করা। এই দৃষ্টিভংগী দ্বারা যারা প্রভাবিত, তাদের ধারণা হলো, রসূল সা. কেবলমাত্র কিছু আকীদা বিশ্বাস, কয়েক প্রকারের আনুষ্ঠানিক এবাদত, কিছু দোয়াকালাম, কিছু নৈতিক উপদেশ, এবং কিছু আইনগত নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া বা শিখিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন কিছু মানুষ তৈরী করা, যারা ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান সুলভ বেশভূষা ধারণ করবে, অথচ যেখানে যত নোংরা সমাজ ব্যবস্থাই চালু থাকনা কেন, তারা তার সর্বোত্তম কর্মী সাব্যস্ত হবে। এ ধরনের লোকেরা রসূল সা. এর কাছ থেকে শুধু নামায, রোযা, নফল কাজ, যিকির, এবং ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সামষ্টিক জীবনের ব্যাপকতর কর্মকান্ডে তারা একেবারেই নির্দ্বিধায় প্রত্যেক বাতিল শক্তির সহায়ক হয়ে যায় এবং সবধরনের অপকর্মের সাথে সহযোগিতা করে। তারা রসূল সা. এর জীবনীর পবিত্র পুস্তকের অসংখ্য সোনালী অধ্যায়কে ভুলে কেবল একটি অধ্যায়ের মধ্যে এমনভাবে মনোনিবেশ করে যে, সেখানেই তারা হারিয়ে যায়। এই গোষ্ঠীটি এ যাবত রসূল সা. এর অনুকরণের যে নমুনা পেশ করেছে, তা দেখে কোন অমুসলিম তো দূরের কথা, কোন শিক্ষিত মুসলিম যুবক পর্যন্ত ভাবতে পারেনা যে, রসূল সা. তাদের নেতা হতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে সাম্প্রতিকতম কঠিন সমস্যাবলীর কোন সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিভংগিও রসূল সা.-এর সত্তার সঠিক উপলব্ধি ও তার আদর্শের অনুসরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সব ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগী টিকে থাকতে পারার একমাত্র কারণ হলো, পরিবেশ এরই অনুকূল। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, তার জন্য একটা বিশেষ ধরনের মানুষ প্রয়োজন। এটা এমন একটা কারখানা, যার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। এ সমাজ ব্যবস্থা তার সদস্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চরিত্র দেখতে চায়। এর কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানসিকতা ও চরিত্র সম্পন্ন লোকদের দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে। অন্যকথায় বলা যায়,

এখানকার বাস্তব কর্মকাণ্ডে মানবতার সেই মডেলের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, যা মুহাম্মদ সা.-এর জীবন চরিতে প্রতিফলিত হয়। এখানকার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সেই চিন্তা ও কর্মের কোনই চাহিদা নেই, যা রসূল সা. এর জীবন থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। বর্তমান দুনিয়ার সামষ্টিক ব্যবস্থায় যে ধরনের মন্ত্রী, আমলা, বিচারক, উকিল, নেতা, সাংবাদিক, সেনাপতি, সৈনিক, কোতোয়াল, পেয়াদা, তহশীলদার, প্রশাসন, জমিদার, কৃষক, লেখক, সাহিত্যিক, এবং শ্রমিক মজুরের চাহিদা রয়েছে, তাদের মানবিক মান সেই মানুষদের মানবিক মানের সম্পূর্ণ বিপরীত, রসূল সা. যাদেরকে তৈরী করে ইতিহাসের মঞ্চে প্রদর্শন করেছিলেন। আজকের পিতামাতা ঘরে ঘরে যে সন্তান স্নেহে আদরে লালন পালন করে গড়ে তুলছে, তা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার চাহিদার আলোকেই গড়ে তুলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পনেরো বিশ বছর ধরে পরিশ্রম করে যে এক একটি মানুষ তৈরী করছে, তা চলমান সমাজের প্রয়োজন মোতাবেকই তৈরী করছে। চলমান সমাজের দাবী অনুসারেই প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি নিজের চরিত্র ও মানসিকতাকে একটা বিশেষ রূপ দানের কাজে সারা জীবন নিয়োজিক থাকে। এই সমাজ ব্যবস্থা যে যে জিনিসকে ভালোবাসে, সেই সেই জিনিসই সমাজ তার সদস্যদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। আর যে যে জিনিসকে সে অপসন্দ ও ঘৃণা করে, পরিবেশের সকল উপকরণ সর্বশক্তি দিয়ে তাকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট থাকে। চলমান সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যে ধরনের বুলি ভালোবাসে, সে বুলি আপনা থেকেই সকলের মুখে মুখে চালু হয়ে যায়। সে যে পোশাক ভালোবাসে, সে পোশাক স্বতস্ফূর্তভাবে সকলের পরিধানে শোভা পেতে থাকে। এর এক ইশারায় প্রাচীন লজ্জাশীল পরিবারগুলোর বৌ ঝিদের মুখমন্ডল থেকে পর্যন্ত নিকাব উঠে যায়। চলমান সমাজ যাকে সম্মানজনক আচরণ বলে চালাতে চায়, সেটাই সম্মানজনক বিবেচিত হয়। আর চলমান সমাজ যাকে অপসন্দ করে, সেটাই বিবেচিত হয় অবাঞ্ছিত, অসম্মানজনক। যে শিল্প-কলাকে সে পসন্দ করে, সেটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে, আর যে সব কর্মকাণ্ডকে সে প্রত্যাখান করে, তা হয়ে যায় সবার উপেক্ষিত। এ সমাজ নিজের মূল্যবোধ নিজেই তৈরী করে এবং সকলকে তা মেনে নিতে বাধ্য করে। আর অন্য সব মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য হয়ে যায় ম্রিয়মান ও নির্জীব। কিছু কিছু আত্মাভিমানী ব্যক্তি ও পরিবার পরিবেশের বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু অর্থনৈতিক বঞ্চনা সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ও হীনমন্যতার চাপ এত প্রবল হয়ে থাকে যে, কালক্রমে তারা নিস্তেজ হয়ে পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। আর তারা আত্মসমর্পণ না করলেও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এভাবে সচেতনভাবেই হোক কিংবা অবচেতনভাবেই, গোটা পৃথিবীটাই যখন পরিবেশের দাবী অনুসারে নিজের জীবন ও চরিত্র গঠনে নিয়োজিত, তখন সেই পৃথিবী যদি রসূলের জীবনী নিয়ে হাজারো বই পুস্তকও রচনা করে, এবং ওয়ায নসিহতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও করে, তবে তাঁর সুমহান আদর্শ অনুসরণের উদ্দীপনা জনগণের মধ্যে আসবে কোথা থেকে?

প্রকৃত ব্যাপার হলো, যারা কোন অনৈসলামিক ব্যবস্থার সাথে আপোষ রফা করে নেয় এবং বাতিল শক্তির সাথে যাদের স্বার্থের ব্যাপারে সমঝোতা হয়ে যায়, তাদের জন্য রসূলের জীবনীতে কোন শিক্ষাই নেই। সীরাতের গ্রন্থাবলী পড়ে তারা হয়তো মাথা দোলাবে,

মানসিক আনন্দ ও তৃপ্তি পাবে। তাদের জ্ঞানও হয়তো বাড়বে, কিন্তু রসূলের সীরাত বা জীবনীর আলোকে আপন জীবন গড়ে তোলার প্রেরণা তারা কোথা থেকে পাবে? তাদের জড়তা ও স্থবিরতা দূর হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত কোন সোহরাব রোস্তমের কাহিনী নয়, আরব্য উপন্যাসের উপাখ্যানও নয়, এবং কোন কিংবদন্তির নায়কের কল্পকাহিনীও নয়। তাঁর অবস্থান কখনো এত নিম্নে নয় যে, তাঁকে আমরা নিছক বিনোদনমূলক সাহিত্য চর্চা বা বিদ্যা চর্চার একটা উপকরণ বানিয়ে রাখবো। তাঁর মূল্য ও মর্যাদা এত উঁচু যে, তা আমাদেরকে নিছক মানসিক তৃপ্তি লাভের জন্য সীরাতকে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়না। তাঁর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাঁর জীবনেতিহাসকে নিছক জাতীয় গৌরব বোধের বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বানাতেও আমাদেরকে বাধা দেয়।

এই সব রকমারি ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগী আমাদের সমাজে মিলিতভাবে সক্রিয় রয়েছে এবং এগুলো আসল লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। প্রতি বছর কত শত মীলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবীর সভা ও মাহফিল আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়, কে তার হিসাব রাখে? একমাত্র রবিউল আওয়াল মাসেই কত যে ওয়ায নসিহত ও বক্তৃতায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়, কত বইপুস্তক ও নিবন্ধ লেখা হয়, কত পত্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা এই বিষয়ে প্রকাশিত হয়, কবিরা কত বিপুল সংখ্যক কবিতা ও না'ত গযল লেখেন, গায়করা কত যে সভা-সমিতিতে কত না'ত, গযল ও কাওয়ালী গেয়ে বেড়ান, নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষ থেকে কত যে বাণী ও বিবৃতি প্রচারিত হয়, কত মিষ্টি বিতরণ ও কত জাঁকজমকের ভোজের আয়োজন হয় এবং তোরণ নির্মাণ ও বর্ণাঢ্য মিছিল সমাবেশের আয়োজনে কত যে টাকা খরচ হয়, কে রাখে তার হিসাব* ?

কিন্তু অন্য দিকে এটাও দেখা দরকার যে, একটা মহৎ উদ্দেশ্যে শক্তি ও অর্থের এই বিপুল ব্যয়ের সত্যিকার ফল ও স্বার্থকতা কী দাঁড়াচ্ছে? পর্যালোচনার এক পাল্লায় প্রতি বছরের এই সব তৎপরতাকে রাখুন, আর অপর পাল্লায় অর্জিত ফলাফল রেখে যাচাই করুন যে, সঠিক ফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা? এই সব মহৎ কর্মকান্ড দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবী জীবনের অনুকরণে আপন জীবনকে গড়া ও তাতে পরিবর্তন ও সংশোধন আনার সাধনায় প্রতি বছর কতজন আত্মনিয়োগ করে থাকে? এক একটা সভা সমাবেশ, এক একটা প্রবন্ধ, ও এক একটা না'ত বা গযল দ্বারা যদি মাত্র এক একজন লোকের মধ্যেও পরিবর্তন আসতো, তাহলে অনুমান করুন যে, বিগত দুই–আড়াইশো বছরে আমাদের কতখানি সুফল অর্জিত হতে পারতো। সেই ইপ্সিত সাফল্য যদি অর্জিত না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের চেষ্টায় কোন ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে এবং সে ত্রুটি অত্যন্ত মৌলিক ধরনের। দুঃখ শুধু এজন্য নয় যে, ইপ্সিত সুফল অর্জিত হয়নি। বরং আমাদের সমাজে রসূল সা.

---

* কোন কোন অঞ্চলে রসূল (সা) এর মীলাদ ও সীরাত উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে আমোদ উল্লাস ও বিনোদনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমনকি খোলাখুলি গুনাহর কাজ এবং হাংগামা ও হট্টগোল পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এর অর্থ হলো সমাজ নবী জীবনের শিক্ষা ও আদর্শের ঠিক বিপরীত দিকেই যাত্রা শুরু করেছে।

এর আদর্শ ও কীর্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক অশুভ প্রবণতার প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখে বিলাপ করতে ইচ্ছা হয়। আমাদের সমাজে আজ এমন মানুষও জন্ম নিচ্ছে, যারা রসূল সা. এর আদর্শকে এ যুগের জন্য অচল ও অকার্যোপযোগী বলে আখ্যায়িত করছে। রসূল সা. এর শিক্ষা নিয়ে উপহাস করছে, সীরাত, সুন্নাহ ও হাদীসের সমগ্র ভান্ডারকে বর্জন করার আহ্বান জানাচ্ছে। এ যারা কুরআন উপস্থাপনকারীর ২৩ বছর ব্যাপী অবিস্মরণীয় আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে কুরআনকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে এবং রসূল সা. এর সত্তাকে আদর্শ ও পূর্ণাংগ মানুষের একটি বাস্তব নমুনা হিসাবে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে উধাও করে দিতে চাইছে। আরো পরিতাপের বিষয়, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বাক স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার নামে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত এক শ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীর পক্ষ থেকে রসূল সা. এর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও অবদানকে চলমান বিকারগ্রস্ত সভ্যতার চিন্তাগত কাঠামোর সাথে সংগতিশীল প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে এবং প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব শক্তিসমূহের অভিরুচি অনুসারে রসূল সা. এর সম্পূর্ণ নতুন ভাবমূর্তি প্রস্তুত করার ধৃষ্টতা দেখানো হচ্ছে।

আমি যতদূর পড়াশুনা ও চিন্তা গবেষণা করেছি তা থেকে আমার এই উপলব্ধিই জন্মেছে যে, আমরা সীরাত অধ্যয়নের নির্ভুল মৌলিক দৃষ্টিভংগী হারিয়ে ফেলেছি এবং উপরোক্ত ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগীই আমাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। এ জন্যই রসূল সা. এর প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসার অসংখ্য প্রমাণ ও আলামত থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে প্রচুর চিন্তা গবেষণা চালানো সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের পূর্ব গগন থেকে সেই রকম নতুন মানুষের আবির্ভাব এখনও ঘটছেনা, যার পূর্ণাংগ নমুনা রসূল সা. জগদ্বাসীকে দেখিয়েছিলেন।

রসূল সা. এর জীবন চরিত আমাদের মধ্যে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পারে কেবল তখনই, যখন আমরা রসূলের সমগ্র জীবন যে মহান কাজ সমাধা করা ও যে মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের সর্বাত্মক সংগ্রামে উৎসর্গিত ছিল, সেই একই লক্ষ্যে একই সংগ্রামে আমাদের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পারবো। রসূল সা. যে ধরনের ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন, একমাত্র সে ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামই রসূল সা. এর অনুসারী জীবন গড়ার একমাত্র উপায়। আর সে ধরনের অনুসারী ব্যক্তিত্ব দ্বারাই নতুন করে সফল ইসলামী আন্দোলন গড়া ও পরিচালনা করা সম্ভব।

মুহাম্মদ সা. এর জীবনী নিছক জনৈক ব্যক্তির জীবনী নয়, বরং তা হচ্ছে এমন এক ঐতিহাসিক শক্তির জীবন বৃত্তান্ত, যা একজন মানুষের আকারে আবির্ভূত হয়েছিল। এটা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কোন দরবেশের কাহিনী নয়, যিনি লোকালয়ের এক প্রান্তে বসে কেবল নিজের সংশোধন ও আত্মগঠনের কাজে নিয়োজিত। বরং এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির জীবন কাহিনী, যিনি ছিলেন একটা সামষ্টিক আন্দোলনের চালিকা শক্তি। এটা শুধু একজন মানুষের নয়, বরং মানুষ গড়ার এক কারিগরের জীবন কাহিনী। এ জীবন কাহিনীতে রয়েছে এক নতুন বিশ্ব নির্মাতার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্তারিত বিবরণ। বস্তুত বিশ্বনবীর জীবনকাহিনী হেরা গুহা থেকে নিয়ে সূর গুহা পর্যন্ত, পবিত্র কা'বার চত্তর থেকে নিয়ে তায়েফের বাজার পর্যন্ত, এবং উম্মুল মুমিনীনদের কক্ষ থেকে রণাঙ্গন পর্যন্ত চতুর্দিকে

বিস্তৃত। তাঁর জীবন চরিত শুধু তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং অসংখ্য ব্যক্তির জীবনকে সুষমা মন্ডিত করেছে। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আম্মার, ইয়াসার, খালেদ, খুয়াইলিদ, বিলাল ও সুহাইব-সকলেই এই একই সীরাত গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়। তাঁরা সবাই একই বাগানের গাছ গাছালি, যার প্রতিটি পত্রপল্লবে এই বাগানের মালির জীবন চরিত লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পৃথিবীর এই মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বকে যদি জীবনী লেখাচ্ছলে নিছক একক একজন ব্যক্তি রূপে তুলে ধরা হয়, এবং জীবনী লেখার প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান কীর্তি, তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিযান, এবং তাঁর স্বভাবচরিত্র ও আদত অভ্যাসের বিস্তৃত, পুংখানুপুংখ ও তারীখওয়ারি বর্ণনা দেয়া হয়, তবে এ ধরনের সীরাত লেখা দ্বারা সীরাতের সঠিক উদ্দেশ্য কখনো পূরণ হবেনা।

রসূল সা. এর জীবন কোন পুষ্করিনীর স্থির পানির মতও নয় যে তার এক কিনারে দাঁড়িয়ে এক নজরেই তা পর্যক্ষেণ করা যাবে। বরং এটা একটা বহমান নদী, যাতে বেগবান স্রোত রয়েছে, গতি ও সংঘাত রয়েছে, তরংগ ও ফেনা রয়েছে, ঝিনুক ও মুক্তা রয়েছে, এর পানির কল্যাণে মৃত ভূমি প্রাণ ফিরে পায় এবং এ নদীর রহস্য বুঝবার জন্য এর স্রোতের সাথে সাথে চলতে হয়। এ কারণে সীরাত বিষয়ক রকমারি গ্রন্থ পড়লে দুর্লভ তথ্যাবলি পাওয়া গেলেও পাঠকদের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়না, আবেগ জাগ্রত হয়না, সাহস ও সংকল্পে নতুন উদ্যমের জোয়ার আসেনা, কাজের অভিরুচিতে নতুন উত্তাপ ও নতুন প্রেরণার উজ্জীবন ঘটেনা এবং আমাদের জীবনের স্থবিরতা ও দূর হয়না। সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ পড়ে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়ে ভক্তির ঢেউ হয়তো ওঠে এবং চোখে অশ্রুর বানও হয়তো ডাকে, কিন্তু আকাংখার সেই স্ফুলিংগ আমাদের হস্তগত হয়না, যার উত্তাপ একজন নিঃসংগ, নিসম্বল ও আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে শত শত বছরের পুঞ্জীভূত বাতিল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আর ঈমানের সেই তেজ ও তীব্রতা আমরা অর্জন করতে পারিনা, যা একজন নিঃস্ব এতীমকে সমগ্র আরব অনারব বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত করেছিল।

আসল কথা হলো, রসূল সা. প্রচলিত পরিভাষার সীমিত অর্থে কেবল একজন 'অসাধারণ' ও 'খ্যাতনামা' ব্যক্তিই ছিলেন না এবং তাঁর সীরাত তথা জীবন চরিত কেবল এ ধরনের কোন 'অসাধারণ ও 'খ্যাতনামা' ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তই নয়, যে ধরনের জীবন চরিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জন্য লিখিত হয়ে থাকে। মহানবীর সত্তা ও ব্যক্তিত্ব এ ধরনের অসাধারণ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধের।

পৃথিবীতে অসাধারণ মানুষ অনেক জন্মেছে এবং জন্মে থাকে, যারা কোন ভাল শিক্ষা ও কোন গঠনমূলক চিন্তা সমাজে উপস্থাপন করে। এদেরকে অসাধারণ মানুষ বলা হয়। যারা নৈতিকতা ও আইনের বিধান নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে তাদেরকেও মহৎ ও অসাধারণ মানুষ বলা হয়। যারা সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, তাদেরকেও অসাধারণ মানুষ বলা হয়। এই 'অসাধারণ' খেতাবটি সেই সব লোককেও দেয়া হয়, যারা দেশ জয় করেছে, বীরোচিত কীর্তির উত্তরাধিকার রেখে গেছে, যারা সাম্রাজ্য পরিচালনা ও শাসন করেছে, যারা দারিদ্র ও অভাবের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং যারা বিশ্ববাসীর

সামনে ব্যক্তিগত চরিত্রের অত্যন্ত উঁচুমানের মানদন্ড স্থাপন করেছে, তাদেরকেও। কিন্তু এ ধরনের অসাধারণ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনী যখন আমরা অধ্যয়ন করি, তখন সাধারণত আমরা এটাই দেখতে পাই যে, তাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ যেন জীবনের কোন একটা ভালই চুষে খেয়ে ফেলেছে, আর বাদবাকী সবগুলো ডালপালা যেন শুকিয়ে গেছে। তাদের জীবনের একটা দিক যদি খুবই উজ্জ্বল দেখা যায়, তবে তার অন্যদিক একেবারেই অন্ধকার প্রতীয়মান হয়। একদিকে চরম বাড়াবাড়ি, অপর দিকে চরম উদাসীনতা। কিন্তু রসূল সা. এর জীবনের প্রতিটি দিক অন্যান্য দিকের সাথে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণও এবং প্রতিটি দিক একই রকম পূর্ণতা ও উৎকৃষ্টতা দ্বারাও শোভিত। যেখানে গুরু গম্ভীরতার প্রতাপ রয়েছে সেখানে সৌন্দর্যের চমকও রয়েছে। সেখানে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি রয়েছে বৈষয়িকতার সমন্বিত অবদান। পরকালের চর্চার পাশে হাত ধরাধরি করে রয়েছে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। দ্বীনের সাথেই রয়েছে দুনিয়াও। এক ধরনের আত্মনিবেদিত ভাব থাকলেও সেই সাথে আত্মমর্যাদাবোধও রয়েছে অম্লান। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি বিরাজ করছে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি স্নেহ মমতা ও তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। কঠোর সামষ্টিক শৃংখলার সাথে রয়েছে ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মানও। প্রগাঢ় ধর্মীয় চেতনা ও আবেগের সাথেই অবস্থান করছে সর্বাত্মক রাজনীতিও। জাতির নেতৃত্ব প্রদানে অষ্টপ্রহর ব্যস্ততা থাকলেও সেই সাথে দাম্পত্য জীবনের কর্মকাণ্ডও সম্পাদিত হচ্ছে সুচারুভাবে। মজলুমদের সাহায্যের পাশাপাশি যালেমদের প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

রসূলের জীবন চরিতরূপী এই পাঠশালা থেকে সমভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে একজন প্রশাসক, একজন শাসনকর্তা, একজন মন্ত্রী, একজন কর্মকর্তা, একজন মনিব, একজন চাকুরে, একজন ব্যবসায়ী, একজন শ্রমিক, একজন বিচারক, একজন শিক্ষক, একজন সিপাহী, একজন বক্তা, একজন নেতা, একজন সংস্কারক, একজন দার্শনিক এবং একজন সাহিত্যিক ও। সেখানে একজন পিতা, একজন সহযাত্রী ও একজন প্রতিবেশীর জন্য একই রকম অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে। একবার কেউ যদি এই পাঠশালায় পৌঁছে যায়, তাহলে তার আর অন্য কোন পাঠশালায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়না। মানবতার যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব, তা এই একক, ব্যক্তিত্বেই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। এজন্যই আমি এই ব্যক্তিকে "শ্রেষ্ঠ মানুষ" বা "মহামানব" বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয়েছি। সমগ্র মানবেতিহাসে "শ্রেষ্ঠ মানুষ" কেবল এই একজনই। তাঁকে মশাল বানিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে উজ্বল করতে পারি। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তাঁর কাছ থেকে আলো গ্রহণ করেছে। অনেকে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের ভান্ডার গড়ে তুলছে। আজ পৃথিবীর দিকে দিকে তাঁর বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিতে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার গভীর প্রভাব রয়েছে। পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই, যে এই শ্রেষ্ঠ মানুষ থেকে কোন না কোন পর্যায়ে উপকৃত হয়নি। কিন্তু তাঁর দ্বারা যারা উপকৃত, তাঁরা তাঁকে চেনেনা এবং তাঁর পরিচয় জানেনা।

রসূল সা. এর ব্যক্তিত্বের পরিচয় এবং তাঁর বাণীর বিশ্বময় প্রচার ও প্রসার তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল তথা মুসলিম জাতিরই দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এই জাতি নিজেই তাঁর ও তাঁর বাণী থেকে

অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। মুসলমানদের কাছে রক্ষিত ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাতায় জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই দিকনির্দেশনা রয়েছে, কিন্তু তাদের জীবনে এই মহামানবের জীবনীর কোন প্রভাব পড়ছে বলে মনে হয়না। এই জাতির ধর্মীয় জীবনে, রাজনীতিতে, সমাজ জীবনে, নৈতিকতায়, আইন ব্যবস্থায় ও সংস্কৃতিতে নবীজীবনের আদর্শের খুব কমই ছাপ অবশিষ্ট রয়েছে। যা রয়েছে তাও অনেক নতুন নতুন ছাপের সাথে মিশে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। এই জাতির সামাজিক পরিবেশ পৃথিবীর কোন একটি ক্ষুদ্রতম অংশেও এমন অবস্থায় নেই, যা দ্বারা বুঝা যায় যে তারা মুহাম্মদ সা. এর নীতি, আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিনিধি। বরঞ্চ এ জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন বিভ্রান্ত ও বাতিল ব্যবস্থার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত শক্তির ভয়ে নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে লজ্জিত বলে মনে হয়। তারা কুরআনকে গেলাফ দিয়ে মুড়ে রসূল সা. এর সীরাতকে ফুলের তোড়া বানিয়ে তাকের ওপর তুলে রেখে দিয়েছে।

উপরন্তু মুহাম্মদ সা. কে সংকীর্ণ অর্থে একজন ধর্মীয় ও জাতীয় নেতায় পরিণত করে নিজেদেরকে একটা ধর্মীয় ও জাতীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেছে। এভাবে এই বিশ্ব ব্যক্তিত্বের বাণী ও জীবনাদর্শকে গোষ্ঠীগত ও সাম্প্রদায়িক একচেটিয়া সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানব জাতির নেতা হয়ে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য বাণী ও আদর্শ নিয়ে। তাঁর জীবনেতিহাসকে এমনভাবে উপস্থাপন করা দরকার ছিল যে, তা মনুষ্যত্বের একটা নমুনা ও আদর্শ। মানুষ এর ছাঁচে ঢালাই হয়ে তৈরী হলে সে নিজের ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের উপকরণ হতে পারে এবং রকমারি সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে একটা পবিত্র নিষ্কলুষ ও নিষ্কন্টক জীবন অর্জন করতে পারে। রসূল সা. এর বাণী ও জীবনাদর্শ প্রকৃত পক্ষে সূর্যের কিরণ, বৃষ্টির পানি ও বাতাসের মত সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। অথচ আমরা তাঁকে নিজেদের অজ্ঞতার দরুন একটা গোষ্ঠীগত বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছি। আজ প্লেটো, সক্রেটিস, ডারউইন, মেকিয়াভেলী, মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনস্টাইন থেকেও সকল দেশ ও সকল ধর্মের লোকদেরকে কমবেশী উপকৃত হতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা যায়। তাদের বিরুদ্ধে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কোন অন্ধ বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মুহাম্মদ সা. এর জ্ঞান, আদর্শ ও নেতৃত্ব থেকে শিক্ষা গ্রহণে এত আপত্তি ও এত বিদ্বেষ যে, তার ইয়ত্তা নেই। লোকেরা ভাবে যে, মুহাম্মদ সা. তো মুসলমানদের নেতা। আর আমরা মুসলমানদের থেকে আলাদা এবং মুসলমানরাও আমদের থেকে ভিন্ন জাতি। কাজেই মুসলমানদের নেতা ও পথ প্রদর্শকের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? দুঃখের বিষয় হলো, এরূপ ধারণা সৃষ্টিতে এবং এর এতটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে উপনীত হওয়াতে আমাদের নিজস্ব কর্মকান্ডেরও যথেষ্ট হাত রয়েছে। সমগ্র মানবজাতির বন্ধু মুহাম্মাদ সা. এর উম্মত হয়েও আমরা তাঁর অনুকরণের অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি বলেই অমুসলিম জনগণের মধ্যে এরূপ চিন্তাধারা জন্ম নিতে পেরেছে।

পাশ্চাত্য জগতের উদ্দেশ্যে

বিশ্বনবীর জীবনকাল মানবেতিহাসের দুটো প্রধান যুগের মাঝখানে অবস্থিত। যেদিন তিনি নবী হিসেবে অধিষ্ঠিত হন, সেদিন থেকে পেছনের দিকে তাকালে আমরা সাক্ষাত পাই

গোত্রবাদ, সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র, পূর্বপুরুষ পূজা, ও পৌত্তলিক সভ্যতার। আর সম্মুখের দিকে তাকালে দেখতে পাই আন্তর্জাতিক, গণতান্ত্রিক, ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন ভিত্তিক সভ্যতার যুগ। এই বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির উদ্বোধনটা সম্পন্ন হয়েছিল স্বয়ং রসূল সা. এর হাতেই। সেই সাথে তাঁর মাধ্যমে বিশ্বমানবকে এমন মূলনীতি দেয়া হলো, যা কেয়ামত পর্যন্ত কার্যোপযোগী। এই মূলনীতির সাথে সাথে এমন মানুষ তৈরী করে দেখিয়ে দেয়া হলো, যে ভবিষ্যত দায়িত্ব বহনের যোগ্য হতে পারে। তাঁর মাধ্যমে সেই অনাগত যুগের চাহিদার আলোকে আত্মা ও দেহ, নৈতিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা, ভাবাবেগ ও যুক্তি-বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কাজ, ব্যক্তি ও দলের আকাংখা এবং বিরাজমান পরিস্থিতি ও চাহিদার মাঝে অকল্পনীয় ও অলৌকিক ধরনের ভারসাম্য স্থাপিত হলো। তাঁর হাতে দুনিয়া সম্পর্কে নির্মোহ অথচ দুনিয়ার শাসনকার্য পরিচালনাকারী একটি মানবগোষ্ঠী তৈরী করা হয়েছিল। এই দল এক দিকে যেমন আল্লাহর আনুগত্যে জুড়িহীন, অপরদিকে তেমনি বস্তুজগতের ওপর কার্য পরিচালনায়ও অগ্রগামী। তাঁরা একদিকে সত্যের সামনে পরম বিনয়ের সাথে মাথা নোয়ায়, অপরদিকে বাতিলের শক্তি খর্ব করার জন্য জানমালের সর্বাত্মক কুরবানী দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। একদিকে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে সোপর্দ করে দিত, অপর দিকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে বশীভূত করে কাজে লাগাতে ছিল সুদক্ষ। ইতিহাসের রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করা মাত্রই এই দল জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো জ্বালালো, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দ্বারোদঘাটন করলো, এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের জন্য দ্রুতগতিতে তারা নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালো। তাদের সকল তৎপরতা, উন্নতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার, আবিষ্কার উদ্ভাবন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল কর্মকান্ডের আসল কৃতিত্ব মুহাম্মদ সা.-এরই প্রাপ্য।

পরিতাপের বিষয়, এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও গণতান্ত্রিক সভ্যতার নিয়ন্তা পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ মুহাম্মদ সা., তাঁর বাণী ও তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝতে পারলোনা। যে মহান ব্যক্তির কৃতিত্বপূর্ণ অবদান পাশ্চাত্যের নব উত্থানের পেছনে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে, যে সত্তা গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল উদগাতা এবং যিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তাঁকে ইউরোপের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষরা দেখতেও পেলনা, বুঝতেও পারলোনা। এর অনেকগুলো কারণ ছিল। এই কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা এখানে বাঞ্ছনীয় মনে করছি ঃ

১. মুহাম্মদ সা. যখন নিজের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁকে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় ধর্মের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই উভয় ধর্ম তখন চরম বিকৃতি ও অবক্ষয়ের যুগ অতিবাহিত করছিল। এই উভয় জাতি ঈমান ও নৈতিকতা থেকে বঞ্চিত একটা অনুষ্ঠান সর্বস্ব কাঠামোকে ধর্মীয় পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য সহকারে বহন করে চলছিল। উভয় জাতির মধ্যে ধর্মীয় শ্রেণী ও উপদল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তারা পুরোপুরি ধর্মব্যবসায়ের দোকান খুলে বসেছিল। সুস্থ চিন্তা ও কর্মের আসল পণ্য লুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বাইরে কেবল চটকদার সাইন বোর্ড লটকানো ছিল। নিজেদের উপদলীয় ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব বহাল রাখার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হতো এবং নিজ নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোকজনকে ধরে রাখাই ছিল প্রত্যেক গোষ্ঠীর একমাত্র কাজ। মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন ও সমাজের

সংস্কার কারোই কাজ ছিলনা। এরূপ পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মানসিকতা এত বিগড়ে গিয়েছিল যে, তারা মুহাম্মদ সা. এর অমূল্য ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন এবং তাঁর বাণী ও তাঁর উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও হঠকারিতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে থাকে। তারা তাঁর দাওয়াতের প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতি ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাঁর কৃত গঠনমূলক কাজকে নষ্ট করে দিতে চায়। এমনকি তাঁকে হত্যা করার চক্রান্তও চালায়। তারপর নিজেদের এই সব অপকর্মের স্বাভাবিক কুফল দ্বারা নিজেদের ও বংশধরদের জীবনকে কলংকিত করে। ইতিহাসের বহমান স্রোতকে তারা নোংরা মানসিকতা ও ঘৃণ্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা নষ্ট করে এবং এই নষ্ট পানি প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত গড়ায়। তারা ঘৃণা ও বিদ্বেষের এক বিশাল উত্তরাধিকার পরবর্তী ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্য রেখে যায়। মুহাম্মদ সা. এর সমকালীন ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই দূষিত ভাবাবেগ জড়িত প্রতিক্রিয়া আজ পর্যন্ত তাদের উত্তরসূরীদের মনমগজে প্রতিফলিত হচ্ছে।

২. ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেকার মনুষ্যজগতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় পরিমন্ডলে খৃষ্টানদের ছিল সুস্পষ্ট প্রাধান্য ও দোর্দন্ড প্রতাপ। এই প্রাধান্য ও আধিপত্যকে সম্প্রসারিত করার আকাংখারও কমতি ছিলনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশও ছিল অনুকূল। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয় খৃষ্টানদের চোখে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির আবির্ভাব বলে প্রতীয়মান হয়। এই শক্তি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে একটি কার্যকর বিশ্বশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের মধ্যে প্রচন্ড প্রতিহিংসা দানা বাঁধে এবং তা ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইসলামী শক্তি যখন খৃষ্টানদের হাত থেকে কার্যত ক্ষমতা ও দখলদারী ছিনিয়ে নিতে থাকে, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র আকার ধারণ করে। ইতিহাসের মুক্তমঞ্চে সমান দুই শক্তির প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে বিচার করার পরিবর্তে খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিহিংসা লালন করতে লাগলো, পরোক্ষভাবে এ প্রতিহিংসা ছিল স্বয়ং রসূল সা. ও ইসলামের বিরুদ্ধে। এ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে চরম আকার ধারণ করে। এই যুগ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে যেহেতু খোদ মুসলমানদের মধ্যেই অধোপতনের বীজ বোনা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদের বিশেষ বিশেষ দুর্বলতা ও ভ্রষ্টতাকে তারা ইসলাম ও রসূলুল্লাহর ওপর আরোপ করতে লাগলো। মুসলমানদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা রসূল সা. এর ভাবমূর্তিকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালাতে শুরু করলো।

৩. ইসলাম ও খৃস্টবাদের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব সংঘাতের এই সুদীর্ঘ যুগের প্রথমাংশে যেহেতু খৃষ্টীয় ধর্মযাজকরা খৃস্টান জনগণকে পুরোপুরিভাবে নিজেদের মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেছিল, আর ইসলাম এই ধর্মযাজক শ্রেণীর গোষ্ঠী স্বার্থের ওপরই আঘাত হেনেছিল, তাই এই গোষ্ঠী রসূল সা. ও তাঁর বাণী সম্পর্কে একটা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে এবং তা সর্বত্র ছড়াতে থাকে। শত শত বছরের এই অপপ্রচার পাশ্চাত্যবাসীর মন মগজকে একেবারেই বিগড়ে দেয়। এই জন্যই আজ দেখা যায়, যারা আদৌ কোন ধর্ম মানেনা

এবং খৃষ্টধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে চিন্তাভাবনা করে, সেই বুদ্ধিজীবীরাও যখন ইসলাম ও মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে, তখন তারা আজ থেকে ছয়শো বছর আগেকার সংকীর্ণমনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাদ্রীদের নীচ মানসিকতা থেকে একটুও উর্দ্ধে উঠতে পারেনা। প্রাচ্যবিদদের লেখা বইগুলোর দুচারটে পাতা ওল্টালেই দেখতে পাবেন যে তাতে কত ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য কিরূপ ন্যাক্কারজনকভাবে সংযোজন করা হয়েছে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটির জীবনকে কত নির্বুদ্ধিতার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। দু-একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীর সাধারণ রীতির কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

৪. বিগত দুশো বছর ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের শয়তানী যুগ। এই যুগে মুসলিম জাতিগুলো ইসলাম থেকে বিচ্যুতি, আল্লাহর অবাধ্যতা ও মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শের প্রতি আনুগত্যহীনতার শাস্তি স্বরূপ একে একে পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী লালসার শিকার হয়েছে। পাশ্চাত্যের এই সাম্রাজ্যবাদী লালসা সর্বত্র মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক দুরন্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই প্রতিরোধের পেছনে সর্বক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। ইসলাম তওহীদ তথা এক আল্লাহর গোলামীর যে তত্ত্ব দিয়েছে তা স্বাধীনতা ও মানবীয় সাম্যের এমন শিক্ষা দেয়, যা ইসলামের অনুসারীদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামীতে সম্মত হতেই দেয়না। এ জন্যই দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যতগুলো আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার সবগুলোর পেছনেই ইসলামী চেতনা ও উদ্দীপনা সক্রিয়। সর্বত্রই কোন না কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় এবং সর্বত্রই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা সক্রিয় লক্ষ্য করা যায়। এভাবেই মুসলিম দেশগুলোর সকল স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মীয় প্রেরণাকে প্রবলভাবে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। আর এ কারণেই পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের মনে এই শক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে বিদ্বেষ ও আক্রোশ সৃষ্টি হয়। কেননা এ শক্তি পদে পদে তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল এবং এক দুর্জয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিল। আর এই আক্রোশের বশেই মুসলমানদের ধর্মপ্রীতিকে পাগলামি বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং "মোল্লাতন্ত্র" কে একটা ভয়ংকর আপদ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এর পাশাপাশি মুসলমানদের ধর্মীয় প্রেরণা এত শক্তিমান প্রমাণিত হয় যে, তা পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও চিন্তাধারার কাছে পরাভব মানতে তো প্রস্তুত ছিলইনা, উপরন্তু তা প্রত্যেক দেশে তার মোকাবিলা করেছে। শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির সকল শক্তি প্রয়োগ করেও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বহু বছর পর মুসলিম জাতির মধ্য থেকে কেবল মুষ্ঠিমেয় সংখ্যক লোককেই আপন তাবেদার বানাতে পেরেছে। অতপর তারা এ ধরনের তাবেদার গোষ্ঠীকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাদেরকে মুসলমানদের ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে চিন্তাগত, কৃষ্টিক ও রাজনৈতিক যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। এর ফলে ইসলাম ও রসূল সা.-এর সাথে পাশ্চাত্যের সংঘাত ক্রমেই বেড়ে গেছে।

৫. পাশ্চাত্যের জাতিগুলো যখন মুসলমানদেরকে গোলামে পরিণত করার চেষ্টায় সফল হলো, তখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে তাদের চেয়ে হীনতর এই

মুসলমানদের কাছ থেকে জীবন পদ্ধতি ও জীবন দর্শন সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। একই রকম কঠিন হয়ে দাঁড়ালো ইসলামের উপস্থাপক ও প্রচারক রসূল সা.কে সম্মান করা। শুধু তাই নয়, তারা যখন মুসলমানদেরকে তাদের মানসিক গোলামীতে লিপ্ত এবং পাশ্চাত্যের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবার যাবতীয় লক্ষণ তাদের মধ্যে প্রতিভাত দেখলো, তখন এ অবস্থাটা আরো বড় অন্তরায় সৃষ্টি করলো। তারা যখন প্রত্যক্ষ করলো যে, তাদের হাতে গড়া আধুনিকমনা মুসলমানগণ ইসলামকে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভংগী অনুসারে পরিবর্তন ও রদবদল করে নিতে শুরু করেছে, তখন আর যায় কোথায়। ইসলাম ও রসূল সা.-এর মর্যাদা তাদের চোখে আরো কমে গেল। মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিভংগী ইসলামের ভাবমূর্তি ও মুহাম্মদ সা. এর মর্যাদার বিরাট ক্ষতি সাধন করলো।

এই পাঁচটি কারণে মুহাম্মদ সা. ও পাশ্চাত্যের মানুষের মাঝে এক বিরাট লৌহপ্রাচীর দাঁড়িয়ে গেছে।

তাই আজ পাশ্চাত্য জগত গোটা মানবজাতির মুক্তিদূত মুহাম্মদ সা. কে কেবল মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে এবং তাঁর জীবন চরিতকে বুঝবার ও বুঝাবার দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তে বিরুদ্ধাচরণ ও আপত্তি তোলার মনোভাব নিয়ে অধ্যয়ন করে থাকে। পাশ্চাত্য এই মহান সত্তার যে চিত্র তাদের সাহিত্যে অংকন করেছে, তা এমন একজন মানুষের ভাবমূর্তি তুলে ধরে, যে মানসিক ভারসাম্য ও সুস্থতা থেকে বঞ্চিত, যার যাবতীয় তৎপরতা অবচেতন মনের বুদ্ধিবিভ্রাটের ফল এবং যে এক রক্তপিপাসু তরবারী হাতে নিয়ে যে দিকে অগ্রসর হয় পাইকারী গণহত্যা করতে করতে এগিয়ে যায়। গোটা বিশ্ব যাকে আপাদমস্তক করুণা বলে জানে, তাঁকে তারা একজন দুনিয়া পুজারী ও উচ্চাভিলাষী আগ্রাসী হানাদারের মর্যাদা দিয়েছে এবং তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ অবদানকে ধোকাবাজি ও ছলচাতুরি নামে আখ্যায়িত করেছে। তারা এও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, ইসলামী আন্দোলনে যা কিছু ভালো ছিল, তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে ধার করা জিনিস। নচেত মুহাম্মদ সা.-এর মধ্যে তেমন কোন মৌলিক যোগ্যতা ছিলনা। এও প্রকাশ করা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতার যাবতীয় কর্মকান্ড ছিল নিছক লোক দেখানো এবং কেবল নাটকীয় কলাকৌশল দ্বারা জনগণকে বশীভূত করে স্বার্থ উদ্ধার করা হয়েছে। তারা দুনিয়ার যে কোন মানুষকে দুনিয়া পুজারী ও ধড়িবাজ বলুক, কিন্তু প্রশ্ন হলো, রসূলের সমগ্র জীবনীতে যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ মহৎ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তথাকথিত ঐ ধড়িবাজ ও দুনিয়া পুজারী ব্যক্তিদের সাথে তার সমন্বয় কিভাবে সম্ভব?

এছাড়া তাঁর আরো যে ঘোরতর অবিচার করা হয় তা হলো, রসূল সা.-এর দাওয়াতের মূল বাণীকে শেকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্রপল্লব পর্যন্ত সর্বত্র সর্বব্যাপী দৃষ্টি দিয়ে অধ্যয়ন করা হয়না। বরং এর মৌল নীতিকে না বুঝে এবং এর চিন্তাধারার মূল দর্শনের নিগুঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি না করে তার্কিক পাদ্রীদের নিয়মানুসারে কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়া হয়। যেমন বলা হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সা. বহু বিবাহ বৈধ করেছেন, ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছেন, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসী বানিয়েছেন, ইত্যাদি

ইত্যাদি। অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার এই একপেশে পদ্ধতিটা সব সময় বিদ্বেষপূর্ণ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানসিকতার বাহন হয়ে থাকে। এই মানসিকতা নিয়ে কোন জীবন ব্যবস্থাকে ও কোন দ্বীনকে বুঝা সম্ভব হয়না। বরং এর দ্বারা সব কিছু বুঝার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আসল বিবেচ্য বিষয় এবং জানা ও বুঝার আসল জিনিস হলো, মূল দর্শন বা মতাদর্শ। মুল দর্শন ও মতাদর্শ কতখানি সত্য ও সঠিক, তা দ্বারা জীবনের কতটা উপকার সাধিত হয় এবং জীবনের ক্ষয়ক্ষতি কতটা রোধ ও পূরণ করা যায়, সেটাই আসল প্রণিধানযোগ্য বিষয়। এরপর এই মূলতত্ত্ব ও মতাদর্শ থেকে যে নীতিমালা তৈরী হয়, যে নীতিমালার ভিত্তিতে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, সেগুলোকে বিবেচনা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। অতঃপর এই সব নীতিমালা থেকে নির্গত খুঁটিনাটি উপবিধি বা উপধারাগুলোকে দেখতে হয় যে, ওগুলো মূল আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা। এক ব্যক্তি আপনার কাছে একটা জীবন দর্শন নিয়ে এলো। আপনি সেই জীবন দর্শনটা বিবেচনা না করে এমন কতকগুলো উপবিধি নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন, যার ব্যাপারে আপনার সমাজে একটা বিশেষ বদ্ধমূল ধারণা বিরাজমান এবং সেই ধারণার বাইরে এসে আপনি কোন চিন্তাভাবনা করতেই পারেন না। এর ফল দাঁড়ায় এইযে, আপনি নিজেও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হন, এবং হাজার হাজার মানুষকেও বিভ্রান্তি ও সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। এক ব্যক্তি আপন সত্তার ভেতর মনুষ্যত্বের একটা নতুন পূর্ণাংগ মডেল বানিয়ে আপনার সামনে হাজির করলো। আপনি এই মডেলকে সামগ্রিকভাবে বুঝার আগে তার দুই একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন এবং তার বৈধতা ও ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তা না করে যদি পুরো মডেলটাকে সামগ্রিকভাবে বুঝে নিতেন, তাহলে ঐ অংশগুলো আপনা থেকেই আপনার বুঝে আসতো। বিভিন্ন মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থাকে বুঝার জন্য এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পর্যালোচনার জন্য পাশ্চাত্য সাধারণভাবে যে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবলম্বন করে থাকে, ইসলাম ও মুহাম্মদ সা. এর বেলায় সেই বিজ্ঞানসম্মত পন্থাটাকে একেবারেই শিকেয় তুলে রাখে। একটা বাগান সম্পর্কে কোন মত অবলম্বন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুরো বাগানটাকে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতে হয়। ঐ বাগানের একটি গাছের ডাল বা পাতা বা ফল ও ফুলকে পুরো বাগান থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে চলেনা। তেমনিভাবে মুহাম্মদ সা. এর জীবনী ও আদর্শরূপী বিশাল বাগানকে দেখুন এবং তার সামগ্রিক অবকাঠামোটা বুঝে নিন। তাহলে তার ভেতরকার প্রতিটি ডালপালা, প্রতিটি ফলফুল ও কুড়ি পাঁপড়িকেও আপনা আপনিই বুঝতে পারবেন। কোন মতবাদ, মতাদর্শ, আন্দোলন বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি কয়েকটা জিনিস আপনার রুচি এবং আপনার প্রিয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির বিরোধী হয়, তাহলে তার অর্থ এটা হতে পারেনা যে, ওখানে আর কোন ভালো জিনিস নেই, ঐ গোটা জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আপনার রুচি বা পসন্দ–অপসন্দ কোন বিশ্বজোড়া বা ঐতিহাসিক মানদন্ড নয়। এমনও হতে পারে, বরং হওয়ারই কথা যে, একটা বিশেষ মতাদর্শ, আন্দোলন বা একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব নিজের ভালো মন্দের মাপকাঠি নিজেই সাথে করে এনেছে এবং তার ভালোমন্দের মানদন্ড আপনার মনদন্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। কাজেই সবার আগে

যে জিনিসটা প্রয়োজন তা হলো, মানদন্ড ও মাপকাঠিগুলোকে পাশাপাশি রেখে পরখ করতে হবে, এবং মানদন্ড পরখের সাথে মূল তত্ত্ব এবং মতাদর্শের মান ও যাচাই বাছাই করতে হবে।

কুরআন, ইসলাম ও মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে খৃষ্টান জগত ও প্রাচ্যবিদগণ এ যাবত যে সাহিত্য তৈরী করেছেন, তা একদিকে যেমন অজ্ঞতা ও ভুল বুঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি হঠকারীসুলভ একগুঁয়েমির বিষ তার শিরায় শিরায় সঞ্চালিত। এমনকি যারা উদার মনের পরিচয় দিয়ে সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কিছুটা প্রশংসামূলক ভাষাও ব্যবহার করেছেন, তারাও জায়গায় জায়গায় সুচতুর শব্দের আড়ালে এমন মিছরির ছুরি বসিয়ে দিয়েছেন যে, পাঠক ধোকাবাজির দক্ষতা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারেনা। দু'চারটে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এমন অবশ্যই পাওয়া যায়, যাতে রসূল সা. এর বাণী ও কীর্তির আন্তরিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে সব লেখক পাশ্চাত্যবাসীর কাছে খুব কমই কদর পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের একটি উৎকৃষ্টমানের বই প্রকাশিত হলে তাকে "মুসলিম সমর্থক" (Pro-Muhammaden) আখ্যায়িত করে পাশ্চাত্যবাসীর চোখে তার মর্যাদা খাটো করার চেষ্টা চলছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মুসলিম দেশগুলোর সাথে আজকাল পাশ্চাত্যের কূটনৈতিক স্বার্থ জড়িত হওয়া উপলক্ষে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সন্তুষ্টির জন্য কত চেষ্টা তদবীর যে করা হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এ যাবত রসূল সা.-এর ওপর যে অবিচারটা করা হয়েছে, তার প্রতিকারের কথা কোথাও ভেবে দেখা হয়নি।

আপনি আপনার বিবেকের রায়ের বিরুদ্ধে রসূল সা.-এর উপস্থাপিত মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থাকে সমর্থন করুন–এ দাবী আপনার কাছে করা হচ্ছেনা। বিবেকের রায় না পেলে আপনি অবশ্যই দ্বিমত প্রকাশ করুন এবং দৃঢ়তার সাথেই করুন। যে জিনিসটা আপনার কাছে দাবী করা হচ্ছে, সেটা হলো, ইতিহাস ও জীবনী রচনার জন্য আপনার নিজেরই প্রণীত এবং সমর্থিত নীতিমালা ও মাপকাঠি লংঘন করে তথ্য বিকৃত করবেননা। এমন সূত্র থেকে বর্ণনা গ্রহণ করবেন না, যা একদিকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে সর্বসম্মতভাবে অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণযোগ্য এবং যা ঐতিহাসিক গবেষণার সর্বস্বীকৃত মানদন্ডে উত্তীর্ণ নয়। আপনি একটি ঘটনার ভালো কার্যকারণগুলোকে বাদ দিয়ে তদস্থলে ইচ্ছাকৃতভাবে অবাঞ্ছিত কার্যকারণসমূহের উল্লেখ করবেননা। যুক্তি দিয়ে কথা বলুন, অসৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত, অপমানজনক, অভদ্রোচিত, শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক ভংগী অবলম্বন করবেন না।

এ আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কোন অপ্রীতিকর ভাবাবেগজনিত পরিস্থিতি সৃষ্ট করা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো এ যাবত যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার অবসান ঘটানো। এ উদ্দেশ্যের সফলতার পয়লা শর্ত হলো, পাশ্চাত্যকে ইসলাম কুরআন ও মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে আপন দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট করতে হবে এবং একটা নতুন গঠনমূলক মনস্তাত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যা কেবল পাশ্চাত্যবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ঐকমত্যকে উপলব্ধি করা দ্বারাই সম্ভব। যে সব বিষয়ে আমাদের ঐকমত্য রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

– খৃষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান এ তিনটে জাতিই আল্লাহর ইবাদত করে এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে। এদের সকলেরই ইবাদতের পদ্ধতিতে সাদৃশ্য রয়েছে এবং সবারই মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সমান।

– এই তিনটে জাতিরই ধর্মীয় শিক্ষার উৎস ওহী এবং মুসলমানরা সকল নবী ও রসূলকে একই ধর্ম ও একই মহাসত্যের পতাকাবাহী বলে বিশ্বাস করে।

পক্ষান্তরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে ঃ

– পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যে সব ব্যবস্থা করেছে, মুসলমানদের নির্ভেজাল ধর্মীয় দৃষ্টিভংগী সেই উন্নতির সমর্থক। ইসলামী মতাদর্শ স্বীয় সমাজ ও সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি এই বস্তুবাদকে (সীমিত পর্যায়ে) স্থান দিতে পারে, যদিও এ দিক দিয়ে পাশ্চাত্য উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছে। অন্যান্য ধর্ম যেখানে নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, ইসলাম সেখানে একটা পূর্ণাংগ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত উদার।

– গণতন্ত্রের যে সব মূলনীতির ভিত্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাসমূহকে গড়ে তুলেছে, মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় তা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। শুধু বিদ্যমান নয়, বরং ইসলামী সভ্যতাই সর্বপ্রথম সেগুলোকে পূর্ণাংগ রূপ দিয়েছে।* জনপ্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে বিশেষ ও সাধারণ জনগণের সাথে পরামর্শ করা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার, এবং এ সব বিষয়ে সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমানাধিকারকে মুসলমানরা পাশ্চাত্যের অনেক আগে বাস্তবায়িত করেছে। যদিও তা করেছে সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার নিরীখে বিবেচনা করলে এ সমস্যার সমাধানেও মুসলমানদের সহযোগিতাই পাশ্চাত্যের সংস্কারবাদীদের জন্য অধিকতর মূল্যবান। এর কারণ দুটো ঃ প্রথমতঃ পাশ্চাত্য যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ভেবে দেখে, তাহলে দেখতে পাবে যে, বিশ্বশান্তির ব্যাপারে মুসলমানরা যতখানি সহযোগিতা করতে সক্ষম, ততখানি আর কেউ নয়। এ জাতির আকীদা বিশ্বাসে মানব প্রেমের শেকড় যত গভীরভাবে বদ্ধমূল এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতির নৈতিক ভিত্তি এ জাতির মর্মমূলে যত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, ততটা আর কারো নয়। এ জাতির এই দুর্লভ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যকে যদি পুরোপুরিভাবে কার্যে পরিণত হতে দেখা যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব। এক কথায় বলা যায়, ভবিষ্যতের বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার জন্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপাদান কেবল ইসলামই পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বস্তুবাদের দুই চরম রূপ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র—উভয়ের প্রতিরোধ করা এবং

---

* লেবান ও ব্রেফাল্ট অস্ফুট চিত্তে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, গণতন্ত্রের চেতনা ও প্রাণশক্তি মুসলমানদের কাছ থেকেই পাশ্চাত্যে পৌঁছেছে।

একটা মধ্যমপন্থী ন্যায়বিচারমূলক পথে মানবজাতিকে নিয়ে আসার কাজে ইসলাম ও তার অনুসারীদের কাছ থেকেই অধিকতর কার্যকর ভূমিকা আশা করা যায়।

চিন্তা-ভাবনার জন্য এই সর্বসম্মত বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করার পর আমরা এর আলোকে যে কথাটা বলতে চাই তা হলো, পাশ্চাত্যবাসী এখন মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে আপন দৃষ্টিভংগী বদলালে ক্ষতি কী? পাদ্রী ও ওরিয়েন্টালিস্টদের স্থাপিত বিদ্বেষের পর্দাকে ঠেলে ছিঁড়ে ফেলতে তাদের আপত্তি কোথায়? এ যাবত বস্তুবাদী মতবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষাকে একইভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয় এবং এই বিজ্ঞ পাশ্চাত্য জনগোষ্ঠী এমন নতুন বংশধর জন্ম দিচ্ছে না, যার আশায় বুক বেঁধে আরো কিছুদিন কাটিয়ে দেয়া যায়। অপরদিকে ইসলাম ছাড়া অন্য যে সব ধর্ম পৃথিবীতে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই এমন যে, ব্যক্তি জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশে গুটিশুটি হয়ে বসে থাকা পছন্দ করে। সেগুলো সামনে অগ্রসর হয়ে গোটা সভ্যতার লাগাম হাতে নিতে প্রস্তুত নয়। এক কথায় বলা যায়, মানবজাতি আদর্শগত দিক দিয়ে সমস্ত পুঁজি হারিয়ে একেবারেই দেউলে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাত্র উৎস অবশিষ্ট রয়েছে, যেখান থেকে কিঞ্চিৎ আশার আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। মনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেই আলো থেকেও যদি বঞ্চিত হয়ে যাই, তাহলে মংগল গ্রহ থেকে তো কোন পথের দিশা আসবেনা।

তাই এখনো সময় আছে যে, আমরা মুহাম্মদ সা. কে একজন ইতিহাস স্রষ্টা, আর্ত মানবতার ত্রাণকর্তা, একটি সভ্যতার দিশারী এবং একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে মেনে নেই। তাঁর কাছ থেকে যে আলো আসে তার জন্য মনমগজের বাতায়ন খুলে দেই। তাঁকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বুঝবার চেষ্টা করি। ইসলামকে নিছক খৃষ্টবাদের প্রতিদ্বন্দ্বি একটা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হবেনা, বরঞ্চ তাকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অনুরূপ অন্যান্য আদর্শবাদী আন্দোলনগুলোর ন্যায় একটা আন্দোলন এবং এমন একটা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যা গোটা সমাজ ও সভ্যতাকে নিজের আয়ত্বে ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। আর মুহাম্মদ সা. কে এই আন্দোলনের নেতা ও এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মেনে নিতে হবে এবং তার এই কৃতিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে যে, তিনি ইতিহাসের একটা অনন্য সাধারণ ও উজ্জ্বল যুগের উদ্বোধন করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ ও মূলনীতিকে আমাদের এই হিসাবে বিবেচনা করতে হবে যে, তা একটা অত্যাধুনিক বিশ্বরাষ্ট্র পরিচালনায় কতটা সহায়ক ও অপরিহার্য। তাঁর তৈরী করা মানবতার নমুনাকে আমাদের উদ্দেশ্যে যাচাই করে দেখতে হবে যে, তা একটা আদর্শ ও নিখুঁত সভ্যতার হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি হওয়ার জন্য কতখানি মানানসই।

আজ যখন আমাদের সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজমান এবং দূর দূরান্তে কোথাও একটা স্ফুলিংগ পর্যন্ত জ্বলতে দেখা যাচ্ছেনা, তখন পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখি, রসূল সা. এর হাতে একটা মশাল জ্বলছে এবং তা বিগত চৌদ্দ শত বছর ধরে হাজারো ঝড় ঝঞ্ঝায় একইভাবে জ্বলে আসছে। কেবল নিজের তৈরী করা বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষের কারণে এ মশাল থেকে আলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করা ও চোখে পট্টি বেঁধে নেয়ার ফল কি ভালো হতে পারে? মানবজাতিকে ও মানবসভ্যতাকে এই ভয়াল অন্ধকারে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া কি সমীচীন হবে? খুব ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, বিরাজমান পরিস্থিতি আমাদের

সামনে কী সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এবং আমাদের মধ্যে এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার শক্তি আছে কিনা।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, আসল অপরাধী স্বয়ং আমরাই। আমরাই রসূল সা. এর ব্যক্তিত্ব, বাণী ও কৃতিত্ব বিশ্ববাসীকেও জানতে দেইনি, নিজেরাও জানতে চেষ্টা করিনি। তাই আজ রসূল সা. কে নতুন করে পরিচিত করানোর প্রয়োজন। এ কাজটা সম্ভবত আনবিক শক্তি আবিষ্কারের চেয়েও বড় ধরনের কীর্তি হবে।

এই গ্রন্থটি প্রসংগে দুটি কথা

রসূল সা. এর পবিত্র সীরাত বা জীবনীর ওপর উচ্চমানের গ্রন্থাবলী থাকা সত্ত্বেও আমি এই কঠিন কাজে নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও হাত দেয়ার সাহস করেছি শুধু এ জন্য যে, রসূল সা.-এর মহান সত্তা জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধির একমাত্র উৎস হিসাবে আর একবার পরিচিতি লাভ করুক। রসূল সা.-এর জীবনী সম্বলিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীতে ঘটনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু পাঠক কোথাও বর্ণনা সংক্রান্ত মতবিরোধে এবং কোথাও গভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় আটকে যায়। কোথাও ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার যোগসূত্র তার কাছ থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, কোথাও তার সামনে এমন সব খুঁটিনাটি তথ্য হাজির হয়, যার সুস্পষ্ট কোন তাৎপর্য ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সে পায়না। কোথাও তাত্ত্বিক ও গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী এবং সূত্রের আধিক্য দেখে সে আঁতকে ওঠে। অথচ ভলিউম ভলিউম বই পড়েও সে নিজের সামনে একটা উচ্ছ্বসিত আন্দোলন দেখতে পায়না। রসূল সা. এর দাওয়াতের দরুন যে সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার দৃশ্য সে দেখতে পায়না। সে নিজেকে রসূল সা. এর যুগে দেখতে পায়না। সীরাতের পুস্তক পড়ে তার এরূপ অনুভূতি হয়না যে, সেও রসূল সা. এর পরিচালিত আন্দোলনের একটা উত্তাল তরংগ এবং তার চারপাশে বিরাজমান পরিবেশের নোংরামির বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব তার ওপরও অর্পিত। রসূল সা. এর নিয়ে আসা মহাসত্যের জ্বলন্ত মশালকে উঁচু করে রাখা এবং তার আলোকে এতটা বিকশিত করাও তার দায়িত্ব যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জগতে ঐ মশাল যেন একটা প্রদীপ্ত সূর্যে পরিণত হয়। এই অভাবটা পূরণের লক্ষ্যেই এই সামান্য রচনার কাজে হাত দিয়েছি।

ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য আমি কুরআনের দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছি। আমার দৃষ্টিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা পৃথিবী একটা চঞ্চল ও গতিশীল পৃথিবী। ওটা একটা বৈচিত্রময় ও পরিবর্তনশীল পৃথিবী। সর্বোপরি তা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বন্দ্ব সংঘাত, জেহাদ ও লড়াই-এর পৃথিবী। এখানে আকর্ষণ বিকর্ষণ দুইই আছে। এখানে ক্রিয়ার সাথে প্রতিক্রিয়া, ভাংগার সাথে গড়া এবং আলোর সাথে অন্ধকারও রয়েছে। এখানে রাত ও দিন পরস্পরকে ধাওয়া করছে। জীবন ও মৃত্যু, আগুন ও পানি, শীত ও বসন্ত পরস্পরের সাথে যুদ্ধরত। মোট কথা, এই পৃথিবীর যে কোণেই এবং যে জগতেই দৃষ্টি দেবেন, পরস্পর বিরোধী জিনিসগুলোকে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পাবেন। এই মহাবিশ্বের একটা নগন্য ও ক্ষুদ্র জায়গায় (অর্থাৎ পৃথিবী নামক গ্রহে) মানব জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ রণক্ষেত্র অবস্থিত। আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা তরংগবিক্ষুব্ধ

মহাসমুদ্র। এতে ঢেউ এর সাথে ঢেউ, বুদবুদের সাথে বুদবুদ ও বিন্দুর সাথে বিন্দু প্রতি মুহূর্তে টক্কর খাচ্ছে। এখানে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ, যুলুম ও ইনসাফ, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এক দীর্ঘ লড়াই চলছে। এ লড়াই-এর বাগডোর রয়েছে রূহ তথা আত্মা এবং নফ্স তথা কুপ্রবৃত্তির হাতে নিবদ্ধ। আর এই দুই উৎস থেকে রকমারি চিন্তা, বিশ্বাস ও মতবাদ একের পর এক উসারিত হচ্ছে এবং বিচিত্র ধরনের চরিত্র ও পরস্পর বিরোধী স্বভাবের সামষ্টিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটছে। প্রতিটি ধ্যান-ধারণা, আকীদা বিশ্বাস, মতবাদ মতাদর্শ, চরিত্র ও ব্যবস্থা তার ঠিক বিপরীতমুখী সহোদরকে সাথে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। যে শক্তিই জন্ম নিচ্ছে, সে তার বিরোধী ও বিপরীত শক্তিকে সংগে নিয়েই জন্ম নিচ্ছে। এই বিরোধ ও বৈপরিত্য থেকে এমন এক সর্বগ্রাসী সংঘাতের উদ্ভব ঘটছে, যা মানব জতির গোটা ইতিহাসকে একটা সংগ্রামের ইতিহাসে পরিণত করেছে। এই সংগ্রামের ইতিহাস আজ আমাদেরই রক্তে লেখা ইতিহাস হিসাবে আমাদের সামনে বিদ্যমান।

মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে চলে আসছে সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক লড়াই। সে লড়াই কোথাও চলছে যুক্তির অস্ত্র দিয়ে, আবার কোথাও মারণাস্ত্র দিয়ে। এ লড়াইতে মানুষ দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে দুটি ভূমিকা পালন করে আসছে। একদিকে সে অরাজকতা, অন্যায় ও অসত্যের পতাকাবাহী। অপরদিকে সে ন্যায়, সত্য, সততা ও কল্যাণের নিশানবরদার। কখনো সে নাশকতা ও বিকৃতির খলনায়কদের সক্রিয় তল্পিবাহক হয়ে যায়। আবার কখনো গঠনমূলক কাজের আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তাদের জোরদার সমর্থক হয়ে এগিয়ে আসে। মানবজীবনকে দুঃখ দুর্দশা ও বিপদমুসিবতে জর্জরিত করার অপচেষ্টায় আদাপানি খেয়ে লেগে যায় এক ধরনের মানুষরূপী শয়তান। অপরদিকে পৃথিবীকে সুখ শান্তি ও আনন্দে ভরা জান্নাত হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের সমস্ত সহায় সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেয়। জীবন যুদ্ধের একদল মরণপণ সৈনিক এমনও হয়ে থাকে, যাদের হাতে মিথ্যা, যুলুম ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যায়। আবার এক শ্রেণীর আপোষহীন মুজাহিদ সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের বিজয় ডংকা বাজিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায়।

সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের এই লড়াকু সৈনিকরাই পৃথিবীকে কিছুটা বাসযোগ্য ও মানব জীবনকে খানিকটা উপভোগ্য বানিয়েছে। সমাজে আজ যে ক'টি জিনিস কিছুটা সমাদর পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হচ্ছে, তা ঐ সব মহৎ ব্যক্তিরই অবদান। তারা মানুষের সামনে আদর্শ জীবন পেশ করেছে। তাঁরা আমাদের সামনে স্থাপন করেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা মানদন্ড ও মডেল। তাঁরা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে জীবনের সুমহান লক্ষ্য ও চমৎকার নীতিমালা। ইতিহাসের শিরায় শিরায় তাঁরা চিরঞ্জীব ও শাশ্বত ঐতিহ্যের রক্ত সঞ্চালিত করেছে। সভ্যতার আকাশে স্থাপন করেছে নৈতিক মূলবোধের জ্বলজ্বল নক্ষত্ররাজি। তারা মানুষকে দিয়েছে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও উচ্চাভিলাষ। উদ্দেশ্য ও নীতির জন্য তারা দিয়েছে ত্যাগ, কুরবানী, ও সংগ্রামের শিক্ষা। এসব মহৎ ব্যক্তির গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি ও অবদানের জন্যই ইতিহাস এত মূল্যবান হয়েছে যে,তার নিদর্শনাবলী সংরক্ষণের যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য নিত্য নতুন কর্মপ্রেরণার উৎসরূপে সমাদৃত হতে থাকবে।

তাছাড়া যখনই যুলুমবাজ ও মিথ্যাচারী অপশক্তি ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী শাসনের অক্টোপাস বন্ধনে মানুষকে বেঁধে অসহায় করে ফেলেছে এবং মানুষ হিম্মত হারিয়ে হতাশার গভীর খাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তখন ইতিহাসের এই মহানায়কগণই মানবজাতির ত্রাণকর্তা হয়ে এগিয়ে এসেছে। তারা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়েছে, পতিত মানুষকে টেনে তুলেছে, কাপুরুষদেরকে বীরত্বের সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়েছে, এবং অস্ত্র সমর্পণকারীদেরকে নতুন করে রণাঙ্গণের সামনের কাতারে দাঁড় করিয়ে নৈরাজ্যবাদী ও দুর্নীতিবাজ অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। অন্য কথায় বলা যায়, এই মহানায়কগণ ইতিহাসের অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছে, সভ্যতার হীমায়িত সমুদ্রের বরফ গলিয়ে দিয়েছে, চিন্তা ও কর্মের স্থবির নদীতে নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করেছে এবং ইস্পাত কঠিন স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে মানুষের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার পুনর্বহাল করেছে। এভাবে বিশ্বমানবের কাফেলা আত্মবিকাশের সরল ও সঠিক পথ ধরে নির্বিঘ্নে এগিয়ে গেছে।

মানব সমাজের যে পুণ্যবান শ্রেণীটি পৃথিবীতে সত্য ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং গঠন ও উন্নয়নের মহৎ কাজে অংশ নিয়েছে, তার প্রথম কাতারেই রয়েছে অনন্য মর্যাদার অধিকারী নবী ও রসূলগণ। এ ছাড়া সিদ্দীকীন (ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই যারা তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে), শহীদগণ ও সালেহীন তথা সৎ লোকগণ এই প্রথম কাতারের কৃতিত্বেরই অনুগামী এবং তাদেরই নেতৃত্বে কর্মরত। আর নবী ও রসূলগণের পবিত্র কাতারটিতে যে মহান ব্যক্তির ওপর সর্বাগ্রে অবারিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইনি হচ্ছেন ইতিহাসে মানবতার সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সবচেয়ে বড় উপকারী মহামানব। এই মহামানবকে যেদিক দিয়েই পর্যবেক্ষণ করুন, তাঁর রকমারি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। এই মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিতে দিতে বিগত চৌদ্দ শতাব্দীতে কত মানুষ যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজও পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের বিবরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। ভবিষ্যতেও কে এই কাজকে পূর্ণতা দান করতে পারবে কেউ জানেনা। এই মহৎ কাজে শুধুমাত্র অংশগ্রহণের দুর্নিবার আকাংখা অতীতের লোকেরাও পোষণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকে পোষণ করবে। এই দুর্নিবার আকাংখা এক সময় আমাকেও পেয়ে বসলো। মন চাইলো রসূল সা. এর জীবনের এই দিকটা বিশেষভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরি যে, তিনি মানবতার কল্যাণ সাধন ও পুনর্গঠনের জন্য যখন ময়দানে নামলেন তখন তাকে কি ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে হলো, মানবতার এক অতুলনীয় সেবকের সেবার প্রতিদান কিভাবে সারা জীবন অন্ধ বিরোধিতা ও অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের অসদাচরণ দ্বারা দেয়া হলো। আর অপরদিকে এত যুলুম নির্যাতন, বিরোধিতা ও অসদাচরণের তান্ডবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সময় রসূল সা. কী ধরনের চরিত্রের পরিচয় দিয়ে যেতে লাগলেন। প্রিয় নবীর এই মর্মন্তুদ জীবন কাহিনীতে সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্যও শিক্ষণীয় রয়েছে এবং সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রতিরোধকারীদের জন্যও শিক্ষণীয় রয়েছে।

মানবতার ইতিহাসে এই হলো মুহাম্মদ সা. এর স্থান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি সবচেয়ে বড় ইতিহাস স্রষ্টা ছিলেন।

মানব কল্যাণের এই সর্ববৃহৎ কাজ করার জন্য যখন রসূল সা. আবির্ভূত হলেন, তখন সকল নবী ও রসূলের ওপর বিভিন্ন যুগে যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, সেই সমস্ত অত্যাচার নির্যাতনকে শয়তান একত্রিত করলো এবং এই এতীম ও অসহায় যুবককে চতুর্মূখী লড়াই চালাতে বাধ্য করলো। রসূল সা. এর জীবন কাহিনীর দৃশ্য অনেকটা এ রকম, যেন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকা বিহীন এক সাতারু পর্বত প্রমাণ ঢেউ এর সাথে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে। সেখানে প্রচন্ড ঝড় বয়ে চলেছে এবং ঘোর কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশে থেকে থেকে বিদ্যুতের চমকে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। মেঘের গর্জনে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এর মধ্য দিয়েও আপোষহীন সাঁতারু নিজের পথ ধরে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন মর্মান্তিক অত্যাচার ও নির্যাতন এবং এমন আপোষহীন অদম্য সংগ্রামের উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও আছে কি?

হক ও বাতিলের এবং ন্যায় ও অন্যায়ের লড়াই এর নাটক যখনই মঞ্চস্থ হয়, তার মৌলিক চরিত্র সব সময় একই থাকে। সময় বদলে যায়, ভৌগলিক পরিবেশ পাল্টে যায়, এবং নায়কদের নামও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা কখনো পাল্টে না। একটি ভূমিকা হয়ে থাকে দাওয়াত দাতার চরিত্র।

দ্বিতীয় চরিত্রের নায়ক থাকে সমাজের সেই নিখাদ নিষ্ঠাবান ও নিষ্কলুষ মানুষগুলো, যারা সত্য, ন্যায় ও সদাচারের আহ্বান শোনা মাত্রই সে আহ্বানকে নিজেদের সহজাত অভিরুচি দিয়েই চিনতে পারে। সে আহ্বানে তারা পুলকিত ও মুগ্ধ হয়, নির্দ্বিধায় ও সর্বান্তকরণে তা গ্রহণ করে এবং ঐ আহ্বানের প্রথম অনুসারীর ভূমিকা অবলম্বন করে।

তৃতীয় ভূমিকা গ্রহণ করে তারা যারা ভদ্রতার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তারা কথা শোনে, ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। কিন্তু জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং কিছু মনস্তাত্বিক বাধার কারণে সত্যকে বুঝতে দেরী করে ফেলে।

চতুর্থ চরিত্রের নায়ক হয়ে থাকে অত্যন্ত কট্টর ও সোচ্চার দুশমনদের গোষ্ঠী, যারা নিজেদের স্বার্থ, পদমর্যাদা ও বিকৃত আদত অভ্যাসের কারণে প্রথম দিন থেকেই চরম হঠকারী পন্থায় বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তাদের এই বিরোধিতা উত্তরোত্তর কেবল বাড়তেই থাকে। পঞ্চম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে দুর্বল জনসাধারণ, যারা সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর দোর্দন্ড প্রতাপের কাছে এত অসহায় থাকে যে কোন সাহসী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনা। আবার মানসিকভাবেও কোন দাওয়াতের গভীরতম মর্ম উপলব্ধি করার যোগ্যতা রাখেনা। তাই তারা সাধারণত যুগ যুগ ধরে সত্যের আহ্বায়ক ও সত্যের শত্রুদের দ্বন্দ্ব সংঘাতে নীরব দর্শক হয়ে থাকে এবং কোন্ পক্ষের কী পরিণতি হয় তার অপেক্ষায় থাকে। যখন কোন এক পক্ষের জয় হয়, তখন জনতার এই প্লাবন বিজয়ী শক্তির পক্ষেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং হক ও বাতিলের যুদ্ধের নাটকটি দুটো চরিত্রের অভিনেতাদের ওপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ সত্যের আহ্বায়ক ও তার অনুসারীদের ভূমিকা, এবং তার সক্রিয় ও কট্টর বিরোধীদের ভূমিকা। সত্যের দাওয়াতের নাটক মঞ্চস্থ হবে অথচ এই দুটো চরিত্রের অভিনেতারা পরস্পরের মুখোমুখী হবেনা–এটা একেবারেই অসম্ভব। আপনি সত্য ও ন্যায়ের আওয়ায তুলবেন, আর তার জবাবে অসত্য ও অন্যায়ের

পক্ষাবলম্বনকারী শক্তিগুলো সমবেতভাবে রুখে দাঁড়াবেনা–এটা হতেই পারেনা। আপনি মানবতার কল্যাণ ও সেবার জন্য কাজ শুরু করবেন, আর গালিগালাজ, অপবাদ, অপপ্রচার, কুৎসা, ষড়যন্ত্র ও হিংস্রতার ভয়ংকর হাতিয়ারগুলো নিয়ে সমাজের সমস্ত অপশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে আসবেনা– এটা অকল্পনীয়।

রসূল সা.-এর বেলায়ও এটাই ঘটেছে। তিনি যদি কেবল কিছু ভালো ভালো কথা বলতেন, জনকল্যাণের বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, নিজের পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পন্থায় রুকু সিজদা ইত্যাদি করে আল্লাহর ইবাদত করেই জীবন কাটাতেন, নির্জনে নিভৃতে বসে যিকির তাসবীহ করতে থাকতেন, এমনকি ভালো ভালো ওয়ায নসিহতও যদি করতে থাকতেন, পীর-মুরীদীর একটা ফের্কাও গড়ে তুলতেন, এবং নিজের অনুসারীদের নিয়ে একটা অক্ষতিকর সংঘ ইত্যাদি গঠন করেও ফেলতেন, তবে সমাজ তা বরদাশত করতো। কিন্তু তিনি তো সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই পালটে ফেলতে চাইছিলেন। সমাজ ও সভ্যতার গোটা ভবন নতুন করে নির্মাণ করতে চাইছিলেন। গোটা সামষ্টিক ব্যবস্থাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে তাকে সর্বোত্তম নকশা অনুযায়ী নতুন করে নির্মাণ করতে তিনি আদিষ্ট ছিলেন। কায়েমী স্বার্থ ও অধিকারের মধ্যে যে অন্যায় অথচ অটুট সমঝোতা তৎকালীন সমাজে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাকে তছনছ করে দিতে উদ্যত ছিলেন। তিনি মানুষকে একটা নতুন বিশ্বাসগত ও নৈতিক কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি এই কাজেরই দাওয়াত দেন এবং জনগণ তাঁর দাওয়াতের এই অর্থই বুঝেছিল প্রথম দিন থেকেই। আর এই অর্থ বুঝেছিল বলেই এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিয়েছিল জাহেলী সমাজের পাল্টা কর্মকান্ড।

সত্য ও ন্যায়ের সর্বব্যাপী আন্দোলনের বিরোধীদের পর্যালোচনা যে কোন যুগেই করা হোক, দেখা যাবে যে, তাদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কৌশল ও ধারাবাহিকতা সব সময় একই রকম ছিল। সর্বপ্রথম মামুলী ধরনের ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হতো। এরপর পরবর্তী পর্যায়ে গালিগালাজ, মিথ্যা অপবাদ আরোপ, কুৎসা অপপ্রচার, এবং কলংকজনক উপাধি প্রদানের তান্ডব সৃষ্টি করা হতো। তারপর জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট মিথ্যা প্রচারণা শুরু করা হতো। ব্যাপারটা যখন আরো বেড়ে যেত, তখন একদিকে জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি বিপন্ন হবার দোহাই দেয়া হতো, আর অপর দিকে ধর্মীয় অজুহাতে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে উস্কানী সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হতো। এরই ফাঁকে ফাঁকে যুক্তিতর্কের লড়াইও চলতো এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দাওয়াত দাতাকে নাজেহাল করার অভিযানও চলতো। যখন বুঝা গেল যে, একটা বিপজ্জনক আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে, তখন প্রলোভন দ্বারা রফা করার চেষ্টা চালানো হলো। সমস্ত ফন্দি ফিকির ব্যর্থ হতে দেখে হিংস্রতার অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা হলো। রসূল সা. ও তাঁর সহযোগীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করা হলো। জুলুম ও নির্যাতনের চক্রান্তও কার্যকর করা হলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত রসূল সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করা হলো। এরপরও সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে না পারায় যুদ্ধ ঘোষণা করে সম্মুখ সমরের আহ্বান জানানো হলো। রসূল সা.-এর জীবনে এই পর্যায়গুলোর সবই একে একে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রত্যেক পর্যায়েই গৌরবজনকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। অবশেষে সমগ্র আরব রসূল সা.-এর পদতলে এসে যায়।

এ গ্রন্থে রসূল সা.-এর জীবনের ঘটনাবলীকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে এবং যথাযথ ধারাবাহিকতা সহকারে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, ইতিহাসের স্থবিরতা ভংগ করে সত্য ও অসত্যের এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের যে ভয়াবহ লড়াই রসূল সা. সংঘটিত করেন, তার দৃশ্য চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। এ লড়াইতে তাঁর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। আশা করি এ পুস্তক পড়ার সময় পাঠক নিজেকে রসূল সা.-এর খুবই নিকটে আছেন বলে অনুভব করবেন। ঘটনা প্রবাহকে নিজের চোখের সামনেই সংঘটিত দেখতে পাবেন এবং ইসলামী আন্দোলনের উত্তাল তরংগমালাকে নিজের কল্পনার জগতে নৃত্য করতে দেখতে পাবেন। ফলে তিনি হক ও বাতিলের এই সংঘাতের নির্বিকার ও নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারবেন না। বরং তার মধ্যে ইতিবাচক চেতনার উন্মেষ ঘটবে এবং তিনি মানবেতিহাসে নিজের অবস্থান বর্তমানে কী এবং কী হওয়া উচিত, সে কথা ভেবে দেখতে বাধ্য হবেন।

আমার দৃঢ় প্রত্যাশা, এ পুস্তক থেকে সাহসিকতা ও বীরত্বের শিক্ষা অর্জন করা যাবে এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতেও দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রেরণা সঞ্চারিত হবে। অন্তরে সেই মহান ব্যক্তির প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা জন্ম নেবে, যিনি মানবতার সবচেয়ে বড় সেবক ছিলেন, এবং যিনি মানবতার সবচেয়ে বেশী উপকার সাধন করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে হৃদয় আপ্লুত হবে এবং তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসায় মন ভরে ওঠবে। ইসলাম এই জিনিসটাই কামনা করে। এ পুস্তক পড়ে বুঝা যাবে, আজ সত্যের যে আলোতে আমাদের অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত, এই আলোর বাহক যিনি ছিলেন, তিনি কত কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, কত মারাত্মক বিরোধিতার মোকাবিলা করে, কী কী ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং রক্ত ও অশ্রুর কত বড় বড় সাগর পাড়ি দিয়ে তা আমাদের কাছে পৌছাতে পেরেছেন। এ থেকে এই উপলব্ধিও আসবে যে, সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহীদের পথ অত্যধিক কন্টকাকীর্ণ। এ পথ যখন মুহাম্মদ সা.-এর ন্যায় পুণ্যময় ব্যক্তিত্বের জন্যও কন্টকমুক্ত হয়ে কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি, তখন তা আর কার জন্য কুসুমাস্তীর্ণ হবে? এমন আরামদায়ক সংক্ষিপ্ত পথ আর কার জন্য তৈরী হবে যে, মানুষ তার নিরাপদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পায়ে একটু ধুলোও না লাগিয়ে সোজা বেহেস্তে চলে যেতে পারবে? রসূল সা. এর জীবনেতিহাসের মর্মন্তুদ কাহিনীগুলো পড়লে সেই ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যায়। নতুবা মানুষ আল্লাহর আনুগত্যকে পরম আয়েশী কাজ মনে করে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকে। রসূল সা. এর জীবন কাহিনীর আলোকে আমাদের ভাবতে হবে যে, কুরআন হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে যে সব অগ্নিপরীক্ষা, বিপদ মুসিবত, বাধাবিপত্তি আঘাত ও আক্রমণ একজন সত্যিকার মুমিনের জীবনে অনিবার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা যদি আমাদের জীবনে না আসে, তা হলে আমাদের চলার পথ, এবং তার গন্তব্য সঠিক আছে কিনা তা পূনর্বিবেচনা করতে হবে। আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, আমরা যাকে ইসলামের পথ মনে করছি, তা কুফর ও জাহেলিয়াতের পথ নয় তো? এ পুস্তক অধ্যয়ন করে প্রত্যেক মুসলমান আগে থেকে জানতে পারবে যে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন ব্যক্তি বা দল অবিকল রসূল সা. এর দাওয়াত ও আন্দোলন নিয়ে ময়দানে নামবে এবং হুবহু রসূল সা. এর অনুসৃত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবে। তখন তার বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অপবাদ, অপপ্রচার, কুৎসা, ষড়যন্ত্র ও যুলুম নির্যাতন ও হিংসাত্মক আক্রমণ ইত্যাদি না

হয়েই পারেনা। কেননা এগুলো এ কাজের অনিবার্য পার্থিব প্রতিদান। এ সব দুর্যোগ ও বিপদ মুসিবতের পরিপূর্ণ পরিবেশে যে কোন যুগে কর্মরত সত্যের আহ্বায়ককে চেনা, তার কথাকে বুঝা এবং তা মেনে নেয়া সহজ কাজ নয়। এটা কেবল সেই সব ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যারা কুরআন হাদীস ও রসূলের সীরাত অধ্যয়ন করে হক ও বাতিলের চিরন্তন লড়াই এর সঠিক ধারণা আগে ভাগেই লাভ করেছে। প্রত্যেক মুসলমানের জানা উচিত, যে বাতিল শক্তি রসূল সা.-এর ন্যায় নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ সত্তাকে ক্ষমা করেনি, এবং যারা পরবর্তীকালে রসূল সা.-এর অনুসারী ইমাম হোসাইন, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু হানিফা, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর ন্যায় মহান ব্যক্তিবর্গকেও অত্যাচার নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়নি, তারা অন্য কাউকেও ছেড়ে দেবেনা। রসূল সা.-এর সীরাত অধ্যয়ন আমাদেরকে প্রত্যেক যুগে সত্যের আহ্বায়ক ও সত্যের শত্রুদের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। ইসলাম ও কুফরের সংঘাতে যারা সক্রিয় থাকে, তাদের পরিচয় আমি এ পুস্তকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি।

আমি আশা করি, রিসালাতের প্রতি ঈমান ও আমাদের বাস্তব জীবনে যে ভয়ংকর বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়ে গেছে, এই পুস্তক অধ্যয়নে আমরা সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারবো। পৃথিবীতে আজ কোন একটা দেশও এমন অবশিষ্ট নেই, যেখানে রসূল সা. এর আনীত জীবন বিধান পুরোপুরি বিজয়ী ও কার্যকর। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের জয়জয়কার, যা একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াতের অন্ধকারে আমাদেরকে ডুবিয়ে রেখেছে। মানসিকভাবে আমরা আপাদমস্তক জাহেলিয়াতে নিমগ্ন। অর্থনৈতিকভাবেও আমরা পর্যুদস্ত। সাংস্কৃতিকভাবেও আমরা সারা বিশ্বে ভিখারীর জাতি হিসাবে পরিচিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের শিকার। আমাদের ঈমানের সাথে আমাদের চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের এই বিষময় পরিণামই আমরা ভোগ করে চলেছি।

এ গ্রন্থে আমি মূলত বিশ্বনবীর দাওয়াত পুণরুজ্জীবনের আহ্বান জানিয়েছি। হুবহু রসূল সা. প্রদর্শিত কর্মপন্থা অনুসারে আমরা যাতে আমাদের জীবনে পরিবর্তন সূচিত করতে পারি, এবং বিশ্ব মানবতার এই মহান নেতা কোরআন ও হাদীসের নীতিমালার আলোকে যে মহানুভবতা ও সুবিচারপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, সেই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সেটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আজ সেই সময় সমাগত, যখন আমাদের ও আমাদের তরুণ সমাজের পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসিক গোলামীর বোঝা মাথার ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত এবং এই বস্তুবাদী যুগের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয়া উচিত। মুহাম্মদ সা.-এর জীবনীকে পুস্তকের পাতা থেকে বের করে নতুন করে বাস্তব জীবনের পাতায় লিখে দিতে হবে। তাঁর আদর্শকে একটা সমষ্টিক ব্যবস্থার আকারে সংকলিত করতে হবে এবং মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী সেই তৃতীয় শক্তির অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে, যার স্থান ইতিহাসে এখনো শূন্য রয়েছে।

দয়াময় আল্লাহ আমার এ নগণ্য চেষ্টা কবুল করুন এবং এর মহৎ উদ্দেশ্য সফল করুন। আমীন

নঈম সিদ্দীকী, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

২

※

এক নজরে
ব্যক্তিত্ব

※

وَاِذَانَظَرْتُ اِلَى اَسِرَّةِ وجْهِهِ
بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ

যখন বুলাই তাঁর মুখমন্ডলে দু'চোখ,
সেযেনো বর্ষামুখী মেঘে বিদ্যুতের চমক।[১]
–আবু কবীর হুযালী

এ চেহারা হতে পারেনা কোনো মিথ্যাবাদী লোকের।
–আবদুল্লাহ ইবনে সালাম

---

[১] জাহেলী যুগের এই বিখ্যাত আরব কবি এই কবিতাটি তার এক প্রীতিভাজন ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে রচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময় কোন এক প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) এটি রসূল (সা) এর ওপর যথার্থ প্রয়োগ করেন।

এক ঝলক [২]

পৃথিবীতে যারা বড় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, বিশেষত নবীগণ আ., তারা সর্বদাই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন। আন্দোলনের নেতৃত্বদান এবং সভ্যতার পুনর্নির্মাণে নেতৃত্বদানকারীদের শক্তির আসল উৎস হয়ে থাকে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা ও চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত তাঁদের ব্যক্তিসত্তা। রসূল সা.-এর ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করাও তাঁর সীরাত অধ্যয়নের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য।

যে কোন ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তার দৈহিক সৌন্দর্য অনেক সাহায্য করে। মানুষের আপাদমস্তক দেহের গঠন এবং তার অংগ প্রত্যংগের সুঠামতা দ্বারা বুঝা যায় সে মানসিক, নৈতিক ও চেতনাগত দিক দিয়ে কোন স্তরের মানুষ। বিশেষত চেহারা বা মুখমন্ডলে মানবীয় চরিত্র ও কীর্তিকলাপের সমস্ত ইতিবৃত্ত লেখা থাকে। তার ওপর একটা দৃষ্টি দিলেই আমরা ওটা কোন্ ধরনের মানুষের চেহারা তা আঁচ করতে পারি।

আমরা যারা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে এসেছি, তারা এদিক দিয়ে ভাগ্যাহত যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটির অনুপম চেহারা আমাদের সামনে নেই এবং তা চর্মচক্ষু দিয়ে এ জগতে দর্শনের সুযোগও পাবনা। আমরা রসূল সা. এর দৈহিক সৌন্দর্যের যে টুকু ঝলক দেখতে পাই, তা কেবল তাঁর বাণী ও কীর্তির দর্পণেই দেখতে পাই।

রসূল সা. এর কোন প্রকৃত ছবি বা মূর্তি নেই। স্বয়ং রসূল সা. ওসব বানাতে ও রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা ছবি এত বিপজ্জনক জিনিস যে তা শেরকে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকি কোনভাবেই রোধ করেনা। রসূল সা. এর কোন ছবি যদি থাকতো, তাহলে তাঁকে যে কত অলৌকিক কর্মকান্ডের উৎস মনে করা হতো এবং নতুন নতুন কত মোজেযার কৃতিত্ব তাকে দেয়া হতো, তার ইয়ত্তা নেই। এর সম্মানে কত যে রং বেরং এর অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হতো তা কল্পনা করাও কঠিন। এমনকি তার পূজা শুরু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিলনা। ইউরোপে রসূল সা. এর কাল্পনিক ছবি অনেক বানানো হয়েছে। কিন্তু এমন শিল্পী কে আছে যে, রসূল সা. এর চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি দিকের সূক্ষ্ম ব্যাপক ও পূর্ণাংগ ধারণা

---

২. প্রধানতঃ শামায়েলে তিরমিযীর আলোকে রচিত।

রাখে এবং সেই ধারণাকে রংতুলি দিয়ে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে? কাল্পনিক ছবি আর যারই হোক, মুহাম্মদ সা. এর নয়। কোন অনুমান সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের ছবি বানিয়ে তাকে রসূল সা. এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। এ সব ছবি তৈরী করার সময় বিন্দুমাত্র সততার ও পরিচয় দেয়া হয়না। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ছবি তৈরী করা হয়, যা দ্বারা এক দুর্বলও অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের ধারণা জন্মে। এসব ছবি তৈরী করার জন্য ব্যক্তিত্বের ধারণা নেয়া হয় পাশ্চাত্যেরই সেই সব বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তকাদি থেকে, যা গোয়ার্তুমি, হঠকারিতা, বক্রচিন্তা ও অবাস্তব ধারণার ফলশ্রুতি। নবীগণ ও পুন্যবান ব্যক্তিগণের ছবি বা চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষতি এটাই যে, তাদের আসল চরিত্র পর্দার আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু রসূল সা. এর সাহাবাগণ ন্যূনতম শব্দের মাধ্যমে তাঁর নিখুঁত ছবি এঁকে দিয়েছেন এবং সেই বর্ণনাগুলোকে বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এখানে আমরা সেই শাব্দিক চিত্রগুলোকে তুলে ধরছি, যাতে পাঠকগণ এই মহামানবের চরিত্র অধ্যয়নের আগে তাঁর ব্যক্তিসত্তার একটা ঝলক দেখে নিতে পারেন। একে এক ধরনের সাক্ষাতও বলা যেতে পারে, কিংবা পরিচিতিও বলতে পারেন।

রসূল সা. এর পবিত্র মুখমন্ডল, তাঁর দৈহিক গঠন, চালচলন ও সৌন্দর্যের যে ছাপ চৌদ্দশো বছরের দূরত্ব পেরিয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা এমন একজন মানুষের ভাবমূর্তি প্রতিফলিত করে, যিনি একাধারে অত্যন্ত উচ্চাংগের মেধাবী ও বুদ্ধিমান, সাহসী বীর, ধৈর্যশীল, আদর্শে অবিচল, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, উদার ও মহানুভব, দাতা, দায়িত্ব সচেতন, বিনয়ী ও ভাবগম্ভীর এবং প্রিয়ভাষী ও শুদ্ধভাষী ছিলেন। আরো সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, তাঁর দৈহিক কাঠামোতে নবুয়্যতের ছাপ অনেকটা লক্ষ্যণীয় ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁর সুদর্শন দেহ সৌষ্ঠব তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রতীক ছিল। এ প্রসংগে রসূল সা. এর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

"খোদাভীতি মানুষের চেহারাকে উজ্জ্বল ও সুন্দর করে।"

নবুয়্যত যখন ঈমান ও খোদাভীতির সর্বোচ্চ স্তর, তখন নবীর চেহারা আলোকময় না হয়েই পারেনা।

এবার আসুন, তাঁর সূর্য জ্যোতিসম চমকপ্রদ চেহারার একটু ঝলক দেখে নেয়া যাক।

দৈহিক সৌন্দর্য

"আমি রসূল সা. কে দেখেই চিনে ফেলেছিলাম। তাঁর চেহারা একজন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারেনা।" (আব্দুল্লাহ বিন সালাম)[৩]

"আমি আমার ছেলেকে সাথে নিয়ে হাজির হলাম। লোকেরা দেখিয়ে দিল ঐ যে, আল্লাহর রসূল। কাছে গিয়ে বসামাত্রই আমি মনে মনে বললাম, যথার্থই ইনি আল্লাহর

৩. ইনি ইহুদীদের একজন মস্ত বড় আলেম ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হ্যসীন। রসূল সা. মদীনায় এলে ইনি তাঁকে দেখতে যান এবং দেখতে গিয়ে তার যে ধারণা জন্মে সেটাই তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈমান আনলেন এবং তার ইসলামী নাম হলো আবদুল্লাহ। (সীরাতুল মুস্তাফা, মাওলানা ইদ্রীস কান্দুলভী। প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৪১–৩৫০)

নবী।"–আবু রামছা তাইমী

"নিশ্চিন্ত থাকো, আমি এই ব্যক্তির পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা দেখেছি। তিনি কখনো তোমার সাথে লেনদেনে অসততা করতে পারেননা। এ ধরনের মানুষ যদি (উটের মূল্য) না দেয়, তবে আমি নিজের কাছ থেকে দিয়ে দেব।"–জনৈক ভদ্র মহিলা[৪]

"আমরা এমন সুদর্শন মানুষ আর দেখিনি। আমরা ওর মুখ থেকে আলো বিকীর্ণ হতে দেখেছি।"–আবু কারসানার মা ও খালা[৫]

"রসূল সা. এর চেয়ে সুদর্শন কাউকে আমি দেখিনি। মনে হতো যেন সূর্য ঝিকমিক করছে।"–আবু হুরায়রা

"তুমি যদি রসূল সা. কে দেখতে, তবে তোমার মনে হতো যেন সূর্য উঠেছে।"–রবী বিনতে মুয়াওয়ায

"রসূল সা. কে যে দেখতো, সে প্রথম দৃষ্টিতেই হতভম্ব হয়ে যেতো। "–হযরত আলী

"আমি একবার জ্যোৎস্না রাতে রসূল সা. কে দেখছিলাম। তিনি তখন লাল পোশাকে আবৃত ছিলেন। আমি একবার চাঁদের দিকে আর একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, রসূল সা. চাঁদের চেয়েও সুন্দর।"–হযরত জাবের বিন সামুরা

"আনন্দের সময় রসূল সা. এর চেহারা চাঁদের মত ঝকমক করতো। এটা দেখেই আমরা তার আনন্দ টের পেতাম।"–কা'ব বিন মালেক

"তাঁর চেহারায় চাঁদের মত চমক ছিল।"–হিন্দ বিন আবি হালা

মুখমণ্ডল

"পূর্ণিমার চাঁদের মত গোলাকার।"–বারা বিন আযিব

"তাঁর মুখমণ্ডল পুরোপুরি গোলাকার ছিলনা। তবে প্রায় গোলাকার।"–হযরত আলী

"প্রশস্ত কপাল, বাঁকানো, চিকন ও ঘন ভ্রূ, উভয় ভ্রূ আলাদা, উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটা উঁচু রগ ছিল, রাগান্বিত হলে এই রগ স্পষ্ট হয়ে উঠতো।"–হিন্দ বিন আবি হালা

"কপালে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠতো।"–কা'ব ইবনে মালেক

বর্ণ

চুনের মত সাদাও নয়, শ্যাম বর্ণেরও নয়। গমের মত রং, তবে একটু সাদাটে।"–হযরত

---

[৪] একটা বাণিজ্যিক কাফেলা এসে মদীনার উপকণ্ঠে যাত্রা বিরতি করেছিল। ঘটনাক্রমে রসূল (সা) সেদিকে গিয়েছিলেন। তিনি একটা উট বাছাই করে দামদস্তুর ঠিক করলেন। অতপর এই বলে উটটা নিয়ে গেলেন যে, দাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে উট বিক্রেতাদের মনে খটকা লাগলো, একজন অচেনা লোককে বাকীতে উট দিয়ে কেমন কাজ করলাম। এসময় কাফেলার নেতার স্ত্রী তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য উপরোক্ত কথা বলে। এ ঘটনা ঐ কাফেলার সদস্য তারেক বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন। এর কিছুক্ষণ পরই রসূল (সা) নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী পরিমাণে খেজুর পাঠিয়ে দিলেন। (সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮০ আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৪।

[৫] এই মহিলাদ্বয় আবু কারসানার সাথে রসূল (সা) এর কাছে বায়আতের (অংগীকার প্রদান) জন্য গিয়েছিলেন। ফিরতি পথে তাঁরা এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৫)।

আনাস

"লালচে সাদা।"–হযরত আলী
" সাদা, তবে লাবন্যময়।"–আবুত্ তোফায়েল
"সাদা দীপ্ত।"–হিন্দ বিন আবি হালা
"শরীরটা যেন রূপার তৈরী।"–হযরত আবু হুরায়রা

চোখ

"কালো চোখ, লম্বা পলক।"–হযরত আলী
" চোখের মণি কালো, দৃষ্টি আনত, চোখের কিনার দিয়ে দেখার সলজ্জ প্রবণতা।"–হিন্দ বিন আবি হালা
" চোখের সাদা অংশে লাল রেখা, লম্বা কোটর, জন্মগত সুর্মা মাখা।"–জাবের বিন সামুরা

নাক

"খানিকটা উঁচু, তার ওপর জ্যোতির্ময় চমক– এ জন্য প্রথম দৃষ্টিতে বড় মনে হয়।"–হিন্দ বিন আবি হালা

গাল

"হালকা ও সমতল, নীচের দিকে একটু মাংসল।"–হিন্দ বিন আবি হালা

মুখ

"প্রশস্ত" ।–জাবের বিন সামুরা
"প্রশস্ত।"–হিন্দ বিন আবি হালা

দাঁত

"চিকন, চকচকে। সামনের দাঁতে মোহনীয় ঔজ্জল্য।"–হযরত ইবনে আব্বাস
তিনি যখন কথা বলতেন, তখন দাঁত দিয়ে চমক ফুটে বেরুতো।"–হযরত আব্বাস

দাড়ি

"মুখভরা ঘন দাড়ি।"–হিন্দ বিন আবি হালা

ঘাড়

"পাতলা ও লম্বা যেন মূর্তির মত সুন্দরভাবে কেটে বানানো।"
"ঘাড়ের রং চাঁদের মত উজ্জ্বল ও মনোরম।"–হিন্দ বিন আবি হালা

মাথা

"বড়–তবে সুষম মধ্যম আকৃতির।"–হিন্দ বিন আবি হালা

চুল

ঈষৎ কোঁকড়ানো।"– আবু হুরায়রা
"একেবারে সোজাও নয়, খুব বেশী কোঁকড়ানোও নয়।"–কাতাদা
"সামান্য কোঁকড়ানো।"–হযরত আনাস
"ঘন–কখনো কখনো কানের লতি পর্যন্ত লম্বা। কখনো ঘাড় পর্যন্ত।"–বারা বিন আযেব
"মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা।"–হিন্দ বিন আবি হালা

"শরীরে বেশী লোম ছিলনা। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের চিকন রেখা।"–হযরত আলী ও হিন্দ বিন আবি হালা
"ঘাড়, বাহু ও বুকের ওপরের অংশে সামান্য কিছু লোম।"–হিন্দ বিন আবি হালা

সামগ্রিক দেহ কাঠামো

"শরীরটা ছিল মজবুত গঠনের। অংগ প্রত্যংগের জোড়ের হাড় বড় ও শক্ত।"–হিন্দ বিন আবি হালা
"শরীর মোটা ছিলনা।"–হযরত আলী
"শরীর বেশী লম্বাও নয়, খাটোও নয়, মধ্যম।"–হযরত আনাসঃ
"শরীর কিছুটা লম্বা। অনেক লোকের মধ্যে দাঁড়ালে তাকে অধিকতর লম্বা মনে হতো।"–বারা বিন আযেব
"পেট উঁচু ছিলনা।"–উম্মে মা'বাদ
"পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যে লালিত লোকদের চেয়ে (ক্ষুধা ও দারিদ্র ভোগ করা সত্তেও) তরতাজা ও শক্তিশালী ছিলেন।"[৬] –আল মাওয়াহেব ১ম খন্ড ৩১০ পৃষ্ঠা
"আমি রসূল সা. এর চেয়ে শক্তিশালী আর কাউকে দেখিনি।"–ইবনে উমার[৭]

কাঁধ ও বুক

"বুক প্রশস্ত, বুক ও পেট সমতল।"–হিন্দ বিন আবি হালা
"বুক প্রশস্ত।"–বারা বিন আযেব
"দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ সাধারণ মাপের চেয়ে বেশী।"–হিন্দ বিন আবি হালা, বারা বিন আযেব
" দুই কাঁদের মধ্যবর্তী অংশ মাংসল।"–হযরত আলী

হাত ও বাহু

"বাহু লম্বা, হাতের তালু প্রশস্ত, আংগুলগুলো মানানসই লম্বা।"–হিন্দ বিন আবি হালা
"রেশমের পাতলা বা ঘন কাপড় বা অন্য কোন জিনিস এমন দেখিনি, যা রসূল সা. এর হাতের চেয়ে কোমল।"–হযরত আব্বাস

পদযুগল

"পায়ের থোড়া মাংসল ছিলনা, ছিল হালকা ও চুপসানো।"–জাবের বিন সামুরা
"হাতের পাতা ও পায়ের পাতা মাংসল ছিল। পায়ের তলা কিঞ্চিৎ গভীর। পায়ের পাতা এত পাতলা যে, তাতে পানিই দাঁড়ায়না।" –হিন্দ বিন আবি হালা
"পায়ের গোড়ালিতে গোশত খুবই কম।"–জাবের বিন সামুরা

---

৬. এ ঘটনা সুখ্যাত যে, ওমরা করতে গিয়ে রসূল (সা) একাই একশো উট হাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার মধ্য থেকে ৬৩টি স্বহস্তে জবাই করেন। বাকীগুলো হযরত আলীর হাতে অর্পণ করেন।

৭. মক্কায় রুকানা নামক একজন পেশাদার কুস্তিগীর ছিল। একবার রসূল (সা) তার সাথে দেখা করে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে নবুয়তের প্রমাণ চায়। রসূল (সা) তার রুচি অনুযায়ী তার সাথে কুস্তী লড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তার সাথে তিনবার কুস্তী হয় এবং তিনবারই তিনি তাকে হারিয়ে দেন। এ ছাড়া আবুল আসওয়াদ জুহমীসহ আরো কয়েকজনকেও তিনি কুস্তী লড়াইতে হারিয়ে দিয়েছেন। (হাকেম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাকী, আল–মাওয়াহিবুল লাহন্নিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩, ৩০৩)

একটা সামগ্রিক ছবি

যদিও রসূল সা. এর বহু সংখ্যক সাহাবী রসূল সা. সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু উম্মে মাবাদের বিবরণের কোন তুলনা নেই। সুর পর্বতের গুহা থেকে যখন রসূল সা. মদীনায় হিজরত করার জন্য রওনা দিলেন, তখন প্রথম দিনই খুযায়া গোত্রের এই মহিয়সী বৃদ্ধার বাড়ীতে যাত্রা বিরতি করেন। রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা নিদারুণ তৃষ্ণা কাতর ছিলেন। আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে বৃদ্ধার জরাজীর্ণ ক্ষুধার্ত বকরী এ সময় এত দুধ দিল যে, রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা পেটপুরে খাওয়ার পর আরো খানিকটা দুধ অবশিষ্ট রইল। উম্মে মা'বাদের স্বামী বাড়ী ফিরে দুধ দেখে অবাক হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলো, এ দুধ কোথা থেকে এল। উম্মে মাবাদ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন তার স্বামী বললো, এই কুরাইশী যুবকের আকৃতির বিবরণ দাও তো, সে সেই বহুল প্রত্যাশিত ব্যক্তি কিনা দেখি। তখন উম্মে মাবাদ চমৎকার ভাষায় তার একটি বিবরণ দিল। উম্মে মাবাদ তখন রাসূল সা. কে চিনতোনা, তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষও পোষণ করতোনা। সে যা দেখেছে, হুবহু তা বর্ণনা করেছে। এই বর্ণনাটা আসল আরবীতে দেখে নেয়া উত্তম।[৮] এখানে তার অনুবাদ দিচ্ছি ঃ

> "পবিত্র ও প্রশস্ত মুখমন্ডল, প্রিয় স্বভাব, পেট উঁচু নয়, মাথায় টাক নেই, সুদর্শন, সুন্দর, কালো ও ডাগর ডাগর চোখ, লম্বা ঘন চুল, গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বর। উঁচু ঘাড়, সুর্মা যুক্ত চোখ, চিকন ও জোড়া ভ্রু, কালো কোকড়ানো চুল। নীরব গাম্ভীর্য, আন্তরিক, দূর থেকে দেখলে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। নিকট থেকে দেখলে অত্যন্ত মিষ্ট ও সুন্দর। মিষ্টভাষী, স্পষ্টভাষী, নিস্প্রয়োজন শব্দের ছড়াছড়ি থেকে মুক্ত কথাবার্তা। সমস্ত কথাবার্তা মুক্তার হারের মত পরস্পরের সাথে যুক্ত। মধ্যম ধরনের লম্বা, ফলে কেউ তাকে ঘৃণাও করেনা, তাচ্ছিল্যও করেনা। সুদর্শন, তরুণ, সর্বক্ষণ সাহচর্য দানকারীদের প্রিয়জন। যখন সে কিছু বলে সবাই নীরবে শোনে, যখন সে কোন নির্দেশ দেয়, তৎক্ষণাত সবাই তা পালন করতে ছুটে যায়। সকলের সেবা লাভকারী, সকলের আনুগত্য লাভকারী, প্রয়োজনের চেয়ে স্বল্পভাষীও নয়; অমিতভাষীও নয়।"[৯]

পোশাক

পোশাক দ্বারাও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হয়। পোশাকের সাইজ, দৈর্ঘ, প্রস্থ, রং, মান পরিচ্ছন্নতা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিশেষত্বের পোশাক পরিহিত ব্যক্তি কেমন চরিত্র ও মানসিকতার অধিকারী তা জানিয়ে দেয়। রসূল সা. এর পাশাক সম্পর্কে তাঁর সাহাবীগণ যে তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে রসূল সা.-এর রুচি ও মানসিকতা অনেকটা প্রকাশ পায়। রসূল সা. আসলে পোশাক সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা পেশ করেছেন ঃ

يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى وَذَالِكَ خَيْرٌ.

---

৮. দেখুন যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৭।
৯. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৭।

"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের লজ্জা স্থান আবৃতকারী এবং তোমাদের সৌন্দর্য উৎপন্নকারী পোশাক নির্ধারণ করেছি। তবে খোদাভীতির পোশাকই উত্তম।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২৬)

পোশাকের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সূরা আন নাহলে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ

"তিনি তোমাদেরকে গরম থেকে বাঁচানো ও যুদ্ধে নিরাপদে রাখার জন্য জামা ও বর্ম সরবরাহ করেছেন।" (সূরা আন নহল)

সুতরাং রসূল সা. এর পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এইযে, তা লজ্জা নিবারক ছিল, সৌন্দর্য উৎপন্নকারী ছিল এবং তাকওয়া তথা খোদাভীতি ও সততার পোশাক ছিল। এতে প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাও ছিল, চারিত্রিক নীতিমালার আনুগত্যের নিশ্চয়তাও ছিল এবং ভদ্রজনোচিত রুচির প্রতিফলনও ছিল। রসূল সা. দাম্ভিকতা, জাঁকযমক, বিলাসিতা ও লোক দেখানোর মানসিকতা কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতেন। তিনি বলেছেন ঃ

"আমি আল্লাহর একজন দাস মাত্র এবং বান্দাদের উপযোগী পোশাকই পরি।"[১০] রেশম জাতীয় পোশাককে তিনি পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। একবার উপহার স্বরূপ পাওয়া রেশমী জামা পরেছিলেন। কিন্তু অস্থিরতার সাথে তৎক্ষণাত তা খুলে ফেললেন। জামা, লুংগী ও পাগড়ী বেশী দীর্ঘ হওয়া অহংকারের আলামত ছিল এবং এ ধরনের পোশাক পরার প্রথা দাম্ভিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বিধায় এটাকে তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন।[১১]

অন্যান্য জাতির পোশাক বিশেষত তাদের ধর্মীয় যাজক শ্রেণীর নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকের অনুকরণ করাকেও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন।[১২] উম্মতের স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধ যাতে বহাল থাকে এবং পোশাক ও ফ্যাশনের অনুকরণ করতে গিয়ে চরিত্র ও আদর্শের অনুকরণও শুরু হয়ে না যায়, সে জন্যই তিনি এরূপ নিষেধজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ জন্য তিনি ইসলামী সংস্কৃতির আওতাধীন বেশভুষা, ফ্যাশন ও কৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক রুচির প্রচলন করেন। পোশাকে আবহাওয়াগত নিরাপত্তা, লজ্জা নিবারণ, সরলতা পরিচ্ছন্নতা ও গাম্ভীর্য কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে দিকে রসূল সা. বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। রসূল সা. এর পোশাককে আমরা যদি সমকালীন সাংস্কৃতিক ধারা, আরবের ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও আবহাওয়াগত প্রয়োজন এবং প্রচলিত রীতিপ্রথার প্রেক্ষাপটে দেখি, তাহলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ঐ পোশাক ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের রুচির প্রতীক। এবারে আসুন দেখা যাক রসূল সা. এর পোশাক কেমন ছিলঃ[১৩]

---

১০. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া– ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৮।

১১. আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ।

১২. মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ।

১৩. শামায়েলে তিরমিযী, যাদুল মায়াদ ও আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া দ্রষ্টব্য।

তিনি জামা খুবই পসন্দ করতেন। জামার আস্তিন (হাতা) বেশী চাপাও হতোনা, বেশী ঢিলাও হতোনা। মধ্যম ধরনের হতো। আস্তিন কখনো কনুই পর্যন্ত এবং কখনো কবজি পর্যন্ত লম্বা হতো। প্রবাসে নিবশেষত জেহাদের সফরে যাওয়ার সময় যে জামা পরতেন, তার দৈর্ঘ ও আস্তিনের দৈর্ঘ অপেক্ষাকৃত কম হতো। সামনের দিকে বুকের ওপর জামার যে অংশটা থাকতো, তা আবহাওয়াগত প্রয়োজনে খোলাও রাখতেন এবং ঐ অবস্থায় নামাযও পড়তেন। জামা পরার সময় প্রথমে ডান হাত ও পরে বামহাত ঢুকাতেন। সাহাবীগণকেও এটাই শিক্ষা দিতেন। ডান হাতের অগ্রাধিকার এবং ভালো কাজে ডান হাতের ব্যবহার রসূলের সা. শেখানো কৃষ্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

লুংগি সারা জীবনই ব্যবহার করতেন। এটা নাভির সামান্য নীচে রাখতেন এবং টাখনুর সামান্য ওপর পর্যন্ত পরতেন। সামনের অংশ ঈষৎ নামানো থাকতো।

পাজামা প্রথম দেখেই পসন্দ করে ফেলেন। সাহাবীগণ পরতেন। একবার নিজে কিনেছিলেন। (পরেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ আছে।) সেটি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। পাজামা খরিদ করার ঘটনাটা বেশ মজার। হযরত আবু হুরায়রা রা. কে সাথে নিয়ে রসূল সা. বাজারে গেলেন এবং পোশাক বিক্রেতাদের দোকানে উপস্থিত হলেন। চার দেরহাম দিয়ে পাজামাটা কিনলেন। বাজারে পণ্য দ্রব্যাদি মেপে দেখার জন্য একজন বিশিষ্ট ওযনকারী ছিল। তার কাছে পাজামাটা ওযন করাতে নিয়ে গেছেন এবং বললেনঃ 'এটি ঝুকিয়ে ওযন কর।' (অর্থাৎ প্রকৃত ওযনের চেয়ে বেশী হয়, এমনভাবে ওযন কর।) ওযনকারী বললো, এমন কথা আমি আর কাউকে বলতে শুনিনি। হযরত আবু হুরায়রা রা. তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেনঃ 'তুমি কি তোমার নবীকে চেননা?" লোকটি তৎক্ষণাত তাঁর হাতে চুমো খেতে এগিয়ে গেলে তিনি বাধা দিলেন এবং বললেনঃ এটা অনৈসলামিক পদ্ধতি।" যাহোক, তিনি পাজামাটা ওযন করিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এটা পরবেন? তাঁর অবাক হওয়ার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, একেতো প্রাচীন অভ্যাসের এমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ পাজামা ছিল পারস্যদেশীয় পোশাক। অথচ রসূল সা. বিজাতীয় সবকিছু এড়িয়ে চলতেন। (অবশ্য অন্যান্য জাতির সংস্কৃতির ভালো উপাদানকে গ্রহণ করতেন।) রসূল সা. বললেনঃ "হাঁ, পরবো। স্বদেশে,বিদেশে, দিনে কিংবা রাতে–সর্বাবস্থায় পরবো। কেননা আমাকে ছতর ঢাকার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং পাজামার চেয়ে ভালো ছতর ঢাকা পোশাক আর কোনটাই নেই।"১৪.

মাথায় পাগড়ি পরতে খুবই ভালোবাসতেন। পাগড়ি খুব বড়ও হতোনা, খুব ছোটও হতোনা। এক বর্ণনা অনুসারে পাগড়ি ৭ গজ লম্বা হতো। পাগড়ির লেজ পেছনের দিকে এক বিঘাত ছেড়ে দিতেন। কখনো কখনো রৌদ্রের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাগড়ি এবং লেজ চওড়া করে মাথার ওপর ছড়িয়ে দিতেন। আবহাওয়ার প্রয়োজনে কখনো কখনো পাগড়ির শেষ বৃত্ত খুলে ঘাড়ের চার পাশে জড়িয়ে নিতেন। কখনো পাগড়ি

---

১৪. আল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া, প্রথম খন্ড, পৃ ৩৩৬–৩৩৭।

না থাকলে একটা বড় রুমাল মাথায় বেঁধে নিতেন।[১৫] পরিচ্ছন্নতার খাতিরে পাগড়িকে তেলচিটা থেকে রক্ষা করার জন্য পাগড়ির নীচে চুলের ওপর একটা বিশেষ কাপড় ব্যবহার করতেন, যার আরবী নাম 'কান্না'। আজ কালও অনেকে টুপির নীচে কাগজ বা সেলোলাইডের একটা টুকরা ব্যবহার করে থাকে। এই টুকরায় তেলচিটা লাগতো ঠিকই। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এত সচেতন ছিলেন যে, বিভিন্ন বর্ণনা মতে এই টুকরাটাকে কেউ কখনো ময়লা দেখেনি। সাদা ছাড়া কখনো কখনো হলুদ, (খুব সম্ভবত মেটে রং বা ছাই রং) পাগড়িও পরতেন। মক্কা বিজয়ের সময় কালো পাগড়িও ব্যবহার করেছেন। পাগড়ির নীচে কাপড়ের টুপিও ব্যবহার করতেন এবং তা পছন্দ করতেন। কোন কোন বর্ণনা মতে, টুপির সাথে পাগড়ির এ ব্যবহার ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং রসূল সা. এ স্টাইলকে মোশরেকদের মোকাবিলায় বিশেষ ফ্যাশন বলে ঘোষণা করেন।

পাগড়ি ছাড়া কখনো কখনো শুধু সাদা টুপিও ব্যবহার করতেন। ঘরোয়া ব্যবহারের টুপি মাথার সাথে লেগে থাকতো। আর প্রবাসে যে টুপি পরতেন তা হতো অপেক্ষাকৃত উঁচু। ঘন সেলাই করা কাপড়ের সূচাঁলো টুপিও পরতেন।

চার গজ লম্বা ও সোয়া দুগজ চওড়া চাদর পরতেন। কখনো তা গায়ে জড়িয়ে নিতেন, কখনো এক পাশ সোজা বগলের মধ্য দিয়ে বের করে উল্টো কাঁধের ওপর নিয়ে রাখতেন। এই চাদর দিয়ে কখনো কখনো বসা অবস্থায় পা জড়িয়ে রাখতেন, আবার কখনো কখনো তা ভাঁজ করে মাথার নীচে বালিশের মত ব্যবহার করতেন। অভিজাত সাক্ষাত প্রার্থীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যও কখনো কখনো চাদর বিছিয়ে দিতেন। জাবারা নামক ইয়ামানী চাদর খুবই পছন্দ করতেন। এতে লাল বা সবুজ ডোরা থাকতো। একবার রসূলের সা. জন্য কালো চাদর (সম্ভবত পশমী) বানানো হয়। সেটা পরলে ঘামের জন্য দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। তাই পরিচ্ছন্নতার জন্য তা আর পরেননি।

নতুন কাপড় সাধারণত শুক্রবারে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর সহকারে পরতেন। পোশাকের বাড়তি সেট বানিয়ে রাখতেন না। কাপড়ে তালি লাগাতেন, মেরামত করতেন। সতর্কতার জন্য মাঝে মাঝে গৃহে তল্লাশী চালাতেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে ওঠাবসার কারণে কোন উকুন বা ছারপোকা চলে এলো কিনা। (নামাযের জামায়াতে এবং বৈঠকাদিতে মাঝে মাঝে অপরিচ্ছন্ন লোকেরাও আসতো। এই অপরিচ্ছন্নতার সাধারণ মানও একাধারে বহু বছর চেষ্টার পরই তিনি খানিকটা উন্নত করতে পেরেছিলেন।)

একদিকে দারিদ্র ও সরলতা তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। অপর দিকে বৈরাগ্যবাদ প্রতিরোধ করাও তাঁর দায়িত্ব ছিল। আবার কোন এক সচ্ছল ব্যক্তিকে অতি মাত্রায় গরীবের মত জীবন যাপন করতে দেখেই বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার জীবনে তাঁর দেয়া নিয়ামতের প্রভাব প্রতিফলিত হোক– এটা ভালোবাসেন।[১৬] এই মূলনীতি অনুসারে রসূল সা. নিজে কখনো কখনো ভালো পোশাকও পরতেন। মধ্যম ও

---

১৫. কারো কারো মতে, কেবল অসুস্থ অবস্থায়ই এরূপ করতেন, বিশেষত মাথা ধরলে।

১৬. তিরমিযী ও নাসায়ী।

ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় বসা তাঁর নীতি ছিল এবং তিনি তাঁর উম্মতকে উগ্রতা ও চরম পন্থা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তিনি চাপা আস্তিন বিশিষ্ট রোমীয় জুব্বাও একবার পরেছিলেন। লাল ডোরা বিশিষ্ট চমকপ্রদ সেটও পরেছেন। কখনো কখনো পারস্যের রাজকীয় তাইলাসানী জুব্বাও পরেছেন।[১৭] একবার ২৭ উটনীর বিনিময়ে এক সেট মূল্যবান পোশাক খরিদ করে পরেন এবং সেই অবস্থায় নামাযও পড়েন। এটা আসলে কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ ছিল ঃ "বল, আল্লাহর দেয়া সৌন্দর্যোপকরণকে হারাম করেছে কে?" (সূরা আরাফ) তবে সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, সরল ও অনাড়ম্বর পোশাকই তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল।

পোশাকের বেলায় সাদা রংই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের জন্য আল্লাহর সামনে যাওয়ার সর্বোত্তম পোশাক সাদা পোশাক।"[১৮] তিনি আরো বলেছেনঃ সাদা কাপড় পর এবং সাদা কাপড় দ্বারা মৃতদের কাফন দাও। কেননা এটা অপেক্ষাকৃত পবিত্র ও পছন্দনীয়[১৯]

সাদার পরেই তাঁর পছন্দনীয় রং ছিল সবুজ। তবে তাতে হালকা সবুজ ডোরা থাকা পছন্দ করতেন। একেবারে নির্ভেজাল লাল পোশাক খুবই অপছন্দ করতেন। (শুধু পোশাক নয়, বরং অন্যান্য জিনিসে লাল রং ক্ষেত্র বিশেষে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে হালকা লাল রং এর ডোরাকাটা কাপড় তিনি পরতেন। অনুরূপ হালকা হলুদ (মেটে রং) এর পোশাকও পরেছেন।

রসূল সা. এর জুতা প্রচলিত আরবী কৃষ্টি অনুসারে চপ্পল বা খড়মের আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। এর দুটো ফিতে থাকতো। একটা থাকতো পায়ের বুড়ো আংগুল ও তার পার্শ্ববর্তী আংগুলের মাঝখানে। আর অপরটা থাকতো তার পার্শবর্তী দু' আংগুলের মাঝে। জুতোয় পশম থাকতোনা। অন্যান্য সাধারণ লোকদের জুতোর মত এটি এক বিঘত ২ আংগুল লম্বা হতো। কখনো দাঁড়িয়ে এবং কখনো বসে জুতো পরতেন। পরবার সময় প্রথমে ডান ও পরে বাম পা ঢুকাতেন। আর খোলার সময় প্রথমে বাম ও পরে ডান পা বের করতেন।

মোজা পরতেন সাধারণ, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট মানের। বাদশাহ নাজ্জাসী কালো মোজা উপহার দিয়েছিলেন। সেটি পরেছিলেন এবং তার ওপর মোসেহ করতেন। অনুরূপভাবে দিহয়া কালবীও মোজা উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা ছেড়ার আগ পর্যন্ত পরেছেন।

রূপার আংটি ব্যবহার করেছেন। এতে রূপার ফলকও ছিল। কখনো হাবশী পাথরের ফলকও থাকতো। কোন কোন বর্ণনা মতে, লোহার আংটিতে রূপার পালিশ দেয়া থাকতো। অপরদিকে তিনি যে লোহার আংটি গহনা অপছন্দ করতেন তা সুবিদিত। আংটি সাধারণত ডান হাতেই পরতেন। তবে কখনো কখনো বাম হাতেও পরেছেন। মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলে পরতেন না। মধ্যমার পার্শবর্তী আংগুলে পরাই পছন্দ করতেন। ফলক ওপরের দিকে নয় বরং হাতের পাতার দিকে রাখতেন। ফলকে "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"

---

১৭. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া

১৮. আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

১৯. আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

খোদাই করা ছিল। এ দ্বারা তিনি চিঠিতে সিল দিতেন। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে এ আংটি সিলের প্রয়োজনেই বানানো হয়েছিল। রাজনৈতিক পদমর্যাদার কারণে এর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

বেশভূষা ও সাজ সজ্জা

রসূল সা. চুল খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। প্রচুর তেল ব্যবহার করতেন। চিরুনী দিতেন, সিথি কাটতেন, ঠোটের বাড়তি পশম ছেঁটে ফেলতেন, দাড়িও লম্বায় চওড়ায় কাঁচি দিয়ে সমান করে রাখতেন। সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতেন। যেমন, এক সাহাবীকে এলোকেশী অবস্থায় দেখে খুবই ভর্ৎসনা করলেন। এক সাহাবীর দাড়ির বাড়তি চুল নিজেই ছেঁটে দেন। বললেন, যে ব্যক্তি মাথার চুল বা দাড়ি রাখবে, তার সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা উচিত। কাতাদাহকে বলেছিলেন, দাড়িকে সুন্দরভাবে রাখো।[২০]

এ ব্যাপারে রসূল সা. তাকীদ করেছেন এ জন্য যে, অনেক সময় ধর্মীয় শ্রেণীর লোকেরা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। বিশেষতঃ বৈরাগ্যবাদী তাসাউফের প্রবক্তরা নোংরা থাকাকে উচ্চ মর্যাদার আলামত মনে করে থাকে। এই বিভ্রান্তি তিনি দূর করার ব্যবস্থা করেন।

প্রবাসে বা গৃহে যেখানেই থাকুক, সাতটা জিনিস সব সময় কাছে ও বিছানার নিকট রাখতেনঃ তেলের শিশি, চিরুনী, সুর্মাদানী (কালো সুর্মা), কাচি, মেসওয়াক, আয়না এবং এক টুকরো হালকা কাঠ।

রাত্রে শোবার সময় প্রতি চোখে তিনবার করে সুর্মা নিতেন। শেষ রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ওযু করতেন, পোশাক বদলাতেন, সুগন্ধী লাগাতেন। রায়হান নামক সুগন্ধী বেশী পছন্দ করতেন। মেহেন্দীর ফুলের সুগন্ধীও ভালোবাসতেন। সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল মেশক ও চন্দনের সুগন্ধী।

বাড়ীতে সুগন্ধী দ্রব্যের ধুঁয়া ছড়াতেন। একটা আতরদানীতে উচ্চমানের সুগন্ধী থাকতো এবং ব্যবহৃত হতো। (কখনো কখনো হযরত আয়েশা নিজ হাতে সুগন্ধী লাগিয়ে দিতেন)। এ কথা সুপ্রসিদ্ধ যে, তিনি যে গলি দিয়ে হেঁটে যেতেন, সে গলি দীর্ঘ সময় সুবাসিত থাকতো। বাতাসই বলে দিত এখান দিয়ে একটু আগে চলে গেছেন সেই চিরবসন্তের বার্তাবাহক। কেউ সুগন্ধী দ্রব্য উপহার দিলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতেন। কেউ যদি তাঁর সুগন্ধী উপহার গ্রহণ না করতো, তবে অসন্তুষ্ট হতেন। ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ অভিরুচি অনুযায়ী তিনি পুরুষদের জন্য এমন সুগন্ধী পছন্দ করতেন, যার রং অদৃশ্য থাকে এবং সৌরভ চারদিকে ছড়ায়, আর মহিলাদের জন্য এমন সুগন্ধী পছন্দ করতেন, যার রং দেখা যায় এবং সৌরব ছড়ায়না।

চলাফেরা

রসূল সা. এর চলাফেরায় গাম্ভীর্য, আত্ম সম্মানবোধ, ভদ্রতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত হতো। দৃঢ়ভাবে পা ফেলে চলতেন। অলসভাবে পা ঘসে ঘসে চলতেন না। চলার সময়

---

২০. আবু দাউদ।

দেহ থাকতো গুটানো। ডানে-বামে না তাকিয়ে পথ চলতেন। সামনের দিকে সতেজ পা তুলতেন। চলার সময় শরীর কিছুটা সামনের দিকে ঝুকে থাকতো। মনে হতো যেন ওপর থেকে নিচে নামছেন। হিন্দ বিন আবি হালার ভাষায়, 'তাঁর চলা দেখে মনে হতো পৃথিবী তার চলার সাথে সাথে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। কখনো দ্রুত চললে পা দূরে দূরে রাখতেন। তবে সাধারণত মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রার রা. ভাষায় 'আমাদের পক্ষে তাঁর সাথে চলাই কষ্টকর হতো।' তাঁর চলার ধরন ছিল সূরা লুকমানের 'যমীনের ওপর দিয়ে দম্ভভরে চলোনা' এই নির্দেশটির বাস্তব প্রতিফলন।

কথা বার্তা

কথাবার্তা মানুষের বিশ্বাস, চরিত্র ও মর্যাদাকে পুরোপুরিভাবে উন্মোচিত করে। কথাবার্তার বিষয় ও শব্দ চয়ন, বাক্যের গঠন, স্বরের উত্থান পতন, বলার ভংগী ও বর্ণনার তেজস্বীতা এই সব কিছু বুঝিয়ে দেয় বক্তা কোন্ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

রসূল সা. এর দায়িত্ব ও পদমর্যাদা এমন ছিল যে, সেই গুরুভার অন্য কারো ওপর চাপানো হলে সে গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেত এবং সে নির্জনে থাকা পছন্দ করতো। কিন্তু রসূল সা. এর অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল এই যে, একদিকে তিনি পাহাড় সমান গুরুদায়িত্ব ও চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়াতেন এবং নানা রকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর সময় কাটতো। অপর দিকে লোকজনের সাথে গভীরভাবে মেলামেশা করতেন এবং দিনরাত আলাপ আলোচনাও চলতো। মেযাজে গাম্ভীর্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল হাসি তামাসা ও রসিকতা। পরস্পর বিরোধী গুণাবলীতে তাঁর বিস্ময়কর ভারসাম্য ছিল। একটা বিশ্বজোড়া আন্দোলন, পুরো একটা সাম্রাজ্যের সমস্যাবলী, একটা সমাজ ও সংগঠনের নানা জটিলতা এবং নিজের একটা বিরাট পরিবারের দায়িত্ব তাঁর জন্য পাহাড় সমান বোঝা ছিল। এই বোঝা তাঁরই কাঁধে চাপানো ছিল। ইমাম হাসান রা. তাঁর মামা হিন্দ বিন আবি হালার বরাত দিয়ে বলেন, 'রসূলুল্লাহ সা. সব সময় নানা ধরনের ব্যস্ততায় থাকতেন। নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে কেবল ভাবতেন আর ভাবতেন। কখনো তিনি এক মুহূর্ত চিন্তামুক্ত থাকতে পারেননি। দীর্ঘ সময় ধরে চুপচাপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।'[২১]

কিন্তু তিনি একজন প্রচারক ও আহ্বায়ক এবং একটা আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এ জন্য প্রচার, শিক্ষা দান, সংস্কার ও সংশোধন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তৎপরতা চালানোর জন্য জনগণের সাথে যোগাযোগ অত্যাবশ্যক ছিল। আর এই যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল কথা বলা। তাই সব রকমের আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করাও ছিল তাঁর রীতি। হযরত যায়েদ বিন ছাবেত বলেনঃ 'যখন আমরা দুনিয়াবী বিষয়ে আলোচনা করতাম, তখন রসূল সা. তাতেও অংশ নিতেন। যখন আমরা আখেরাতের বিষয়ে কথা বলতাম, তখন তিনিও সে বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। আমরা যখন খানাপিনা সম্পর্কে কোন কথা বলতাম, তখন তিনিও তাতে যোগ দিতেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রসূল সা. কসম খেয়ে বলেছেন যে, আমার মুখ দিয়ে সত্য কথা ও ন্যায্য

---

[২১] শামায়েলে তিরমিযী, রসূল (সা) এর কথা বলার ধরণ সংক্রান্ত অধ্যায়।

কথা ছাড়া আর কিছুই বের হয়নি। কোরআনও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, 'তিনি মনগড়া কিছু বলেননা।'

কথা বলার সময় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শ্রোতা তা সহজেই মুখস্থ করে ফেলতো, এমনকি শব্দগুলো বলার সাথে সাথে গণনাও করা যেত। উম্মে মা'বাদ তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "তাঁর কথা যেন মুক্তোর মালা।" প্রয়োজনের চেয়ে কথা বেশীও বলতেন না, কমও বলতেন না। বেশী সংক্ষিপ্তভাবেও বলতেন না, অতিরিক্ত লম্বা করেও বলতেন না। কথার ওপর জোর দেয়া, বুঝানো এবং মুখস্থ করার সুবিধার্থে বিশেষ বিশেষ কথা ও শব্দকে তিনবার করে উচ্চারন করতেন। কোন কোন বিষয়ে স্পষ্টোক্তি সমীচীন মনে না করে আভাসে ইংগিতে কথা বলতেন। অশোভন, অশ্লীল ও নির্লজ্জ ধরনের কথাবার্তাকে ঘৃণা করতেন। কথাবার্তার সাথে সাধারণত একটি মুচকি হাসি উপহার দিতেন। আব্দুল্লাহ বিন হারিস বলেনঃ 'আমি রসূল সা. এর চেয়ে বেশী মুচকি হাসতে কাউকে দেখিনি।' এ মুচকি হাসি তাঁর গাম্ভীর্যকে কঠোরতায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতো এবং সাথীদের কাছে আকর্ষণীয়তা বাড়াতো। কথা বলতে বলতে বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। বক্তব্য রাখার মাঝে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য হঠাৎ হেলান দেয়া অবস্থা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসতেন এবং বিশেষ বাক্যকে বারবার উচ্চারণ করতেন। শ্রোতাদেরকে কোন বিষয়ে সাবধান করতে চাইলে কথার সাথে সাথে মাটিতে হাত দিয়ে থাপড়াতেন। কোন কথা বুঝানোর ব্যাপারে হাত ও আংগুলের ইশারা দিয়েও সাহায্য নিতেন। যেমন, দুটো জিনিসের একত্র সমাবেশ বুঝাতে তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলকে একত্র করে দেখাতেন। কখনোবা দুই হাতের আংগুলগুলোকে পরস্পরের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে দৃঢ়তা ও একাত্মতার ধারণা স্পষ্ট করতেন। কোন জিনিস বা কোন দিকে ইশারা করতে হলে পুরো হাতকেই নাড়াতেন। কখনো হেলান দিয়ে বসে জরুরী বিষয়ে আলোচনা করার সময় ডান হাতকে বাম হাতের পিঠের ওপর রেখে আংগুলের সাথে আংগুল যুক্ত করে নিতেন। বিস্ময় প্রকাশ করার সময় কখনো হাতের তালু উল্টে দিতেন। কখনো ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের বুড়ো আংগুলের মধ্যমাংশের ওপর আঘাত করতেন। কখনো মাথা দোলাতেন এবং ঠোঁটকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতেন। আবার কখনো হাত দিয়ে উরু চাপড়াতেন।

মক্কার কুরাইশ গোত্রের এক মার্জিত ভদ্র পরিবারের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি বনু সা'দ গোত্রের পরিবেশে বেড়ে উঠে আরবের সবচেয়ে নির্ভুল ভাষা তো রপ্ত করেছিলেনই, তদুপরি ওহীর প্রাঞ্জল ভাষা তাঁর বাক্যালাপের মাধুর্যকে আরো পরিশীলিত করে দিয়েছিল। বস্তুত তিনি ছিলেন আরবের সর্বাপেক্ষা সুভাষী মানুষ। রসূল সা. এর ভাষার সাহিত্যিক মান যেমন উচ্চ ও উৎকৃষ্ট ছিল, তেমনি তা ছিল সহজবোধ্য এবং সরলও। সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করলেও তিনি কখনো নিচুমানের ও অশালীন শব্দ ব্যবহার করেননি, আর কোন কৃত্রিম ধরনের ভাষাও পছন্দ করতেননা। সত্য বলতে কি, রসূল সা. নিজের দাওয়াত ও নিজের লক্ষ্যের প্রয়োজনে একটা নিজস্ব ভাষা তৈরী করে নিয়েছিলেন এবং একটা স্বতন্ত্র বাচনভংগীও বানিয়ে নিয়েছিলেন। রসূল সা. এর একটি উক্তি 'যুদ্ধ একটা কৌশল' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ছা'লাব বলেছেন যে, এটা রসূল সা. এর বিশেষ ভাষা। তিনি বহু

পরিভাষা তৈরী করেছেন। বহু নতুন বাগধারা, উপমা ও উদাহরণ উদ্ভাবন করেছেন। বক্তৃতার এক নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেছেন, এবং প্রচলিত বহু শব্দ ও পদ্ধতি বর্জন করেছেন। একবার বনু নাহদ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি এল এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করলো। এই আলোচনার সময় আগন্তুকগণ অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বললেনঃ 'হে রসূলুল্লাহ, আপনি ও আমরা একই মা বাপের সন্তান এবং একই জায়গায় লালিত পালিত হয়েছি। তবুও আপনি এমন আরবীতে কথা বলেন, যার মর্মার্থ আমাদের অধিকাংশ লোকই বুঝতে পারেনা। এর রহস্যটা কী? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ স্বয়ং আমাকে ভাষা ও সাহিত্য শিখিয়েছেন, তাই সর্বোত্তম ভাষাই শিখিয়েছেন। তাছাড়া আমি বনু সা'দ গোত্রে পালিত হয়েছি। এটাই এর রহস্য। একবার জনৈক সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে কথা বলছিলেন এবং হযরত আবু বকর গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লোক আপনাকে কী বলেছে এবং আপনি কী বলেছেন? রসূল সা. বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর বলতে লাগলেন, 'আমি সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে ঘুরেছি এবং আরবের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের বিশুদ্ধ ও সাবলীল বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু আপনার চেয়ে মিষ্টিমধুর কথা আর কারো মুখ থেকে শুনিনি। এখানেও রসূল সা. একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন যে, আল্লাহই আমাকে ভাষা শিখিয়েছেন এবং আমি বনু সা'দ গোত্রে লালিত পালিত হয়েছি। অনুরূপভাবে একবার হযরত ওমর রা. বললেন, হে রসূল আপনিতো কখনো আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকেননি, তবু আপনি আমাদের সবার চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন কিভাবে? তিনি বললেনঃ 'আমার ভাষা ইসমাঈল আ. এর ভাষা। ওটা আমি বিশেষভাবে শিখেছি। জিবরীল এ ভাষাই আমার কাছে নিয়ে এসেছে এবং আমার অন্তরে তা বদ্ধমূল করেছে। অর্থাৎ রসূল সা. এর ভাষা সাধারণ আরবী ছিলনা, বরং বিশেষ নবীসুলভ ভাষা ছিল এবং তা হযরত ইসমাঈলের ভাষার অনুরূপ ছিল। আর জিবরীল যে ভাষায় কোরআন নাযিল করতেন তাও ছিল সেই নবী সুলভ ভাষা।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, বিশেষতঃ নবীগণ, যারা একটা বিশেষ ব্রত ও লক্ষ্য নিয়ে এসে পরিবেশের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং যাদের মধ্যে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের আবেগ বিরাজ করে, তারা যখন কথা বলেন, তখন তাতে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মহত্ব গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তার সাহিত্যিক মানকে উন্নত করে এবং তাদের চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে পবিত্রতর করে।

রসূল সা. এর অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল এইযে, তাঁকে 'জাওয়ামিউল কালিম' দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন,[২২] (আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' দেয়া হয়েছে। রসূল সা. এর যে সংক্ষিপ্ততম বাক্যগুলো ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে তাকেই বলা হয় 'জাওয়ামিউল কালিম'। স্বল্পতম শব্দে ব্যাপকতম অর্থ বুঝানোতে রসূল সা. এর জুড়ি ছিলনা এবং একে তিনি আল্লাহর বিশেষ দান বলে গণ্য করেছেন।

---

২২. মুসলিম ঃ আবু হুরাইয়রা (রা)।

এখানে তাঁর জাওয়ামিউল কালিমের কিছু উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে ঃ

১.	اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ	মানুষ যাকে ভালোবাসে, কেয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।
২.	اَسْلِمْ تَسْلَمْ	মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে।[২৩]
৩.	اِنَّمَا الاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ	নিয়ত অনুসারে কাজের বিচার হবে।
৪.	لَيْسَ لِلْعَامِلِ مِنْ عَمَلِه الاَّ مَانَوَا	যে কাজ করে, সে কেবল আপন নিয়ত অনুযায়ীই তার ফল পায়।
৫.	اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اَلْحجَرُ	সন্তান যার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়, তার। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।
৬.	اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ	যুদ্ধ একটি কৌশল।
৭.	لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ	দেখা ও শোনা এক কথা নয়।
৮.	اَلْمَجَالِسُ بِالاَمَانَةِ	বৈঠকের জন্য বিশ্বস্ততা জরুরী।
৯.	تَرْكُ الشَّرِّ صَدَقَةٌ	খারাপ কাজ বর্জন করাও একটা ভালো কাজ।
১০.	سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ	জনগণের যিনি সেবা করেন, তিনিই তাদের নেতা।
১১.	كُلُّ ذِىْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ	প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হয়।
১২.	اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ	ভালো কথা বলাও সৎ কাজের শামিল।
১৩.	مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ	যে দয়া করেনা সে দয়া পায়না।

সাধারণত ভাষা, বাচনভংগী ও বিষয়বস্তু দ্বারা রসূল সা. এর উক্তি চেনা যায়। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে রসূল সা. এর উক্তি সমূহ মুক্তার মত উজ্জ্বল। অল্প ক'টা শব্দ, শব্দগুলোর মধ্যে চমৎকার সমন্বয়, অর্থের গভীরতা ও হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী আন্তরিকতা রসূল সা. এর কথার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। এ সব বৈশিষ্টে সমৃদ্ধ দু' একটা কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছিঃ

আমি তোমাদেরকে সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। সামগ্রিক ব্যবস্থার জন্য নেতার আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণের জোর আহ্বান জানাচ্ছি-চাই সে নেতা কোন নিগ্রো ক্রীতদাসই হোকনা কেন। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, তারা অসংখ্য মতভেদে লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অবলম্বন করা, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

---

২৩. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে প্রেরিত দাওয়াত পত্রের অংশ।

এবং দাঁতের মাড়ি দিয়ে চেপে ধরা। সাবধান, ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন নিয়ম চালু করা থেকে বিরত থেকো। কেননা প্রত্যেক নতুন নিয়ম বেদয়াত। আর প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহী[২৪]

আমর বিন আবাসা রা. রসূল সা. এর কাছে কিছু প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি এগুলোর খুব সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র জবাব দেন। এই ক্ষুদ্র সংলাপটি লক্ষ্য করুন!

– এই কাজে (ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে) প্রথম প্রথম আপনার সাথে কে কে ছিল?
– একজন স্বাধীন মানুষ (হযরত আবু বকর) এবং একজন ক্রীতদাস (হযরত যায়েদ)।
– ইসলাম কী?
– ভালো কথা বলা ও ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো।
– ঈমান কী?
– ধৈর্য ও দানশীলতা।
– কার ইসলাম সর্বোত্তম?
– যার জিহ্বা ও হাতের বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ মন্দ কাজ ও মন্দ কথা) থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে।
– কার ঈমান উৎকৃষ্ট?
– যার চরিত্র ভালো তার।
– কি ধরনের নামায উত্তম?
– যে নামাযে বিনয়ের সাথে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো হয়।
– কি ধরনের হিজরত উত্তম?
– তোমার প্রতিপালকের অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে চিরতরে পরিত্যাগ করা।
– কোন জেহাদ উত্তম?
– সেই ব্যক্তির জেহাদ, যার ঘোড়াও রণাঙ্গনে মারা যায় এবং সে নিজেও শহীদ হয়।
– কোন সময়টা (এবাদতের জন্য) সর্বোত্তম?
– রাতের শেষ প্রহর।[২৫]

একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, প্রধানত কোন্ জিনিস মানুষের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য করে তোলে? তিনি জবাব দিলেন, "মুখ ও লজ্জাস্থান।"[২৬] মুখ দ্বারা বুঝানো হয়েছে কথা ও খাদ্য। আর লজ্জাস্থান দ্বারা বুঝানো হয়েছে অবৈধ যৌনাচার। অর্থাৎ খারাপ কথা, হারাম জীবিকা ও যৌন বিপথগামিতা মানুষের আখেরাতের ধ্বংসকারী সবচেয়ে বড় উপকরণ। অধিকাংশ যুলুম, নির্যাতন, দ্বন্দ্ব ঘংঘাতও এগুলো থেকেই জন্ম নেয়।

একবার হযরত আলী অনুরোধ করলেন, আপনি নিজের নীতি ব্যাখা করুন। তিনি এর জবাবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ এত অলংকার মন্ডিত ভাষায় নিজের চিন্তাধারা, স্বভাব ও আধ্যাত্মিকতার এমন ব্যাপক চিত্র তুলে ধরলেন, যা মানুষের ভাষার ইতিহাসে এক অলৌকিক নিদর্শন। তিনি বললেন ঃ

---

২৪. মিশকাত– বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ।

২৫. মেশকাত– কিতাবুল ঈমান।

২৬. তিরমিযী– আবু হুরায়রা বর্ণিত।

'আল্লাহর পরিচয় আমার পুঁজি, বুদ্ধি আমার দীনের মূল, ভালোবাসা আমার ভিত্তি। আকাংখা আমার বাহন, আল্লাহর স্মরণ আমার বন্ধু, আস্থা ও বিশ্বাস আমার সাথী, জ্ঞান আমার অস্ত্র, ধৈর্য আমার পোশাক, আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার জন্য অতিবড় নিয়ামত, বিনয় আমার সম্মান, যোহাদ তথা পার্থিব সম্পদ নিস্পৃহতা আমার পেশা, প্রত্যয় আমার শক্তি (উচ্চারণ ভেদে অর্থ খাদ্য), সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী। আনুগত্য আমার রক্ষাকবচ, জেহাদ আমার চরিত্র আর নামায আমার চক্ষু শীতলকারী।"২৭.

উদাহরণ ও উপমার অনেক বিরল দৃষ্টান্ত রসূল সা. এর কথায় পাওয়া যায়। এগুলোর সাহায্যে তিনি বেদুইনদেরকে অনেক বড় বড় জিনিস বুঝিয়ে দিতেন। এখানে তার একটি উপস্থাপন করছি ঃ

"আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত ও এলমের যে পুঁজি দান করেছেন, তার উদাহরণ এরূপ, যেন পৃথিবীতে মুষলধারে বৃষ্টি হলো। তারপর পৃথিবীর যে অংশটা সবচেয়ে উর্বর, তা পানিকে খুব করে চুষে নিল। এর ফলে ঢলে পড়া তরুলতা সব তরতাজা হয়ে গেল এবং নতুন নতুন গাছ গাছালি জন্ম নিল। এ ছাড়া ভূমির কিছু শক্ত অংশ এমনও ছিল, যা পানিকে তার ভেতরে সঞ্চিত করে রাখলো এবং আল্লাহ তাতে মানুষের জন্য বহু উপকার নিহিত রাখছেন। তিনি তা থেকে পানি সেচ করালেন। তারপর এই পানি তিনি অন্য একটা ভূখন্ডেও বর্ষালেন যা পাথরে পরিপূর্ণ ছিল। এই মাটি পানিকে সঞ্চয় করেও রাখলোনা, নিজের ভেতরে শুষে নিয়ে উর্বরতার লক্ষণও দেখালোনা। এর একটি হলো সেই সব লোকের উদাহরণ যারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন তা দ্বারা উপকৃত হয়। তারা নিজেরাও ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে এবং অন্যদেরকেও শেখায়। দ্বিতীয় উদাহরণটা যারা আমার দাওয়াতকে এবং আমার মাধ্যমে আল্লাহর পাঠানো হেদায়াতকে গ্রহণ করেনি তাদের।

রসূল সা. এর কথা বলার নীতিকে যদি কোন শিরোনাম দিতে হয়, তবে তা কোরআনের এই বাক্য দ্বারা দেয়া চলে যে, "মানুষকে আকর্ষণীয় ভাষায় আহ্বান জানাও।" রসূল সা. এর চিত্তাকর্ষক বাক রীতিতে সরলতার ভাব নিহিত ছিল, কৃত্রিমতা থেকে তিনি থাকতেন বহু দূরে। তিনি বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা কেয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকবে তারা হলো ঐ সবলোক যারা অতিরঞ্জিত করে কথা বলে, বেশী কথা বলে এবং কথার মধ্যে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে।"

তাছাড়া বাচালতাপূর্ণ ও অশ্লীল কথাবার্তাও তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর মজলিস সব সময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতো এবং তাঁর চেহারাই ছিল সবচেয়ে বেশী হাসিময়, যদিও কঠিন দায়িত্ব ও বিপদমুসিবতে প্রায় সর্বদাই ঘেরাও হয়ে থাকতেন।

বক্তৃতা

কথাবার্তারই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বক্তৃতা। রসূল সা. মানব জাতির জন্য একটা বিরাট ও মূল্যবান বার্তা বয়ে এনেছিলেন এবং সে জন্য বক্তৃতা ছিল অপরিহার্য। আরবরা এমনিতেও সুবক্তা হতো। বিশেষত কুরাইশগণ হতো অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির অধিকারী। আরব ও কুরাইশদের বক্তৃতার পরিবেশ থেকে রসূল সা. অনেক উর্ধে থাকতেন। নেতাসুলভ কর্তব্যের তাগিদে কখনো বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন হলে তিনি কাল বিলম্ব না করেই সময়োপযোগী ভাষণ দিতেন। তখন তার জিহ্বা কখনো ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের মত, কখনো প্রবল স্রোতধারার মত এবং কখনো ধারালো তরবারীর মত সক্রিয় হয়ে উঠতো।

তবে তিনি বেশী ঘন ঘন বক্তৃতা ও ভাষণ দেয়া থেকে বিরত থাকতেন। সমাজের প্রয়োজন ও তার সার্বিক পরিবেশ অনুসারে ভারসাম্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন। মসজিদে বক্তৃতা দিলে নিজের লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন, আর যুদ্ধের ময়দানে ভাষণ দিলে কামানের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। কখনো কখনো বাহন জন্তুর পিঠের ওপর বসে ভাষণ দিতেন। বক্তৃতার সময় শরীর ডান দিকে ও বাম দিকে ঈষৎ ঝুঁকে যেত। প্রয়োজনমত হাত নাড়াতেন। বক্তৃতার মধ্যে কখনো কখনো 'যার হাতে আমার প্রাণ, বা যার হাতে মুহাম্মদরে জীবন তার শপথ' এই বলে শপথ করতেন। তাঁর মনের ভাবাবেগ তাঁর স্বরে ও চেহারায় সমভাবে প্রতিফলিত হতো এবং শ্রোতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়তো। এই মহামানবের ভাষণ মানুষের মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করতো। এখানে আমি শুধু দুটো উদাহরণ দেবো। হোনায়ন ও তায়েফ যুদ্ধের পর রসূল সা. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান মোতাবেক মাক্কার নওমুসলিম সরদারদেরকে বেশ বড় বড় অংশ দিলেন, যাতে তাদের মন আরো নরম হয় এবং তারা মহানুভবতার বন্ধন দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হয়। আনসারগণের মধ্যে কেউ কেউ এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন। তারা বললেন ঃ

"রসূল সা. কুরাইশদের অনেক পুরস্কার দিলেন, আর আমাদেরকে বঞ্চিত রাখলেন। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনো রক্তের ফোঁটা ঝরছে।" কেউবা বললেন ঃ

"বিপদাপদে আমাদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে যায় অন্যরা।"

এই সব কথাবার্তা রসূল সা. এর কানেও গেল। তখন একটা চামড়ার তাঁবু খাটিয়ে সেখানে আনসারদের সমবেত করা হলো। রসূল সা. তাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা কি এ সব কথা বলেছ?" জবাব দেয়া হলোঃ "আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি। তবে এ সব কথা আমাদের দায়িত্বশীল লোকেরা বলেনি। কতক যুবক এ কথাগুলো বলেছে।" পুরো ঘটনার তদন্ত শেষে রসূল সা. নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

'এ কথা কি সত্য নয় যে, তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সুপথে পরিচালিত করলেন? তোমরা কতটা বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন? তোমরা দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের স্বচ্ছল বানিয়েছেন? (প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসারগণ বলছিলেন, নিসন্দেহে আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনেক দান রয়েছে।)

'না, তোমরা বরং জবাবে এ কথাও বলতে পারতে যে, হে মুহাম্মদ, তোমাকে যখন সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে, আমরা তখন তোমার ওপর ঈমান এনেছি। তোমাকে যখন লোকেরা বিতাড়িত করেছে, আমরা তখন তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি যখন নিসম্বল অবস্থায় এসেছিলে, আমরা তখন তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তোমরা যদি জবাবে এ সব কথা বল, আমি অবশ্যই বলবো যে, তোমাদের কথা সত্য। কিন্তু ওহে আনসারগণ! তোমাদের কি এটা পছন্দ নয় যে, অন্য সবাই উট ছাগল ইত্যাদি নিয়ে যাক, আর তোমরা মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে বাড়ী চলে যাও? (বোখারী)

কথার চড়াই উৎরাই দেখুন, নাযুক ভাবাবেগ দ্বারা শানিত বক্তৃতার তেজ দেখুন, ভাষণের প্রাঞ্জলতা দেখুন এবং তারপর ভাবুন যে, বক্তা কিভাবে শ্রোতাদের মধ্যে ইঙ্গিত প্রেরণার সঞ্চার করলেন। আনসারগণ স্বতস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ "আমরা শুধু মুহাম্মদ সা. কে চাই, আর কিছু চাইনা।"

দাওয়াতের সূচনা পর্বে সাফা পর্বতের ওপর থেকে প্রদত্ত ভাষণ ছাড়াও তিনি একাধিকবার কুরাইশদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন। এই যুগের একটা ভাষণের উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয় ঃ

"কাফেলার পথপ্রদর্শক কখনো কাফেলাকে ভুল তথ্য জানায়না। আল্লাহর কসম, আমি যদি অন্য সকলের সাথে মিথ্যা বলতে রাযীও হয়ে যেতাম, তবুও তোমাদের সাথে মিথ্যা বলতামনা। অন্য সবাইকে যদি ধোকা দিতাম, তবুও তোমাদের ধোকা দিতামনা। সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কেউ এবাদত উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নেই, আমি তোমাদের কাছে বিশেষভাবে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর রসূল। আল্লাহর কসম, তোমরা যেমন ঘুমাও ও ঘুম থেকে জাগো, তেমনি তোমাদের মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন সুনিশ্চিত। তোমাদের কাছ থেকে অবশ্যই তোমাদের কৃত কর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং তোমাদেরকে ভালো কাজের ভালো প্রতিফল ও মন্দ কাজের মন্দ পরিণাম তোমাদের ভোগ করতেই হবে। অতপর হয় চিরদিনের জন্য জান্নাত, নচেত চিরদিনের জন্য জাহান্নাম।"

কত সরল ও সাবলীল বর্ণনাভংগী এবং কত যুক্তিপূর্ণ ও আবেগপূর্ণ আবেদন। আহ্বায়কের হিতাকাংখা প্রতিটি শব্দের মধ্য দিয়ে নিসৃত হয়ে পড়ছে। প্রতিটি বাক্য বিশ্বাস ও প্রত্যয় দ্বারা পরিপূর্ণ। এই ক্ষুদ্র ভাষণটিতে উদাহরণও দেয়া হয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মৌলিক দাওয়াত এতে পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত।

রসূলের সা. আরো দুটো ঐতিহাসিক ভাষণ রয়েছে। একটা মক্কা বিজয়ের পর এবং অপরটি বিদায় হজ্জের সময় দিয়েছিলেন। এই ভাষণ দুটি একেবারেই বৈপ্লবিক প্রকৃতির এবং ঐ দুটোতে ঈমান, নৈতিকতা ও ক্ষমতা–তিনটেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। বিদায় হজ্জের ভাষণ তো বলতে গেলে একটা নবযুগের উদ্বোধনের ঘোষণা।

সাধারণ সামাজিক যোগাযোগ

সাধারণত বড় বড় কাজ যারা করেন, তারা সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ করার সময় পান না এবং সব দিকে মনোযোগও দিতে পারেন না। উঁচু স্তরের লোকদের অনেকের মধ্যে নির্জন তা প্রিয় ও মেযাজের রূক্ষতার সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ দাম্ভিকতায়

লিপ্ত হয়ে নিজের জন্য স্বতন্ত্র এক ভুবন তৈরী করে নেয়। কিন্তু রসূল সা. ছিলেন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েও এবং ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী কীর্তি সম্পন্ন করেও তিনি সর্বস্তরের জনগণের সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ বজায় রাখতেন। সমাজের ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করতেন। জন বিচ্ছিন্নতা, দাম্ভিকতা বা রুক্ষতার নামগন্ধও তাঁর মধ্যে ছিলনা। আসলে তিনি যে ভ্রাতৃত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তার অপরিহার্য দাবী ছিল জনগণ নিজেদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকুক। একে অপরের উপকার করুক এবং একে অপরের অধিকার সম্পর্কে অবগত থাকুক। আজকের পাশ্চাত্য জগতে যে ধরনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে, তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সংস্কৃতিতে কারো সাথে কারো কোন সম্পর্ক থাকেনা। এই সম্পর্কহীনতা এখন এক মানবতা বিধ্বংসী উপকরণে পরিণত হয়েছে। আজ তাই মুহাম্মাদ সা. এর নেতৃত্বে এই পবিবেশটাকে পাল্টে ফেলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আসুন, রসূল সা. কে সাধারণ সামাজিক সংযোগের প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করি।

তাঁর রীতি ছিল পথে যার সাথে দেখা হোক প্রথমে ছালাম দেয়া। কাউকে কোন খবর দিতে হলে সেই সাথে ছালাম পাঠাতে ভুলতেননা। তাঁর কাছে কেউ কারো ছালাম পৌঁছালে ছালামের প্রেরক ও বাহক উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে ছালাম দিতেন। একবার একদল শিশু কিশোরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ছালাম দিয়েছিলেন। মহিলাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকেও ছালাম দিতেন। বাড়ীতে প্রবেশকালে ও বাড়ী থেকে বেরুবার সময় পরিবার পরিজন ছালাম দিতেন। বন্ধুবান্ধবের সাথে হাতও মেলাতেন, আলিঙ্গনও করতেন। হাত মেলানোর পর অপর ব্যক্তি হাত না সরানো পর্যন্ত তিনি হাত সরাতেন না।

যখন বৈঠকাদিতে যেতেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াক, এটা পছন্দ করতেন না। বৈঠকের এক পাশেই বসে পড়তেন। ঘাড় ডিংগিয়ে ভেতরে ঢুকতেন না। তিনি বলতেন ঃ 'আল্লাহর একজন সাধারণ বান্দা যেভাবে ওঠাবসা করে, আমিও সেভাবেই ওঠাবসা করি।'–হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত।

নিজের হাটু সংগীদের চেয়ে আগে বাড়িয়ে বসতেননা। কেউ তাঁর কাছে এলে তাঁকে নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিতেন। আগন্তুক নিজে না ওঠা পর্যন্ত তিনি বৈঠক ছেড়ে উঠতেন না।

কোন বৈঠকে অবান্তর বিষয় আলোচনার জন্য তুলতেননা। বরং যে বিষয়ে আলোচনা চলছে, তাতেই অংশ গ্রহণ করতেন। ফজরের জামায়াতের পর বৈঠক বসতো এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে অনেক কথাবার্তা বলতেন। কখনো জাহেলী যুগের কাহিনী এসে গেলে তা নিয়ে বেশ হাসাহাসি হতো।[২৮] সাহাবীগণ কবিতাও পড়তেন। যে বিষয়ে বৈঠকের লোকদের মুখমন্ডলে বিরক্তি ও একঘেয়েমির চিহ্ন ফুটে উঠতো, সে বিষয়

---

২৮. জাবের বিন সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত।

পরিবর্তন করতেন। বৈঠকের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিতেন, যাতে কেউ অনুভব না করে যে, তিনি তার ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কথার মাঝখানে কেউ অবান্তর প্রশ্ন তুললে তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আলোচনা চালিয়ে যেতেন এবং আলোচনা শেষ করে ঐ ব্যক্তির দিকে মনোযোগ দিতেন। আলাপরত ব্যক্তির দিক থেকে ততক্ষণ মুখ ফেরাতেন না, যতক্ষণ সে নিজে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। কেউ কানে কানে কোন কথা বললে সেই ব্যক্তি যতক্ষণ কথা শেষ করে মুখ না সরায়, ততক্ষণ এক নাগাড়ে তার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতেন। নেহাৎ অন্যায় কথা না বললে কারো কথার মাঝখানে হস্তক্ষেপ করতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে হয় ভুল ধরিয়ে দিতেন, নচেত তার মুখমন্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠতো, নয়তো উঠে চলে যেতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা পছন্দ করতেন না। অপ্রীতিকর বিষয়কে হয় এড়িয়ে যেতেন। নচেত আপত্তি জানানোর সাধারণ রীতি ছিল এই যে, সরাসরি নাম নিয়ে বিষয়টির উল্লেখ করতেন, বরং সাধারণভাবে ইংগিত করতেন কিংবা সামাজিকভাবে উপদেশ দিতেন। অত্যধিক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হলে, যা কেবল ইসলামী বিষয়ের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হতো, বন্ধুবান্ধবকে সচেতন করার জন্য তিনি কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতেন। হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে তার সালাম গ্রহণ করতেন না, কিংবা তার দিকে মনোযোগ দিতেন না। কোন অবাঞ্ছিত লোক এসে পড়লেও হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাতেন। একবার এমন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল, যাকে তিনি সংশ্লিষ্ট গোত্রের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি তার সাথে অমায়িকভাবে কথাবার্তা বললেন। এটা দেখে হযরত আয়েশা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেনঃ আল্লাহর কছম, যে ব্যক্তির দুর্ব্যবহারের ভয়ে লোকেরা তার সাথে মেলামেশাই বন্ধ করে দেয়, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।[২৯]

কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে দরজার ডান দিকে বা বাম দিকে দাঁড়িয়ে নিজের উপস্থিতির কথা জানাতেন এবং ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেয়ার জন্য তিনবার সালাম করতেন। সালামের জবাবা না পেলে কোন রকম বিরক্ত না হয়ে ফিরে যেতেন। রাতের বেলায় কারো সাথে দেখা করতে গেলে এমন আওয়াযে সালাম করতেন যেন সে জাগ্রত থাকলে শুনতে পায়, আর ঘুমিয়ে গিয়ে থাকলে তার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

তাঁর শরীর বা কাপড় থেকে কেউ ধূলি বা খড়কুটা সরিয়ে দিলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেন ঃ 'আল্লাহ যেন কোন অপ্রীতিকর জিনিস তোমার কাছ থেকে দূর করে দেন।' উপহার গ্রহণ করতেন এবং পাল্টা উপহার দেয়ার কথা মনে রাখতেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ তাঁর দ্বারা কষ্ট পেলে তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিতেন এবং কখনোবা তাকে বিনিময়ে কোন উপহার দিতেন। কেউ নতুন কাপড় পরে তাঁর সামনে এলে বলতেনঃ حسنة حسنة ابل واخلق 'চমৎকার, চমৎকার, যত দীর্ঘদিন পার ব্যবহার কর এবং পুরানো হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার কর।' খারাপ ব্যবহারের প্রতিশোধ খারাপ ব্যবহার দ্বারা নিতেন না। ক্ষমা করতেন। অন্যদের অপরাধ যখন ক্ষমা

---

২৯. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, পৃঃ ২৯১।

করতেন, তখন সেটা জানানোর জন্য প্রতীক স্বরূপ নিজের পাগড়ী পাঠিয়ে দিতেন। কেউ ডাক দিলে সব সময় 'লাব্বাইক' বলে ডাক শুনতেন, চাই সে নিজের পরিবারের লোক বা নিজের সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ হোক না কেন।

রোগী দেখতে যেতেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে। শিয়রে বসে জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কেমন আছ? রুগ্ন ব্যক্তির কপালে ও ধমনীতে হাত রাখতেন। কখনোবা বুকে, পেটে ও মুখমন্ডলে সস্নেহে হাত বুলাতেন। রোগী কি খেয়েছে জিজ্ঞাসা করতেন। সে কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে তা ক্ষতিকর না হলে এনে দিতেন। সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলতেনঃ 'চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ চাহেন তো অচিরেই তুমি রোগমুক্ত হবে।' রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করতেন। হযরত সা'দের জন্য তিনবার দোয়া করেছিলেন। মোশরেক চাচাদেরও রোগব্যাধি হলে দেখতে যেতেন। একটা রুগ্ন ইহুদী শিশুকেও তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। (শিশুটি পরবর্তিতে ঈমান এনেছিল)। এ কাজের জন্য কোন দিন বা সময় নির্দিষ্ট থাকতোনা। যখনই খবর পেতেন এবং সময় পেতেন দেখতে যেতেন।

একবার হযরত জাবেরের অসুখ হলো। রসূল সা. হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে পায়ে হেটে অনেক দূর পর্যন্ত গেলেন। (মদীনার জনবসতি ছড়ানো ছিটানো ছিল।) হযরত জাবের বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখে ওযু করলেন, পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। এতে রোগীর অবস্থার উন্নতি হতে লাগলো। এমনকি হযরত জাবের কথাবার্তা বললেন এবং নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি এতটা মানবদরদী ছিলেন যে, এমনকি মুনাফিকদের নেতা রোগাক্রান্ত আব্দুল্লাহ বিন উবাইকেও দেখতে গিয়েছিলেন।

কেউ মারা গেলে সেখানে চলে যেতেন। মুমূর্ষ অবস্থায় খবর পেলে বা ডাকা হলে গিয়ে তাওহীদের ব্যাপারে ও আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারে নসিহত করতেন। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন, ধৈর্যের উপদেশ দিতেন এবং চিৎকার করে কাঁদতে নিষেধ করতেন। সাদা কাপড়ে কাফন দিতে তাগিদ দিতেন এবং দাফন কাফন দ্রুত সম্পন্ন করতে বলতেন। দাফনের জন্য লাশ নিয়ে যাবার সময় সাথে সাথে যেতেন। মুসলমানদের জানাযা নিজেই পড়াতেন এবং গুনাহ মাফ করার জন্য দোয়া করতেন। কোন লাশ যেতে দেখলে তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে যেতেন, চাই সে লাশ কোন অমুসলিমেরই হোক না কেন। (কোন কোন বর্ণনায় রসূল সা.) বসে থাকতেন এ কথাও বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, দাঁড়ানোর রীতি রহিত হয়ে গিয়েছিল। (যাদুল মায়াদ ১৪৫ পৃঃ)। তিনি প্রতিবেশীদের উপদেশ দিতেন মৃতের পরিবারের জন্য খাবার পাঠাতে। (আজকাল উল্টো মৃতের বাড়ীতে অন্যদের ভোজের আয়োজন হয়ে থাকে)। আনুষ্ঠানিক শোক সভা কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকাকে খুবই অপছন্দ করতেন।

প্রবাস থেকে ফিরে কেউ সাক্ষাত করতে চাইলে তার সাথে আলিঙ্গন করতেন, কখনো কখনো কপালে চুমু খেতেন। কাউকে প্রবাসে যাওয়ার সময় বিদায় জানাতে গেলে তাকে এই বলে অনুরোধ করতেন ঃ দোয়া করার সময় আমাদের কথা মনে রেখ।

স্নেহ ও ভালোবাসার আতিশয্যে কারো কারো সাথে এত অমায়িক ও সহজ হয়ে যেতেন যে, প্রিয়জনের নাম সংক্ষেপ করে ডাকতেন। যেমন আবু হুরায়রাকে সংক্ষেপে 'আবু হুর'

এবং হযরত আয়েশাকে কখনো কখনো 'আয়েশ' নামে ডাকতেন।

শিশুদের সাথে রসূল সা. এর বড়ই মাখামাখি ছিল। শিশু দেখলেই তার মাথায় হাত বুলাতেন, আদর করতেন, দোয়া করতেন এবং একেবারে ছোট শিশু কাছে পেলে তাকে কোলে নিয়ে নিতেন। শিশুদের মন ভুলানোর জন্য চমক লাগানো কথা বলতেন। যেমন বলতেন ঃ টিকটিকিরা ভাই রাতে মশার চোখে ঘা মারে দাঁতে।' একবার এক নিষ্পাপ শিশুকে চুমু খেতে খেতে বলেছিলেনঃ শিশুরা আল্লাহর বাগানের ফুল। শিশুদের নাম রাখতেন। কখনো কখনো শিশুদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পুরস্কারের ভিত্তিতে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করাতেন যে, দেখবো কে আগে আমাকে ছুঁতে পারে। শিশুরা দৌড়ে আসতো। কেউ তার পেটের ওপর আবার কেউ বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো। শিশুদের সাথে হাসি তামাশা করতেন। যেমন হযরত আনাসকে কখনো কখনো আদর করে বলতেঃ 'ও দুই কান ওয়ালা'। হযরত আনাসের ভাই আবু উমাইরের পালিত পাখির ছানাটি মরে গেলে সে উদাস ভাবে বসেছিল। রসূল সা. তাদের বাড়ীতে এসে ডাক দিলেন ঃ 'ও আবু উমায়ের, কোথায় তোমার নুগায়ের (পাখির শাবক)? আর এক শিশু আব্দুল্লাহ বিন বশীরের মাধ্যমে তার মা রসূল সা. কে আংগুর পাঠালেন। আব্দুল্লাহ পথেই সব আংগুর খেয়ে ফেললো। পরে যখন বিষয়টা জানাজনি হয়ে গেল, তখন রসূল সা. আদরের সাথে আব্দুল্লাহর কান ধরে বললেন ঃ ' يا غدر يا غدر ওরে ধোকাবাজ, ওরে ধোকাবাজ।' প্রবাস থেকে আসার পথে যে শিশুকে পথে দেখতেন, সওয়ারীর পিঠে পিঠে চড়িয়ে আনতেন। শিশু ছোট হলে সামনে এবং বড় হলে পেছনে বসাতেন। মৌসুমের প্রথম ফসল ফলমূল আনা হলে তা বরকতের দোয়াসহ কোন শিশুকে আগে খেতে দিতেন। তনি মনে করতেন এই শিশু ভবিষ্যতে ইসলামী আন্দোলনের নেতা হবে।

বুড়ো মানুষদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নিজের অন্ধ প্রবীণ পিতাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য যখন রসূল সা. এর কাছে নিয়ে এলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ওঁকে কষ্ট দিয়েছ কেন? আমি নিজেই তাঁর কাছে চলে যেতাম।

মহানুভবতার এমন চরম পরাকাষ্টা দেখাতেন যে, মদীনার আধ পাগলী গোছের এক মহিলা যখন এসে বললো, আপনার কাছে আমার কিছু কথা নিভৃতে বলার আছে, তখন তিনি বললেন, বেশ চল, অমুক গলিতে অপেক্ষা কর, আমি আসছি। তারপর সেখানে গিয়ে তার অভাব অভিযোগের কথা শুনে আসলেন এবং তার প্রতিকারও করলেন।[৩০] এ ধরনের ঘটনা আদী ইবনে হাতেমও দেখেছিলেন এবং রসূল সা. এর মহানুভবতাকে নবুয়তের আলামত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

রসূল সা. কত অমায়িক ছিলেন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কত মধুর স্বভাবের পরিচয় দিতেন, হযরত আনাস রা. তার চমৎকার ছবি এঁকেছেন। তিনি বলেন ঃ

'আমি দশ বছর যাবত রসূলের সা. সেবায় নিয়োজিত থেকেছি। তিনি কখনো বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করেননি। কোন কাজ যেভাবেই করে থাকি, কখনো বলেননি,

---

[৩০] আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৯৫।

এভাবে করলে কেন? আর না করলেও কখনো বলেননি, এটা কেন করলেন না? তাঁর ভৃত্য ও চাকরানীদের সাথেও এ রকমই ব্যবহার করতেন। তিনি কাউকে কখনো প্রহার করেননি।'

হযরত আয়েশা রা. বলেন, তিনি কখনো স্ত্রী বা চাকর চাকরানীদের মারেননি। কারো কাছ থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। অবশ্য আল্লাহর পথে জেহাদ করতে গিয়ে কিংবা আল্লাহর আইন অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি বিধান করতে গিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকলে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

ব্যক্তিগত জীবন

সাধারণত সেই সব লোককেই নেতা বলা হয়ে থাকে, যারা সামষ্টিক জীবনের একটা কৃত্রিম আলখেল্লা পরে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যেয়েই সে আলখেল্লা খুলে ফেলেন। বাইরে প্রচুর মহত্ব ও উদারতার মহড়া দেখান, কিন্তু ঘরোয়া জীবনে গিয়েই নেমে যান ইতরামির সর্বনিম্ন স্তরে। লোক সমাজে সরলতা ও বিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা দেখান, আর গৃহে ফিরেই বিলাসিতায় ও আরাম আয়েশে মেতে ওঠেন। সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে কোন ব্যক্তির যত বেশী ব্যবধান ও দূরত্ব হবে, ততই যেন তার মর্যাদা হবে। অথচ রসূল সা.-এর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন ছিল একই রকম।

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলো, রসূল সা. ঘরোয়া জীবনে কী কী করতেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ রসূল সা. সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। নিজের কাপড় চোপড়ের তদারকী নিজেই করতেন। (অর্থাৎ পোকামাকড় লাগলো কিনা সেদিকে নজর রাখতেন)। ছাগলের দুধ নিজেই দোহাতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজেই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতে হলে নিজেই লাগাতেন, জুতো মেরামত করতেন। বোঝা বহন করতেন, পশুকে খাদ্য দিতেন। কোন ভৃত্য থাকলে তার কাজে অংশ নিতেন, যেমন তার সাথে আটা পিষতেন, কখনো একাই পরিশ্রম করতেন, বাজারে যেতে কখনো লজ্জা বোধ করতেন না। নিজেই বাজার সদাই করে আনতেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাধারণত একখানা কাপড়ে বেধে আনতেন। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, রসূল সা. ঘরোয়া জীবনে কেমন আচরণ করতেন? হযরত আয়েশা জবাবে বলেন ঃ সবচেয়ে বিনম্র স্বভাবের, হাসিমুখে প্রফুল্ল আচরণ তিনি করতেন। কেমন বিনম্র স্বভাবের ছিলেন তা বুঝা যায় এই উক্তি দ্বারা যে, 'কখনো কোন ভৃত্যকে ধমক পর্যন্ত দেননি।'[৩১] আপন পরিবার পরিজনের সাথে সহৃদয় আচরণে রসূলুল্লাহর সা. কোন জুড়ি ছিলনা। (সহীহ মুসলিম)

একবার হযরত ইমাম হোসেনের জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আলী রা. বললেন ঃ রসূল সা. বাড়ীতে থাকাকালে তিন ধরনের কাজে সময় কাটাতেন। কিছু সময় কাটাতেন আল্লাহর এবাদতে, কিছু সময় দিতেন পরিবার পরিজনকে এবং কিছু সময় বিশ্রামে ব্যয় করতেন। এই তিন সময় থেকেই একটা অংশ সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য বের করতেন। মসজিদের সাধারণ বৈঠক ছাড়াও যদি কোন বন্ধু বান্ধব একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হতে চাইত কিংবা

---

৩১. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৯৩।

যদি কোন অতিথি আসতো, অথবা যদি কেউ কোন অভাব অভিযোগ জানাতে আসতো, তবে তাদেরকে তাঁর বিশ্রামের সময় থেকে কিছু সময় দিতেন। এতে করে দেখা যায় যে, তাঁর বিশ্রামের জন্য খুব কম সময় অবশিষ্ট থাকতো।৩২.

স্ত্রীদের খোরপোশ ও বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও তাঁকেই করতে হতো। তাছাড়া তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থার ভারও তাঁরই কাঁধে ন্যস্ত ছিল। অতপর তাঁদের দ্বারাই মহিলাদের সংশোধনের কাজ চালু রাখা হতো। মহিলারা তাদের নানা সমস্যা নিয়ে আসতো এবং উম্মুল মুমিনীনগণের মাধ্যমে তার সমাধান চাইতো। তবুও তিনি বাড়ীর পরিবেশকে একদিকে যেমন নিরস ও একঘেয়ে হতে দেননি, অন্যদিকে তেমনি সেখানে কোন কৃত্রিমতার সৃষ্টিও হতে দেননি। তাঁর সংসার একজন মানুষের সংসারের মতই ছিল এবং তার পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবাবেগের জোয়ার ভাটা থাকতো। সেখানে অশ্রুও ঝরতো এবং মুচকি হাসিও দীপ্তি ছড়াতো। এমনকি কখনো কখনো কিছু ঈর্ষাকাতরতা জনিত উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়ে যেত। উদ্বেগ ও অস্থিরতা যেমন বিরাজ করতো, তেমনি আনন্দের মুহূর্তও আসতো। রসূল সা. যখন বাড়ীতে আসতেন, তখন ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের মত আসতেন এবং এক অপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত। কথাবার্তা হতো। কখনো কখনো গল্প বলাবলিও হতো। মজার মজার কৌতুক-রসিকতাও চলতো। যেমন হযরত আয়েশা রা. নিজের একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি খামীরা (গোশতের কিমার সাথে আটা দিয়ে রান্না করা এক ধরনের খাদ্য) বানালাম। হযরত সওদাও রা. সেখানে ছিলেন। রসূল সা. আমাদের দুজনের মাঝখানে বসেছিলেন। একটা অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিবেশ বিরাজ করছিল। আমি সওদাকে বললাম, খাও। সে অস্বীকার করলো। আমি আবার পিড়াপিড়ী করলাম। সে তবুও বললো, খাবোনা। আমি আরো জিদ ধরে বললাম, তোমাকে খেতেই হবে। সে এবারও খেতে রাযী হলোনা। আমি বললাম যদি না খাও, তবে আমি ঐ খামীরা তোমার মুখে মেখে দেবো। সওদা জিদ বহাল রাখলো। আমি সত্যি সত্যি খামীরার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠ তুললাম এবং সওদার মুখে লেপ্টে দিলাম। রসূল সা. তা দেখে খুব হাসলেন। তিনি সওদাকে বললেন, তুমিও আয়েশার মুখে লেপ্টে দাও। উভয়ে সমান হয়ে যাক। সওদাও তৎক্ষণাত আয়েশার মুখে মেখে দিল। এবার রাসূল সা. আবারও হাসলেন।৩৩.

একবার হযরত আবু বকর রা. এসে দেখেন, আয়েশা রসূল সা. এর সাথে জোরে জোরে কথা বলছেন। আবু বকর রা. রেগে গিয়ে তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। রসূল সা. তাকে শান্ত করলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে কোন রাগারাগি হয়নি। তবুও হযরত আবু বকর রাগ নিয়েই চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর রসূল সা. হযরত আয়েশাকে তীর্যক স্বরে বললেন, দেখলে তো কিভাবে আমি তোমাকে রক্ষা করলাম?

ঘরোয়া জীবনের এই স্বাভাবিক উত্থান পতনকে কেউ কেউ ইসলামী আদর্শের চেয়ে নীচু মানের মনে করেন। বিশেষত রসূল সা. এর পারিবারিক জীবনের এমন একটা ছবি তারা

---

৩২. শামায়েলে তিরমিযী, রসূল (সা) এর বিনয় ও সরলতা সংক্রান্ত অধ্যায়।

৩৩. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৯৬-২৯৭।

অন্তরে পোষণ করেন, যেন সেখানে কতিপয় অতিমানবীয় সত্তা বাস করতো, যাদের কোন ভাবাবেগ বা কামনা বাসনা ছিলনা। অথচ সে পরিবারটাও মানুষেরই পরিবার ছিল। তাদের মধ্যে যাবতীয়, মানবীয়, ভাবাবেগ বিদ্যমান ছিল। তবে ঐ পরিবারটায় আল্লাহর নাফরমানী বা পাপের অস্তিত্ব ছিলনা। এদিক থেকে ওটা ছিল আদর্শ পরিবার। রাতের বেলা যখন রসূল সা. ঘুমাতে যেতেন, তখন পরিবার পরিজনের সাথে তাঁর সাধারণ কথাবার্তা হতো। কখনো ঘরোয়া বিষয়ে, আবার কখনো সাধারণ মুসলমানদের সমস্যাবলী নিয়ে। এমনকি কখনো কখনো গল্পও শোনাতেন। একবার তিনি হযরত আয়েশাকে উম্মে যারার গল্প বলেন। এই কাহিনীতে এগারো জন মহিলা পরস্পরের কাছে নিজ নিজ স্বামীর স্বভাব চরিত্র বর্ণনা করে। এদের মধ্যে এক মহিলা ছিল 'উম্মে যারা'। সে তার স্বামী আবু যারা'র মনোমুগ্ধকর চরিত্র বর্ণনা করে। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এটা বড়ই মজার কাহিনী। উপসংহারে রসূল সা. হযরত আয়েশাকে বলেন, উম্মে যারার জন্য আবু যারা যেমন ছিল, আমিও তোমার জন্য তেমনি। অনুরূপভাবে আর একবার কোন এক মজলিসে তিনি একটা গল্প শোনালেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক মহিলা বলে উঠলো, এতো 'খুরাফার' গল্পের মত। খুরাফা আরবের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বহু সংখ্যক চমকপ্রদ কিস্‌সা কাহিনী লিখে গেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। রসূল সা. ঐ মহিলাকে বললেন, খুরাফা কে ছিল তা জান? অতঃপর তিনি এই খোরাফা নামক খ্যাতনামা ব্যক্তির কাহিনীও শোনালেন। বনু আযরা গোত্রের এই ব্যক্তিকে জিনেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরে আবার ফেরত দিয়ে গিয়েছিল।[৩৪]

রসূল সা. এর আজীবন এই অভ্যাস ছিল যে, রাতের শেষার্ধের প্রথম দিকে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে ওযূ ও মেছওয়াক করার পর তাহাজ্জুদ পড়তেন।[৩৫] কোরআন খুব ধীরে ধীরে পড়তে গিয়ে নামাযে কখনো কখনো এত দীর্ঘ কেয়াম (দাঁড়িয়ে থাকা) করতেন যে, পা ফুলে যেত।[৩৬] সাহাবাগণ তাঁর এই কষ্ট দেখে বলতেন, আল্লাহ তো আপনার আগে পাছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তবুও আপনি এত কষ্ট কেন করেন। রসূল সা. বললেন, তাই বলে আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবনা?[৩৭]

গৃহ ও গৃহের আসবাবপত্র সম্পর্কে রসূল সা. এর দৃষ্টিভংগী ছিল এরূপ যে, দুনিয়ার জীবনটা একজন পথিকের মত কাটানো উচিত। তিনি বলেন, আমি সেই পথিকের মত, যে কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে, অতপর নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হয়ে যায়। অর্থাৎ যারা আখেরাতকে গন্তব্যস্থল রূপে গ্রহণ করে, দুনিয়ার জীবনকে কেবল কর্তব্য সম্পাদন বা পরীক্ষার অবসর মনে করে কাটিয়ে দেয়, এবং যাদের এখানে বসে উচ্চতর লক্ষ্য জান্নাত লাভের জন্য কাজ করতে হবে, তাদের বড় বড় গগনচুম্বী বাড়ীঘর বানানো, সেগুলোকে আসবাবপত্র দিয়ে ভরে তোলা, এবং প্রাণ ভরে আরাম আয়েশ

৩৪. শামায়েলে তিরমিযী ।
৩৫. যাদুল মায়াদ।
৩৬. তিরমিযী : ইবনুল মুসাইয়েব কর্তৃক বর্ণিত।
৩৭. যাদুল মায়াদ ।

উপভোগ করার সুযোগ কোথায়? এ জন্য তিনিও তাঁর সাহাবীগণ উঁচুমানের বাড়ীঘরও বানাননি। সেগুলোতে আসবাবপত্রও জমা করেননি এবং সেগুলোর সাজসজ্জা ও জাকজমক বাড়াননি। তাঁদের বাড়ীঘর উত্তম মুসাফির খানা ছিল বলা যায়।[৩৮] ঐ সব বাড়ীতে শীত ও গরম থেকে আত্মরক্ষা, জীব জানোয়ার থেকে নিরাপত্তা ও পর্দাপুশিদার ভালো ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। রসূল সা. মসজিদে নববীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট কক্ষ স্বীয় স্ত্রীদের জন্য তৈরী করিয়েছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছাড়া আর কোন সাজসজ্জা তাতে ছিল না। পরিচ্ছন্নতার রুচি রসূল সা. এর এত তীব্র ছিল যে, সাহাবীদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন নিজ নিজ বাড়ীর আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখে।[৩৯]

তৈজসপত্রের মধ্যে কয়েকটি ছিল একেবারেই সাদামাটা ধরনের। যেমন একটা কাচের পেয়ালা, যার ওপর লোহার পাত লাগানো ছিল। পানাহারে এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। খাদ্য সম্ভার সঞ্চয় করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের মত খাবারও থাকতোনা। খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার তৈরী তোষক ছিল তাঁর বিছানা। বানের তৈরী চৌকি এবং টাটের তৈরী বিছানাও ব্যবহার করতেন। এই বিছানা দু'ভাজ করে বিছানো হতো। একবার চার ভাজ করে বিছানো হলে সকাল বেলা সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে বিছানায় এমন আরামদায়ক কী ব্যবস্থা ছিল যে, আমার গাঢ় ঘুম হয়েছে এবং তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে? যখন আসল ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তখন বললেন, বিছানাকে আগের মতো দু'ভাজ করে রেখে দাও। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে শোয়ার অভ্যাসও ছিল। একবার চৌকির কাঠের দাগ শরীরে দেখে রসূল সা. এর কতিপয় সাহাবী (হযরত ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কেঁদে ফেলেছিলেন।[৪০]

আর একবার এরূপ নগ্ন চৌকিতে শুয়ে তাঁর শরীরে দাগ পড়ে গেছে দেখে হযরত ওমরের চোখে পানি এসে গেল। রসূল সা. তাঁর চোখে পানি আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত ওমর বললেন, রোম ও ইরানের সম্রাটরা ভোগবিলাসসে মত্ত আর আপনার এই অবস্থা। রসূল সা. বললেন, 'ওমর! তুমি কি এতে খুশী নও যে, তারা দুনিয়া নিয়ে যাক, আর আমরা আখেরাত লাভ করি?'

পানাহার

রসূল সা. এর পানাহার রুচিটা ছিল অত্যন্ত ছিমছাম ও ভদ্রজনোচিত। তিনি গোশতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন পিঠ, উরু ও ঘাড়ের গোশত। পাশের হাড়ও তার বিশেষ প্রিয় ছিল। গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটি টুকরো টুকরো করে ভিজিয়ে রেখে 'ছারীদ' নামক যে উপাদেয় আরবীয় খাবার তৈরী করা হতো, সেটাও তিনি খুবই পছন্দ করতেন। অন্যান্য প্রিয় খাবারের মধ্যে মধু, সের্কা ও মাখন ছিল অন্যতম। দুধের সাথে খেজুর খেতেও ভালোবাসতেন। (এটা একটা চমৎকার পুষ্টি খাদ্যও বটে।) মাখন মাখানো খেজুরও তাঁর কাছে একটা মজাদার খাবার ছিল। রোগীপথ্য হিসাবে ক্যালরিযুক্ত

---

৩৮. আদুল মুফরাদ।
৩৯. তিরমিযী।
৪০. শামায়েলে তিরমিযী।

খাদ্য পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। প্রায়ই জবের ছাতু খেতেন। একবার বাদামের ছাতু খেতে দেয়া হলে তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এটা বিত্তশালীদের খাদ্য। বাড়ীতে তরকারী রান্না হলে প্রতিবেশীর জন্য একটু বেশী করে তৈরী করতে বলতেন।

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল মিষ্টি পানি এবং তা বিশেষ যত্নের সাথে দু'দিনের দূরত্ব থেকে আনানো হতো। পানি মেশানো দুধ এবং মধুর শরবতও সাগ্রহে পান করতেন। মাদক নয় এমন খেজুরের নির্যাসও পছন্দনীয় ছিল। মশক বা পাথরের পাত্রে পানি ঢেলে খেজুর ভেজানো হতো এবং তা এক নাগাড়ে সারা দিন ব্যবহার করতেন। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ রাখা হলে মাদকতার সৃষ্টি হতে পারে, এই আশংকায় তা ফেলে দিতেন। আবু মালেক আশয়ারীর বর্ণনা অনুসারে তিনি বলেছেনও যে, আমার উম্মতের কেউ কেউ মদ খাবে, কিন্তু তার নাম পাল্টে নাম রাখবে। (ইতিহাস সাক্ষী যে, পরবর্তী কালের শাসকরা ফলের নির্যাস নামে মদ খেতো।)

এক এক ব্যক্তির আলাদা আলাদাভাবে খাওয়া দাওয়া করা পছন্দ করতেন না। একত্রে বসে খাওয়ার উপদেশ দিতেন। চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করাকে নিজের বিনয়ী স্বভাবের বিপরীত মনে করতেন। অনুরূপভাবে দস্তরখানের ওপর ছোট ছোট পেয়ালা পিরিচে খাবার রাখাও নিজের রুচি বিরোধী মনে করতেন। স্বর্ণরৌপ্যের পাত্রকে একেবারেই হারাম ঘোষণা করেছেন। কাঁচ, মাটি, তামা ও কাঠের পাত্র ব্যবহার করতেন। দস্তরখানের ওপর হাত ধোয়ার পর জুতো খুলে বসতেন। ডান হাত দিয়ে নিজের সামনের দিক থেকে খাবার তুলে নিতেন। পাত্রের মাঝখানে হাত রাখতেন না। হেলান দিয়ে বসে পাহানার করার অভ্যাসও তাঁর ছিলনা। কখনো দুই হাঁটু খাড়া করে এবং কখনো আসন গেড়ে বসতেন। প্রতি গ্রাস খাবার মুখে তোলার সময় বিছমিল্লাহ পড়তেন। যে খাদ্যদ্রব্য অপছন্দ হতো কোন দোষ উল্লেখ না করেই তা বাদ দিতেন। বেশী গরম খাবার খেতেন না। কখনো কখনো রান্না করা খাবার ছুরি দিয়ে কেটে খেতেন। তবে এটা তাঁর কাছে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর মনে হতো এবং এটা তেমন ভালোবাসতেন না।[৪১] রুটি ইত্যাদি সব সময় তিনি আংগুল দিয়ে ধরতেন এবং আংগুলে তরকারী ইত্যাদি লাগতে দিতেন না। কখনো কখনো ফলমূল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হাটা চলা করা অবস্থায় খেতেন না। দুটো ফল এক সাথেও খেতেন–যেমন এক হাতে খেজুর অপর হাতে তরমুজ ইত্যাদি। খেজুরের আটি বাম হাত দিয়ে ফেলে দিতেন। দাওয়াত কখনো ফেরত দিতেন না। যদি অন্য কেউ ঘটনাক্রমে তাঁর সাথে থাকতো (আলাপরত থাকার কারণে বা অন্য কোন কারণে) তবে তাকে সাথে নিয়ে যেতেন ঠিকই, কিন্তু বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে তার জন্য অনুমতি নিতেন। কোন মেহমানকে খাওয়ালে বারবার তাকে বলতেন যে, লজ্জা শরম বাদ দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খাও। খাবার মজলিস থেকে ভদ্রতার খাতিরে সবার শেষে উঠতেন। অন্যদের খাওয়া আগে শেষ হলে তিনিও দ্রুত শেষ করে তাদের সাথে উঠে

---

৪১. বুখারী ও মুসলিম (আমর বিন উমাইয়া কর্তৃক বর্ণিত) আবু দাউদ ও বায়হাকী (হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত)।

যেতেন। খাওয়ার শেষে হাত অবশ্যই ধুয়ে নিতেন এবং আল্লাহর শোকর আদায় এবং জীবিকা ও বাড়ীওয়ালার জন্য বরকত কামনা করে দোয়া করতেন। কোন খাবার জিনিস উপঢৌকন পেলে উপস্থিত বন্ধুদের তাতে শরীক না করে ছাড়তেন না এবং অনুপস্থিত বন্ধুদের অংশ রেখে দিতেন। খাবার মজলিশে একটি দানাও নষ্ট না হয়, এরূপ যত্নসহকারে খেতে সবাইকে প্রশিক্ষণ দিতেন। পানি খাওয়ার সময় ঢক ঢক শব্দ করতেন না এবং সাধারণত তিনবার মুখ সরিয়ে শ্বাস নিয়ে খেতেন। প্রতিবার বিছমিল্লাহ বলে আরম্ভ ও আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করতেন। সাধারনত বসে পানি খাওয়াই তাঁর নিয়ম ছিল। তবে কখনো কখনো দাঁড়িয়েও পানি পান করেছেন। মজলিসে কোন পানীয় জিনিস এলে সাধারণতঃ ডান দিক থেকে পরিবেশন শুরু করতেন। যেখানে একটা জিনিসের পরিবেশন শেষ হতো, সেখান থেকেই পরবর্তী জিনিসের পরিবেশন শুরু হতো। বেশী বয়স্ক লোকদের অগ্রাধিকার দিতেন, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা ধারাবাহিকতায় যাদের প্রাপ্য, তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই ধারাবাহিকতা ভংগ করতেন। বন্ধুদের কিছু পান করালে নিজে সবার শেষে পান করতেন এবং বলতেন, 'যে পান করায় সে সবার শেষে পান করে।' খাদ্য পানীয়ে ফু দেয়া ঘ্রাণ নেয়া অপছন্দ করতেন। মুখের দুর্গন্ধ অপছন্দনীয় ছিল বিধায় কাঁচা পেয়াজ ও রশুন খাওয়া কখনো ভালোবাসতেন না। খাদ্য পানীয় দ্রব্য সব সময় ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন কোন খাবার এলে খাওয়ার আগে তার নাম জেনে নিতেন। বিষ খাওয়ার ঘটনার পর তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন অজানা লোক খানা খাওয়ালে প্রথমে এক দু'লোকমা তাকে খাওয়াতেন।

এত তীব্র রুচিবোধের পাশাপাশি বেশীর ভাগ সময় ক্ষুধা ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত থাকতেন। এ ব্যাপারে যথাস্থানে বিশদ বিবরণ দেয়া হবে। তিনি বলেছেনঃ 'আমার খানাপিনা আল্লাহর একজন সাধারণ বান্দার মতই।'

ওঠাবসা ও শয়ন

কখনো আসন গেড়ে বসতেন, কখনো দু'হাত দিয়ে দু'উরুর চার পাশ জড়িয়ে ধরে বসতেন, আবার কখনো হাতের পরিবর্তে কাপড় (চাদর ইত্যাদি) দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন। বসা অবস্থায় হেলান দিলে সাধারণত বাম হাতের ওপর হেলান দিতেন। কোন বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করার সময় একটা কাঠের টুকরো দিয়ে মাটি খোঁচাতে থাকতেন। সাধারণত ডান দিকে কাত হয়ে এবং ডান হাতের তালুর ওপর ডান গাল রেখে শুতেন। কখনো কখনো চিত হয়েও শুতেন এবং পায়ের ওপর পা রাখতেন। তবে সতরের দিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। উপুড় হয়ে শোয়া তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন এবং সবাইকে তা থেকে বারণ করতেন। এমন অন্ধকার ঘরে শোয়া পছন্দ করতেন না যেখানে বাতি জ্বালানো হয়নি। খোলা ছাদে শোয়া ভাল মনে করতেন না। ওযু করে ঘুমানোর অভ্যাস ছিল এবং ঘুমানোর আগে বিভিন্ন দোয়া ছাড়াও সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে শরীরে ফুঁক দিয়ে নিতেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃদু নাক ডাকার শব্দ বেরুতো। রাত্রে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলে পবিত্রতা অর্জনের পর হাতমুখ অবশ্যই ধুয়ে নিতেন। ঘুমানোর জন্য আলাদা লুংগী ছিল। গায়ের জামা খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন।

মানবীয় প্রয়োজন

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সেকালে পায়খানার প্রথা না থাকায় তিনি মাঠে জংগলে চলে যেতেন। সাধারণত এত দূর চলে যেতেন যে চোখের আড়াল হয়ে যেতেন। কখনো কখনো দু'মাইল পর্যন্ত দূরে চলে যেতেন। এজন্য এমন নরম মাটি খুজতেন, যাতে ছিটে না আসে। প্রয়োজন পূরণের জায়গায় প্রথমে বাম পা ও পরে ডান পা রাখতেন। বসার সময় ভূমির অতি নিকটে গিয়েই কাপড় খুলতেন। কোন টিলা বা গাছ ইত্যাদির আড়ালেই বসতেন। এ সময় পায়ে জুতো ও মাথায় আচ্ছাদন নিয়েই বেরুতেন। কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসতেন না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় হাতের আংটি খুলে নিতেন। (কারণ তাতে আল্লাহ ও রসূলের সা. নাম খোদিত ছিল। সব সময় বাম হাত দিয়ে শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। প্রয়োজনের জায়গা থেকে বেরুবার সময় প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা ফেলতেন।

গোছলের জন্য পর্দাকে অপরিহার্য গণ্য করেছিলেন। ঘরে গোছল করলে কাপড়ের পর্দা টানিয়ে নিতেন। বৃষ্টিতে গোছল করলে মাথায় লুংগি বেঁধে নিতেন। হাঁচি দেয়ার সময় স্বল্প শব্দ করতেন এবং হাত বা কাপড় মুখে চেপে নিতেন।

প্রবাস

প্রবাসে বা সফরে রওনা হবার জন্য বৃহস্পতিবারটা অধিক পছন্দ করতেন। বাহনকে দ্রুত চালাতেন। বিরতিস্থল থেকে সকাল বেলা যাত্রা করাই তাঁর অভ্যাস ছিল। প্রবাসকালে যে সব সামষ্টিক কাজ থাকতো, তাতে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতেন। একবার রান্নার আয়োজন ছিল। সঙ্গীরা যখন নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিল, তখন তিনিও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন। সবাই বললো, আপনার কষ্ট করার দরকার নেই। আমরাই যথেষ্ট। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে পৃথক মর্যাদা নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করিনা।[৪২] ভ্রমণকালে পালাক্রমে কোন কোন পদাতিক সহযাত্রীকে নিজ বাহনে আরোহন করাতেন। রাতের বেলা প্রবাস থেকে ফেরা পছন্দ করতেন না। ফিরলে সোজা বাড়ীতে যাওয়ার পরিবর্তে আগে মসজিদে গিয়ে নফল নামায পড়ে নিতেন। বাড়ীতে খবর পৌঁছার পর বাড়ীতে যেতেন।

আবেগ ও অনুভূতি

আবেগ ও অনুভূতির কথা বাদ দিয়ে আমরা মানবতার কথা ভাবতে পারিনা। রসূল সা. এর মধ্যেও মানবীয় অনুভূতি সর্বোত্তম পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ। আনন্দে আনন্দিত ও দুঃখ বেদনায় ব্যথিত হতেন।

যারা সারা দুনিয়ার দুঃখশোকে মুহ্যমান হন, কিন্তু পরিবারের দুঃখশোকে পাষাণ ও নিরুদ্বেগ থাকেন, সেই সব তথাকথিত মহামানবদের কাতারে তিনি শামিল ছিলেননা। মহিয়ষী জীবন সংগিনীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। হযরত আয়েশার রা. সাথে একই পাত্রে পানি পান করতেন। আনসারদের মেয়েদেরকে ডেকে আনাতেন তাঁর

---

৪২. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৪)।

স্ত্রীদের সাথে খেলা করার জন্য। নিগ্রোদের ক্রীড়া নৈপুন্য দেখতে দেখতে হযরত আয়েশা রা. এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, রসূল সা. এর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে দেখছিলেন। এরপরও তিনি যখন আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি তোমার তৃপ্তি হয়েছে? তখন হযরত আয়েশা বললেন, 'না আরো দেখবো।' এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।[৪৩] হযরত সাফিয়া রা. কে উটের ওপর আরোহন করানোর জন্য তিনি নিজের হাটু এগিয়ে দেন এবং সেই হাটুর ওপর দাঁড়িয়ে সাফিয়া রা. উটে আরোহন করেন। একবার উষ্ট্রী পা পিছলে পড়ে গেলে রসূল সা. এবং হযরত সফিয়া মাটিতে পড়ে যান। হযরত আবু তালহা সাথে ছিলেন। তিনি রসূল সা. এর কাছে ছুটে গেলে তিনি বললেন, আগে মহিলাকে উদ্ধার কর। একবার কাফেলার তত্ত্বাবধায়ক উটগুলোকে দ্রুত চালালে রসূল সা. বললেন, 'সাবধান, কাঁচের পাত্র রয়েছে কাঁচের পাত্র। একটু ধীরে, সাবধান।[৪৪] এই ভালোবাসার কারণেই একবার মধু না খাওয়ার কসম খেয়ে ফেলেছিলেন। এবং সে জন্য 'হালাল জিনিসকে হারাম করোনা' বলে কুরআনে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল।[৪৫]

নিজের সন্তানদের প্রতিও রসূল সা. এর স্নেহ মমতা ছিল অত্যন্ত গভীর। হযরত ইবরাহীমকে মদীনার উপকণ্ঠে এক কামার পরিবারের ধাই এর কাছে দুধ খাওয়াতে দিয়েছিলেন। তাকে দেখতে অনেক দূরে হেটে চলে যেতেন। ধূয়ায় আচ্ছন্ন ঘরে বসতেন এবং ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। হযরত ফাতেমা রা. এলে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করতেন। কখনো কখনো নিজে যেতেন। নিজের অবস্থা বলতেন এবং তাঁর অবস্থা শুনতেন। তাঁর দু'ছেলে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন রা. কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদের কোলে নিতেন, ঘাড়ে ওঠাতেন এবং নিজে ঘোড়া সেজে পিঠে চড়াতেন। নামাযের সময়ও তাদের ঘাড়ে উঠতে দিতেন। একবার হযরত আকরা বিন হাবিস তাঁকে হযরত হাসানকে চুমু খেতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, আমার তো দশটা ছেলে রয়েছে। কিন্তু কাউকেও এভাবে আদর করিনি। অথচ আপনি চুমু খান। রসূল সা. বললেন, যে দয়া স্নেহ করেনা সে দয়া স্নেহ পায়না।

ছেলে ইবরাহীম যখন মারা গেল, তখন শোকে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠলো। আরো এক মেয়ে তাঁর সামনেই মারা গেল। চাকরানী উম্মে আইমান চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। রসূল সা. তাকে নিষেধ করলেন। সে বললো, আপনিও তো কাঁদছেন। রসূল

---

৪৩. আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৬।

৪৪. বুখারী ও মুসলিম, (কাঁচের পাত্র দ্বারা নারীদের বুঝিয়েছেন)।

৪৫. পাশ্চাত্যের লেখকরা রসূল (সা) এর এই পবিত্র ও নির্মল দাম্পত্য জীবনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। অথচ তাদের সভ্যতায় সর্বাপেক্ষা দায়িত্বশীল ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে কয়জন মানুষ জন্মেছে, তারা শুধু যে ঘরোয়া জীবনেই পংকিলতার পর্যায়ে পৌঁছেনি বরং এই পরিমন্ডলের বাইরেও তারা জঘন্য কলংকময় জীবন যাপন করে থাকে। রসূল (সা) এর বৈশিষ্ট ছিল, তাঁর সমস্ত আবেগ অনুভূতি ও কামনাবাসনা নিজের স্ত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাও ছিল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় সুষমামন্ডিত। তিনি প্রকৃতির দাবীগুলোকে শালীনতার সীমার মধ্যে রেখে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন এবং দাম্পত্য প্রেমের এক পরিশীলিত রীতির পত্তন করেন।

সা. বললেন, এভাবে (নিঃশব্দে বা মৃদু শব্দে) কাঁদা নিষিদ্ধ নয়। মনের যে কোমলতা ও মমত্বের কারণে এই (মৃদু) কান্না আসে, সেটা আল্লাহর রহমত স্বরূপ। তাঁর মেয়ে উম্মে কুলসুমের কবরে যখন দাঁড়ান, তখনও তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। হযরত উসমান বিন মাযউনের লাশের সামনেও তাঁর চোখ অশ্রুসজল ছিল। তিনি তাঁর কপালে চুমু খেয়েছিলেন।[৪৬] নিজের কান্নার স্বরূপ বর্ণনা করে তিনি বললেন, 'চোখ অশ্রুসজল, হৃদয় মর্মাহত, কিন্তু তবুও আমরা মুখ দিয়ে এমন কোন কথা উচ্চারণ করবোনা, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। দুঃখ শোকের সময় প্রায়ই পড়তেন حسبنا الله ونعم الوكيل উচ্চশব্দে কখনো কাঁদতেন না, কেবল দীর্ঘ শ্বাস ছাড়তেন এবং বুকের মধ্য থেকে হাড়িতে সিদ্ধ হওয়ার শব্দের মত শব্দ বেরুতো।

এহেন দরদী হৃদয় যখন আল্লাহর কাছে কোন আকুতি জানাতো তখন সে সময়েও চোখের পাতায় অশ্রু মুক্তার মত চিক চিক করতো। একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কোরআন তেলাওয়াতের অনুরোধ করলেন। তিনি যখন সূরা নিসার এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেনঃ 'যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী হাজির করবো এবং তোমাকে এদের ওপর সাক্ষী বানাবো তখন কী উপায় হবে?' এসময় রসূলের সা. চোখ দিয়ে অশ্রুর স্রোত বয়ে গেল।[৪৭]

সমগ্র মানবজাতির প্রতি এবং বিশেষত মুসলিম জামায়াতের সদস্যদের প্রতি রসূল সা. এর যে গভীর স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি ছিল, তাঁর হৃদয়ের এই কোমলতাই ছিল তাঁর উৎস। এত কোমল হৃদয় এবং এত আবেগভরা মন নিয়েও রসূল সা. কঠিন বিপদ মুসিবতে যে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, সেটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার।

রসিকতা

আমি আগেই বলেছি, রসূল সা. সদা হাসিমুখ ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ 'তোমার ভাই-এর দিকে মুচকি হাসি নিয়ে তাকানোটাও একটা সৎ কাজ।' রসূল সা. এর সম্পর্কে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'তিনি অত্যন্ত হাসিমুখ ও সদাপ্রফুল্ল ছিলেন।'

পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিগণের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, তাঁরা জীবনের কঠিন দায়িত্বের বোঝাকে নিজেদের মুচকি হাসির সাহায্যে সহনীয় করে নেন। এবং সাথীদের হৃদয়ের গভীরে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেন। তিনি এমন অকৃত্রিম রসিকতা করতেন যে, তাঁর সাথীদের হৃদয়ে তার প্রতি গভীর ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়ে যেত।' তিনি হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে মজলিশে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলতেন। তবে সব সময় ভারসাম্য বজায় থাকতো। কথাবার্তায় রসিকতার মাত্রা থাকতো খাদ্যে লবণের মাত্রার সমান। তাতে কোন অন্যায় ও অসত্য কথাও আসতোনা, তা দ্বারা কারো মনে কষ্টও দেয়া হতোনা এবং কেউ অট্টহাসিতে ফেটেও পড়তোনা। সামান্য মুচকি হাসির সৃষ্টি করতো, যাতে শুধু দাঁত বের হতো মুখগহ্বর বা কণ্ঠনালি দেখা যেতনা।

---

৪৬. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৯৭।

৪৭. অধিকাংশ ঘটনা শামায়েলে তিরমিযী থেকে সংকলিত।

একবার হযরত আবু হুরায়রা অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি দেখি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন!' রসূল সা. বললেনঃ হাঁ, তা করি। তবে আমি কোন অন্যায় ও অসত্য কথা বলিনা।'

এখানে আমরা রসূল সা. এর রসিকতার কিছু নমুনা তুলে ধরছি, যা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত রয়েছে ঃ[৪৮].

জনৈক ভিক্ষুক তাঁর কাছে একটা বাহক উঠ চাইল। রসূল সা. বললেনঃ আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা দেবো। ভিক্ষুক অবাক হয়ে বললো, 'আমি ওটা দিয়ে কি করবো?' রসূল সা. বললেন, 'প্রত্যেক উটই কোন না কোন উটনীর বাচ্চা হয়ে থাকে।

এক বুড়ি এসে বললো, 'আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।' রসূল সা. রসিকতা করে বললেনঃ 'কোন বুড়ি জান্নাতে যেতে পারবেনা।' বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে উদ্যত হলো। রসূল সা. উপস্থিত লোকদের বললেন, 'ওকে বলো যে, আল্লাহ ওকে বুড়ি অবস্থায় নয় বরং যুবতী বানিয়ে জান্নাতে নেবেন। আল্লাহ বলেছেন, আমি জান্নাতের নারীদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করবো, তাদেরকে কুমারী সমবয়সী যুবতী বানাবো।' মোটকথা, জান্নাতে গমনকারীনীদের আল্লাহ নবযৌবন দান করবেন।

যাহের বা যোহায়ের নামক এক বেদুইনের সাথে রসূল সা. এর সখ্য ছিল। তিনি তাঁর এই বেদুইন বন্ধুকে শহর সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করতেন এবং বেদুঈন রসূল সা. কে গ্রাম সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করতো। কখনো কখনো সে আন্তরিক আবেগ সহকারে উপহার দিত। রসূল সা. অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে ঐ উপহারের দাম দিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, যাহের গ্রামে আমাদের প্রতিনিধি এবং আমরা শহরে তার প্রতিনিধি। এই যাহের একদিন বাজারে নিজের কিছু পণ্য বিক্রি করছিল। রসূল সা. পেছন থেকে চুপিসারে যেয়ে তার চোখ চেপে ধরলেন এবং বললেন, বলতো আমি কে। বেদুইন প্রথমে তো ত্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝতে পেরে আনন্দের আতিশয্যে রসূল সা. এর বুকের সাথে মাথা ঘষতে লাগলেনা। অতপর রসূল সা. রসিকতা করে বললেন, এই দাসটা কে কিনবে? যাহের বললো, হে রসূলুল্লাহ, আমার মত অকর্মন্য দাসকে যে কিনবে, সেই ঠকবে। রসূল সা. বললেন, আল্লাহর চোখে তুমি অকর্মন্য নও।

একবার এক মজলিসে খেজুর খাওয়া হলো। রসূল সা. রসিকতা করে খেজুরের আটি বের করে করে হযরত আলীর সামনে রাখতে লাগলেন। অবশেষে আটির স্তুপ দেখিয়ে বললেন, তুমি তো অনেক খেজুর খেয়েছ দেখছি। হযরত আলী বললেন, আমি আটিসুদ্ধ খেজুর খাইনি।

খন্দক যুদ্ধের সময় একটা ঘটনায় রসূল সা. এত হেসেছিলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। আমেরের পিতা সাঈদ তীর নিক্ষেপ করছিলেন। শত্রু পক্ষের জনৈক যোদ্ধা তীরের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। সে খুবই ত্বরিত গতিতে ঢাল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলতো, তাই সাদের তীর কোন মতেই তাকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছিলনা। শেষ বারে

---

৪৮. অধিকাংশ ঘটনা শামায়েলে তিরমিযী থেকে সংকলিত।

পুণরায় সা'দ তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। শত্রু সৈন্যটি যেই ঢালের বাইরে মাথা বের করেছে, আর যায় কোথায়। সা'দের তীর সোজা তার কপালে গিয়ে বিঁধলো, সে এমন জোরে মাথা ঘুরে পড়লো যে, তার ঠ্যাং দুটো ওপরের দিকে ওঠে গেল।

পরবর্তী কালের লোকেরা তাঁর এ ধরনের রসিকতার কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। কেননা একে তো ধর্মের সাথে সব সময় এক ধরনের নিরস জীবনের ধারণা যুক্ত থাকতো এবং খোদাভীরু লোকদের কাঁদ কাঁদ মুখ ও সুক্ষ্ম কঠিন মেজাজ থাকার কথা সবার জানা ছিল। তদুপরি রসূল সা. এর সার্বক্ষণিক এবাদাতমুখিতা, খোদাভীরুতা ও অসাধারণ দায়িত্ব সচেতনতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখলে এ কথা বুঝাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, এ ধরনের একজন অসাধারণ মানুষ আপন জীবন কাঠামোতে এমন কৌতুক ও হাস্যরসের অবকাশ কিভাবে সৃষ্টি করলেন। হযরত ইবনে ওমরকে রা. জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রসূল সা. এর সাথীরা কি হাসতেন? তিনি বললেন, 'হাঁ, হাসতেন। অথচ তাদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়ে বড় ও মজবুত ঈমান ছিল। (অর্থাৎ কৌতুক ও রসিকতা ঈমান ও খোদাভীতির প্রতিকূল নয়।) তাঁরা তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে ছুটোছুটি করতেন আর পরস্পরে হেসে লুটোপুটি খেতেন।(কাতাদার বর্ণনা)

এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফজরের নামাযের পর নিয়মিত বৈঠক হতো, তাতে জাহেলী যুগের প্রসংগ উঠতো এবং সাহাবীগণের সাথে সাথে রসূল সা. ও খুব হাসতেন। শিশুদের সাথে ও স্ত্রীদের সাথে তিনি যে হাস্যকৌতুক করতেন তাও ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

বিনোদন

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হলো (বৈধ সীমার মধ্যে) বিনোদন। রসিকতার ন্যায় এ অংশটাও যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে জীবন একটা বোঝা হয়ে ওঠবে। যে জীবন ব্যবস্থায় বিনোদনের স্থান নেই, তা কোন সমাজ বেশী দিন বহন করতে পারে না। রসূল সা. কিছু কিছু বিনোদন ভালোবাসতেন এবং বৈধ সীমার মধ্যে এর ব্যবস্থা করতেন।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাগানে ভ্রমণের সখ ছিল। কখনো একা আবার কখনো সাথীদের নিয়ে বাগানে যেতেন এবং সেখানে বৈঠকাদিও করতেন।

সাঁতার কাটাও তাঁর সখের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বন্ধু বান্ধবের সাথে কখনো কখনো পুকুরে সাঁতার কাটতেন। এ জন্য দু'জনের এক একটা জোড় গঠন করতেন। প্রত্যেক জোড় দূর থেকে সাঁতরে পরস্পরের দিকে আসতো। একবার রসূল সা. হযরত আবু বকরকে নিজের সাঁতারের সাথী মনোনীত করেছিলেন।

কিছুদিন বিরতির পর বৃষ্টি হলে লুংগি বেঁধে ফোয়ারায় গোসল করতেন। কখনো কখনো চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যে কোন কূয়ার মুখে বসে ভেতরে পা ঝুলিয়ে রাখতেন।[৪৯]

---

৪৯. শামায়েলে তিরমিযী।

দৌড় ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন এবং নিজে পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে শরীক হতেন। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রচুর হাসাহাসিও হতো।

উৎসবাদিতে ঢোল বাজানো ও শিশু মেয়েদের গান গাওয়া পছন্দ করতেন। একবার ঈদের দিন দুটো মেয়ে হযরত আয়েশার কাছে গান গাইছিল। রসূল সা. কাছেই শায়িত ছিলেন। হযরত আবু বকর এসে এই দৃশ্য দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন যে, আল্লাহর রসূলের বাড়ীতে এ সব শয়তানী কান্ড কারখানা কেন? এ কথা শুনে রসূল সা. বললেন, ওদেরকে গাইতে দাও।[৫০]

বিয়েশাদীর সময়ও ঢোল বাজাতে উৎসাহ দিয়েছেন। (হযরত আয়েশা ও মুহাম্মদ বিন হাতে আল জুহমীর বর্ণনা) হযরত আয়েশা বলেন, আমার কাছে জনৈক আনসারীর মেয়ে থাকতো। আমি তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের সময় রসূল সা. বললেন, 'আয়েশা, তুমি গানের ব্যবস্থা করলেনা? আনসার গোত্র তো গান পছন্দ করে।' অন্য এক বর্ণনায় (সম্ভবত এই ঘটনা প্রসংগেই) রয়েছে যে, রসূল সা. বলেছেন, 'তোমরা কনের সাথে একজন গায়ককে পাঠালে ভালো করতে। সে গাইত, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, কাজেই তোমরাও সুখী হও আমরাও সুখী হই। এ ধরনেরই এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট মেয়েরা গান গাইছিল। হযরত আমের বিন সা'দ কতিপয় শ্রোতাকে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'হে রসূলের সাহাবীগণ, হে বদরের যোদ্ধাগণ! তোমাদের সামনে এ সব কর্মকান্ড হচ্ছে? উপস্থিত সাহাবীগণ জবাব দিলেন, 'তোমার ইচ্ছা হলে বসে শোন, নচেত চলে যাও। আল্লাহর রসূল আমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন।'

বিনোদনের উপায় হিসাবে রসূল সা. কবিতার প্রতিও আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে আরবে যেভাবে কবিতার পূজা করা হতো, তা তিনি এড়িয়ে চলতেন। ওহীর সুমিষ্ট স্বরের তীব্র আকর্ষণ তাকে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করার তেমন সুযোগ দিতনা। কিন্তু কবিতার রুচি থেকে তিনি একেবারে বঞ্চিতও ছিলেন না। বক্তব্যের দিক দিয়ে ভালো কবিতার যথেষ্ট কদর করতেন। বরঞ্চ বলা যায় যে, রসূল সা. সমাজকে এদিক দিয়ে এক নতুন রুচি দিয়েছেন এবং বাছবিচারের এক নতুন মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন। হযরত জাবের বিন সামুরা বলেন, আমি রসূল সা. এর উপস্থিতিতে একশোরও বেশী বৈঠকে যোগদান করেছি। এ সব বৈঠকে জাহেলী যুগের কিচ্ছাকাহিনী যেমন বলা হতো তেমনি সাহাবীগণ কবিতাও পাঠ করতেন। একবার আরব কবি লাবীদের কবিতার নিম্নের চরণ দুটির তিনি প্রশংসা করলেন ঃ

الا كل شيئ ما خلا الله باطل -وكل نعيم لا محالة زائل

সতর্ক হয়ে যাও, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল, দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত একদিন বিলীন হয়ে যাবে।'

---

৫০. মুসলিম, হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত।

একবার প্রবাসে থাকাকালে হযরত শরীদকে অনুরোধ করে কবি উমাইয়া ইবনে আবিস সালতের একশোটা কবিতা পড়িয়ে শোনান। পরে মন্তব্য করেন, এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কোন কোন সময় তিনি নিজেও, বিশেষত যুদ্ধের ময়দানে, স্বতস্ফূর্তভাবে ও বিনা ইচ্ছায় কবিতার মত করে কথা বলতেন। ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক যে সব কবিতা পাঠ করতো, হযরত হাসসান ও কা'ব বিন মালেককে দিয়ে তার জবাবে কবিতা রচনা করাতেন। কখনো কখনো হযরত হাসসানকে নিজের মিম্বরে বসিয়ে কবিতা পাঠ করাতেন এবং বলতেন, 'এ কবিতা শত্রুর বিরুদ্ধে তীরের চেয়েও কঠোর।' তিনি এ কথাও বলেছেন, 'মুমিন তরবারী দিয়ে যেমন জেহাদ করে, তেমনি মুখ দিয়েও জেহাদ করে।' আমি কবিতা, সাহিত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলাদা একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখাতে চাই, রসূল সা. মানুষের রুচিকে কেমন গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করতেন।

কয়েকটি চমৎকার অভিরুচি

এ পর্যায়ে রসূল সা. এর এমন কিছু আদত অভ্যাস ও অভিরুচির উল্লেখ করতে চাই, যা অন্য কোন শিরোনামের আওতায় আনা যায়নি।

কোন জিনিস দেয়া ও নেয়ার কাজ ডান হাত দিয়েই সম্পন্ন করতেন। চিঠি লিখতে হলে সর্বপ্রথম বিছমিল্লাহ লেখাতেন। তারপর প্রেরকের নাম ও তার নিচে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার নাম থাকতো।

তিনি কল্পনা বিলাসিতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং কোন 'শুভ লক্ষণ' বা 'অশুভ লক্ষণে' বিশ্বাস করতেন না। তবে ব্যক্তি ও স্থানের ভালো অর্থবোধক ও শ্রুতি মধুর নাম পছন্দ করতেন। খারাপ নাম পছন্দ করতেন না। বিশেষত সফরে যাত্রা বিরতির জন্য এমন জায়গা নির্ধারন করতেন। যার নাম আনন্দ বরকত বা সাফল্যের অর্থসূচক। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তির নাম ঝগড়া, লড়াই বা ক্ষতির অর্থবোধক, তাকে কোন কাজ সোপর্দ করতেন না। যাদের নামের অর্থে আনন্দ, বা সাফল্য ইত্যাদি আছে, তাদেরকেই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। বহু নাম তিনি পাল্টে দিয়েছেন।

– বাহক জন্তুর মধ্যে ঘোড়াই বেশী প্রিয় ছিল। বলতেন, ঘোড়ার মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে। ঘোড়ার চোখ, মুখ ও নাকের বিশেষ যত্ন নিতেন এবং নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন।

- হৈ চৈ ও হাঙ্গামা পছন্দ করতেন না। সব কাজে ধীর স্থির থাকা, নিয়ম শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতা ভালোবাসতেন। এমনকি নামায সম্বন্ধেও বলেছেন যে, দৌড়াদৌড়ি করে এসনা। শান্ত শিষ্ট ও ধীর স্থিরভাবে এস। আরাফার দিন অনেক হৈ-চৈ হলে তিনি নিজের ছড়ি উচিয়ে শান্ত থাকা ও শৃংখলা মেনে চলার নির্দেশ দেন এবং বলেন, তাড়াহুড়ো করায় কোন পূণ্য নেই।[৫১]

---

৫১. বুখারী ও মুসলিম।

স্বভাব চরিত্র

রসূল সা. এর আখলাক বা স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকতার বিবরণ কোন উপশিরোনামে দেয়া সম্ভব নয়। কেননা তাঁর গোটা জীবনই তো সৎ চরিত্রের নামান্তর। হযরত আয়েশা বলেছিলেন ঃ 'কোরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেনঃ 'তিনি সবার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও বীর ছিলেন।'

সবার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এভাবে যে, সারা জীবনেও কাউকে কোন কষ্ট দেননি, (আল্লাহর হুকুম অনুসারে যা দিয়েছেন, তা বাদে) এবং অন্যদের অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ নেননি। সবাইকে ক্ষমা করেছেন, এমনকি মক্কা ও তায়েফের নজীরবিহীন অত্যাচারীদেরকেও এবং সকল মোনাফেক ও দুর্বৃত্তকেও। সবচেয়ে দানশীল ছিলেন এভাবে যে, হযরত জাবের রা. বলেন, রসূলুল্লাহর কাছে যে যা-ই চেয়েছে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করেননি। হাতে থাকলে তৎক্ষণাত দিতেন, কখনো অন্যের কাছ থেকে ধার করে দিতেন, আর না থাকলে পরে আসতে বলতেন অথবা চুপ থাকতেন। সবার চেয়ে বীর ছিলেন, এ কথার প্রমাণ হিসাবে আপাতত এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সত্য আদর্শ নিয়ে একেবারেই একাকী মাঠে নেমেছিলেন এবং সমগ্র দেশবাসীর বিরোধিতা ও অত্যাচারের মুখেও অটল থেকেছিলেন। কখনো কোন কঠিনতম যুদ্ধের মুখেও ভীতি বা দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। সূর পর্বতের গুহায়ই হোক কিংবা ওহুদ ও হুনায়েনের রণাঙ্গনেই হোক, সর্বত্র অবিচল প্রত্যয় ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন।

মক্কীযুগে
মানবতার বন্ধু
সা.

❊

তীব্র বিরোধিতার
মুখোমুখী

❊

এ হচ্ছে একটি শাশ্বত কথা।
এ কথাটি গ্রহণ করে তোমরা
আমার সাথি হয়ে যাও। দেখবে,
এর শক্তিতে গোটা আরব
তোমাদের মুষ্টিবদ্ধ হবে এবং
এর প্রভাবে গোটা বিশ্ব
তোমাদের অধীন হবে।
—মানবতার বন্ধু সা.

এবার আসুন, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতটা পর্যালোচনা করা যাক। উষর মরুতে বিকশিত সেই ফুলের গাছটার উত্থান পর্যবেক্ষণ করি, যার চার দিকে কাঁটা বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল।

এই সেই যুবক

আরবের এক বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারে, নির্মল স্বভাব বিশিষ্ট এক ভাগ্যবান দম্পতির গৃহে এক ব্যতিক্রমী শিশু পিতৃহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে জনৈকা দরিদ্র ও সুশীলা ধাত্রীর দুধ খেয়ে গ্রামের সুস্থ ও অকৃত্রিম পরিবেশে প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হয় ও বেড়ে ওঠে। সে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মরুভূমিতে ছুটাছুটি করতে করতে জীবনের কর্মক্ষেত্রে কঠিন বিপদ মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং ছাগল ভেড়া চরিয়ে চরিয়ে এক বিশ্বজোড়া জাতির নেতৃত্ব করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। শৈশবের পুরো সময়টা অতিবাহিত করার আগেই এই ব্যতিক্রমী শিশু মায়ের স্নেহময় ছায়া থেকেও বঞ্চিত হয়। দাদার ব্যক্তিত্ব পিতামাতার এই শূন্যতা খানিকটা পূরণ করতে পারলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই এই আশ্রয়ও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে চাচা হন অভিভাবক। এ যেন কোন পার্থিব আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী না হয়ে একমাত্র আসল মনিবের আশ্রয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি পর্ব।

যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এ ব্যতিক্রমধর্মী কিশোরকে অন্যান্য ছেলেদের মত দুষ্ট ও বখাটে হয়ে নয়, বরং প্রবীণদের মত ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। যখন সে যৌবনে পদার্পণ করে, তখন চরম নোংরা পরিবেশে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের যৌবনকে নিষ্কলংক রাখতে সক্ষম হয়। যে সমাজে প্রেম, কু-দৃষ্টি বিনিময় ও ব্যভিচার যুবকদের জন্য গর্বের ব্যাপার, সেই সমাজে এই অসাধারণ যুবক নিজের দৃষ্টিকে পর্যন্ত কলুষিত হতে দেয়না। যে সমাজে প্রত্যেক অলিগলিতে মদ তৈরীর কারখানা এবং ঘরে ঘরে পানশালা, যে সমাজে প্রত্যেক মজলিশে পরনারীর প্রতি প্রকাশ্য প্রেম নিবেদন ও মদ্যপানের বিষয়ে কবিতা পাঠের জমজমাট আসর বসে, সেখানে এই নবীন যুবক

একটি ফোঁটা মদও মুখে নেয়না। যেখানে জুয়া জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেখানে আপাদমস্তক পবিত্রতায় মন্ডিত এই যুবক জুয়ার স্পর্শ পর্যন্ত করেনা। রূপকথার গল্পবলা ও গানবাজনা যেখানে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে ভিন্ন এক জগতের এই অধিবাসী এই সব অপসংস্কৃতির ধারে কাছেও ঘেষেনা। দু'একবার যদিও এ ধরনের বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ তার হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া মাত্রই তার এমন ঘুম পায় যে, সেখানকার কোন অনুষ্ঠানই তার আর দেখা ও শোনার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। যে সমাজে দেবমূর্তির সামনে সিজদা করা ধর্মীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে হযরত ইবরাহীমের বংশধর এই পবিত্র মেজাজধারী তরুণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথাও নোয়ায়না এবং কোন মোশরেক সুলভ ধ্যানধারণাও পোষণ করেনা। এমনকি একবার যখন তাকে দেব মূর্তির সামনে বলি দেয়া জন্তুর রান্না করা গোশত খেতে দেয়া হয়, তখন সে তা খেতে অস্বীকার করে। যেখানে কুরায়েশরা হজ্জের মৌসুমে আরাফাত ময়দানে না গিয়েই হজ্জ সমাধা করতো, সেখানে এই অসাধারণ কুরায়েশী যুবক এই মনগড়া নিয়মকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। হযরত ইবরাহীমের বংশধরেরা যেখানে ইবরাহীমী আদর্শকে বিকৃত করে অন্য বহু অনাচার ছাড়াও দিগম্বর সেজে কা'বা শরীফ তওয়াফ করার জঘন্য বেদয়াত চালু করে, সেখানে এই লাজুক যুবক এক মুহূর্তের জন্যও এই বিদয়াতকে গ্রহণ করেনা। যে দেশে যুদ্ধ একটা খেলা এবং রক্তপাত, একটা তামাশায় পরিণত হয়েছিল, সেখানে মানবতার সম্মানের পতাকা বাহী এই যুবক এক ফোঁটাও কারো রক্তপাত করেনি। তারুণ্যে এই যুবক 'হারবুল ফুজ্জার' নামক বিরাট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কোরায়েশ গোত্রের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ ন্যায়সংগত ছিল বলে সে এই যুদ্ধে যোগদান করলেও কোন মানুষকে নিজে কোন আঘাত করেনি।

শুধু কি তাই? এই সচ্চরিত্র ও সত্যাশ্রয়ী যুবকের সখ কেমন তাও দেখুন। যে বয়সে ছেলেরা সাধারণত বিপথগামী হয়ে থাকে, ঠিক সেই বয়সেই সে গরীব ও নিপীড়িত মানুষদের সহায়তা এবং অত্যাচারীদের যুলুম উচ্ছেদের লক্ষ্যে 'হালফুল ফুযুল' নামে একটা সংস্কারকামী সমিতিতে যোগদান করে। এতে যোগদানকারীরা তাদের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের অংগীকার করে।

নবুয়ত লাভের পর রসূল সা. ঐ সমিতির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন ঃ

'ঐ অংগীকারের পরিবর্তে কেউ যদি আমাকে লাল রং এর উটও দিত, তবু আমি তা থেকে ফিরে আসতামনা। আজও কেউ যদি আমাকে ঐ রকমের কোন চুক্তি সম্পাদন করতে ডাকে, তবে আমি সে জন্য প্রস্তুত।'

এই যুবকের গুণাবলী ও যোগ্যতা কতখানি, তা এ ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, কা'বা শরীফ সংস্কারের সময় হাজরে আসওয়াদ পুনস্থাপন নিয়ে কোরায়েশদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এটা এতদূর গড়ায় যে, তলোয়ার পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে এবং সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই গোলযোগ মিটমাট করার সুযোগটা এই যুবকই লাভ করে। চরম উত্তেজনার মধ্যে শান্তির পতাকাবাহী এই বিচারক একটা চাদর বিছিয়ে দেয় এবং চাদরের ওপর রেখে দেয় হাজরে আসওয়াদ নামক সেই পাথর। তারপর সে কোরায়েশ গোত্রের সকল শাখার প্রতিনিধিদেরকে চাদর উত্তোলনের আহ্বান জানায়।

পাথর সমেত চাদর উত্তোলিত হয়ে যখন যথাস্থানে উপনীত হলো, তখন এই যুবক পাথরটা তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলো। গোলযোগ থেমে গেল এবং সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

এই যুবক যখন অর্থোপার্জনের ময়দানে পদার্পন করলো, তখন বাণিজ্যের ন্যায় পবিত্র ও সম্মানজনক পেশা বেছে নিল। দেশের বড় বড় পুঁজিপতি এই যুবককে তাদের পুঁজিগ্রহণ ও বাণিজ্য করার জন্য মনোনীত করে। এ যুবকের মধ্যে এমন গুণ নিশ্চয়ই ছিল যে জন্য তারা তাকেই মনোনীত করেছিল। সায়েব, কায়েস বিন সায়েব, হযরত খাদীজা এবং আরো কয়েক ব্যক্তি একে একে এই যুবকের অনুপম সততার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তারা সবাই তাকে এক বাক্যে 'তাজের আমীন' বা 'সৎ ব্যবসায়ী' উপাধিতে ভূষিত করে। আব্দুল্লাহ বিন আবিল হামসার সাক্ষ্য আজও সংরক্ষিত রয়েছে যে, নবুয়তের পূর্বে একবার এই তরুণ সৎ ব্যবসায়ীর সাথে তার কথা হয় যে, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি আসছি। কিন্তু পরে সে ভুলে যায়। তিন দিন পর ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ ঐ জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায়, ঐ সৎ ব্যবসায়ী আপন প্রতিশ্রুতির শেকলে আবদ্ধ হয়ে সেই জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে আব্দুল্লাহকে বললো, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তিন দিন ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'–আবু দাউদ

তারপর দেখুন, এ যুবক জীবন সংগিনী নির্বাচন করার সময় মক্কার উঠতি যৌবনা চপলা চঞ্চলা মেয়েদের দিকে ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত না করে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করে, যার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সতী সাধ্বী ও সচ্চরিত্র মহিলা। তার এ নির্বাচন তার মানসিকতা ও স্বভাব চরিত্রের গভীরতাকেই ফুটিয়ে তোলে। বিয়ের প্রস্তাব হযরত খাদীজাই পাঠান, যিনি এই যুবকের অতুলনীয় সততা ও নির্মল চরিত্র দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আর যুবকও এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে।

এছাড়া কোন ব্যক্তির চরিত্র ও মানসিকতাকে যদি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহচরদেরকে দেখে যাচাই করতে হয়, তাহলে আসুন দেখা যাক কেমন লোকেরা এ যুবকের বন্ধু ছিল?

সম্ভবত হযরত আবু বকরের সাথেই ছিল তাঁর সবচেয়ে গভীর বন্ধুত্ব ও সবচেয়ে অকৃত্রিম সম্পর্ক। একে তো সমবয়সী, তদুপরি সমমনা। তার অপর এক বন্ধু ছিল হযরত খাদীজার চাচাতো ভাই হাকীম বিন হিযাম। এই ব্যক্তি হারাম শরীফের একজন খাদেম ছিলেন।[১] দেমাদ বিন সা'লাবা আযদী নামক একজন চিকিৎসকও ছিল তার অন্যতম বন্ধু। কই, এ যুবকের বন্ধু মহলে একজনও তো নীচ, হীন, বদ অভ্যাস, যুলুমবাজ ও পাপাচারী লোক দেখা যায়না!

এই যুবক সাংসারিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে যখনই কিছু সময় অবসর পেয়েছে, তখন তা আমোদ ফূর্তি ও বিনোদনে কাটায়নি। যত্রতত্র

---

১. অষ্টম হিজরী পর্যন্তও তিনি ঈমান আনেননি। কিন্তু তবুও রসূল সা. এর সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও প্রীতি বজায় রাখতেন। এই বন্ধুত্বের কারণেই একবার পঞ্চাশ আশরাফী দিয়ে একটা মূল্যবান পোশাক কিনে মদীনায় এসে রসূল সা. কে উপহার দেন। কিন্তু রসূল সা. অনেক পীড়াপীড়ী করে তাকে ঐ পোশাকের মূল্য দিয়ে দেন।

ঘোরাঘোরি করে, আড্ডা দিয়ে, অথবা অলসভাবে ঘুমিয়ে কাটায়নি। বরং সমস্ত হৈ হাঙ্গামা থেকে দূরে সরে ও সমস্ত কর্মব্যস্ততা পরিহার করে নিজের নির্মল ও নিষ্কলুষ সহজাত চেতনা ও বিবেকের নির্দেশক্রমে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করতো হেরা গুহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গিয়ে। বিশ্বজগতের প্রচ্ছন্ন মহাসত্যকে হৃদয়ংগম করা ও মানব জীবনের অদৃশ্য রহস্যগুলোকে জানার জন্য আপন সত্তায় ও বিশ্ব প্রকৃতির অতলান্তে চিন্তা গবেষণা চালাতো। সে ভাবতো, কিভাবে আপন দেশবাসী ও গোটা মানবজাতিকে নৈতিক হীনতা ও নীচতা থেকে টেনে তুলে ফেরেশতার পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। যে যুবকের যৌবনের অবসর সময় ব্যয় হলো এরূপ একান্ত চিন্তা গবেষণা কার্যে, তাঁর উঁচু ও পবিত্র স্বভাব সম্পর্কে মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি – কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা?

দৈনন্দিন জীবনের এ জাতীয় ঘটনাবলী নিয়ে ভবিষ্যতের বিশ্বনবী কোরায়েশদের চোখের সামনেই মক্কী সমাজের কোলে লালিত পালিত হতে থাকে, ক্রমে যৌবনে পদার্পন করে এবং পরিপক্কতা লাভ করে। জীবনের এই চিত্র কি বলে দিচ্ছিলনা যে, এ যুবক এক অসাধারণ মহামানব? এভাবে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কি কোনভাবে এমন ধারণা পোষণ করা চলে যে, ইনি কোন মিথ্যাচারী ও ধাপ্পাবাজ মানুষ হতে পারে ? কিংবা হতে পারেন কোন পদলোভী, স্বার্থপর কিংবা ধর্মকে পুঁজি করে ব্যবসায় ফেঁদে বসা কোন ধর্মব্যবসায়ী? কক্ষনো নয়। খোদ কোরায়েশরাই তাঁকে সাদেক (সত্যবাদী) আমীন (বিশ্বাসী ও সৎ) জ্ঞানীগুণী , পবিত্রাত্মা, ও মহৎ চরিত্রধারী মানুষ বলে স্বীকার করেছে এবং বারংবার করেছে। তাঁর শত্রুরাও তাঁর মনীষা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং কঠিনতম দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যেও দিয়েছে। সত্যের এই মহান আহ্বায়কের জীবন চিত্রকে কুরআন নিজেও সাক্ষী হিসেবে পেশ করে তাঁকে বলতে বলেছে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

'আমি তো এর আগেও তোমাদের মাঝেই জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমাদের বুঝে আসেনা?' (ইউনুস, ১৬০)

কিন্তু জাতির এই উজ্জ্বল রত্নটি যখন নবুয়তের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সত্যের বাণী পেশ করলো, তখন তাদের মনোভাব সহসাই পাল্টে গেল। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, ভদ্রতা, মহত্ব ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব সব কিছুরই মূল্য কমে গেল। কাল পর্যন্ত যে ব্যক্তি জাতির চোখের মনি ছিল, আজ সে দুশমন, বিদ্রোহী ও জাতির কলংক খেতাব পেল। কাল পর্যন্ত যাকে প্রতিটি শিশু পর্যন্ত সম্মান করতো, আজ সে সকলের ক্রোধভাজন। দীর্ঘ চল্লিশোর্ধ বছর ধরে যে ব্যক্তি নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করেছেন, তিনি আজ আল্লাহর একত্ববাদ, সত্য ও ন্যায়ের বাণী শোনানো মাত্রই কোরায়েশদের চোখে খারাপ হয়ে গেলেন! আসলে তিনি খারাপ ছিলেন না। বরং কোরায়েশের মূল্যায়নকারীদের চোখেই ছিল বক্রতা এবং তাদের মানদন্ডই ছিল ভ্রান্ত।

কিন্তু সত্যই কি কোরায়েশদের চোখ এত অন্ধ ছিল যে, ঘোর তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে এমন আলোকময় একটা চাঁদকে তারা দেখতে পায়নি? চরিত্রহীনদের সমাবেশে সৎ চরিত্রবান একজন নেতাকে দেখে কি তারা চিনতে পারেনি? আস্তাকুড়ে পড়ে থাকা মুক্তার একটা

মালা কি তাদের নজর কাড়তে পারেনি? অসভ্য ইতর মানুষদের সমাজে এই আপাদমস্তক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারে মন্ডিত ব্যক্তি কি নিজের যথোচিত আদর ও কদর আদায় করতে পারেন নি? না, তা নয়। কোরায়েশরা ভালোভাবেই জানতো মুহাম্মদ কেমন মানুষ। কিন্তু জেনে শুনেও তারা চোখে ঠুলি পরেছিল। স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ তাদেরকে চোখ থাকতে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ 'তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখতে পায়না।' চোখ থাকতে যারা অন্ধ হয় তাদের দ্বারা হেন বিপদ নেই যা ঘটতে পারেনা এবং হেন বিপর্যয় নেই যা দেখা দিতে পারেনা।

কোরায়েশদের বিরোধিতার কারণ

আজ যদি আমরা কোনভাবে মক্কার কোরায়েশদের সাথে কথা বলতে পারতাম তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম, তোমাদের গোত্রের এই নয়নমনি যে দাওয়াতটা দিয়েছিল, তাতে সে মূলত কোন্ খারাপ কাজটার প্ররোচনা দিয়েছিল? সে কি তোমাদের চুরি ডাকাতি করার আহ্বান জানিয়েছিল? সে কি তোমাদের হত্যা ও লুটতরাজ করতে ডেকেছিল? সে কি এতীম, বিধবা ও দুর্বলদের যুলুম নির্যাতন ও শোষণ চালানোর কোন পরিকল্পনা পেশ করেছিল? সে কি তোমাদের পারস্পরিক লড়াই চালাতে ও গোত্রে গোত্রে কোন্দল বাধাতে উস্কানি দিয়েছিল? সে কি কোন বিত্তবৈভব গড়া ও ভূ-সম্পত্তি বানানোর জন্য কোন সমিতি গঠন করতে চেয়েছিল? তোমরা তার ডাকে কী অসুবিধা দেখেছিলে? তার কর্মসূচীতে কোন্ বিপর্যয় অনুভব করেছিলে? কী কারণে তোমরা তার বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগেছিলে?

যে জিনিষটি জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এবং পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কোরায়েশদের উন্মত্ত করে তুলেছিল, সেটা রসূল সা. এর চিন্তা ও চরিত্রের কোন ত্রুটি এবং তাঁর দাওয়াতের কোন মারাত্মক ক্ষতিকর উপকরণ ছিলনা। এর কারণ এও ছিলনা যে, তাঁর আন্দোলন তৎকালীন জাহেলী সমাজকে পশ্চাদপদতার দিকে নিয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। বরং সে জিনিসটি ছিল শুধু কোরায়েশদের স্বার্থপরতা। শত শত বছর ধরে গঠিত আরবীয় সমাজ কাঠামোতে কোরায়েশরা নিজেদের জন্য একটা উচ্চ নেতৃত্বের আসন দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পদ তাদের কুক্ষিগত ছিল। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে তাদের আধিপত্য ছিল অদম্য। এক কথায় গোটা আরব জাতির তারাই ছিল হর্তাকর্তা ও কর্ণধার। তাদের এই অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও আধিপত্য শুধু সেই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোতেই চলতে সক্ষম ছিল, যা জাহেলী যুগ থেকে চলে আসছিল। তারা যদি সচেতন ও অবচেতনভাবে নিজেদের এই সর্বময় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখতে বাধ্য থেকে থাকে, তবে তারা তাদের জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকেও সব রকমের আক্রমণ ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে বাধ্য ছিল।

কোরায়েশ গোত্র যেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে আরবদের নেতা ও পরিচালক ছিল, সেখানে তারা আরবদের পৌত্তলিক ধর্মের পুরোহিত, ধর্মীয় তীর্থস্থানগুলোর রক্ষক ও সেবক এবং যাবতীয় ধর্মীয় তৎপরতার একচ্ছত্র ব্যবস্থাপকও ছিল। এই ধর্মীয় একচ্ছত্র ব্যবস্থাপনা ও সর্বময় কর্তৃত্ব তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক

কর্তৃত্বেরও পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং এটা স্বতন্ত্রভাবে একটা বড় রকমের ব্যবস্থাও ছিল। এর কারণে আরব উপদ্বীপের প্রতিটি অঞ্চল থেকে তাদের কাছে নযর নিয়ায তথা উপঢৌকনাদি আসতো। এর কারণে তারা প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র ছিল। লোকেরা তাদের কদমবুছি করতো। ধর্ম যখন কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর ব্যবসায়ে পরিণত হয় তখন তার আসল প্রেরণা, চেতনা ও প্রাণশক্তি লোপ পায় এবং রকমারি আনুষ্ঠানিকতায় পরিপূর্ণ একটা নিরেট প্রদর্শনীমূলক তামাশার রূপ ধারণ করে। ধর্মের নীতিগত দাবী কি, তা আর কেউ মনে রাখেনা। তখন মনগড়া ঐতিহ্য ও অনুষ্ঠানাদি মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর দেয়া ওহী ভিত্তিক জ্ঞান ও আইন কানুন তখন উধাও হয়ে যায় এবং ধর্মব্যবসায়ীদের তৈরী করা এক অভিনব শরীয়ত বিকাশ লাভ করে। যৌক্তিকতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্ধ বিশ্বাস ও অলীক ধ্যানধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে বক্তব্য দেয়ার রীতি উধাও হয়ে যায়। আবেগ উত্তেজনা বিবেকবুদ্ধির কণ্ঠরোধ করে। ধর্মের গণমুখী ও গণতান্ত্রিক মেযাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ধর্মব্যবসায়ীদের একনায়কত্ব সমাজের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পড়ে। প্রকৃত জ্ঞান অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। সহজ সরল আকীদা বিশ্বাস ও বিধিমালার পরিবর্তে কথায় কথায় জটিল ও পেঁচালো বিধিনিষেধ জারী করা হয়। দ্বিমত পোষণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হয় এবং একটা গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব অবাধে চালু হয়ে যায়। সত্য, সততা, সৌজন্য ও খোদাভীতির নাম নিশানাও অবশিষ্ট থাকেনা এবং ধর্ম একটা প্রতারণাময় বহুরূপী কারবারের রূপ ধারণ করে। যখনই কোন ধর্মের বিকৃতি ঘটেছে, তখন এই প্রক্রিয়াতেই তা ঘটেছে। আরবের জাহেলী সমাজে এই বিকৃতি নিকৃষ্টতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এই বিকৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল কোরায়েশ গোত্রের ধর্মীয় পৌরহিত্যের গদি। এই বিরাট লাভজনক ক্ষমতার গদিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঐ বিকৃত ধর্মীয় আবহ ও অবকাঠামোকে বহাল রাখা আবশ্যক ছিল। তার বিরুদ্ধে কোন বাদ প্রতিবাদ ও ভিন্নমতের আওয়ায তোলা এবং কোন ধরনের সংস্কার ও সংশোধনের আহ্বান জানানো যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য ছিল। সুতরাং কোরায়েশ গোত্র যে ইসলামের দাওয়াতে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠবে সেটা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

তা ছাড়া, কোরায়েশদের সংস্কৃতি ছিল চরম পাপাচারী সংস্কৃতি। মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়া, সুদখোরী, নারী নির্যাতন, মেয়ে শিশুকে জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলা, স্বাধীন মানুষকে গোলাম বানানো এবং দুর্বলদের ওপর যুলুম করা এসবই ছিল কোরায়েশ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট। শত শত বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বদভ্যাস ও গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্যের রূপ ধারণকারী কদর্য সমাজপ্রথার সমন্বয়েই গঠিত ছিল এ সংস্কৃতি। নিজেদের হাতে গড়া এই সাংস্কৃতিক লৌহ খাঁচা ভেংগে একটা নতুন পরিবেশে বিচরণ করতে প্রস্তুত হওয়া কোরায়েশদের জন্য সহজ ছিলনা। তারা সংগে সংগেই বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মদ সা. এর দাওয়াত তাদের চিরাচরিত রীতি-প্রথা, আদত অভ্যাস, কামনা-বাসনা, ললিতকলা তথা তাদের প্রিয় সংস্কৃতির শত্রু। তাই তারা প্রচন্ড আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ঐ দাওয়াতের বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে যায়।

আসলে এ সব কারণেই প্রতিষ্ঠিত বিকৃত সমাজব্যবস্থার কর্ণধাররা, ধর্মীয় ঠিকাদাররা এবং প্রবৃত্তির পূজারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চিরকাল সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

ঘোর অন্ধকারে কয়েকটা আগুনের ফুলকি

রসূল সা. এর নবুয়ত লাভের আগে আরবের কিছু প্রতিভাধর ব্যক্তির মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মহাবিশ্বে বিরাজমান প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীতে প্রতিফলিত খোদায়ী আভাস ইংগিতের ভিত্তিতে চলমান সমাজ, পরিবেশ ও পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি তাদের সৃষ্টি হয় অনাস্থা ও বিরাগ। এ অবস্থা তাদের মনকে অশান্ত ও স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদে সোচ্চার করে তুলেছিল। একটু আগেই আমরা যে ক'জন সংবেদনশীল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছি, তাদের অন্তরাত্মা থেকেও পরিবর্তনের অস্পষ্ট আকুতি ফুটে উঠেছিল।

একদিন কোরায়েশ জনতা একটা প্রতিমার চারপাশে সমবেত হয়ে একটা উৎসব উদযাপন করছিল। তারা ঐ পাথুরে দেবমূর্তির ভজন গাইছিল। ভক্তি নিবেদন করছিল, তার ওপর বিভিন্ন নজর নেয়ায চড়াচ্ছিল, এবং তওয়াফ করছিল। ঠিক এই সময় চার ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনুল হুয়াইরিছ এবং যায়েদ বিন আমর এই অর্থহীন উৎসবের প্রতি বিরক্ত হয়ে দূরে একটা আলাদা জায়গায় বসে গোপন বৈঠক করছিল। তারা পরস্পরের বক্তব্যের গোপনীয়তা রক্ষার শপথ গ্রহণের পর আলাপ আলোচনা চালায়। তাদের সর্বসম্মত অভিমত ছিল এরূপ ঃ 'আমাদের জনগণ একেবারেই ভিত্তিহীন একটা মতাদর্শের ওপর চলছে। নিজেদের দাদা ইবরাহীমের ধর্মকে তারা বর্জন করেছে। যে পাথর নির্মিত মূর্তির উপাসনা করা হচ্ছে, তা দেখেও না, শোনেওনা, কারো উপকারও করতে পারেনা এবং ক্ষতিও করতে পারেনা। সাথীরা, তোমরা নিজ নিজ বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস কর, তাহলে আল্লাহর কসম, তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের কোন ভিত্তি নেই। দুনিয়ার দেশে দেশে সফর কর এবং খোঁজ নাও, ইবরাহীমের ধর্মের সত্যিকার অনুসারী কেউ কোথাও আছে কিনা।[২] পরে তাদের মধ্য থেকে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল খৃষ্টান হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রথমে অস্থিরতার বশে মুসলমান হয়ে যায় এবং পরে আবার অস্থিরতার বশেই খৃষ্টান হয়ে যায়। উসমান রোম সম্রাটের কাছে গিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। আর যায়েদ ইহুদী বা খৃষ্টান কোনটাই হলোনা, আবার পৌত্তলিকতাও পরিত্যাগ করলো। সে মৃত প্রাণীর গোশত, রক্ত, এবং বেদীতে বলি দেয়া পশুর গোশত খাওয়া ছেড়ে দিল এবং মেয়ে শিশু হত্যা করতে লোকজনকে নিষেধ করতে লাগালো। সে বলতোঃ 'আমি ইবরাহীমের প্রভুর ইবাদত করি।'[৩] হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা বলেন, 'আমি বুড়ো গোত্রপতি যায়েদকে কা'বা শরীফের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। সে বলছিল, 'হে কুরাইশ জনতা, আল্লাহর শপথ, আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করছেনা।' তারপর সে বললো, 'হে আল্লাহ, আমি যদি জানতাম কোন্ নিয়ম তোমার পছন্দ, তা হলে সেই নিয়েমেই তোমার ইবাদত করতাম। কিন্তু আমি জানিনা। তারপর সে হাতের তালু মাটিতে রেখে সিজদা করতো।[৪] তার সাথে কেউ সাক্ষাত করতে গেলে সে প্রায়ই এই

২. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪২।
৩. ঐ
৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৪।

কবিতাটা পড়ে শোনাতো, যার অর্থ হলোঃ

'রব কি একজন হওয়া' উচিত, না হাজার হাজার? জীবনের সমস্যাগুলো যখন একাধিক রবের মধ্যে বন্টিত হয়ে যায়, তখন আমি কোন্ রবের আনুগত্য করবো" ।

'আমি লাত ও উয্যা সবাইকে ত্যাগ করেছি। দৃঢ়চেতা ও ধৈর্যশীল লোকেরা এমনটিই করে থাকে।'

'তবে হাঁ, আমি আমার দয়াময় রহমানের ইবাদত অবশ্যই করতে থাকবো, যাতে সেই ক্ষমাশীল প্রভু মাফ করে দেন আমার গুনাহগুলো।'

'সুতরাং তোমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করার নীতি অব্যাহত রাখ, যতক্ষণ এটা অব্যাহত রাখবে, তোমরা ধ্বংস হবেনা ততক্ষণ।'

বেচারা যায়েদের স্ত্রী সফিয়া বিনতুল হাযরামী অনবরত তার পেছনে লেগে থাকতো। কখনো কখনো যায়েদ প্রকৃত ইবরাহীমী ধর্মের অন্বেষণে মক্কা ছেড়ে বেরুতে চাইত। কিন্তু তার স্ত্রী এটা খাত্তাব বিন নুফাইলকে আগে ভাগে জানিয়ে দিত। আর খাত্তাব পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করার জন্য তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতো। যায়েদ নিজের মতের প্রতি এত উৎসর্গীত ছিল যে, কা'বা শরীফের চত্তরে প্রবেশ করা মাত্রই বলে উঠতো।

'হে সত্য প্রভু! আমি তোমার কাছে আন্তরিকতার সাথে ও দাসত্বের মনোভাব নিয়ে ইবাদত করার জন্য হাজির হয়েছি।' তারপর আরো বলতো, 'আমি কা'বার দিকে মুখ ক'রে সেই সত্তার কাছে আশ্রয় চাই, যার কাছে হযরত ইবরাহীম আশ্রয় চাইতেন।'[৫]

খাত্তাব বিন নুফাইল যায়েদকে কষ্ট দিত। এক পর্যায়ে সে তাকে মক্কার বাইরে নির্বাসিত করে। যায়েদ মক্কার উপকণ্ঠে হেরার কাছে অবস্থান করতে থাকে। এরপর খাত্তাব কুরাইশ গোত্রের কিছু যুবক ও দুশ্চরিত্র লোককে তার প্রহরী নিযুক্ত করে এবং তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে না দেয়ার নির্দেশ দেয়। যায়েদ কখনো কখনো লুকিয়ে মক্কায় আসতো। খাত্তাব ও তার সাথীরা টের পেলে তাকে আবার বিতাড়িত করতো। তারা তাকে ধর্ম বিকৃত করার দায়ে খুবই ঘৃণার সাথে নির্যাতন করতো। অবশেষে বিরক্ত হয়ে সে দেশ ছেড়ে চলে যায় এবং মোসেল, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে হযরত ইবরাহীমের ধর্মের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অবশেষে সে দামেস্কের রোলকা এলাকায় জনৈক বিদ্বান দরবেশের সন্ধান পেল এবং তার কাছে গিয়ে হযরত ইবরাহীমের ধর্মের সন্ধান জানতে চাইল। দরবেশ বললো, 'আজ আর তুমি এই ধর্মের অনুসারী একজন মানুষও পাবে না। তবে এই ধর্মের পতাকাবাহী একজন নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হবেন এবং তুমি যে জায়গা থেকে এসেছ, সেখানেই আবির্ভূত হবেন। যাও, তার সাথে সাক্ষাত কর।' যায়েদ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম ভালো করেই পরখ করে দেখেছিল। ঐ দুই ধর্ম তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে দরবেশের উপদেশ অনুসারে মক্কার দিকে ছুটে চললো। কিন্তু পথিমধ্যে 'বিলাদ লাখাম' নাম স্থানে লোকেরা তাকে হত্যা করে।[৬]

---

৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৪৮।
৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, (প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৯, ২৫০)।

এই যায়েদের পুত্র সাঈদ ও হযরত ওমর ইসলামের আবির্ভাবের পর রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমরা যায়েদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে পারি কিনা? রসূল সা. বলেনঃ 'হা, কারণ সে কেয়ামতের দিন একটা স্বতন্ত্র উম্মত হিসাবে ওঠবে।' অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার নির্মল স্বভাবের কাছ থেকে যতটুকু পথ নির্দেশ পাওয়া সম্ভব, তা পেয়েই যায়েদ পূর্ব আন্তরিকতা সহকারে তা গ্রহণ করেছে, অতঃপর সে ওহীর হেদায়াত লাভের জন্য অনেক ছুটাছুটি করেছে। সর্বশেষে সে রসূল সা. এর কাছে রওনা হয়েছিল, কিন্তু এই সত্য সন্ধানের পথেই সে শহীদ হলো।

এই দীর্ঘ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ইতিহাস একটা নতুন মোড় নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং মানবীয় বিবেক অশান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রকৃতির অস্পষ্ট আভাস ছাড়া কোন আলোর দিকনির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছিলনা। বিকৃত ধর্মচর্চা ও অযৌক্তিক আনুষ্ঠানিকতার পরিবেশ মানুষের স্বকীয়তার টুটি চেপে ধরেছিল। মানুষ ছিল স্থবিরতার চার দেয়ালে বন্দী। সংবেদনশীল লোকেরা হয় খৃষ্টধর্মের মনযিলে এসে থেমে গিয়েছিল। কেননা পরিবেশ এর অনুকুল ছিল। নচেত তারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু চলমান ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে জেহাদ করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। উল্লেখিত চার ব্যক্তির মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেবল যায়েদ এতটা সাহস দেখিয়েছে যে, হারাম শরীফে বসে এক আল্লাহকে ডেকেছে এবং কুরাইশদের সামনে পৌত্তলিকতাকে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু সেও অস্থিরতা প্রকাশ ও প্রতিবাদ করার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারেনি। কেননা তার সামনে কোন এমন সুস্পষ্ট ও পূর্ণাংগ আদর্শ ছিলনা, যাকে সে দাওয়াত ও আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তবুও মক্কা তার অস্তিত্ব বরদাশত করতে অস্বীকার করেছে।

জাহেলী সমাজে কবিদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তারা মানুষের মনস্তাত্মিক নেতৃত্বও দিত। তাদের কবিতা ছিল তৎকালীন সমাজের মানসিকতা ও চিন্তাধারার দর্শন। সমাজের বিবেকের অস্থিরতার ছাপ রসূল সা. এর অব্যবহিত-পূর্ববর্তী যুগের জাহেলী কবিদের কবিতায় প্রতিফলিত হতো। এ সব কবিতায় অনেক সময় মানবীয় বিবেক মৌলিক সত্য নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠতো।

এ সব কবির মধ্যে একজন হচ্ছেন তায়েফের বিশিষ্ট সরদার উমাইয়া বিন আবিস্ সাল্ত। ইনি তাওহীদ, কেয়ামত, ও কর্মফল সম্পর্কে ভালো ধ্যান-ধারনা পেশ করেছেন। তাছাড়া বেশ কিছু নৈতিক উপদেশও তার কবিতায় রয়েছে। ইনিও পৌত্তলিক চিন্তাধারার প্রতি বিদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু রসূল সা. এর দাওয়াতকে গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেননি। রসূল সা. তার কবিতাকে পছন্দ করতেন এবং বলতেন, এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।

এ ধরনের সচেতন ব্যক্তিবর্গের মানসিক আলোড়ন পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, পরিবেশ একটা নতুন প্রাণোচ্ছল বাণী লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

ইতিহাস যে বিপ্লবী শক্তির প্রতীক্ষায় ছিল, তা উপযুক্ত সময়েই মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি শুধু নেতিবাচক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এবং নিজের ব্যক্তিগত মনমানস ও মহৎ চরিত্র নিয়েই উপস্থিত হননি, বরং একটা সর্বব্যাপী ইতিবাচক

মতবাদ ও মতাদর্শ নিয়ে সমগ্র জাতি ও সমগ্র পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। আরবের তৎকালীন পরাক্রান্ত বাতিল শক্তির পক্ষে এই অপরাধকে (!) বরদাশত করা কিভাবে সম্ভব ছিল?

দাওয়াতের প্রথম যুগ ঃ গোপন প্রচার

নবুয়তের সূচনা যুগের প্রাক্কালে প্রস্তুতি স্বরূপ নিভৃত ধ্যানে মগ্ন থাকার সময় রসূল সা. কে বিভিন্ন সত্য স্বপ্ন দেখানো হতো। কখনো বা গায়েবী আওয়ায শুনতে পেতেন। কখনো ফেরেশতা দেখতে পেতেন। অবশেষে আল্লাহর আরশ থেকে প্রথম বাণী এলো। জিবরীল এসে সম্বোধন করলেন ঃ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ الخ

এটা ছিল তাঁর ওহী লাভের প্রথম অভিজ্ঞতা। তিনি অনুভব করলেন যেন তার ঘাড়ের ওপর এক ভীতিময় ও বিরাট বোঝা চেপে বসেছে।। বাড়ীতে ফিরে এসে নিজের জীবন সংগিনীকে ঘটনা অবহিত করলেন। তিনি সান্ত্বনা দিলেন, যে, আপনার খোদা কখনো আপনাকে ছেড়ে দেবেন না। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বললেন, এতো আল্লাহর সেই দূত, যিনি মূসার আ. ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, দেশের লোকেরা আপনাকে মিথ্যুক বলবে, উত্যক্ত করবে, দেশ থেকে বিতাড়িত করবে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করবে। আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকি, তাহলে আমি আল্লাহর কাজে আপনাকে সমর্থন করবো। এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত হলেন। তাঁর ওপর এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো। এ দাওয়াত সর্বপ্রথম হযরত খাদীজার সামনে উপস্থাপিত হলো এবং তিনিই লাভ করলেন এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্তির মর্যাদা। এরপর ধীর গতিতে গোপনে চলতে লাগলো এ কাজ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু। দু'জনেরই মন মেযাজ ও রুচি ছিল একই রকম। তিনি যখন সত্যের দাওয়াত পেলেন, তৎক্ষণাত এমনভাবে তা গ্রহণ করলেন যেন তাঁর অন্তরাত্মা এরই জন্য আগে থেকে অপেক্ষমান ছিল। রসূল সা. এর পালিত পুত্র যায়েদও তাঁর সাথী হলো। সে তাঁর জীবন ও চরিত্র দ্বারা আগে থেকেই প্রভাবিত ছিল।

এই ঘনিষ্ঠতম লোকদের তাঁর ওপর ঈমান আনা তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতার একটা প্রমাণ। এই ব্যক্তিবর্গ কয়েক বছর ধরে তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এবং তাঁর ভেতর ও বাহির সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত ছিলেন। রসূল সা. এর জীবন, চরিত্র, চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা সম্পর্কে এদের চেয়ে বেশী জানা কারো পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এই ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গ একেবারে সূচনাতেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে দিলেন যে, আহ্বায়কের সত্যবাদিতা ও আন্তরিকতা সন্দেহাতীত।

হযরত আবু বকর রা. রসূল সা. এর আন্দোলনের সৈনিক হওয়া মাত্রই নিজের প্রভাবাধীন লোকদের মধ্যে জোরে শোরে কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি হযরত ওমর, ওসমান, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা রা. প্রমুখসহ বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে এ বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য বানিয়ে ফেললেন। অত্যন্ত সতর্কতা, গোপনীয়তা ও নীরবতার মধ্য দিয়ে তারা এ কাজের প্রসার ঘটাতে লাগলেন। ইসলামী আন্দোলনের এই গোপনীয় ও প্রাথমিক যুগে অন্যান্য যারা প্রথম

কাতারের মুসলমানদের দলভুক্ত হন তাদের মধ্যে হযরত আম্মার, খাব্বাব, আরকাম, সাঈদ বিন যায়েদ, (ইতিপূর্বে আলোচিত যায়েদ বিন আমরের পুত্র, যিনি পিতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, উসমান বিন মাযউন, আবু উবাইদা, সুহায়েব রূমী প্রমুখ অন্যতম।

নামাযের সময় হলে রসূল সা. কোন পাহাড়ের ওপর চলে যেতেন এবং নিজের সাথীদের নিয়ে গোপনে নামায পড়ে আসতেন। শুধু চাশতের নামায কা'বার চত্তরে পড়তেন। কেননা ও নামায কুরাইশদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। একবার রসূল সা. হযরত আলীকে সাথে নিয়ে কোন এক গিরিপথে নামায পড়ছিলেন। এ সময় তাঁর চাচা আবু তালেব তা দেখে ফেলেন। এই নতুন ধরনের নামায দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান এবং গভীর মনোযোগের সাথে তা দেখতে থাকেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা এটা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করলে? রসূল সা. বললেন, 'আমাদের দাদা ইবরাহীমের ধর্ম এটাই ছিল।'

একথা শুনে আবু তালেব বললেন, 'আমার পক্ষে তো এ ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে তোমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছি। কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবেনা।[৭]

হযরত আবু যরও ইসলামী আন্দোলনের এই গোপনীয়তার যুগে ঈমান এনেছিলেন। আল্লামা শিবলী নুমানীর মতে তাঁর ক্রমিক নম্বর ৬ষ্ঠ বা ৭ম। ইনিও সেই সব ব্যক্তির অন্যতম, যারা অস্থিরতায় ভুগছিলেন এবং মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে নিছক আপন নির্মল স্বভাব ও বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর যিকির ও ইবাদত করতেন। কোন না কোন উপায়ে তিনি রসূল সা. এর দাওয়াতের খবর পেয়ে গেলেন। অতঃপর নিজের ভাইকে সঠিক তথ্য জানার জন্য পাঠালেন। তাঁর ভাই রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করলেন, তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন এবং ফিরে গিয়ে ভাইকে বললেন, 'আমি এই দাওয়াত দাতাকে দেখে এসেছি। লোকেরা তাকে ধর্মত্যাগী[৮] বলে থাকে। কিন্তু তিনি মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা দেন এবং এমন এক বিস্ময়ের বাণী শোনান, যা মানবীয় কবিতা থেকে একেবারেই অন্য রকম। তাঁর চালচলন তোমার চালচলনের মত। এরপর তিনি নিজে এলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সত্যের সুবাস বাতাসের ওপর ভর করেই দিক থেকে দিগন্তে ছুটে যাচ্ছিল। এ সময়ে রসূল সা. কে নানা রকমের কু-খেতাব দেয়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তথাপি পরিবেশ মোটামুটি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল। কেননা তখনো কুরাইশ নেতারা আসন্ন বিপদের গুরুত্ব অনুমান করতে পারেনি।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করুন, ইসলামী আন্দোলনের এই প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে একজনও এমন ছিলেন না, যিনি উচ্চতর জাতীয় ও ধর্মীয় পদে আসীন ছিলেন। এর ফলে তাঁরা সকল স্বার্থপরতার বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন। ইতিহাসে এ

---

৭. সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী, (প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৯২)।

৮. বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার বিচিত্র রূপ দেখুন। যে ব্যক্তি সারা দুনিয়ার মানুষকে ঈমানের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তিনিই নাকি ধর্মচ্যুত! সকল যুগের ধর্ম ব্যবসায়ীরাই এ ধরনের ফতোয়া দিয়ে থাকে।

ধরনের স্বাধীনচেতা যুবকরাই বড় বড় পরিবর্তন সূচিত করার জন্য সম্মুখের কাতারে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। নেতা ও পদস্থ ব্যক্তিরা কেউ এ কাজে অবদান রাখেনি।

গোপনীয় স্তরের এই ইসলামী আন্দোলনকে কুরাইশ নেতারা আদৌ গুরুত্ব দেয়ার যোগ্য মনে করেনি। তারা ভেবেছিল, এ-তো কতিপয় যুবকের পাগলামি। ওরা উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলে থাকে। কয়েকদিন পর আপনা থেকেই মাথা ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত বুকের পাটা কার আছে? এভাবে ক্ষমতার মসনদে আসীন লোকগুলো নিজেদের ক্ষমতার গর্বে এতই দিশেহারা ছিল যে, ঐ মসনদের ছায়ার নীচে তাদের অজান্তেই সত্যের চারাগুলো ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে ইতিহাসের মহীরূহে পরিণত হলো। কুরাইশদের এটাও ধারণা ছিল যে, লাত মানাত ও উয্যার মত দেবতাদের আমরা যখন এত ভক্তি ও পূজা করি, তখন তারাই মান সম্মান ও পৌত্তলিক ধর্মের হেফাজত করবে। তাদের আধ্যাত্মিক অভিশাপ এই গুটিকয় তওহীদপন্থীর দেবদ্রোহিতাকে খতম করে দেবে।

প্রকাশ্য দাওয়াত

এভাবে তিন বছর কেটে গেল। কিন্তু একটা পরিস্থিতিকে চিরদিন একইভাবে থাকতে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। তাঁর চিরাচরিত রীতি হলো, তিনি বাতিলের প্রতিরোধের জন্য সত্যকে সামনে নিয়ে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধান। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

'আমি বরং সত্যকে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করি, অতপর সত্য বাতিলকে আঘাত করে। এর ফলে বাতিল উৎখাত হয়ে যায়।' –সূরা আল আম্বিরয়া

আল্লাহর এই চিরাচরিত রীতি অনুসারে আদেশ জারী হলো ঃ 'তোমাকে যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তা প্রকাশ করে দাও।'

রসূল সা. সমস্ত হিম্মত ও সাহস সঞ্চয় করে, নতুন সম্ভাব্য সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে একদিন সাফা পর্বতের ওপর এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আরবের বিশেষ রীতি অনুযায়ী কুরাইশ জনতাকে ডাক দিলেন। কোন বিপদের মুহূর্তে জনগণকে সাহায্যের জন্য একটা বিশেষ সাংকেতিক ধ্বনি দিয়ে ডাকার রেওয়াজ ছিল। তিনি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। লোকেরা ছুটে এল। বিরাট জন সমাগম হলো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে রইল কী হয়েছে জানার জন্য।

রসূল সা. প্রথমেই উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের অপর পাশে হানাদার বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে ছুটে আসছে, তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

সবাই সমবেত স্বরে বলে উঠলো ঃ 'হাঁ, কেন করবোনা? আমরা তোমাকে সব সময় সত্য কথাই বলতে দেখেছি।'

– তাহলে ওহে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, ওহে আবদ মানাফের বংশধর, ওহে যাহরার বংশধর, ওহে তামীমের সন্তানেরা, ওহে মাখযুমের সন্তানেরা, ওহে আসাদের বংশধর, শোনো, আমি বলছি, তোমরা এক আল্লাহকে প্রভু ও উপাস্য মেনে নাও, নচেত তোমাদের ওপর কঠিন আযাব নেমে আসবে। এই বলে তিনি অতি সংক্ষেপে প্রথমবারের মত উন্মুক্ত দায়াত পেশ করলেন।

তাঁর চাচা আবু লাহাব কথাটা শোনা মাত্রই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো, 'ওরে হতভাগা তুই আজকের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যা। এই কথা বলার জন্যই কি আমাদের এখানে ডেকেছিলি?' আবু লাহাব ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেল।

লক্ষণীয় যে, আবু লাহাবের পক্ষ থেকে, রসূলের দাওয়াতকে নিছক গুরুত্বহীন ও আমল দেয়ার অযোগ্য বলে প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া তখনো দেখা দেয়নি। অভিযোগটা শুধু এই ছিল যে, তুমি আমাদের অকারণেই কষ্ট দিয়েছ এবং আমাদের সময় নষ্ট করেছ।

প্রকাশ্য দাওয়াতের দ্বিতীয় পদক্ষেপটা নেয়া হলো এই যে, রসূল সা. আব্দুল মুত্তালিব পরিবারের লোকদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করলেন। এই ভোজে তাঁর চাচা হামযা, আবু তালিব ও আব্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গও যোগ দান করেন। আহারের পর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'আমি যে বিধান নিয়ে এসেছি তা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্যই কল্যাণের। এ কাজে আমার সাথী হবার জন্য কে কে প্রস্তুত? একথা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি দাওয়াতের সূচনালগ্নেই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তিনি দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ধর্ম নয় বরং দুনিয়াকে কল্যাণময় ও সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারে এমন ধর্ম নিয়েই এসেছেন।

তাঁর আবেদনে সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। সহসা তেরো বছরের এক কিশোর নীরবতা ভংগ করে উঠে দাঁড়ালো। সে বললো, 'যদিও আমি চোখের অসুখে আক্রান্ত, আমার পা দুর্বল, এবং আমি একজন কিশোর মাত্র,তবুও আমি আপনার সংগী হব।' ইনি ছিলেন হযরত আলী রা.। পরবর্তীতে তিনি এ আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ প্রমাণিত হন।

একটা কিশোর ছাড়া আর কেউ সাড়া দিলনা–এই দৃশ্য দেখে সমবেত জনতা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আব্দুল মুত্তালিবের বংশধররা এই অট্টহাসির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে এ কথাই বললো যে, এই দাওয়াত, এই দাওয়াতদাতা এবং এই সাড়া দানকারী বালক মিলিত হয়ে কোন মহাবিপ্লব সাধন করবে? এ সব একটা তামাশা এবং একটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। এ আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য একটা বিদ্রুপাত্মক অট্টহাসিই যথেষ্ট।

এই দ্বিতীয় ঘটনায়ও পরিবেশের শান্তভাব কাটেনি। কিন্তু এরপর যখন তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হল, তখন সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমশ তীব্রতর হতে লাগলো।

এই তৃতীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আরো একটা ঘটনার বর্ণনা জরুরী মনে হচ্ছে। আগেই বলেছি যে, প্রতিকূল পরিবেশের কারণে নামায গোপনে পড়া হতো, রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা শহরের বাইরে পাহাড়ের উঁচু নীচু স্থানে বা সমতলে যেয়ে যেয়ে নামায পড়ে আসতেন। একদিন এক পার্বত্য ঘাটিতে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস অন্যান্য সাহাবীকে সাথে নিয়ে নামায পড়ার সময় মোশরেকরা দেখে ফেলে। নামায পড়ার সময়ই মোশরেকরা অশালীন কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিল এবং নামাযের প্রতিটা কাজের ব্যংগ বিদ্রুপ করতে লাগলো। ওদিক থেকে যখন কোনই জবাব দেয়া হলোনা, তখন তারা বিরক্ত হয়ে সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে দিল। এই সংঘর্ষে জনৈক

মোশরেকের তলোয়ারের আঘাতে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. আহত হলেন। মক্কার মাটিতে এটাই ছিল আল্লাহর পথের প্রথম রক্তপাতের ঘটনা। এটা ছিল জাহেলী সমাজের প্রথম উন্মত্ত হিংস্র প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিরোধিতা এখন হিংস্রতার পথে পা বাড়াতে শুরু করেছে।

উস্কানী ও উত্তেজনার আবহ সৃষ্টি

ইসলামী আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে চল্লিশ জন সহযোগী জুটে গেল। এভাবে ইসলামী সংগঠন একটা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হলো। প্রকাশ্যে সত্যের কলেমা উচ্চারণের নির্দেশ ইতিমধ্যে দেয়াই হয়। এ নির্দেশ পালন করার জন্য রসূল সা. একদিন কা'বার চত্তরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। কিন্তু ধর্মীয় চেতনা যখন বিকৃত হয়ে যায়, তখন ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো ভূলুণ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই যে পবিত্র ঘর একদিন তাওহীদের বাণী প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার চত্তরে আল্লাহর একত্বের কথা বলা ঐ কেন্দ্রের অবমাননার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হলো। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অতগুলো মূর্তি স্থাপনে কা'বা শরীফের অবমাননা হয়না, মূর্তির সামনে কপাল ঘষলেও তার অবমাননা হয়না, উলংগ হয়ে তওয়াফ করলে, উলু ধ্বনি দিলে এবং তালি বাজালেও তার পবিত্রতা হানি হয়না। দেবদেবীর নামে জানোয়ার বলি দিলে এবং পুরোহিতগিরি ও খাদেমগিরির কর আদায় করলেও কা'বার অপমান হয়না। অপমান হয় শুধু ঐ ঘরের আসল মালিকের নাম নিলেই।

আওয়ায উঠলো ঃ কা'বার অবমাননা করা হয়েছে, হারাম শরীফের সম্মানহানি করা হয়েছে।' কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মাথায় রক্ত চড়িয়ে দেয়ার মত উস্কানীদায়ক কাজ প্রচন্ড উত্তেজনায় বেসামাল ও আবেগে দিশেহারা মোশরেকরা তাওহীদের কলেমা শুনে চারদিক থেকে ধেয়ে এল। গোলযোগের সূত্রপাত হলো। রসূল সা. ঘেরাও হয়ে গেলেন। হারেস বিন উবাই হৈ চৈ শুনে রসূল সা. কে রক্ষা করতে ছুটে এলেন। কিন্তু তরবারীর আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আরবে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘাতে এটাই ছিল ইসলাম রক্ষার লক্ষ্যে সংঘটিত প্রথম শাহাদাত।

অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও যুক্তিসংগত পন্থায় যে দাওয়াত দেয়া হলো, তা নিয়ে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং যুক্তির জবাব যুক্তির মাধ্যমে দেয়ার পরিবর্তে অন্ধ আবেগ ও উন্মত্ত হিংস্রতা দিয়ে তার জবাব দেয়া হলো। রসূল সা. তরবারীর জোরে সত্যের কলেমা গ্রহণে বাধ্য করেননি। কিন্তু বিরোধী শক্তি তলোয়ার হাতে নিয়ে রুখে এল। একটা বাতিল ব্যবস্থার স্বার্থপর হোতাদের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট যে, তারা যুক্তির জবাবে উস্কানী ও উত্তেজনা এবং প্রমাণের জবাবে হিংস্রতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে থাকে। বিরোধীদের মধ্যে এতটুকু সহিষ্ণুতাও ছিলনা যে, অন্ততপক্ষে কয়েক সপ্তাহ, কয়েক দিন বা কয়েক মিনিট সময় কা'বার চত্তরে প্রদত্ত ঘোষণাটা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে। তারা এ কথাটা স্বীকার করতে পারতো যে, তাদের মত মুহাম্মদ সা.-এরও অধিকার রয়েছে কোন না কোন ধর্ম, মতবাদ, দর্শন, বা আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার, তদনুসারে বলার এবং অন্য কারো ধর্ম, মত বা আকীদাবিশ্বাসের বিরোধিতা করার। তারা অন্তত এতটুকু সম্ভাবনার কথা স্বীকার করতে পারতো যে, আমাদের ভেতরে কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে

এবং মুহাম্মদের সা. প্রচারিত মতাদর্শে সে ত্রুটি শুধরাবার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। আসলে কোন বাতিল ব্যবস্থার নেতাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা একেবারেই শেষ হয়ে যায় এবং তাদের চিন্তাভাবনা ও বিচার বিবেচনার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

একটু ভাবতে চেষ্টা করুন তো সেই পরিবেশটা কেমন ছিল, যেখানে আমাদের সকলের ইহ-পরকালের কল্যাণের জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একেবারেই নিরস্ত্র ও নিসম্বল অবস্থায় আপন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.।

অপপ্রচার

হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. এর পবিত্র আবেগ উদ্দীপনা ও আশা আকাংখার প্রতীক হারাম শরীফের অভ্যন্তরে মক্কাবাসী কর্তৃক একজন নিরপরাধ মানুষের এই হত্যাকাণ্ড থেকে অনাগত ভবিষ্যতের একটা ধারণা পাওয়া গেলেও এর মধ্য দিয়ে আসল হিংস্রতার যুগের সূচনা হয়নি।

বিরোধিতার প্রথম স্তর সব সময়ই ঠাট্টা বিদ্রুপ, উপহাস, ও কূটতর্কের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা সন্ত্রাস-গুন্ডামীর রূপ ধারণ করে।

রসূল সা. এর দাওয়াতের গুরুত্ব কমানোর উদ্দেশ্যে গালিগালাজের ঘৃণ্য ইতরামির পাশাপাশি রকমারি উপাধি প্রণয়নের কাজও শুরু করে দিল অপপ্রচারের দক্ষ কুশলীরা।

যেমন কেউ বললো, এই ব্যক্তির কথাবার্তা তোমরা শোনোনা। কারণ ওতো 'ধর্মত্যাগী।' আমাদের পূর্বপুরুষদের চিরাচরিত ধর্মকে পরিত্যাগ করে সে নিজে এক মনগড়া উদ্ভট ধর্ম তৈরী করেছে। তারা কোন যুক্তির ধার ধারতোনা। যার ইচ্ছা হতো, কুফরি ফতোয়া জারী করে দিত। কখনো বা বলা হতো, সে 'সাবী' (নক্ষত্র পূজারী বা প্রকৃতিপূজারী) হয়ে গেছে। যেহেতু তৎকালীন মোশরেক সমাজে সাবী হওয়া ছিল একটা অবাঞ্ছিত ও কলংকজনক ব্যাপার। তাই কাউকে সাবী আখ্যা দেয়া আজকের যুগে কোন মুসলমানকে ইহুদী, খারেজী বা নাস্তিক বলার মতই গালি বলে বিবেচিত হতো। সত্যের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রমাণ সহকারে বক্তব্য দিতে অক্ষম লোকদের একমাত্র সম্বল হয়ে থাকে নেতিবাচক প্রচারণা। আর এই নেতিবাচক প্রচারণার একটা হাতিয়ার হলো খারাপ নাম ও খারাপ উপাধি দেয়া। প্রত্যেক অলিতে গলিতে এবং প্রত্যেক সভা সমিতিতে মক্কার প্রচারণাবিদেরা এই বলে ঢেড়া পিটাতো যে, ওরা সাবী হয়ে গেছে, ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে, বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, নতুন নতুন আকীদা তৈরী করে শোনাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রচারণার ঝড় যখন উঠতো তখন সাধারণ মানুষের জন্য পরিবেশ যে কত ভারী ও শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠতো এবং সঠিক পথের সন্ধান করা যে কত দূরূহ হয়ে উঠতো, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর এরূপ পরিবেশে সত্যের সেই ক্ষুদ্র কাফেলা যে কী সংকটের সম্মুখীন ছিল, তা কল্পনা করাও বোধ হয় সহজসাধ্য নয়। কিন্তু পরিস্থিতি ও পরিবেশ যতই বিপদ সংকুল হোক, তা দৃঢ়চেতা ও কৃত সংকল্প লোকদের পথ আগলে রাখতে পারেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

'আল্লাহ মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ উন্মুক্ত করেন, তা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা।' (সূরা ফাতের)

যুক্তি প্রমাণের মোকাবিলায় যখন গালি বর্ষণ করা হতে থাকে, তখন চিরদিনই এরূপ হয়ে থাকে যে, যুক্তিপ্রমাণ তো যথাস্থানে বহালই থাকে, কিন্তু যে গালি দেয়া হয়, তা আবেগের ওপর ভর করে, দু'চারদিন টিকে থাকলেও অচিরেই নিস্প্রভ ও ম্লান হয়ে যায় এবং মানুষের মন তার প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে যায়। তাই এ কাজে যারা অভিজ্ঞ, তাদের মূলনীতি হলো নিত্যনতুন গালি আবিস্কার করে যেতে হবে।

এই মূলনীতি অনুসারে রসূল সা. এর জন্য আর একটা নতুন গালি উদ্ভাবন করা হয়। তা হলো 'ইবনে আবি কাবশা'। 'আবি কাবশা' আরবের একজন কুখ্যাত ব্যক্তির নাম। সে সারা আরবের ধর্মীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে 'শা'রা' নামক নক্ষত্রের পূজা করতো। সেই আবি কাবশার নাম থেকেই 'ইবনে আবি কাবশা' উপাধির উদ্ভব। এর অর্থ আবি কাবশার ছেলে বা অনুসারী। নাউযুবিল্লাহ। মনের আক্রোশ মেটাতে মক্কার আবেগগ্রস্ত লোকেরা কত কিইনা আবিস্কার করেছে!

কোন দাওয়াত বা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ও প্রধান ব্যক্তিত্বকে যখন এ ধরনের হীন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়, তখন শুধু ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়াই আসল লক্ষ্য হয়না, বরং আসল লক্ষ্য হয়ে থাকে ঐ মতবাদ ও মতাদর্শকে এবং ঐ আন্দোলনকে হেয় করা ও তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা যার ক্রমবর্ধমান প্রসারে বিরোধীরা আতংকিত থাকে। কিন্তু প্রচন্ড বেগবান একটা স্রোতধারাকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো কেমন করে সম্ভব? মক্কার বিদ্রুপকারীরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে, তারা নোংরা আবর্জনা দিয়ে যত বাঁধই বাঁধছিল, তা এই দাওয়াতের তোড়ে খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তা ক্রমশ কিছু না কিছু সামনেই অগ্রসর হচ্ছে। তাই তারা অপপ্রচারের একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করলো। তারা রসূল সা. এর নামে একটা নতুন উপাধি উদ্ভাবন করে বলতে লাগলো, এই ব্যক্তি আসলে পাগল হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ। দেবতাদের অভিশাপে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে যে সব কথাবার্তা বলে, তা কোন সচেতন মানুষের উপযোগী কথাবার্তাও নয় এবং কোন সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিজনিত ও চিন্তাসুলভ কথাও নয়। সে এক ধরনের মানসিক ব্যাধি বা হিষ্টরিয়ায় আক্রান্ত মানুষ। এই ব্যাধির তীব্রতা বাড়লে কখনো সে ফেরেশতা দেখে। কখনো বেহেশত ও দোজখের স্বপ্ন দেখে, কখনো তার মনে হয় যেন অদৃশ্য জগত থেকে কোন ওহী বা কোন অদ্ভুত কথা ভেসে আসছে। সে আসলে একজন মস্তিষ্ক বিকৃত মানুষ। তার কথাবার্তায় মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। সবার নিজ নিজ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থা অবিচল রাখা উচিত। এভাবে সত্যের আহবায়কদের যুক্তির ধার ভোতা করার জন্য তাদের পাগল ও উন্মাদ বলা কিংবা নির্বোধ ও বোকা বলা বাতিলপন্থীদের একটা চিরাচরিত রীতি। দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধি বাড়ানো এবং নিজেদের লোভ-লালসা ও কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া যাদের স্বভাব, তাদেরকেই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক মনে করা হয়। পক্ষান্তরে সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের কর্মসূচী গ্রহণ করে যারা নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাদেরকে নির্বোধ ও উন্মাদ বলা ছাড়া দুনিয়া পুজারীদের অভিধানে আর কোন উপযুক্ত শব্দ থাকেনা।

এই সব গালি শুধু যে অসাক্ষাতেই বলা হতো তা নয়, বরং সামনাসামনিও বলা হতো :

يَاأَيُّهَاالَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنَ

'ওহে ওহীপ্রাপ্ত হওয়ার দাবীদার, তুমি তো একটা পাগল ছাড়া আর কিছু নও।' (সূরা আল-হিজর, ৬)

আসলে মুখের ওপর গালি না দিতে পারলে গালির প্রকৃত মজাই পাওয়া যায়না।

কিন্তু ভেবে দেখার মত বিষয় হলো, কোন পাগলের নেতৃত্বে কখনো সমাজের লোকেরা আন্দোলন করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে, এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? সুস্থ মস্তিষ্ক, সৎ স্বভাব ও সচেতন তরুণ সমাজ কি কখনো নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে? মাথা বিগড়ে যাওয়া কোন উন্মাদ লোকের আহবানে সুস্থ ও বুদ্ধিমান লোকেরা কি কখনো সাড়া দিয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য মক্কার মোশরেকরা আরো একটা বাহানা প্রস্তুত করে।[৯] তারা বলে, নবুয়তের দাবীদার এই ব্যক্তি জাদুবিদ্যায়ও পারদর্শী। তার সাথে কেউ সাক্ষাত করতে এলেই সে দু'চারটে কথা বলে তাকে সম্মোহিত করে ফেলে এবং মায়াবী দক্ষতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখায়। এ কারণে ভালো ভালো বুদ্ধিমান লোকেরা পর্যন্ত ক্রমশ তাঁর ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, আজ পর্যন্ত কোন জাদুকর কি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করেছে? কোন জাদুকর বা জ্যোতিষী কি কখনো আল্লাহর ইবাদত, তাওহীদ, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার শিক্ষা দেয়ার জন্য জাদুবিদ্যাকে ব্যবহার করেছে? ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত কি আছে যে, জাদুকরের ন্যায় মানসিকতার অধিকারী কোন ব্যক্তি কখনো চলমান সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পাল্টানোর জন্য নিজের জাদু শক্তি বলে একটা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলেছে? জাদুর শক্তি দিয়ে মন মগজ, চরিত্র ও অন্তরাত্মাকে বদলে দেয়ার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও আছে কি? আর ইনি ছিলেনই বা কেমন জাদুকর যে, জাদুর ভেলকি দেখিয়ে, দু'পয়সা উপার্জন করার পরিবর্তে সারা দেশের মানুষের যুলুম নিপীড়ন ভোগ করে সমাজের সর্বোত্তম লোকগুলোকে বাছাই করছিলেন এবং একটা বিরাট সামষ্টিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন? এটা কি কোন ভেলকিবাজি ছিল? আসলে এটা ছিল একটা গদবাধা অভিযোগ। প্রত্যেক যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত লোকদের ওপর এ অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। এ দ্বারা জনগণকে এরূপ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এ দাওয়াতের সাথে সত্যের কোন যোগাযোগ নেই এবং এ কারণে তার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ জন্মে এমন কোন উপাদানও নেই। দাওয়াত দাতার যুক্তিতে এমন কোন ধার নেই যে, তা দ্বারা সে মানুষের মন জয় করতে পারবে, বরং গোটা ব্যাপারটাই জালিয়াতি ও জাদুর

---

[৯] ধর্মভীরু লোকদের জন্য পাশ্চাত্যবাসী Fanaties বা ধর্মান্ধ পরিভাষা এই অর্থেই উদ্ভাবন করেছে যে, তারা মস্তিষ্কের ভারসাম্যহারা আবেগপ্রবণ মানুষ। আমাদের সমাজের অধার্মিক ধরনের লোকেরা যখন ইসলামপ্রিয় লোকদের 'মোল্লা' বলে আখ্যায়িত করে তখন এই অর্থেই করে যে, তারা অবুঝ, যুগের চাহিদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং অতীতের ধ্যান ধারণার অন্ধ ভক্ত। এর চেয়েও একধাপ নীচে নেমে ধার্মিক লোকদেরকে বিরোধীরা রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বোধ বলে অভিহিত করে থাকে।

কারসাজির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যই ভালো ভালো বুদ্ধিমান লোকেরা পর্যন্ত দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং ভারসাম্য হারাচ্ছে।

কিছু কিছু লোক হয়তোবা কোরায়েশ নেতাদের সামনে রসূল রা. এর ওহী যোগে প্রাপ্ত বাণী বিশেষত কুরআনের আয়াতগুলো পেশ করে থাকবে যে, এতে উচ্চাংগের অলংকার মন্ডিত ভাষা রয়েছে। সেই ভাষা নিয়ে সেকালের সাহিত্য বিশারদদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও চিন্তাগবেষণাও হয়ে থাকতে পারে এবং তারা অনুভব করতে পারে যে, ওহীর এই বাণীই এক অলৌকিক ও অসাধারণ প্রভাবশালী বাণী। তাই এই বাণীর আলৌকিকত্বের ধারণাটা খন্ডন করার জন্য তারা বলতে লাগলো, "এমন অলৌকিকত্বের কী আছে এতে? এতো কেবল এক ধরনের কবিতা, ভাষার শৈল্পিক চর্চা এবং সাহিত্যিক ওজস্বিতা। মুহাম্মাদ সা. একজন উচ্চাংগের বাগ্মী। তাঁর বাগ্মিতার জোরে অপরিপক্ক মনের অধিকারী কিছু তরুণ বিপথগামী হচ্ছে।"

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কবি তো পৃথিবীতে কতই এসেছে। মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সংগীরা যে চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এমন নজীরবিহীন ও নিষ্কলংক চরিত্রের অধিকারী কোন কবি কি কখনো পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে? কোরায়েশদের চোখের সামনে যে ধরনের ধর্মীয় কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে, নিছক কবিতার আসর গরমকারীরা কি কখনো তা করতে পেরেছে!

এ প্রশ্ন কোরায়েশদেরকেও বিব্রত করেছিল। এর জবাবে তারা রসূল সা. এর বিরুদ্ধে রটনা করেছিল জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার আর এক অপবাদ। জ্যেতিষীরা কিছু ধর্মীয় ভাবভংগী অনুসরণ করতো। তারা একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতো। চল্লিশ দিন ব্যাপী ধ্যান, নির্জনবাস, জপতপ ও মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়েই তাদের জীবন কাটতো। তারা নানা ধরনের অস্বাভাবিক পন্থায় বিচিত্র তথ্যাবলী সংগ্রহ করে তা রহস্যময় কৌশলগত ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতো। সাধারণ মানুষের মধ্যে তারা বিচরণ করতো অসাধারণ মানুষ হিসেবে। কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ধরনের এসব লোককে 'কাহেন' নামে আখ্যায়িত করা হতো। সেই নামে রসূল সা. কে আখ্যায়িত করে তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, উনিও একই ধাপ্পাবাজির ব্যবসা খুলেছেন, যাতে লোকেরা এসে মুরীদ হয়, এবং তাঁর জীবিকার সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

কিন্তু কোরআন এই সব অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে এই বলে যেঃ

وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُؤْمِنُوْنَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَاتَذَكَّرُوْنَ

"সে কবি নয়। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ও ঈমানের দ্বার তোমরাই রুদ্ধ করে রেখেছ। সে কোন জ্যোতিষী নয়। কিন্তু তোমরা তো চিন্তাভাবনাই করনা।" (সূরা আল-হাক্কা)

তাদের এই উচ্ছৃংখলতার তান্ডব সম্পর্কে কোরআন খুবই সংক্ষেপে যে পর্যালোচনা করেছে তা হলো ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الاَمْثَالَ

"দেখ, এ লোকগুলো তোমার সম্পর্কে কি কি ধরনের প্রবাদ, উদাহরণ, পরিভাষা ও উপাধি প্রয়োগ করে।" এত সব কিছু করার পর তারা সহসা কিভাবে বিপথে ধাবিত হয়, সে সম্পর্কে কোরআন বলেঃ فَضَلُّوا "নিজেরাই নিজেদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে।"

এবার লক্ষ্য করুন, আরো একটা বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা। হযরত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী হবার দাবীদাররা বলে যে, মুহাম্মাদের সা. কাছে একটা জ্বিন এসে অদ্ভুত অদ্ভুত কথাবার্তা শিখিয়ে দিয়ে যায়। কখনো কখনো মক্কার জনৈক রোমক খৃস্টান ক্রীতদাস (জাবের, জাবরা বা জারব) এর নামোল্লেখ করে বলা হয় যে, ঐ ক্রীতদাসটা গোপনে গিয়ে মুহাম্মাদকে এ সব ভাষণ লিখে দিয়ে আসে। অথচ সে কেবল মাঝে মাঝে রসূলের সা. কথাবার্তা শোনার জন্য যেত। একবার কোরায়েশ নেতাদের একটা দল রসূল সা. কে বললোঃ 'আমরা শুনেছি, ইয়ামামার রহমান নামক এক ব্যক্তি তোমাকে এই সব জিনিস শেখায়। আল্লাহর কসম, আমরা কখনো ঐ রহমানের ওপর ঈমান আনবোনা।[১০] এই সব ভিত্তিহীন অপপ্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে এরূপ ধারণা দেয়া যে, এসব কোন বিদেশী অপশক্তি কিংবা ব্যক্তির কারসাজি। মুহাম্মাদ সা. ঐসব অপশক্তির ক্রীড়নক হয়ে তাদের সাথে যোগসাজশ করে আমাদের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত এঁটেছে। অপরদিকে এ ধারণা দেয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই মনোমুগ্ধকর অলংকার সমৃদ্ধ বাণীগুলো মুহাম্মাদেরও সা. প্রতিভার সাক্ষর নয়, আল্লাহর দানও নয়। বরঞ্চ এগুলোর মধ্য দিয়ে তৃতীয় কোন বহির্শক্তি তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। উপরন্তু এ দ্বারা রসূল সা.কে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। এসব দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিয়ে কোরআন অনেক বিস্তারিত জবাব দিয়েছে। তবে তার যে চ্যালেঞ্জটা সবচেয়ে অকাট্য ও অব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে তা হলো, 'তোমরা জ্বিন ও মানুষের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারাও যদি পার তবে কোরআনের মত কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত রচনা করে নিয়ে এস।'

আনুষংগিকভাবে এর মধ্য দিয়ে এ কথাও বলা হলো যে, মুহাম্মাদ সা. কোন নতুন কথা বলছেনা বা কোন বিরল কৃতিত্বও দেখায়নি। আসলে সে কিছু পুরানো কিস্সা কাহিনীর বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে তা জোরদার ভাষায় নতুন করে পেশ করছে। এ হচ্ছে এক ধরনের গল্প বলার শিল্প। গল্পকাররা যেমন গল্প বলে বলে আসর জমায় তেমনি মুহাম্মদ মজার মজার গল্প শুনিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করছে। ইসলামের দাওয়াতকে প্রাচীন কিস্সা কাহিনী' বলে গালি দেয়ার এরূপ একটা তীর্যক ইংগিত রয়েছে যে, ঐসব সেকেলে কিস্সা বাহিনী দিয়ে এ যুগের সমস্যাবলীর সমাধান কেমন করে হবে? সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন রূপকথায় তখনকার মানুষের কোন উপকারিতা নেই।

মজার ব্যাপার হলো, একদিকে বাপদাদার ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী নতুন ধর্ম প্রচারের দায়ে রসূল সা.কে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল। অপরদিকে সেই রসূলের সা. পেশ করা বাণীকেই প্রাচীন কিস্সা কাহিনী বলে নিন্দা করা হচ্ছিল। মতলববাজ কুচক্রীদের এটা চিরাচরিত

---

১০. সীরাতে ইবনে হিশাম, (আরবী) প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩১৭।

স্বভাব যে, আগপাছ চিন্তাভাবনা না করে কখনো একদিক থেকে একটা খুঁত ধরে, আবার কখনো অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে ঠিক তার বিপরীত আপত্তি তোলে। অথচ তারা ভেবেও দেখেনা যে, এভাবে তারা স্ববিরোধী আচরণই করছে।

এই পর্যায়ে একটা ফ্রন্ট খোলা হয় কবিদের দিয়ে। রসূল সা. এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক কবিতা রচনা ও প্রচার করার দায়িত্বে নিযুক্ত হয় আবু সুফিয়ান বিন হারেস, আমর বিন আস, এবং আব্দুল্লাহ বিন যাবারী। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আরবের জাহেলী সমাজে কবিদের প্রচন্ড প্রভাব ছিল। তারা বলতে গেলে মানুষের মনস্তাত্মিক প্রশিক্ষক ও দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতো। তাদের মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দ মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করতো এবং তা মুখস্থ করে করে প্রচার করা হতো। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সেকালে কবিরা অনেকাংশে এ যুগের সাংবাদিকদের ন্যায় অবস্থানে ছিল। আজ যেমন একজন দক্ষ সাংবাদিক নিজের লেখনি ও পত্রিকার শক্তি নিয়ে কারো পেছনে লাগলে তার অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে, নিজের কুটিল ও তীর্যক মন্তব্য, অশালীন ব্যংগবিদ্রুপ, অশোভন চিঠিপত্র, সংবাদ না ছাপানো কিংবা বিকৃতভাবে ছাপানো, এবং বিভ্রান্তিকর শিরোনাম দিয়ে যেমন কোন দাওয়াত, আন্দোলন বা সংগঠনের জন্য সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক তেমনি ভূমিকা পালন করতো আরবের কবিরা। সেখানে প্রতিটি অলিগলিতে মুহাম্মদ সা. ও তার আন্দোলনের দুর্ণাম ও কুৎসা রটিয়ে বেড়ানো এবং ছন্দবদ্ধ গালি ও নিন্দাসূচক শ্লোগান দিয়ে পরিবেশকে বিষাক্ত করার কাজে একাধিক কবি নিয়োজিত ছিল। একজন ভদ্র পথচারীর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, মুহাম্মাদ সা.কে ঘিরে ঠিক সেই ধরনের দৃশ্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু মানবতার বন্ধু নবী মুহাম্মাদ সা. এর বাণী ও চরিত্র কবিদের অপপ্রচারের মায়াবী প্রভাবকে একেবারেই নিস্প্রভ ও পন্ড করে দিচ্ছিল।

উল্লেখ্য যে, অপপ্রচারের এই গোটা অভিযান কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে নয়, বরং একটা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত চক্রান্তের আওতায়ই পরিচালিত হচ্ছিল। তারা সর্বসম্মতভাবে ও ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ঃ لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

'এই কোরআন তোমরা শুনোনা, বরং কোরআন পাঠের সময় হৈ চৈ কর, হয়তো এভাবেই তোমরা জয়ী হতে পারবে।' (হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত ২৬)

অর্থাৎ দাওয়াতদাতার কথায় কর্ণপাতই করোনা, ওটা বুঝবার চেষ্টাই করোনা। তাহলে চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসে যেতে পারে এবং বিদ্যমান আকীদাবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হৈ চৈ করে এর প্রচারে বাধার সৃষ্টি কর এবং একে হাসি ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত কর। এতে করে কোরআনের শক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে, এবং শেষ বিজয় তোমাদেরই হবে। এ আয়াত থেকেই অনুমান করা যায়, ইসলাম বিরোধী শক্তির মনস্তত্বটা কেমন। তারা কথা শুনতে ও বুঝতে চায়না এবং অন্যদেরকেও শুনতে ও বুঝতে দিতে চায়না। এ জন্য হাংগামা সৃষ্টি করে তারা বাধা আরোপ করতে চায়। আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতার পালা পড়েছিল ঠিক এমনই লোকদের সাথে!

আ'স বিন ওয়ায়েল আস-সাহামী রসূল সা. এর দাওয়াত ও আন্দোলনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় যেভাবে বিষোদগার করছিল তা হলো, মুহাম্মাদ যা করছে, করতে দাও।

সে তো নির্বংশ। তার কোন পুত্রসন্তান নেই। সে মারা গেলে তার কথা কেউ স্মরণও করবেনা এবং তোমরা তার কবল থেকে চিরতরে অব্যাহতি পাবে।' রসূল সা. এর পুত্রসন্তান জীবিত না থাকায় এই কুটিল মন্তব্য করা হয়। আরবে এ মন্তব্য নিরর্থকও ছিলনা। কিন্তু আগের মত লোকেরা এ কথা বুঝতে সমর্থ হয়না যে, নবীদের ন্যায় ইতিহাস স্রষ্টা ব্যক্তিগণের আসল সন্তান হয়ে থাকে তাদের অসাধারণ ও ঐতিহাসিক কীর্তি। তাদের মস্তিষ্ক থেকে নতুন নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। তাদের দাওয়াত ও শিক্ষার উত্তরাধিকার ধারণ করা ও তাদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাদের সাথী ও অনুসারীরা দলে দলে অগ্রসর হয়। এভাবে যে বিপুল কল্যাণের সমাগম ঘটে, তার শক্তি ও মূল্যমান ঝাঁক ঝাঁক পুত্রসন্তানের চেয়েও অনেক বেশী। এই তীর্যক মন্তব্যের জবাবেই সূরা কাওসার নাজিল হয়। ঐ সূরায় আ'স ও তার সতীর্থদের বলা হয় যে, আমি আমার নবীকে কাওসার দান করেছি, এই কাওসারকে তার জন্য বিপুল কল্যাণের উৎস বানিয়েছি, কোরআনের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত তাকে দিয়েছি, আল্লাহ ও রসূলের অনুগত এবং ইসলামের বাস্তবায়ন ও প্রচারকারী মুমিনদের একটা বিরাট দল তাকে দিয়েছি, আর আখেরাতে তার জন্য কাওসার নামক পুস্করিনী উপহার দেয়ার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। সেই পুস্করিনী থেকে কেউ একবার পানি পান করার অনুমতি পেলে অনন্তকাল পর্যন্ত তার আর পিপাসা লাগবেনা। তারপর আল্লাহ বলেছেন, হে নবী, আসলে নির্বংশ তো তোমার শত্রুরাই। তাদের প্রকৃতপক্ষে কোনই স্মরণকারী থাকবেনা। তাদের কথা কেউ ভুলেও মনে করবেনা যে অমুক কে ছিল। ইতিহাসে তাদের কোন স্থানই থাকবেনা।

ব্যংগবিদ্রুপে মক্কার যে নরাধমরা সবচেয়ে অগ্রগামী ছিল, এখানে তাদের একটা তালিকা দেয়া বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না। তারা ছিল বনু আসাদ গোত্রের আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, বনু যুহরা গোত্রের আসওয়াদ বিন আব্দু ইয়াগুস, বনু মাখযূমের ওলীদ ইবনুল মুগীরা, বনু সাহমের আস বিন ওয়ায়েল এবং বনু খুযায়া গোত্রের হারিস বিন তালাতিলা।

কুটতর্ক

ব্যংগবিদ্রুপ, ঠাট্টা উপহাস, গালিগালাজ ও অশালীন উপাধি প্রদানের সাথে সাথে কুটতর্কের পালাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। যারা একটা চাক্ষুস সত্যকে মানতে চায়নি, তারা নিজেদের ও দাওয়াতদাতার মাঝে নানা রকমের কুটতর্ক বাধিয়ে অন্তরায় সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাতো। এই অপচেষ্টার একটা ব্যর্থ হলে নব উদ্যমে আরেকটা শুরু করা হতো। এ ধরনের অপচেষ্টায় লিপ্ত লোকদের গোটাজীবনই এতে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা না পারে নিজেদের কোন উপকার করতে, আর না পারে অন্যদের কোন গঠনমূলক সেবা করতে। আন্তরিকতার সাথে যে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হয়, তার ধরন হয় এক, আর চক্রান্তমূলকভাবে দাওয়াতদাতার পথ আটকানোর জন্য যে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হয় তার ধরন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রশ্ন ও আপত্তি তোলাকে বলা হয় কুটতর্ক। কুটতর্ক সব সময় বেঈমানী, দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের প্রতীক হয়ে থাকে। কুটতার্কিকদের বৈশিষ্ট হলো, তারা দাওয়াত থেকে কিছুই শিখতে চায়না, বরং তাতে কৃত্রিমভাবে কোন না কোন বক্রতা অন্বেষণ করে। কোরআনে এ অবস্থাটা বলা হয়েছে : 'তারা বক্রতা অন্বেষণ করে।' (সূরা হুদ ঃ ১৯)

বাপদাদার ধর্মের এই সব উগ্র ও কট্টর সমর্থক একদিকে তো রসূল সা.কে বারবার জিজ্ঞাসা করতো যে, তুমি যদি নবী হয়ে থাক তবে তোমার নবী হওয়ার এমন কোন অকাট্য আলামত ও প্রমাণ তোমার সাথে কেন থাকলোনা যা দেখে কারো পক্ষে নবুয়ত স্বীকার না করে উপায়ই থাকবেনা?

আবার কখনো কখনো তারা নিতান্ত সরলতার ভান করে বলতোঃ 'আমাদের ওপর সরাসরি কোন নিদর্শন নাযিল হলোনা কেন, কিংবা এমন হলোনা কেন যে, আমরা আমাদের মনিবকে সরাসরি দেখে নিতাম? (সূরা ফুরকান, আয়াত ৩১)

অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনা বা তর্কের কী দরকার? সোজাসুজিভাবে আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেশতা নেমে এসে আমাদের সামনে বিচরণ করলেই পারতো। আর আল্লাহ তোমার মাধ্যমে আমাদের কাছে খবরাখবর পাঠিয়ে নিজের খোদায়ী চালু করার বদলে তিনি স্বয়ং আমাদের সামনে হাজির হলেই পারেন। আমরা দেখে নিতে পারি যে, এই তো আমাদের আল্লাহ। তাহলে তো আর ঝগড়া থাকেনা।

তারা সময় সময় এও বলতো যে, তুমি যা যা বল, তা যদি সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে থাক, তাহলে তো একখানা লিখিত কিতাব আমাদের চোখের সামনেই আমাদের কাছে চলে আসলে ভালো হতো। বরঞ্চ তুমি নিজেই একটা সিঁড়ি দিয়ে আকাশ থেকে কিতাবখানা হাতে নিয়ে নেমে আসলে আরো ভালো হতো। আমরা তা হলে অবনত মস্তকে মেনে নিতাম যে, তুমি সত্যিই নবী। এ প্রশ্নও তোলা হয় যে, কোরআন এভাবে এক এক অংশ করে নাযিল হয় কেন? পুরো কিতাবখানা একবারেই নাযিল হয়না কেন? কিন্তু তাদের এ জাতীয় প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব কোরআনে বারবার দেয়া হয়েছে। এই জবাব দেয়ার কারণেই তারা ক্ষুব্ধ ছিল। কেননা এতে করে তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুঁলে যেত এবং তা ব্যর্থ হয়ে যেত।

তাদের আরো একটা কুটতর্ক ছিল এই যে, তুমি তো আমাদেরই মত রক্ত মাংসের তৈরী মানুষ। তোমারও ক্ষুধা লাগে, আয়রোজগার করতে বাধ্য হও, বাজারে যাও, কষ্টে জীবন যাপন কর, তোমার ওপর কত যুলুম হয়, অথচ তোমার কোন সাহায্য করা হয়না। এমতাবস্থায় একথা কিভাবে বিশ্বাস করি যে, তুমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা এবং তোমাকে বিশ্বাবাসীর সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে? তুমি যদি এমন একজন বিশিষ্ট ও অসাধারণ লোক হতে, তাহলে তোমার আগে আগে একদল ফেরেশতা প্রহরী হিসাবে চলতো এবং পথ থেকে লোকজনকে সরে যাওয়ার জন্য হাঁকাহাকি করতো। কেউ তোমার ওপর যুলুম তো দূরের কথা, সামান্য বেআদবী করলেই ঐ ফেরেশতারা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিত। এ রকম হলে সবাই বিনা বাক্য ব্যয় মেনে নিত যে, তুমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী। তোমার জন্য আকাশ থেকে ধনরত্ন নাযিল হওয়া উচিত ছিল। রাজকীয় শান শওকতে তোমার জীবন যাপন করা উচিত ছিল, তোমার বসবাসের জন্য একটা স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ হওয়া উচিত ছিল, তোমার জন্য বিশেষভাবে একটা খাল তৈরী হওয়া উচিত ছিল, তোমার একটা বড় রকমের ফলের বাগান থাকা উচিত ছিল, এবং সেই বাগান থেকে তোমার সচ্ছন্দে জীবন যাপনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জিত হওয়া দরকার ছিল। এ ধরনের শান শওকত ও যাঁকজমক নিয়ে যদি তুমি

নবুয়তের দাবী করতে, তাহলে আমরা তা অবশ্যই মেনে নিতাম। অতচ আমরা ধনে, জনে, তোমার চেয়ে কত বড়। আর তুমিও তোমার সাথীরা সমাজের সবচেয়ে গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোক। আমাদের তুলনায় তোমাদের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাহলে হে মুহাম্মাদ, তুমিই বল, কোন্ যুক্তিতে আমরা তোমাকে নবী মেনে নেব?

এ জন্য যখনই রসূল সা. কোন রাস্তা দিয়ে যেতেন, অমনি লোকজন বলে উঠতো, 'ইনি নাকি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ রসূল সা. করে পাঠিয়েছেন? আংগুল নাচিয়ে নাচিয়ে, ইংগিত করে করে মক্কার গুন্ডাপান্ডা ও সন্ত্রাসী লোকেরা বলতো, 'দেখ, আল্লাহ নবী ও রসূল বানানোর জন্য এই চালচুলোহীন লোক ছাড়া আর কাউকে পেলেন না। কী চমৎকার নির্বাচন! অনুরূপভাবে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের দেখিয়ে বলা হতো, এই নাকি সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্লাহ আমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে বাছাই করেছেন।

এ কথাও বলা হতো, যে আযাবের ভয় দেখিয়ে তুমি নেতা হতে চাইছ, তা নিয়ে আস না কেন? আমাদের মত কাফেরদের ওপর তুমি আকাশের একাংশ ভেংগে ফেলতো দেখি! খোদ আল্লাহর কাছেও দোয়া করতো যে, এই দাওয়াত সত্য হলে হে আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দিয়ে খতম করে দাও।'

বাপদাদার ধর্মের এই একচেটিয়া অধিকারের দাবীদাররা কখনো কখনো এ কথাও বলতো যে, 'হে মুহাম্মদ! তুমি যখন বল, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তখন তিনি নিজের শক্তি প্রয়োগ করে আমাদেরকে ইসলামের পথে চালান না কেন? তিনি যদি আমাদেরকে তাওহীদপন্থী ও সৎ লোক দেখতে চান, তাহলে তিনি আমাদের তাওহীদপন্থী ও সৎ লোক বানিয়ে দেন না কেন? তিনি তো আমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধা দিতে পারেন। তিনি আমাদেরকে ভুল আকীদা পোষণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন। তা যখন তিনি করেন না, তখন নিশ্চয়ই আমাদের বর্তমান চালচলন তাঁর পসন্দ। এমতাবস্থায় তুমি কেন আমাদের চালচলন ও রীতিনীতির নিন্দা সমালোচনা কর? তুমি কোথাকার কে?

তারা কেয়ামত নিয়েও উপহাস করতো। খুব নাটকীয় ভংগিতে জিজ্ঞেস করতো, এই ঘটনাটা কবে ঘটবে বলুন তো। কেয়ামতের কোন দিন তারিখ কি নির্ধারিত নেই?

কোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী থেকে এই উদাহরণগুলো সংগৃহীত। এগুলো দ্বারা অনুমান করা যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক এবং মানবতার সবচেয়ে বড় হিতাকাংখী মানুষটিকে কেমন হীন পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অত্যন্ত নিকৃষ্ট রুচির অধিকারী লোকেরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নিন্দা ও কুৎসা গেয়ে চলেছে। বিতর্কের সুরে নানা ধরনের প্রশ্ন বানিয়ে বানিয়ে তুলে ধরছে। আর রসূল সা. অত্যন্ত ঠান্ডা ও শান্তমনে এবং অত্যন্ত ভদ্র ও শালীন মেজাজে নিজের দাওয়াতের পক্ষে যুক্তি পেশ করছেন। জবাবে কোন নিন্দা ও তিরস্কার করছেন না। বিতর্কের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। রেগে যাচ্ছেন না। কিন্তু দাওয়াত ও তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও পিছু হটছেন না।

ব্যংগবিদ্রূপ ও কূটতর্কের এই তান্ডবের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হবার সময় রসূল সা. যে মানসিক নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করেছেন, তার পুরো প্রতিচ্ছবি কোরআনে পাওয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রসূল সা. কে প্রবোধ ও সান্তনা দিয়েছেন এবং এই স্তরটা ধৈর্যের সাথে পেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'ক্ষমার নীতি অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল।' (সূরা আরাফ-১৯৯)

অর্থাৎ সেই যুলুম নির্যাতনের যুগে রসূল সা. কে তিনটে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় ঃ অপপ্রচার ও গালমন্দের তোয়াক্কা না করা, সর্বাবস্থায় হক কথা বলতে থাকা এবং দুশ্চরিত্র ও মুর্খ লোকদের পেছনে না পড়া।

কোরআন ও ইতিহাস উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, রসূল সা. যুলুম নির্যাতনের সমগ্র যুগটা ঐ তিনটে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে পার করে দিয়েছেন। চরম মর্মযাতনা ভোগ করা সত্ত্বেও নিজের ভাষায়ও কোন পরিবর্তন ঘটতে দেননি, দাওয়াতদাতা হিসেবে নিজের উন্নত চরিত্রের পার্থক্য সৃষ্টি হতে দেননি, এবং যুক্তির প্রখরতাকেও কিছুমাত্র ম্লান হতে দেননি।

আল্লাহ তাঁর পবিত্র আত্মা ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর রহমত ও বরকত নাযিল করুন। এমনকি ঐ কূটতার্কিকরা যখনই কিছু ধারালো যুক্তি উপস্থাপন করেছে, অমনি ওহীর নির্দেশে তাকেও সর্বতোভাবে খন্ডন করেছেন, তা সে যতই নিম্নস্তরের হোক না কেন।

যুক্তি

ব্যংগ বিদ্রুপ, কুৎসা রটনা ও কূটতর্কে কখনো কখনো কোরায়েশ নেতারা দু' একটা ধারালো যুক্তিও উপস্থাপন করেছে, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। এর কয়েকটা উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে ঃ

এ ধরনের একটা যুক্তি তারা মাঝে মাঝে এভাবে পেশ করতো যে, আমরা তো দেবমূর্তিগুলোকে আল্লাহর চেয়ে বড় কখনো মনে করিনা। আমরা শুধু বলি, এই মূর্তিগুলো যে সব মহান ব্যক্তির আত্মার প্রতীক, তারা আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে। এ সব মূর্তির সামনে সিজদা করে ও বলি দিয়ে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকি।

তারা আরো বলতো, আমাদের মতে দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন এ ছাড়া আর কোন জীবন আমাদের হবেনা এবং আমাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিতও হতে হবেনা। সুতরাং আমরা এমন একটা ধর্মকে কিভাবে মেনে নেব, যা অন্য একটা জগতের ধারণা দিয়ে আমাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনের স্বার্থ ও সুখশান্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়?

তারা এ যুক্তিও দিত যে, আমরা যদি মুহাম্মদের সা. দাওয়াত মেনে নেই, বর্তমান ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হতে দেই এবং এর ওপর আমাদের প্রাধান্যকে খর্ব হতে দেই, তাহলে দেশ থেকে আমাদের উৎখাত হয়ে যেতে হবে।

এই দু'তিনটে উদাহরণ থেকে বুঝা গেল যে, কূটতর্ক ও ধড়িবাজির মাঝে তারা কিছু কিছু যুক্তিও দিত। তবে কোরআন সে সব যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিত।

সন্ত্রাস ও গুন্ডামী

ব্যংগ বিদ্রুপ, গালিগালাজ ও অপপ্রচারাভিযানের সাথে সাথে কোরায়েশদের উন্মত্ত বিরোধিতা ক্রমশ গুন্ডামী, সন্ত্রাস ও সহিংসতার রূপ নিত। নেতিবাচক ষড়যন্ত্রের হোতারা

যখন তাদের ব্যংগ বিদ্রুপ ও কুৎসা রটনাকে ব্যর্থ হতে দেখে, তখন গুন্ডামী ও সন্ত্রাসই হয়ে থাকে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। মক্কাবাসী রসূল সা. কে উত্যক্ত করার জন্য এমন হীন আচরণ করেছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন প্রচারক হলে সে যতই সাহসী ও উদ্যমী হোক না কেন, তার উৎসাহ উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যেত এবং হতাশ হয়ে বসে পড়তো। কিন্তু রসূল সা. এর ভদ্রতা ও গাম্ভীর্য সকল সহিংসতা ও গুন্ডামীকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

যে আচরণটা একেবারেই নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, সেটা হলো, তাঁর মহল্লার অধিবাসী বড় বড় মোড়ল ও গোত্রপতি তাঁর পথে নিয়মিতভাবে কাঁটা বিছাতো, তাঁর নামায পড়ার সময় ঠাট্টা ও হৈ চৈ করতো, সিজদার সময় তাঁর পিঠের ওপর জবাই করা পশুর নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করতো, চাদর পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিত, মহল্লার বালক বালিকাদেরকে হাতে তালি দেয়া ও হৈ হল্লা করে বেড়ানোর জন্য লেলিয়ে দিত এবং কোরআন পড়ার সময় তাঁকে, কোরআনকে এবং আল্লাহকে গালি দিত।

এ অপকর্মে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী ছিল আবু লাহাব ও তার স্ত্রী। এ মহিলা এক নাগাড়ে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর পথে ময়লা আবর্জনা ও কাঁটা ফেলতো। রসূল সা. প্রতিদিন অতি কষ্টে পথ পরিষ্কার করতেন। এই হতভাগী তাঁকে এত উত্যক্ত করেছিল যে, তাঁর সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তায়ালা আলাদাভাবে সূরা লাহাব নাযিল করেন এবং তাতে ঐ দুর্বৃত্ত দম্পত্তির ঠিকানা যে দোজখে, তা জানিয়ে দেন।

একবার পবিত্র কা'বার চত্বরে রসূল সা. নামাজ পড়ছিলেন। এ সময়ে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত রসূলের গলায় চাদর পেঁচিয়ে এমনভাবে ফাঁস দেয় যে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। এই দুর্বৃত্তই একবার নামাযের সময় তাঁর পিঠের ওপর নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করেছিল। একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক দুরাচার তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। তিনি ঐ অবস্থাতেই নীরবে বাড়ী চলে যান। শিশু ফাতেমা রা. তাঁর মাথা ধুয়ে দেয়ার সময় দুঃখে ও ক্ষোভে কাঁদতে থাকেন। তিনি শিশু মেয়েকে এই বলে সান্ত্বনা দেন, মাগো, তুমি কেঁদনা। আল্লাহ তোমার আব্বুকে রক্ষা করবেন।

আর একবার যখন তিনি হারাম শরীফে নামায পড়ছিলেন, তখন আবু জাহল ও অপর কয়েকজন কোরায়েশ সরদার তা লক্ষ্য করলো। তখন আবু জাহলের নির্দেশে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত গিয়ে নাড়িভূড়ি নিয়ে এল এবং রসূল সা. এর গায়ে নিক্ষেপ করে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। সেদিনও শিশু মেয়ে ফাতেমা তাঁর গা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন এবং উকবাকে অভিশাপ দেন।

'এক আল্লাহর আনুগত্য কর, সততা ও ইনসাফের অনুসারী হও এবং এতীমও পথিককে সাহায্য কর', এই সদুপদেশের প্রতিশোধ এভাবে নেয়া হয়েছিল যে, কাঁটা বিছিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হলো। ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করে তাওহীদ ও সদাচারের পবিত্র দাওয়াতকে সমুলে উৎখাতের অপচেষ্টা চালানো হলো। রসূল সা. এর পিঠে নাড়িভূড়ির বোঝা চাপিয়ে ধারণা করা হলো যে, এখন আর সত্য মাথা তুলতে পারবেনা। রসূলের সা. গলায় ফাঁস লাগিয়ে জ্ঞানপাপীরা ভেবেছিল এবার ওহীর আওয়ায স্তব্ধ হয়ে যাবে। যাঁকে কাঁটা বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হলো, তিনি সব সময় ফুল বর্ষণ

করতে লাগলেন। যাঁর গায়ে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হলো, তিনি জাতিকে ক্রমাগত আতর গোলাপ বিতরণ করতে লাগলেন। যার ঘাড়ে নাড়িভূড়ির বোঝা চাপানো হলো, তিনি মানবজাতির ঘাড়ের ওপর থেকে বাতিলের ভূত নামিয়ে গেলেনে। যার গলায় ফাঁস দেয়া হলো, তিনি সভ্যতার গলা থেকে বাতিল রসম রেওয়াজের শেকল খুলে ফেললেন। গুণ্ডামী এক মুহূর্তের জন্যও ভদ্রতার পথ আটকাতে পারেনি। ভদ্রতা ও শালীনতার পতাকাবাহীরা যদি যথার্থই কৃত সংকল্প হয়, তবে মানবেতিহাসের শাশ্বত নিয়মের পরিপন্থী সন্ত্রাস ও গুন্ডামীকে এভাবেই চরম শাস্তি দিয়ে চিরতরে নির্মূল করতে পারে।

ইসলামী আন্দোলনকে সহায়হীন করার অপচেষ্টা

ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীরা যখন পানি মাথার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখে, তখন বেশামাল হয়ে আন্দোলনকে বা তার নেতা ও কর্মীদেরকে সমাজের সব ধরনের কার্যকর সমর্থন ও পৃষ্টপোষকতা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চালায়। প্রত্যক্ষভাবে পারা না গেলেও পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করে বিপ্লবের সৈনিকদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে চায়।

মক্কাবাসী রসূল সা. কে একেবারেই খতম করে দিতে চাইত। কিন্তু ভয় পেত যে, গোত্রীয় জিঘাংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণতার আগুন এমনভাবে জ্বলে উঠবে যখন রক্তপাতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করার সাধ্য আর কারো থাকবেনা। নিকট অতীতে এক সর্বনাশা যুদ্ধ তাদেরকে এত ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল যে, এক্ষণি অনুরূপ আর একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে তারা মোটেও প্রস্তুত ছিলনা। এছাড়া আরো একটা জটিলতাও ছিল। বনু হাশেম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে ছিল পুরানো কোন্দল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বনু উমাইয়ার নেতারা বিশেষত আবু লাহাব কিছুতেই বরদাশত করতে পারছিলনা যে, বনু হাশেম গোত্রের কোন পরিবারে কেউ নবী হোক এবং সেই সুবাদে ঐ পরিবার সমাজের স্বীকৃতি লাভ করুক। বনু হাশেম দু'একবার এই মর্মে মন স্থিরও করে ফেলেছিল যে, 'মুহাম্মদকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করলে ক্ষতি কী? সে তো আমাদেরই লোক। সে যদি বড় হয় এবং তার ধর্ম যদি বিস্তার লাভ করে, তবে তা তো আমাদেরই কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এনে দেবে।' কিন্তু বনু উমাইয়ার নেতারা তাদেরকে ঐ সিদ্ধান্ত কখনো কার্যকরী করতে দেয়নি। বনু হাশেম কার্যকরভাবে কিছু করতে পারেনি বটে, তবে তাদের একজন সদস্যের গায়ে হাত তোলা সহজ ব্যাপার ছিলনা, যতক্ষণ না তারা তাকে গোত্র থেকে বহিষ্কার করেছে। এদিকে রসূল সা. ছিলেন তাঁর চাচা আবু তালেবের অভিভাবকত্বে। এ অভিভাবকত্ব যতক্ষণ বহাল ছিল, ততক্ষণ বলতে গেলে গোটা বনু হাশেম গোত্র তাঁর রক্ষক ছিল। তাঁর শত্রুরা তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালালো যাতে রসূল সা. কে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করা যায়। এ জন্য আবু তালেবের ওপর চাপ প্রয়োগ অনেকদিন ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু তারা প্রতিবারই তাতে ব্যর্থ হয়।

একবার রবীয়ার দু'ছেলে উতবা ও শায়বা, আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবুল বুখতারী, আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবু জাহল, ওলীদ ইবনুল মুগীরা, হাজ্জাজ বিন আমেরের দু'ছেলে নুবাইহ ও মুনাব্বিহ এবং আস বিন ওয়ায়েলের মতো শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দল আবু তালেবের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ

'হে আবু তালেব আপনার ভাতিজা আমাদের দেবতা ও ঠাকুরদের গালি দেয়, আমাদের ধর্মের খুঁত ধরে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের বোকা ঠাওরায় ও বিপথগামী আখ্যায়িত করে। এখন আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, হয় আপনি ওকে আমাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা থেকে নিবৃত্ত করুন, নচেত আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। কেননা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে আপনিও আমাদেরই দলভুক্ত এবং ওর বিরোধী। আপনি যদি ওকে সামলাতে না পারেন তবে আমরা অবশ্যই পারবো।'

আবু তালেব সমস্ত কথাবার্তা শান্তভাবে শুনলেন এবং প্রতিনিধি দলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করলেন। রসূল সা. নিজের কাজ যথারীতি অব্যাহত রাখলেন এবং কোরায়েশরা তেলে বেগুনে জ্বলতে লাগলো। প্রতিনিধি দলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। দেখবেন, এতে কত গভীর আবেগ সক্রিয় রয়েছে। এতে অত্যন্ত জোরদার আবেদন জানানো হয়েছে। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, ইসলামের দুশমনরা জনগণকে উত্তেজিত করার বিশেষ আয়োজন করে রেখে এসেছিল। এমন সব স্লোগান ও অভিযোগ তুলেছিল, যা শোনা মাত্রই জনতা ক্রোধে ফেটে পড়বে এবং রসূল সা. এর বিরুদ্ধে ভয়ংকরভাবে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হবে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করা হয়েছে, তখন জনগণকে উস্কানি দেয়ার লক্ষ্যে কিছু না কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য অবশ্যই পরিবেশন করা হয়েছে।

এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তোমাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হচ্ছে এবং তোমাদের দেবদেবীকে গালি দেয়া হচ্ছে।
দ্বিতীয়টি এই ছিল যে, চিরাচরিত ও পৈত্রিক ধর্মের খুঁত ধরা হচ্ছে।
তৃতীয়টি হলো, পূর্ব পুরুষদের অবমাননা করা হচ্ছে।

মক্কার মোশরেকেরা উত্তেজনাকর এ সব উপকরণ সংগ্রহ করে ফেলেছিল। যদিও রসূল সা. এর কাছে নাযিল হওয়া ওহীতে কোরায়েশদের দেবদেবীকে গালি দেয়া হয়নি। বরং গালি দিতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। তবুও এই সব দেবদেবীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণকে গালি আখ্যায়িত করে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি ওদের পূর্ব পুরুষদের অবমাননা করেননি, কেবল এ কথাই বলেছেন যে, কোন জিনিস শুধু পুরুষানুক্রমিকভাবে চলে আসছে এই অজুহাতে ধারণ করে রাখা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু এ কথাটাকেও পূর্ব পুরুষদের অবমাননা বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল সা. তাওহীদের যৌক্তিকতা ও শেরকের অযৌক্তিকতার প্রমাণ করার জন্য যা কিছু বলেছেন এবং মোশরেকদেরই প্রশ্নের জবাবে প্রচলিত ধর্মমতের যে পর্যালোচনা করেছেন, তাকে গতানুগতিক ধর্মের দোষ অন্বেষণের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।
আরেকবার এলো অন্য এক প্রতিনিধি দল। তারাও একই কাসুন্দি ঘেটে বললোঃ

'হে আবু তালেব আপনি আমাদের মধ্যে বয়সেও প্রবীণ, মান মর্যাদায়ও শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। আমরা দাবী করেছিলাম যে, আপনার ভাতিজার অত্যাচার থেকে আমাদের বাঁচান। কিন্তু আপনি কিছুই করলেন না। আল্লাহর কসম, আমাদের বাপদাদাকে যেভাবে গালি দেয়া হচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষকে যেভাবে বেকুফ ঠাওরানো হচ্ছে এবং আমাদের দেবদেবীর যেভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে, তা আমাদের কাছে অসহ্য। আপনি যদি ওকে না ঠেকান,

তবে আমরা ওকেও দেখে নেব, আপনাকেও দেখে নেব। হয় আমরা বেঁচে থাকবো, না হয় মুহাম্মদ ও তার সমর্থকরা বেঁচে থাকবে।[১১]

আবু তালেব এবার রসূলকে সা. ডাকলেন এবং সমস্ত কথাবার্তা তাঁকে জানালেন। তারপর খুবই অনুনয় করে বললেনঃ 'ভাতিজা, আমার ওপর এমন বোঝা চাপিওনা, যা বহন করতে পারিনা।' এ পর্যায়ে তিনি এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন যে, তাঁর একমাত্র আশ্রয় স্থলও যেন টলটলায়মান হয়ে পড়লো। বাহ্যত ইসলামী আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর মুহূর্ত এসে পড়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কী গভীর আন্তরিকতা ও অবিচল সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন ঃ

'চাচাজান, আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ উপহার দিয়েও এই কাজ পরিত্যাগ করতে বলে, তবুও আমি তা পরিত্যাগ করতে পারবোনা। আমার এ কাজ সেই দিন বন্ধ হবে, যেদিন হয় আল্লাহ আমাকে এ কাজে বিজয়ী করবেন, নচেত আমি এই চেষ্টা সাধনা করতে করতে খতম হয়ে যাবো।'

রসূল সা. এর এ উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা সেই আসল শক্তির সোচ্চার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি, যে শক্তি ইতিহাসকে ওলট পালট করে দেয় এবং সকল প্রতিরোধ ও ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করে আপন লক্ষ্যে উপনীত হয়। পরিতাপের বিষয় হলো, কোরায়েশ এই শক্তির উপস্থিতি টের পায়নি। আবু তালেব এই শক্তির মায়াবী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বললঃ 'যাও ভাতিজা, তোমার যা ভালো লাগে তার দাওয়াত দাও গে। আমি কোন অবস্থায় তোমাকে অসহায় ছেড়ে দেবনা।'

কিছুদিন পর আরেক প্রতিনিধি দল এলো আম্মারা ইবনে ওলীদকে সাথে নিয়ে। এবার তারা এল এক ব্যতিক্রধর্মী পরিকল্পনা নিয়ে। তারা আবু তালেবকে বললোঃ 'এই দেখুন, এ হচ্ছে কোরায়েশ বংশের সবচেয়ে সুঠাম ও সুদর্শন যুবক। একে নিয়ে নিন। এর বুদ্ধি ও শক্তি আপনার অনেক কাজে লাগবে। একে নিজের ছেলে বানিয়ে নিন এবং তার বিনিময়ে মুহাম্মদকে আমাদের হাতে অর্পণ করুন। কেননা সে আপনার ও আপনার চৌদ্দ পুরুষের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আপনার দেশের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের পূর্ব পুরুষকে বেকুফ গণ্য করেছে। ওকে আমরা হত্যা করতে চাই। আপনাকে একজন মানুষের পরিবর্তে আর একজন মানুষ দিচ্ছি।[১২]

লোকগুলোর চিন্তার ধরনটা দেখুন। মুহাম্মদ সা. এর ন্যায় সুমহান ব্যক্তিত্ব যেন একটা বাণিজ্যিক পণ্য। আর আবু তালেব যেন তার চাচা নয়, বরং একজন ব্যবসায়ী! প্রতিনিধিদের কথা শুনে আবু তালেবের ভাবাবেগে প্রচন্ড আঘাত লাগলো। তিনি বললেনঃ 'তোমরা চাও যেন তোমাদের সন্তানকে তো আমি আদরযত্নের সাথে লালন পালন করতে থাকি, কিন্তু আমার ভাতিজাকে নিয়ে তোমরা যবাই করে দাও। এমনটি কস্মিনকালেও হতে পারেনা।' শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত বাক্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঘটনার সমাপ্তি ঘটলো। খোদ প্রতিনিধি দলের মধ্যে দ্বিমতের সৃষ্টি হলো।

---

১১. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১০৮।

১২. ইবেনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৭৯।

এবার কোরায়েশরা রসূল সা. এর সাথীদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য যে সমস্ত গোত্রে কোন মুসলমান ছিল, সেই সব গোত্রকে উস্কে দিতে লাগলো। তাদেরকে ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য কঠোর নির্যাতন চালানো শুরু হলো। কেবল রসূল সা. কে আল্লাহ আবু তালেবের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষা করলেন। আবু তালেব কুরায়েশদের হাবভাব দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালেবের কাছে রসূল সা. এর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানালেন। লোকেরা সমবেত হলো এবং মুহাম্মদ সা.কে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু আবু লাহাবের প্রবল বিরোধিতায় কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলনা।

পরবর্তী সময় যখন শত্রুদের মধ্য থেকে হামযা ও ওমরের ন্যায় দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করলো, তখন শত্রু মহলে আবারো প্রচন্ড গাত্রদাহের সৃষ্টি হলো। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মুহাম্মদের সা. এর পরিচালিত আন্দোলন তখন ঘরে ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং একটা কিছু করা চাই। আবু তালেব তখন রোগ শয্যায়। তারা তাঁর কাছে হাজির হলো। এবার তাদের পরিকল্পনা এই ছিল যে, রসূল সা. এর সাথে তাদের এই মর্মে চুক্তি হয়ে যাক যে, সেও আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেনা, আর আমরাও তার ব্যাপারে নাক গলাবোনা। সে আমাদের ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেনা, আর আমরাও তার ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবোনা। রসূল সা. কে ডাকা হলো। তিনি কোরায়েশদের দাবী দাওয়া শোনার পর বললেনঃ

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين بها العجم

"ওহে কোরায়েশ নেতৃবৃন্দ, তোমরা আমার এই একটা মাত্র কথাকে মেনে নাও, দেখবে আরব ও অনারব নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি তোমাদের অনুগত হয়ে গেছে।"

একটু কল্পনা করুন তো, কী প্রাণঘাতি পরিবেশ। ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতার বিষে জর্জরিত কী ভয়াবহ পরিস্থিতি! তা সত্ত্বেও রসূল সা. এর মনে স্বীয় দাওয়াতের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কত গভীর ও অবিচল আস্থা। যেন রাতের প্রগাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছেন, এক্ষুনি সূর্য উঠবে। শুধু তাই নয়, এও লক্ষ্য করুন যে, নিজের আদর্শের শুধু ধর্মীয় দিক নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকও তাঁর সামনে কিরকম উজ্জ্বল ছিল।

আবু জেহেল ঝনাত্ করে বলে উঠলোঃ 'হ্যাঁ, তোর বাপের কসম, একটা কেন, দশটা কথা চলবে।'

অন্য একজন বললোঃ 'আল্লাহর কসম, এ লোকটা তোমাদের পছন্দ মাফিক কোন কথাই মেনে নেবে বলে মনে হচ্ছেনা।'

এরপর তারা হতাশ হয়ে চলে গেল। তবে প্রতিনিধি দলটির কথাবার্তা থেকে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমত, ইসলামী আন্দোলনকে তারা এমন একটা শক্তি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, যাকে উৎখাত করার বৃথা চেষ্টার চেয়ে আপোষ ও সহাবস্থানের কোন উপায় খুঁজে বের করা অনেক ভালো। দ্বিতীয়ত, কোরায়েশগণ তাদের সমস্ত নির্যাতন নিষ্পেষণ ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও নিজেদের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

এ ছিল স্বয়ং রসূল সা. এর অবস্থা। পক্ষান্তরে তাঁর সংগীদের মধ্যেও যারা কারো না কারো অভিভাবকত্বের আওতায় জীবন যাপন করছিল, তাদেরকেও অভিভাবকত্বহীন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আবু সালমাও আবু তালেবের নিরাপত্তা হেফাজতে ছিলেন। তাঁর গোত্র বনু মাখযুমের লোকেরা এল। তারা বললো, আবু তালেব, আপনি আপনার ভাতিজাকে তো আমাদের হাতে সোপর্দ করলেননা। কিন্তু আমাদের গোত্রের লোককে ঠেকানোর কী অধিকার আছে আপনার? আবু তালেব বললেন, 'সে আমার ভাগ্নে এবং আমার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছে। তোমরা ওর ওপর যুলুম চালাচ্ছিলে। আল্লাহর কসম, হয় তোমরা যুলুম থেকে বিরত হবে, নচেত আমি ওর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা করা দরকার করবো।'

অনুরূপভাবে, আবিসিনিয়ায় হিজরত শুরুর পর একবার হযরত আবু বকর মক্কার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা ত্যাগ করে চললেন। কিছু দূর গেলে ইবনুদ দুগুন্না নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে যখন জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, উনিও হিজরত করছেন, তখন সে বললো, আপনার মত লোকদের এভাবে মাতৃভূমি ত্যাগ করা উচিত নয়। আপনি বিপদাপদে আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেন, এবং নগ্ন লোককে কাপড় দেন। নিজে সৎকাজ করেন এবং অন্যদেরকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ইবনুদ দুগুন্না এভাবে হযরত আবু বকরকে নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে ফিরিয়ে আনলো এবং কোরায়েশদের সামনে ঘোষণা করে দিল যে, আবু বকর তাঁর নিরাপত্তা হেফাজতে আছেন। বাড়ীতে তিনি নিজের নামায পড়ার জায়গায় বসে সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়তেন। সেই সাথে তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তো। ফলে যে-ই তার তেলাওয়াত শুনতো, সে প্রভাবিত হতো। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা কোরায়েশদের কানে গেল। তারা ইবনুদ দুগুন্নার কাছে এসে বললো, তুমি আবু বকরকে আশ্রয় দিয়ে তো আমাদের সর্বনাশ করছেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়েন, আর তা শুনে আমাদের মহিলারা ও শিশুরা প্রভাবিত হচ্ছে, তোমার আশ্রয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। আবু বকরকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। সেখানে বসে সে যা ইচ্ছে করুক। আমরা নাক গলাতে যাবনা। ইবনুদ দুগুন্না অগত্যা আবু বকর রা. কে তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। (ইবনে হিশাম)

নেতিবাচক ফ্রন্ট

শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ সা. মানবজাতির যে বৃহত্তম সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, তাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য ইসলামের শত্রুরা হরেক রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত ছিল এবং তার সুফলও কিছুনা-কিছু পাওয়া যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় বিরুদ্ধবাদী প্রচারণার একটা সক্রিয় সেল গঠন করা হলো। এই সেলের আওতায় মক্কার কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতা রসূল সা. এর কাছাকাছি অবস্থান করতে লাগলো। তাদের প্রধান সমস্যা ছিল এই যে, মক্কা ছিল সমগ্র আরবের কেন্দ্রস্থল। এখান দিয়ে সব জায়গা থেকে কাফেলা যাতায়াত করতো এবং সত্যের দাওয়াতের নিত্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতো। মক্কার সরদারদের যে ধাপ্পাবাজী খোদ মক্কাবাসীর ওপর চলতো, সেটা

বহিরাগতদের ওপর চলতোনা। তাছাড়া নবাগতদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও নির্মল বিবেকধারী লোকও থাকতো। তারা কোন দাওয়াতকে নিছক যুক্তির বিচারে এবং দাওয়াত দাতাকে শুধু তার আচার ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্রের আলোকে যাচাই করে কোন বিদ্বেষ বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। মুমাম্মদ সা. এর দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিলনা এবং থাকার কোন কারণও ঘটেনি। এ পরিস্থিতিতে শুধু মক্কাকে মুহাম্মদের সা. দাওয়াতের প্রভাব থেকে রক্ষা করায় কোন লাভ হতোনা, যদি মক্কার বাইরের আরবীয় সমাজ ঐ দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। কোরআনে বিষয়টির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

اَوَلَمْ يروْا اَنَّا نَأْتِى الاَرْض نَنْقُصُها مِنْ اَطْرَافِهَا

'তারা কি দেখতে পায়না, তাদের প্রভাবাধীন এলাকাকে আমি চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?' এ দিক দিয়ে তাদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক সময় ছিল হজ্জের মওসুম। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলে দলে তাদের সরদারদের নেতৃত্বে মক্কায় সমবেত হতো। এ সময় রসূল সা. ঐ সব দলের সদস্য ও নেতাদের সাথে তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে সাক্ষাত করতেন এবং দাওয়াত দিতেন। প্রতিক্রিয়াশীল নেতিবাচক আন্দোলনের নেতারা তা দেখে তেলে বেগুনে জ্বলতো। একবার হজ্জের মওসুম সমাগত হলে কোরায়েশ নেতারা ওলীদ ইবনুল মুগীরার বাড়ীতে জমায়েত হলো এবং গভীর ভাবতে লাগলো। ওলীদ সমস্যাটা এভাবে তুলে ধরলো ঃ

'হে কোরায়েশ জনতা, হজ্জের মওসুম সমাগত। সমগ্র আরব থেকে তোমাদের এখানে দলে দলে লোক আসবে। তারা সবাই আমাদের এই লোকের (মুহাম্মাদের) ব্যাপারটা জেনে গেছে। তাই তারা বিষয়টা ভালো করে জানার কৌতুহল নিয়েই আসবে। কাজেই তোমরা এখন এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। পরস্পর কোন মতভেদে লিপ্ত হয়োনা। একজনের কথা আরেকজন মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকবে ও খন্ডন করতে থাকবে এমন যেন না হয়।'

উপস্থিত জনতা বললো ঃ 'আপনিই বলুন। একটা কর্মসূচী আপনিই ঠিক করে দিন। আমরা সেই মোতাবেক কাজ করবো।'

কিন্তু ওলীদ জোর দিয়ে বললোঃ 'তোমরাই আলোচনা কর, আমি শুনি।'

অগত্যা আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

একদল বললো ঃ আমরা তো মনে করি, মুহাম্মদ একজন জ্যোতিষী। এই কথাই হজ্জে আগত লোকদের বলে বুঝাতে হবে।

ওলীদ ঃ না, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ জ্যোতিষী নয়। আমরা বহু জ্যোতিষী দেখেছি। জ্যোতিষীদের মত ছন্দবদ্ধ ও মিত্রাক্ষর পয়ারে মুহাম্মদ কথা বলেনা।

লোকেরা বললো ঃ তাহলে আমরা বলবো ঃ ওকে ভুতে ধরেছে।

ওলীদ ঃ না, সে ভুতেধরাও নয়। ভুতে ধরা মানুষের যেমন গলা ধরে যায়, অংগপ্রত্যংগ কাঁপে, এবং চিন্তাধারা এলোমেলো থাকে, মুহাম্মাদের মধ্যে সে সব লক্ষণ নেই।

জনতা ঃ তাহলে আমরা বলবো, ও একজন কবি।

ওলীদ ঃ না, ও কবি বলেও তো আমার মনে হয়না। আমরা হরেক রকম ছন্দের কবিতা চিনি। সে অনুসারে সে কবিও নয়।'

জনতা ঃ তাহলে আমরা বলবো সে একজন যাদুকর।

ওলীদ ঃ না, সে যাদুকরও নয়। আমরা অনেক যাদুকর ও তাদের জাদু দেখেছি। জাদুতে ফুঁক ও মাদুলী দেয়ার যে রীতি আছে, মুহাম্মাদের সা. কাছে তা তো নেই।

জনতা ঃ তাহলে ওহে আবু আবদুশ্‌শামস, আপনিই বলুন, মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানোর জন্য আমরা কী বলবো?

ওলীদ ঃ আল্লাহর কসম। ওর কথাবার্তা বড়ই মধুর। তার কথার শেকড় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং তার শাখা প্রশাখায় অনেক ফল ধরে। এ দাওয়াত বিজয়ী হবেই। একে পরাভূত করা যাবেনা। এ দাওয়াত অন্য সব কিছুকে পর্যুদস্তু করে দেবে। তোমরা যেটাই বলবে, নিরর্থক ও বৃথা হয়ে যাবে। তবে তোমরা যা যা বলেছ, তার মধ্যে শেষের কথাটাই কিছুটা মানানসই হয়েছে। তোমরা এটাই বলবে যে, সে একজন জাদুকর। তার কথায় জাদু রয়েছে। সে কথা দিয়ে বাপবেটায়, স্বামী স্ত্রীতে, ভাইয়ে ভাইয়ে, ব্যক্তি ও গোত্রে এবং গোত্রে গোত্রে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটায়। (ইসলামের দাওয়াতের দিকে ইংগিত করে এ কথা বলা হয়েছে। কেননা এই দাওয়াতের ভিত্তিতে সমাজে দুটো দল সৃষ্টি হয়ে গেছে। অথচ এর আসল কারণ হলো, ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র।) তোমরা বলবে যে, তার জাদুর কারণেই লোকেরা তাকে বয়কট করে রেখেছে। (সীরাতে ইবনে হিশামও সীরাতুল মুস্তাফা, ইদ্রীস কান্দুলভী)

লক্ষ্য করুন, কিভাবে একজন মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। যে কথা বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়না, সে কথাই জোর করে চালু করার চক্রান্ত করা হয়। ঐ মজলিসেই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মক্কা অভিমুখী এক এক রাস্তার মুখে এক একটা দল বসে থাকবে। তারা প্রত্যেক প্রতিনিধি দলকে মুহাম্মদ সা. ও তার দাওয়াত সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হলো। কিন্তু এর ফল হলো উল্টো। রসূল সা. সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আরবের কোণে কোণে পৌঁছে গেল। যারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতোনা, তারাও জেনে গেল যে, আরবে একটা নতুন ধর্মের দাওয়াত চালু হয়েছে এবং মুহাম্মদই সা. তার পতাকাবাহী।

এবার আসুন, ইতিহাসের পর্দায় ইসলামের আহ্বায়ক ও তার বিরুদ্ধে কর্মরত নেতিবাচক আন্দোলনকারীদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা যাক।

রবীয়া বিন উবাদা বর্ণনা করেন, আমি তখন একজন তরুণ। মীনায় বাবার সাথে থাকতাম। দেখতাম যে, রসূল সা. আরবের বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে তাঁবুতে যেয়ে বলছেন, হে অমুক গোত্রের জনমন্ডলী, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তোমাদের কাছে আমার দাওয়াত, তোমরা শুধু আল্লাহর এবাদত কর, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করোনা। যে সমস্ত দেবমূর্তির তোমরা পূজা করে থাক, তা বর্জন কর। আমার ওপর ঈমান আনো। আমাকে সমর্থন কর ও আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত কর। তাহলে আল্লাহ যে সমস্ত কথা বলার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন, তা বিস্তারিতভাবে বলবো।'

ঘটনার প্রতিবেদক বলেন, এক ব্যক্তি এতেনীয় পোশাক পরে রসূল সা. এর পেছনে পেছনে চলছিল। রসূল সা. যখনই তার কথা বলা শেষ করতেন, অমনি ঐ লোকটা চিৎকার করে বলতোঃ 'ওহে অমুক গোত্রের অতিথিবৃন্দ, এই লোকটা তোমাদেরকে লাত ও উয্যা থেকে দূরে সরিয়ে নতুন ধর্ম ও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ওর কথা তোমরা শুনোনা এবং মান্য করোনা।

ঐ তরুণ এ দৃশ্য দেখে নিজের বাবাকে জিজ্ঞেস করে, দাওয়াতদাতার পেছনে পেছনে যে লোকটা ছুটে চলছে সে কে? সে তো ওর প্রত্যেকটা কথা খন্ডন করছে।'

বাবা জবাব দেন, 'সে ঐ ব্যক্তির চাচা আবু লাহাব।

হজ্জের ন্যায় বিভিন্ন মেলায়ও রসূল সা. হাজির হতেন, যাতে সামাজিক সমাবেশগুলো দ্বারা কিছু না কিছু উপকৃত হওয়া যায়। একবার যুল মাজায নামক মেলায় হাজির হয়ে জনতাকে কলেমায়ে তাইয়েবার দাওয়াত দিলেন। আবু জাহেল তাঁর পিছু লেগে ছিল। সে এমন ইতরামির পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, হাতে ধুলোবালি নিয়ে রসূল সা. এর মুখে নিক্ষেপ করছিল এবং বলছিল, তোমরা ওর কথা শুনোনা। ও লাত ও উয্যার পূজা বন্ধ করতে চায়। (সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী)

বিরুদ্ধবাদী প্রচারণার এই জোরদার অভিযানের খবরাদি শুনে আবু তালেব শংকিত হন যে, আরবের জনগণ সংঘবদ্ধভাবে বিরোধিতা শুরু করে না দেয়। এ জন্য তিনি একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে কা'বার দুয়ারে ঝুলিয়ে রাখেন। এতে তিনি একদিকে সাফাই দেন যে, আমি নিজে মুহাম্মাদের দাওয়াত গ্রহণ করিনি। অপর দিকে তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন যে, আমি কোন অবস্থাতেই মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করতে পারবোনা। প্রয়োজন হলে তার জন্য আমি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেব। আবু তালেবের নামে সংকলিত এ জাতীয় কবিতার বেশীর ভাগই ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল। তবে এর বেশ কিছু অংশ যে সঠিক, সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ নেই। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

বিরূপ প্রতিক্রিয়া

যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মক্কায় আসতো, অমনি ইসলামের শত্রুরা তাকে ঘিরে ধরতো এবং রসূল সা. এর প্রভাব থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু অধিকাংশ সময় উল্টো ফল ফলতো। এ ধরনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে।

তোফায়েল বিন আমর দাওসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নামকরা কবি ছিলেন। একবার তিনি মক্কায় বেড়াতে এলে কোরায়েশদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে গেল। তারা গিয়ে বললোঃ 'তোফায়েল সাহেব, আপনি আমাদের শহরে আগমন করেছেন, এতে আমরা আনন্দিত। তবে এখানে যে ক'টা দিন থাকবেন একটু সাবধানে থাকবেন। এখানে মুহাম্মাদের সা. কার্যকলাপ আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এ লোকটা আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং আমাদের স্বার্থ ধ্বংস করে দিয়েছে। ওর কথাবার্তা জাদুর মত। সে পিতাপুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, এবং স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। আপনার ও আপনার গোত্রকে নিয়ে আমরা শংকিত, পাছে আপনারা ওর ধাপ্পার শিকার হয়ে

যান। তাই মুহাম্মাদের সা. সাথে আপনার একেবারেই কোন কথা না বলা ও তার কোন কথা না শোনা সবচেয়ে উত্তম।'

তোফায়েল বলেনঃ আমি মুহাম্মাদের সাথে কোন কথা বলবোনা এবং তাঁর কোন কথা শুনবোনা– এই মর্মে ওয়াদা না করায় তারা আমার পিছু ছাড়েনি। তাই মসজিদুল হারামে যাওয়ার সময় কানে তুলো দিয়ে যেতাম। এই সময় হঠাৎ একদিন দেখলাম, রসূল সা. কা'বার কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমিও তাঁর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর আবৃত্তি করা খুবই মধুর বাণী শুনলাম। মনে মনে বললামঃ আমি কি মায়ের দুধ খাওয়া শিশু? আল্লাহর কসম, আমি তো একজন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। আমি একজন কবি। ভালোমন্দ বাছ বিচারের ক্ষমতা আমার আছে। তাহলে মুহাম্মাদের কথা শুনতে আমাকে কে বাধা দিতে পারে? তিনি যে দাওয়াত দেন তা যদি ভালো হয় তাহলে গ্রহণ করবো। আর খারাপ হলে প্রত্যাখ্যান করবো।'

এই চিন্তা–ভাবনায় খানিকটা সময় কেটে গেল। নামায শেষে রসূল সা. বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। তোফায়েল তাঁর সাথে সাথে চললেন। পথে তাঁকে সব কথা জানালেন যে, তাঁর কাছে তাঁর সম্পর্কে কিরূপ অপপ্রচার করা হয়েছে এবং কিভাবে তাকে রসূল সা. এর কাছ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। বাড়ীতে পৌঁছে তিনি রসূল সা. এর দাওয়াত কি, সবিস্তারে জানতে চাইলেন। রসূল সা. তাঁকে ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এবং কোরআন পড়ে শোনালেন। তোফায়েল বলেনঃ 'আল্লাহর কসম, এত সুন্দর বাণীও আমি কখনো শুনিনি, এমন নির্ভুল ও সত্য দাওয়াতও আমি কখনো পাইনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলাম প্রচার করলেন। এতে তাঁর সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

তোফায়েল এমন আবেগোদ্দীপ্ত প্রচারকে পরিণত হন যে, বাড়ীতে গিয়ে বৃদ্ধ পিতার সাথে দেখা হওয়া মাত্রই বলেনঃ 'আপনিও আমার কেউ নন, আমিও আপনার কেউ নই।' পিতা বললেনঃ 'সে কী? তোমার কী হয়েছে বাবা!' তোফায়েল বললেনঃ 'আমি এখন মুহাম্মদ সা. এর ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং তাঁর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছি।' পিতা বললেন ঃ 'বাবা, তোমার ধর্ম যা, আমার ধর্মও তাই হবে।' তিনি তৎক্ষণাত গোসল করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তোফায়েল একই পন্থায় নিজের স্ত্রীকেও দাওয়াত দিলেন। সেও ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর গোত্রের সবার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। পরে তিনি রসূল সা. এর কাছে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁর গোত্রের বিভিন্ন চারিত্রিক দোষের উল্লেখ করে তাদের জন্য আযাবের দোয়া করতে রসূল সা. কে অনুরোধ করেন। কিন্তু রসূল সা. হেদায়াতের ও সংশোধনের দোয়া করেন এবং তোফায়েলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন, যেন, ধৈর্যের সাথে নিজের গোত্রের সংশোধনের জন্য কাজ করে যেতে থাকে এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ করে। (ইসলাম প্রচারে তার জবরদস্তির প্রবণতা ইসলামী কর্মনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলনা।)[১৩]

---

১৩. সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ঃ ৪০৭-৯ পৃষ্ঠা।

আরো একটা ঘটনা লক্ষ্য করুন। আ'শা ইবনে কায়েসও একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তিনি রসূল সা. সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে ইসলাম গ্রহণ করার মানসে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি রসূল সা. এর প্রশংসাসূচক একটা কবিতাও রচনা করেছিলেন। আ'শা মক্কার সীমার ভেতরে পৌঁছা মাত্রই জনৈক কোরায়েশী মোশরেক (ইবনে হিশামের মতে, সে ছিল আবু জাহল) এসে তাকে ঘিরে ধরলো এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। আ'শা বললেন, আমি মুহাম্মদ সা. এর কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথাবার্তা হলো। কুচক্রী মোশরেকটি আ'শার মনোভাব যাচাই করার জন্য বললো, দেখ, মুহাম্মদ তো ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে।' এতেও যখন আ'শা দমলেন না, তখন সে বললো, মুহাম্মদ সা. মদ খেতেও নিষেধ করে। এভাবে এটা ওটা বলতে বলতে সে আ'শার সংকল্পটাকে দুর্বল করে দিল। শেষ পর্যন্ত তাকে এই মর্মে রাজী করালো যে, এবারকার মত তুমি চলে যাও। আগামী বছর এসে ইসলাম গ্রহণ করো। আ'শা ফিরে গেল। কিন্তু পরের বছর মক্কায় ফিরে আসার আগেই হতভাগার মৃত্যু হয়ে গেল।

সবচেয়ে মজার ঘটনা ছিল মুরদ আরাশীর। বেচারা একটা উট নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আবু জাহলের সাথে উট বিক্রির বিষয়ে তার কথাবার্তা পাকা হয়। কিন্তু আবু জাহল দাম দিতে গড়িমসি করতে থাকে। বাধ্য হয়ে সে কোরায়েশদের বিভিন্ন নেতার কাছে গিয়ে উটের দাম আদায় করিয়ে দেয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকে। পবিত্র কা'বার চত্তরে কোরায়েশদের একটা বৈঠক চলছিল। আরাশী ঐ বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানালো যে, আপনাদের কেউ আবু জাহালের কাছ থেকে আমার পাওনাটা আদায় করে দিন। আমি একজন বিদেশী। আমার ওপর যুলুম করা হচ্ছে। বৈঠকের লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিলনা, যে আবু জাহলের কাছে গিয়ে বিদেশীর হক আদায় করে দেয়ার দুঃসাহস দেখায়। এ জন্য তারা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ যে একটা লোক (মুহাম্মদ সা) বসে আছে, ওর কাছে যাও। সে আদায় করে দেবে। আসলে এটা ছিল একটা পরিহাস মাত্র। কেননা সবাই জানতো মুহাম্মাদের সা. সাথে আবু জাহলের কি সাংঘাতিক শত্রুতা। আরাশী রসূল সা. এর কাছে এসে তার সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। রসূল সা. তৎক্ষণাত উঠলেন এবং বললেন, আমার সাথে এস। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো কী ঘটে তা দেখার জন্য। রসূল সা. হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে সোজা আবু জাহলের বাড়ীতে গেলেন এবং দরজায় করাঘাত করলেন। ভেতর থেকে আওয়ায এলো, কে? তিনি বললেনঃ আমি মুহাম্মদ। বাইরে এস। আমার জরুরী কথা আছে।

আবু জাহাল বেরিয়ে এল। মুখ তার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, এ লোকটার যা পাওনা আছে, দিয়ে দাও। আবু জাহল বিনা বাক্যবয়ে পাওনা পরিশোধ করে দিল। আরাশী সানন্দে হারাম শরীফের বৈঠকরত লোকগুলোর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা জানালো।

মুহাম্মদ সা. এর নির্মল চরিত্রের প্রভাবেই ঘটেছিল এ ঘটনা। আবু জাহল নিজেও এর স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বৈঠকরত কোরায়েশ নেতাদের কাছে তা ব্যক্তও করেছিল। সে বললো, মুহাম্মদ এসে দরজায় করাঘাত করলো। আমি তার আওয়ায শুনতেই কেন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। (ইবনে হিশাম)

স্বয়ং আরাশী এবং মক্কাবাসীর ওপর এ ঘটনার কেমন প্রভাব পড়ে থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

যে সব নওমুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাদের কল্যাণে ঐ এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে ২০ জন খৃস্টান মক্কায় এল। তারা হারাম শরীফে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করে। রসূল সা. তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, কোরআন শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তাদের চোখে পানি এসে যায় এবং তারা নির্দ্বিধায় ঈমান আনে। তারা যখন উঠে বেরুলো, তখন মসজিদের বাইরে কোরায়েশরা জটলা পাকাচ্ছিল। আবু জাহল আবিসিনিয়ার প্রতিনিধি দলকে বললো, তোমরা কেমন নির্বোধ! নিজেদের ধর্মকে পরিত্যাগ করলে! প্রতিনিধি দল বললো, 'আপনাদেরকে আমরা ছালাম জানাচ্ছি। আমরা আপনাদের সাথে কোন বিবাদ বিসম্বাদে যেতে চাইনে। আমাদের পথ ভিন্ন এবং আপনাদের পথও ভিন্ন। আমরা একটা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে চাইনে।'

মক্কার কুচক্রীরা প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এই আশংকায় আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের পুরো ঘটনাটা রাতের গভীর অন্ধকারে কঠোর গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করা হয়। মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধি দল যখন বায়য়াত সম্পন্ন করে নিজেদের অবস্থান স্থলে পৌঁছলো, তখন কোরায়েশ নেতারা সেখানে গিয়েই তাদের সাথে সাক্ষাত করলো। কোরায়েশদের গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা এত মজবুত ছিল যে, তারা বায়য়াতের পুরো ঘটনা জানিয়ে তাদেরকে বললো, তোমরা মুহাম্মদ সা. কে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও এবং তার হাতে হাত দিয়ে তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছ। ভালো করে শুনে নাও, তোমরা যদি আমাদের সাথে আরবদের লড়াই বাধিয়ে দাও, তাহলে আমাদের চোখে তোমাদের চেয়ে ঘৃণ্য মানুষ আর কেউ থাকবেনা। আনসারগণ ব্যাপারটা গোপন করার চেষ্টা করলেন। তাই তখনকার মত ব্যাপারটা আর সামনে গড়ালোনা এবং আনসারগণ মদীনায় রওনা হয়ে গেল। কিন্তু কোরায়েশগণ এর পরও গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যায় এবং সমস্ত তথ্য জেনে ফেলে। তারা আনসারী কাফেলার পিছু ধাওয়া করে এবং সা'দ বিন উবাদা ও মুনযির বিন আমরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে। তারা উভয়ে নিজ নিজ গোত্রে ইসলাম প্রচারের অংগীকার করেছিলেন। কোরায়েশগণ তাদের উভয়কে পিঠমোড়া দিয়ে বেধে ভীষণ মারধর করে।

সা'দ বিন উবাদা বর্ণনা করেছেন, আমাদের এই করুণ অবস্থায় কোরায়েশদের এক দীর্ঘাঙ্গী ও সুদর্শন ব্যক্তি এল। আমি মনে মনে বললাম, এই গোত্রটির মধ্যে যদি কোন ভালো লোক থেকে থাকে, তবে সে বোধহয় এই ব্যক্তি এবং এর কাছ থেকে হয়তো কিছুটা সদ্ব্যবহার পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু সে কাছে এসেই আমাকে প্রচন্ড একটা থাপপড় মারলো। এবার আমি বুঝে নিলাম, এদের কাছ থেকে কোন সদ্ব্যবহার আশা করা যায় না। অবশেষে তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কোরায়েশদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যার সাথে তোমাদের কোন পূর্বপরিচয়, সৌহার্দ বা চুক্তি আছে? আমি জুবাইর ইবনে মুতায়াম ও হারেস বিন হারবের নামোল্লেখ করলাম। সে আমাকে ঐ দু'জনের নাম ধরে ধরে ডাকার পরামর্শ দিল। আমি তাই করলাম। তখন তারা উভয়ে এসে আমাদের মুক্ত করলো।

এই ঘটনাগুলো থেকে বুঝা যায়, ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীরা কত সক্রিয় ছিল।

সাহিত্য ও গান বাজনার ফ্রন্ট

নযর বিন হারেস ছিল ইসলাম বিরোধী অভিযানের আর এক হোতা। সে নিজের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঘন ঘন পারস্য যেত। সেখান থেকে সে অনারব রাজা বাদশাদের ঐতিহাসিক সাহিত্যিক কিচ্ছা কাহিনী সংগ্রহ করে আনতো। তারপর মক্কায় কোরআনের বৈপ্লবিক সাহিত্যের মোকাবিলায় অনারব বিশ্ব থেকে আমদানী করা বিনোদন মূলক সাহিত্যের আসর গড়ে তোলত। এসব আসরে সে জনগণকে এ বলে দাওয়াত দিতে থাকে যে, আরে মুহাম্মদের সা. কাছ থেকে আ'দ সামূদের পঁচাবাসি কিচ্ছা শুনে কি করবে, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের দেশের মজার মজার কাহিনী শোনাবো। নযর বিন হারেসকে একটা স্বতন্ত্র মানবীয় চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে কোরআন বলেছে ঃ

'এক শ্রেণীর লোক এমনও আছে যারা বিভ্রান্তিকর চিত্তবিনোদনমূলক কিচ্ছা–কাহিনী কিনে আনে, যাতে করে তা দ্বারা না জেনে বুঝে মানুষকে বিপথগামী করতে পারে এবং তাদেরকে উপহাস করতে পারে।' (সূরা লুকমান, ৬)

এই নযর বিন হারেস একবার এক মজলিসে আবু জাহলের সামনে রসূল সা. এর দাওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নরূপ ভাষণ দিয়েছিলঃ

'হে কোরায়েশ জনমন্ডলী, আজ তোমরা এমন একটা জিনিসের সম্মুখীন, যার মোকাবিলায় ভবিষ্যতে তোমাদের কোন কৌশল সফল হবেনা। মুহাম্মদ সা. এক সময় তোমাদের সবার প্রাণপ্রিয় এক কিশোর ছিল। তোমাদের সবার চাইতে সত্যবাদী এবং সবার চাইতে আমানতদার ও বিশ্বাসী ছিল। পরে যখনই সে প্রৌঢ় বয়সে পদার্পন করলো এবং নিজের দাওয়াত পেশ করলো, অমনি তোমরা বলতে আরম্ভ করলে, সে যাদুকর...... বলতে আরম্ভ করলে, সে জ্যোতিষী, বলতে আরম্ভ করলে সে উন্মাদ।..... আসলে এর কোনটাই ঠিক নয়। হে কোরায়েশ জনমন্ডলী, তোমরা তোমাদের নীতি সম্পর্কে আরো একটু চিন্তাভাবনা কর। কেননা আল্লাহর কসম তোমাদের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উপস্থিত'। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

নযর বিন হারেসের এ ভাষণ থেকে বুঝা যায়, রসূলের সা. দাওয়াতকে সে একটা অসাধারণ ব্যাপার মনে করতো এবং তাঁর চারিত্রিক মাহাত্য সম্পর্কেও সচেতন ছিল। কিন্তু সে নিজের সচেতন বিবেককে পদদলিত করে রসূলের দাওয়াতের বিরোধিতা করার জন্য কুটিল শয়তানী চক্রান্ত আঁটতো। সে ভালো করেই বুঝতো যে, একটা ইতিবাচক ও মহৎ উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনের আন্তরিকতাপূর্ণ আহ্বানের মোকাবিলায় সাধারণ লোকদের জন্য বিনোদনমূলক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অধিকতর আকর্ষণীয় উপাদান থাকতে পারে। এ জন্য সে বিনোদনমূলক ও নান্দনিক সাহিত্যের একটা আসর গড়ে তুলতো। নযর বিন হারেস বলতো, 'আমি মুহাম্মাদের চেয়েও চিত্তাকর্ষক ও মজাদার কিচ্ছাকাহিনী শোনাতে পারি।' এরপর যখন সে বিদেশী কিচ্ছাকাহিনী বলতো, তখন বলতো, মুহাম্মাদের সা. কিচ্ছাকাহিনী আমার কিচ্ছাকাহিনীর চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে ভালো? পক্ষান্তরে কোরআনের কিচ্ছাকাহিনীকে সে পূরাকালের কিচ্ছাকাহিনী বলে ব্যংগ করতো।

শুধু এখানেই শেষ নয়, সে গানবাজনায় পারদর্শিনী একটা দাসীও কিনে এনেছিল। সে লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়াতো এবং খাওয়ার পর ঐ দাসীর গান বাজনা শোনাতো। যে যুবক সম্পর্কেই সে খবর পেতো যে, সে ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তার কাছে সে ঐ গায়িকাকে নিয়ে যেত এবং দাসীকে নির্দেশ দিত, 'এ যুবককে খাইয়ে দাইয়ে ও গান বাজনা শুনিয়ে পরিতৃপ্ত কর।' শিল্প ও সংস্কৃতির এরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করার পর সে সগর্বে বলতো 'মুহাম্মদ সা. যে দাওয়াত দেয়, সেটা বেশী আনন্দদায়ক, না আমি যেটার আয়োজন করছি সেটা বেশী আনন্দদায়ক?' (সীরাতুল মুসতাফা, মাওলানা ইদ্রীস কান্দালভী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৮৮)

প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মূল প্রাণশক্তি হলো আল্লাহর আনুগত্য ও নৈতিকতা। নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতার পরিবেশে ঐ প্রাণশক্তির মৃত্যু ঘটে। যে পরিবেশে খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, বিনোদন, ললিত কলা ও যৌনতার প্রতি সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়, সে পরিবেশ ইসলামী দাওয়াতের উপযোগী হতে পারেনা। এ কারণেই নযর বিন হারেস একদিকে বিনোদনমূলক কিচ্ছাকাহিনী পরিবেশন করা শুরু করে আর অপর দিকে গান বাজনা, নারীপুরুষের সম্মিলন ও অশ্লীলতার সমাবেশ ঘটায়।

কিন্তু একটা গঠনমূলক দাওয়াত ও সদুদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনের প্রতিরোধে বিনোদনমুলক সাহিত্য সফল হয়না এবং ললিত কলা তথা গানবাজনা ইত্যাদিও কোন কাজে লাগেনা। দু'চার দিন একটু হৈ চৈ হলো। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

নযব বিন হারেসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সে কোরায়েশ নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে মদীনায় ইহুদী ধর্মযাজকদের কাছে গেল। তাদের কাছে সে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা তো জ্ঞানীগুণী মানুষ, আর আমরা অশিক্ষিত মুর্খ, ইসলামী আন্দোলনকে আমরা কিভাবে ঠেকাই এবং কিভাবে মুহাম্মাদ সা. কে প্রতিরোধ করি, তা বলে দাও। ইহুদী আলেমরা তাদেরকে শেখালো যে, তোমরা মুহাম্মাদের সা. কাছে যুলকারনাইন ও আসহাবে কাহফের ঘটনা জিজ্ঞেস কর এবং আত্মা কী জিনিস, জানতে চাও। তারা ঐ তিনটে প্রশ্ন যথা সময়ে রসূলের সা. কাছে তুললো এবং ওহীর সাহায্যে তিনি তার সন্তোষজনক জবাবও দিলেন। কিন্তু কাফেরদের হঠকারিতার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব? (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আপোষের চেষ্টা

গোপনীয়তার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার পর যখন ইসলামী আন্দোলন দ্রুতগতিতে ছড়াতে লাগলো এবং পরবর্তীতে যখন অপপ্রচার ও হিংস্রতার বিভিন্ন আয়োজন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে গেল, তখন বিরোধীরা অনুভব করতে আরম্ভ করলো যে, ইসলামী আন্দোলন একটা অজেয় শক্তি এবং তা অচিরেই দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে ছাড়বে। তাই আপোষ মীমাংসা ও সমঝোতার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এবং দু'পক্ষের মাঝে লেনদেনের ভিত্তিতে এ দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটানো যায় কিনা, সে জন্য পুণরায় উদ্যোগ আয়োজন ও চেষ্টা তৎপরতা শুরু হলো। কিন্তু আদর্শবাদী আন্দোলনে এত বেশী শৈথিল্যের অবকাশ থাকেইনা যে, লেনদেন ও গোজামিলের মাধ্যমে একটা মধ্যবর্তী পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবুও কোরায়েশ নেতারা এ কৌশলটাও সর্বতোভাবে পরীক্ষা

করে দেখলো যে, হয়তোবা কোন দিক দিয়ে কিছুটা সুযোগ সুবিধা আদায় করা যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, তাদের একটা আপোষ প্রস্তাব এই ছিল যে, রসূল সা. তাদের দেবদেবী ও দেবমূর্তিগুলোর নিন্দা সমলোচনা করবেন না এবং তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবেননা। এছাড়া আর যত ইচ্ছা ওয়ায নছিহত ও নৈতিক উপদেশ দিতে চান, দেবেন, তাতে কোন আপত্তি করা হবে না। অর্থাৎ তিনি তাঁর মূল দাওয়াতী কলেমা থেকে বাতিলকে প্রত্যাখ্যানজনিত বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর নাম নেয়ার অবকাশ থাকবে, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) এ কথা বলা যাবে না। যে বাতিল ধ্যানধারণার ওপর প্রচলিত সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সমাজে খারাপ পরিবেশ ও খারাপ উপাদান যেটুকু যেভাবে আছে, তাকে ঐভাবেই বহাল থাকতে দিতে হবে। সত্য ও ন্যায়কে এমন আকারে পেশ করতে হবে, যেন তা বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত না করে এবং তা থেকে বৈপ্লবিক প্রেরণা নির্মূল করে দিতে হবে। ইসলামের রাজনৈতিক সংলাপ নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে। সমাজ ব্যবস্থাকে যথারীতি বহাল রেখে তার অধীনে আধ্যাত্মিক ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজ করে যেতে হবে। ভাবখানা যেন এই, কোরায়েশদের শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার ও নেতৃত্ব, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কৌলিন্য, কায়েমী স্বার্থ এবং অর্জিত পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা সবই বহাল রাখতে হবে। এরপর তুমি যা কিছু করতে চাও কর। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন যদি এ শর্ত মেনে নিত, তবে তা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যেত।

তাদের পক্ষ থেকে এই শর্তও আরোপ করা হয় যে, এই কোরআন বাদ দিয়ে তদস্থলে অন্য কোন কোরআন আনতে হবে অথবা তাতে এমন রদবদল করতে হবে, যাতে আমাদের দাবী দাওয়াও পূর্ণ হয়। ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ

'এই কোরআন' বাদ দিয়ে অন্য কোরআন নিয়ে এস, অথবা এতে রদবদল ঘটাও।'[১৪]

এর যে জবাব ওহীর ভাষায় রসূল সা. এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়, তা হলো: 'আমি নিজের খেয়াল খুশী মোতাবেক এ কোরআনকে বদলে ফেলবো, এ অধিকার আমার নেই। আমার কাছে যে ওহী আসে, তা ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ আমি করতে পারিনা। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তাহলে আমাকে কেয়ামতের ভয়াবহ দিনের আযাব ভোগ করতে হতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে?'

আপোষ মীমাংসার পথ বের করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ দাবীও করা হয় যে, তুমি তোমার আশপাশ থেকে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলোকে বের করে দাও। যারা কাল পর্যন্ত আমাদেরই গোলাম ছিল, তাদেরকে যদি বের করে

---

১৪. সূরা ইউনুস : ১৫।

দাও, তাহলে আমরা তোমার কাছে এসে বসতে পারি, তোমার উপদেশ শুনতে পারি। নচেত বর্তমান অবস্থায় আমরা তোমার কাছে আসতে পারিনা এবং তোমার কথাবার্তা শুনতে পারিনা। নিম্ন স্তরের লোকেরা আমাদের পথ বন্ধ করে রেখেছে। অথচ তোমার ওখানে তারাই বড় বড় নেতা হয়ে জেঁকে বসে আছে। এই লোকদের সম্পর্কেই তারা বিদ্রূপ করে বলতো, এরাই নাকি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। মোশরেকদের মন যে ইসলামী আন্দোলনের খিদমতের জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিল, তা নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যে সব তাজা প্রাণ তরুণ সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা তুলে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিল, যারা নিজেদের যাবতীয় স্বার্থ কুরবানী করে সব রকমের বিপদমুসিবত হাসিমুখে বরণ করে নিচ্ছিল এবং যাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস এই পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের কাজে নিবেদিত ছিল, তাদের উৎসাহ যেন ভেংগে যায় এবং ইসলামী আন্দোলন যেন তাদের একনিষ্ঠ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

রসূল সা. এর মনে এই প্রতারণাপূর্ণ আপোষ প্রস্তাবের কোন প্রভাব পড়ার আগেই কোরআন তাঁকে সতর্ক করে দেয় যে, এটা ইসলামের শত্রুদের একটা চিরাচরিত ধাপ্পাবাজী। পূর্ববর্তী সকল নবীর সাথে এই ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। সূরা হুদের ২৭নং আয়াতের বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ আ. এর কাছেও অবিকল এই ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সূরা আনয়ামের ৫২ নং আয়াতে রসূল সা. কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তুমি ইসলামের শত্রুদেরকে খুশী করার জন্য সকাল বিকাল আল্লাহর নাম জপকারী একনিষ্ঠ সাথীদের নিজের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিও না। সূরা শুয়ারার ২১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমার এই সব নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরকে স্নেহের সাথে লালন করতে থাক। এমনকি সূরা আবাসার প্রথম দশ আয়াতে রসূল সা. কে শুধু এজন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন প্রভাবশালী কাফেরের সাথে কথা বলার সময় নিজের একজন অন্ধ সাহাবীর প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করেছিলেন।

একবার কট্টরপন্থী কোরায়েশ নেতৃবৃন্দের বৈঠকে এ প্রসংগে চিন্তাভাবনা হচ্ছিল। সে সময় অপর প্রান্তে রসূল সা. একাকী বসেছিলেন। উত্বা ইবনে রবীয়া বৈঠকে উপস্থিত কোরায়েশ নেতৃবৃন্দকে বললো, 'তোমরা যদি সম্মতি দাও তবে আমি মুহাম্মাদের সাথে গিয়ে কথাবার্তা বলি। আমি তার কাছে কয়েকটা বিকল্প ফর্মুলা তুলে ধরবো, যার মধ্য থেকে কোন একটা হয়তো সে গ্রহণ করবে। আমরা সেটা মেনে নিলে সে হয়তো আমাদের সাথে আর দ্বন্দ্ব-সংঘাত করতে চাইবেনা।' এটা স্পষ্টতই একটা আপোষের উদ্যোগ ছিল। কোরোয়েশদের এ পর্যায়ে আসা সম্ভবত হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলামী আন্দোলনের দ্রুত বিস্তৃতির কারণেই সম্ভব হয়েছিল। উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে উতবা গিয়ে রসূল সা. এর সাথে নিম্নরূপ কথা বলে ঃ

'হে ভাতিজা, আমরা তোমাকে কতখানি মর্যাদা দিয়ে থাকি, তা তো তুমি জানই। সমগ্র গোত্রের মধ্যে তুমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বংশগতভাবেও তুমি বিশিষ্টতার দাবীদার।' এভাবে কিছুটা তোষামুদীতে পরিপূর্ণ কিন্তু বাস্তব ভূমিকা দেয়ার পর উতবা একটু অনুযোগের সুরে বললো ঃ 'তুমি জাতিকে খুবই উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। তাদের ঐক্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছ। তাদের নেতৃবৃন্দকে বেকুফ ও নির্বোধ বলে আখ্যায়িত

করেছ। তাদের ধর্মের ও তাদের দেবদেবীদের খুঁত ধরেছ। তাদের অতীত পূর্ব পুরুষদের বিধর্মী আখ্যায়িত করেছ। এবার আমার কথা শোন। আর আমি যে কয়টা প্রস্তাব দিচ্ছি, তা নিয়ে তুমি চিন্তাভাবনা কর। হয়তো তার কোন একটা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। রসূল সা. বললেন, ঠিক আছে। আপনি বলুন। আমি শুনবো। উতবা নিম্নোক্ত বিকল্প প্রস্তাবগুলো একে একে তুলে ধরলো ঃ

'তোমার উদ্দেশ্য যদি ধনসম্পদ অর্জন করা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত ধনসম্পদ সংগ্রহ করে দেব, যাতে তুমি আমাদের সবার চেয়ে ধনবান হয়ে যাবে।'

আর যদি তুমি এর দ্বারা নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হাতে পেতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা ও সরদার নিযুক্ত করতে প্রস্তুত আছি। আমরা কোন ব্যাপারেই তোমার মতামত না নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবনা।

তুমি যদি দেশের রাজা হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানাতেও প্রস্তুত।

আর যদি এর কারণ এই হয়ে থাকে যে, তোমার ওপর কোন জ্বিন ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে এবং সেই সব অশরীরী জীব তোমার ওপর প্রবল হয়ে পড়েছে, তাহলে আমরা চাঁদা তুলে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। এরপর তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে তো ভালো কথা, নচেত আমাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হবে।'

এই আপোষমূলক প্রস্তাবগুলোতে বিভিন্ন রকমের মনোভাব ও ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীরা সাধারণত এ সব ধ্যানধারণা পোষণ করতো। এই প্রস্তাবগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাদের দৃষ্টিতে দুটো সম্ভাবনাই ছিল। প্রথমত রসূল সা. হয়তো জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার সাথে এত বড় সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার উদ্যোগ সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে নিচ্ছেন না, বরং কোন ভূত প্রেতের প্রভাবে কিংবা অচেতন অবস্থায় নিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত যদি তিনি সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় এ সব উদ্যোগ নিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই রাজত্ব বা ক্ষমতা লাভই তার উদ্দেশ্য। যাহোক, সব ক'টা প্রস্তাব শোনার পর রসূল সা. বললেন, 'ওহে ওলীদের বাবা, আপনার কথা শেষ হয়েছে?' সে বললো, হাঁ। রসূল সা. বললেন, এবার আমার বক্তব্য শুনুন। উতবা বললো, 'আচ্ছা বল, শুনি।' রসূল সা. সবক'টা প্রস্তাব একদিকে রেখে সূরা হা-মীম সিজদার শুরু থেকে পড়তে শুরু করলেনঃ

'হা-মীম। এ হচ্ছে পরম দয়ালু ও করুণাময়ের প্রেরিত বাণী। এ হচ্ছে একটা সুলিখিত গ্রন্থ, যার প্রতিটি আয়াত সুস্পষ্ট। এ হচ্ছে আরবী ভাষায় রচিত কোরআন - বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। এ গ্রন্থ বিশ্বাসীদের সুসংবাদদাতা এবং অবিশ্বাসীদের দুসংবাদদাতা। কিন্তু ওদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা কর্ণপাতই করেনা। তারা বলে যে, আমাদের মন এ সব তত্ত্বের বিরোধী, যার দিকে তুমি আমাদের ডাকছ। আর আমাদের কানে রয়েছে ভারী ঢাকনা এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে একটা আড়াল। সুতরাং তুমি নিজের কাজ করে যাও, আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো।' (আয়াত ১-৫)

রসূল সা. যতক্ষণ শোনাতে লাগলেন, ততক্ষণ উতবা দু'হাত পেছনে নিয়ে তার ওপর হেলান দিয়ে নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। সিজদার আয়াত এলে তিনি পড়া

বন্ধ করে সিজদা করলেন। তারপর বললেন, 'ওলীদের বাবা, শুনলেন তো। এখন যা ভালো বোঝেন করুন।'

এরপর উতবা উঠলো এবং তার সংগীদের কাছে চলে গেল। তারা উতবার চেহারা দেখেই বললো, উতবার চেহারা বদলে গেছে। যাওয়ার সময় ওর চেহারা যেমন ছিল, এখন তেমন নেই। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তারা জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কি?'

উতবা বললোঃ

'ব্যাপার হলো, আমি এমন বাণী শুনে এলাম, যা জীবনে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, ওটা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীর কথাও নয়। হে কোরেশ জনমণ্ডলী, আমার কথা শোন। আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি, মুহাম্মদকে তার বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং তার পেছনে লেগনা। আল্লাহর কসম, আমি যে বাণী শুনেছি, তা দ্বারা নিশ্চয়ই বড় রকমের ফল ফলবে। আরবরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করে, তাহলে অন্যদের দ্বারা তোমরা ওর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি সে আরবের রাজা হয়ে যায়, তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার শক্তি তোমাদেরই শক্তি হবে। তখন তারই কল্যাণে তোমরা সবচেয়ে সৌভাগ্যশীল জাতিতে পরিণত হবে।' (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩-৩১৪)

উতবার এই বক্তব্য থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। প্রথমত, সেকালের আরবের বড় বড় বাগ্মী ও কবি সাহিত্যিকগণ কোরআনের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও চমৎকারীত্বের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হতো। দ্বিতীয়ত যতক্ষণ বিরোধীরা ইসলামের মূল দাওয়াতকে সরাসরি দাওয়াতদাতার মুখ থেকে না শুনতো, ততক্ষণই তারা নানা রকমের বিষাক্ত অপপ্রচারে প্রভাবিত হতো এবং বিরোধিতার ওপর অবিচল থাকতো। কিন্তু যখনই কেউ আসল দাওয়াতের কিছু অংশ সরাসরিভাবে শোনার সুযোগ পেয়েছে, অমনি তার মন তাকে গ্রহণ করেছে। তৃতীয়ত ওহীর বাণী সম্পর্কে মোশরেক সমাজের প্রত্যেক মেধাবী মানুষের ধারণা এই ছিল যে, এই বাণীর ভিত্তিতে বড় রকমের কোন বিপ্লব সংঘটিত হবেই। তারা এর অন্তরালে একটা পূর্ণাংগ বিপ্লবের দৃশ্য দেখতে পেত এবং অনুমান করতো যে, এই কলেমার ভিত্তিতে একটা সাম্রাজ্য এবং একটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবেই।

কিন্তু উতবার কথা শুনে কোরায়েশদের মজলিসে ঠাট্টাবিদ্রূপ শুরু হয়ে গেল এবং অনেকেই বললো, 'ওলীদের বাবা, মুহাম্মাদ তো আপনাকেও যাদু করে দিয়েছে দেখছি।

উতবা বললো, 'ওর সম্পর্কে আমার যা অভিমত, তাতো বললামই। এখন তোমরা যা ভালো মনে কর, কর।'

এর কিছুদিন পর এ ব্যাপারে আরো একটা চেষ্টা করা হলো। একদিন সূর্যাস্তের পর কোরায়েশদের সকল বড় বড় সরদার কা'বা শরীফের চত্তরে জমায়েত হলো। উতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, আবু সুফিয়ান বিন হারব, নযর বিন হারিস, কানদা, আবুল বুখতারী, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, যাময়া বিন আসওয়াদ, ওলীদ বিন মুগীরা, আবু জাহল বিন হিশাম, আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া, আ'শ বিন ওয়ায়েল, নবীহ ও মুনাবিবহ বিন হুজ্জাজ, (বনুসাহম) এবং উমাইয়া বিন খালফ এরা সবাই এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা

রসূল সা. কে ডেকে পাঠালো। রসূল সা. একটা নতুন আশায় বুক বেঁধে তাদের কাছে এলেন। কিন্তু তারা নতুন কিছু বললোনা। ইতিপূর্বে উতবা ইবনে রবীয়ার মাধ্যমে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করলো। শুনে রসূল সা. নিম্নরূপ জবাব দিলেন ঃ

'তোমরা যা বলছ, আমার ব্যাপারটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি যে দাওয়াত তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি, তার উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন, নেতৃত্ব ও সরদারী লাভ কিংবা রাজত্ব কায়েম করা নয়। আমাকে তো আল্লাহ তোমাদের কাছে নবী ও রসূল করে পাঠিয়েছেন। তিনি আমার কাছে কিতাব নাযিল করেছেন এবং আমাকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হবার আদেশ দিয়েছেন। সে অনুসারে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের হিতাকাংখীর দায়িত্ব পালন করেছি। আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি, তা যদি তোমরা গ্রহণ কর, তাহলে সেটা তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যের পরিচয় দেব, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে নিজের ফায়সালা জারী করেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫)

এ জবাব শুনে তারা যখন দেখলো সামনে অগ্রসর হবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নানা রকমের কুটতর্ক শুরু করলো। উদাহরণ স্বরূপ, তারা বললো ঃ তুমি তো জান, আমাদের দেশটা বড়ই সংকীর্ণ। এখানে পানি খুব কম এবং জীবন যাপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তুমি আল্লাহকে বল তিনি যেন ঐ পাহাড়গুলো সরিয়ে দেন, আমাদের ভূখণ্ডকে প্রশস্ত করে দেন এবং এর ওপর ইরাক ও সিরিয়ার মত নদনদী সৃষ্টি করেন। তাঁকে বল, তিনি যেন আমাদের বাপদাদাদের জীবিত করে দেন, বিশেষত কুসাই বিন কিলাবকে যেন অবশ্যই জীবিত করেন। কেননা তিনি খুব সত্যবাদী ছিলেন এবং তাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো তোমার দাওয়াত সত্য না মিথ্যা। এভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষরা যদি একে একে জীবিত হয়ে তোমার দাওয়াতকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয় এবং আমরা যা যা দাবী করছি, তা তুমি করে দেখাও, তাহলে আমরা মেনে নেব যে, তুমি আল্লাহর রসূল। আর যদি তা না কর, তাহলে আমাদের ওপর তুমি আযাবই নামিয়ে আনো।' রসূল সা. এই সব অসম্ভব দাবী-দাওয়ার জবাবে এই কথাই বারংবার বলেছেন যে, 'আমি এ সবের জন্য প্রেরিত হইনি।'

অবশেষে রসূল সা. যখন বাড়ীর দিকে ফিরে চললেন, তখন তাঁর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও তাঁর সাথে সাথে চললো। সে বললো, 'তোমার গোত্রের লোকেরা তোমাকে কতকগুলো সুযোগ সুবিধা দিতে চাইল। কিন্তু তুমি তার একটাও গ্রহণ করলেনা। এখন তো আল্লাহর কসম, আমি তোমার উপর আর ঈমান আনছিনে, এমনকি তোমাকে আকাশের ওপর সিঁড়ি লাগিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে দেখলেও নয়। আবার তোমাকে যদি আকাশ থেকে নেমে আসতে স্বচোক্ষে দেখি এবং তোমার সাথে চার চারজন ফেরেশতা এসেও যদি তোমার সত্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবুও নয়। আল্লাহর কসম, আমি যদি ঈমান আনিও, তবু আমার আদৌ মনে হয়না যে, আমি সত্যিই তোমার সমর্থকে পরিণত হয়ে যাবো। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

এরপর রসূল সা. খুবই মর্মাহত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেন।

এ ধরনের আরো একটা ঘটনা ঘটে তায়েফ সফরের পর। রসূল সা. এই সময় মক্কা থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী বনুকান্দা, বনু হানিফা ও অন্যান্য গোত্রে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ শুরু করেন। বনু আমের গোত্রে যখন দাওয়াত দিতে গেলেন, তখন ঐ গোত্রের সরদার বুখায়রা বিন ফিরাসের সাথে দেখা করলেন। বুখায়রা রসূল সা. এর দাওয়াত শুনলেন। তারপর নিজের সমর্থকদেরকে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, কোরায়েশ গোত্রের এই যুবককে আমি যদি পেতাম, তাহলে আমি তার মাধ্যমে গোটা আরব জয় করে ফেলতাম।' তারপর সে রসূল সা. কে জিজ্ঞেস করলো, আমরা যদি এই দাওয়াত গ্রহণ করি, এবং তুমি যদি তোমার বিরোধীদের ওপর জয়যুক্ত হও, তাহলে তোমার পরে ইসলামের যাবতীয় কর্তৃত্ব কি আমার হাতে চলে আসবে?

ভেবে দেখার বিষয় হলো, প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত দাওয়াত পাওয়া মাত্রই ঐ ব্যক্তির মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, এ দাওয়াত এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী দাওয়াত। এর বিজয়ী হবার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং বিজয়ী হলে তা তাদের স্বার্থোদ্ধারেরও সহায়ক হবে। এ সব ধারণার কারণেই বুখায়রার মনে ব্যবসায়ী সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু রসূল সা. তো শ্রেফ দাওয়াতদাতা ছিলেন। তিনিতো আর রাজনৈতিক ব্যবসায় খুলে বসেননি। তাই তিনি জবাব দিলেন ঃ

'এটাতো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমার পরে তিনি যাকে চাইবেন নিযুক্ত করবেন'।

বুখায়রা বললো ঃ

'বেশ তো! আজ আমরা সমগ্র আরববাসীর সাথে লড়াই করবো। তারপর যেই তোমার স্বার্থ উদ্ধার হয়ে যাবে, তখন অন্যেরা সুযোগ সুবিধে বাগিয়ে নেবে। তুমি যাও। আমাদের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই।' (রহমাতুল্লিল আলামীন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ-৮৯)

রসূল সা. যদি কোন অরাজনৈতিক বক্তা হতেন অথবা সুফীবাদী বা পীরীমুরিদী কায়দায় সমাজের নৈতিক পরিশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে সিদেসাধাভাবে জবাব দিতেন যে, 'আরে মিয়া, তুমি এ সব কিসের স্বপ্ন দেখছ? এতো আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্কারমূলক কাজ। এতে স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? কিভাবেই বা কথা ওঠে স্থলাভিষিক্ত হবার বা নেতৃত্ব ও সরদারী লাভের? রসূল সা. নিজেও যেমন জানতেন তাঁর আন্দোলন কত সুদূর প্রসারী এবং তাঁর রাজনৈতিক সম্ভাবনাই বা কতখানি। তেমনি যার সাথে তিনি কথা বলতেন সেও টের পেয়ে যেত এ দাওয়াতের শেষ গন্তব্য কোথায়।

এই সব রকমারি আপোষ-প্রচেষ্টা থেকে বিরোধী শক্তি যে সুবিধেটা বাগাতে চেয়েছিল তা হলো, রসূল সা. যদি আন্দোলনে নিরাপদে অগ্রসর হওয়ার পথ বের করা বা নির্যাতন থেকে সংগীদেরকে বাঁচানোর জন্য আপোষ করতে রাজী হয়ে যান, তাহলে আদর্শবাদী আন্দোলন হিসেবে তাঁর দাওয়াতের শক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তিনি আপোষহীনতার পরিচয় দেন, তাহলে প্রচারণা চালানো যাবে যে, দেশবসী দেখে নাও, আমরা দ্বন্দ্ব কলহ মেটানোর জন্য কত সুযোগ সুবিধা দিতে চাইলাম এবং কত উপায় বের করলাম, কিন্তু এই ব্যক্তি এমন হঠকারী যে, কোন সমাধানকেই সে গ্রহণ করলো না। বাস্তবিকই রসূল সা. এর অবস্থানটা ছিল খুবই স্পর্শকাতর। তাই কোরআন এই সব আপোষ ফর্মূলার মোকাবিলায়

রসূল সা.কে দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য ক্রমাগত সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে থাকে। এমনকি এক জায়গায় তো অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিরোধীদের এই ধোকা থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষণের আশ্বাসও দেয়া হয়। সূরা বানী ইসরাঈলের ৭৪ ও ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

'আমি যদি তোমাকে দৃঢ়তা দান না করতাম, তাহলে বিচিত্র নয় যে, তুমি তাদের প্রতি খানিকটা নমনীয় হয়ে যেতে। তা যদি হতে, তাহলে আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে দ্বিগুণ শাস্তির মজা ভোগ করিয়ে দিতাম। তখন তুমি আমার মোকাবিলায় কাউকে সাহায্যকারী পেতেনা।'

মোটকথা, অত্যধিক বিচক্ষণতা, কুশলতা ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতা দ্বারা রসূল সা. আন্দোলনকে এসব সওদাবাজী থেকে রক্ষা করেছেন।

সহিংসতার চরম রূপ

ইসলামের শত্রুরা চিরকালই উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অসৎ এবং যুক্তির দিক দিয়ে অসার ও দেউলে হয়ে থাকে। তাদের আসল সমস্যা হয়ে থাকে স্বার্থপরতা ও গদির নেশা। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কেউ ময়দানে নামলেই তারা সর্বশক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং যুক্তি-প্রমাণের জবাব দেয় সহিংসতা সন্ত্রাস ও গুণ্ডামী দিয়ে। ইসলামী আন্দোলন মানবীয় বিবেক বুদ্ধিও চিন্তাশক্তির বলে কাজ করে। কিন্তু ইসলাম বিরোধীরা ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আবেগ উত্তেজনা দিয়ে এর গতি রোধে সচেষ্ট হয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য কোন শক্তি যদি সামান্যতম তৎপরতাও চালায়, তবে তাকে সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহকদের হাতে মার খেতে হয়। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত যে সুদূর প্রসারী ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের আহবান জানায়, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধাররা এক ধরনের তীব্র উন্মত্ততায় ভোগে। মক্কায় এই অবস্থাটাই দেখা দিয়েছিল। যদিও প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনার সাথে সাথেই সহিংসতাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে জাহেলিয়াতের হিংস্রতা ও মুসলিম নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই মক্কা ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য একটা জ্বলন্ত চুলোয় পরিণত হলো। হযরত খাদীজা ও জনাব আবু তালেবের ইন্তিকালের পর এই চুলোর দহনশক্তি আরো তীব্র ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। কম হোক, বেশী হোক, এই চুলোয় দগ্ধ হওয়া থেকে কেউ রেহাই পায়নি। এই চুলোয় দগ্ধ হয়ে তপ্ত হয়ে ও গলে গলে তাঁরা খাঁটি সোনায় পরিণত হন। এই চুলোর আঁচের সবচেয়ে বড় অংশ আন্দোলনের নেতা যদিও মুহাম্মদ সা. নিজেই ভোগ করেন, কিন্তু তাঁর সহচররাও কম ভোগ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত এই ভয়ংকর নির্যাতনের কথা ইতিহাস থেকে আমরা খুব কমই জানতে পারি। তথাপি ইতিহাস থেকে যেটুকু জানা যায়, তাও লোমহর্ষক। এখানে আমি ইসলামের দুশমনদের পরিচালিত এই নির্যাতনের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

সরাসরি রসূল সা. এর ওপর তো প্রতি মুহূর্তেই রকমারি যুলুম চালানো হতো। কিন্তু তাঁর সহচরবৃন্দকে যে যন্ত্রণা দেয়া হতো, তাও পরোক্ষভাবে রসূল সা. এর সংবেদনশীল মনকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিত। এবার লক্ষ্য করুন কার ওপর কেমন নির্যাতন চলেছে।

খাব্বাব ইবনুল আরত তামীমীকে জাহেলিয়তের যুগে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। উম্মে নুমার নাম্নী এক মহিলা তাকে খরিদ করে নেয়। হযরত আরকামের বাড়ী যখন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল এবং সেখান থেকেই রসূল সা. সমস্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন, তখনই হযরত খাব্বাব ইসলাম গ্রহণ করেন। কোরায়েশরা জ্বলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে তাকে সেই আগুনের বিছানায় শুইয়ে দিত। সংগে সংগে বুকের ওপর একজন মানুষও দাঁড়িয়ে যেত, যাতে খাব্বার পাশ ফিরে শুতে না পারে। শেষ পর্যন্ত পিঠের নীচেই অংগারগুলো নিভে যেত। পরবর্তীকালে খাব্বাব রা. হযরত ওমর রা. কে একবার নিজের পিঠ দেখালে তিনি কুষ্ঠের ন্যায় সাদা সাদা দাগ দেখতে পান। পেশায় তিনি একজন কামার ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যখন বিভিন্ন লোকের কাছে নিজের পাওনা চান, তখন তারা জবাব দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সা. এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে, ততক্ষণ এক পয়সাও পাবেনা। এভাবে তার ওপর অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছিল। কিন্তু এই সত্যের সৈনিক জবাব দিলেন, এটা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

কৃষ্ণাংগ হযরত বিলাল ছিলেন উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস। সূর্য ঠিক মাথার ওপর এলে আরবের উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর ওপর তাকে শুইয়ে দেয়া হতো এবং বুকের ওপর ভারী পাথর দিয়ে রাখা হতো, যাতে তিনি পাশ ফিরে শুতে না পারেন। উমাইয়া তাকে বলতো, ইসলাম থেকে ফিরে আস, নচেত এভাবেই খতম হয়ে যাবে। হযরত বিলাল রা. এর জবাবে চিৎকার করে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলতেন। এতে উমাইয়ার রাগ আরো বেড়ে যেত। সে তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে শহরের উচ্ছৃংখল ছেলেদেরকে তার পেছনে লেলিয়ে দিত। তারা তাকে গলিতে গলিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো। কিন্তু এই নিবেদিত প্রাণ আল্লাহ প্রেমিক সেই অবস্থায়ও উচ্চস্বরে 'আহাদ আহাদ' ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন। কখনো তাকে গরুর চামড়ায় জড়িয়ে আবার কখনো লোহার বর্ম পরিয়ে প্রখর রৌদ্রে বসিয়ে দেয়া হতো। হযরত আবু বকর রা. অন্য একটা ক্রীতদাসের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন।

আম্মার বিন ইয়াসার ছিলেন কাহতান বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা ইয়াসার ইয়ামান থেকে নিজের দু' ভাইকে সাথে নিয়ে হেজাজ এসেছিলেন তাদের অপর এক হারানো ভাইকে খুঁজতে। দু'ভাই পরে ইয়ামানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াসার আবু হুযাইফা মাখযুমীর সাথে মৈত্রী স্থাপন পূর্বক মক্কায়ই থেকে যান এবং এখানেই বিয়ে করেন। ইয়াসার সহ তার প্রায় পুরো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। মক্কায় আম্মার বিন ইয়াসারের কোন স্বপক্ষীয় না থাকায় তার ওপর ভীষণ অত্যাচার চালানো হতো। ইসলাম গ্রহণের শাস্তি স্বরূপ তাকেও তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে দেয়া হতো। কোরায়েশরা তাকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলতো। তার পিতামাতার উপরও একই রকম শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো। তাকে পানিতে ডুবানো হতো। জ্বলন্ত অংগারের ওপরও শোয়ানো হতো। রসূল সা. তাঁর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দোয়া করতেন এবং বেহেশতের সুসংবাদ শোনাতেন। হযরত আলীর রা. বর্ণনা মোতাবেক রসূল সা. বলতেন, আম্মারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ। হযরত আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া রা. কে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হত্যা করা হয়।

আবু জাহল স্বয়ং বর্শার আঘাতে অত্যন্ত পাশবিক পন্থায় তাকে হত্যা করে। ইসলামে এটাই প্রথম শাহাদাতের ঘটনা। হযরত আম্মারের বাবা হযরত ইয়াসারও নির্যাতনের চোটে শহীদ হয়ে যান।

সুহায়েবও আম্মারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাকে এত নির্মমভাবে প্রহার করা হতো যে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন। হিজরতের সময় কোরোয়েশরা তার সমস্ত সহায় সম্বল তাদেরকে দিয়ে যেতে হবে এই শর্তে তাঁকে হিজরত করা অনুমতি দেয়। সুহায়েব রা. এ শর্ত সানন্দে মেনে নেন এবং খালি হাতে মদীনায় চলে যান।

আবু ফুকইহা সুহালী ছিলেন সাফওয়ান বিন উমাইয়ার ক্রীতদাস। তিনি ইসলাম গ্রহণে হযরত বিলালের সমসাময়িক ছিলেন। একবার তার বুকের ওপর এত ভারী পাথর চাপা দেয়া হয় যে, তার জিভ বেরিয়ে পড়ে। কখনো তাকে লোহার বেড়ি পরিয়ে তপ্ত বালুর ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেয়া হতো। হযরত আবু বকর রা. তাকেও কিনে স্বাধীন করে দেন।

হযরত ওমরের রা. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর পরিবারে লুবাইনা নাম্নী এক দাসী ছিল। ওমর রা. তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তারপর বলতেন, তোকে দয়া করে নয়, বরং ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

হযরত ওমরের পরিবারের আর এক দাসী ছিল যুনাইরা। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাকেও হযরত ওমর রা. অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রহার করতেন। আবু জাহল একবার তাকে পেটাতে পেটাতে চোখ নষ্ট করে দেয়। তবে একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঈমানের বরকতে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক তাকেও কিনে স্বাধীন করে দেন।

নাহদিয়া ও উম্মে উবাইস নামক দুটো দাসীও ইসলাম গ্রহণের কারণে কঠোর নির্যাতন সহ্য করে।

হযরত ওসমান বয়সের দিক দিয়েও সম্মানার্হ ছিলেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তবুও তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর আপন চাচা তাঁকে রশী দিয়ে বেঁধে মারে।

হযরত আবু যর ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই কা'বা শরীফে এসে ঘোষণা দেন। সংগে সংগে কোরায়েশ সন্ত্রাসীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারতে মারতে ধরাশায়ী করে দেয়।

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে তাঁর চাচা ইসলাম গ্রহণের শাস্তি স্বরূপ চাটাইতে জড়িয়ে নাকে ধূঁয়া দিত। কিন্তু তিনি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলতেন, 'কোন অবস্থায়ই আমি কুফরির দিকে ফিরে আসবো না।'

আপন চাচাতো ভাই সাঈদ বিন যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত ওমর রা. তাকে রশী দিয়ে বেঁধে রাখেন।

সাইদ বিন ওয়াক্কাসও অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম কা'বা শরীফের চত্তরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করেন। সূরা রহমান তেলাওয়াত শুরু করতেই কাফেররা

তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখের ওপর উপর্যুপরি ঘুষি মারতে থাকে। কিন্তু তার পরও তিনি তেলাওয়াত অব্যাহত রাখেন এবং আহত মুখমণ্ডল নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন।

উসমান ইবনে মাযউন প্রথমত ওলীদ বিন মুগীরার আশ্রয়ে থাকার কারণে নিরাপদে ছিলেন। কিন্তু রসূলের সা. সাহাবীদের ওপর ভয়ংকর যুলুম নির্যাতন হতে দেখে তিনি অনুভব করেন যে, আমার সাথীরা যখন এত নির্যাতন ভোগ করছে, তখন আমি একজন মোশরেকের আশ্রয়ে থেকে নিরাপদ জীবন যাপন করবো কেন? তিনি ওলীদ বিন মুগীরাকে বললেন, আমি আপনার আশ্রয় ফিরিয়ে দিচ্ছি। ওলীদ তাকে বুঝালো যে, 'ভাতিজা, আমার আশংকা হয়, কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে।' তিনি বললেন, 'না, আমি তো আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবো। তাঁর ছাড়া আর কারো আশ্রয় আমার পছন্দ নয়।' কা'বা শরীফে গিয়ে তিনি ওলীদ বিন মুগীরার আশ্রয় ফেরত দেয়ার ঘোষণা দিলেন। তারপর কোরায়েশদের মজলিসে গিয়ে বসলেন। সেখানে কবি লবীদ স্বরচিত কবিতা পড়ছিল। সে যখন পড়লোঃ "আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল" তখন উসমান বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু লবীদ যখন এর পরবর্তী চরণ পড়লো, "সমস্ত নিয়ামত ধ্বংসশীল" তখন উসমান বললেন, এ কথাটা তুমি ভুল বলেছ। বেহেশতের নিয়ামমত কখনো ধ্বংস হবে না।' লবীদের মাথায় খুন চড়ে গেল। সে চারদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলো, কে তার ভুল ধরার ধৃষ্টতা দেখালো। লবীদ বললো, 'ওহে কোরায়েশ জনমন্ডলী, তোমাদের সহযোগী কবির সাথে এমন বেআদবী কে করলো? একজনে বললো ঃ 'এ হচ্ছে ধর্মচ্যুত জনৈক বেকুফ। ওর কথা গায় মাখিও না।' উসমান চুপ থাকতে পারলো না। তিনি তার কথার যুৎসই জবাব দিলেন। এতে ঐ লোকটি উঠে এসে উসমানকে এমন জোরে থাপ্পড় দিল যে, তার চোখ নষ্ট হয়ে গেল।' এ দৃশ্য দেখে ওলীদ বিন মুগীরা বললো, তুমি আমার আশ্রয়ে থাকলে আজ এভাবে চোখ খোয়াতে না। উসমান বললেন, আমার যে চোখটা অক্ষত আছে, তাও হারাতে রাযী আছি। আমি যার আশ্রয়ে আছি, তিনি তোমার চেয়েও প্রতাপশালী ও শক্তিশালী।

হযরত আবু যর গিফারী ইসলাম গ্রহণের পর বিপ্লবী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সরাসরি হারাম শরীফে উপনীত হলেন এবং সেখানে উচ্চস্বরে নিজের নতুন আকীদা বিশ্বাস ঘোষণা করলেন। কোরোয়েশরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো, এই ধর্মত্যাগীকে পেটাও। অমনি মারপিট শুরু হয়ে গেল। তাকে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রসূলের সা. চাচা আব্বাস ঘটনাক্রমে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আরে এ তো গিফার গোত্রের লোক। তোমাদের বাণিজ্যোপলক্ষে ওদের এলাকা দিয়েই যেতে হয়। একটু সাবধানে কাজ কর।' অগত্যা কোরায়েশরা সংযত হলো। পরের দিন তিনি আবারো নিজের ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ঘোষণা করলেন এবং আবারো গণপিটুনি খেলেন।

হযরত উম্মে শুরাইক ইসলাম গ্রহণ করলে তার আত্মীয় স্বজন তাকে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এ সময় তাকে খাবার জন্য রুটির সাথে মধু দিত এবং পানি খেতে দিতনা, যাতে গরম বেশী অনুভূত হয় এবং দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করে। এ অবস্থায় এক নাগাড়ে তিন দিন কেটে গেল। চরম কষ্টের ভেতরে যখন তাকে বলা হলো, ইসলাম ত্যাগ কর, তখন তার বোধশক্তি অবশ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বঝুতেই পারলেননা তাকে

কি করতে বলা হচ্ছে। অবশেষে যুলুমবাজরা আকাশের দিকে ইংগিত দিয়ে বললো, আল্লাহর একত্ব অস্বীকার কর। এবার তিনি তাদের দাবী বুঝতে পেরে বললেন, আমি আমার আকীদা বিশ্বাসে অবিচল আছি এবং থাকবো।

খালেদ ইবনুল আ'স ইসলাম গ্রহণ করার পর তার বাবা তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। উপরন্তু তাকে ক্ষুধার শাস্তিও দেয়া হয়।

মোটকথা, এমন কেউ ছিলনা যাকে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। হযরত উসমানের ন্যায় হযরত আবু বকর ও তালহাকেও রশী দিয়ে বেধে রাখা হয়। ওলীদ ইবনে ওলীদ, আইয়াশ বিন আবি রবীয়া এবং সালমা বিন হিশামকে কঠোর নির্যাতন করা হয় এবং তাদেরকে হিজরত করতেও বাধা দেয়া হয়। হযরত ওমর নিজের বোন ও ভগ্নিপতির ওপর যে নির্যাতন চালান তাও ছিল অমানুষিক। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া হবে।

একদিকে এই ভয়াবহ নির্যাতন আর অপর দিকে ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীদের দৃঢ়তা লক্ষ্য করুন। নারী-পুরুষ, দাস-দাসী - যে-ই একবার এই দাওয়াতকে গ্রহণ করেছে, সে আর পিছু হটেনি। যুলুম-নির্যাতন কোন এক ব্যক্তিকেও ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে পারেনি। আমরা দেখতে পাই, সার্থক অর্থে একটা বিপ্লবী প্রেরণা তাদের অস্থিমজ্জায় সঞ্চালিত হয়েছিল। তাদের অতুলনীয় ধৈর্য কোরায়েশদের নিপীড়নমূলক স্বৈরাচারকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ইসলামের আহ্বানে যে-ই একবার সাড়া দিত, তার ভেতরে সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষ জন্ম নিত এবং তার বুকে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হতো।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

প্রতিটি বিপদ মুসিবতেরই একটা সহ্য সীমা থাকে। ইসলামী আন্দোলনের নিশানবাহীরা কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছিল, এবং তাতে তারা ধৈর্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তা অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু যুলুম নির্যাতনের বিরতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলনা। বরং ক্রমেই তা জোরদার হচ্ছিল। রসূল সা. তাঁর সংগীদের দুরবস্থা দেখে মর্মাহত হতেন। কিন্তু তাঁর কিছুই করার ক্ষমতা ছিলনা। তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল আল্লাহর প্রতি আস্থা, আখেরাতে অবিচল ঈমান, সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের দৃঢ় আশা এবং আবেগভরা দোয়া। রসূল সা. তাঁর সাথীদের এই বলে প্রবোধ দিতেন যে, আল্লাহ কোন না কোন পথ অবশ্যই বের করবেন। বাহ্যত মক্কার পরিবেশ হতাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠছিল এবং এমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না যে, ঐ অনুর্বর ভূমিতে ইসলামী আন্দোলনের পবিত্র বৃক্ষে কোন ফল জন্মাবে। পরিস্থিতি দেখে স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল, মক্কায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের সম্ভাবনা নেই, এ সৌভাগ্য হয়তো অন্য কোন ভূখন্ডের কপালে লেখা রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে আগেও হিজরাতের অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই অনুমিত হচ্ছিল যে, রসূল সা. ও তার সাহাবীদেরকেও হয়তো মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হবে। একটা সর্বাত্মক মানব কল্যাণমূলক মতাদর্শের সূচনা যদিও একটা বিশেষ দেশ ও বিশেষ জাতির মধ্যেই হয়ে থাকে, কিন্তু তা জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদের সংকীর্ণতার উর্দ্ধে অবস্থান করে এবং তা কোন দেশ ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা।

কোন বিশেষ এলাকার মানুষ যদি অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে তা অন্য কোন জনপদকে এই লক্ষ্যে মনোনীত করে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি বা নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দাওয়াতের কেন্দ্রীয় ভূমিকে পরিত্যাগ করা নবীদের নীতি নয়। তা সত্ত্বেও রসূল সা. যুলুম ও ধৈর্যের সংঘাতকে এমন এক পর্যায়ের দিকে ধাবমান হতে দেখছিলেন, যেখানে সহনশীলতার মানবীয় ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। মুসলমানগণ ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করছিলেন আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি সাহাবীদের পরামর্শ দিলেন, "তোমরা দুনিয়ার কোন দেশে চলে যাও। আল্লাহ অচিরেই তোমাদের কোথাও একত্রিত করবেন।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দেশে যাবো? রসূল সা. আবিসিনিয়ার দিকে ইংগিত করলেন। ঐ দেশটার রাজা অপেক্ষাকৃত ন্যায়পরায়ণ এবং হযরত ঈসার আ. আদর্শের অনুসারী বলে রসূল সা. জানতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ঐ দেশটাই হিজরতের উপযোগী। তিনি আবিসিনিয়া সম্পর্কে বললেন, 'ওটা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দেশ'। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

নবুয়তের পঞ্চম বছর রসূল সা. এর বিপ্লবী দলের এগারো জন পুরুষ ও চারজন মহিলার কাফেলা হযরত উসমান ইবনে আফফানের নেতৃত্বে রাতের অন্ধকারে আবিসিনিয়া অভিমুখে রওনা হলো। হযরত উসমানের সাথে তাঁর মহীয়সী স্ত্রী অর্থাৎ রসূল সা. এর কন্যা রুকাইয়াও হিজরতের এই প্রথম সফরে সংগিনী হন। রসূল সা. এই মহান দম্পতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ হযরত লূত ও হযরত ইবরাহীমের পর এটাই আল্লাহর পথে মাতৃভূমি ত্যাগকারী প্রথম দম্পতি। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, রহমাতুল্লিল আলামীন)

এই কাফেলার গৃহত্যাগের খবর যখন কোরায়েশরা জানতে পারলো, তৎক্ষণাত তারা তাদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালো। কিন্তু তারা জেদ্দা বন্দরে পৌঁছে জানতে পারলো, তাৎক্ষণিকভাবে নৌকা পেয়ে যাওয়ায় তারা এখন নাগালের বাইরে। এই মোহাজেররা খুব অল্প দিন (রজব থেকে শওয়াল পর্যন্ত) আবিসিনিয়ায় থাকেন। তারা একটা গুজব শুনতে পান যে, কোরায়েশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছেই জানতে পারেন, ঐ গুজব ছিল ভুল। এবারে দেখা দিল কঠিন সমস্যা। কেউ লুকিয়ে এবং কেউ বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় শহরে প্রবেশ করলো। এভাবে ফিরে আসার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ আগের চেয়েও প্রবলভাবে নির্যাতন হতে লাগলো।

এরপর আরেকটা বড় কাফেলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলো। এ কাফেলায় ৮৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলা ছিল। আবিসিনিয়ায় তারা নিরাপদ পরিবেশ পেলেন এবং নিশ্চিন্তে ইসলামী জীবন যাপন করতে লাগলেন।

এবার লক্ষ্য করুন, ইসলামের শত্রুদের আক্রোশ কত সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। তারা একটা বৈঠকে মিলিত হয়ে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালালো। তারা স্থির করলো, আব্দুল্লাহ ইবনে রবীয়া ও আমর ইবনুল আ'সকে আবিসিনিয়ার রাজার কাছে দূত করে পাঠাবে। দূতদ্বয় রাজার সাথে আলোচনা করে মোহাজেরদের ফিরিয়ে আনবে। এ উদ্দেশ্যে নাজ্জাশী ও তার সভাসদদের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রস্তুত করা হলো এবং বিপুল জাঁকজমকের সাথে দূতদ্বয় রওনা হলো। আবিসিনিয়া পৌঁছে তারা সভাসদ ও

পাদ্রীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো এবং তাদের ঘুষ দিল। তারা তাদেরকে বুঝালো যে, আমাদের দেশে কয়েকজন বেয়াড়া লোক একটা ধর্মীয় গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। ওরা আমাদের পৈতৃক ধর্মের জন্য যতটা বিপজ্জনক, ঠিক ততটা বিপজ্জনক তোমাদের ধর্মের জন্যও। আমরা ওদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার পর ওরা আপনাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওদেরকে এখানে থাকতে দেয়া উচিত নয়। এ উদ্দেশ্যে আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। তারা চেষ্টা চালিয়েছিল যাতে দরবারে পুরো ঘটনা নিয়ে আলোচনাই না হতে পারে, মোহাজেররা আদৌ কথা বলারই সুযোগ না পায় এবং রাজা কোরায়েশ দূত দ্বয়ের একতরফা কথা শুনেই মোহাজেরদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করে। এ উদ্দেশ্যে ঘুষ ও গোপন যোগসাজশের পথ অবলম্বন করা হয়। সভাসদদের নেপথ্যে বশীকরণের পর তারা উপঢৌকনাদি নিয়ে নাজ্জাশীর সামনে উপস্থিত হয়। তারা নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যাখ্যা করে, মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদেরকে আপনার দরবারে এই আবেদন পেশ করার জন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি আমাদের লোকগুলোকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। সভাসদ ও পাদ্রীরা তাদের আবেদনকে সংগে সংগেই সমর্থন করলো। কিন্তু নাজ্জাশী একতরফা দাবীর ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মোহাজেরদের বক্তব্য না শুনে আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পন করতে পারিনা।

পরদিন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকা হলো। মুসলমানদের কাছে যখন নাজ্জাশীর আহবান পৌছলো, তখন তারা পরামর্শে বসলেন। তারা আলোচনা করলেন, রাজা তো খৃষ্টান, আর আমরা আকীদা বিশ্বাসে ও রীতিনীতিতে তার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে আমরা কী বলবো? আলাপ আলোচনার পর তাঁরা স্থির করলেন যে, রসূল সা. আমাদের যা যা শিখিয়েছেন, আমরা হুবহু তাই বলবো, তা থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন কিছু বলবো না। এতে পরিণাম যা হয় হোক। ভেবে দেখুন, তাঁদের ঈমান কত মজবুত ছিল। কঠিন অবস্থায়ও সত্য ও সততার ওপর অবিচল থাকাই আল্লাহর বিধান। এরপর যখন মোহাজেররা দরবারে পৌছলেন, তখন প্রচলিত রীতি অনুসারে নাজ্জাশীকে সিজদা করলেন না। সভাসদরা এতে আপত্তি তুলে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা সিজদা করলে না কেন? মোহাজেরদের মুখপাত্র হযরত জাফর জবাব দিলেন, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করিনা। এমনকি স্বয়ং রসূল সা. কেও আমরা সাদাসিদাভাবে শুধু সালামই করি। লক্ষ্য করুন যে, কী নাজুক পরিস্থিতিতে প্রকৃত তাওহীদের এই দুঃসাহসিক অভিব্যক্তি ঘটানো হচ্ছিল। যে শক্তির সামনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রেখে চাতুর্যের আশ্রয় নিচ্ছিল, সেই শক্তির সামনেই তারা অকুতোভয়ে আদর্শবাদী একনিষ্ঠতার পরিচয় দিলেন।

এবার মক্কার দূতদ্বয় তাদের দাবী পেশ করলো যে, এই মোহাজেররা আমাদের দেশের পলাতক আসামী। তারা একটা নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে এবং তার ভিত্তিতে একটা সর্বনাশা তান্ডবের সৃষ্টি করেছে। কাজেই ওদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করা হোক। নাজ্জাশী মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তোমরা কি খৃষ্টবাদ ও পৌত্তলিকতা ছাড়া তৃতীয় কোন্ ধর্মকে গ্রহণ করেছ?

মুসলমানদের মুখপাত্র হিসাবে হযরত জাফর উঠে দাঁড়ালেন এবং নাজ্জাশীর কাছে এই মর্মে আবেদন জানালেন যে, তিনি প্রথমে মক্কার দূতদ্বয়ের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চান। তাকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার অনুমতি দেয়া হোক। নাজ্জাশীর অনুমতি লাভের পর তিনি নিম্নরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ঃ

হযরত জা'ফর ঃ আমরা কি মক্কায় কারো ক্রীতদাস ছিলাম যে, আমরা আমাদের মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি? তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের অবশ্যই ফেরত পাঠানো উচিত।

আমর ইবনুল আস ঃ না, তোমরা ক্রীতদাস নও, স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত।

হযরত জা'ফর ঃ আমরা কি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসেছি? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা অভিভাবকদের কাছে ফেরত পাঠানো উচিত।

আমর ইবনুল আ'স ঃ না, তোমরা এক ফোঁটা রক্ত প্রবাহিত করনি।

হযরত জা'ফর ঃ আমরা কি কারো ধনসম্পদ চুরি করে এসেছি? তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেই পাওনা পরিশোধ করতে প্রস্তুত।

আমর ইবনুল আ'স ঃ না, তোমাদের কাছে কারো এক পয়সাও পাওনা নেই।

এই জেরার মাধ্যমে যখন মুসলমানদের নৈতিক অবস্থা ও মান সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন হযরত জা'ফর নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

"হে রাজা, আমরা একটা মুর্খ ও অজ্ঞ জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মরা জন্তুর গোশ্‌ত খেতাম, ব্যভিচার করতাম, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতাম, ভাইয়ে ভাইয়ে যুল্‌ম অত্যাচার করতাম, এবং আমাদের সবলেরা দুর্বলদের শোষণ ও নিপীড়ন করতো। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি জন্ম নিল, যার সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও ভদ্রতা সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং আমাদেরকে পাথর পূজা পরিত্যাগ করা, সত্য কথা বলা, রক্তপাত বন্ধ করা, এতীমদের সম্পদ আত্মসাত না করা, প্রতিবেশীর সেবা ও উপকার করা, সতী নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা না করা, নামায পড়া, রোযা রাখা ও দানসদকা করার শিক্ষা দিলেন। আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনলাম, পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিলাম, এবং সমস্ত খারাপ কাজ বর্জন করলাম। এই অপরাধে আমাদের গোটা জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল। তারা আমাদেরকে আগের সেই গোমরাহীতে ফিরিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে? এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের ঈমান ও জান বাঁচানোর জন্য আপনার রাজ্যে পালিয়ে এসেছি। আমাদের জাতি যদি আমাদেরকে মাতৃভূমিতে থাকতে দিত, তাহলে আমরা আসতাম না। এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত অবস্থা।"

কথা যদি সত্য হয় এবং বক্তা যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে তা বলে, তবে শ্রোতার মনে তা প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। নাজ্জাশীর মত খোদাভীরু রাজার মন গলে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তার কিছু অংশ আমাকে শোনাও তো দেখি। হযরত জা'ফর সূরা মরিয়মের প্রথম থেকে কিছু অংশ পড়ে

শোনালেন। আল্লাহর এ আয়াতগুলো শুনে রাজার মন আরো নরম হলো এবং তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, এই বাণী এবং ইনজীল একই উৎস থেকে এসেছে।" তিনি আরো বললেন, "মুহাম্মাদ তো সেই রসূলই, যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা আ. করেছিলেন। আল্লাহর শোকর যে, আমি সেই রসূলের যুগটা পেয়ে গেলাম।" সংগে সংগে তিনি এই রায়ও দিয়ে দিলেন যে, মোহাজেরদের ফেরত দেয়া সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত দরবারের কার্যক্রম শেষ হলো এবং দূতদ্বয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। পরে তারা উভয়ে স্থির করলো যে, আরো একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। নাজ্জাশী একজন খৃস্টান। হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস দরবারে তুলে ধরলে বিচিত্র নয় যে, রাজার মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠবে।

পরদিন আমর ইবনুল আ'স পুনরায় দরবারে হাজির হলো। নাজ্জাশীকে উস্কে দেয়ার জন্য এই অপবাদ আরোপ করলো যে, এই মোহাজেররা হযরত ঈসা সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা পোষণ করে। নাজ্জাশী পুণরায় মুসলমানদের ডাকলেন। তারা যখন পরিস্থিতি জানলেন তখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন যে, হযরত ঈসা "আল্লাহর পুত্র'-এ কথা অস্বীকার করলে নাজ্জাশীর কী প্রতিক্রিয়া হয় কে জানে?

কিন্তু ঈমানদারের দৃঢ়তা এবারও তাদেরকে নির্দেশ দিল, যা সত্য তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দাও। হযরত জা'ফর তাঁর ভাষণে বললেন ঃ

"আমাদের নবী বলেছেন ঃ হযরত ঈসা আ. আল্লাহর দাস, আল্লাহর নিদর্শন ও আল্লাহর রসূল।"

এ কথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটা ঘাসের টুকরো হাতে নিয়ে বললেন, 'তুমি যা বলেছ, হযরত ঈসা তা থেকে এই ঘাসের টুকরো পরিমাণও বেশী কিছু নন।' ষড়যন্ত্রের শিকার এবং ঘুষ ও উপঢৌকন দ্বারা বশীভূত পাদ্রীরা মনে মনে অনেক ছটফট করলো। এক পর্যায়ে তাদের নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু নাজ্জাশী তার কোন তোয়াক্কা করলেননা। পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন যে, সমস্ত উপঢৌকন ফেরত দেয়া হোক। মক্কার প্রতিনিধি দ্বয় একেবারেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ

সহিংসতার এই অধ্যায়ের একটি কাহিনী সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো, হযরত ওমরের ক্রোধোন্মত্ততার কাহিনী। রসূল সা. যখন নবুয়ত লাভ করেন, তখন হযরত ওমরের বয়স ছিল সাতাশ বছর। ইসলাম খুবই দ্রুত গতিতে তার পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদ প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বোন ফাতেমাও মুসলমান হয়ে যান। ওমরের রা. পরিবারে আরো এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব নঈম বিন আবদুল্লাহও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। প্রথম প্রথম তিনি জানতেই পারেননি যে, তার পরিবারে এভাবে ইসলামের বিস্তার ঘটছে। যখনই জানতে পারলেন, ক্রোধে অধীর এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তাঁর পরিবারের এক দাসী লুবাইনাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি পিটাতে পিটাতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। বিশ্রাম নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার পিটাতেন।

শেষ পর্যন্ত একদিন সবচেয়ে ভয়ংকর সিদ্ধান্তটাই নিয়ে ফেললেন। সেটি হলো, এই আন্দোলনের মূল আহ্বায়ককেই খতম করে ফেলতে হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এই সময় আবু জাহল রসূল সা.- কে যে হত্যা করতে পারবে তাকে দু'শো উট পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করে রেখেছিল এবং সেই পুরস্কার পাওয়াই ছিল এ সিদ্ধান্তের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু হযরত ওমরের মেযাজের সাথে তার এ ধরনের লোভের শিকার হওয়াটা বেমানান। মনে হয়, তিনি এ কাজটাকে একটা পৈতৃক ধর্মের সেবা মনে করেই করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, তিনি তলোয়ার নিয়ে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে নঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ায় বাধা পেলেন। নঈম বললেন, 'আগে নিজের বোন ভগ্নিপতির খোঁজ নাও, তারপর আর যেখানে যেতে চাও যেয়ো।' ওমর রা. তৎক্ষণাত ফিরলেন এবং বোনের বাড়ী অভিমুখে চললেন। সেখানে যখন পৌঁছলেন, তখন বোন ফাতেমা কোরআন পড়ছিলেন। পায়ের শব্দ কানে আসা মাত্রই চুপ করে গেলেন এবং কোরআনের পাতা গুলো লুকিয়ে ফেললেন। হযরত ওমর রা. ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী পড়ছিলে? বোন নিরুত্তর রইলেন। ওমর রা. বললেন আমি জেনে ফেলেছি, তোমরা উভয়ে ধর্মত্যাগী হয়েছ। তবে দেখাচ্ছি মজা।' এই বলে ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বোন স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তাকেও পিটালেন। বোনের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল। কিন্তু অশ্রুভরা চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ফাতেমা বললেন,

'ওমর! যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইসলাম ত্যাগ করা সম্ভব নয়।'

ক্ষতবিক্ষত দেহ, রক্তাক্ত পোশাক পরিচ্ছদ, চোখভরা অশ্রু ও আবেগভরা মন নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। শুধু নারী নয়–সহোদরা বোন। আর তার মুখে এমন তেজোদীপ্ত কথা! ভেবে দেখুন, অবলা নারীর মধ্যেও ইসলাম কেমন নতুন প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল। এহেন মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সামনে ওমরের দুর্ধর্ষ শক্তিও হার মানলো। তার ইস্পাত কঠিন সংকল্পের বজ্র আঁটুনি মাঝপথেই ফস্কা গিরোয় পরিণত হলো। বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা যা পড়ছিলে, আমাকে একটু শোনাও তো।' ফাতেমা গিয়ে কোরআনের লুকিয়ে রাখা পাতাগুলো নিয়ে এলেন। পড়তে পড়তে যখন এ কথাটা সামনে এল, آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অমনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন। 'আশহাদু আল্‌-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। ঈমান আনার পর ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র হযরত আরকামের বাড়ী অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে রসূল সা. এর হাতে বায়য়াত করলেন। এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত মুসলমানগণ আনন্দের আতিশয্যে এমন জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন যে, মক্কার গোটা পরিবেশ গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীরা সেখান থেকে বেরুলেন এবং সমগ্র মক্কা নগরীতে ছড়িয়ে পড়লেন। তারা অনুভব করলেন যে তাদের শক্তি বেড়ে গেছে। হযরত ওমরের রা. ঈমান আনার অব্যবহিত পর থেকেই কাবা শরীফে সর্ব প্রথম প্রকাশ্যে জামায়াতে নামায পড়া শুরু হলো।

হযরত ওমর রা. মক্কার যুবকদের মধ্যে স্বীয় মেধা ও আবেগ উদ্দীপনার জন্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর আচার ব্যবহার ছিল আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ।

জাহেলিয়াতের যুগে তিনি ইসলামের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করতেন, তাও কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে নয় বরং ওটাকে ন্যায় সংগত মনে করে আন্তরিকতার সাথেই করতেন। তারপর যখন প্রকৃত সত্য তাঁর কাছে উদঘাটিত হলো এবং বিবেকের ওপর থেকে পর্দা সরে গেল, তখন পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামের পতাকা উঁচু করে তুলে ধরলেন। বিরোধিতা করার সময় তার ধরন যদিও অতিমাত্রায় উগ্র ও উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁর প্রখর মেধা ও নির্মল বিবেক সব সময়ই একটু একটু করে সত্যের আলো গ্রহণ করেছে। মক্কার পরিবেশে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা তাঁর অন্তরাত্মাকে প্রভাবিত, আলোড়িত ও ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। একদিকে ইসলামের দাওয়াতের খবরাখবর প্রতিনিয়ত তাঁর কর্ণগোচর হতে থাকে। অপর দিকে এর বিরোধীদের হীন ও কদর্য মানসিকতাও তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তারপর একদিকে তিনি রসূল সা. ও তাঁর সাথীদের নির্মল ও সৎ চরিত্র এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের চরিত্রের কলুষিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। প্রতিনিয়ত এই তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ মক্কার সচেতন ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী এই যুবককে ক্রমাগত প্রভাবিত ও আলোড়িত করতে থাকে। তবে পরিস্থিতির এই দুটো পরস্পর বিরোধী সাধারণ দৃশ্য ছাড়াও কয়েকটা বিশেষ ঘটনাও তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

উদাহরণ স্বরূপ, উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে আবি হাশমা আবিসিনিয়ায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় একদিন হযরত ওমর তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'উম্মে আব্দুল্লাহ, মনে হচ্ছে মক্কা ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।' উম্মে আব্দুল্লাহ বললেন, 'হা, তাই যাচ্ছি। তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছ এবং আমাদের ওপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছ। এখন আল্লাহ আমাদের জন্য বাঁচার একটা পথ খুলে দিয়েছেন।' ওমর বললেন ঃ 'আল্লাহ আপনাদের সাথী হোন।' উম্মে আব্দুল্লাহ বলেন, 'ঐ সময় ওমরকে যেরূপ দুঃখভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল, তেমন আমি আর কখনো দেখিনি। আমাদের দেশান্তরী হওয়ার প্রস্তুতি দেখে তিনি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করেন। উম্মে আবদুল্লাহ তাঁর স্বামী আমের বিন রবীয়াকে যখন ওমরের এই মর্মবেদনার কথা জানালেন তখন আমের জিজ্ঞাসা করলেন, ওমরের এই ভাবান্তর দেখে তুমি কি তাঁর ইসলাম গ্রহণের আশা পোষণ করছ? উম্মে আব্দুল্লাহ বললেন, হাঁ। আমের বললেন, তুমি যাকে দেখেছে, সে যখন ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন খাত্তাবের গাধাও ইসলাম গ্রহণ করবে (খাত্তাব হযরত ওমরের পিতার নাম)। উম্মে আব্দুল্লাহ বলেন, ইসলামের ব্যাপারে ওমরের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার কারণে এ ধরনের হতাশা জন্মে গিয়েছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড)

কিন্তু এই ঘটনা যে হযরত ওমরের বিবেকে এক জোরালো কষাঘাত হেনে থাকবেনা, তা কে বলতে পারে? অনুরূপভাবে অন্য একটা বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসূল সা.-এর কোরআন পাঠ শুনে তার মন প্রভাবিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ 'আমি ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলাম। জাহেলিয়াতের যুগে মদে আসক্ত ছিলাম এবং

খুব বেশী পরিমাণে মদ খেতাম ; হাযওয়ারাতে[১৫] আমাদের মদের আসর বসতো এবং সেখানে কুরায়শী বন্ধুরা জমায়েত হতো। এক রাতে আমি নিজের সতীর্থদের আকর্ষণে ঐ আসরে উপস্থিত হই। সতীর্থদের সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু কাউকে পাইনি। পরে এক মদ বিক্রেতার কথা মনে পড়লো এবং ভাবলাম ওখানে গিয়ে মদ খাবো। কিন্তু তাকেও পেলামনা। তারপর ভাবলাম কা'বা শরীফে চলে যাই এবং ওখানে ষাট সত্তর বার তওয়াফ করে নেই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, রসূল সা. নামায পড়ছেন। তিনি রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে (বাইতুল মাকদাস অভিমুখে) দাঁড়িয়েছিলেন। সহসা মনে ইচ্ছা জাগলো, এই লোকটা কী পড়ে আজ একটু শোনাই যাকনা। কা'বার গেলাফের ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে একেবারে কাছে গিয়ে শুনতে লাগলাম। আমার ও রসূল সা. এর মাঝে কেবল কা'বার গেলাফ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আমি যখন কোরআন শুনলাম, তখন আমার মনটা গলে গেল। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করলো।'[১৬]

এই বর্ণনার অবশিষ্টাংশে বলা হয়েছে, ওমর রা. তখনই রসূল সা. এর সাথে চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে প্রকৃত পক্ষে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে পূর্বোক্ত বর্ণনাই সঠিক। তাঁর বোনের ঈমান, ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখেই তাঁর মনমগয ইসলাম গ্রহণের দিকে চূড়ান্তভাবে ধাবিত হয়। ওমরের রা. নিজের বর্ণনার এ অংশটা খুবই গুরুত্ববহ যে তিনি রসূল সা. এর কাছ থেকে কোরআন শ্রবণ করতে গিয়েছেন। এবং নিজ কানে শোনা কোরআনের আয়াত তাঁর অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করেছে। এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ধরে চলা দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এরূপ ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। ওমরের মত ব্যক্তিত্ব ইসলামের দাওয়াত নিজকানে না শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন এটা সম্ভব হয়ইবা কেমন করে ?

কোরআনের বিরোধিতায় লিপ্ত আরো অনেকে, এমনকি বড় বড় নেতারাও পর্যন্ত কৌতুহলের বশে গোপনে ছুটে আসতো আকাশ থেকে নেমে আসা এই সুমধুর তান শুনতে। অথচ প্রকাশ্য মজলিসে তারাই আবার বলতো, 'আমাদের কান বধির।' একবার গভীর রাতে যখন রসূল সা. নিজ ঘরে বসে কোরআন পড়ছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান, আবু জাহল ও অখনাস বিন শুরাইক লুকিয়ে লুকিয়ে রসূল সা. এর ঘরের আশে পাশে সমবেত হয়ে শুনছিল। পরে বাড়ী ফেরার সময় তারা ঘটনাক্রমে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তখন একে অপরকে এই বলে ভর্ৎসনা করতে থাকে যে, এ রকম করা উচিত নয়। নচেত স্বল্পবুদ্ধির সাধারণ লোকেরা যদি দেখে ফেলে, তাহলে তাদের মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এ কথা বলে তারা চলে গেল। পরের দিন তারা আবারো আসলো এবং আবারো আগের মত ভর্ৎসনা ও উপদেশ বিনিময় হলো। তৃতীয় রাতে আবারো এই ঘটনা ঘটলো এবং শেষ পর্যন্ত খুবই জোরদার প্রতিজ্ঞা করা হলো যে, ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কিছুতেই হবেনা। তবে প্রাসংগিকভাবে পরস্পরের মধ্যে

---

১৫. তৎকালে এটা মক্কার একটা বাজার ছিল। বর্তমানে এই যমীনটুকু মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত।
১৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৬৮-৩৬৯ পৃ:।

জিজ্ঞাসাবাদ হলো যে, মুহাম্মাদের সা. কাছ থেকে শোনা বাণী সম্পর্কে কার কী মত? প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বললো। সবার শেষে আবু জাহল উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, বনু আবদ মানাফের সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব সময়ই ছিল। তারা আতিথেয়তা করলে আমরাও করতাম, তারা রক্তপণ দিলে, আমরাও দিতাম, তারা দানশীলতা করলে আমরাও করতাম। এভাবে আমরা তাদের সমকক্ষ হয়ে গিয়েছিলাম। কোন ব্যাপারেই পেছনে পড়িনি। হঠাৎ এখন তারা বলতে আরম্ভ করেছে যে, তাদের গোত্রে একজন নবী এসেছে। এটা আমরা কেমন করে মেনে নেই? এ ক্ষেত্রে তো আমরা তাদের সমকক্ষতার দাবী করতে পারছিনে। কাজেই আল্লাহর কসম, আমরা তার ওপর ঈমানও আনতে পারিনা, তাকে সমর্থনও করতে পারিনা।'[১৭]

ঐ সময় ইসলাম সম্পর্কে সর্ব সাধারণের মনে ব্যাপক কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল এবং যা হযরত ওমরকেও কখনো কখনো রসূল সা. এর কাছে নিজ কানে আল্লাহরবাণী শোনার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তা অনুধাবন করার জন্যই এ ঘটনাটা প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ করলাম।

আর এক ধাপ অগ্রগতি

মোটকথা, হযরত ওমরের রা. ইসলাম গ্রহণ ছিল একটা বিরাট ঘটনা। এ ঘটনার পেছনে অনেকগুলো কার্যকারণ সক্রিয় ছিল। এ ঘটনার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার আরো একটা কারণ হলো, ইসলাম বিরোধী একতরফা সহিংসতা যখন চরম আকার ধারণ করেছে, ঠিক তখনই এই সত্যসন্ধানী মানুষটি এগিয়ে আসেন। বিরোধী শক্তি জনগণকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যই নির্যাতন চালাচ্ছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এই নির্যাতন জনগণের মনকে গলিয়ে দিচ্ছিল এবং নির্যাতনের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। ইসলাম যে সত্য তার একটা অন্যতম অকাট্য প্রমাণ এটাই যে, সহিংস ও আগ্রাসী প্রতিরোধ যতই বেড়েছে, ততই উৎকৃষ্টতম মনমগজের অধিকারী লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হতে থেকেছে। আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরের সময়টায় মক্কার মূল্যবান রত্নগুলো ইসলামে জড় হতে থাকে।

একদিকে ওমরের রা. মত ব্যক্তিত্ব ইসলাম গ্রহণ করবে, আর নতুন কোন আলোড়ন সৃষ্টি হবেনা, এটাই বা কেমন করে সম্ভব? তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, একবার গোটা সমাজকে চ্যালেঞ্জ করবেনই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তখনও বালক মাত্র। তিনি বলেন, 'আমার পিতা ওমর রা. ঈমান আনার পর খোঁজ নিলেন যে, কোরায়েশ গোত্রের কোন্ ব্যক্তি কথা ছড়াবার উস্তাদ? তিনি জামীল বিন মুয়াম্মার জামহী নামক এক ব্যক্তির সন্ধান পেলেন। তিনি খুব ভোরে তার কাছে চলে গেলেন। ওখানে গিয়ে তিনি কি করেন তা দেখার জন্য আমিও তাঁর সাথে গেলাম। তিনি যেয়ে তাকে বললেন, 'ওহে জামীল, তুমি কি জান, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদের সা. দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছি? জামীল একটি কথাও না বলে নিজের চাদরটা ঘাড়ে করে সোজা মসজিদুল হারামের

---

১৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮।

দরজায় দিয়ে পৌঁছলো। তারপর গগনবিদারী কণ্ঠে ঘোষণা করতে শুরু করলো যেঃ 'ওহে কোরায়েশ জনতা শোনো। খাত্তাবের ছেলে ওমর রা. সাবী (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে।' হযরত ওমরও তার পিছু পিছু এসে পৌঁছলেন এবং চিৎকার করে বললেন ঃ 'জামীল ভুল বলছে। আমি সাবী নয়, মুসলমান হয়েছি। আমি ঘোষণা করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ সা. তার বান্দা ও রসূল।' কোরায়েশরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমনকি নিজের বাবার সাথেও তিনি তুমুল লড়াই করলেন। ধস্তাধস্তি করতে করতে সূর্য মাথার ওপর চলে আসলো। এই সময় জনৈক প্রবীণ কোরায়েশ নেতা হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি? অতঃপর পুরো ঘটনা শুনে সে বললো, এই ব্যক্তি নিজের জন্য একটা মত ও পথ বাছাই করে নিয়েছে। এখন তোমরা কী করতে চাও! ভেবে দেখ, বনু আদী (হযরত ওমরের গোত্রের নাম) কি তাদের লোককে এভাবে তোমাদের হাতে অসহায় ছেড়ে দেবে? ওকে ছেড়ে দাও।' এই সরদারের নাম ছিল আস বিন ওয়ায়েল সাহমী। সে হযরত ওমরকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, ৩৭০-৩৭১ পৃঃ)

এই সাথে হযরত ওমর নিজের ঈমানী উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশের আরো একটা পথ খুঁজে পেয়ে গেলেন। তিনি ঈমান আনার পর প্রথম রাতেই চিন্তা করলেন, রসূল সা. এর সবচেয়ে কট্টর ও উগ্র বিরোধী কে? তিনি বুঝলেন, আবু জাহলের চেয়ে কট্টর ও উগ্র বিরোধী আর কেউ নেই। প্রত্যুষে উঠেই আবু জাহলের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। দরজার কড়া নাড়তেই আবু জাহল বেরিয়ে এলো। সে স্বাগত জানিয়ে আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইল। ওমর রা. বললেন, আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, আমি মুহাম্মদ সা.-এর ওপর ঈমান এনেছি এবং তিনি যা বলেন তা সত্য বলে স্বীকার করেছি। আবু জাহল 'তোর ওপর এবং তোর এই খবরের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত' এই কথাটা বলেই ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল।

অপর দিকে ওমর রা. ইসলামী আন্দোলনকে এক ধাপ সামনে এগিয়ে দিলেন। মার খেয়েও কা'বার চত্তরে প্রকাশ্যে নামায পড়ার সূচনা করে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, 'আমরা হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের আগে কা'বা শরীফের সামনে প্রকাশ্যে নামায পড়তে পারতামনা। ওমর রা. ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি কোরায়েশদের সাথে লড়াই করে কা'বায় নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম।'

এভাবেই তীব্র সহিংসতার ভেতর দিয়েও শত্রুদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামযার ঘটনাও প্রায় একই ধরনের। মক্কার এ যুবক একাধারে মেধাবী সাহসী ও প্রভাবশালী ছিলেন। রসূল সা. এর চাচাদের মধ্যে আবু তালেবের পর ইনিই একমাত্র চাচা ছিলেন, যিনি দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও রসূল সা.কে ভালোবাসতেন। বয়সেও ছিলেন মাত্র দু'তিন বছরের বড়। সমবয়সী হওয়ার কারণে শৈশবে চাচা ভাতিজা গলাগলি ভাব ছিল।

একদিনের ঘটনা। সাফা পাহাড়ের কাছে আবু জাহল রসূল সা. কে লাঞ্ছিত করে এবং অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে। রসূল সা. ধৈর্য ধারণ করলেন এবং এই লাঞ্ছনার কোন প্রতিশোধ নিলেন না। ঘটনাক্রমে জনৈক দাসী এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। হযরত হামযা তখন শিকারে গিয়েছিলেন। ধনুক হাতে করে ফিরে আসতেই দাসীটা তাকে ঘটনাটা শুনালো এবং বললো, 'হায়, তুমি যদি নিজ চোখে দেখতে পেতে যে তোমার ভাতিজার কী অবস্থা হয়েছিল'। ঘটনার বিবরণ শুনে হামযার তীব্র আত্ম সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠলো। তিনি সোজা কোরায়েশদের মজলিসে আবু জাহলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আবু জাহলের মাথায় ধনুক দিয়ে আঘাত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মুহাম্মাদকে গালি দিয়েছ? যদি দিয়ে থাক তাহলে জেনে রেখ, আমিও তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি এবং সে যা কিছু বলে, আমিও তা বলি। সাহস থাকলে আমার মোকাবিলা করতে এস।' আবু জাহলের সমর্থনে বনু মাখযুমের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু আবু জাহল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'বাদ দাও, আমি হামযার ভাতিজাকে খুব অশ্রাব্য গালি দিয়েছি।' এরপর হযরত হামযা ইসলামের ওপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোরায়েশরা বুঝতে পারলো যে, রসূলের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড)

বয়কট ও আটকাবস্থা

ইসলামের শত্রুরা তাদের সকল ফন্দি ফিকিরের ব্যর্থতা, ইসলামের অগ্রগতির ও বড় বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য দেখে দিশাহারা হয়ে উঠে। নবুয়তের সপ্তম বছরের মুহাররম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেম গোত্রকে বয়কট করার চুক্তি সম্পাদন করলো। চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, বনু হাশেম যতক্ষণ মুহাম্মদ সা. কে আমাদের হাতে সমর্পন না করবে এবং তাকে হত্যা করার অধিকার না দেবে, ততক্ষণ কেউ তাদের সাথে কোন আত্মীয়তা রাখবেনা, বিয়ে শাদীর সম্পর্ক পাতাবেনা, লেনদেন ও মেলা মেশা করবেনা এবং কোন খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য তাদের কাছে পৌঁছাতে দেবেনা। আবু তালেবের সাথে একাধিকবার কথাবার্তার পরও আবু তালেব রসূল সা. কে নিজের অভিভাবকত্ব থেকে বের করতে প্রস্তুত হননি। আর তার কারণে বনু হাশেমও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেনি। এই কারণে হতাশ হয়ে তারা ঐ চুক্তি সম্পাদন করে। গোত্রীয় ব্যবস্থায় এ সিদ্ধান্তটা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক এবং চূড়ান্ত পদক্ষেপ। সমগ্র বনু হাশেম গোত্র অসহায় অবস্থায় 'শিয়াবে আবু তালেব' নামক উপত্যকায় আটক হয়ে গেল। এই আটকাবস্থার মেয়াদ প্রায় তিন বছর দীর্ঘ হয়। এই সময় তাদের যে দুর্দশার মধ্য দিয়ে কাটে তার বিবরণ পড়লে পাষাণও গলে যায়। বনু হাশেমের লোকেরা গাছের পাতা পর্যন্ত চিবিয়ে এবং শুকনো চামড়া সিদ্ধ করে ও আগুনে ভেজে খেতে থাকে। অবস্থা এত দূর গড়ায় যে, বনু হাশেম গোত্রের নিষ্পাপ শিশু যখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাঁদতো, তখন বহু দূর পর্যন্ত তার মর্মভেদী শব্দ শোনা যেত। কোরায়েশরা এ সব কান্নার শব্দ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। সমগ্র বনু হাশেম গোত্র একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতার কারণে এহেন বন্দীদশায় নিক্ষিপ্ত হলো। বয়কট এমন জোরদার ছিল যে, একবার হযরত খাদীজার ভাতিজা হাকীম বিন হিযাম তার ভৃত্যকে দিয়ে কিছু গম পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। পথি মধ্যে আবু জাহল তা দেখে গম ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। ঠিক এ সময় আবুল

বুখতারীও এসে গেল এবং তার মধ্যে একটু মানবিক সহানুভূতি জেড়ে উঠলো। সে আবু জাহলকে বললো, আরে ছেড়ে দাওনা। এছাড়া হিশাম বিন আমরও লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু গম পাঠাতো।

এই হিশাম বিন আমরই এই নিপীড়নমূলক চুক্তি বাতিলের প্রথম উদ্যোক্তায় পরিণত হলো। সে যুহাইর বিন উমাইয়ার কাছে গেল। তাকে বললো, 'তুমি কি এতে আনন্দ পাও যে, তুমি খাবে দাবে, কাপড় পরবে, বিয়ে শাদী করবে, আর তোমার মামাদের এমন অবস্থা হবে যে, তারা কেনাবেচাও করতে পারবেনা এবং বিয়ে শাদীও করতে পারবেনা? ব্যাপারটা যদি আবুল হাকাম বিন হিশামের (আবু জাহল) মামা নানাদের হতো এবং তুমি তাকে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানাতে, তাহলে সে কখনো সে আহ্বানে সাড়া দিতনা।' এ কথা শুনে যুহাইর বললো, 'আমি কী করবো? আমি তো একা মানুষ। আল্লাহর কসম আমার সাথে যদি আর কেউ থাকতো, তাহলে আমি এই চুক্তি বাতিল করানোর উদ্যোগ নিতাম এবং বাতিল না করিয়ে ছাড়তামনা।' হিশাম বললো, 'দ্বিতীয় ব্যক্তি তো তুমি পেয়েই গেছ। যুহাইর বললো, 'সে কে? হিশাম বললো, আমি স্বয়ং। এরপর হিশাম গেল মুতয়াম বিন আদীর কাছে এবং একইভাবে তাকে বুঝালো। সেও যুহাইরের ন্যায় জবাব দিল যে, আমি একাকী কী করবো। হিশাম তাকেও বললো, 'আমি আছি তোমার সাথে।' মুতয়াম বললো, 'তাহলে তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের কর।' হিশাম বললো, তৃতীয় ব্যক্তি তো আমি পেয়েই গেছি। সে বললো, কে সে? হিশাম বললো, 'যুহাইর বিন আবি উমাইয়া।' মুতয়াম বললো, এবার চতুর্থ একজন বের করা দরকার। অতপর আবুল বুখতারী ও যামরা বিন আসওয়াদের কাছে পৌঁছে হিশাম কথা বললো।

এভাবে বয়কট চুক্তি বাতিলের আন্দোলন যখন ভেতরে ভেতরে কার্যকরভাবে অগ্রসর হলো, তখন তারা সবাই একত্রে বসে পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করলো। পরিকল্পনা করা হলো যে, হিশামই প্রকাশ্যে কথাটা তুলবে। সে অনুসারে হিশাম কা'বা শরীফের সাতবার তওয়াফ করলো। তারপর জনতার কাছে এসে বললো, 'ওহে মক্কাবাসী, এটা কি সমীচীন যে, আমরা খাবার খাবো, পোশাক পরবো, আর বনু হাশেম ক্ষুধায় ছটফট করতে থাকবে এবং কোন কিছু কিনতেও পারবেনা?' তারপর সে নিজের ইচ্ছেটা এভাবে জানিয়ে দিল :

'আল্লাহর কসম, সম্পর্ক ছিন্নকারী এই নিপীড়নমূলক চুক্তি টুকরো টুকরো করে না ফেলে আমি বিশ্রাম নেবনা।'

আবু জাহল চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো এটা ছিড়তে পারবেনা।'

যামরা ইবনুল আসওয়াদ আবু জাহলকে জবাব দিল, 'আল্লাহর কসম, তুমিই সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। এই চুক্তি যেভাবে লেখা হয়েছে, আমরা তা পছন্দ করিনা।' আবুল বুখতারীও বলে উঠলো, 'যামরা ঠিকই বলেছে। এই চুক্তি আমাদের পছন্দ নয় এবং আমরা তা মানিও না।' মুতয়ামও সমর্থন করে বললো, 'তোমরা দু'জনে ঠিকই বলেছ। এর বিপরীত যে বলে সে ভুল বলে।' এভাবে অধিকাংশ লোক বলতে থাকায় আবু জাহল মুখ কাচুমাচু

করে বসে রইল এবং চুক্তি ছিড়ে ফেলা হলো। লোকেরা যখন চুক্তিটাকে কা'বার প্রাচীর থেকে নামালো তখন অবাক হয়ে দেখলো যে, সমগ্র চুক্তিটাকে উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবল 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটা বাকী আছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

দুঃখের বছর

বন্দীদশা কেটে যাওয়ায় রসূল সা. আর একবার সপরিবারে মুক্ত পরিবেশে উপনীত হলেন। কিন্তু এবার তার চেয়েও কঠিন যুগের সূচনা হলো। তখন চলছিল নবুয়তের দশম বছর। এ বছর সর্বপ্রথম যে বিয়োগান্ত ঘটনাটা ঘটলো, তা এই যে, হযরত আলীর পিতা আবু তালেব মারা গেলেন। যে শেষ আশ্রয়টি এ যাবত পরম স্নেহে রসূল সা. কে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করে আসছিল এবং কোন চাপ ও উস্কানীর কাছে নতি স্বীকার না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকল চক্রান্ত প্রতিহত করে আসছিল, সেই আশ্রয়টি এভাবে হারিয়ে গেল।

এই বছরই রসূল সা. দ্বিতীয় যে আঘাতটা পেলেন তা হলো হযরত খাদীজার রা. ইন্তিকাল। হযরত খাদীজা রা. শুধু রসূলের স্ত্রী-ই ছিলেন না, বরং প্রথম ঈমান আনয়নকারী ভাগ্যবান গোষ্ঠীটির অন্যতম ছিলেন। নবুয়ত লাভের আগেও তিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মীতা দেখাতে মোটেই কসুর করেননি। প্রথম ওহি নাযিল হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সত্যের পথে রসূলের সা. যথার্থ জীবন সংগিনীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থনে তিনি প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছেন। পদে পদে পরামর্শও দিয়েছেন এবং আন্তরিকতা সহকারে সহযোগিতাও করেছেন। এ জন্য তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি রসূল সা. এর মন্ত্রী ছিলেন। বস্তুত এ মন্তব্য যথার্থ ও সংগত।

একদিকে পরপর এই দুটো আঘাত রসূল সা. কে সইতে হলো। অপরদিকে এই বাহ্যিক সহায় দুটো হারিয়ে যাওয়ার কারণে বিরোধিতা আরো প্রচন্ড আকার ধারণ করলো। এবার বিরোধিতা ও নির্যাতন নিপীড়ন অতীতের সমস্ত রেকর্ড যেন ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা সম্ভবত এই ছিল যে, ইসলাম নিজের হেফাযত নিজেই করুক, নিজের চলার পথ নিজেই তৈরী করুক এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। দুনিয়াবী সহায়গুলো এভাবে হটিয়ে না দিলে হয়তো সত্যের প্রাণশক্তি পুরোপুরি দৃশ্যমান হতে পারতোনা। এই দুঃখজনক ও দুঃসহ পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণেই এ বছরটা দুঃখের বছর নামে আখ্যায়িত হয়।

এখন কোরায়েশরা চরম অসভ্য আচরণ শুরু করে দিল। বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিতে লাগলো। তারা হৈ চৈ করতো। রসূল সা. যখন নামায পড়তেন, তখন হাতে তালি দিত। পথে চলার সময় রসূল সা. এর ওপর নোংরা বর্জ্য নিক্ষেপ করা হতো। দরজার সামনে কাঁটা বিছানো হতো। কখনো তাঁর গলায় ফাঁস লাগানো হতো। কখনো তাঁর গায়ে পর্যন্ত হাত দেয়া হতো, প্রকাশ্যে গাল দেয়া হতো। তাঁর মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করা হতো। এমনকি কোন কোন নরপশু এমন জঘন্যতম বেয়াদবীও পর্যন্ত করেছে যে, তাঁর জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করেছে।

একবার আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল একটা পাথর নিয়ে রসূল সা.কে খুঁজতে খুঁজতে হারাম শরীফ পর্যন্ত এসেছিল। তার ইচ্ছা ছিল এক আঘাতেই তাঁকে খতম করে দেয়া। রসূল সা. হারাম শরীফে তার সামনেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এমনভাবে তার চোখের আড়ালে রেখে দিলেন যে, সে তাঁকে দেখতেই পেলনা। অগত্যা সে হযরত আবু বকরের সামনে ক্রোধ উদগীরণ করে ফিরে এল এবং নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলো "আমরা নিন্দিত ব্যক্তির আনুগত্য প্রত্যখ্যান করেছি, তার আদেশ অমান্য করেছি এবং তার ধর্মের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছি।" বস্তুত নাম বিকৃত করা এবং খারাপ শব্দ প্রয়োগ করা নৈতিক নীচতা ও অধোপতনের লক্ষণ। শত্রু যখন ইতরামির সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, তখন এই সব নোংরা অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে।

এসব কথা শুনে রসূল সা. বলতেন, আল্লাহ তাদের নিন্দাবাদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওরা মুযাম্মামকে (নিন্দিত ব্যক্তি) গালি দেয়। কিন্তু আমি তো মুহাম্মাদ। কাজেই ওদের গালি আমাকে স্পর্শ করেনা।

অনুরূপভাবে একবার আবু জাহল পাথর দিয়ে আঘাত করে রসূল সা. কে হত্যা করার মতলবে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু আল্লাহ আবু জাহলকে সহসাই এমন ভীত ও সন্ত্রস্থ করে দেন যে, সে কিছুই করতে পারেনি।

একবার শত্রুরা সদলবলে রসূল সা. এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ছিল এ রকম ঃ ইসলামের শত্রুরা তাদের এক আড্ডায় বসে বলাবলি করছিল যে, 'এই লোকটার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আমরা বড্ড বেশী সহনশীলতা দেখিয়ে এসেছি। এতটা সহনশীলতার কোন নজীর নেই।' ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়ই রসূল সা. সেখানে এসে পড়েন। শত্রুরা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি এ সব কথা বলে থাক? রসূল সা. পরিপূর্ণ নৈতিক দৃঢ়তা নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই তো এ সব কথা বলে থাকি।' ব্যাস, আর যায় কোথায়। চার দিক থেকে আক্রমণ চালানো হলো। আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'স বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. এর ওপর কোরায়েশদের পক্ষ থেকে এমন বাড়াবাড়ি আর কখনো দেখিনি।

আক্রমণকারীরা কিছুক্ষণ পর থামলে রসূল সা. পুণরায় সেই অতি মানবীয় সাহসিকতা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন ঃ 'আমি তোমাদের কাছে এমন বার্তা নিয়ে এসেছি যে, তোমরা যবাই হয়ে যাবে।' অর্থাৎ যে যুলুম নির্যাতনের ছুরি তোমরা আমার গলায় চালাচ্ছো, ইতিহাসের শ্বাশত বিধান আল্লাহর আইন শেষ পর্যন্ত ঐ ছুরি দিয়েই তোমাদের যবাই করবে। তোমাদের এই যুলুমের রাজত্ব একেবারেই খতম হয়ে যাবে।

এই সব ঘটনার সঠিক সময়কাল বলা কঠিন। তবে অনুমান হয়যে, যে সময় সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছিল, তখনই এ ঘটনাগুলো ঘটে থাকবে। আবু তালেবের মৃত্যুর পরেই যে এ সব ঘটনা ঘটেছে, তা সুনিশ্চিত।

হযরত উসমান বিন আফফান বর্ণনা করেন, একবার রসূল সা. পবিত্র কা'বার তওয়াফ করছিলেন। কোরায়েশ সরদার উকবা ইবনে আবু মুয়াইত, আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে

খাল্‌ফ এ সময় হাতীমে কা'বায় বসা ছিল। রসূল সা. যখনই তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা তাঁকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য গালাগাল বর্ষণ করছিল। এভাবে তিনবার হলো। শেষ বার রসূল সা. পরিবর্তিত চেহারা নিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহর আযাব অবিলম্বে তোমাদের ওপর না নামলে তোমরা কিছুতেই ক্ষান্ত হবেনা।' হযরত উসমান বলেন, এ কথাটা বলার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে এমন আতংক উপস্থিত হয় যে, প্রত্যেকে ভয়ে কাঁপতে থাকে। এ কথাটা বলার পর রসূল সা. বাড়ী অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁর সাথে হযরত উসমান এবং অন্যান্যরাও রওনা হন। এই সময় রসূল সা. নিজ সাথীদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী, তাঁর বাণীকে পূর্ণাংগ এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবেন। আর এই লোকগুলোকে অচিরেই আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে যবাই করাবেন।'

লক্ষ্য করুন, দৃশ্যত নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতিতে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। অথচ কত দ্রুত কেমন জাঁকজমকের সাথে তা সত্য প্রমাণিত হলো। ইসলামী আন্দোলন যেন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললো।

তায়েফে ইসলামের দাওয়াত

এ ঘটনাটা ঠিক কোন সময়ে ঘটেছিল, নিশ্চিতভাবে তা বলা কঠিন। কেউ কেউ এটিকে সূরা মুদদাসসিরের নাযিল হবার প্রেক্ষাপট হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ কথা মেনে নিলে ঘটনাটাকে প্রাথমিক যুগে স্থান দিতে হয়। কিন্তু ঘটনার ধরন দেখে মনে হয়, এটা মক্কী যুগের শেষের দিককার ব্যাপার।

একদিন রসূল সা. প্রত্যুষে বাড়ী থেকে বেরুলেন। মক্কার বিভিন্ন অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু পুরো দিনটা অতিবাহিত করেও তিনি সেদিন একজন লোকও এমন পেলেন না, যে তাঁর বক্তব্যে কর্ণপাত করে। সে সময় ইসলামবিরোধীরা যে নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল তা হলো, রসূল সা. কে আসতে দেখলেই সবাই সটকে পড়তো। কারণ তাঁর কথা শুনলেই জটিলতা দেখা দেয়। বিরোধিতা করলে বা তর্কবিতর্ক করলে তার আরো বিস্তার ঘটে। এই কর্মপন্থা বেশ সফল হলো। দু'একজনের সাক্ষাত পেলেও তারা উপহাস অথবা গুণ্ডামির মাধ্যমে জবাব দিল। পুরো দিনটা বিফলে যাওয়ায় তিনি বুকভরা হতাশা ও বিমর্ষতা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। কেউ যখন কোন ব্যক্তির উপকার করতে ও শুভ কামনা করতে এগিয়ে যায়, আর সেই ব্যক্তি ঐ উপকারী ও শুভাকাংখী ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন উপকারী ব্যক্তিটির মন যেমন দুর্বিষহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, রসূল সা. এর মনের অবস্থাটাও ছিল অবিকল তদ্রুপ।

ঐ বিশেষ দিনটার অভিজ্ঞতা থেকে রসূলের সা. মনে এই ধারণা দানা বাঁধে যে, মক্কার মাটি এখন ইসলামের দাওয়াতের জন্য অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে যা কিছু ফসল ফলার সম্ভাবনা ছিল, তা ইতিমধ্যেই ফলেছে। পরবর্তী সময় পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকায় তাঁর এ ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। সম্ভাবনাময় সর্বশেষ মানুষগুলো তখন রসূলের সা. চার পাশে সমবেত হয়ে গেছে। সম্ভবত ঐ দিন থেকেই তাঁর মনে এই

ভাবনা প্রবলতর হতে থাকে যে, এখন মক্কার বাইরে গিয়ে কাজ করা উচিত। আসলে একজন বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ দাওয়াতদাতার এ রকম ভাবটাই স্বাভাবিক। সে যখন নিজের প্রাথমিক কেন্দ্রে এতটা দাওয়াতী কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, যার ফলে সেখানকার কার্যোপযোগী সব লোক দাওয়াত গ্রহণ করে এবং একগুঁয়ে হটকারী লোকেরা ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকেনা, তখন সে আর ঐ জায়গায় পড়ে থেকে শক্তির অপচয় করেনা, বরং নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে এবং পরিবেশ পরিবর্তন করে নতুন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই রসূল সা. মক্কার আশপাশে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তায়েফকে দাওয়াতের নতুন ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। যায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিয়ে একদিন তিনি মক্কা থেকে পায়ে হেটে রওনা হন। পথিমধ্যে যে সব গোত্রের বসতবাড়ী দেখতে পান তাদের সবার কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেন। আসা যাওয়ায় তাঁর প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

তায়েফ ছিল ছায়া সুনিবীড়, সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা, বাগবাগিচা ও ক্ষেতখামারে পরিপূর্ণ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়াযুক্ত একটা স্থান। অধিবাসীরা ছিল খুবই স্বচ্ছল, সুখী এবং অত্যধিক ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশে মত্ত। আর্থিক সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী হলে মানুষ সাধারণত আল্লাহকে ভুলে যায় এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজে নিয়োজিত হয়। তায়েফবাসীর অবস্থা ছিল এ রকমই। মক্কাবাসীর মধ্যে তো তবু ধর্মীয় পৌরহিত্য ও দেশ শাসনের দায়িত্বের কারণে কিছুটা নৈতিক রাখঢাক থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তায়েফবাসী ছিল একেবারেই বেপরোয়া ধরনের। উপরন্তু সুদখোরীর কারণে তাদের মানবতাবোধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এহেন জায়গায় সফরে যাওয়ার অর্থ হলো, রসূল সা. মক্কার চেয়েও খারাপ জায়গায় যাচ্ছিলেন।

বিশ্বমানবের পরম সুহৃদ মুহাম্মদ সা. তায়েফ পৌঁছে সর্বপ্রথম সাকীফ গোত্রের সরদারদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা ছিল তিন ভাই আবদ ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। এদের প্রত্যেকের ঘরে কোরায়েশ বংশোদ্ভুত বনু জামাহ গোত্রের এক একজন স্ত্রী ছিল। সে হিসাবে তিনি আশা করেছিলেন যে, তারা কিছুটা সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে। রসূল সা. তাদের কাছে গিয়ে বসলেন, তাদেরকে সর্বোত্তম ভাষায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, দাওয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করলেন, এবং আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করলেন। কিন্তু এই তিন ব্যক্তি কেমন জবাব দিল দেখুন ঃ

এক ভাই বললো ঃ সত্যি যদি আল্লাহই তোমাকে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি কা'বা ঘরের গেলাফের অবমাননা করতে চান।

দ্বিতীয় ভাই ঃ কী আশ্চর্য! আল্লাহ তাঁর রসূল বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া আর কোন উপযুক্ত লোক পেলেন না!

তৃতীয় ভাই ঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে কথাই বলবো না। কেননা তুমি যদি তোমার দাবী মোতাবেক সত্যি সত্যিই আল্লাহর রসূল হয়ে থাক, তাহলে তোমার মত লোককে জবাব দেয়া ভীষণ বেআদবী হবে। আর যদি তুমি আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ

করে থাক, তাহলে তোমার সাথে কথা বলা যায় এমন যোগ্যতাই তোমার নেই।'
এর প্রতিটি কথা রসূলের সা. বুকে বিষমাখা তীরের মত বিদ্ধ হতে লাগলো। তিনি পরম ধৈর্য সহকারে মর্মঘাতী কথাগুলো শুনলেন এবং তাদের কাছে সর্বক্ষেত্রে অনুরোধ রাখলেন যে, তোমরা তোমাদের এ কথাগুলোকে নিজেদের মধ্যেই সীমিত রাখ এবং জনসাধারণকে এসব কথা বলে উস্কে দিওনা।

কিন্তু তারা ঠিক এর উল্টোটাই করলো। তারা তাদের শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বখাটে তরুণদেরকে, চাকর নফর ও গোলামদেরকে রসূলের পেছনে লেলিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, যাও, এই লোকটাকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এসো।' বখাটে যুবকদের এক বিরাট দল আগে পিছে গালি দিতে দিতে, হৈ চৈ করতে করতে ও পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে চলতে লাগলো। তারা তাঁর হাঁটু লক্ষ্য করে করে পাথর মারতে লাগলো, যাতে তিনি বেশী ব্যথা পান। পাথরের আঘাতে আঘাতে এক একবার তিনি অচল হয়ে বসে পড়ছিলেন। কিন্তু তায়েফের গুণ্ডারা তার বাহু টেনে ধরে দাঁড় করাচ্ছিল এবং পুনরায় হাঁটুতে পাথর মেরে হাতে তালি দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। ক্ষতস্থানগুলো থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছিল। এভাবে জুতোর ভেতর ও বাহির রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। আর এই অপূর্ব তামাশা দেখার জন্য জনতার ভীড় জমে গেল। গুণ্ডারা এভাবে তাকে শহর থেকে বের করে এক আঙ্গুরের বাগানের কাছে নিয়ে এল। বাগানটা ছিল রবিয়ার ছেলে উতবা ও শায়বার। রসূল সা. একেবারে অবসন্ন হয়ে একটা আংগুর গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসলেন। বাগানের মালিক তাঁকে দেখছিল এবং ইতিপূর্বে তাঁর ওপর যে অত্যাচার হচ্ছিল, তাও কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিল।
এখানে দু'রাকাত নামায পড়ে তিনি নিম্নের মর্মস্পর্শী দোয়াটা করলেন ঃ
'হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ জানাই। দরিদ্র ও অক্ষমদের প্রতিপালক তুমিই। তুমিই আমার মালিক। তুমি আমাকে কার কাছে সঁপে দিতে চাইছ? আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, নাকি শত্রুর কাছে? তবে তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না থাক, তাহলে আমি কোন কিছুর পরোয়া করিনে। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা পেলে সেটাই আমার জন্য অধিকতর প্রশস্ত। আমি তোমার কোপানলে অথবা আযাবে পতিত হওয়ার আশংকা থেকে তোমার সেই জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করি, যার কল্যাণে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার সন্তোষ ছাড়া আমি আর কিছু কামনা করিনা। তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে কোন শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।"

ইতিমধ্যে বাগানের মালিক এসে পড়লো। তার অন্তর সমবেদনায় ভরে উঠেছিল। সে তাঁর খৃস্টান গোলাম আদ্দাসকে ডাকলো এবং তাকে দিয়ে একটা পিরিসে করে আঙ্গুর পাঠিয়ে দিল। আদ্দাস আঙ্গুর দিয়ে রসূল সা. এর সামনে বসে পড়লো। রসূল সা. **'বিসমিল্লাহ'** বলে আংগুরের দিকে হাত বাড়াতেই আদ্দাস বললো, 'আল্লাহর কসম, এ ধরনের কথা তো এ শহরের লোকেরা কখনো বলেনা। রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী এবং তোমার ধর্ম কী? সে বললো, আমি খৃস্টান এবং নিনোভার

অধিবাসী। রসূল সা. বললেন, 'তুমি তো দেখছি আল্লাহর সৎ বান্দা ইউনুস বিন মিত্তার শহরের লোক।' আদ্দাস অবাক হয়ে বললো, 'আপনি কিভাবে ইউনুস বিন মিত্তাকে চিনেন?' রসূল সা. বললেন, 'উনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন আর আমিও নবী।' এ কথা শোনা মাত্রই আদ্দাস রসূল সা. এর হাতে ও পায়ে চুমু খেতে লাগলো। রবীয়ার এক ছেলে চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখে মনে মনে চটে গেল। আদ্দাস ফিরে গেলে তাকে সে ভর্ৎসনা করতে লাগলো যে, তুমি ও কী করছিলে? তুমি তো নিজের ধর্ম নষ্ট করে ফেলছিলে।' আদ্দাস গভীর আবেগের সাথে বললো, "হে আমার মনিব, পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নেই। ঐ ব্যক্তি আমাকে এমন একটা কথা বলেছে যা নবী ছাড়া আর কারো জানা সম্ভব নয়।"

আসলে চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর রসূল সা. মক্কায় বাহ্যত একেবারেই সহায়হীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শত্রুদের শক্তি ও প্রতাপ বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। তাই ভেবেছিলেন তায়েফে হয়তো আল্লাহর কিছু বান্দাকে সাথী হিসেবে পাওয়া যাবে। অথচ সেখানেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লো। সেখান থেকে তিনি নাখলায় এসে অবস্থান করলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে হেরা গুহায় উপনীত হলেন। এখান থেকে মুতয়াম বিন আদীকে (বয়কট চুক্তি বাতিলের উদ্যোক্তাদের অন্যতম) বার্তা পাঠালেন যে, "আপনি কি আমাকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় দিতে পারেন?" আরবের জাতীয় চরিত্রের একটা ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট ছিল এই যে, কেউ নিরাপত্তামূলক আশ্রয় চাইলে তা তাকে দেয়া হতো চাই সে শত্রুই হোক না কেন। মুতয়াম রসূল সা. এর অনুরোধ গ্রহণ করলো। সে তার ছেলেদেরকে নির্দেশ দিল, সশস্ত্র অবস্থায় কা'বার চত্তরে ঘোরাফিরা করবে এবং মুহাম্মাদের সা. নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সে নিজে গিয়ে রসূল সা. কে সাথে করে মক্কায় নিয়ে এল এবং উটের ওপর বসে ঘোষণা করলো, আমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশ্রয় দিয়েছি। মুতয়ামের ছেলেরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দিয়ে রসূল সা. কে হারাম শরীফে নিয়ে এল এবং তারপর তাঁর বাড়ীতে পৌছালো।

তায়েফে রসূল সা. এর যে দুরাবস্থা হয়েছিল, ইতিহাসের ভাষা আমাদেরকে তার পূর্ণাংগ বিবরণ দিতে পারেনি। একবার হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে রসূলুল্লাহ, আপনি কি ওহুদের চেয়েও কঠিন দিনের সম্মুখীন কখনো হয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "তোমার জাতি আমাকে আর যত কষ্টই দিয়ে থাকুক, আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিল তায়েফে যেদিন আমি আব্দ ইয়ালীলের কাছে দাওয়াত দিলাম। সে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং এত কষ্ট দিল যে, অতি কষ্টে কারনুস সায়ালেব নামক জায়গায় পৌছে কোন রকমে রক্ষা পেলাম।" (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, প্রথম খণ্ড, ৫৬ পৃঃ)

নির্যাতনের চোটে অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার পর যিনি রসূল সা. কে ঘাড়ে করে শহরের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন, সেই যায়েদ বিন হারেসা ব্যথিত হৃদয়ে বললেন, আপনি এদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। রসূল সা. বললেন, "আমি ওদের বিরুদ্ধে কেন বদদোয়া করবো? ওরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান নাও আনে, তবে আশা করা যায়, তাদের পরবর্তী বংশধর অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে।"

এই সফরকালেই জিবরীল এসে বলেন, পাহাড় সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা আপনার কাছে উপস্থিত। আপনি ইংগিত করলেই তারা ঐ পাহাড় দুটোকে এক সাথে যুক্ত করে দেবে, যার মাঝখানে মক্কা ও তায়েফ অবস্থিত। এতে উভয় শহর পিষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানবতার বন্ধু মহান নবী এতে সম্মত হননি।

এহেন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেই জ্বিনেরা এসে রসূল সা. এর কোরআন তেলাওয়াত শোনে এবং তাঁর সামনে ঈমান আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রসূল সা. কে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষও যদি ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমার সৃষ্ট জগতে এমন বহু জীব আছে, যারা আপনার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

শুভ দিনের পূর্বাভাস

তায়েফের অভিজ্ঞতা এতই মর্মান্তিক ছিল যে, তা অতিক্রম করতে গিয়ে রসূল সা. দুঃখবেদনার শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিলেন। এই সীমায় পৌছার পরই আল্লাহ মানুষের সাফল্যের দ্বার উদঘাটন করেন। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা দৃশ্যত রসূল সা. কে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছিল। আর এর অনিবার্য ফল স্বরূপ তাঁর মর্যাদা আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদেরকে পাঠিয়ে যখনই হক ও বাতিলের সংঘাত লাগিয়েছেন, তখন সে সংঘাতকে একটা সুনির্দিষ্ট বিধির আওতাধীন করে দিয়েছেন। বিধিটা ছিল এই যে, বাতিল যখন সত্যের সৈনিকদের ওপর যুলুম নির্যাতন ও বলপ্রয়োগের শেষ সীমায় পৌছে যায়, নির্যাতিত মোজাহেদরা যুলুম নিপীড়নের সব ক'টা স্তর একে একে চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পার হয়ে যায় এবং সর্বশেষ প্রাণান্তকর সময়টাও অতিক্রম করে, কেবল তখনই আল্লাহর গায়েবী সাহায্যের সময় সমাগত হয়। জান্নাতমুখী পথগুলো কাঁটায় পরিপূর্ণ। এই পথে যারা চলে, তাদের সাফল্যের সুসংবাদ কখন আসে, সে কথা কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"তাদের ওপর বিপদ মুসিবত ও দুর্যোগাদি এলো এবং তারা একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়লো। এমনকি রসূল এবং তাঁর সহচর মুমিনরা বলে উঠলো, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? (এ পর্যায়ে পৌছার পর তাদের সুসংবাদ দেয়া হয় যে) শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য নিকটে।" (বাকারা ঃ ২১৪)

তায়েফের অভিজ্ঞতার পর রসূল সা. যেন এই সর্বশেষ পরীক্ষা অতিক্রম করলেন। আল্লাহর বিধান অনুসারেই এখন নতুন যুগের সূচনা অবধারিত ছিল এবং এ সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল। এই সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যেই রসূল সা. কে মে'রাজ দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

আসলে মে'রাজের তাৎপর্য হলো, রসূল সা. কে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা হয়। যে বিশ্ব সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রসূল সা. বেশ কয়েকটা বছর নানা রকমের দুঃখকষ্ট ও বিপদ মুসিবত ভোগ করলেন এবং বিভিন্ন অপশক্তির সাথে আদর্শিক ও চিন্তাগত যুদ্ধ করে কাটিয়ে দিলেন, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর দূতকে নিজের সর্বোত্তম উপাধিতে ভূষিত করার জন্য আপন দরবারে ডেকে পাঠান। যে বীর সেনানী জীবন ও জগত সংক্রান্ত মৌলিক সত্যগুলোকে মেনে নিতে স্বজাতিকে

উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রামে নেমে চারদিক থেকে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেছেন, মে'রাজের মাধ্যমে তাকে সুযোগ দেয়া হয় যেন, ঐ সত্যগুলোকে নিকট থেকে দেখে আসতে পারেন। বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের সর্বাত্মক চেষ্টায় নিয়োজিত শেষ নবীকে এক বিরল সৌভাগ্যে ভূষিত করা হয় যেন, তিনি এই আন্দোলনের এক বিরাট ও সুপ্রাচীন কেন্দ্রে (বাইতুল মাকদাস) উপস্থিত হয়ে অতঃপর সেখান থেকে উর্ধ জগতে উড্ডয়ন করে এই আন্দোলনের সাবেক নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হতে পারেন।
পূর্বতন নবীগণকে অদৃশ্য সত্যগুলোকে দর্শন ও আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে উপনীত হবার মাধ্যমে বিশেষ অনুগ্রহ লাভের সুযোগ দেয়া হতো। কোরআনে একদিকে যেমন হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁকে ...... আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য পরিদর্শন করানো হয়েছিল। অপরদিকে তেমনি হযরত মূসা আ. কে তূর পর্বতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ তায়ালা একটা আলোকময় গাছের আড়াল থেকে..... 'আমি আল্লাহ' বলে ঘোষণা দিয়ে তাঁর সাথে কথোপকথন করেন। অন্য এক সময় এরূপ ঘনিষ্ঠ পরিবেশই তাঁকে শরীয়তের বিধান প্রদান করা হয়। মোটকথা, সকল বড় বড় নবী কোন না কোন পন্থায় মে'রাজের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তবে রসূল সা. এর মে'রাজ ছিল পূর্ণাংগ।
তায়েফ ও হিজরতের ঘটনার মাঝখানে মে'রাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্টমণ্ডিত আর কোন ঘটনা ঘটেনি। এ ঘটনার খবর যখন তিনি জানালেন, তখন মক্কায় হৈ চৈ পড়ে গেল। তিনি ঐ রাতে কোথায় কোথায় কী কী দেখেছেন সব খোলাখুলি বর্ণনা করলেন। বাইতুল মাকদাসের আকৃতির পুরো ছবি তুলে ধরলেন। পথিমধ্যকার এমন সব সুনিশ্চিত আলামতও বর্ণনা করলেন যা পরে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়।
ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানের এই সৌভাগ্যময় মুহূর্তে যে বিশষ ওহি নাযিল করা হলো, সেটাই সূরা বনী ইসরাইলের আকারে আমাদের কাছে বিদ্যমান। ঐ সূরা শুরুই হয়েছে মে'রাজের ঘটনা দিয়ে। আর গোটা সূরাই মে'রাজের প্রেরণায় সিক্ত। ঐ সূরার নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ঃ

১- বনী ইসরাইলের শিক্ষাপ্রদ ইতিবৃত্ত সামনে রেখে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর আইন বড় বড় শক্তিধর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে পর্যন্ত জবাবদিহীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এবং তারা বিপথগামী হলে তাদেরকে অন্য কোন অনুগত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দিয়ে পিটিয়ে দেয়া হয়। অপর দিকে এ কথাও শেখানো হয়েছে যে, বিজয় ও সফলতার যুগে পৌঁছে তারাও যেন বনী ইসরাইলের মত আচরণ শুরু করে না দেয়।

২- চরম প্রতিকূল পরিবেশে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা হয়, সত্য সমাগত, বাতিল পরাভূত (আয়াত-৮৯) অর্থাৎ অন্ধকার তখন দূরীভূত হবে এবং প্রভাতের আবির্ভাব ঘটবে।

৩- আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ কথাও জানিয়ে দেন যে, মক্কাবাসী এবার আপনাকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেবে। কিন্তু আপনাকে বহিষ্কার করার পর বেশী দিন শান্তিতে থাকতে পারবেনা। (আয়াত-৭৬) হিজরতের যে দোয়া আল্লাহ শেখালেন তার ভাষা ছিল এ রকম ঃ "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সত্যের দরজা দিয়ে প্রবেশ করান এবং সত্যের দরজা দিয়েই (বর্তমান পরিবেশ থেকে) বের করুন, আর আমাকে আপনার

পক্ষ থেকে সাহায্য হিসাবে শাসন ক্ষমতা দান করুন।" -(আয়াত-৮০) এ দোয়ায় শাসন ক্ষমতার প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকারন্তরে সুসংবাদ দেয়া হলো যে, হিজরতের পরবর্তী সময়টা আধিপত্য ও শাসনের যুগ হবে।

৪- ২২ থেকে ২৯ নং আয়াতে একাধারে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাথমিক মূলনীতি সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে ঐ মূলনীতি সমূহের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ও নতুন সভ্যতা গড়ে তোলা হয়।

মে'রাজের প্রাক্কালীন ওহির এই বক্তব্য সমূহ বক্ষে ধারণ করে যখন রসূল সা. ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন, তখন সম্ভবতঃ আকাশ থেকে আলোর এক বিরাট স্রোতধারা নেমে আসতে দেখতেন। মক্কার এই ভীতিময় পরিবেশে যদি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন বস্তুবাদী নেতা থাকতো, তাহলে সে হয়তো হতাশ হয়ে নিজের সমস্ত কর্মসূচী ও তৎপরতা বন্ধ করে দিত। কিন্তু রসূল সা. চরম প্রতিকূল ও হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতেন যে, প্রভাত আসছে। এই প্রভাত সমীরণের একটা ঝাপটা এসে যেন রসূলের সা. কানে কানে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, নতুন প্রভাতের সূর্যোদয় আর কোথাও নয় মদিনায়ই ঘটবে। কেননা ওখানকার তরুণরা পরম পরিতৃপ্তি ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামী আন্দোলনে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করেছিল।

মক্কী জীবনের অবসান কালে রসূল সা. তায়েফকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন যে, তুমি কি সত্যের মশাল বহন করতে পারবে? তায়েফ জবাব দিল, আমি তো এ কাজে মক্কার চেয়েও অযোগ্য। এই হতাশাব্যঞ্জক জবাব শুনে রসূল সা. যখন পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করার চিন্তায় মগ্ন, তখন ইয়াসরিব বললো, 'আমি মদিনাতুন নবী (নবীর শহর) হতে প্রস্তুত। আমি সত্যের মশাল উঁচু করবো এবং সারা দুনিয়াকে আলোকিত করবো। আমার বুকের ওপর সত্য ও ন্যায়ের বিধান লালিত হবে। আমার কোলে এক নতুন ইতিহাস বিকাশ লাভ করবে।' তায়েফ নিকটে থেকেও দূরে সরে গেল। ইয়াসরিব দূরে থেকেও নিকটে এসে গেল।

নবুয়তের একাদশ বছর ইয়াসরিব থেকে আগত ৬ জন বিপ্লবী যেদিন রসূল সা. এর সাথে অংগীকারে আবদ্ধ হলো, সেদিন ইয়াসরিব আরো নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পর তারা ইসলামের তাওহীদ ও নৈতিক বিধিবিধান মেনে চলার যে শপথ গ্রহণ করেন, তাকেই বলা হয় আকাবার প্রথম বয়াত। এরপর হজ্জের সময় আরো একটা বড় দল মদিনা থেকে আসে। তারাও রাতের অন্ধকারে এক গোপন বৈঠকে আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াত সম্পন্ন করেন। এটি ছিলো পুরোপুরি রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত চুক্তি। এতে রসূল সা. এর হিজরত করে মদিনায় চলে যাওয়া স্থির হয় এবং এমন সর্বাত্মক ত্যাগের মনোভাব প্রতিফলিত হয় যে, মদিনার আনসারগণ রসূল সা. এর জন্য সমগ্র দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত থাকার কথা ঘোষণা করেন।

তায়েফ সফর ও হিজরতের মধ্যবর্তী সময়টাতেই সম্ভবত সূরা ইউসুফ নাযিল হয়েছিল। এ সূরায় অন্য একজন নবী হযরত ইউসুফের জীবন কাহিনী বর্ণনা করে রসূল সা. কে সুসংবাদ দেয়া হয় এবং তাঁর শত্রুদেরকে তাদের অমানুষিক নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সাবধান করে তাদের শোচনীয় পরিণতি জানিয়ে দেয়া হয়।

বিদায়, হে মক্কা!

অস্থিতিশীল নিমজ্জমান সমাজ ব্যবস্থার শেষ অস্ত্র হয়ে থাকে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন নিপীড়ন। এতেও যদি প্রতিপক্ষকে দমন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সংস্কার বিরোধীরা বিপ্লবী আন্দোলনের মূল নায়ককে হত্যা করতে কৃত সংকল্প হয়। মক্কাবাসীতো আগে থেকেই আক্রোশে অধীর ছিল এবং তাঁকে খতম করে দিতেই উৎসুক ছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। এবার চরম মহূর্ত উপস্থিত। দ্বন্দ্ব সংঘাত একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। একটা হেস্তনেস্ত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছাঁটাই বাছাই হয়ে পরস্পর থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে গেছে। আকীদা বিশ্বাস ও মনমানসিকতার দিক দিয়ে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত হয়ে গেছে। এক পক্ষ এই সীমারেখার ওপারে রয়ে গেছে, আর পক্ষ এপারে। কোন পক্ষেরই আর ঐ সীমারেখা অতিক্রম করার সুযোগ নেই। ইসলামী আন্দোলন এখন একটা সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ শক্তি। এর দলীয় শৃংখলা অটুট এবং চারিত্রিক মান অত্যন্ত উন্নত। এর যুক্তি খুবই ধারালো এবং আবেদন অসাধারণ রকমের চিত্তাকর্ষক। এর নেতা ও কর্মীদের ওপর পরিচালিত যুলুম নিপীড়ন জনগণের হৃদয় জয় করার ক্ষমতা রাখে। সত্যের ক্ষুদ্র চারাগাছটা পরিণত হয়েছে বিশাল মহীরূহে। জাহেলী সমাজের কর্ণধারদের কাছে কালও যে আশংকা ছিল নিছক আনুমানিক, আজ তা বাস্তব। উদ্ভূত উপস্থিতি তাদের কাছে দাবী জানাচ্ছিল যে, এই আশংকাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা যদি তোমাদের থেকে থাকে, তবে প্রতিহত কর। অন্যথায়, নবাগত যুগের যে আলোর সয়লাব আসছে, তাতে তোমাদের ধর্ম, পদ পদবী, জাহেলী ঐতিহ্য-সব কিছুই ভেসে যাবে। তারপর তোমাদের উদ্ধত মস্তককে নোয়াতে হবে মুহাম্মদ ও তাঁর আদর্শের সামনে। জাহেলিয়াতের নেতারা ইতিহাসের এ চ্যালেঞ্জ শুনতে পাচ্ছিলো এবং ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত হচ্ছিলো। তাই এই পর্যায়ে উপনীত হয়ে রসূল সা. এর রক্তপিপাসু দুশমনেরা তাঁর বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর চক্রান্তের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়।

ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের জন্য যে মক্কা জ্বলন্ত চুলোর রূপ ধারণ করেছিল তা এমনিতেও উত্তাপের সর্বোচ্চ মাত্রায় উপনীত হয়েছিল। নির্যাতন ও নিপীড়ন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কোরায়েশ নরপশুরা তাদের যুলুমের ষ্টীম রোলার চালিয়ে সত্যের নিশানাবাহীদের জীবন দুর্বিষহ করে এবং তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গিয়েছিল। এর স্পষ্ট অর্থ ছিল এই যে, এ পরিস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসন্ন, কোন মুক্তির পথ বেরিয়ে আসা অবধারিত এবং ইতিহাসে কোন নতুন অধ্যায় সংযোজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কোরায়েশ তাদের জন্য এক বিরাট সৌভাগ্যের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। তারা নিজেদেরকে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হবার অযোগ্য প্রমাণ করেছিল। এহেন মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে মে'রাজের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন রসূল সা. উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দিলেন, আভাসে ইংগিতে হিজরতের পথ উন্মুক্ত হওয়ার ও তারপর ক্ষমতার যুগ শুরু হওয়ার আশ্বাস দিলেন, তখন মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হলো। যারা সহিংসতার শীকার হয়েছিল, তারা সান্ত্বনা পেল এবং তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। তারপর যখন রসূল সা. সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসতে দেখলেন, তখন

তার আবেগ ও অনুভূতি তুংগে উঠলো। তিনি গায়েবী সূত্র থেকে বুঝতে পারলেন যে, ভবিষ্যতের সেই হিজরতের স্থান হবে মদিনা। একদিকে পরিস্থিতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য, বিশেষতঃ আকাবার বায়য়াতের দুটো ঘটনা, অপর দিকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত তথ্য থেকে এটা জানা যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে রসূল সা. তাঁর সাথীদের মদিনা চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং সাহাবীগণ একের পর এক চলে যেতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে অনেকেই চলে গেল। মহল্লার পর মহল্লা খালি হয়ে গেল। একবার আবু জাহল অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কোরায়েশ নেতা বনু জাহশ গোত্রের শূন্য বাড়ীঘর দেখে মন্তব্য করলোঃ

'এটা আমাদের ভাতিজার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কীর্তি। সে আমাদের ঐক্য ভেঙ্গে দিয়েছে। আমাদের সমাজকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভাংগন লাগিয়ে দিয়েছে।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪)

সাথীদেরকে মদিনা পাঠানো সত্ত্বেও রসূল সা. নিজ দাওয়াতের কেন্দ্রভূমি ত্যাগ করেননি। তিনি আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। কোরায়েশরা আটক করে রেখেছিলেন কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল, এমন স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলমানই আর মক্কায় অবশিষ্ট ছিল না। তবে ঘনিষ্ঠ সাথীদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত আলী তখনো মক্কায় ছিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে যখন কোরায়েশরা বুঝতে পারলো যে, মুসলমানরা যখন একটা ঠিকানা পেয়ে গেছে এবং এক এক করে সবাই চলে গেছে, তখন মুহাম্মাদ সা. অচিরেই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এরপর আমাদের আওতার বাইরে গিয়ে শক্তি অর্জন করবে এবং অতীতের সব কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তখন তারা সবাই মক্কার গণ মিলনস্থল 'দারুননাদওয়া'তে সমবেত হলো এবং সলাপরামর্শ করতে লাগলো, মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এখন কী পদক্ষেপ নেয়া যায়। একটা প্রস্তাব এল, তাঁকে কোন লোহার তৈরী হাজতখানায় আটক করা হোক এবং দরজা বন্ধ করে রাখা হোক। এতে আপত্তি তোলা হলো যে, সে এমন এক ব্যক্তি, যার কথা বন্ধ লোহার ঘর থেকেও বাইরে চলে যাবে, আর তার সাথীরা শক্তি অর্জন করলে তাঁকে বের করে নিয়ে যাবে। অন্য কোন উপায় খুঁজতে হবে। মজলিসের জনৈক সদস্য প্রস্তাব দিল, তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হোক। তারপর তার কী পরিণতি হয় তা দিয়ে আমাদের কী কাজ। কিন্তু এ প্রস্তাবেও আপত্তি উঠলো। অনেকে বললো, তোমরা কি তার চিত্তাকর্ষক কথাবার্তার খবর রাখ না? সে কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তা কি তোমরা জাননা? এ সব জিনিসই তো তার জনমনে এত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণ। এ পদক্ষেপ নিলে তার কবল থেকে তোমরা রেহাই পাবনা। সে আরবদের ওপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে এবং নিজের বাগ্মীতার জোরে তাদেরকে স্বমতে দীক্ষিত করে ফেলবে। তারপর সমগ্র আরব জনগণকে সাথে নিয়ে তোমাদের ওপর হামলা চালাবে, ক্ষমতার বাগডোর তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদের সাথে যেমন খুশী আচরণ করবে। এবার ধুরন্ধর আবু জাহল এক সুচতুর কৌশল উদ্ভাবন করলো। সে বললো, মক্কার প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী ও প্রতাপশালী যুবককে বেছে নিয়ে তাদের সবাইকে তলোয়ার দিতে হবে এবং তারা সবাই একযোগে আক্রমণ চালিয়ে

মুহাম্মাদকে সা. হত্যা করবে। এভাবেই আমরা তার খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে পারি। এতে মুহাম্মাদের খুনের দায়দায়িত্ব ও রক্তপণ সকল গোত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। বনু হাশেম গোত্র একাকী এত সব গোত্রের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবে না এবং সে সাহসও করবেনা। ব্যাস, এই কৌশলটাই সবার মনোপুত হয়ে গেল এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠক সমাপ্ত হলো। এই বৈঠকের সম্পর্কে কোরআন নিম্নরূপ পর্যালোচনা করেছে ঃ

"আর সেই সময়টার কথা স্মরণ কর, যখন কাফেররা তোমাকে বন্দী করা, হত্যা করা অথবা বহিষ্কার করার ফন্দি আঁটছিল। তারা তাদের পছন্দমত চক্রান্ত আটে, আর আল্লাহ পাল্টা পরিকল্পনা করেন। আল্লাহ সবার চেয়ে দক্ষ পরিকল্পনাকারী।" (সূরা আনফাল-৩০)

রহস্যঘেরা সেই কালোরাত সামনে। দুপুর বেলা রসূল সা. তাঁর প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠতম সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে গোপনে জানালেন, হিজরতের অনুমতি পেয়ে গেছি। হযরত আবু বকর রা. তাঁর সহযাত্রী হবার অনুমতি চাইলেন। এ অনুমতি তিনি চাওয়ার আগেই পেয়েছিলেন। এ সৌভাগ্য লাভের জন্য আনন্দের আতিশয্যে হযরত আবু বকরের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি হিজরতের জন্য আগে থেকেই দুটো উটনীকে ভালোভাবে খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা করে রেখেছিলেন। ঐ উটনী দুটো দেখিয়ে তিনি রসূল সা. কে বললেন, এই দুটোর যেটা আপনার ভালো লাগে, হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করুন। কিন্তু রসূল সা. অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে 'জাদয়া' নামক উটনীটাকে মূল্য দিয়ে কিনে নিলেন। রাত হলে রসূল সা. আল্লাহর ইংগিতক্রমে নিজের ঘরে ঘুমালেন না। তাঁর অপর প্রিয়তম সাথী হযরত আলীকে আপন বিছানায় নির্ভয়ে ঘুমানোর নির্দেশে দিলেন। সেই সাথে লোকজনের রক্ষিত আমানতগুলো তাঁর কাছে অর্পণ করলেন এবং সকাল বেলা সংশ্লিষ্ট মালিকদের কাছে ফেরত দিতে বললেন। এত উঁচু মানের নৈতিকতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কটাই বা আছে যে, এক পক্ষ যাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে, সে স্বয়ং হত্যাকারীদের আমানত ফেরত দেয়ার চিন্তায় বিভোর? এর পর রসূল সা. হযরত আবু বকর সিদ্দীকের বাড়ীতে চলে গেলেন। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর দ্রুত নিজের কোমরের বেল্ট কেটে দুটো বানালেন এবং একটি দিয়ে খাবারের পুটুলি ও অপরটা দিয়ে পানির মসকের মুখ বাঁধলেন। সত্যের পথের এই দুই অভিযাত্রী রাতের আধারে রওনা হয়ে গেলেন।

আজ বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় উপকারী ও শুভাকাংখী বন্ধুর সা. একেবারেই বিনা অপরাধে আপন ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত হবার দিন। আজ তিনি সেই সব অলিগলিকে বিদায় জানাতে জানাতে যাত্রা করছেন, যেখানে চলাফেরা করে তিনি বড় হয়েছেন, যার ওপর দিয়ে তিনি সত্যের বাণী সমুন্নত করতে হাজার হাজার বার দাওয়াতী সফর করেছেন, যেখানে তিনি অসংখ্য গালাগাল খেয়েছেন এবং নির্যাতন সয়েছেন। আজ তাঁর হারাম শরীফের পবিত্র আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থেকে বিদায় নেয়ার পালা, যেখানে তিনি বহুবার সিজদা করেছেন, বহুবার আপন জাতির কল্যাণ ও সুখশান্তির জন্য দোয়া করেছেন, বহুবার কোরআন পড়েছেন, বহুবার এই চত্তরে ও নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত এই একমাত্র আশ্রয়স্থলেও বিরোধীদের হাতে নিপীড়িত হয়েছেন এবং মর্মঘাতী বোলচাল শুনেছেন। যে

শহরে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এর পবিত্র স্মৃতি ও কীর্তি রক্ষিত এবং যে শহরের আকাশ বাতাস আজও তাঁর দোয়ায় মুখরিত, সেই শহরকে আজ তার শেষ সালাম নিবেদন করতে যাচ্ছেন।

এটা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কলিজা যে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, চোখে যে অশ্রুর বান ডেকেছে, সেতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও জীবনের লক্ষ্য অর্জনে যেহেতু এ কুরবানীর প্রয়োজন ছিল, তাই শ্রেষ্ঠ মানব এ কুরবানীও দিতে দ্বিধা করলেন না।

আজ মক্কার দেহ থেকে যেন তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। মক্কার বাগানের ফুল থেকে যেন সুগন্ধী হারিয়ে গেছে। এর ঝর্ণা যেন শুকিয়ে গেছে। কারণ তার সমাজের ভেতর থেকে নীতিবান ও চরিত্রবান লোকগুলো বেরিয়ে গেছে।

সত্যের দাওয়াতের চারা গাছটি মক্কার মাটিতেই জন্মেছিল। কিন্তু তার ফল আহরণ করার সৌভাগ্য মক্কাবাসীর কপালে জোটেনি। এ সৌভাগ্য অর্জন করলো মদিনাবাসী এবং সারা দুনিয়ার অধিবাসীরা। মক্কাবাসীকে আজ ধাক্কা দিয়ে পেছনে হটিয়ে দেয়া হলো এবং মদিনাবাসীর জন্য সামনের কাতারে জায়গা বানানো হলো। যারা নিজেদেরকে বড় মনে করতো, অভিজাত ও কুলীন মনে করতো, তাদেরকে নিম্নতর স্তরে নামিয়ে দেয়া হলো। আর যাদেরকে অপেক্ষাকৃত নীচ মনে করা হতো, তাদের জন্যই আজকের দিনে বরাদ্দ হলো উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর স্থান।

রসূল সা. শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মক্কাকে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম, তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভূখন্ড। আমাকে এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতামনা।" (তিরমিযী)

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সূর পর্বত গুহায় উপনীত হলেন।

কোন্ পথ ধরে যেতে হবে, সেটা স্বয়ং রসূল সা. নির্ধারণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আরিকতকে নির্দিষ্ট মজুরীর ভিত্তিতে পথ প্রদর্শক নিয়োগও তিনিই করলেন। তিনি তিন দিন গুহায় কাটালেন। হযরত আবু বকরের ছেলে আব্দুল্লাহ রাতে মক্কার সমস্ত সংবাদ পৌঁছাতেন। আমের বিন ফুহাইরা (হযরত আবু বকরের ক্রীতদাস) মেষপাল নিয়ে সারাদিন গুহার আশপাশ দিয়ে চরিয়ে বেড়াতো, আর অন্ধকার হলে গুহার কাছে নিয়ে যেত, যাতে হযরত আবু বকর ও রসূল সা. প্রয়োজনীয় দুধ নিতে পারেন।

এদিকে কোরায়েশরা সারা রাত রসূল সা. এর বাড়ী ঘেরাও করে রাখলো। তাছাড়া পুরো শহরের চতুঃসীমানাও বন্ধ করে রাখা হলো। কিন্তু সহসা যখন তারা জানতে পারলো যে, সেই ইপ্সিত ব্যক্তিটাই হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। রসূল সা. এর বিছানায় আলীকে দেখে তারা গভীর হতাশায় ভেংগে পড়লো এবং তাকে অনেক বকাবকি করে গায়ের ঝাল মিটিয়ে চলে গেল। চারদিকে তালাশ করতে লোক পাঠানো হলো। কিন্তু কোন হদিসই মিললোনা। একটা দল অনেক দৌড়ঝাপ করে সূর পর্বতগুহার ঠিক মুখের ওপর এসে পড়লো। ভেতর থেকে তাদের পা পর্যন্ত দেখা

যেতে লাগলো। কী সাংঘাতিক নাজুক মুহূর্ত ছিল সেটি, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হযরত আবু বকর এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন যে, এই লোকগুলো গুহায় ঢুকে পড়লে গোটা ইসলামী আন্দোলন হুমকীর সম্মুখীন হবে। এরূপ মুহূর্তে সাধক মানবীয় স্বভাবপ্রকৃতির অধিকারী কোন মানুষের ভেতর যে ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার কথা, হযরত আবু বকরের মধ্যে সে ধরনেরই অনুভূতি জন্মেছিল। কিন্তু যেহেতু রসূল সা. কে আল্লাহর কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়া ছিল, এবং তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, তাই তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদে রাখবেন। তথাপি হযরত মূসার কাছে যেমন ওহি যোগে 'ভয় পেয়না' - এই আশ্বাসবাণীটা এসেছিল, তেমনি রসূল সা. এর কাছেও এল। তিনি সাথী আবু বকরকে বললেন "তুমি চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" তাই দেখা গেল, যারা গর্তের মুখের কাছে এসেছিল, তারা এখান থেকেই ফিরে গেল।

তিন দিন গুহার মধ্যে অবস্থান করার পর রসূল সা. হযরত আবু বকর ও পথ প্রদর্শক আমের বিন ফুহাইরাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কোরায়েশের গোয়েন্দারা যাতে তাদের পিছু নিতে না পারে, সে জন্য সাধারণ চলাচলের পথ বাদ দিয়ে সমুদ্রোপকূলের দীর্ঘ পথ অবলম্বন করা হয়। এদিকে মক্কায় ঘোষণা করা হয় যে, মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর - এই দু'জনের যে কোন একজনকেও কেউ যদি হত্যা অথবা গ্রেফতার করতে পারে, তবে তাকে শত শত উট পুরস্কার দেয়া হবে। অনেকেই খোঁজাখুঁজিতে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। সুরাকা বিন জা'সাম খবর পেল যে, এ ধরনের দু'জনকে উপকূলীয় সড়কে দেখা গেছে। সে একটা বর্শা হাতে ঘোড়া হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল। কাছাকাছি এসেই সুরাকা যখন ত্বরিত গতিতে ধাওয়া করলো, অমনি তার ঘোড়ার সামনের দু'পা মাটিতে দেবে গেল। সুরাকা দু'তিনবার ব্যর্থ চেষ্টা চালানোর পর ক্ষমা চাইল এবং একটা লিখিত নিরাপত্তানামাও চাইল। এর অর্থ দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করলো যে, এই ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে একটা নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। নিরাপত্তানামা লিখে দেয়া হলো। সেই নিরাপত্তানামা মক্কা বিজয়ের দিন কাজে লাগলো। এই সময় রসূল সা. সুরাকাকে এই বলে সুসংবাদও দিলেন যে, হে সুরাকা, তুমি যেদিন ইরান সম্রাটের কংকন পরবে, সেদিন তোমার কেমন মর্যাদা হবে দেখ।' হযরত ওমরের খেলাফত যুগে ইরান জয়ের সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। এই সময় হযরত যোবায়ের ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি রসূল সা. ও আবুবকরের সাথে মিলিত হন এবং উভয়কে সাদা পোশাক হাদিয়া দেন।

এই সফর কালে বারীদা আসলামীও ৭০ জন সাথী সমেত তাঁদের সাথে সাক্ষাত করেন। মূলত তারা পুরস্কারের লোভে বেরিয়ে ছিলেন। কিন্তু সামনে আসামাত্রই বারীদার মধ্যে পরিবর্তন এল। পরিচয় গ্রহণের সময়ই যখন রসূল সা. তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, "তোমার অংশ নির্ধারিত হয়ে গেছে" (অর্থাৎ তুমিও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অবদান রাখবে এটা নির্ধারিত হয়ে গেছে)। তখন বারিদা তাঁর সত্তর জন সাথীসহ ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর বারিদা বললো, 'রসূল সা. মদীনায় প্রবেশকালে তাঁর সামনে একটা পতাকা থাকা উচিত।' রসূল সা. সম্মতি দিলেন এবং নিজের পাগড়ি বর্শার মাথায় বেঁধে

বারিদার হাতে সমর্পণ করলেন। এই পতাকা উড়িয়ে এই কাফেলা মদিনায় প্রবেশ করলো।

০ ০ ০ ০

"অবশ্য অবশ্য তোমাদেরকে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। আর আহলে কিতাব ও মোশরেক - উভয় গোষ্ঠীর কাছ থেকে তোমাদের অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে। এ সব পরীক্ষায় তোমরা অবিচল থাকতে পারলে এবং (নোংরামি থেকে) সংযত থাকলে নিসন্দেহে সেটা হবে সাহসিকতাপূর্ণ কীর্তি।" (আল ইমরান, ১৮৬)

০ ০ ০

'কোন নবীর প্রতি তাঁর আত্মীয় স্বজনের যতটা অসদাচারী হওয়া সম্ভব, তোমরা ততটাই অসদাচারী ছিলে। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করলে আর অন্যরা আমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিল। তোমরা আমাকে মাতৃভূতি থেকে বহিষ্কার করলে, আর অন্যরা আমাকে নিজেদের কাছে ঠাই দিল। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে। আর অন্যরা আমার সহযোগিতা করলো।"

- বদরের ময়দানে মোশরেকদের লাশকে সম্বোধন করে দেয়া রসূল সা. এর ভাষণ।

৪

❊

ইতিহাসের পট পরিবর্তন

❊

"অতি প্রত্যুষে উম্মে আহমদ আমাকে দেখলো, আমি যে ব্যক্তিকে না দেখেও ভয় পাই, তার হেফাযতে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন সে বলতে লাগলো, তোমার যদি চলে যেতেই হয় তবে ইয়াসরিবে যেয়োনা, আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

আমি তাকে জবাব দিলাম, এখন ইয়াসবিরই আমাদের গন্তব্য স্থল। দয়াময় আল্লাহ যেদিকেই বান্দাকে নিতে চান, বান্দা সেদিকেই রওনা হয়।

কত যে প্রিয় সাথী ও শুভাকাংখীকে আমরা পেছনে ছেড়ে এসেছি এবং কত যে বেদনা ভারাক্রান্ত মহিলাকে অশ্রু বিসর্জন দিতে দেখে এসেছি, তার ইয়ত্তা নেই।

তুমি তো ভাবছ, আমাদেরকে যারা বহিস্কার করেছে, তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছি। অথচ আমাদের অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে।

এক পক্ষ আমরা, আর অপর পক্ষ হলো আমাদের সেই সব বন্ধু, যারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে গেছে এবং আমাদের ওপর নির্যাতনের অস্ত্র প্রয়োগ করে হাংগামা বাধিয়েছে।

এই দুটো বিবদমান পক্ষের একটা সত্যের পতাকা ওড়াবার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। আর অপর পক্ষ আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যদিও তারা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, কিন্তু (আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য ভিত্তিক) আন্তরিক সম্পর্ক যেখানে থাকেনা, সেখানে কেবল রক্ত সম্পর্ক অচল।

এমন একদিন আসবে, যেদিন তোমাদের ঐক্য ভেংগে খান খান হয়ে যাবে। তোমাদের সামষ্টিক অস্তিত্ব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তখন তুমি ভালোভাবেই জানবে, আমাদের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে কারা সত্যের পথে রয়েছে।"

(আবু আহমাদ বিন জাহাশের হিজরত সংক্রান্ত কবিতার সার সংক্ষেপ)

মানবতার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইতিহাস স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের মক্কী যুগটা দাওয়াত ও আদর্শ প্রচারের যুগ। আর মাদানী যুগ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের যুগ। মক্কায় লোক তৈরী করা হয়েছে।

আর মদিনায় সামষ্টিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মক্কায় মালমশলা তৈরী করা হয়েছে। আর মদিনায় ভবন নির্মিত হয়েছে।

এই পার্থক্যের কারণে কোরআন, নবী জীবন ও ইসলামের ইতিহাসকে স্থূল দৃষ্টিতে অধ্যয়নকারী সাধারণ মানুষের ধারণা হলো, ইসলামী আন্দোলন ও তার আহ্বায়কের ওপর পরীক্ষার কঠিন সময় কেবল মক্কায়ই কেটেছে। মদিনায় বিরোধিতার তেমন তীব্রতা ও উগ্রতা ছিলনা এবং সেখানে তেমন সার্বক্ষণিক নির্যাতনের দুর্বিষহ পরিবেশ ছিলনা, যেমন ছিল মক্কায়। অন্তত পক্ষে এরূপ মনে করা হয় যে, বিরোধিতা ও শত্রুতা মাদানী যুগে নগ্ন তরবারীর রূপ ধারণ করে যুদ্ধের ময়দানে চলে এসেছিল। শত্রুদের পক্ষ থেকে হীন ও ইতরসুলভ আচরণের যুগটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। এ কথা সত্য যে, মাদানী যুগে প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী কোরায়েশ উন্মুক্ত যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায়না যে, ইসলামী আন্দোলন আগের চেয়ে জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার নতুন নতুন শত্রু সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ সব নতুন শত্রু অপকর্মে মক্কাবাসীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলনা। তাদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উত্যক্ত ও বিব্রত করেছে এবং পুনর্জাগরণের কাজে বাধা দিতে কোন অপচেষ্টাই বাদ রাখেনি।

ইতিহাসের একটা চিরাচরিত নিয়ম হলো, সংস্কার সংশোধন ও পুনর্জাগরণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, সংস্কার বিরোধী ও কর্মবিমুখ গোষ্ঠীগুলো তাকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করার জন্য শত্রুতার আবেগে ততই হন্যে হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত যখন তা নির্যাতনের ফাঁসি কাষ্ঠ থেকে উদ্ধার পেয়ে এক লাফে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয় তখন বাতিলের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। মদিনায় নতুন ইসলামী সমাজ ও শান্তিপূর্ণ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছিল।

মদিনার ভিন্নতর পরিবেশ

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা যে, মদিনার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ছিল মক্কা থেকে একেবারেই ভিন্নতর। এ কারণে ইসলামের যে চারা গাছ মক্কায় চরম প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠতেই পারছিলনা, মদিনায় এনে লাগানো মাত্রই তা দ্রুত পত্র পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠলো ও ফল দিতে শুরু করলো।

প্রথম পার্থক্যটা ছিলো এইযে, মক্কা ও তার আশ পাশের গোটা জনবসতি পরস্পরে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তারা ছিলো একই ধর্মাবলম্বী গোত্র ও পারস্পরিক চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের ওপর কোরায়েশদের ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য। কিন্তু মদিনা ও তার আশপাশে দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জনগোষ্ঠী বাস করতো এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

মদীনা ছিল ইহুদীদের প্রতিষ্ঠিত 'ইয়াসরিব নামক প্রাচীন শহর। এখানে তাদের ক্রমান্বয়ে বংশ বিস্তার ঘটতে থাকায় মদিনার আশপাশে তাদের নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। সেই সাথে তাদের ছোট ছোট সামরিক দূর্গও নির্মিত হয়েছিল। এভাবে সমগ্র এলাকা ইহুদীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিল।

দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীটা ছিল আনসারদের। তাদের আসল জন্মভূমি ছিল ইয়ামান। কাহতানের বংশধর ছিল তারা। ইয়ামানের ইতিহাস খ্যাত বন্যায় যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকেরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। কাহতান গোত্রের দু'ভাই আওস ও খাজরাজ তৎকালে মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে অন্যান্য লোকও এসে থাকতে পারে। তবে এই নবাগতদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে নতুন অধিবাসীর সমাগম ঘটে। পরে বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে একটা নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটে। প্রথম প্রথম তারা ইহুদী সমাজ ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আগে থেকে জেঁকে বসা ইহুদী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। কিন্তু ইহুদীরা যখনই অনুভব করলো যে, আনসারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য একটা হুমকী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন তারা মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো।

ইহুদীদের মধ্যে ফিতিউন নামক এক লম্পট সরদারের আবির্ভাব ঘটে। সে শক্তির দাপট দেখিয়ে আদেশ জারী করলো, তার এলাকায় যে মেয়েরই বিয়ে হবে, তাকে প্রথমে তার প্রমোদ রজনীর শয্যা সংগিনী হয়েই তবে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে হবে। ইহুদীদের নৈতিক অধোপতন ও বিকৃতি কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল, তা এ থেকেই বুঝা যায় যে, তারা এই আদেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই শয়তানী আদেশের দরুন আনসারদের আত্ম সম্ভ্রমবোধ একদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। মালেক বিন আজলানের বোনের বিয়ে হতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক যেদিন বর এলো, সেদিন ফিতিউন মালেকের সামনে দিয়ে একেবারে বিবস্ত্র অবস্থায় যাচ্ছিল। মালেক তাকে তিরস্কার করলে সে বললো, কাল তাকে আরও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। উত্তেজিত হয়ে মালেক গিয়ে ফিতিউনকে হত্যা করে ফেললো এবং সিরিয়া পালিয়ে গেল। সেখানে গাসসানী রাজা আবু জাবালার শাসন চলছিল। সে যখন এ অবস্থা জানলো তখন মদিনা আক্রমণ করে বড় বড় ইহুদী নেতাকে হত্যা করে ফেললো এবং আওস ও খাজরাজকে পুরস্কৃত করলো। এ ঘটনাবলী ইহুদীদের শক্তি খর্ব করে দেয় এবং আনসারদের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

মোটকথা ইহুদীদের সাথে আনসারদের সম্পর্ক সব সময়ই দ্বন্দ্ব সংঘাতেপূর্ণ ছিল, কিন্তু কোন আদর্শ বা লক্ষ্য না থাকায় আনসারদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য কোন মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে তাদের শক্তি ঘুনের মত খেয়ে নষ্ট করে দেয়। ফলে এক সময় আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে বুয়াস নামক যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ নিহত হয়। এভাবে তারা ইহুদীদের সামনে আবার শক্তিহীন হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তারা কিছু দিন আগে কোরায়েশদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের আবেদন জানায়। কিন্তু নানা কারণে এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে ইহুদীদের আধিপত্য ও আভিজাত্যের একটা কারণ ছিল তাদের ধর্মীয় মোড়লিপনা। তাদের কাছে তাওরাত ছিল। এই সুবাদে তারা একটা স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিধানের পতাকাবাহী ছিল, তাদের কাছে আলাদা আকীদা ও আদর্শগত পুঁজি ছিল, কিছু চারিত্রিক

নীতিমালা ছিল, কিছু ধর্মীয় আইন ও বিধি ছিল, কিছু ঐতিহ্য ছিল এবং এবাদত পালনের স্বতন্ত্র বিধান ছিল। এদিক দিয়ে আনসারদের বলতে গেলে কিছুই ছিলনা। এ সব বিষয়ে তারা ইহুদীদের মুখাপেক্ষী ছিল। তাদেরই 'বাইতুল মাকদাস' (তৎকালে ইহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র) থেকে তারা শিক্ষা লাভ করতো। এমনকি যদি কোন আনসারীর সন্তান না বাঁচতো, তাহলে সে এই বলে মান্নত মানতো যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাকে ইহুদী বানানো হবে। আনসারদের মধ্যে এদিক থেকে হীনমন্যতাবোধ বিরাজ করতো। তাদের আত্মসম্মানবোধ ও আভিজাত্যবোধ ক্ষুন্ন হওয়ায় তারা মনে মনে সব সময় বিব্রত থাকতো। এই সমস্ত তথ্য দ্বারা বুঝা যায় যে,মদিনার পরিমন্ডলে ইহুদী ও আনসারদের মাঝে দ্বন্দ্বকলহ বিরাজ করতো এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গভীর প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইহুদীরা প্রায়শ আনসারদের সামনে আস্ফালন করতো যে, শীগগীরই শেষ নবী আসবেন। তিনি এলে আমরা তার সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে দেখে নেব। ইহুদীদের এই হুমকী ও ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে আনসাররাও প্রতিক্ষীত নবীর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। তারা মনে মনে সংকল্প নেয়, ঐ নবীর আবির্ভাব ঘটলে তারা সর্বপ্রথম তাঁর দলে ভিড়বে। হলোও তাই। যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তারা বঞ্চিত থেকে গেল। আর যাদেরকে তারা হুমকী দিয়ে আসছিল, তারাই শেষ নবীর সহচরও সহযোগী হলো। ইহুদীরা যাদেরকে মার খাওয়াতে চেয়েছিল, তাদের হাতে নিজেরাই মার খেয়ে গেল। (সীরাতুন্নবী ঃ শিবলী নুমানী)

মদিনার এই পরিবেশ ও পটভূমি বিবেচনা করলে বুঝে আসবে মক্কার তুলনায় এখানকার পরিবেশ কেন ইসলামী আন্দোলনের অধিকতর অনুকূল হলো।

ইসলামী আন্দোলন মদীনায়

মক্কা দীর্ঘ ১৩ বছর যাবত ইসলামের আহ্বান শুনেছে। এর সপক্ষে যুক্তি কী কী তাও জেনেছে। উপরন্তু ইসলামের আলোয় আলোকিত এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের চরিত্র এবং ভূমিকা তার সামনে দেদীপ্যমান ছিল। ইসলামের পতাকাবাহীরা যুলুম নিষ্পেষনের চাকার তলে পিষ্ট হয়েও আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) ধ্বনি তুলেছে। তবুও মক্কার সামগ্রিক পরিবেশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানই করেছে।

কিন্তু দাওয়াত মদিনায় পৌঁছা মাত্রই সেখান থেকে 'লাব্বাইকা'(গ্রহণ করলাম) ধ্বনি উঠলো। মদিনার প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী যুবক ছিলেন সুয়াইদ বিন ছামিত। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মেধাবী কবি, দক্ষ ঘোড় সওয়ার ও বীর যোদ্ধা। এ ধরনের যুবকরা সাধারণত বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিক হয়ে থাকেন, উন্নয়ন ও গঠনমূলক যে কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ও যথা সর্বস্ব উৎসর্গ করেন। এ যুবক মক্কায় এলে রাসূল সা. তার সাথে যথারীতি মিলিত হলেন এবং দাওয়াত দিলেন। সুয়াইদ বললো, এ ধরনেরই একটা জিনিস আমার কাছে আছে, যার নাম 'সহিফায়ে লুকমান'। তিনি তা থেকে কিছুটা পড়েও শোনালেন। এরপর রসূল সা. তাকে কোরআন পড়ে শোনালেন। হঠকারীতামুক্ত ও বিদ্বেষমুক্ত বিবেক কাকে বলে দেখুন। সুয়াইদ সংগে সংগে বলে উঠলেন ঃ "এটা আরো সুন্দর কথা।" এরপর রসূল সা. এর দাওয়াত তার অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু

পরিতাপের বিষয় তিনি মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার পর পরই খাজরাজীদের হাতে নিহত হন। তাঁর সম্পর্কে অনেকে বলেছেন যে, নিহত হবার সময় তিনি মুসলমান ছিলেন এবং মুখে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৭–৬৮)

মদিনার দ্বিতীয় যে যুবক ইসলামের দাওয়াতে প্রভাবিত হন, তার নাম আয়াস বিন মু'য়ায। এই ব্যক্তি মদিনার একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। এই দলটি মক্কায় এসেছিল খাজরাজের বিরুদ্ধে কোরায়েশের সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে এবং সাহায্য লাভের আশায়। রসূল সা. এই দলের লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান এবং কোরআন পড়ে শোনালেন। আয়াস বিন মুয়ায তখনো বয়সে কিশোর মাত্র। সে বললো, "হে আমার সাথীরা, তোমরা যে জন্য এসেছ তার চেয়ে এটাই তো ভালা"। প্রতিনিধি দলের নেতা আবুল হুসাইর সংগে সংগে তার মুখের ওপর মাটি ছুড়ে মারলো। তার অর্থ এই ছিল যে, তুমি আবার মাঝখানে এ কোন্ ঝামেলা বাধাচ্ছ? সে আরো বললো, 'আমরা এজন্য আসিনি। আবুল হুসাইর কুরায়েশদের সাহায্য লাভের জন্য উদগ্রীব ছিল। সে জানতো যে, মুহাম্মাদ সা. এর দাওয়াত গ্রহণ করলে কোরায়েশদের সাহায্য পাওয়ার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াস চুপ করলো বটে। ইসলামের দাওয়াত তার অন্তরে প্রবেশ করলো। প্রতিনিধি দল মদিনায় ফিরে গেল। দুঃখের বিষয় যে, এই সচেতন যুবকটিও শীঘ্রই বুয়াস যুদ্ধের কবলে পড়ে মারা গেল।

নবুয়তের একাদশ বছরে মদিনা থেকে যে দলটি এসেছিল, তার সাথে এক বৈঠকে রসূল সা. এর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রসূল সা. এর দাওয়াত শোনার পর তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো, "তোমরা নিশ্চিত জেন, এই ব্যক্তিই সেই নবী, যার কথা ইহুদীরা তোমাদের কাছে বলে আসছে। এখন ইহুদীরা যেন আমাদের আগে এই নবীর সহযোগী হয়ে যেতে না পারে।" এরপর আল্লাহ তাদের অন্তর উন্মুক্ত করে দেন এবং তারা সবাই ইসলামকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেয়। তারপর তারা বলতে থাকে ঃ

"আমরা আমাদের জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমাদের মধ্যে যত শত্রুতা ও কলহ কোন্দল, তা বোধহয় আর কোন জাতিতে নেই। হতে পারে রসূল সা. এর মাধ্যমে আমাদের জাতিকে আল্লাহ আবার ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর রসূল সা. এর দ্বীনের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দেব এবং আমরা তাঁর সামনে এই দ্বীনের ব্যাপারে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, তাদের সামনেও সেই মনোভাব ব্যক্ত করবো। তারপর আল্লাহ যদি তাদেরকে এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত করে দেন তাহলে এরপর ইনিই হবেন সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি"। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

যে দাওয়াতকে মক্কার লোকেরা বিভেদের কারণ বলে মনে করেছিল, মদিনার লোকেরা প্রথম দৃষ্টিতেই তাতে তাদের ঐক্যের ভিত্তি দেখতে পেল। ইসলামী আন্দোলনের পতাকা উত্তোলনের জন্য মক্কায় বসে সংগঠিত মদিনার এই প্রথম দলটির সদস্য ছিলেন ছয় ব্যক্তিঃ

(১) আবুল হাইছান বিন বিন হাম, (২) আসাদ বিন যারারা। (৩) আওফ বিন হারিস (৪) রাফে বিন মালেক বিন আজলান (৫) কুতবা বিন আমের (৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ।

এই ব্যক্তিবর্গ মদিনায় ফিরে যাওয়ার পর তারা সেখানে নতুন চাঞ্চল্য ও নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেন। সেখানে ইসলামের দাওয়াত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে থাকে। আনসারদের পরিবারগুলোর মধ্যে কোন পরিবারই এমন ছিলনা, যেখানে মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হচ্ছিলনা।

প্রথম আকাবার বায়য়াত

পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়তের দ্বাদশ বছর বারো ব্যক্তি মদিনা থেকে এসে বায়য়াত সম্পাদন করেন। এটা 'মাতৃশপথ' নামে পরিচিত। এই নামকরণের কারণ হলো, এই বায়য়াতে শুধু মৌলিক বিষয়ে অংগীকার গ্রহণ করা হয় এবং কোন যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। এই ঈমানী অংগীকারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবোনা, চুরি করবোনা, ব্যভিচার করবোনা, সন্তান হত্যা করবোনা, জেনে শুনে কারো বিরুদ্ধে মনগড়া আপবাদ রটাবনা, এবং কোন সৎ কাজে মুহাম্মদ সা. এর অবাধ্য হবনা।"

এই দলটি যখন মদিনায় রওনা হলো, তখন রসূল সা. মুসয়াব বিন উমাইরকে মদিনায় ইসলামের দাওয়াতী কাজ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করেন। সেখানে গিয়ে মুসলমানদেরকে কোরআন পড়ানো, ইসলামের শিক্ষা দান এবং ইসলামের বিস্তারিত ও সঠিক জ্ঞান দানের দায়িত্ব তাকে অর্জন করেন। তিনি সেখানে নামাযের ইমামতিও করতেন এবং ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী চারিত্রিক নীতিমালাও শিক্ষা দিতেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

দুই নেতার ইসলাম গ্রহণ

রসূল সা. এর নিযুক্ত ইসলাম প্রচারক মুসয়াব যে বাড়ীতে অবস্থান করতেন, সে বাড়ীর মালিক আসাদ বিন যারারা একদিন মুসয়াবকে সাথে নিয়ে বনু আব্দুল আশহাল ও বনু যফর গোত্রের বাসস্থানের দিকে দাওয়াতী অভিযানে রওনা হলেন। তারা মারাক নামক কুঁয়ার পার্শবর্তী বনুযফরের বাড়ীর চৌহদ্দীর কাছে পৌঁছলেন। ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় ব্যক্তি এসময় তাদের পাশে এসে সমবেত হলো। বনু আব্দুল আশহালের দুই নেতা সা'দ বিন মু'য়ায এবং উসাইদ বিন হুযাইর তখনো তাদের গোত্রের ধর্মানুসারী অর্থাৎ-পৌত্তলিক ছিলেন। আস'য়াদ বিন যারারা ও মুসয়াবের পরিচালিত দাওয়াতী তৎপরতায় সা'দ বিন মুয়ায আগেই রেগে আগুন হন। এই দুই ব্যক্তির আগমনের খবর শুনে তিনি উসাইদকে কানে কানে বললেন, "এই দুই ব্যক্তি আমাদের ভেতরকার দুর্বল লোকদেরকে ধোকা দিয়ে বিপথগামী করতে আসে, যেয়ে ওদেরকে নিষেধ করে দাও আমাদের বাড়ীতে যেন না আসে। আসয়াদ বিন যারারা যদি আমার খালাতো ভাই না হতো, তাহলে তোমাকে বলতামনা, আমি নিজেই তার মোকবিলা করতাম।" এরপর যখন দাওয়াতী বৈঠক বসলো, সা'দ বিন মুয়াযের নির্দেশ মোতাবেক উসাইদ একটা বর্শা উঁচিয়ে তাদের উভয়ের কাছে এল। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে কটূ ভাষা প্রয়োগ করে বললো, "তোমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী? তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বিভ্রান্ত কর। প্রাণে বাঁচতে চাওতো আমাদের এলাকা ছেড়ে এক্ষুণি চলে যাও।" মুসয়াব বিনম্র ভাষায় বললেন, "আপনি একটু বসে মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনুন না। শোনার পর ভালো

লাগলে মেনে নেবেন, নচেত প্রত্যাখ্যান করবেন।" উসাইদ এ কথা শুনে একটু শান্ত হলো। সে বর্শাটা নীচে রেখে দিয়ে আসদা ও মুসয়াবের পাশে শান্তভাবে বসে পড়লো। মুসয়াব আলোচনা শুরু করলেন এবং কোরআন পড়ে শোনালেন। তারা উসাইদ মুখ দিয়ে কিছু বলার আগেই তার মুখ মন্ডলের হাবভাব লক্ষ্য করে তার ইসলাম গ্রহণের মনোভাব উপলব্ধি করেছিলেন। অবশেষে উসাইদ মুখ ফুটে বললো, কী সুন্দর ও কত মনোমুগ্ধকর কথা!" সে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা ইসলাম গ্রহণের সময় কী পন্থা অবলম্বন কর?" উভয়ে বললেন, "যাও, গোসল কর, পাকপবিত্র হও, নিজের কাপড় ধুয়ে ফেল, তারপর সত্যের সাক্ষ্য দাও এবং নামায পড়।" যে উসাইদ একটু আগে বর্শা তাক করে দাঁড়িয়েছিল, তার বুকে এখন ইসলামের উজ্জীবনী বর্শা বিদ্ধ হয়ে গেছে। সে উঠে যেয়ে গোসল করে পাকসাফ হয়ে এসে দু'রাকাত নামায পড়লো। নামায শেষে উসাইদ বললোঃ আমার সাথে আর এক ব্যক্তি আছে। সেও যদি তোমাদের দলে যোগ দেয়, তাহলে তার গোত্রের কেউ বিরোধিতা করবেনা। আমি এখনই তাকে ডেকে আনি। সে হচ্ছে সা'দ বিন মু'য়ায।" সে তৎক্ষণাত বর্শা হাতে নিয়ে সা'দের কাছে গেল। সেখানে মজলিস বসলো। মুয়ায উসাইদকে দূর থেকে দেখেই তার সাথীদেরকে বললো, "আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, উসাইদ যাওয়ার সময় যে রকম চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তার চেহারা সে রকম নেই।" তারপর উসাইদকে বললো, "বল, তুমি কী করে এসেছ?" উসাইদ সরলভাবে জবাব দিল, "আমি উভয়ের সাথে কথা বলেছি। আল্লাহর কসম, তাদের দিক থেকে কোন আশংকা অনুভব করিনি। তাদেরকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি। আর তুমি যা বল, তাই আমরা করবো।" সাথে সাথে সা'দকে উত্তেজিত করার জন্য বললো, বনু হারেসা আসাদ বিন যারারাকে হত্যা করতে চায়। আসাদ তোমার আত্মীয়, তা জেনেও এটা করতে চাইছে যাতে তোমাকে হেয় করা যায়। সা'দ বনু হারেসার পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণের আশংকা বোধ করে রেগে উঠলো। উসাইদের হাত থেকে বর্শাটা ছোঁ মেরে নিয়ে মুয়ায আসাদ ও মুসায়াবের কাছে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে উভয়ে শান্তভাবে বসে আছে। মুয়ায বলেন, আমি তৎক্ষণাত বুঝে ফেললাম, উসাইদ চালাকি করে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে আমি ওদের দু'জনের কথাবার্তা প্রত্যক্ষভাবে শুনি। তাকে মনে মনে অনেক তিরস্কার করে উভয়ের সামনে থমকে দাড়ালাম। আসাদ বিন যারারাকে বললাম, তোমরা আমাদের কাছে এমন সব কথাবার্তা বলতে আস যা আমরা ঘৃণা করি।' মুসয়াব বিনম্রভাবে বললেন, একটু ঠান্ডা হও, আমাদের কথা শোন। তারপর ভালো লাগলে গ্রহণ করো, নচেত তোমরা যা ঘৃণা কর, তা আমরা তোমার সামনে পেশ করবোনা। সা'দ শান্ত হয়ে গেল এবং বললো, "তুমি তো ন্যায়সংগত কথাই বলেছ।" সা'দ বসে পড়লে মুসয়াব তাকে ইসলামের বার্তা ও কোরআন শোনালেন। এখানেও উসাইদের মত অবস্থার পুনরাবৃত্তি হলো। সা'দ কিছু বলার আগেই তার চেহারা থেকে ইসলাম গ্রহণের লক্ষণ ফুটে উঠলো। কয়েক মুহূর্তে দ্বিতীয় নেতা ইসলাম গ্রহণ করলো।

সা'দ বিন মুয়ায 'নতুন জীবন' নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন গোত্রীয় মজলিসের লোকজন দূর থেকে দেখেই বললো, সা'দের চেহারা বদলে গেছে। এসেই সা'দ

বললেন, 'হে বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের জনমন্ডলী, আমার সম্বন্ধে তোমাদের মত কী? সবাই বললো, তুমি আমাদের সরদার। তোমার মতামত আমাদের মতামতের চেয়ে পরিপক্ক। আমাদের সবার চেয়ে তুমি গুণবান ও কল্যাণময়।" সা'দ বললেন, "তা হলে শুনে রাখ, তোমরা যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান না আনবে, ততক্ষণ তোমাদের নারী ও পুরুষদের সাথে কথা বলা আমার ওপর হারাম।" এরপর আর যায় কোথায়। সমগ্র গোত্রের নারী ও পুরুষেরা এক যোগে ইসলাম গ্রহণ করলো।

এই দুই নেতার মাধ্যমে যখন ইসলামী আন্দোলনের শক্তি প্রভুত বৃদ্ধি পেল, তখন দাওয়াতী অভিযানও জোরদার হলো এবং ঘরে ঘরে ও গোত্রে গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো।

আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াত

ইতিমধ্যে হজ্জের মওসুম এসে গেল। এবার বিপুল সংখ্যক মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় গেল। কারণ মদিনার ভূমিতে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছিল। মদিনার এই নওমুসলিমগণ নতুন ধর্মীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে হজ্জ উপলক্ষে এসে কোরায়েশদের দৃষ্টি এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে নিজেদের প্রিয় নেতা রসূলের সা. সাথে মিলিত হলো। এবার পুনরায় আনুগত্যের অংগীকার নেয়া হলো। তবে এবারের অংগীকার 'মাতৃ বায়য়াত' এর চেয়ে অনেকটা অগ্রগামী ছিল। প্রথম বায়য়াতের কেবল একটি ধারায় রাজনীতিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হতো। সেটি ছিল এই প্রতিজ্ঞা যে, "আমরা মুহাম্মাদ সা. এর ন্যায়সংগত আদেশ অমান্য করবোনা।' কিন্তু এবার যাবতীয় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এ বায়য়াতের আলোকে মুহাম্মাদ সা. এর সহযোগিতা করার অর্থ ছিল কোরায়েশ ও সমগ্র আরব জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। দ্বিতীয় বায়য়াত প্রকৃত পক্ষে সম্পাদন করাও হয়েছিল এই অর্থ সামনে রেখেই।আলাপ আলোচনার সময় ইসলামী আন্দোলনের এই সব ইয়াসরিবী সৈনিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করে বললেন, "ইয়াসরিবের লোকদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) সাথে আমাদের যে সব চুক্তি আছে, তা আমাদের বাতিল করতে হবে। বাতিল করার পর এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করলে আপনি স্বজাতির লোকদের কাছে ফিরে যাবেন এবং আমাদেরকে ত্যাগ করবেন।" এই আশংকার জবাবে রসূল সা. মুচকি হেসে বললেন : "তোমাদের রক্ত আমারই রক্ত, তোমাদের শত্রু আমারই শত্রু, আমি তোমাদের লোক এবং তোমরা আমার লোক। যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ হবে, আর যাদের সাথে তোমাদের সন্ধি হবে তাদের সাথে আমারও সন্ধি হবে।" আব্বাস বিন উবাদা বললেন, "হে খাজরাজের বংশধরগণ। তোমরা কি জান, মুহাম্মদের সা. সাথে তোমরা কিসের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ? এ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের সাথে লড়াই এর প্রতিশ্রুতি।" প্রতিনিধিদলের সদস্যারা পরিপূর্ণ দায়িত্বোপলব্ধি সহকারেই জবাব দিলেন : "আমরা আমাদের সমস্ত সহায় সম্পদ ধ্বংসে এবং আমাদের গোত্রপতিদের হত্যার বিনিময়ে হলেও আপনার সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো বলে অংগীকার করছি।" এই বায়য়াতের বিশেষ প্রকৃতির কারণেই এর নাম হয়ে গেল "বায়য়াতুল হারব" বা "সামরিক অংগীকার"। এর একটা মৌলিক শর্ত

ছিল এই যে, "আমরা অনটনে অথবা প্রাচুর্যে, সুখে কিংবা দুঃখে, যে অবস্থায়ই থাকিনা কেন, রসূল সা. এর প্রতিটি নির্দেশ শুনবো ও তার আনুগত্য করবো, রসূলের আদেশকে আমরা নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেব এবং নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলদের সাথে দ্বন্দ্বকলহ করবোনা। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কেউ আমাদের নিন্দা ভর্ৎসনা করলে আমরা তার পরোয়া করবোনা।"

এ বায়য়াতকে আসলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর বলা যায়। সেই সাথে একে হিজরতের ভূমিকা বলেও আখ্যায়িত করা চলে। এ বায়য়াতের মাধ্যমে কার্যত ভবিষ্যতের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তার ভাবী নাগরিকগণ সেচ্ছায় ও সানন্দে মুহাম্মদ সা. এর রাষ্ট্রনায়কত্বকে গ্রহণ করে নিল। উপরন্তু আনুগত্যের ব্যবস্থাও এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এর মাধ্যমে শুধু যে একটা অংগীকার নেয়া হলো তা নয়, বরং সামষ্টিক নিয়ম-শৃংখলার ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ইসলামী আন্দোলনের নেতা নাগরিক সংগঠনের মতানুসারে বারোজন আঞ্চলিক দায়িত্বশীল (নকীব) নিয়োগ করলেন। তন্মধ্যে ৯ জন খাজরাজ থেকে এবং তিনজন আওস থেকে নিযুক্ত হলো। এই নকীবদেরকে আদেশ দেয়া হলো যে, তোমরা নিজি নিজ গোত্রের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বশীল, যেমন হযরত ঈসার আ. হাওয়ারীগণ দায়িত্বশীল ছিলেন এবং যেমন আমি স্বয়ং আমার দলের দায়িত্বশীল। এরা স্বয়ং রসূল সা. এর প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। তাদের নিযুক্তির মাধ্যমে সংগঠিত সমাজ নির্মাণের কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হলো।

খবরটা যখন কোরায়েশদের কানে গেল, তখন তারা বুক চাপড়াতে লাগলো। প্রতিনিধি দল ততক্ষণে মক্কা থেকে চলে গেছে। অনুসন্ধানে লোক পাঠানো হলো। সা'দ বিন উবাদা ও মুনযির বিন আমরকে ধরে আনা হলো। তাদের ওপর তারা গায়ের ঝাল ঝাড়লো। কিন্তু তাতে আর কী লাভ? (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

মদীনায় আন্দোলনের নতুন জোয়ার

এই প্রতিনিধি দল নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে মদিনায় ফিরে এলে দাওয়াতের কাজ প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে শুরু হলো। যুবকরা যখন কোন পরিবর্তনের উদ্যোক্তা হয়ে ময়দানে নামে, তখন তার মোকাবিলায় বুড়ো জনগোষ্ঠী বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনা। কোন আন্দোলনের ভবিষ্যত কেমন তা উপলব্ধি করতে হলে জানতে হবে, তা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল, না তার শিরায় নবীনদের রক্ত প্রবাহিত। মক্কায় ও বিশেষত মদিনায় যারা ইসলামী আন্দোলনের ঝান্ডা নিয়ে আগে আগে চলছিল, তারা প্রায় সবাই ছিল উঠতি বয়সের। এই তরুণ প্রজন্ম ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কত কী যে করেছে তার ধারণা পাওয়ার জন্য একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে।

বনু সালমা গোত্রে আমর ইবনুল জামুহ নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ গৃহে মানাত নামে কাঠের একটা মূর্তি সংগ্রহ করে এনে রেখেছিলেন। বুড়ো তার পূজো করতেন ও অষ্ট্র প্রহর ঝাড়ামোছায় নিয়োজিত থাকতেন। বনু সালামার দুই তরুণ মুয়ায বিন জাবাল ও মুয়ায বিন আমর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হয়ে গিয়েছিলেন। শেষোক্তজন আলোচ্য বুড়ো মিয়ারই ছেলে। এরা দু'জন প্রতিদিন রাতের

অন্ধকারে উঠে গিয়ে বুড়ো মিয়ার মূর্তিটাকে প্রথমে কাঁদামাটিতে লুটোপুটি খাওয়াতেন, অতঃপর বনুসালামার যে গর্তে লোকেরা যাবতীয় বর্জ্য নিক্ষেপ করতো, সেখানে মাথা নিচের দিকে করে ফেলে রেখে আসতেন। সকাল বেলা উঠে বুড়ো চিৎকার করতেনঃ যে, "রাতের বেলা আমার খোদার ওপর কে হস্তক্ষেপ করলো?" তারপর তিনি নিজের হারানো খোদাকে খুঁজতে বেরুতেন। খুঁজে পাওয়ার পর ধুয়ে মুছে আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন। পরবর্তী রাতেও আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো। বুড়ো আবারও চিল্লাচিল্লি করতেন। একদিন বুড়ো আমর বিরক্ত হয়ে মূর্তির ঘাড়ে নিজের তলোয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। মূর্তিকে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি জানিনা তোমার সাথে কে এমন আচরণ করে। তোমার যদি একটুও শক্তি থেকে থাকে, তবে এই যে তলোয়ার রেখে গেলাম, আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রো।" রাত হলো। আমর ঘুমিয়ে গেলেন। এই নাটকের উভয় অভিনেতা রাতের বেলা এলেন। তারা মূর্তির ঘাড় থেকে তলোয়ার খুলে ফেললেন। তারপর একটা মরা কুকুর খুঁজে এনে মূর্তির গলায় রশি দিয়ে বাঁধলেন এবং তাকে এমন এক বদ্ধ কূয়ায় ফেলে আসলেন, যা মানুষের মলমূত্রে ভর্তি থাকতো। সকাল বেলা উঠে আমর দেখলেন, তার খোদা আবারো উধাও হয়েছে। খোঁজাখুঁজি করে যখন তার এরূপ করুণ দশা দেখলেন, তার মনে প্রচন্ড ভাবান্তর উপস্থিত হলো এবং আমর ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, মদিনায় কী আমুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

আন্দোলনের নতুন কেন্দ্র

ইসলামী আন্দোলনের নেতা সর্বদাই এই ভাবনায় থাকতেন যে, মক্কায় যদি আন্দোলন তিষ্টিতে না পারে এবং মক্কার নিষ্ঠুর নেতৃত্ব যদি "নতুন বিশ্ব" গড়ার সুযোগ দিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পৃথিবীর আর কোন্ অঞ্চলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই গঠনমূলক কাজটা শুরু করা যেতে পারে? তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল আবিসিনিয়ার ওপর এবং এজন্যই তিনি সাথীদেরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহ নাজ্জাশী যদিও মক্কার মযলুমদের সাহায্যের ব্যাপারে সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন। কিন্তু একে তো সেখানে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা মুসলমানদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ওদের সর্বব্যাপী প্রভাবের আওতায় সেখানে ইসলামের বিকাশ লাভ সহজ ছিলনা। তদুপরি সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একেবারে নতুন করে প্রচারকার্য শুরু করতে হতো। আর এ কাজ করতে গিয়ে বিদেশের মাটিতে নানা রকমের দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হতো। এ জন্য অন্য কোন ভূখন্ডের সন্ধান করা হচ্ছিল। মদিনা যখন খোলা মনে দাওয়াতে সাড়া দিল, তখন রসূল সা. আশার আলো দেখতে পেলেন। আকাবার প্রথম বায়য়াত এই আশাকে আরো জোরদার করে। তারপর হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর সেখানে অবস্থান করে কিছু দিন কাজ করার পর আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের প্রাক্কালে হজ্জের সময় যে রিপোর্ট দেন, তাতে মদিনার মুসলমানদের বিস্তারিত বিবরণ দেন, তাদের শক্তি সামর্থের তথ্য জানান এবং সুসংবাদ দেন যে, এ বছর বিপুল সংখ্যক মুসলমান হজ্জ করতে আসছে। এই রিপোর্ট রসূল সা. কে গভীর চিন্তাভাবনার প্রেরণা যোগাচ্ছিল। মদিনায় মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া খুবই আশাব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল। সেখানে ইহুদীদের দিক থেকে তাদের তেমন মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিলনা, যেমন মক্কায় কোরায়েশদের দিক থেকে হতে

হচ্ছিল। ইয়াসরিব বাসী মক্কার সাথীদের জন্য খুবই চিন্তিত থাকতেন। ইয়াসরিববাসীর অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল। তাদের ক্ষেতখামার ও বাগবাগিচা ছিল। রসূল সা. ভাবতেন, মক্কার মুসলমানরা মদিনায় চলে গেলে এবং কোরায়েশদের যুলুম থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলামের দাবী পূরণ করলেই কি ভালো হয়না? তাই আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে যারা হজ্জ করতে এসেছিলেন, তাদের কাছে তিনি নিজের এই ধারণা ব্যক্ত করলেন এবং পরে যে বায়য়াত সম্পন্ন হলো, তা এই পটভূমির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। (হায়াতে মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ হোসেন হাইকেল)

আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই একজন দুজন করে মুসলমান রসূল সা. এর অনুমতিক্রমে মদিনা যাচ্ছিল। কিন্তু আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের পর এর গতি তীব্রতর হয় এবং দ্বিতীয় হিজরতের স্থান যে মদিনা হবে, তা প্রায় ঠিকঠাক হয়ে যায়।

মক্কার মোড়লরা দেখতে পাচ্ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন নতুন একটা মজবুত ঘাঁটি সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যত অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হচ্ছিল। তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল যে, এখন মদিনায় যদি ইসলাম শেকড় গাড়ে, তাহলে আমাদের নাগালের বাইরে তা এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হবে। অতপর তা একদিন আমাদের ওপরও চড়াও হবে এবং আমাদের অতীতের কীর্তিকলাপের পাই পাই করে প্রতিশোধ নেবে। তারা এ আশংকাও বোধ করছিল যে, সিরিয়ার বাণিজ্যিক সড়ক যেহেতু মদিনার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে, তাই মদিনার নতুন ইসলামী কেন্দ্র এই পথ আটকে দিতে পারে। এভাবে মক্কার কোরায়েশদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অপমৃত্যু ঘটবে। তারা ভেতরে ভেতরে গভীর আতংক ও উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। কিছুই বুঝতে পারছিলনা যে কী করবে। তারা দিন রাত এই চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, মুহাম্মাদ সা. ও তার সমগ্র দল পাছে হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই দুশ্চিন্তার কারণেই তারা শেষ পর্যন্ত রসূল সা.কে হত্যার পরিকল্পনা করে। একটা ঐতিহাসিক শক্তি তাদের গৃহ থেকেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং দুনিয়ার অন্য সবার চাইতে তাদেরই নিজস্ব ছিল। সেই শক্তিকে তারা নিজেদেরই অপকর্ম দ্বারা "পর" বানিয়ে দেয় এবং নিজেরাই তার শত্রু হয়ে যায়। তাই এরপর তা যতই জোরদার হচ্ছিল তাদের জন্য ততই প্রাণঘাতী আপদে পরিণত হচ্ছিল।

এজন্য প্রথম মোহাজের যখন মদিনায় যাওয়ার জন্য রওনা হলো, তখন মক্কাবাসী তার ওপর অত্যাচার চালায়। এই ব্যক্তি ছিলেন আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনুল আসাদ মাখযুমী। তিনি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে উটের ওপর চড়িয়ে রওনা দিচ্ছিলেন, ঠিক এই সময় তার স্ত্রীর পৈত্রিক গোত্র বনু মুগীরার লোকজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার উটের রশী আবু সালামার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। তারা বললো, আমাদের মেয়ে উম্মে সালামাকে তোমার সাথে ভবঘুরে হতে ছেড়ে দিতে পারিনা। এরূপ আবেগজড়িত ঘটনা আবু সালামার গোত্রের লোকেরা ক্ষেপে গেল। তারা বনু মুগীরাকে বললো, তোমরা যদি আমাদের লোকের স্ত্রীকে কেড়ে নাও, তাহলে আমরা আমাদের শিশু সন্তানকে তার কোলে থাকতে দেবনা। ফলে স্বামী, স্ত্রী ও শিশু সন্তান তিনজনই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবু সালামা এ অবস্থায়ই মদিনায় চলে গেলেন। উম্মে সালামা প্রতিদিন

সকালে শহরের উপকণ্ঠের সেই জায়গাটায় এসে বিলাপ করে কাঁদতো। এভাবে প্রায় এক বছর কেটে যাওয়ার পর কোন এক ব্যক্তির মনে দয়ার উদ্রেক করলো এবং সে বনু মুগীরাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে উম্মে সালামাকে শিশুসন্তানসহ উটে চড়িয়ে মদিনায় পাঠিয়ে দিল। মহিলা একাই রওনা হয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে উসমান বিন তালহার সাথে দেখা হয় এবং তিনি তাকে মদিনার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন।

অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় হিজরতের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এখন মক্কাবাসীর নীতি হয়ে দাঁড়ালো এইযে, মুসলমানদেরকে হাতছাড়া হতে দেয়া যাবেনা। যদি কেউ হিজরত করতেই চায়, তবে গোত্র ও পরিবার পরিজন মক্কাবাসীর হাতে জিম্মী হয়ে থাকবে। এই নীতি প্রথমে একটু শিথিল ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা কঠোর হয়। এমনকি বিলম্বে হিজরতকারী হযরত ওমর, আইয়াশ ইবনে আবি রবীয়া ও হিশাম ইবনে আ'স ইবনে ওয়ায়েলকে এত গোপনে যাত্রা করতে হয় যে, যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হবার ভয়ে তটস্থ থাকতে হয়েছিল। হযরত ওমর ও আইয়াশ তো কোন রকমে দ্রুত গতিতে ছুটে চলে গেলেন। কিন্তু হিশাম ধরা পড়ে গেল এবং নির্যাতনের শিকার হলো। হযরত ওমর ও আইয়াশ নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে গেলেন। কিন্তু মক্কা থেকে একটা কুচক্রী দল তাদের পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল। এ দলটির সদস্য ছিল আবু জাহল বিন হিশাম ও হারেস বিন হিশাম। তারা দুজনে গিয়ে আইয়াশের সাথে সাক্ষাত করে বললো, তোমার মা মৃত্যু পথযাত্রী। তিনি কসম খেয়েছেন যে, তোমার মুখ না দেখা পর্যন্ত তিনি মাথার চুল আচড়াবেন না এবং প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সাথীরা আইয়াশকে অনেক বোঝালেন যে, এটা একটা চালাকি মাত্র। তুমি একবার যদি মক্কাবাসীর চাতুর্যের জালে ধরা পড়, তাহলে তারা তোমাকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করবে। ধনাঢ্য আইয়াশ এই লোভেও পড়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের ধন সম্পদের একটা অংশ নিয়ে আসবেন। হযরত ওমর তার এ ইচ্ছার কথা জেনে বললেন, "আমি তোমার চেয়েও বেশী সম্পদশালী এবং আমার অর্ধেক সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেব। ওদের সাথে যেয়না।" কিন্তু আইয়াশ কোন কথা শুনলেন না। হযরত ওমর বললেন, 'যদি যেতেই চাও তবে আমার দ্রুতগামী উটনীটা নিয়ে যাও, যেখানেই কোন আশংকা অনুভব কর, ওতে চড়ে পালিয়ে এস।" কিন্তু মক্কার কুচক্রীরা এমন চক্রান্ত করলো যে, ঐ উটনীকে ভিন্ন পথে চালিয়ে পালিয়ে আসাও আইয়াশের পক্ষে সম্ভব হলোনা। তাকে কষে বেধে নেয়া হলো। মক্কায় পৌঁছে তারা অন্যান্য লোককে বললো, তোমাদের মধ্যে যারা যারা হিজরত করতে চায়, তাদেরকে আমাদের মত চিকিৎসা কর।'

পরে হযরত ওমর রা.স্বহস্তে হিশাম ইবনুল আসকে একটা চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়োনা।"–এই প্রখ্যাত আয়াতটি উদ্ধৃত করেন। মক্কার নিকটবর্তী 'মীতুয়া' নামক স্থানে হিশাম চিঠিটা পড়েন এবং তা নিয়ে বারবার চিন্তাভাবনা করেন। যখন বুঝতে পারলেন যে এতে স্বয়ং তার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, তখন কাল বিলম্ব না করে উটে চড়ে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু এর চেয়েও বিশুদ্ধ বর্ণনা এইযে রসূল সা. মদিনায় হিজরত করার পর একদিন তাঁর মজলিশে এই দুই বন্দীর বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলো। রসূল সা.

বললেন, "আইয়াশ বিন আবি রবীয়া ও হিশাম ইবনে আ'সকে মুক্ত করে আনতে কে আমাকে সাহায্য করবে?" ওলীদ বিন মুগীরা নিজের প্রস্তুতির কথা জানালেন। ওলীদ রসূলের সা. আদেশে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে লোকালয়ের কাছে পৌঁছে দেখলেন, এক মহিলা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" সে জবাব দিল, "এখানে দু'জন কয়েদী আছে। তাদেরকে খাবার দিতে যাচ্ছি।" ওলীদ পিছে পিছে যেতে লাগলেন। একটা ছাদবিহীন কক্ষে ঐ দু'জনই আটক ছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেলে দেয়াল টপকে তাদের কাছে পৌঁছলেন। তারপর শেকলের নিচে পাথর রেখে তলোয়ার দিয়ে তা কেটে ফেললেন। তারপর দু'জনকে বাইরে এনে উটে বসালেন এবং সবাই একযোগে পালালেন।

যে সকল মোহাজের মদিনায় যেতে সক্ষম হয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই যাবতীয় সহায় সম্পদ মক্কাবাসী রেখে দিয়েছে।

কিন্তু হিজরত এত মর্মান্তিক কাজ হওয়া সত্ত্বেও নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই দ্বীনী দায়িত্ব পালনের পথে নির্দ্বিধায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে লাগলো। ইসলামী আন্দোলনের এ অলৌকিক কৃতিত্বের কোন তুলনা নেই যে, আজ থেকে শত শত বছর আগের অসভ্য আরব সমাজের নিরক্ষর মহিলাদেরকে পর্যন্ত সে ইসলামী প্রেরণায় প্রবলভাবে উজ্জীবিত করেছে।

মোহাজেরদের যাত্রায় বাধা দিয়ে কোরায়েশরা চরম অসহিষ্ণুতার মনোভাব প্রকাশ করছিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির সাথে তাদের বোঝাপড়া চলছিল, তিনি দেখাচ্ছিলেন পর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং সমুদ্রের ন্যায় ঔদার্য ও মহানুভবতা। তিনি ছিলেন ধৈর্য, সহনশীলতা, গাম্ভীর্য ও স্থিরচিত্ততার মূর্ত প্রতীক। তাই তিনি দাওয়াতের কেন্দ্রস্থলে স্থির থাকলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকারে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছেন এটা প্রমাণ করা তার কর্তব্য ছিল। মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত তিন ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন ডুবন্ত জাহাজের দুঃসাহসী নাবিকের মত, যাকে সকল কর্মচারী ও যাত্রীদের নিরাপদে অন্য জাহাজে তুলে দেয়ার পরই সবার শেষে জাহাজ ত্যাগ করতে হয়।

যাদেরকে কোরায়েশরা জোরপূর্বক আটক করে রেখেছে, কিংবা যারা কোন বিশেষ স্বার্থ বা সুবিধার কারণে যেতে পারেনি, তারা ছাড়া আর কেউ যখন বাকী রইলনা, কেবল তখনই তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি পেলেন। তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন কেবল তখনই, যখন মক্কাবাসী তাকে জীবিত দেখতে প্রস্তুত ছিলনা। তাঁর সফরের মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখন তিনি রক্তপিপাসু তরবারীর বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে নির্ভয়ে ও নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন।

মদিনা : প্রতীক্ষার মুহূর্ত

মোহাজেরদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মদিনার প্রাণচাঞ্চল্য বেড়ে যাচ্ছিল। ইসলামী দাওয়াতের ঔজ্জ্বল্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইসলামের বিস্তারের সাথে ইসলামের বার্তাবাহকের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষত আকাবার

দ্বিতীয় বায়য়াতের পর থেকে মদিনার জনগণ প্রতি মুহূর্তে মক্কার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো। যেন ক্ষেতভরা ফসলের ক্ষেত অপেক্ষমান রয়েছে যে, কখন মেঘ আসবে এবং বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যেন সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী স্তূপ হয়ে রয়েছে। মানবতার ভবনের নির্মাতা এসে তা দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করে দেবেন।

বাতাসের কাঁধে ভর করে এ খবরও মদিনায় ছড়িয়ে পড়লো যে মুহাম্মদ সা. মক্কা থেকে চলে গেছেন এবং হিজরতের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। এ খবর শুনে স্বভাবতই মদিনায় ঔৎসুক্য চরম আকার ধারণ করলো এবং অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহনীয় হয়ে উঠলো।

ছোট ছোট শিশুদের মুখে পর্যন্ত এ কথাই লেগে ছিল যে, রসূল সা. আসছেন, রসূল সা. আসছেন। লোকেরা প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে শহরের বাইরে জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করতো। গ্রীষ্মের সূর্য মাথার ওপর এলে এবং রৌদ্র অসহনীয় হয়ে উঠলে আক্ষেপ করতে করতে ঘরে ফিরে যেত। যেদিন রসূল সা. সত্যি সত্যি এসে পৌঁছলেন, সেদিনও যথারীতি লোকেরা জমায়েত হওয়ার পর ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। সহসা এক ইহুদী এক দুর্গের ওপর থেকে দেখেই সুসংবাদ শোনালো, "ওহে ইয়াসরিববাসী, ঐ দেখ, তোমরা যে মহা মানবের অপেক্ষা করছ, তিনি এসে গেছেন।" আর যায় কোথায়! সমগ্র শহর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে ফেটে পড়লো। লোকেরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো। অধিকাংশ আনসার সশস্ত্র হয়ে বেরুলো।

মদিনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী শহরতলীর জনপদ কোবাতে তিনি সর্বপ্রথম আবাসস্থল করলেন। আমর বিন আওফের পরিবার সানন্দে অভ্যর্থনা জানালো এবং এই পরিবারই তাঁর আতিথেয়তা করার সৌভাগ্য লাভ করলো। এই বাড়ী আসলে ইসলামী আন্দোলনের একটা কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ছিল। আর মোহাজেরদের অধিকাংশের জন্যই এই বাড়ীটা প্রথম মনযিলে পরিণত হলো। কিছু কিছু মোহাজের সাহাবী তখনো ওখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলীও আমানতগুলো পৌঁছিয়ে দিয়ে এখানেই নিজের প্রাণপ্রিয় নেতা ও কাফেলার সাথে এসে মিলিত হলেন। এখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। লোকেরা দলে দলে সাক্ষাত করতে আসতে থাকে। যার বাণী তারা ইতিপূর্বেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে, তাঁকে স্বচক্ষে দেখার জন্য তাদের আগ্রহের অন্ত ছিলনা। তাঁর চেহারা দর্শন, তাঁর মিষ্টি বাণী শ্রবণ এবং তাঁর দোয়া লাভের আশায় সবাই জমায়েত হচ্ছিল। সালাম, সাক্ষাত, আলাপ আলোচনা, দোয়া, বৈঠক কোন কিছুই বাদ যাচ্ছিলনা।

কোবায় রসূল সা. নিজ হাতে একটা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। প্রত্যেক মুসলমান এর নির্মাণ কাজে শরীক ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিত্ব একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় বড় বড় পাথর তুলে আনতে লাগলেন। কাজের সাথে সাথে গানও গাওয়া হচ্ছিলঃ

افلح من يعالج المساجدا　　ويقرء القرآن قائما وقاعدا

ولا يبيت الليل عنه راقدا

"মসজিদ নির্মাণকারী, কোরআন পাঠকারী এবং এবাদতের জন্য রাত্র জাগরণকারী যথার্থ সফলকাম।"

এ মসজিদ শুধু ইটপাথর ইত্যাদির সমষ্টি ছিল না, বরং নবী সা. থেকে শুরু করে একজন সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত সবাই সর্বোত্তম উদ্দীপনার পরিচয় দিয়েছিল। এ জন্যই এ মসজিদ সম্পর্কে কোরআন বলেছে ঃ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

"এটা এমন মসজিদ যার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর।"

রসূল সা. কোবায় পৌঁছলেন নবুয়তের একাদশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার। চৌদ্দ দিন পর তিনি সদলবলে মদীনায় রওনা হলেন। কোবা থেকে মদিনা পর্যন্ত আনসারগণ দু'ধারে লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন মোবারকবাদ জানানোর জন্য। রসূল সা. এর মাতুলালয়ের আত্মীয়রা বিশেষভাবে সশস্ত্রভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। মহিলারা ছাদের ওপর জমায়েত হয়ে স্বাগত সংগীত গাইতে থাকে ঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوِدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

ছোট ছোট শিশুরা দলে দলে ঘুরছিল এবং ঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে গাইছিলঃ

نَحْنُ جَوَارٌ مِّنْ بَنِي نَجَّارٍ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارٍ

এই শিশুদের ভালোবাসার জবাবে রসূল সা. তাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করলেন। তাদের সাথে কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি আমাকে চাও?" তারা বললো, "জ্বী হা!" রসূল সা. বললেন, "আমিও তোমাদের চাই।" (সীরাতুন্নবী)

মদিনার ভাগ্যে যখন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা জুটলো, তখন সেখানে কেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা একবার কল্পনা করুন! সেখানকার অলিগলিতে কেমন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল এবং আকাশে বাতাসে কেমন অনুভূতি ও কেমন সাড়া জেগেছিল একটু ভাবুন তো!

সাময়িক আবাসস্থল হিসাবে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ীর ভাগ্য চমকে উঠলো। এখানে রসূল সা. সাত মাস অবস্থান করেন।

উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ

একটু স্বস্তি লাভ করার এবং সফরের ক্লান্তি দূর হওয়ার পর রসূল সা. উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। প্রথম যে কাজটা শুরু করা হলো, তা ছিল মসজিদ নির্মাণ। দু'জন এতীম শিশুর পতিত জমি খরিদ করা হলো এবং হযরত আবু আইয়ূবই তার মূল্য দিয়ে দেন। এই জমিতে মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপিত হলো। মসজিদ শুধু নামাযের স্থান হিসাবেই গুরুত্ব বহন করতো না, বরং তাকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সভ্যতার কেন্দ্র ও উৎস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। একাধারে সরকারের দরবার, পরামর্শ কক্ষ, সরকারী অতিথি ভবন, গণপাঠাগার, ও জাতীয় সম্মেলন ভবন হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছিল মজজিদে নববীকে। এই নির্মাণ কাজের বেলায়ও কোবার মত সাড়া জাগলো। এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে কি, যে এই কাজে মনে প্রাণে অংশ গ্রহণ করেনি? স্বয়ং রসূল সা. পাথর ও কাঁদা তুলে আনছিলেন। এ দৃশ্য দেখে জনৈক সাহাবী আবেগাপ্লুত হয়ে বলে

উঠলেন ঃ "আল্লাহর নবী যদি এ কাজে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন, আর আমরা বসে বসে দেখতে থাকি, তাহলে আমাদের সমস্ত সৎকাজ বাতিল হয়ে যাবে।"

কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে কোন বাজে কথাবার্তার বালাই ছিলনা। বরং রসূল সা. সহ সবাই একযোগে আওয়ায তুলছিলেন ঃ

لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الاَخِرَةِ اَللّٰهُمَّ ارْحم الاَنْصَار وَالْمُهَاجِرَةَ

"আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। তা না হলে জীবন নিরর্থক। হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মোহাজেরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

এই প্রেরণা ও দোয়াই ছিল মসজিদে নববী নির্মাণের আসল উপকরণ। মসজিদের সাথে সংলগ্ন একটা হুজরাও রসূল সা. এর জন্য তৈরী হয়ে গেল লতাপাতা ও মাটি দ্বারা। তিনি এই হুজরাতেই থাকতে আরম্ভ করলেন।

মদিনায় রসূল সা. এর আগমনের সাথে সাথে আপনা আপনি দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগলো। এই সাত মাসে ইসলামী আন্দোলন প্রত্যেক গৃহ ও প্রত্যেক গোত্র থেকে নিবেদিত প্রাণ সাথী সংগ্রহ করে ফেলেছিল। কেবলমাত্র আওস গোত্রের খাতমা, ওয়াকিফ, ওয়ায়েল ও উমাইয়ার পরিবারে শেরকের অন্ধকার অবশিষ্ট ছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

দাওয়াতী কাজের বিস্তার ঘটানো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠনমুলক কাজ। রসূল সা. ব্যক্তিগত দাওয়াত তো দিতেনই। কিন্তু যে ভাষণ দিয়ে তিনি সামষ্টিক দাওয়াতের সূচনা করেন তা ছিল নিম্নরূপঃ

"হে জনমন্ডলী, নিজেদের জন্য সময় মত কিছু উপার্জন করে নাও। জেনে রাখ, তোমাদের সকলেরই একদিন মরতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের লোকজনকে এমনভাবে রেখে যাবে যে, তাদের কোন অভিযোগ থাকবেনা। তারপর তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাকে এমনভাবে সম্বোধন করা হবে যে, মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবেনা। জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তোমার কাছে কি আমার রসূল পৌঁছেনি! এবং রসূল কি তোমার কাছে আমার বাণী পৌঁছায়নি? আমি কি তোমাকে সম্পদ ও অনুগ্রহ দেইনি? তা হলে তুমি নিজের জন্য কি সঞ্চয় করেছ? এরপর সে ডানে বামে তাকাবে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাবেনা। এরপর সামনের দিকে দৃষ্টি দেবে। কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বেনা। অতএব যার পক্ষে সম্ভব, সে যেন একটা খেজুরের বিনিময়ে হলেও নিজেকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি এতটুকুও পারেনা, সে যেন একটু ভালো কথা বলে হলেও আত্মরক্ষা করে। কেননা সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তোমাদের ওপর নিরাপত্তা এবং আল্লাহ রহমত ও বরকত নাযিল হোক।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

আর একটা সামষ্টিক ভাষণ নিম্নরূপ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। আমরা সবাই আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের কর্মের কুপ্রভাব থেকে

আল্লাহর পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারেনা। আর তিনি যাকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক থাকেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও শরীক বিহীন আল্লাহ ছাড়া এবাদত ও আনুগত্য লাভের যোগ্য আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবই সর্বোত্তম বাণী। আল্লাহ যার অন্তরে কোরআনকে প্রিয় বানিয়েছেন, যাকে কুফরির পর ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন, এবং যে ব্যক্তি অন্য সকল মানবরচিত বাণীর চেয়ে কোরআনকে বেশী পছন্দ করে, সে সাফল্যমন্ডিত হবে। এ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী বাণী। আল্লাহ যা ভালোবাসেন তোমরা শুধু তাই ভালোবাসবে এবং আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে। আল্লাহর কাজে শৈথিল্য দেখিওনা এবং এর জন্য তোমাদের মন যেন কঠোর না হয়। যেহেতু আল্লাহ নিজের সৃষ্টি থেকে উত্তম জিনিসই মনোনীত করেন, তাই তিনি উত্তম কাজ, উত্তম বান্দা ও পবিত্রতম বাণী চিহ্নিত করেছেন। তিনি মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন, তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম। কাজেই আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর। তার সাথে কাউকে শরীক করোনা। তার গযব থেকে এমনভাবে আত্মরক্ষা কর, যেমনভাবে করা উচিত। আল্লাহর সামনে সেই সব ভালো কথাবার্তাকে কার্যে পরিণত কর, যা তোমরা মুখ দিয়ে বলে থাক। আল্লাহর রহমত দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভংগ করলে অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে তাঁর বক্তৃতার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। রসূল সা. এর ভাষণ সাধারণত সংক্ষিপ্ত হতো। কিন্তু এর ভেতর কত সুদূর প্রসারী বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে লক্ষ্য করুন। এতে বলতে গেলে যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এতে ইসলামের দাওয়াতও রয়েছে, কোরআনের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, হালাল ও হারাম বাছবিচার করার তাগিদও দেয়া হয়েছে এবং আদর্শ ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এই দুটো ভাষণ দেখলে বুঝা যায় যে, সামষ্টিক দাওয়াত কিভাবে দেয়া হতো। একদিকে মৌলিক আদর্শের দিকে আহ্বান জানানো হতো। অপর দিকে ঐ আদর্শেরই আলোকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমাজকে পথনির্দেশিকা দেয়া হতো।

ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন

তৃতীয় পদক্ষেপ এবং সম্ভব রাজনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ ছিল এই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মদিনার ইহুদী, মোশরেক ও মুসলমানদের মধ্যে একটা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটা লিখিত চুক্তিনামা তৈরী করা হয়, যা একটা লিখিত সংবিধানের মত ছিল। একে যথার্থভাবেই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান বলে অভিহিত করা হয়। আমি এখানে এ সংবিধানের ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাইনা। তবে তার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের সার সংক্ষেপ তুলে ধরবো। এই লিখিত সাংবিধানিক চুক্তি দ্বারা রসূল সা. যা কিছু অর্জন করেন তা নিম্নরূপঃ

– মদিনার নবগঠিত সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর আইন মূল ভিত্তির গুরুত্ব অর্জন করে।

– রাজনৈতিক, আইনগত ও বিচারবিভাগীয় চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মুহাম্মাদ সা. এর হস্তগত হয়।

– এই সাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে বিধিসম্মতভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত ও ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।।[১]

সে যুগের পরিস্থিতির জটিলতার প্রতি লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় যে, এটা এক অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। এর পেছনে এক অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আলাপ-আলোচনার দক্ষতা সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়। এই সাংবিধানিক চুক্তি এবং অন্যান্য চুক্তি ও লেনদেন থেকে আমরা জানতে পারি যে, রসূল সা. নিছক একজন সুফী দরবেশই ছিলেন না, বরং সামষ্টিক বিষয়গুলোকে সামাল দেয়া ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার বিশেষজ্ঞীয় দক্ষতা ও বিচক্ষণতার তিনি অধিকারী ছিলেন এবং এ সব দায়িত্ব সম্পাদনের পূর্ণ যোগ্যতা তিনি রাখতেন।

ভ্রাতৃত্ব ব্যবস্থা

মদিনার সমাজের তখন একটা বড় রকমের সমস্যা ছিল মোহাজেরদের পুনর্বাসন। লোকেরা একের পর এক ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসছিল। মাত্র কয়েক হাজার অধিবাসী সম্বলিত ও এই মাঝারি পর্যায়ের জনপদে তাদেরকে ঠাঁই দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বস্তুত এটা এমন একটা সমস্যা, যা ইতিহাসে যখনই দেখা দিকনা কেন, বিব্রতকর হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। মদিনার সমাজ ও তার রাষ্ট্রপ্রধান যেরূপ দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। কোন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়নি, কোন আইন চাপিয়ে দেয়া হয়নি, ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সরকারীভাবে বরাদ্দ করতে হয়নি, শরণার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ করে কোন কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি এবং কোন বলপ্রয়োগ করা হয়নি। কেবল একটি নৈতিক আবেদন দ্বারা এত বড় জটিল সমস্যার সমাধান মাত্র কয়েক দিনে করে ফেলা হয়। বিশ্বনবী সা. আকীদা, আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে একটা নতুন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দেন এবং এক একজন আনসারীর সাথে এক একজন মোহাজেরের ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। প্রত্যেক আনসারী নিজের সহায় সম্পদ ঘরবাড়ী, বাগবাগিচা ও ক্ষেতখামার অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিজ নিজ আদর্শিক সাথীকে দিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ কেউতো নিজের একাধিক স্ত্রীর মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে তার দ্বীনী ভাই এর সাথে বিয়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। অপরদিকে মোহাজেররা নিজেদেরকে

---

[১] যে ব্যক্তি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়, সে সব সময় সর্ব প্রথম নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করে। আরবের ইসলামী সংগঠন বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সহায় সম্পদের দিক দিয়ে কত রিক্ত হস্ত দেখুন। তা ছাড়া মদিনার অজানা অচেনা পরিবেশে এসে কতিপয় বাস্তু ভিটে হারা ব্যক্তির সমস্যা জর্জরিত অবস্থা দেখুন। তারপর লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো কত ত্বরিত গতিতে। কিভাবে কয়েক মাসের মধ্যে তার সংবিধানও চালু হয়ে গেল। ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে পরস্পর বিরোধী জনতাকে এত শীঘ্র একটা সংগঠনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করা সত্যিই ইতিহাসের এক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।

এতদূর আত্মসম্ভ্রমী প্রমাণ করেন যে, তারা বলতেন, আমাদেরকে ক্ষেতখামার বা বাজার দেখিয়ে দাও, আমরা ব্যবসায় করে বা শ্রম খেটে জীবিকা উপার্জন করতে পারবো।

অবিবাহিত, বিশেষত উঠতি বয়সের যে সব মোহাজের সংসারী হওয়ার পরিবর্তে নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত করতে চাইছিলেন, তাদের বাসস্থান ছিল 'সুফফা' অর্থাৎ মসজিদে নববীর একটা চত্বর। বিনির্মাণ কাজের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠনের রূপ নেয়। সুফফাবাসী সাহাবীদের অভিভাবক ছিল ইসলামী সমাজ। রসূল সা. স্বয়ং তাদের প্রয়োজন পূরণে মনোযোগী ও সক্রিয় থাকতেন।

আবার সেই দ্বন্দ্ব সংঘাত

এখানে আমি ইসলামের ইতিহাস ও নবী জীবনের ইতিহাসের (সীরাত) সমস্ত ধারাবাহিক ঘটনার উল্লেখ করতে ইচ্ছুক নই। সংক্ষেপে শুধু দেখাতে চেয়েছি যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রজন্ম মক্কা থেকে মদিনায় এসে কিভাবে পুনর্বাসিত হয় এবং কিভাবে নবতর প্রজন্মের জন্ম দিতে থাকে। পরিবেশ কেমন ছিল এবং একটা কার্যকর শক্তির আগমনে সেই পরিবেশে কী ধরনের নতুন তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। একটা ঘুমন্ত সমাজকে সত্যের সৈনিকরা কিভাবে এগিয়ে এসে জাগিয়ে দেয় এবং তার চরিত্র গঠনে এক কার্যকর ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক ভূমিকা সামনে আসার সাথে সাথেই কোন না কোন নেতিব্যচক ভূমিকারও আবির্ভাব ঘটা ঐতিহাসিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য ছিল। গঠনমূলক তৎপরতার পাশাপাশি একটা নাশকতামূলক শক্তির সক্রিয় হয়ে উঠাটা ছিল প্রাকৃতিক বিধির অবধারিত লিখন। সত্য যখন ময়দানে সক্রিয় হয় তখন বাতিলের ময়দানেও তৎপরতা শুরু হয়ে যাওয়া অনিবার্য। নায়কের সাথে সাথে খলনায়কের আবির্ভাবও অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। মদিনায় যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তা দেখে শয়তান নিদারুণ অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করছিল। সে নিজের কিছু একনিষ্ঠ কর্মীকে মাঠে নামাতে চাইছিল। কিন্তু খলনায়ক সে পেয়েও গেল এবং তাদেরকে সে মঞ্চে এনে হাজির করলো। ইসলামী আন্দোলন মক্কায় পড়েছিল হযরত ইবরাহীমের তথাকথিত অনুসারীদের কবলে, আর মদিনায় সম্মুখীন হলো হযরত মূসার পবিত্র আলখেল্লা গায়ে দেয়া কুচক্রীদের। ইসলামী আন্দোলনের সাথে পবিত্র কা'বার মুতাওয়াল্লীরা যে আচরণ করেছিল, বাইতুল মাকদাসের অনুসারীরাও সেই একই আচরণ করতে আরম্ভ করলো।

ইহুদীদের ঐতিহাসিক অবস্থান ও ভূমিকা

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ইতিহাসের এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রতিরোধের কাজটা সর্বাধিক ঈমানী আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে চিরকাল ধর্মীয় মহলই করে এসেছে। ধর্মীয় মহলের যেখানে সত্য দ্বীনের দাওয়াতের প্রথম আওয়াযেই সাড়া দিয়ে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা, সেখানে কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে তারাই সর্বপ্রথম তাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। ধর্মীয় মহল প্রথমে ধর্মের খাদেম ও পতাকাবাহী হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন তাদের একটা পদমর্যাদার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ধর্মের সাথে তাদের কিছু স্বার্থ জড়িত হয়ে যায়, তখন তারা ধর্মকে নিজেদের তাবেদার

বানিয়ে নেয় এবং ধীরে ধীরে ধর্মের নামে নিজেদের কিছু চিরস্থায়ী অধিকার সৃষ্টি করে ফেলে। ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে তারা নিজেদের কিছু শ্রেণী ভিত্তিক দাবীদাওয়া মানতে বাধ্য করে এবং এর পরিণামে তাদের জন্য কিছু বিশেষ সম্মানজনক পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম তার অনুসারীদের নৈতিক অধোপতনের যুগে সর্বদাই এই সব স্তর অতিক্রম করে থাকে। এ পর্যায়ে এসে ধর্ম একটা চমৎকার লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয় এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য স্থাবর সম্পত্তির রূপ ধারণ করে। এ পর্যায়ে এসে ওয়ায নসীহত হয়ে যায় ব্যবসায়িক পণ্য, ধর্মীয় বিদ্যা হয়ে যায় জীবিকার উপায়, আর ফতোয়া বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পর্যবসিত হয়ে একটা নিজস্ব বাজার মূল্য সৃষ্টি করে। ধর্মীয় পদ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতার সিড়িতে পরিণত হয়। ধর্মীয় নেতারা একবার এই স্তরে উপনীত হলে তাদের বাণিজ্যিক মানসিকতা প্রত্যেক ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, আমাদের স্বার্থ বহাল আছে কিনা, এবং আমাদের পদমর্যাদা অন্য কেউ কেড়ে নিচ্ছে নাতো? ব্যবসায়ী মনমানস যখন এসব গুণবৈশিষ্ট সহকারে ধর্মের গণ্ডীতে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো দেখা দিতে থাকে ঃ

– কারো দিক থেকে ভিন্নমত পোষণ সহ্য করতে পারেনা এবং কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যে অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে পারেনা।

– নিজেদের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি বা দুর্বলতার অস্তিত্ব স্বীকার করেনা এবং তা সংশোধনেও প্রস্তুত হয়না।

– নেতৃত্বের পদ ও প্রভাব বিস্তারের গদি ছেড়ে অন্য কারো নেতৃত্বে, নির্দেশে বা আহ্বানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারেনা।

এই সব বৈশিষ্টের চরম অবস্থায় এসে পৌঁছে ছিল ইহুদী জাতি। তারা কখনো এটা মেনে নিতে পারেনি যে, তাদের শ্রেণীর চৌহদ্দীর বাইরেও সত্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তাদের আনুগত্য না করে কেউ সুপথে পরিচালিত হতে পারে এবং নেতৃত্বের পদ তাদের ছাড়া আর কারো প্রাপ্য হতে পারে–এ কথা তারা স্বীকারই করতোনা।

বিরোধিতা মক্কার কোরায়েশও করেছে, মদিনার ইহুদীরাও করেছে। উভয় গোষ্ঠীর কেউই বিরোধিতায় কোন কমতি রাখেনি। কিন্তু উভয়ের বিরোধী ভূমিকায় বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের ভূমিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কোরায়েশদের বিরোধিতার পেছনে আসল চালিকাশক্তি ছিল দাম্ভিকতা ও অহংকার। কিন্তু ইহুদীদের মন আচ্ছন্ন ছিল প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায়। কোরায়েশ অভিজাত্যবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের রোগে আক্রান্ত ছিল, আর ইহুদীরা আক্রান্ত ছিল হীনমন্যতার ব্যাধিতে। এ জন্য কোরায়েশদের মধ্যে ছিল খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান ও সংঘাতের মনোভাব। আর ইহুদীদের বিরোধিতায় কুটিল ষড়যন্ত্র ও ধাপ্পাবাজী স্বভাবের প্রাধান্য ছিল। কোরায়েশদের মধ্যে ছিল বীরোচিত ঔদ্ধত্য, আর ইহুদীদের স্বভাবে ছিল কাপুরুষোচিত ইতরামি। কোরায়েশদের বিরোধিতা যেখানে সরাসরি আক্রমণাত্মক বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল, সেখানে ইহুদীরা এগিয়ে ছিল গোপন যোগসাজশ, চক্রান্ত, কপটতা ও ভন্ডামির দিক থেকে। মক্কায় শুধু দুটো সম্প্রদায় ছিল ঃ মুসলমান ও কাফের। কিন্তু মদিনায় মুসলমান ও কাফের এই দুই শক্তির মাঝে তৃতীয় শক্তি মোনাফেকদেরও অভ্যুদয় ঘটে। এই পর্যালোচনা থেকে

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বক ধার্মিকতা ও বিকৃত দ্বীনদারী উগ্র প্রকাশ্য কুফরী, শেরক ও জাহেলিয়তের চেয়েও কতটা নীচ হীন স্বভাবের হয়ে থাকে এবং সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতায় কতো বেশী জঘন্য ভূমিকা পালন করে থাকে ?

আমরা এটাও দেখতে পাই যে, কুফরি ও দ্বীনদারীর এই সংঘাতে ইহুদীদের বিকৃত ও স্বার্থবাদী দ্বীনদারী ইসলামের মোকাবেলায় মক্কার কাফের ও মোশরেক শক্তির সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। অথচ যত মতভেদই থাকুক, এক আল্লাহর এবাদত ও নৈতিকতার পতাকাবাহীদের প্রতি তো তার অধিকতর সহানুভূতি থাকা উচিত ছিল। অন্তত এতটুকু সহনীয় তো হতে পারতো যে, ইহুদীরা ইসলাম বিরোধিতায় নিজেদের অবস্থানকে কাফের ও মোশরেকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারতো। কিন্তু "এসো আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার একটি সম্মত বক্তব্যে আমরা একমত হই" এই দরদপূর্ণ আহ্বান শোনার পরও তারা শ্রেষ্ঠতম মানব মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাথীদের পবিত্র ধর্মীয় চিন্তা ও কর্মকে বাদ দিয়ে আবু জাহল ও আবু লাহাবের ন্যায় নিকৃষ্ট মানুষদের সহযোগী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বক ধার্মিকতা ও বিকৃত দ্বীনদারীর আরো একটা চিরন্তন ঐতিহাসিক ভূমিকা এই হয়ে থাকে যে, তা যুদ্ধের ময়দানেও কোন অবস্থায়ই ধর্মীয় পক্ষের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়না। বরং তা অবধারিতভাবে ধর্মের শত্রুদের পক্ষেই যায়। কুফরী,নাস্তিকতা ও পাপাচারীদেরই সহযোগী হয়ে যায়। গুটিকয় ব্যতিক্রমী ব্যক্তির কথা আমি আলোচনা করছিনা। এ ধরনের ব্যতিক্রম যে কোন গোষ্ঠীর মধ্যে নিকৃষ্টতম বিকৃতির সময়েও কিছু না কিছু পাওয়া যায়। আমরা কেবল সাধারণ নীতিগত বিষয়েই আলোচনা করছি।

এই ছিল ইহুদীদের ন্যাক্কারজনক অবস্থান। তারা নিজেদের গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মাচারের সকল অস্ত্র ধারণ করত নাশকতামূলক ও নেতিবাচক ফ্রন্টে গিয়ে তারা ইসলামের দিকে অস্ত্র তাক করে ওৎ পেতে বসে এবং কার্যত কাফের ও মোশরেকদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়। তারা রসূল সা. ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী সাহাবীগণের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য গালাগাল ও কটুবাক্য বর্ষণ করে, ব্যংগ বিদ্রুপ করে, নিত্যনতুন প্রশ্নাদি তুলে হয়রানি করে। অপবাদ ও অপপ্রাচারের তান্ডব তোলে এবং গোয়েন্দাগিরি করে। কখনো কখনো মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করে, তাদেরকে কাফের ও ফাসেক বলে ফতোয়া দেয়, রসূল সা. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং যুদ্ধ ও আপদকালীন অবস্থায় ভয়ংকর ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইসলামের ক্ষতি সাধনে তারা সাধ্যমত কোন কিছুই করতে বাদ রাখেনি। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা একটা মারাত্মক ভুল ধারণায় পতিত থাকে। নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত নেতিবাচক স্বভাবের লোকেরা চিরকালই এ ধরনের ভুলধারণায় পতিত হয়ে থাকে। (কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণও করেনা।) তাদের ভুল ধারণাটা ছিল এই যে, যারা কোন নীতি ও আদর্শের ধার ধারেনা, কোন গঠনমূলক কর্মসূচী রাখেনা এবং নৈতিক অধোপতনের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়, তারা যে কোন আদর্শবাদী ও গঠনমূলক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে পারে। আসলে তাদের ভূমিকা এ রকম, যেমন উঠতি সূর্যের আলোক রশ্মির প্রতি বিদ্বেষপরায়ন হয়ে চামচিকেরা শূন্যে

পাখনা মেলে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা চালায়, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জন্য যেমন কিছু মশামাছি ভনভন করে, কিংবা পূর্ণিমার চাঁদ দেখে যেমন কোন গোঁয়ার তার দিকে থুথু নিক্ষেপ করে।

যাদের নিজস্ব কোন মূল্য নেই, যাদের কাছে কোন প্রাণবন্ত আদর্শ নেই, যাদের স্বভাব চরিত্রে সমকালীন মানব সমাজের জন্য কোন আকর্ষণ নেই এবং যাদের কাছ থেকে মানব জাতির কোন গঠনমূলক সেবা পাওয়ার আশা নেই, তারা নিছক অন্যদের গতি রোধ করে নিজেদের জন্য কোন স্থায়ী সাফল্য আনতে পারেনা। যাদের কাছে স্থবিরতা, কর্মবিমুখতা, গোঁড়ামি, বিকৃতি, ও নাশকতা ছাড়া আর কোন উপকরণ নেই, তারা সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত একটা কর্মচঞ্চল দলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর যাই হোক, নিজেদের মধ্যে কোন মূল্য ও মর্যাদা সৃষ্টি করতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের লোকদের কপালে ব্যর্থতা ও অপমান ছাড়া আর কিছু জোটেনা। কিন্তু যখন কোন বিকারগ্রস্ত জনগোষ্ঠী আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়ার গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন সে আর পরিণাম নিয়ে ভাবেনা। শুধুই সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। বিকারগ্রস্ত ইহুদী সম্প্রদায়ও হীনমন্যতা ও হিংসার চোটে অন্ধ হয়ে ইসলামের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়।

মদিনার মুসলমানদের চরিত্রের সাথে ইহুদীদের চরিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে এও বুঝা যায় যে, সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহীদের ডাকে যারা সাড়া দেয়, তাদের চরিত্র যতটা উন্নত মানের হয়ে থাকে, তাদের বিরোধিতাকারীদের চরিত্রেও ঠিক ততই অধোপতন ঘটে। ইতিবাচক আন্দোলন মানবতাকে যত সুষমামন্ডিত করে, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাকে ততোটাই বিকৃত ও বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়।

ইসলামী সমাজের পরিচালকের সামনে একদিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী গঠনমূলক পরিকল্পনা ছিল। অপরদিকে অব্যাহতভাবে আগমনরত শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা দানের সমস্যা ছিল। উপরন্তু মক্কার কোরায়েশদের পক্ষ থেকে প্রতিমুহূর্তে আক্রমণের আশংকাও ছিল এবং তা প্রতিরোধের জন্য টেকসই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য ছিল। আর এই সমস্ত সমস্যাগুলোর ওপর বাড়তি আর একটা মারাত্মক সমস্যা এই ছিল যে, মদিনার নবগঠিত রাষ্ট্র ও বিকাশমান সমাজের অভ্যন্তরে কুচক্রী ও বিশ্বাসঘাতক গৃহশত্রু বিভীষণদের একটা বৃহৎ গোষ্ঠী নানা রকমের বিভ্রান্তিকর ও বিভেদাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছিল। ভেবে দেখা দরকার যে, এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বনবীর দায়দায়িত্ব কত নাযুক ও জটিল হয়ে থাকতে পারে। ঐ একটি মাত্র মস্তিষ্ক দিনরাত কত রকমের সমস্যার ভাবনায় ছিল তা বোধ হয় আমাদের পক্ষে চিন্তা করাও কষ্টকর। আমরা হয়তো ভেবেও কুল কিনারা পাবোনা যে, ক্ষুদ্র একটি ইসলামী সংগঠন এবং একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অতিক্রমরত আন্দোলন কত বড় প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে পড়েছিল। আর এই যাবতীয় জটিলতা সৃষ্টির দায়ভার ইতিহাসে একমাত্র ইহুদীদের ঘাড়েই চাপানো হয়েছে। এর দায়ভার যথার্থই আল্লাহকে মান্যকারী, হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত মূসা আ.-এর ভক্ত, তাওরাতের অনুগত এবং পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর জ্ঞান ও খোদাভীরুতার স্বগত ঠিকাদার ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপরই বর্তায়।

শুরুতে ইহুদীরা রসূল সা. ও ইসলামের প্রতি অত্যন্ত আশান্বিত ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, এই নব আবির্ভূত ধর্মের অনুরারীরা হযরত ইসমাঈলের বংশধরদের সাথে (অর্থাৎ কোরায়েশদের সাথে- অনুবাদক) দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ইহুদীরা যেসব নবীর ভক্ত তারাও তাদেরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তাদের কিতাবকেও তারা ভক্তি করে এবং তাদের কেবলা অর্থাৎ বাইতুল মাকদাসকে নিজেদের কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদের ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, ধীরে ধীরে মুহাম্মদ সা. ও তার সহচর বৃন্দকে ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যাবে। ইহুদীরা ন্যায় ও সত্যের দৃষ্টিতে এ কথা ভাবছিল না, বরং এটা ছিল তাদের নির্ভেজাল ও বাণিজ্যিক ভাবনা। তারা ভেবেছিল, এই বাস্তুভিটে চ্যুত সর্বহারা লোকদেরকে তারা অচিরেই নিজেদের অনুগত বানাতে পারবে। এই আশায়ই তারা মুসলমানদের সাথে তেমন কোন বাদানুবাদ ছাড়াই চুক্তি সম্পাদন করে এবং মদীনায় যে রাজনৈতিক সংগঠনটা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল, তাকে মেনে নেয়। তাদের ধারণা ছিল যে, এই বিকাশমান রাজনৈতিক শক্তি তো আমাদের পকেটেই রয়েছে। আমাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতাপ তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করা, চিন্তা ও চরিত্রের সংশোধন করা,কিংবা পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা করার কোন উদ্যোগ, চেষ্টা বা চিন্তা চেতনা ইহুদীদের ছিলনা। নিছক একটা গোষ্ঠী স্বার্থ এই হতভাগাদের মাথায় সওয়ার ছিল। তারা মনে করতো মদিনায় তাদের দোর গোড়ায় শিকার এসে জড় হচ্ছে। তাই তারা ফাঁদ ও জাল পেতে শিকার ধরার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা ছিল সাগর থেকে কিনারের দিকে ভেসে আসা মাছের ঝাঁক। আর সেগুলোকে ধর্মীয় ভন্ডামীর জালে আটকানোর জন্য ইহুদী জেলেরা সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে তীরে বসেছিল। কিন্তু অল্প কিছু দিনের অভিজ্ঞতাতেই তাদের আকাশ কুসুম কল্পনা ভেস্তে যেতে লাগলো। মুসলমানরা তাদের বুঝিয়ে দিল যে, তারা এত সহজ শিকার নয়। তারা এমন মজবুত শক্তি যে, শিকারী স্বয়ং তাদের হাতে শিকারে পরিণত হয়। তারা দেখতে পেল যে, ক্রমান্বয়ে একটা বিপ্লবী মেজাজের ইসলামী রাষ্ট্র বিকাশ লাভ করতে যাচ্ছে। এই রাষ্ট্র স্বয়ং একটা দুর্গের মত শক্তিশালী হতে লাগলো। ইহুদীরা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝে ফেললো যে, সাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে যে রাষ্ট্রের পত্তনে তারাও অংশ নিয়েছে, সে রাষ্ট্রটা তাদের হাতের পুতুল হওয়া তো দূরের কথা, তার কোথাও তাদের আংগুল ঢুকানোরও অবকাশ নেই। ঐ রাষ্ট্রে তারা যে মোড়ল সুলভ আসন লাভ করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে ব্যাপারে অচিরেই তারা চরমভাবে ব্যর্থ হলো। ঐ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও তৎপরতায় প্রভাব বিস্তারের যে চেষ্টা তারা করেছিল তাতে তারা বাররার ব্যর্থ হলো। ঐ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, অন্যান্য কর্মকর্তা ও তার মূলনীতিতে আস্থাশীল নাগরিকগণকে নিজেদের বাগে আনতে তারা যতগুলো ষড়যন্ত্র করেছিল, তার সবই নস্যাত হয়ে গেল। বরঞ্চ প্রাথমিক পর্যায়েই এমন বিপত্তি ঘটলো যে, তাদের লোকেরাই রসূল সা. এর পেশ করা মূলনীতির সামনে আত্মসমর্পন করতে লাগলো। এই "বিপজ্জনক" বৈপ্লবিক স্রোত কেবল নিরক্ষর সাধারণ ইহুদীদেরকে নয়, বরং বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এরপরই তারা সম্বিত ফিরে পেল। তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের আধ্যাত্মিকতার রমরমা ব্যবসা লাটে উঠতে চলেছে। তাদের

সাধের শিকারগুলো একে একে হাতছাড়া হতে চলেছে। ইহুদীরা তাদের সম্পাদিত চুক্তির সর্বনাশা ফল দেখে আঁতকে উঠলো। এই চুক্তির আলোকে একদিকে তারা মুসলিম রাষ্ট্রের আইনের আনুগত্য করতে ছিল বাধ্য। অপরদিকে মুসলমানদের সাথে প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। তৃতীয় দিকে তারা দেখতে পাচ্ছিল, যে আশায় তারা এসব করেছিল, তা সবই মরিচীকায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

তাই এ কারণে ভেতরে ভেতরে তাদের মধ্যে চরম বিদ্বেষাত্মক লাভা পুঞ্জীভূত হতে লাগলো এবং থেকে থেকে সেই লাভা তাদের সমাজদেহ থেকে উদ্গীরণ করা হতে লাগলো। বিশেষত, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনায় তো ইহুদী সমাজের প্রতিহিংসার মনোভাব নগ্নভাবে প্রকাশ পেল। প্রথমে তা অপপ্রচারের রূপ ধারণ করলো। তারপর তা পরিণত হলো নাশকতামূলক তৎপরতায়। সর্বশেষে তা বিশ্বাসঘাতকতার আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। আসুন, মাদানী যুগে এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট সেই ইসলাম বিরোধী তৎপরতার পর্যালোচনা করা যাক, যা মানবতার শ্রেষ্ঠতম শুভাকাংখী ও তার সাথীরা ভোগ করেছিলেন এবং যা থেকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ইসলামী রাষ্ট্রকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

অসহিষ্ণু আচরণ

মদিনার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে যেসব গুরুদায়িত্ব বহন করতে হচ্ছিল, তার আলোকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যারা প্রথম কাতারের কর্মী ছিল, তাদের কোন একজনের অভাবও রসূল সা. এবং তাঁর সাথীদের জন্য মর্মঘাতী ছিল। বনু নাজ্জার গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আবু উমামা আসয়াদ বিন যারারা ঠিক এ ধরনেরই একজন কর্মী ছিলেন। কিন্তু একেবারে প্রাথমিক যুগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ফলে ইসলামের একজন সুযোগ্য সৈনিকের অভাব ঘটলো। এ ঘটনা রসূল সা. এর জন্য এমনিতেই মর্মঘাতী ঘটনা ছিল। তদুপরি মদিনার ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর এই মনোকষ্টকে দ্বিগুণ করে তুললো। ইহুদী ও তাদের তল্পীবাহক মোনাফেকেরা বলে বেড়াতে লাগলো যে, "দেখলে তো! মুহাম্মাদ সা. যদি সত্যি সত্যি নবী হতো, তাহলে তার এমন সক্রিয় কর্মী এমন অসময়ে মারা যেত নাকি?" অর্থাৎ কিনা, তাঁর মৃত্যুতে তাদের উল্লাসের অবধি রইল না। চারদিক থেকে প্রতিনিয়ত দুঃখ দুর্বিপাকের আঘাতে জর্জরিত স্বয়ং রসূল সা. এর সংবেদনশীল মনও পর্যন্ত এ অপপ্রচারে নিরব থাকতে পারেনি। তিনি বললেনঃ "আবু উমামার মৃত্যুটা ইহুদী ও আরবের মোনাফেকদের জন্য নিদারুণ মৃত্যু! ওরা বলে বেড়াচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সা. যদি নবী হতো, তাহলে তার সাথী মরতোনা। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি নিজেও রক্ষা পেতে পারিনা, আমার কোন সাথীকেও রক্ষা করতে পরিনা।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

এই ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, শত্রুদের মনে কত আক্রোশ পুঞ্জীভূত ছিল। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা এসে রসূল সা. কে বললো, "এখন আমাদের জন্য আর একজন দায়িত্বশীল নিয়োগ করে দিন।" বনু নাজ্জার যেহেতু রাসূল সা. এর আত্মীয় ছিল,

তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রসূল সা. বললেন, "তোমরা আমার মাতুল, আমি তোমাদের সব কিছুর সাথে আছি এবং আমিই তোমাদের দায়িত্বশীল।"

যে সব শর্তের ভিত্তিতে ইহুদীরা চুক্তিতে সই করেছিল, তার কারণে তারা ইসলামী আন্দোলনের উন্নতি ও বিস্তার লাভে বাধা দিতে পারছিলনা। তাদের চোখের সামনে সাধারণ মানুষ ও তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছিল। অথচ তাদের আধ্যাত্মিক নেতারা, পীর দরবেশরা, ও মুফতীরা নীরবদর্শক হয়ে তা দেখছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ঘরে ঘরেও ইসলাম প্রবেশ করা শুরু করেছিল। তাদের নিজেদের লোকেরা, বিশেষত গণ্যমান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকায় ধর্মব্যবসায়ী মানসিকতার অধিকারী এই সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাঁধ না টুটে গত্যন্তর ছিলনা। তাছাড়া প্রত্যেক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এত অপ্রতিরোধ্য হয়ে থাকে যে, নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে যারা তার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে, তাদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের পরিবারের নবীনরাই ঐ বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে থাকে। ফলে ছেলেরা বাপের সাথে, বউরা শাশুড়ীর সাথে, মেয়েরা মায়ের সাথে, পৌত্রেরা দাদা নানার সাথে এবং দাসেরা মনিবের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে থাকে।

প্রবীণদের ধর্মাচার যখন নবীন আন্দোলনের এই অভ্যন্তরীণ আক্রমণের শিকার হয়, তখন প্রবীণরা ক্রোধে বেসামাল হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে তাদের ধৈর্যসহিষ্ণুতা একেবারেই ফুরিয়ে যায়। ইতিহাস মদিনায়ও তার এই চিরাচরিত রীতির পুনরাবৃত্তি করলো। আমি আগেই বলেছি মদিনায় কত জোরেশোরে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তীর্ণ হচ্ছিল এবং কত দ্রুত গতিতে ঘরে ঘরে নতুন আদর্শের বিজয় ডংকা বাজছিল। এই অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটতে দেখে ইহুদীরা আক্রোশে অধীর হয়ে উঠছিল। বিশেষত যখন বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা এবং খ্যাতনামা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলামের সত্য দাওয়াতে সাড়া দিত, তখন হিংসা ও হীনমন্যতার প্রভাবে সমগ্র ইহুদী সমাজের দেহ শিউরে উঠতো। উদাহরণ স্বরূপ তাদের চোখের সামনেই যেদিন আবু কায়েস আবি আনাস ইসলাম গ্রহণ করলো, সেদিন ইহুদীদের মন যে উত্তেজনায় কি তোলপাড় হয়েছিল, তা বোধকরি ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য কারোই ছিলনা। ইনি একজন নামকরা প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। জাহেলী যুগেই তিনি সমাজের প্রচলিত ধারার বিপরীত দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। শুধুমাত্র স্বভাবসুলভ প্রজ্ঞা ও বিবেকের তাগিদে তিনি মূর্তিপূজা ছেড়ে দেন, স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করা জরুরী সাব্যস্ত করেন, এবং ঋতুবতী স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকেন। প্রথমে খৃষ্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন, কিন্তু সহসাই থেমে যান। নিজ গৃহে মসজিদ বানিয়ে নেন এবং তাতে অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, আমি ইবরাহীম আ. এর খোদার এবাদত করি। বার্ধক্য পীড়িত এই ব্যক্তি হক কথা বলায় খুবই সাহসী ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁর কিছু কবিতা ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে সংকলিত আছে। এ ধরনের তীক্ষ্ণ মেধাবী ও সৎ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে সমাজে বিশিষ্ট গণ্যমান্য হিসাবে চিহ্নিত হবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

বিচিত্র নয় যে, ইহুদীরা তার সাথে তর্কবিতর্ক করে থাকবে এবং নিজেদের পক্ষে টানার

চেষ্টা করে থাকবে। কিন্তু তাঁর নির্মল ও বিকারমুক্ত স্বভাব প্রকৃতি তাঁর মধ্যে সত্য দ্বীনের যে চাহিদা ও রুচি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা স্বয়ং রসূল সা. ছাড়া আর কারো পক্ষে পূরণ করা সম্ভব ছিলনা। রসূল সা. যখন মদিনায় পৌঁছলেন, তখন তার সৌভাগ্যের মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। তিনি ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং ইসলামের বাস্তব অনুসারীতে পরিণত হলেন। এ ঘটনায় ইহুদীদের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে, সেটা কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব।

তবে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, তাদের নিজস্ব সামাজিক গন্ডির বাইরেই হয়েছে। আসল তোলপাড় সৃষ্টিকারী ঘটনা তখনই ঘটলো যখন ইসলাম খোদ ইহুদী সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। তন্মধ্যে যে ঘটনাটা ইহুদী সম্প্রদায়ের মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়, তা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্বিকের মানসিক বিপ্লব। ইতিহাস সাক্ষী যে, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, তা সে দুনিয়াদারী কিংবা দ্বীনদারী যে দিককারই হোক না কেন, তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের আনুপাতিক হার খুবই কম হয়ে থাকে। তবে সৎ স্বভার সম্পন্ন লোকেরা অবশ্যই সকল মহলে বর্তমান থাকে। সত্যের সূর্য দীপ্তি ছড়ানোর সময় তারা চোখ বুজে একগেঁয়েমি ও বিদ্বেষ পরায়ণতার বদ্ধ কুঠুরিতে গিয়ে আত্মগোপন করেনা। বরং উজ্জ্বল আলোক রশ্মি প্রবেশের জন্য মন মগজের বাতায়ন খুলে দেয়। গণ্যমান্য ও জ্ঞানী গুণীদের কাতার থেকে যদিও খুব কম লোকেরই সমাগম ঘটে থাকে ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনে, কিন্তু যারা আসে, তারা খুবই মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকে। কেননা তাদেরকে স্বার্থ ও পদ মর্যাদার বড় বড় শেকল ভেংগে আসতে হয়। ইহুদী সমাজে এ ধরনেরই এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তাঁর প্রাগৈসলামিক নাম ছিল হাসীন। তিনি একজন উঁচুদরের আলেম ও খোদাভীরু ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু কাইনুকা গোত্রের লোক। রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও ইসলামে দাওয়াত দেন ও উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গোটা পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর এক আত্মীয় তাঁর কাছ থেকে শুনে তাঁর ইসলাম গ্রহণের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা শুনুন ঃ "আমি যখন আল্লাহর বার্তাবহকের আগমনের খবর প্রথম শুনলাম, তখন তাঁর নাম, গুণবৈশিষ্ট ও আগমনের দিনক্ষণ জেনে নিলাম। কেননা আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তাই এ খবরটা শুনে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলছিলাম না। তিনি যখন মদিনায় চলে এলেন, তখন পর্যন্ত আমি চুপচাপ ছিলাম। যখন তিনি কোবায় বনু আমর ইবনে আওফের বসতিতে পৌঁছলেন, তখন একটা লোক এসে আমাকে তাঁর আগমন বার্তা শোনালো। এ সময় আমি আমার খেজুর গাছের মাথার ওপর চড়ে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস নিচে বসা ছিলেন। আমি আগমন বার্তা শোনামাত্র উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললাম। ফুফু আমার ধ্বনি শুনে বললেন, "আল্লাহ তোকে ধ্বংস করে দিক! হযরত মূসা বিন ইমরানের আগমনের খবর শুনলেও তুই এমন উল্লাস প্রকাশ করতিনা।" আমি বললাম, "ফুফুজান! আল্লাহর কসম, ইনি মূসা বিন ইমরানের ভাই এবং তাঁরই ধর্ম পালনকারী। মূসা বিন ইমরান যে বিধান এনেছিলেন, ইনিও তাই নিয়ে এসেছেন।" ফুফু বললেন, "হে আমার ভাতিজা, যে নবীর কথা আমাদেরকে বলা হয় যে, কেয়ামতের

আগে আসবেন, ইনি কি সেই নবী?" আমি বললাম হা, ইনিই তো সেই নবী।" এরপর আমি আল্লাহর নবীর সান্নিধ্যে পৌঁছলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর নিজের পরিবার পরিজনের কাছে এলাম এবং তাদেরকেও দাওয়াত দিলাম। ফলে তারা সবাইও ইসলাম গ্রহণ করলো।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

এই নওমুসলিম আলেম যেহেতু ইহুদীদের দুর্বলতাগুলো জানতেন এবং তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা ও নিকৃষ্ট চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাই তাঁর ইসলাম গ্রহণে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হবে, তাও জানতেন। স্বার্থপরতার ভিত্তিতে যখন দল ও গোষ্ঠী গঠিত হয়, তখন চরিত্রের এত অধোপতন ঘটে থাকে যে, ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলার পরিবর্তে নিজেদের মন্দকে ভালো এবং প্রতিপক্ষের ভালোকে মন্দ বলা হয়। নিজের গোয়ালের গরু কালো হলেও তাকে সাদা এবং অন্যের গোয়ালের গরু সাদা হলেও তাকে কালো বলা হয়। এমনকি নিজের গোয়ালের সাদা গরু গোয়াল ভেংগে বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই কালো বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সকল যুগেই এ ধরনের ধর্মাচারীদের চরিত্র একই রকম হয়ে থাকে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি তাদের সাথে থাকে অথবা অন্তত পক্ষে তার সম্পর্কে এই আশংকা জন্মোনা যে তার তৎপরতা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা, ততক্ষণ তার গুণাবলী খোলামনে স্বীকার করা হয়। বরং কখনো কখনো অতিরঞ্জিত করে ঢালাওভাবে তার বিদ্যা ও চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সময়ের কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের কোন মহান ব্যক্তিত্বের ভূমিকা কারো ধর্মব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাত মতামত পাল্টে যায়। আগে যিনি আলেম ছিলেন এখন তাকে মুর্খ বলা হয়। আগে যিনি মুমিন ছিলেন, এখন তাকে বলা হয় কাফের, ফাসেক এবং আরো অনেক কিছু। আগে যে ব্যক্তি জাতির সেবক বলে গণ্য হতো, এখন তাকে বলা হয় বিপথগামী।আগে যে ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র ছিল, এখন সে হয়ে যায় গালাগালের শিকার। বিকৃত স্বভাবের অধিকারী ইহুদী জাতির চরিত্রের এইসব হীনতা ও নীচতা আব্দুল্লাহ ইবনে ছালামের জানা ছিল। তিনি এই হীনতা ও নীচতার ওপর থেকে আবরণ তুলে ফেললেন। মনে মনে একটা নাটকের পরিকল্পনা করে নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা গোপন রেখেছিলেন। উপযুক্ত সময় রসূল সা. এর কাছে হাজির হয়ে বললেন, ইহুদীরা একটা বাতিলপন্থী জাতি। তাদের বিকারগ্রস্ত স্বভাবের মুখোশ খুলে ফেলার জন্য আপনি আমাকে আপনার গৃহে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখুন। তারপর তাদের চোখের আড়ালে রেখে আমার সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইবেন। তারপর দেখবেন, আমার ইসলাম গ্রহণের কথা নাজানা অবস্থায় তারা আমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে। তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জেনে ফেলে, তাহলে আমার ওপর অপবাদ আরোপ করবে ও দোষ বদনাম করবে। রসূল সা. অবিকল তাই করলেন। আবদুল্লাহ বিন সালামকে তাঁর ঘরে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখলেন। এদিকে ইহুদী নেতারা এল এবং আলাপ আলোচনা চললো। তারা নানা প্রশ্ন করলো এবং তার জবাব দেয়া হলো। সর্বশেষে রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যকার হাসীন বিন সালাম কেমন লোক? তারা বললো, 'উনি আমাদের সরদার এবং এক সরদারের ছেলে। উনি আমাদের একজন মহৎ ব্যক্তি এবং একজন বড় আলেম। এভাবে তারা গুণকীর্তন করার

পর আবদুল্লাহ বিন সালাম পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ইহুদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় কর এবং যে ধর্ম মুহাম্মাদ সা. নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহর কসম, তোমরা ভালোভাবেই জান যে, ইনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তোমরা মুহাম্মাদ সা. এর পবিত্র নাম ও গুণাবলী তাওরাতে লিখিত দেখে থাক। তাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তাঁর ওপর ঈমান আনছি, তাঁকে সত্য বলে জানি এবং স্বীকার করছি।" ইহুদীরা এই নাটকে যারপর নাই বিব্রত হলো এবং তৎক্ষণাত বললো, "তুমি মিথ্যুক।" এরপর আব্দুল্লাহ বিন সালামের নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটানো শুরু করে দিল। এক্ষুনি কয়েক সেকেন্ড আগে যাকে মহান ব্যক্তি ও আলেম বলে আখ্যায়িত করেছে, তাকেই মিথ্যুক বলতে শুরু করে দিল। আবদুল্লাহ রসূল সা. কে বললেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে, এরা একটা বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এরা অহংকার, মিথ্যাচার ও অসদাচারের দোষে দুষ্ট। এভাবে একটা নাটকীয় পদ্ধতিতে আব্দূল্লাহ ইবনে সালাম নিজের গোটা পরিবারের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ ঘটনায় ইহুদীদের মনমগজে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে ভেবে দেখুন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ)

এর অল্প কিছুদিন পরে ওহুদ যুদ্ধের দিন প্রখ্যাত আলেম ও সম্মানিত ব্যক্তি মুখাইরিকের বেলায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ইনি ইহুদীদের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁর ছিল অনেকগুলো খেজুরের বাগান। তিনি নিজের জ্ঞানের আলোকে রসূল সা. এর গুণাবলী দেখে তাকে চিনে ফেলেছিলেন। ঘটনাক্রমে ওহুদের দিন এসে গেল এবং তা ছিল শনিবার। একটা মজলিশে তিনি বললেন, "হে ইহুদী জনমন্ডলী, আল্লাহর কসম তোমরা জান যে, মুহাম্মাদ সা. এর সাহায্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।" তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মক্কায় মোশরেকদের মোকাবিলায় মুসলমানদের দলকে সাহায্য করা তোমাদের ওপর নীতিগতভাবে ফরয। এর জবাবে ইহুদীরা যা বললো তা তাদের ধাপ্পাবাজি ও খল মানসিকতারই ঘৃণ্য ছবি তুলে ধরে। তারা বললো, "আজ তো শনিবার।" এ জবাব শুনে মুখাইরিক তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমাদের জন্য কোন শনিবার নেই।" অতপর তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে ওহুদের ময়দানে গিয়ে রসূল সা. এর সাথে মিলিত হলেন। যাওয়ার সময় নিজের পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করে বলে গেলেন, আমি যদি আজ নিহত হই, তবে আমার সমস্ত ধন সম্পদ রসূল সা. এর হাতে সমর্পণ করবো। তিনি আল্লাহর নির্দেশে যেভাবে ভালো মনে করেন, তা খরচ করবেন। সত্যিই এই ত্যাগী সৈনিকটি ঐদিন মারা গেলেন। রসূল সা. তার যাবতীয় সম্পত্তি গ্রহণ করে ব্যয় করেন। তবে মুখাইরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।

ইসলামী আন্দোলনের এই বিজয়াভিযানে ইহুদীদের ধর্মীয় ভন্ডামি যে গোপন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, তা একটা মজার ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতার বর্ণনা করেন, আমি আমার বাবা (ইহুদী সরদার হুয়াই) ও চাচার কাছে অন্য সব সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিলাম। তারা উভয়ে সব সময় আমাকে সাথে সাথে রাখতেন। রসূল সা. যখন মদিনায় এসে কোবায় অবস্থান করতে লাগলেন,

তখন আমার বাবা হুয়াই বিন আখতাব ও চাচা আবু ইয়াসার বিন আখতাব খুব ভোরে তার সাথে দেখা করতে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন। মনে হলো, তারা খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন। তারা খুব ধীর গতিতে চলছিলেন। আমি অভ্যাস মত মুচকি হেসে তাদের সামনে গেলাম। কিন্তু ক্লান্তির কারণে তারা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপই করলোনা। আমার চাচা আবু ইয়াসার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কি হে, ইনিই কি সেই (প্রতিশ্রুত নবী) ব্যক্তি? বাবা বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম।" চাচা আবার জিজ্ঞেস, "তুমি কি তাকে চিনে ফেলেছ? তুমি কি নিশ্চিত?" বাবা বললেন, হাঁ। চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তাঁর সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?" বাবা বললেন, "শুধুই শত্রুতা। যতদিন বেঁচে আছি, খোদার কসম, শত্রুতাই করে যাবো।"

এই ছিল ইহুদীদের আসল মানসিকতা। তারা খুব ভালো করেই জানতো যে, তাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি সত্যের আহ্বায়ক এবং নবী। তাঁর প্রতিটি কথা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সমগ্র চরিত্র তাঁর মর্যাদাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁর চেহারা তাঁর নবুয়তের লক্ষণ প্রতিফলিত করছে। তারা শুধু যে জানতো ও বুঝতো তা নয়, বরং গোপন বৈঠকে তা মুখ দিয়ে স্বীকারও করতো। কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন না করে তারা বিরোধিতা ও শত্রুতার জন্য কৃতসংকল্প হতো। এটাই ছিল ইহুদীদের চিরাচরিত স্বভাব। সূর্য উঠলে যে আলোর বান ডাকে তা কে না জানে। মানুষ ও জীবজন্তুর চোখ আছে, তাই তারা এ দৃশ্য দেখতে পায়। কিন্তু যে ঘাসপাতার চোখ নেই, তারাও টের পায় যে, প্রত্যেক অন্ধকার রাতের শেষে যে ঘটনা প্রতিদিন ঘটে থাকে, তা ঘটে গেছে। এমনকি তাপ, উষ্ণতা, মাটির নিষ্প্রাণ কণাগুলো, পানির ফোঁটাগুলো এবং বাতাসের ঝাপটাগুলোও জেনে ফেলে যে, আলোর বার্তাবাহক আবির্ভূত হয়েছে। সূর্যোদয় এমন একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা যে, চামচিকে ও বোবা পর্যন্ত তা জেনে ফেলে। কিন্তু তাদের স্বভাবের বক্রতা এই যে, রোদ ওঠার পর দুনিয়ার আর সব জীব জানোয়ারের চোখ খুলে যায়, কিন্তু পেঁচা ও চামচিকের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু তাদের জন্য সূর্যোদয়ের আলামতই হয়ে থাকে সূর্য রশ্মিতে তাদের চোখ ঝলসে যাওয়া ও বুজে যাওয়া। মানুষ এত অন্ধ হতে পারেনা যে, তার সামনে আল্লাহর নবীগণ অলৌকিক পর্যায়ের জ্ঞান ও চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হবেন এবং সে অনুভবই করবেনা যে, কোন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব লোক দেখে, জানে, বোঝে এবং এ সব কিছুর পরও চোখ বন্ধ করে। তারপরও যদি আলো চোখের ভেতরে প্রবেশ করে, তবে চোখের ওপর পট্টি বেঁধে নেয়; হাত দিয়ে ঢেকে নেয়, মুখ বালুতে লুকায়, কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করে তার ওপর কালো পর্দা ফেলে দেয়। প্রবাদ আছে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায়, কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তিকে জাগানো যায়না। অনুরূপভাবে, অজ্ঞ লোককে জ্ঞান দান করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি জেনেও না জানার ভান করে, তাকে অজ্ঞতার জগত থেকে বের করে আনা সম্ভব নয়। ইহুদী জাতির অধিকাংশ এবং তাদের বড় বড় আলেমদের এই অবস্থাই হয়েছিল। কোরআনও তাদের এই বিকৃতির উল্লেখ করে বলেছে যে, يعرفونه كما يعرفون ابناءهم "অর্থাৎ তারা নিজের সন্তানদেরকে যেমন নিশ্চিতভাবে জানে ও চেনে, রসূল সা. কেও ঠিক তেমনি জানে ও চেনে।"

ইহুদী নেতারা রসূল সা. এর উচ্চ মর্যাদা ও সাধারণ মানুষরা তাঁর নতুন দাওয়াতের প্রতি ধাবমান হতে দেখে হিংসায় জ্বলতে থাকতো এবং তাদের হৃদয়ের জগতে ঘোরতর অসুহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা কেবল বৃদ্ধিই পেত।

কুতর্ক ও বাজে প্রশ্নের বাণ

বিকারগ্রস্ত ভণ্ড ধার্মিকদের মনে যখন কোন সক্রিয় দাওয়াত, কোন বিকাশমান আন্দোলন ও কোন মহান দাওয়াতদাতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জন্মে যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা জোরদার হয়, তখন তারা বুঝ সৃষ্টিকারী আলাপ-আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করে বিতর্কের পথ খুলে দেয়। বিতর্কের মাধ্যমে যে সব প্রশ্ন ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হয়, তা কখনো কোন কথা বুঝার উদ্দেশ্যে নয় বরং না বুঝার উদ্দেশ্যেই করা হয়। অন্য কথায়, 'আমি মানবোনা' এটাই হয়ে থাকে তাদের বিতর্কের প্রেরণার উৎস। কিন্তু বিতর্কের উদ্দেশ্য কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সরলমতি জনসাধারণকে সত্যানুসন্ধানের স্বাভাবিক পথ থেকে হটিয়ে দিয়ে সন্দেহ সংশয়ের কবলে নিক্ষেপ করা, যাতে তারা সহজ সরল যুক্তি থেকে দূরে সরে গিয়ে জটিল তাত্ত্বিক প্রশ্নের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় এবং দাওয়াতের যৌক্তিক মূল্য ও নৈতিক প্রভাব যাচাই করার পরিবর্তে পেঁচালো সমস্যাবলীর কানাগলিতে ঘুরপাক খেতে থাকে। ভন্ড আলেমরা নিজেদের সম্পর্কে তো পুরোপুরি আস্থাশীল থাকে যে, ইসলামী আন্দোলন তাদেরকে কখনো নিঃশেষ করতে পারবেনা। তাদের আশংকা থাকে সাধারণ মানুষদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া নিয়ে। তাই তাদেরকে তাদের সমর্থনের ওপর বহাল রাখার জন্য তারা বাঁকা বাঁকা প্রশ্নের বেড়ি তৈরী করে থাকে। ইহুদী ভন্ড আলেমরাও এই কারসাজিতেই লিপ্ত ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে যাওয়ার পর ইহুদীরা সর্বাত্মকভাবে মনোযোগ দিল বিতর্ক সৃষ্টির দিকে। বাঁকা ও জটিল বাহাসের তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো ইসলামী আন্দোলনের ওপর। কিন্তু এই ন্যাক্কারজনক যুদ্ধের তৎপরতাও প্রকাশ্য ঘাঁটি থেকে নয়, বরং মোনাফেকদের গোপন ঘাঁটি থেকে চালু করা হলো। খোদাভীরুতার জমকালো পোশাকে আবৃত বহুরূপী লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের সম্মেলনগুলোতে যোগদান করতো এবং কথা প্রসংগে অত্যন্ত সরল ও নিরীহ গোবেচারার ভাব দেখিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে হরেক রকমের প্রশ্ন তুলতো।

এক বৈঠকে তারা রসূল সা. এর কাছে প্রশ্ন রাখলো ঃ আল্লাহ যখন গোটা সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করেছে? দেখলেন তো মনের বক্রতা? ইহুদীরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে বলে দাবী করতো। তারা তাঁর নবীদের ওপর বিশ্বাসী এবং তাঁর কিতাবসমূহের নিশানবাহী ছিল। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তারা আগে থেকেই ওয়াকিফহাল ছিল। অথচ ইসলাম যখন সেই আল্লাহর দিকেই আহ্বান জানালো, তখন আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মনে খুবই জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়ে গেল। তাদের প্রশ্ন থেকে বাহ্যত মনে হতো যে, এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলেই তাদের জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাবে। কিন্তু প্রশ্নের বক্রতা থেকে বুঝা যাচ্ছিল, হেদায়াত লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য পালাবার পথ

দেখানোই প্রকৃত উদ্দেশ্য। রসূল সা. এই বাঁকা প্রশ্নের জবাব খুবই সোজাভাবে দিলেন। অর্থাৎ খুবই সহজ সরল পন্থায় সূরা ইখলাস পড়ে শুনিয়ে দিলেন ঃ "(হে মুহাম্মদ) বল, আল্লাহ্ এক। তিনি অভাবশূন্য। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনা।" (হায়াতে মুহাম্মদ ঃ মুহাম্মদ হোসেন মিশরী)

আসুন, আপনাকে আর একটা মজার মজলিসে নিয়ে যাই। ইহুদীদের কতিপয় নামকরা আলেম একবার রসূলের সা. বৈঠকে এল এবং বললো, "আমাদের চারটে প্রশ্নের জবাব দিন। তাহলে আমরা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করবো এবং আপনার আনুগত্য করবো।" রসূল সা. বললেন, "তোমাদের প্রতিশ্রুতির দায়দায়িত্ব তোমাদের ওপরই থাকলো, কী প্রশ্ন করতে চাও কর।" প্রশ্নগুলো সামনে আসার আগে পাঠক নিজেই একটু ভাবুন তো যে, ইসলামী আন্দোলনের যথার্থ রূপ অনুধাবন করার জন্য বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষ থেকে কী ধরনের প্রশ্নের আশা করা উচিত। তাদের উচিত ছিল মৌলিক তত্ত্ব সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা, ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি জানতে চাওয়া। মুসলমান হতে হলে কী কী করা উচিত তা জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু এ সব জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই ছিলনা। তারা নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরী জাহির করার জন্য একে একে নিম্নের প্রশ্নগুলো তুলে ধরলো ঃ

১- শিশুরা পিতার বীর্য দ্বারা তৈরী হওয়া সত্ত্বেও দেখতে মায়ের মত হয় কেন?

২- রসূল সা. এর ঘুম কেমন হয়?

৩- ইসরাইল (এয়াকুব আলাইহিস্ সালাম) কোন্ কোন্ জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন এবং কেন?

ইসলামী আন্দোলন সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্যই নাকি এ প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছিল। কেবল চতুর্থ প্রশ্নটার কিছুনা কিছু সম্পর্ক সরাসরি ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সাথে ছিল। কিন্তু এরও প্রকৃতি একই ছিল। চতুর্থ প্রশ্নটা ছিল ঃ রূহ কি?

রসূল সা. শান্তভাবে প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিলেন। শেষ প্রশ্নের জবাবে বললেন, তোমরা ভালো করেই জান যে, রূহ হচ্ছে জিবরীল এবং তিনিই আমার কাছে আসেন।

সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হলো। কোন জবাবের প্রতিবাদ করা হলোনা। বরং প্রত্যেক জবাবের শেষে তারা মন্তব্য করলো ঃ 'আল্লাহুম্মা না'আম' অর্থাৎ হে আল্লাহ, এটা সত্য।

পাঠক হয়তো আশা করছিলেন যে, এই জবাবগুলো পাওয়ার পর তারা ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। না, কখখনো নয়। রসূল সা. এর শেষ কথাটা শুনে তারা বললো, "কিন্তু হে মুহাম্মাদ সা., জিবরীল তো আমাদের শত্রু। সে যখনই আসে, আমাদের জন্য খুব খারাবীর বার্তা নিয়ে আসে।" এ কথার অর্থ এই যে, জিবরীল যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাবাহী হবার দাবি নিয়ে আসেন, তখনই একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, নানা রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়, এমনকি পরিস্থিতি জেহাদ পর্যন্ত গড়ায়। তার সাথে আমাদের বনিবনা নেই। এই ফেরেশতার শত্রুতা যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াতো, তাহলে আমরা নির্ঘাত আপনার সহযোগী হয়ে যেতাম

এবং আপনার অনুকরণ ও অনুসরণ করতাম। অর্থাৎ কিনা, দাওয়াত, আন্দোলন এবং বার্তা–সবই সঠিক। কিন্তু এর পটভূমিতে আল্লাহ যে ফেরেশতাকে জড়িত করেছেন, তাতেই আমাদের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই ঐ জিবরীল যেখানে আছে, সেখানে আমরা আসতে পারিনা।

রসূল সা. কোরআনের ভাষায় এর এমন জবাব দিলেন, যারা তা শুনেছে, তারা কখনো তা ভুলতে পারবেনা। তিনি বললেন "বল, (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যক্তি জিবরীলের শত্রু হবে, সে যেন জেনে রাখে, কোরআনকে আল্লাহ নিজের আদেশের আওতায় তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে নাযিল করেছেন। এই কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের সমর্থন করে এবং মুমিনদের জন্য (শত্রুতা, বিপদমুসিবত বা খুনখারাবীর বার্তা নয় বরং) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

আরো একটা বিতর্কের সূত্রপাত হলো, রসূল সা. কোন এক প্রসঙ্গে নবীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত সোলায়মান আ. এর বিষয়টা উত্থাপন করলেন। এ নিয়ে ইহুদী মহলে অনেক কথা হলো। বলা হতে লাগলো, মুহাম্মদ সা. এর আশ্চার্য কথা শুনেছ? সে বলে যে, দাউদের ছেলে সোলায়মানও নাকি নবী ছিল। আরে, আল্লাহর কসম, সে তো নিছক একজন যাদুকর ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। কোরআন তাদের এই সব প্রলাপোক্তি খন্ডন করে বলেছে, যাদু তো কুফরি। হযরত সোলায়মান কখনো কুফরীতে লিপ্ত হননি। ব্যাবিলনের কূয়া সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, সেতো কেবল শয়তানের কারসাজি। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

কেবলা পরিবর্তন

ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে ইহুদীরা এমন অনেকগুলো লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল, যার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে আশা জন্মে গিয়েছিল যে, ধীরে ধীরে এই ঐতিহাসিক শক্তি তাদের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে। কোরআনে বনী ইসরাঈলের বিশ্বজোড়া মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন "আমি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" তাছাড়া কোরআনে তাদের নবীদের নবুয়ত ও তাদের পবিত্র গ্রন্থের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে 'এস, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্ব সম্মত একটা ব্যক্তব্যের দিকে' এই আহ্বান জানানোর মাধ্যমে দ্বীনের কেন্দ্রীয় তত্ত্বকে উচ্চকিত করা হয়েছিল।

এ ছাড়া, রসূলুল্লাহ সা. মোশরেকদের রীতিনীতির মোকাবিলায় ইহুদীদের কিছু কিছু রীতিনীতিকে পসন্দ করতেন, যেমন মোশরেকরা চুলের একটা গোছা বড় করে রাখতো, কিন্তু ইহুদীরা এটা রাখতোনা। এ ক্ষেত্রে তিনি মোশরেকদের বিরোধিতা ও ইহুদীদের পক্ষাবলম্বন করেন। যে সব ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসতোনা, সে সব ব্যাপারে রসূল সা. ইহুদী ও খৃষ্টানদের নীতি অনুসরণ করতেন।* মদিনার ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখতো। রসূলও সা. ঐ দিন রোযা রাখতেন এবং মুসলমানদের জন্যও রোযা রাখা পসন্দ করতেন। কোন ইহুদীর লাশ সৎকারের জন্য নিয়ে

---

* (বোখারী, পোশাক সংক্রান্ত অধ্যায়)

যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। সর্বোপরি, মুসলমানদের নামাযের কেবলা ছিল বাইতুল মাকদাস। এ সব জিনিস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতো যে, ইসলাম মোশরেকদের চেয়ে আহলে কিতাবের নিকটতম ছিল। প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, ইহুদী ধর্মের মূল কাঠামোকে তো ইহুদীদের স্বার্থপর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতারা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে ফেলেছিল। আর সেই বিকৃত কাঠামোটাও হয়ে গিয়েছিল নিষ্প্রাণ। অথচ হযরত মূসা আ. যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল অবিকল ইসলাম। অন্য সকল নবীও ইসলামেরই বাহক, আহ্বায়ক ও প্রচারক ছিলেন। কেবল প্রত্যেক নবীর আমলে শরীয়তের বিধানে সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য থাকতো। মুহাম্মাদ সা. সেই একই ইসলামকে সারা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন। শুধু তত্ত্ব হিসাবেই পেশ করছিলেন না, বরং বাস্তব আইন ও বিধানের আকারে তা কার্যকরও করেছিলেন। এই তাত্ত্বিক সম্পর্কটার কারণেই রসূল সা. নিজেও আশাবাদী ছিলেন যে ইহুদীরা ইসলামী তৎপরতাকে পর্যায়ক্রমে বুঝতে পারবে, বুঝার সাথে সাথে স্বাগতও জানাবে এবং এ কাজকে নিজেদেরই করণীয় কাজ বলে গণ্য করবে। তারা একদিন এজন্য আনন্দিত হবে যে, আল্লাহর নামের পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, নবীদের শেখানো চারিত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামষ্টিক জীবন গড়ে উঠছে, এবং তাওরাতের শরীয়তের মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। এই আশাবাদের ভিত্তিতেই কোরআন স্বীয় দাওয়াতকে এভাবে পেশ করেছে যে, তার কাছে দলীয় ও গোষ্ঠীগত পরিচয়ের কোন গুরুত্ব নেই, বরং আসল গুরুত্ব হলো নীতি ও কর্মের তথা আদর্শের ও চরিত্রের এবং আকীদা ও আমলের। কোন ব্যক্তি চাই সে ইহুদী হোক, খৃষ্টান হোক, নক্ষত্র পূজারী হোক, কিংবা মুসলমান হোক, সে যদি আল্লাহ, আল্লাহর বিধান, তার নবীদের দাওয়াত এবং কেয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহীর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনে, এবং তারপর নিজের গোটা জীবনকে সৎকর্মশীল জীবনে পরিণত করে দেখিয়ে দেয়, তাহলে এটাই সত্যিকার কাংখিত ও বাঞ্ছিত জিনিস। নাম নয় বরং কাজই আসল বস্তু। সাইনবোর্ড নয়, নির্ভেজাল পথই আসল বাঞ্ছিত জিনিস। কে কার সাথে সম্পর্ক রাখে, কে কার দল বা গোষ্ঠীর লোক, তা আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো, কার চরিত্র কেমন, এবং মানবতার সম্মিলিত কল্যাণ কিভাবে নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু ইহুদীদের দিক থেকেও যেমন ইসলামী আন্দোলনের আশা পূর্ণ হয়নি, তেমনি ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকেও ইহুদীদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই সহসা ইসলামী আন্দোলনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। এই পরিবর্তনটা ছিল কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা। প্রত্যেক যুগে ইসলামী আন্দোলনের মূল স্বভাব এই ছিল যে, সে নিজের অস্তিত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টকে বহাল রাখতে চায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে আদর্শিক ও আকীদাগত স্বকীয়তাকে জীবিত রাখতে বদ্ধপরিকর। মক্কায় থাকতে এই উদ্দেশ্যেই বাইতুল মাকদাসকে কেবলা বানানো হয়েছিল, যাতে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী দল নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকে। এর ফলে হিজরত পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলমানরা মোশরেকদের মোকাবেলায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করে।

মোশরেকরাও বুঝতে পেরেছিল যে, তারা ও মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দুটো আদর্শের ধারক ও বাহক। এই চেতনা ও অনুভূতিকেই "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এতে স্পষ্টভাবেই বলে দেয়া হয়েছে , তোমাদের পথ আলাদা, আমাদের পথ আলাদা। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই মিল নেই।

মদিনায় চলে আসার পর মুসলমানদের স্বকীয়তা যদি কোন দিক থেকে বিপন্ন হবার আশংকা থেকে থাকে, তবে তা ছিল সেখানকার ইহুদী ও খৃষ্টান গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এখানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিষ্প্রাণ ধর্মের মিশ্রণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যকে সুরক্ষিত করার এবং মুসলিম সমাজকে ইহুদী সমাজে মানসিকভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার কবল থেকে রক্ষা করার। মক্কী যুগে বাইতুল মাকদাসকে অস্থায়ীভাবে কেবলা বানানোর যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, এখানে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের হৃদয়ের সম্পর্ক হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেবলার প্রতিই ঘনিষ্ঠতর ছিল। রসূল সা. স্বয়ং হযরত ইবরাহীমেরই বংশধর ছিলেন এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক সংগ্রামীরাও ছিলেন এই বংশেরই লোক। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সেই অস্থায়ী ব্যবস্থা তখন নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই রসূলের সা. সত্যাভিষ্ট মন এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষমান ও উদগ্রীব ছিল।

আসলে কেবলা পরিবর্তনের আদেশ জারী করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করলেন। তাদের শূন্য পদে উম্মতে মুহাম্মদীকে নিয়োগ দান করলেন। গোটা বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত তৎপরতার যে কেন্দ্র এতদিন বাইতুল মাকদাসে ছিল, এখন তা কা'বা শরীফে স্থানান্তর হলো। মুসলমানদেরকে আখ্যায়িত করা হলো মধ্যপন্থী অর্থাৎ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় জাতি। তার ওপর অর্পন করা হলো মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষ্যদানের গুরু দায়িত্ব এবং সমগ্র মানবজাতির নেতৃত্ব।

মদিনায় হিজরতের পর ষোল মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া হতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রজব কিংবা শা'বানের ঘটনা। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. বিশর বিন বারা ইবনে মারূরের রা. বাড়ীতে দাওয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের নামাযের সময় হলে তিনি জামায়াতের ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকাত পড়ানো হলো। তৃতীয় রাকাতে ওহী যোগে নিম্নের আয়াত নাযিল হলোঃ

" আমি আকাশের দিকে তোমার মুখ তোলা দেখে থাকি। কাজেই তুমি যে কেবলা পসন্দ কর, সেদিকেই তোমাকে ফেরাচ্ছি। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। এখন তুমি যেখানেই থাক, ঐ দিকেই মুখ করে নামায পড়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪)

এ আদেশ শোনা মাত্রই আল্লাহর সবচেয়ে অনুগত বান্দা নামাযের মধ্যেই কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর তাঁর সাথে সাথেই তাঁর অনুসারী নামাযীরা সবাই নতুন কেবলার দিকে মুখ ফেরালেন। বাইতুল মাকদাস মদীনা থেকে সোজা উত্তরে এবং মক্কা দক্ষিণে অবস্থিত। নামাযের মাঝখানে কেবলা পরিবর্তনের অর্থ এই দাড়ায় যে, ইমামকে

মুক্তাদীদের সামনে থেকে সোজা পেছনের দিকে চলে আসতে হয়েছিল এবং নামাযীদের কাতারকে সোজা পেছনের দিকে ঘুরে যেতে হয়েছিল। এরপর মদীনা ও তার পার্শবর্তী পল্লীগুলোতেও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো। বারা বিন আযের রা. বর্ণনা করেন যে, এক মসজিদে লোকেরা যখন রুকুতে ছিল, তখন এ খবর পৌঁছে। তারা খবর শোনামাত্রই ঐ অবস্থায়ই কা'বার দিকে মুখ ফেরালেন। আনাস বিন মালেকের বর্ণনা অনুসারে বনু সালমা গোত্রে পরদিন ফজরের নামাযের সময় খবর পৌঁছে, লোকেরা এক রাকাত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে ছিল। এই সময় ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাত সবাই নতুন কেবলার দিকে মুখ ঘুরায়। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা ঃ টীকা ১৪৬)

এই পরিবর্তনে যে হৈ চৈ আসন্ন হয়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে কোরআন আগে ভাগেই মুসলমানদের সাবধান করে দেয় ঃ "অচিরেই অজ্ঞ লোকেরা অপপ্রচারের তান্ডব সৃষ্টি করবে যে, মুসলমানরা কোন কারণে কেবলা পরিবর্তন করলো?" নানা রকমের প্রশ্ন তোলা হবে, অদ্ভুত ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং পারস্পরিক জাতিগত সম্পর্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। মুসলমানরা যাতে আসন্ন অপপ্রচারের তান্ডবের সামনে জোরালো অবস্থান নিয়ে দাঁড়াতে পারে, সে জন্য কোরআন তাদেরকে কেবলা পরিবর্তনের তাৎপর্য পূর্বাহ্নেই বুঝিয়ে দিল। সে জানিয়ে দিল যে, শুরুতে বাইতুল মাকদাসকে কেবলা বানানোর উদ্দেশ্য ছিল আরব জাতীয়তাবাদের মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করা। কেননা আরবরা নিজেদের জাতিগত বৃত্তের বাইরের কোন জিনিসের কোন গুরুত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলনা। আর এখন বাইতুল মাকদাস থেকে কা'বার দিকে মুখ ঘুরানোর উদ্দেশ্য ইসরাইলী আভিজাত্যের মূর্তিও ভেংগে গুড়িয়ে দেয়া। একটা কাজ আগে করা হয়েছিল। দ্বিতীয় কাজটা এখন করা হলো। আরব জাতীয়তাবাদের উপাসকরা আগেই ছাটাই হয়ে গিয়েছিল। এবার ইসরাইলী জাতীয়তাবাদের পূজারীদের ছাটাই হওয়ার পালা। এভাবে মোনাফেক নামক ঘুনের কবল থেকে সমাজ পবিত্র হয়ে যাবে। এরপর ইসলামী সমাজে শুধু তারাই টিকে থাকবে, যাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর আদেশ ও রসূলের সুন্নাহরই গুরুত্ব সর্বাধিক। এক্ষণে ইসলামী আন্দোলন যে পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তা রসূল সা. এর একনিষ্ঠ আনুগত্যকারীদেরকে সমস্ত আদর্শহীন লোকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত করবে। আর আদর্শহীনদেরকে সেই সব একনিষ্ঠ ঈমানদারদের থেকে ছাটাই করে দেবে, যারা বিশ্বাস করে যে পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর এবং আল্লাহই আনুগত্যের আসল কেন্দ্র বিন্দু যারা এই নিগুঢ় তত্ত্ব জানে যে, শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করাই আসল নেক কাজ নয়, ,বরং আসল নেক কাজ হলো শরীয়তের এই সব বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার অভ্যন্তরে সক্রিয় আসল প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তি হলো আল্লাহর ওপর, আখেরাতের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর কিতাবের ওপর, ও তার নবীদের ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। সুতরাং তোমাদের কেবলার বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা প্রতিষ্ঠায় যে জিনিসকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, তা হলো ঃ

ভালোকাজ ও কল্যাণমূলক কাজের দিকে অগ্রসর হও, আল্লাহর বড় বড় বৈপ্লবিক ও পরিবর্তনকামী নির্দেশ পালনে কোন বিরোধী শক্তির ভয় পেয়না, ভয় পেয়ো শুধু আল্লাহকে।

কোরআন বিশ্ব বিধাতার আদেশ ঘোষণা করার সময়ই বলে দিয়েছিল যে, এ ঘটনা দৃঢ় প্রত্যয়ী মুমিনরা ব্যতিত সবার কাছেই কঠিন ও কষ্টকর লাগবে। এ নিয়ে যখন গোলযোগ সৃষ্টি হবে, তখন অনেকে ঘাবড়ে যাবে। প্রত্যেক অলিগলিতে যখন বিতর্ক ছড়িয়ে পড়বে, তখন দুর্বল লোকদের মাথায় চক্কর দেবে এবং তাদের আবেগে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হবে। এবার শুনুন কেবলা পরিবর্তন নিয়ে যে সব মন্তব্য করা হয়েছিল তার কিছু নমুনা।

মোশরেকরা বললো, ঐ দেখ, এবার মুহাম্মাদ সা. ও তার দলবলের কিছুটা চেতনা ফিরে এসেছে। আমাদের কা'বাকে এবার যখন কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে তখন ওরা ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মেও ফিরে আসবে।

ইহুদীরা বললো, ইসলামের নেতা আমাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আক্রোশে এতই বেসামাল হয়ে গেছে যে, নবীদের কেবলাকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। সে যদি নবী হতো তাহলে এই কেবলাকে পরিত্যাগ করতোনা।

মোনাফেকরা বলতে লাগলো, 'কিছুই বুঝে আসছেনা মুহাম্মাদের সঠিক কেবলা কোন্টা। কেবলা নিয়ে যেন খেলা শুরু হয়েছে। যেদিকে মন চায়, সেদিকেই মুখ ফেরানো হয়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, পুরো ইসলাম ধর্মটাই যেন ইচ্ছের খেলা।

আর যারা পাক্কা ঈমানদার ছিল, তারা বললো, আমরা আদেশ শুনেছি, তার আনুগত্য করেছি এবং আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। (যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড)

শেষোক্ত এই ঈমানদারদের দলটাই অপপ্রচারের ঝড়ের কবলে পড়ে গেল। চারদিক থেকে প্রশ্ন, কুটতর্ক, এবং ব্যংগ বিদ্রুপের বান নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। প্রত্যেক মজলিসে একই আলোচনা, প্রত্যেক অলিতে গলিতে জটলা পাকিয়ে একই কানাঘুষা এবং প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনাকর বাগবিতন্ডা, চলছিল। যে কোন বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের এবং জনসাধারণের চিরাচরিত ধ্যান ধারণার বিপরীত প্রতিটি পদক্ষেপে এ ধরনের হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের কর্মীরা ঘাড়বে গিয়ে ও দিশেহারা হয়ে অনেক সময় উত্তেজনার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এই আশংকার পরিপ্রেক্ষিতেই উপদেশ দেয়া হলো, এ সব সংকটজনক পরিস্থিতি অতিক্রম করার জন্য ধৈর্য ও নামাযই সর্বোত্তম পন্থা। অপপ্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হলো, সত্য অনুসন্ধান করা কখনো তাদের লক্ষ্য নয়। যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তারা কখনো পরিতৃপ্ত ও শান্ত হবার নয়। তাদের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কেবল বিব্রত করা। তোমরা যতক্ষণ তোমাদের আদর্শ ও মূলনীতি ত্যাগ করে তাদের অনুসারী না হবে, ততক্ষণ তারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেনা।

অর্থহীন কূটতর্কের জবাবে চূড়ান্ত যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব ইসলামী আন্দোলনের কাঁধের ওপর অর্পিত ছিল। সে দায়িত্ব পালন করার জন্য অত্যন্ত ধারালো ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করা হলো এবং জনগণের সামনে পবিত্র কা'বার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সূরা আল ইমরানের এক জায়গায় ব্যাখ্যা করা হলো। এরশাদ করা হলো ঃ

"মানব জাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম এবাদতের স্থান হলো মক্কায় অবস্থিত সেই ঘর, যাকে বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং যাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র

বানানো হয়েছে। এতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। সেখানে ইবরাহীমের এবাদতের জায়গাও রয়েছে। সেখানে যে একবার প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই ঘরের কাছে পৌঁছার সামর্থ রাখে, তার সেখানে গিয়ে হজ্জ আদায় করা কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ সারা দুনিয়াবাসী থেকেই মুখাপেক্ষাহীন।" (আয়াত ৯৬-৯৭)

বাইতুল মাকদাস সম্পর্কে এ তথ্য বাইবেল থেকেই জানা গিয়েছিল যে, হযরত মূসার সাড়ে চারশো বছর পর হযরত সোলায়মান তা নির্মাণ করিয়েছিলেন। হযরত সোলায়মানের শাসনামলেই তাকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উভয় প্রকারের সর্বসম্মত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কা'বা শরীফকে হযরত ইবরাহীম আ. হযরত মূসারও আট/নয় শো বছর আগে নির্মাণ করেছিলেন। কা'বা শুধু সময়ের দিক থেকেই জ্যেষ্ঠ নয়, বরং তার পবিত্র পরিবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলীও রয়েছে। এর সাথে ইসলামের অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহ্য জড়িত রয়েছে। তার প্রতিটি প্রান্তরে উৎকীর্ণ রয়েছে সত্য ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত করার ইতিহাস। তা ছাড়া এতে হযরত ইবরাহীমের এবাদতের উপকরণও সংরক্ষিত রয়েছে। এ স্থান আজও তাওহীদী প্রেরণার উৎস। এবাদতের এই কেন্দ্রভূমি যে আল্লাহর কাছেও গৃহীত ও মনোনীত, তার অকাট্য প্রমাণ এইযে, উষর মরুর অভ্যন্তরে নির্মিত এই ঘরের আশপাশে বিশাল এক মনুষ্যবসতি গড়ে উঠেছে এবং লোকেরা এখানে অনেক দূর দূর থেকে এসে থাকে। এর উচ্চ মর্যদার আরো একটা উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, এই তরুলতাহীন উষর মরুবাসীদের কাছে আপনা থেকেই সব ধরনের জীবিকা পৌঁছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আরবের জংগী বেদুইন সমাজে এই পবিত্র ঘর চার হাজার বছর ধরে শান্তি ও নিরাপত্তার একটা দ্বীপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে যেই প্রবেশ করুক, তার জান মাল ও ইজ্জত নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে রক্ত পিপাসু লোকেরা পর্যন্ত এই ঘরের ছায়ায় এসে তরবারী কোষবদ্ধ করে ও আক্রোশের আগুন নিভিয়ে ফেলে। খুনী ও ডাকাত এর বেষ্টনীতে প্রবেশ করা মাত্রই শান্তি প্রিয় নাগরিক হয়ে যায়। তাই ইবরাহীম আ. এর দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নামা যে কোন আন্দোলনের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হওয়া এই ঘরেরই ন্যায্য অধিকার। এতে ধর্ম বা যুক্তির পরিপন্থী কোন্ জিনিসটা হয়েছে যে, তা নিয়ে অলিগলিতে এত কানাঘুষা চলছে?

এই যুক্তির ফলে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকলে তা নেয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। ইহুদীরা কেবলা পরিবর্তনকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটা চূড়ান্ত বৈরী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেছিল। কেননা এর কারণে তাদের সকল আশা ভরসা খতম হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদেরকে বাগে আনা যাবে বলে তারা যে স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন নস্যাত হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারলো, মুসলমানদেরকে বশে আনা সহজ নয়। অপরদিকে মুসলমানরাও ইহুদীদের মনের সমস্ত ক্লেদ স্পষ্ট দেখতে পেল। তাদের মানসিকতার সমস্ত অন্ধকার দিক তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। এত ঘৃণ্য মানসিকতা যাদের, তাদের সাথে সেই ভালো ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়, যার ভিত্তিতে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝে নিল যে,

মদিনাতেও ইসলামী আন্দোলনকে নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে হবে। ধর্ম ও খোদাভীরুতার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের আশা করা বৃথা। বরঞ্চ দিন দিন এই আশংকা ঘনীভূত হতে লাগলো যে, ইহুদীরা মক্কার কাফের ও মোশরেকদের চেয়েও জঘন্য মানসিকতা নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথ আগলে ধরবে। কিন্তু এ আশংকা সত্ত্বেও রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীদের আচরণে সব সময়ে ইসলামের আহ্বায়ক সুলভ নৈতিকতার মান বজায় রইল। যে যেমন, তার সাথে তেমন আচরণ ইহুদী মোনাফেক ও অন্যান্য বৈরী শ্রেণীর লোকদের সাথে করা হয়নি। কূটতর্ক, ব্যংগ বিদ্রুপ ও ইতরসুলভ আচরণের মোকাবেলায় মুসলমানরা হার মানতো। কোন কথা বলতে হলে ভদ্র জনোচিত পন্থায় ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কেবল যুক্তিযুক্ত কথা বলেই তারা ক্ষান্ত থাকতেন। তাদের বাড়াবাড়িকে উদার মনোভাব নিয়ে ধৈর্য ও উদারতার সাথে গ্রহণ করতেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে এ যাবত আটকে থাকা উত্তেজনা বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত বেরিয়ে পড়তো।

অসভ্যপনা ও ইতরামি

যাদের কোন গঠনমূলক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী থাকেনা, তারা সাধারণত অন্য কাউকেও কোন গঠনমূলক কাজ করতে দেয়না। এর কারণ শুধু এই যে, এতে দুনিয়াবাসীর সামনে তাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। মদিনার ইহুদীদের অবস্থাও ছিল এরূপ। তারা দীর্ঘকাল মদিনায় অবস্থান করে আসছিল। কিন্তু নিম্নস্তরের মানুষদের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য তারা কোন কাজ করার যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। মানুষের মন মানসিকতার উন্নয়ন, চরিত্র সংশোধন, ভদ্রতা ও শৃংখলার প্রশিক্ষণ দান, এবং শান্তি ও নিরাপত্তামূলক জীবন যাপনের শিক্ষা দানে তারা কোনই পদক্ষেপ নেয়নি। পতিত মানবতাকে সামাল দেয়া দূরে থাক, তারা নিজেদেরকেও অধোপতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। দুনিয়ার যাবতীয় সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি তাদের মেরুমজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল এবং কোন রোগেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় তাদের সামনে যখন একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটলো এবং সেই শক্তি মানুষের মন মগজে প্রেরণাদায়ক নীতি, আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করলো, সমস্ত সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করে নব উদ্যমে নতুন জাতি গড়ার কাজ শরু করলো এবং একটা পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপযোগী করে ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও সেই সব ব্যক্তির সাহায্যে একটা শান্তিপূর্ণ ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করে দিল, তখন ইহুদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা এই গঠনমূলক আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য যে কোন হীন চেষ্টা তদবীর শুরু করে দিল। এ ধরনের নেতিবাচক ও নাশকতামূলক শক্তি যখন কারো বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয় তখন তা সভ্যতা, ভব্যতা ও ভদ্রতাকে শিকেয় তুলে রাখে। অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে অসভ্য ও অভদ্র আচরণ করা তার রপ্ত হয়ে যায়। ইহুদীরাও অনুরূপ চরম অসভ্য আচরণ শুরু করে দিল।

নবীদের উত্তরসুরী, আল্লাহর কিতাবের অনুসারী, এবং আল্লাহর আইনের শিক্ষক ও ফতোয়াদাতা হিসাবে সুপরিচিত ইহুদী সম্প্রদায় শত্রুতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যে সব

অপকর্ম ও অসদাচরণ করতে শুরু করলো, তার দুতিনটে অবিস্মরণীয় উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে ধার্মিক ও খোদাভীরু মনে করতোনা এই ইহুদী সম্প্রদায়। অথচ তাদের নৈতিকতার এমনই অবস্থা হয়েছিল যে, তারা যখন রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করতো, তখন আস্‌সালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে 'আসসামু আলাইকুম' বলতো। এর অর্থ হলো, 'তোমার মৃত্যু হোক।' এই আচরণ করা হতো সেই মহান ব্যক্তির সাথে, যিনি হযরত ইবরাহীম, মূসা, ইয়াকুব, ইউসুফ, ইসহাক ও ইসমাঈল আ.-এরই আনীত দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন, যিনি তাওরাতের আসল প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবনে নিয়োজিত ছিলেন, যিনি আল্লাহর আইন ও বিধানকেই পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত ছিলেন। বরং সত্য কথা এই যে, তিনি তো প্রকৃত পক্ষে ইহুদীদেরই ভুলে যাওয়া দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তাদেরই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করছিলেন। একবার এদের কয়েকজন রসূল সা. এর বাড়ীতে এলে গুন্ডাপান্ডার ন্যায় আচরণ ও উপরোক্ত ভাষা ব্যবহার করে। এই অসদাচরণের বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা পর্যন্ত পর্দার আড়াল থেকে কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি এতই রেগে যান যে, জবাব না দিয়ে থাকতে পারেননি। তিনি বলে ওঠেন, "হতভাগারা, তোদের মৃত্যু হোক।" রসূল সা. শুনতে পেয়ে বলেন, "আয়েশা, একটু নম্র হও।" হযরত আয়েশা বললেন, আপনি শুনছেন ওরা কী বলেছে? রসূল সা. বললেন, "আমি শুনেছি, তবে জবাবে শুধু বলেছি 'ওয়ালাইকুম' অর্থাৎ "তোমাদেরও"। এটুকুই যথেষ্ট।

অসভ্য আচরণের আরো দুটো লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত কোরআনে চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথমত রসূল সা. এর দরবারে তারা হাজির হতো এবং আলাপ আলোচনার সময় যখনই এ কথা বলার প্রয়োজন বোধ করতো যে, 'একটু থামুন, কথা বুঝবার সুযোগ দিন', তখন একটা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ 'রায়িনা' ব্যবহার করতো। আরবীতে এ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ হলো, 'আমাদের একটু সুযোগ দিন, আমাদের বক্তব্য শুনুন, বা আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য করুন'। কিন্তু ইহুদীদের মূল ধর্মীয় ভাষা ইবরানীতে এর কাছাকাছি ও প্রায় সম উচ্চারিত শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হতো যে, 'শোন্, তুই বধির হয়ে যা'। তাছাড়া আরবীতেও এর প্রায় কাছাকাছি ধাতু থেকে তৈরী এবং প্রায় সম উচ্চারিত এমন শব্দ রয়েছে, যার খুবই খারাপ অর্থ বেরুতো। যেমন 'রায়য়া' থেকে নির্গত একটা শব্দ ছিল 'আর রায়া' যার অর্থ নিকৃষ্ট মানুষ'। এ শব্দটাকে 'রায়ায়েনা' আকৃতিতে পরিবর্তিত করা মোটেই কঠিন ছিলনা। (যার অর্থ দাঁড়াতো' আমাদের নিকৃষ্ট মানুষটি।'-অনুবাদক) অনুরূপভাবে 'রায়ানা' শব্দটি অজ্ঞ ও নির্বোধ হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খোদ্ 'রায়েনা' শব্দটিকেও একটু জিহ্বা বাঁকিয়ে উচ্চারণ করলে 'রায়িয়ানা'তে রূপান্তরিত করা যায়, যার অর্থ দাঁড়ায় 'ওহে আমাদের রাখাল'। ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় জুব্বা ও পাগড়িধারী লোকেরা এভাবে সুকৌশলে কটুবাক্যের তীর নিক্ষেপ করতো। সাধারণ মানুষ সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে এত দক্ষতা কোথায় পাবে। এটা তো বড় বড় দক্ষ আলেমদের কারসাজি। বাড়ী থেকে তারা ভালোমত চিন্তা গবেষণা করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতো যে, আজ কি কি উপায়ে অসভ্য আচরণ করা যেতে পারে। এই সব ধড়িবাজ আলেমদের

মধ্যে 'যায়েদ বিন তাবুত' নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে ইতিহাসে সুস্পষ্ট বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। অনৈতিক ও অভদ্রজনোচিত বাক্যবান নিক্ষেপের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে এই ইহুদী ভন্ড মৌলবীও বিরাট অবদান রেখেছিল। বাহ্যত তারা খুবই ভদ্র ও মার্জিত আচরণের লেবেল আঁটা ছিল। কিন্তু তাদের অন্তরের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যেত, গুন্ডাসুলভ মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে জানাজানি ছিল যে, আমরা এ যুগের সেরা মানুষটাকে ব্যংগ বিদ্রুপ করছি। কিন্তু কেউ যদি আপত্তি জানাতো তবে বলতো, আরে ভাই, আমাদেরকে অভদ্র মনে করেছেন নাকি? আমরা তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আদরের সাথে বলছি যে, আমাদেরকে একটু বুঝবার ও বুঝাবার অবকাশ দিন।

দ্বিতীয়ত, আলাপ আলোচনার মাঝখানে কখনো কখনো নবীদের উত্তরসুরী ইহুদী আলেমরা রসূল সা. এর সাথে এভাবে বাক্যালাপ করতো ঃ 'ইসমা' গায়রা মুসমায়িন।' এ কথাটার বাহ্যিক অর্থ হলো, "একটু শুনুন, আপনি "এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে, আপনাকে আপনার ইচ্ছা বা অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলা চলেনা।" কিন্তু তাদের কুচক্রী মানসিকতা এর অন্য একটা অর্থ বুঝাতো। সেটি হলো, "তুমি কোন কথা শোনানোর যোগ্যই নও। আল্লাহ যেন তোমাকে বধির করে দেয় এবং তোমার শ্রবণ শক্তিই যেন না থাকে।"

লক্ষ্য করুন, কত নোংরা ও ঘৃণ্য মানসিকতার অধিকারী লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরোধে নেমেছিল।

তৃতীয়ত, মুমিনরা রসূল সা. এর বৈঠকে বসে যখন কোন কথা শুনতো এবং বুঝতো, তখন আল্লাহর নির্দেশে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে বলে উঠতো 'সামি'না ওয়া আতা'না' অর্থাৎ আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য অবলম্বন করলাম।" কিন্তু তাওরাতের ধারক বাহকরা এরূপ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নাটকীয় আচরণ করতো। প্রথমে জোরে শোরে বলতো 'সামি'না অর্থাৎ "জ্বী হা, শুনেছি।" পরক্ষণে 'আতা'না' (আনুগত্য অবলম্বন করলাম)-এর পরিবর্তে একটু আস্তে জিহ্বাটাকে একটু বাঁকিয়ে বলতো, 'আসাইনা' অর্থাৎ "তোমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করলাম এবং অমান্য করার সংকল্প নিলাম।" এখানেও সেই একই জটিলতা যে, কেউ আপত্তি তুললে বিরক্তি প্রকাশ করে বলতো, "আমাদেরকে তোমরা এতই বাজে লোক মনে করেছ? বিরোধিতার আতিশয্যে আমাদের ওপর এমন অপবাদ আরোপ করছ? তোমাদের ভেতরে নিজেদের মধ্যকার ছাড়া বাইরের আলেম ও বিত্তজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোন রেওয়াজ নেই? নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে তোমরা ভদ্র ও সদাচারী মনে করতে প্রস্তুত নও?"

ভেবে দেখার বিষয় হলো, এ ধরনের হীন আচরণ দ্বারা কি রসূল সা. এর আন্দোলনের কোন ক্ষতি সাধন করা গিয়েছিল। এই হীনতা ও নীচাশয়তার জোরে কি ইসলামী দলের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করা গিয়েছিল? আসলে গালি ও কটুবাক্য বর্ষণ করে কোন গঠনমূলক শক্তির লোমও ছেড়া যায়না। প্রতিপক্ষ এতে শুধু এতটুকুই মজা পায় যে, তার নেতিবাচক, নাশকতামূলক ও গোঁড়ামিপূর্ণ মনের পুঞ্জীভূত বাষ্প বেরিয়ে যায়। এই সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যখন নবীজীর বৈঠকে এ ধরনের কীর্তিকলাপ সম্পাদন করে বিদায় হয়ে যেত, তখন নিজেদের বৈঠকে গিয়ে নিশ্চয়ই আস্ফালন করতো যে, আজ নবী সাহেবকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে এসেছি। আপন মুরীদদের সমাবেশে বসে নিশ্চয়ই নিজেদের

যোগ্যতার প্রমাণ দিত যে, আমরা এক একটা শব্দকে ওলট পালট করে কি সব অর্থ বের করেছি এবং আরোপ করেছি। আমাদের ভাষাজ্ঞান, ব্যাকরণ জ্ঞান এবং অলংকার শাস্ত্রীয় পারদর্শিতার বলে আমরা কত বড় বড় যুদ্ধ চালিয়ে এলাম।

ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এই সব অপকর্ম থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো, ধর্মীয় নেতারা যখন অধোপতনের শিকার হয়, তখন তাদের মধ্যে প্রথমত শাব্দিক বিকৃতির নোংরা ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্য থেকে মানবতা, ভদ্রতা, শালীনতা ও শিষ্টাচারের দাবী ও চাহিদা বিবেচনা করার ক্ষমতা লোপ পায়। তৃতীয়ত তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডের মাঝে লজ্জাজনক স্ববিরোধিতা জন্ম নেয়। চতুর্থত তাদের মধ্যে এক ধরনের কাপুরুষতা পাওয়া যায়, যার কারণে তারা খোলাখুলিভাবে মনের নোংরা ভাবাবেগ প্রকাশ করতেও পারেনা। বরং তারা নিজেদের নীচ ও কদর্য মানসিকতার ওপর শালীনতা ও ভদ্রতার লেবেল এঁটে চলে। এ আলামতগুলো যে কোন চিন্তাধারা ও মানসিকতার অকর্মণ্যতার অকাট্য প্রমাণ। বিশেষত কটু ও অশালীন বাক্যালাপ যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে কোন সম্পর্কই থাকতে পারেনা। সদ্য রান্না করা খাবারের কোন হাড়ি থেকে বেরুনো সুগন্ধ যেমন খাবারটার ধরন ও মশলার মান সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি মানুষের প্রতিটা কথাবার্তা ও কথা বলার ভংগী তার স্বভাব চরিত্রের মাপকাঠি হয়ে থাকে। কারো মনমগজের ডেকচি থেকে যদি অশালীন বাক্যালাপ ও অভদ্র আচরণরূপী দুর্গন্ধ বেরোয়, তাহলে কিছুতেই আশা করা যায়না যে, তার মধ্যে পবিত্র ধ্যানধারণা ও ভদ্রজনোচিত মনোভাবের সমন্বয়ে কোন মহৎ চরিত্র তৈরী হচ্ছে। যখন কাউকে দেখবেন ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে অশালীন বাক্যালাপ ও অসদাচরণ করছে, তখন বুঝবেন সে তার প্রতিপক্ষের সাথে যুক্তির লড়াইতেও হেরে গেছে, নৈতিকতার লড়াইতেও পরাভূত হয়েছে। এখন এই হেরে যাওয়া মানুষটি গালাগাল দিয়ে কেবল মনের বিষ উদগীরণ করছে। আর মনের বিষ উদগীরণকারীরা ইতিহাসে কোন গুরুত্ব পায়না। তারা কেবল বিষোদগারই করতে থাকে, আর গঠনমূলক দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত কাফেলাতো কেবল সামনেই এগিয়ে যেতে থাকে।

এখানেই শেষ নয়। মদিনায় যখন আযানের প্রচলন হলো, তখন যেহেতু ইহুদীদের প্রচলিত ধর্মীয় বিধির বিরুদ্ধে এটাও একটা ধর্মীয় বেদয়াত ছিল, এ জন্য তারা আযান নিয়েও অনেক জটিলতায় ভুগতো। বিশেষত তারা যখন দেখতো যে, আযানের শব্দ ও বাক্যগুলো ইসলামের গোটা বিপ্লবী দাওয়াত ও তার মৌলিক মতাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরে এবং দিনে পাঁচবার এই আযান উচ্চ ও মধুর স্বরে উচ্চারণ করা একটা অত্যন্ত কার্যকর ও প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যম। এ আওয়ায তাদের নারী, শিশু ও গোলামদের কানে প্রতিদিন পাঁচবার প্রবেশ করতো। একবার কল্পনা করুন, এই নজীরবিহীন ধ্বনি যখন বিলালের সুলোলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হতো, তখন মদিনার আকাশে বাতাসে কেমন নীরবতা বিরাজ করতো। মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই মন হয়তো আকৃষ্ট হয়ে যেত। বিশেষত ঘন্টা ও নাকাড়ার ধ্বনির সাথে আযানের ধ্বনির পার্থক্য নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতো। তাদের জনগণের মনেও এর প্রতি কিছু না কিছু অনুভূতি হয়তো জন্ম নিত। ঘন্টা ও নাকাড়ার ধ্বনি তো কেবল ধ্বনিই ছিল। তাতে কোন কথাও ছিলনা অর্থও ছিলনা।

পক্ষান্তরে আযানের ধ্বনি ছিল সহজবোধ্য অর্থে ঝংকৃত কতিপয় বাক্যের সমষ্টি। নাকাড়া ও ঘন্টার ধ্বনিতে কোন মানবীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটতোনা, অথচ আযানের আহ্বানে প্রতিফলিত হতো মানুষের মনের আবেগ ও অনুভূতি। এই পার্থক্যটা বুঝতে পারার পর ইহুদীদের এ কথা স্বীকার করা উচিত ছিল যে, আযানই যথার্থ এবাদতের দাওয়াত দেয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত কার্যকর ও শ্রেষ্ঠতর মাধ্যম। কিন্তু তা স্বীকার না করে তারা ক্ষেপে গেল। তারা আযান দাতার আওয়াযকে আশ্চর্য ধরনের উপমা দিত, নকল করতো এবং শব্দ বিকৃত করে করে হাস্যোদ্দীপক অংগভংগী করতো। ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা এই ভন্ড ধার্মিকদের ভাড়ের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আযান যে কাজ করছিল, তা ব্যংগবিদ্রুপ, ও ভাড়ামী দ্বারা কিভাবে রোধ করা সম্ভব?

ইহুদীদের অসভ্যপনা এতদূর গড়িয়েছিল যে, তারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেও এর শিকার তারা বানিয়ে ফেলেছিল। যেমন ঃ কারআনের আয়াত "আল্লাহকে কে ঋণ দিতে প্রস্তুত?" এর সরল অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে এই বলে বিদ্রুপ করা শুরু করে দিল যে, 'এখন তো আল্লাহ তায়ালাও গরীব হয়ে গেছেন। উনিও এখন বান্দাদের কাছে ঋণ চাওয়া শুরু করেছেন। আল্লাহর সাথে নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার এমন জঘন্য উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে কোরআনে যেখানে যেখানে মশা, মাছি ও অনুরূপ ছোট ছোট জিনিসকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং এগুলোর অস্তিত্বকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে, সেখানে ইহুদীরা ঠাট্টাবিদ্রুপের তান্ডব সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে যেত। তারা বলতো, মুসলমানদের আল্লাহও আশ্চার্য ধরনের। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়েও মশামাছির মত নগণ্য প্রাণী ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননা। আর যে কোরআনে এই সব নগণ্য জিনিসের উল্লেখ থাকে, তা আল্লাহর কিতাব হয় কি করে? তারা এর কেমন দাঁতভাঙ্গা জবাব পেল দেখুন আল্লাহর বক্তব্য ঃ

"আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র জিনিসের উদাহরণ দিতে কখনো লজ্জা পাননা। যারা হক কথা মানতে প্রস্তুত তারা এসব উদাহরণ দেখে বুঝতে পারে যে, এটা সত্য এবং এটা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকেই এসেছে। আর যারা মানতে প্রস্তুত নয়, তারা এগুলো শুনে বলতে থাকে, এ ধরনের উদাহরণের সাথে আল্লাহর কিসের সম্পর্ক? (সূরা বাকারা-২৬)

হাস্যকর দাবী

ইহুদীদের বেয়াড়াপনা প্রমাণ দাবি করার রূপ ধারণ করে এক উদ্ভট হাস্যকর অবস্থায় পরিণত হয়। তারা রসূলকে সা. বলতে লাগলো, "আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?" (বাকারা-১১৭) অর্থাৎ আল্লাহ তোমার কাছে গোপনে গোপনে ফেরেশতা পাঠান এবং গোপনেই তোমার কাছে নিজের বার্তা পাঠান কেন? তিনি কি চান, সেটা তিনি সরাসরি আমাদের সামনে এসে বলেন না কেন? আল্লাহ দুনিয়াতে নেমে আসুক, চোখের সামনে দেখা দিক, এবং আমাদের সাথে মুখোমুখি হয়ে বলুক যে, এ হচ্ছে আমার হুকুম, এগুলো মেনে চল, আর এইযে আমার নবী, এর আনুগত্য কর। তাও যদি তিনি করতে না

চান, তাহলে অন্তত কোন একটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য আলামত পাঠিয়ে দিক, যা দেখার পর কেউ আর এ কথা অস্বীকার করতে পারবেনা যে তুমি তার নবী এবং কোরআন তার বাণী।

এই অকাট্য আলামত কি হওয়া দরকার, তাও তারা নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছ যাতে করে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হতে পারে। ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায়, ইহুদী মহলে এই দাবী খুবই গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন যাবত তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং রসূল সা. এর সামনে তা বারবার উত্থাপিত হতে থাকে।

এই দাবী কিভাবে সৃষ্টি হলো প্রথমে তা শুনুন। ব্যাপারটা ছিল এইযে, মদীনার ইহুদীরা রসূল সা. এর আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজকে ভয় দেখানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে ভাবি নবীর তাৎক্ষণিক আবির্ভাবের জন্য দোয়া করতো। কিন্তু যখনই রসূল সা. নবী হিসেবে আবির্ভূত হলেন, অমনি তারা তাদের মনোভাব পাল্টে ফেললো এবং তাঁকে অস্বীকার ও অমান্য করতে বদ্ধপরিকর হলো। তাদের এই রাতারাতি ভোল পাল্টানোতে জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়ে গেল। লোকেরা এসে এসে তাদের কাছে জিজ্ঞাস করতো, "ব্যাপার কী? আগে তো আপনারাই দোয়া করতেন এবং একজন নবী আসবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। আর এখন আপনারাই আবির্ভূত নবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেছেন! বিশেষত এক মজলিসে মুয়ায বিন জাবাল ও বিশর বিন বারা বিন মারুরের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতারা ইহুদী নেতৃবৃন্দকে খোলাখুলিভাবে বললেন, "হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর এবং মাথা নোয়াও। কেননা তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি লাভের নিমিত্তে নিজেরাই আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মদ সা. এর আবির্ভাব কামনা করতে। আমরা মোশরেক ছিলাম। তোমরাই আমাদেরকে জানাতে যে, সেই নবী আবির্ভূত হয়েছে এবং তাঁর গুণাবলীও তোমরা বর্ণনা করতে।" এ ধরনের কথাবার্তায় কিভাবে ইহুদীদের মুখোশ খুলে যেত, তা সহজেই অনুমেয়। তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতো, তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত কি? নিজেদের দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের কোন না কোন ঢালের আশ্রয় নেয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই ঢাল কী ছিল? এটা জানার জন্য উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব বনু নযীরের জনৈক ইহুদী নেতা সালাম ইবনে মুশকামের মুখ থেকে শুনুন। তিনি বলেন ঃ "মুহাম্মদ সা. নিজের সাথে এমন কোন প্রমাণ নিয়ে আসেননি, যা দ্বারা আমরা তাকে নবী হিসেবে চিনতে পারি। তাই মুহাম্মদ সা. সেই ব্যক্তি নন, যার কথা আমরা তোমাদের কাছে উল্লেখ করতাম।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

ইবনে সিলভিয়া ফাতয়ূনীও রসূল সা.কে সরাসরি এ কথাই বলেছিল। অর্থাৎ একটু চূড়ান্ত আলামতের দরকার ছিল। সেই আলামত নির্ণয়ের কাজটাও ইহুদীদেরই করণীয়। তারা যেমন আলামত দাবী করতে চায় করবে। অনুরূপভাবে সাবেক নবীদের কাছ থেকে শেষ নবীকে মান্য করার যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল, তার ব্যাপারেও জনগণ তাদেরকে প্রশ্ন করছিল। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তারা এটা ওটা বলে এড়িয়ে যেত। ইহুদী মালেক ইবনুল কাতীদ একবার স্পষ্ট করেই বলেছিল যে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে কোনই অংগীকার নেয়া হয়নি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

তাদের জন্য কোরআনের পবিত্র বাণী এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণে কোন নিদর্শন ছিলনা, রসূলের সা. চরিত্রে কোন নিদর্শন ছিলনা। জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়নকারী আন্দোলনে কোন নিদর্শন ছিলনা, সত্যের সৈনিকদের বিকাশমান দলে কোন নিদর্শন ছিলনা, নির্যাতন ও নিপীড়নকারী প্রতাপশালী শক্তিগুলোর মোকাবেলায় মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান যে ত্যাগ কুরবানী ও প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল, তাতেও তাদের বিবেকে সাড়া জাগাতে পারে এমন কোন নিদর্শন ছিলনা। তারা চাইছিল কেবল বিস্ময়োদ্দীপক অথবা কৌতুকপ্রদ ঘটনা।

এবার শুনুন কি ধরনের আলামত বা নিদর্শনের তারা দাবী জানাচ্ছিল।

রাফে বিন হুরায়মালা ও ওহাব বিন যায়েদ রসূল সা. এর কাছে এসে আলাপ আলোচনা প্রসংগে বললো,

"হে মুহাম্মাদ সা. আমাদের কাছে পুরো একখানা কিতাব লিখিতভাবে আকাশ থেকে নামিয়ে আনো, আমরা তা পড়ে দেখবো, আর আমাদের সামনে ঝর্ণা বানিয়ে দাও। তাহলেই আমরা তোমাকে অনুসরণ করবো এবং তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দেব।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

এই রাফে বিন হুরায়মালা এ দাবী ও জানায় যে, "হে মুহাম্মদ, সা. তুমি যদি আল্লাহর রসূল হয়ে থাক, যেমন তুমি বলে থাক, তাহলে আল্লাহকে আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলতে বল, যাতে আমরা তা শুনতে পাই।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

অন্য এক আলোচনা সভায় ফাখখাস, আব্দুল্লাহ বিন সবুর প্রমুখ ইহুদী নেতারা রসূল সা. এর সাথে কথা বলছিল, তারা বললো, "হে মুহাম্মদ, সত্যই কি এই কোরআন তোমাকে কোন জিন বা মানুষ শেখায়না? রসূল সা. বললেন, তোমরা ভাল করেই জান, এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং আমি আল্লাহর রসূল। তোমরা এ সত্য তোমাদের তাওরাতেও লিখিত দেখতে পাও।" তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ সা., তুমি যত কিছুই বলনা কেন, এ কথা তো সত্য যে, আল্লাহ যখন কোন রসূলকে পাঠান, তখন ঐ রসূল যা কিছুই চায় তা তিনি করে দেন, আর রসূল যা কিছুই ইচ্ছা করে, তা করে দেখানোর ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। কাজেই তুমি আকাশ থেকে লিখিত গ্রন্থ অবতীর্ণ কর, যা আমরা পড়বো ও জানবো।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

ইহুদীরা একটা কার্যকর ঢাল পেয়ে গেল। এখন আর তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব রইলনা যে, রসূল সা. এর দাওয়াত কী? তিনি কী বলেন? তার যুক্তি প্রমাণ কী? তার দাওয়াতে জীবন কিরূপ গড়ে ওঠে? তাঁর শিক্ষায় কী ধরনের চরিত্র গড়ে ওঠে? এর গঠনমূলক চেষ্টা দ্বারা কি ধরনের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নির্মিত হয়? এই সমস্ত প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর হয়ে গেল। তাদের কাছে তখন এই দাবীটাই প্রধান হয়ে উঠলো যে, "আকাশ থেকে কিতাব নামিয়ে দেখাও।" এখন সবার মুখ বন্ধ করার জন্য তারা একটা ছুঁতো পেয়ে গেল। কেউ এ নিয়ে কিছু বললেই তাদেরকে তারা সাফ জবাব দিয়ে দিত যে, আমরা তো ঈমান আনতে প্রস্তুত। কিন্তু মুহাম্মদ সা. কে যেয়ে বলে দাও যে, একটা কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিক। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তো যা চায়, আল্লাহর কাছ থেকে আদায়

করে নিয়ে থাকে। উনি কেমন রসূল যে, আল্লাহ তার আবদার রক্ষা করেনা? ওহে জনমন্ডলী, এ সব বিভেদাত্মক কথাবার্তা বাদ দাও। যাও, আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার কাছে যাও। এতো নিছক ফাঁকিবাজি।

ইহুদীদের শাইলকী কর্মকান্ড

এটা সর্বজন বিদিত যে, মদিনার সীমিত উপায় উপকরণ ও সহায় সম্পদের ওপর যখন মোহাজেরদের চাপ বাড়তে লাগলো এবং সহায় সম্বলহীন ও আশ্রয়হীন মানুষেরা নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনে নিয়োজিত হলো, তখন ইসলামী আন্দোলনের অধিকাংশ কর্মীর মধ্যে দারিদ্র ও ক্ষুধা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দারিদ্র ও ক্ষুধার এই পরীক্ষায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা স্বয়ং এবং তাঁর পরিবারপরিজন সাধারণ সাথীদের সমান অংশীদার ছিলেন। বরং পরীক্ষার প্রধান অংশ তার ঘাড়েই পড়লো। বিপদ মুসিবত কখনো একাকী আসেনা। দারিদ্র ও ক্ষুধার কষ্টের পাশাপাশি মোহাজেরদের মধ্যে রোগব্যাধিও ছড়িয়ে পড়ে। নতুন আবহাওয়া বহিরাগতদের শরীরে সইলনা। তারা একের পর এক রোগাক্রান্ত হতে লাগলো। অপ্রতুল খাদ্যের সাথে সাথে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়া এক কষ্টদায়ক জ্বর মোহাজেরদেরকে হাড্ডিসার ও অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনার অযোগ্য করে তুললো। ইসলামী আন্দোলন একদিকে সমস্যা ও বিরোধিতার নিত্য নতুন ফ্যাকড়ার সম্মুখীন হচ্ছিল। সদ্য গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বদিক দিয়ে পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন শত্রুদের পক্ষ থেকে হরেক রকমের হুমকি আসছিল। কর্মক্ষম লোকেরা ক্রমেই শয্যাগত হচ্ছিল। খাদ্য ও পোশাকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলনা। এমন একটা অবস্থাকে এই ক্ষুদ্র বিপ্লবী দল যে শক্তির বলে অতিক্রম করলো, তা ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান, উদ্দেশ্যের প্রতি ভালোবাসা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের শক্তি। আসলে বড় বড় ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ও সংগঠন সমূহের কেন্দ্রীয় শক্তিই হয়ে থাকে ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব। এই শক্তি শারীরিকভাবে দুর্বল লোকদেরকেও সবল রেখেছিল এবং সহায়-সম্পদের ঘাটতির প্রভাব অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়েও প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছিল, তাকে সর্বব্যাপী মহামারী রোগ অনেকটা দুর্বল করে দিল। এই সময় এ গুজবও ছড়িয়ে পড়ে যে, মদিনার ইহুদীরা যাদু করে দিয়েছে এবং মুসলমারা এখন আর ওখানে টিকে থাকতে পারবেনা। এ সময়ে পরিস্থিতি কত সংকটাপন্ন ছিল, সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য রসূল সা. এর কতিপয় সাহাবীর বক্তব্য শুনুন।

হযরত আবু বকর রোগ শয্যায় যন্ত্রণায় ছটফট করছেন এবং একটি কবিতা আবৃত্তি করে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ঃ কل امرء مصبح فى اهله

والموت ادنى من شراك نعله

“প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারে অবস্থান করে। অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটবর্তী।”

এদিকে হযরত বিলাল রোগ শয্যায় এপাশ ওপাশ করছেন, আর প্রচন্ড রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়েও কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন, যার অর্থ হলো ঃ

"এখন মক্কার সমতল প্রান্তের, পাহাড় ও ঝর্ণার স্মৃতি চারণ করা হচ্ছে। যে সমতল ভূমিতে আযখর ও জুলাইল ঘাস জন্মে, সেখানে কি একটা রাত কাটাতে পারবো কখনো? মাজান্না ঝর্ণার পানিতে কি আর কখনো নামতে পারবো এবং শামা ও তোফায়েল পাহাড়ের দৃশ্য কি আর কখনো দেখতে পাবো?

আমের গাইছিলেন ঃ "আমি মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করার আগেই মৃত্যুকে পেয়েছি। কাপুরুষের মৃত্যু আসে তার ওপর থেকে।" ইনি এত তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুর পায়ের আওয়ায পেয়ে গিয়েছিলেন।"

হযরত শাদ্দাদও রুগ্ন ছিলেন। রসূল সা. তাঁর এই সাথীকে দেখতে এলেন। রোগী রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে বললেন, "বাতহানের পানি পান করলে হয়তো উপকার হতো।" রসূল সা. বললেন, চলে যাও। কে বাধা দিচ্ছে? রোগী বললেন, "হিজরতের কী হবে?" রসূল সা. প্রবোধ দিয়ে বললেন, "চলে যাও। তুমি যেখানেই যাবে মোহাজেরই থাকবে।"

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন মুসলমানরা মক্কায় গেল, তখন তাদের শরীর বারবার রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন ভীষণ দুর্বল ছিল। আর এই অবস্থা দেখে মক্কাবাসী টিটকারী দেয় যে, "আবার মদিনায় যেওনা।"এই টিটকারীর কারণে রসূল সা. এর নির্দেশে মুসলমানরা বিরোচিত ভঙ্গিতে চলতো।

এ সব কারণে রসূল সা. বলতেন ঃ ان شأن الهجرة لشديد

"অর্থাৎ হিজরত কোন ছেলে খেলা নয়, বরং খুবই কঠিন কাজ। জনৈক বেদুঈন একবার রসূলের সা. কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদিনায় আসা মাত্রই তার জ্বর হলো। সে ইসলামকে অশুভ মনে করে ইসলাম পরিত্যাগ করে চলে গেল। এই ঘটনায় রসূল সা. বললেন ঃ "মদিনা স্বর্ণকারের চুল্লীর মত। খাদকে বের করে দেয় এবং খাঁটি সোনাকে আলাদা করে।" (বুখারী) অর্থাৎ আন্দোলনের মহান কাজ সম্পাদনের জন্য যারা উদ্যোগী হয়, তাদেরকে পদে পদে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় খাঁটি ঈমানদার লোকেরাই পাশ করে। মেকি ও ভন্ড ঈমানের দাবীদাররা কোন না কোন পর্যায়ে আলাদা হয়ে যায়। তাই মদিনার এই অগ্নি পরীক্ষার পর্যায়টা স্বর্ণকারের চুল্লীর ভূমিকা পালন করছিল। (উসওয়ায়ে সাহাবা মাওলানা আবদুস সালাম নদভী)

এই সময়ই রসূল সা. আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের কাছে মক্কাকে যেমন আকর্ষণীয় বানিয়েছিলে, মদিনাকেও তেমনি চিত্তাকর্ষক বানাও, অথবা তার চেয়েও বেশী। আমাদের জন্য এর খাদ্য শস্যে বরকত দাও। আর মদিনায় যে রোগ মহামারী এসেছে, তাকে মাহিয়ার দিকে সরিয়ে দাও।" (সীরাতে ইবনে হিশাম ২য় খন্ড)

অন্যদিকে দারিদ্র ও ক্ষুধা চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। নতুন জায়গায় এসে অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলা এবং তাতে হালাল জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করা—তাও এমন পরিস্থিতিতে যে আন্দোলনের সামনে প্রতি মুহূর্তে নূতন নতুন ব্যয়ের খাত এসে উপস্থিত হচ্ছিল- কত কঠিন, তা বলারই অপেক্ষা রাখেনা। সত্যের সৈনিকদের এই সময় যে বিপর্যয়কর অবস্থা অতিবাহিত করতে হয়েছে তার বেদনাদায়ক বিবরণে ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ।

হযরত আবু তালহা এই দুর্যোগকালীন সময়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে ঃ

আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাহায্য লাভের জন্য রসূল সা. নিকট গেলাম। পুরো অবস্থা জানালাম এবং পেট খুলে দেখালাম যে, একাদিক্রমে কয়েকদিন উপোষ করার কারণে (পাকস্থলীতে সৃষ্ট বিশেষ ধরনের প্রদাহ রোধ করার উদ্দেশ্যে) পেটে একটা পাথর বেঁধে রেখেছিলাম। এটা দেখার পর মানবেতিহাসের ঐ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটিও পেট খুলে দেখালেন, সেখানে একটা নয়, দুটো পাথর বাঁধা রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা যারা নিজেদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করছিলাম, মনে সান্ত্বনা পেয়ে গেলাম। (শামায়েলে তিরমিযী, আইশুন্নাবী সংক্রান্ত অধ্যায়)

একবার এ ধরনেরই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর রা. এলেন এবং সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য নিজের দুর্দশা বর্ণনা করতে চাইলেন। কিন্তু এতে অনর্থক রসূল সা. এর মনোকষ্ট বেড়ে যাবে এই ভেবে চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর রা. এলেন। তিনিও একই মুসিবতে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি খোলাখুলি বলে ফেললেন, ক্ষুধার তাড়নায় দিশেহারা হয়ে গেছি। একথা শুনে রসূল সা. বললেন, আমার অবস্থাও তদ্রুপ। সিদ্ধান্ত হলো, সবাই মিলে বাগবাগিচার মালিক অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সাহাবী আবুল হাইসামের কাছে যাওয়া যাক। তিনজন তার কাছে যখন গেলেন, দেখলেন, ঐ বেচারা ভৃত্য না থাকায় নিজেই পানি আনতে গেছে। ফিরে এসে আগন্তুকদের দেখে আনন্দের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বাগিচায় নিয়ে গিয়ে খেজুর খেতে দিলেন। তারা খেজুর খেয়ে পানি পান করলেন এবং আবুল হাইসামের জন্য দোয়া করে ফিরে এলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস একবার বর্ণনা করেন, আমিই ইসলামী আন্দোলনের সেই সদস্য যার হাতে সর্ব প্রথম ইসলামের একজন শত্রুর রক্ত ঝরেছে এবং আমিই জেহাদের ময়দানে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা এমন অবস্থায় জেহাদ করেছি যে, গাছের পাতা ও কিকর ফল খেতে খেতে আমাদের মুখে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যেত এবং উট ও ছাগলের মত পায়খানা হতো।[২]

রসূল সা. এর ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত আবু হুরায়রা জানান, "এক সময় আমি মসজিদে নববীর মিম্বর ও হযরত আয়েশার কক্ষের মাঝখানে ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। লোকেরা আমাকে জ্বিনে ধরা ভেবে (চিকিৎসার ব্যবস্থা হিসাবে) পা দিয়ে ঘাড় টিপে দিত। অথচ আমাকে জ্বিনে ধরতোনা। শুধু ক্ষুধার জ্বালায় এমন অবস্থা হতো। (শামায়েলে তিরমিযী, আইশুন্নবী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) হযরত আবু হুরায়রা আরো জানান যে, একবার তিনি হযরত ওমরের সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। একটা আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে চলছিলাম। সহসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম। ক্ষুধার কারণে এ অবস্থা হয়েছিল।

---

[২] এ ঘটনাও শামায়েলে তিরমিযী থেকে গৃহীত। এটা কিছুটা পরবর্তীকালের ঘটনা হলেও এ দ্বারা মদিনার অর্থনৈতিক সংকটকালের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা জন্মে।

এরূপ পরিস্থিতিতে যদিও রসূল সা. বাইতুল মালে আগত দ্রব্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে সাহাবীদের ক্ষুধা দূর করার জন্য ব্যয় করতে থাকতেন। কিন্তু সংকট এত ব্যাপক ছিল যে, বাইতুল মালের উপার্জন এবং সচ্ছল মোহাজের ও আনসারদের মুক্ত হস্তে দান ও যথেষ্ট হতোনা। সাধারণ ক্ষুধার্ত মোহাজেরগণ ছাড়াও আসহাবে সুফফার (মসজিদে নববীতে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থানরত অসহায় সাহাবীগণ) স্থায়ী নিবাসও বিপুল সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল। অনবরতই মেহমান আসতো। বেদুঈনরা যখন তখন ইসলাম গ্রহণ, সাক্ষাত ও শরীয়তের বিধি জিজ্ঞেস করতে আসতো, সাহায্য প্রার্থীরা এসে এসে সাহায্য চাইত। এবং একের পর এক মোহাজেরদের আগমনও অব্যাহত ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাইতুল মাল কতদূর সামাল দিতে পারে? সাথীদের ও অভাবীদের চাহিদার চাপ যখন বেড়ে যেত তখন রসূল সা. সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতেন এবং যে যা পারতো, আন্তরিকতা সহকারে দিত। কখনোবা ঋণ গ্রহণ করা হতো। মুসলমানদের ভেতর থেকে বেশী ঋণ পাওয়া যেতনা। তাই ইহুদী বিত্তশালীদের কাছে যেতে হতো। ইহুদীরা ছিল ঝানু সুদখোর মহাজন। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে ছিল তাদের সুদের জাল। কিন্তু মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাথীদেরকে তারা যে উদ্দেশ্যে ঋণ দিত, তা ছিল সুদের চেয়েও ভয়ংকর। উদ্দেশ্য ছিল অর্থ কড়ি ও সাহায্যের জোরে তাদেরকে বশীভূত করা। এই মানসিকতা নিয়ে তারা ঋণ আদায় করতে গিয়ে একেবারেই শাইলকের রূপ ধারণ করতো এবং অপমানজনক আচরণ করতো। মোশরেকদের অবস্থাও ছিল একই রকম। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বয়ং রসূল সা. ও তাঁর সাথীদেরকেও অর্জন করতে হয়েছিল। এ ধরনের বহু ঘটনা ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গকারীগণ এত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। এমন চরম বেগতিক অবস্থায়ও ইসলামের সৈনিকদের ঈমান ও লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা আসেনি।

রসূল সা. নিজের ঘনিষ্ঠ সহচর ও ব্যক্তিগত সহকারী হযরত বিলালকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন ইসলামী আন্দোলন ও তার সৈনিকদের প্রয়োজনে বাইতুল মালে প্রাপ্ত সম্পদ মুক্ত হস্তে ব্যয় করেন। হযরত বিলাল করতেনও তাই। একবার নব্বই হাজার দিরহাম এল এবং তা একটা মাদুরের উপর স্তুপ করে রাখা হলো। ওখানে বসে বসেই রসূল সা. ঐ অর্থ অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। একটা দিরহামও অবশিষ্ট রইলনা। বিলি বন্টন শেষ হয়ে যাওয়ার পর জনৈক সাহায্য প্রার্থী এলে তার জন্য ঋণ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, একবার হযরত বিলালের সামনে খেজুর স্তুপীকৃত ছিল। রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের মাল? হযরত বিলাল বললেন, ওটা ভবিষ্যতের অজ্ঞাত প্রয়োজনের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। রসূল সা. বললেন, "এই মাল এভাবে আটকে রাখার কারণে কেয়ামতের দিন যে তোমার কাছে জাহান্নামের ধূয়াঁ পৌঁছে যেতে পারে, তা কি তুমি জান? ওটাও বন্টন করে দাও। হে বিলাল, সর্বময় ক্ষমতার মালিকের পক্ষ থেকে কোন কিছুর আশংকা করোনা।" হযরত বিলাল বর্ণনা করেন, একবার মদিনার জনৈক মোশরেক তাঁর কাছে এল। সে বললো, "আমার কাছে অনেক সম্পদ আছে। যখন প্রয়োজন হয় নিও।" হযরত বিলাল তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ

করতে লাগলেন। একদিন যখন বিলাল ওযু করে আযান দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সহসা ঐ মহাজন কতিপয় কারবারীকে সাথে করে এসে চিল্লাতে লাগলো, "ও হাবশী!" হযরত বিলাল তার কাছে এগিয়ে গেলেন। সে খুব উত্তেজিত হলো এবং বকাবকি করতে লাগলো। সে সতর্ক করলো যে, মাস প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সময়মত ঋণ ফেরত না দিলে (আরবের জাহেলী প্রথা অনুসারে) তোমাকে গোলাম বানিয়ে নেব। তখন তোমার সাবেক অবস্থা ফিরে আসবে। হযরত বিলাল বলেন, এই অপমানজনক আচরণে আমি অন্য যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতই বিব্রত বোধ করলাম। হযরত বিলাল এশার নামাজের পর এই দুঃখজনক ঘটনা জানাতে রসূল সা. এর কাছে হাজির হলেন। ঋণ পরিশোধ করার কোন উপায় না দেখে তিনি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হলে আমি ফিরে আসবো। কিন্তু হযরত বিলাল তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার আগেই পরদিন সকালে রসূল সা. তাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলেন, ফিদিকের শাসকের পক্ষ থেকে চারটে পণ্য বোঝাই ওট এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঋণদাতাকে ডেকে ঋণ ফেরত দেয়া হলো এবং বাদবাকী মাল যথারীতি বিলি বন্টন করা হলো।

ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক আবু হাদরু আসলামী জনৈক ইহুদীর কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর কাছে পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আবু হাদরু ইহুদীর কাছে আরো সময় চাইলেন। কিন্তু ঐ শাইলকরূপী মহাজন একটুও সময় দিতে রাযী হলোনা। সে আবু হাদরুকে ধরে রসূলের সা. কাছে এনে বললো, আমার পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করুন। রসূল সা. আবু হাদরুকে বললেন, ঋণ পরিশোধ করে দাও। আবু হাদরু ওযর পেশ করলেন। কিন্তু রসূল সা. মহাজনের অনড় মনোভাব দেখে বললেন, যেভাবে পার ঋণ ফেরত দাও। সাহাবী আবার বললেন, খয়বরের যুদ্ধ আসন্ন। ওখান থেকে ফিরে আশা করি পরিশোধ করা সম্ভব হবে। রসূল সা. পুনরায় কঠোরভাবে এই মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু হাদরুর পরনের পোশাক খুলে নিয়েই ইহুদী বিদায় হলো। আবু হাদরু নিজের পাগড়ি খুলে কোমরে জড়ালেন। কত সামান্য ঋণের জন্য ইহুদী মহাজনের যুলুমের ধরন দেখুন যে, সে খাতকের পরনের কাপড় খুলে নিয়েই ক্ষান্ত হলো।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের আরেকজন নামকরা ব্যক্তি। তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন এবং বেশ সচ্ছল ছিলেন। তথাপি মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদে জনৈক ইহুদী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। একবার খেজুরের ফলন ভালো না হওয়ায় যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিতে না পেরে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে নিলেন। পরবর্তী ফসলও খারাপ হলো। মহাজন আর সময় দিতে রাযী হলোনা। অবশেষে তিনিও নিজের দুরবস্থা বর্ণনা করার জন্য রসূল সা. এর দরবারে হাজির হলেন। রসূল সা. কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে ইহুদীর বাড়ীতে গেলেন। তিনি জাবেরকে আরেকটু সময় দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইহুদী অস্বীকার করলো। রসূল সা. কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফিরা করে আবার এসে ইহুদীর সাথে আলোচনা করলেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় মহাজনের মন গললোনা। অতপর কিছুক্ষণের জন্য রসূল সা.

ঘুমালেন। জেগে আবার একই অনুরোধ করলেন। এবারও সে অনড়। অবশেষে রসূল সা. জাবেরের খেজুর বাগানে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, খেজুর নামাও। খেজুর নামানো হলে আশাতীত খেজুর পাওয়া গেল। ঋণও পরিশোধ হলো এবং কিছু বেঁচেও গেল। (সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানী)

রসূল সা. এর ব্যক্তিগত বর্ম জনৈক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্তও ঐ বর্ম ছাড়ানোর মত অর্থ সঞ্চিত হয়নি। (সীরাতুন্নবী, শিবলী)

একবার রসূল সা. এর কাছে জনৈক বেদুঈন এসে ঋণ পরিশোধের তাড়া করতে লাগলো। স্বভাবসুলভ ভংগীতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বললো। সাহাবীগণ তাকে বুঝালো যে, কত বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলছ লক্ষ্য কর। সে বললো, আমি তো আমার পাওনা ফেরত চাইছি। রসূল সা. সাহাবাগণকে বললেন, তোমাদের উচিত ওকে সমর্থন করা। কেননা এটা তার প্রাপ্য। অতপর তার প্রাপ্য পরিশোধ করার আদেশ দিলেন এবং প্রাপ্যের চেয়ে কিছু বেশী দিলেন। (সীরাতুন্নবী, শিবলী)

যায়েদ বিন সাহনার ঘটনা থেকে এই সংকট সম্পর্কে আরো ধারণা পাওয়া যায়। ইনি একজন ইহুদী আলেম ছিলেন এবং বিভিন্ন আলামতের আলোকে রসূল সা.-এর নবূয়তের দাবীর সত্যতা যাচাই করছিলেন। তিনি জানান, জনৈক বেদুঈন এসে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করলো। সে বললো, আমার গোত্র মুসলমান হয়ে গেছে। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় বলেছিলাম, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রচুর সম্পদ দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর বিপরীত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এখন তাদেরকে সাহায্য না করলে তাদের ইসলাম পরিত্যাগ করার আশংকা আছে। রসূল সা. হযরত আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। হযরত আলী রা. বললেন, এ মুহূর্তে কিছুই নেই। যায়েদ বিন সাহনা বললেন, আমার কাছ থেকে ৮০ মিসকাল স্বর্ণ নিয়ে নিন। এর বদলে মৌসুমে খেজুর দেবেন। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। রসূল সা. স্বর্ণ নিয়ে বেদুঈনকে দিলেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের দুতিন দিন বাকী থাকতে একদিন রসূল সা. যখন কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে একজনের জানাযা পড়ে একটি প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন যায়েদ রসূল সা. এর গায়ের জামা ও চাদর ধরে অত্যন্ত রুক্ষভাবে বললেন, "হে মুহাম্মাদ! আমার ঋণ পরিশোধ করনা কেন? আল্লাহর কসম, তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর কেমন লোক তা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমরা ঋণ পরিশোধ না করার অভ্যস্ত।"

হযরত ওমর রা. যায়েদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন, "হে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর কসম, আমি যদি (রসূলের দিক থেকে তিরস্কারের) আশংকা না করতাম, তাহলে তোর গর্দান উড়িয়ে দিতাম।" রসূল সা. হযরত ওমরকে বললেন, "ওমর! এ ক্ষেত্রে তোমার উচিত ছিল, একদিকে আমাকের সুষ্ঠুভাবে ঋণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেয়া এবং অপরদিকে এই ব্যক্তিকে ভদ্রজনোচিত পন্থায় ঋণ ফেরত চাওয়ার উপদেশ দেয়া।" তারপর বললেন, যাও, ওর পাওনা দিয়ে দাও। আর ধমক দেয়ার বদলে অতিরিক্ত বিশ সা খেজুর দিও।

আসলে এ ঘটনাটা ছিল যায়েদ বিন সাহনার পক্ষ থেকে রসূল সা. এর নবুয়তের শেষ পরীক্ষা। তিনি হযরত ওমরকে নিজের পরিচয় জানালেন এবং তাকে সাক্ষী করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতপর নিজের অর্ধেক সম্পত্তি মুসলিম জনগণকে দান করলেন। এই যায়েদ বিন সাহনা ইহুদী মহাজনদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার এ ঘটনা থেকেও জানা যায় ইসলামী আন্দোলন ও তার সদস্যরা কিরূপ আর্থিক সংকটে ছিলেন, সংকটের কারণে কত ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং ঋণদাতাদের পক্ষ থেকে কত কঠিন আচরণ সইতে হতো।

ইহুদীরা ও ধনী মোশরেকরা একদিকে তো ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মহাজনীর অস্ত্র প্রয়োগ করতো। অপরদিকে তারা মুসলমানদেরকেও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতো, যাতে করে আন্দোলন আর্থিক অভাবের কারণে দুর্বল হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা আল্লাহর পথে দানে উদ্বুদ্ধকারী আয়াতগুলো নিয়ে বিদ্রুপ করতো। তারা বলতো, এই দেখ, মুসলমানেদর আল্লাহ্ তায়ালাও দেউলে হয়ে ঋণের জন্য ধর্না দিয়েছে। আবার কখনো বলতো, আল্লাহর হাত শেকলে বাঁধা। এ সব কথা ইহুদীদের মুখ থেকে পাচার হয়ে মোনাফেকদের মুখেও উচ্চারিত হতো এবং গোটা পরিবেশকে কলুষিত করতো। অন্যদিকে তারা দানে অভ্যস্ত মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করে বলতো, "আঁরে, নিজেদের সম্পদ নষ্ট কর কেন? মক্কার ক'জন কাংগালকে খাইয়ে দাইয়ে তোমাদের কী লাভ? নিজেদের ছেলেমেয়েদের সেবাযত্ন কর। ব্যবসায় বাণিজ্যে সম্পদ খাটাও। সম্পদ বিনিয়োগের এমন নির্বোধসুলভ খাত কোথা থেকে পেলে?" এইসব অপপ্রচারাভিযান পরিচালনাকারী ইহুদী ও মোনাফেকদের সম্পর্কেই কোরআনে বলা হয়েছে যে, يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ "অর্থাৎ তারা মানুষকে কার্পন্য করার শিক্ষা দেয়। এরা আনসারদের কাছে এসে বসতো এবং শুভাকাংখীর বেশ ধারণ করে বলতো, "নিজেদের টাকা পয়সা এভাবে উড়িওনা। এতে তোমরা অভাব অনটনে পড়বে। কাজেই তোমরা ইসলামী আন্দোলনের পেছনে এত অর্থ ব্যয় করোনা। পরিস্থিতি কী হয়ে দাঁড়াবে, তা বুঝতে চেষ্টা কর।" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

ওদিকে ইহুদীদের ক্রীড়নক পঞ্চম বাহিনীর লোকদের মধ্যে কানাঘুষা হতো যে, "রসূল সা. এর সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ কর। ওরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাক।" (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-৭)

কত দূরদর্শী কুট পরিকল্পনা ছিল! একদিকে আল্লাহর পথে দান করার মানসিকতা ও জযবার উৎস বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ। অপরদিকে মহাজন হয়ে নিজেদের শাইলকী যুলুম দ্বারা ইসলামী আন্দোলনকে পিষ্ট করে ফেলার অপচেষ্টা। এ পরিকল্পনা সফল হলে ঈমান, যুক্তি এবং আমল ও চরিত্রের ময়দানে মোকাবেলা না করেই ইসলামী বিপ্লবকে পরাজিত করা যেত। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা ছিল সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে জড়িত। তাই তাঁর সুক্ষ্ম তদবীরে ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাত হয়ে গেল।

এই কাহিনীতে মূল বিষয় হলো রসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের সেই ধৈর্যশীল সুলভ চরিত্র ও ভূমিকা যা বিরোধীদের হীন নিপীড়নের জবাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যারা চরম নৈরাজ্যজনক ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতেও তাদের উচ্চস্তরের নৈতিক মানকে এতটুকুও

নীচে নামতে দেননি। তারা যে মানবতার কত বড় ও উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন, ভেবেও তার কুলকিনারা পাওয়া যায়না।

ইহুদীদের গড়া পঞ্চম বাহিনী

মানবেতিহাসের হাজারো অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যখনই সততা ও মানব কল্যাণের লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে কোন আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং তা বিজয়ের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে; তখন তার প্রতিরোধকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর একটি হয়ে থাকে যারা প্রকাশ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সমকালীন অস্ত্র প্রয়োগ করে তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। অপর শক্তিটি হয়ে থাকে সেই সব নৈরাজ্যবাদী ও নাশকতাবাদী লোক, যারা চারিত্রিক হীনতা ও নীচতার কারণে কাপুরুষতা ও শঠতার নিম্নস্তরে নেমে আসে এবং মোনাফেকীর গোপন ঘাঁটিতে বসে চক্রান্তের জাল বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। মক্কার মোশরেকদের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ ছিল প্রথমোক্ত শক্তি আর মদিনার ইহুদীও তাদের বংশধরা ছিল শেষোক্ত শক্তি।

যেহেতু ইসলামী আন্দোলন একটা রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছিল, এই রাষ্ট্র সকলের চোখের সামনেই বেড়ে উঠছিল, এবং চারদিক থেকে বিবেকবান, সক্রিয় ও কর্মপ্রিয় লোকেরা এতে যোগদান করছিল। তাই বিরোধী শক্তি হীনমন্যতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছিল। কিন্তু তাদের মনের অভ্যন্তরে যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল তা প্রকাশ করা ও পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বিস্তার করার কোন উপায় ছিলনা। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের মোকাবেলায় ইহুদীদের কাছে কোন যুক্তিসংগত, সহজ সরল, জনগণকে আকর্ষণকারী এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কোন গঠনমূলক মতবাদ ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে ছিলনা। তাদের কাছে ছিল কতগুলো নিষ্প্রাণ ও অসার আকীদা-বিশ্বাস, যা ইতিহাসের প্রবাহকে রোধ করা ও মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পংগুত্ব ও স্থবিরতা সৃষ্টি করার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। ইসলামী আন্দোলন যে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী জনশক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল, তাদের সামনে টিকে থাকার মত সমমানের নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন জনশক্তি ইহুদীদের কাছে ছিলনা। তাদের কাছে যে জনশক্তি ছিল, তা নৈতিক দিক দিয়ে মনুষ্যত্বের কাংখিত সর্বনিম্নমানের চেয়েও নিম্ন মানের ছিল। এই পতিত দশা থেকে টেনে তোলার মত কোন প্রেরণা ও চালিকাশক্তি তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিলনা। মানবতার পুনর্গঠনের কোরআনী দাওয়াত যে নতুন মানুষ গড়ে তুলেছিল, ইহুদীবাদের গড়া প্রাচীন ধাচের মানুষ তার সামনে দাঁড়ানোরই যোগ্য ছিলনা। অপপ্রচার চালিয়ে ভুল বুঝাবুঝি ও শত্রুতা যতই সৃষ্টি করুক না কেন, যুক্তির ময়দানে ইহুদী শক্তি ক্রমেই পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল। তারা নিজেদেরকে যাই মনে করুক না কেন, ইতিহাসের শক্তি ইসলামী আন্দোলনেরই পক্ষে ছিল। বাস্তবতার রণাঙ্গনে ইহুদীদের ওপর সর্বদাই দুরন্ত আঘাত আসছিল। সমকালীন মানব সমাজ তাদেরকে পেছনে ফেলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক অংগনে ইহুদীদের সাধ ছিল ইসলামী বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু মৈত্রী চুক্তি তাদের হাত বেঁধে রেখেছিল। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তারা একেবারেই অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়েছিল। আর এই

অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের অনুভূতি তাদের চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্টের সাথে মিলিত হয়ে কাপুরুষত্বের রূপ ধারণ করেছিল। অসহায়ত্ব ও কাপুরুষত্বের পরিবেশে মানুষের মনে যে প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিকতা সক্রিয় থাকে, তা সর্বদাই হিংসা ও বিদ্বেষের পথ দিয়ে তাকে মোনাফেকীর গোপন ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়ে থাকে। ফলে সে প্রতিপক্ষের ওপর সম্মুখ থেকে আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে পেছন থেকে গোপন আঘাত হানে। প্রকাশ্য ডাকাতির পরিবর্তে সে সিঁদেল চুরির চক্রান্ত আটে। এই কাপুরুষোচিত ভূমিকাই অবলম্বন করলো ইহুদী সম্প্রদায়।

বাস্তব পরিস্থিতি ঘৃণ্য মোনাফেক চক্রের আবির্ভাবের জন্য দুটো সহায়ক উপকরণ সৃষ্টি করে দেয়। প্রথমত ইহুদী চক্র ও তাদের বশংবদদের প্রতিহিংসামূলক মানসিকতা। এই মানসিকতার যেহেতু প্রত্যক্ষ আক্রমণের ক্ষমতা ছিলনা, তাই মোনাফেকীর গোপন ঘাঁটি সক্রিয় হয়ে উঠলো। দ্বিতীয়ত ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে অনেকে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য এই চোরা পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগালো।

এই চোরা পথের উদ্বোধন ইহুদী মস্তিস্কই করেছিল। তাদের নামকরা সরদাররা নিজেদের বৈরী মানসিকতাকে লুকিয়ে রেখে ইসলামের আলখেল্লা পরে ইসলামী সংগঠনে প্রবেশ করতে লাগলো। বনু কাইনুকার নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ "পঞ্চম বাহিনী" হিসেবে ইসলামে প্রবেশ করে ঃ

(১) সা'দ বিন হানীফ (২) যায়েদ বিন লুসিত (৩) নুমান বিন আওফা বিন আমর (৪) রাফে বিন হুরাইমালা (৫) রিফা বিন যায়েদ বিন তাবুত (৬) সালসালা বিন বারহাম (৭) কিনানা ইবনে সূরিয়া।

এদের মধ্যে যায়েদ বিন লুসিত হলো সেই ব্যক্তি, যে বনু কাইনুকার বাজারে হযরত ওমরের সাথে মারামারি বাধিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া এই ব্যক্তি রসূল সা. এর উটনী হারিয়ে গেলে টিটকারী দিয়েছিল যে, "এমনি তো উনি আকাশের খবরাদি দিয়ে থাকেন, অথচ ওর উটনীটা এখন কোথায় আছে তা জানেন না!" এর জবাবে রসূল সা. বলেছিলেন, "আল্লাহ যা আমাকে জানিয়ে দেন তাছাড়া আমি আর কিছু জানিনা। এখন আল্লাহ আমাকে উটনীর খবর জানিয়ে দিয়েছেন। উটনীটা অমুক মাঠে আছে এবং একটা গাছের সাথে তার বাগের রশী আটকে গেছে।" সাহাবীগণ তালাশে ছুটে গেলে অবিকল সেই অবস্থাই স্বচোক্ষে দেখলেন।

রাফে বিন হুরাইমালা এমন উঁচুস্তরের মোনাফেক ছিল যে, সে যেদিন মারা গেল সেদিন রসূল সা. বললেন, আজ মোনাফেকদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা মারা গেছে। রিফা বিন যায়েদ বিন তাবুতও অনুরূপ একজন। বনুল মুসতালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একটা ঝড় উঠলে লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। রসূল সা. সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এই ঝড় জনৈক মোনাফেক নেতাকে শাস্তি দেয়ার জন্য এসেছে।" মদিনায় পৌঁছার পর সবাই জানতে পারলো যে, ঐ ঝড়েই রিফা পটল তুলেছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

মজার ব্যাপার হলো, মোনাফেকদের কাতারে যত লোক শরীক হয়েছিল, তারা সকলেই ছিল বয়সে প্রাচীন ও সচ্ছল। তারা ছিল স্বার্থপর এবং পাষাণ হৃদয়। যুবকরা সাধারণত

ইসলামী আন্দোলনের সাথী ছিল। মাত্র একজন যুবক কিস বিন আমর বিন সাহলকে পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাওয়া যায়।

এই চক্রটি এত সীমিত ছিলনা। আসলে এই কয় ব্যক্তি তো ছিল পঞ্চম বাহিনীর নেতা ও সেনাপতি। তারা নিজেদের পরিচিত মহল থেকে নতুন নতুন মোনাফেককে ভর্তিও করতো। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকে দুর্বল লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে তাদেরকেও প্রভাবিত করতো, তাদেরকে ব্যবহার করতো, তাদের মধ্যে সন্দেহ সংশয় ছড়িয়ে মুসলমানদের বৈঠকাদিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে বিদ্রুপ ও উপহাসের মাত্রা যোগ করে পরিবেশকে খারাপ করতো। মসজিদে গিয়ে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনে নিজেদের বৈঠকগুলোতে তার রিপোর্ট দিত। রাতের বেলা বসতো ষড়যন্ত্রের বৈঠক, তৈরী হতো নতুন নতুন ক্ষতিকর পরিকল্পনা, এবং নতুন নতুন পন্থায় তা বাস্তবায়ন করা হতো। মোনাফেকদের তৈরী করা এই বেঢংগা চালচলন তার নিজস্ব অস্বাভাবিকতার কারণে রসূল সা. ও মুসলমানদের দৃষ্টিতে সুপরিচিত ছিল। সাথে সাথে প্রত্যেকটি স্তরে ওহীর মাধ্যমে তাদের চিন্তা, কর্মকান্ড, ষড়যন্ত্র, এমনকি তাদের অপরাধ প্রবণ বিবেকের বিশেষ বিশেষ আলামতকেও চিহ্নিত করতে থাকতো। একবার তো মসজিদে নববীতে এই মোনাফেক সরদারদের আচরণ অসহনীয় হয়ে ওঠে। সাধারণ সমাবেশে এই চক্রটি একেবারেই আলাদাভাবে বসেছিল এবং পৃথকভাবে কানাঘুষায় লিপ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে রসূল সা. তাদেরকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কেউ কেউ পরস্পরের সাথে এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, হাত ধরাধরি ও জড়াজড়ি করা অবস্থায়ই বহিস্কৃত হলো।

এই মোনাফেক চক্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর সত্তায়। হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার নাটকের প্রধানতম খলনায়ক ছিল এই ব্যক্তি। ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা তার মেরুমজ্জায় মিশে ছিল। এই দুরারোগ্য ঘৃণা ও বিদ্বেষের মূল কারণ হযরত উসাইদ বিন হুযাইরের মুখ থেকে শুনুন। তিনি রসূল সা. এর কাছে বনুল মুসতালিক যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে বলেন ঃ

"হে রসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তির (দুঃখভারাক্রান্ত আবেগের) প্রতি একটু সদয় হোন। মদিনায় যখন আপনার শুভাগমন ঘটেছিল, তখন আমরা তাকে রাজকীয় সিংহাসনে বসানোর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিলাম। তার জন্য মুকুট তৈরী হচ্ছিল। আপনার আগমনে তার বাড়াভাতে ছাই পড়েছে। বেচারা সেই আক্রোশ ঝাড়ছে।" (তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের ভূমিকা)

কোন দাওয়াত বা আন্দোলনের কারণে যাদের পরিকল্পনা নস্যাত হয়ে যায়, এবং যাদের স্বার্থ সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও বিফলে যায়, তারা বুকের ভেতরে বিষ ভরে নিয়ে সারা জীবন ছটফট করতে থাকে। এমন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী কখনো প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করতে পারেনা। ইসলামের অবস্থাও ছিল তাই। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার ব্যর্থতার তিক্ত স্মৃতি প্রথম দিন থেকেই বহন করছিল এবং আজীবন বহন করেছে। শুরুতেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাতে এই নতুন শক্তির ভেতরে নিজের জন্য জায়গা তৈরী করে নিতে পারে এবং তার ভেতর থেকে ধাপে ধাপে উঠে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে

পৌঁছতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেদিকেই কেউ যেতে চায় তাকে ঈমান ও আমলের পথ ধরেই যেতে হয়। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর পক্ষে মোনাফেক হিসেবে অবস্থান করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। শুরু থেকে এই মোনাফেকী গোপন ছিল। কিন্তু একদিন তার মনের এই নোংরা ব্যাধি ঘটনাক্রমে জনসমক্ষে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন রসূল সা. অসুস্থ সাহাবী সা'দ বিন উবাদাকে দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন একটা গাধায় আরোহন করে। তাঁর পেছনে বসেছিল উসামা বিন যায়েদ। এই উসামাই বর্ণনা করেন, পথিমধ্যে এক জায়গায় আবদুল্লাহ বিন উবাই মজলিস জমিয়ে বসেছিল। তার চারপাশে স্বগোত্রের লোকেরাই উপবিষ্ট ছিল। রসূলকে সা. ওখান দিয়ে যেতে দেখে সে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। রসূল সা. তার কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। তারপর একটু থেমে কোরআনের একটা অংশ পড়লেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তার ক্রোধ সম্পর্কে সতর্ক করলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই নিরবে ও রুদ্ধশ্বাসে বসে রইল। কিন্তু রসূল সা. যখন কথা শেষ করে রওনা হলেন, তখন সে অত্যন্ত অভদ্র ও অশালীন ভাষায় চিৎকার করে বললো, "ওহে অমুক! তোমার কথা বলার এই পদ্ধতি ঠিক নয়। নিজের ঘরে বসে থাকো গে। যে ব্যক্তি তোমার কাছে যায়, তাকে যা বলতে চাও বলে দিও। যে ব্যক্তি তোমার কাছে না যায়, তাকে উত্যক্ত করোনা। কারো বাড়ীতে গিয়ে উপযাচক হয়ে এমন দাওয়াত দিওনা যা তার পছন্দ হয়না।" দেখুন প্রতিটা শব্দ কেমন বিষে ভরা! কেমন নোংরা ও মর্মঘাতী ভাষা এবং কেমন উস্কানীপূর্ণ ভাবাবেগ।

আসলে এ কথাগুলো ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর ছিলনা। এ ছিল আসন্ন সুখ সমৃদ্ধির যুগের বিরুদ্ধে পতনোন্মুখ জাহেলিয়াতের বিষোদগার।

রসূল সা. নিজের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে এই ইতরসুলভ প্রলাপ শুনলেন। শুনে তাঁর মহানুভব হৃদয়ে হয়তো ক্রোধের পরিবর্তে করুণারই উদ্রেক করে থাকবে।

মজলিসে মুসলিম দলের সদস্য আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও উপস্থিত ছিলেন। তার আত্মসম্মানবোধ তাকে আপন কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করলো। তিনি মোনাফেক নেতাকে তীব্র কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ "রসূল সা. কেন আসবেন না? আমরা তাঁকে চাই। তিনি আমাদের বাড়ীতে ও মজলিসে আসবেন। আমরা তাঁকে ভালোবাসি এবং তাঁরই ওছিলায় আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন।"

পথিমধ্যে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর বিশ্বমানবতার নেতা সা'দ বিন উবাদাকে দেখতে গেলেন। সা'দ রসূল সা. এর মুখমন্ডলে অস্বাভাবিক চিহ্ন দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রসূল সা. ঘটনা বর্ণনা করলেন। সা'দও একই পটভূমি বর্ণনা করলেন যে, "আল্লাহ যখন আপনাকে মদিনায় নিয়ে এলেন তখন আমরা ওর জন্য মুকুট বানাচ্ছিলাম। আপনি এসে তো তার রাজত্বের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়েছেন।" তিনি বুঝাতে চাইছিলেন যে, তার এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। একে গুরুত্ব না দেয়াই ভাল।

এই ব্যক্তি মোনাফেকীর সমগ্র নাটকের প্রধান খলনায়ক হয়ে ইতিহাসের মঞ্চে অভিনয় করতে থাকে। সে ছিল এর প্রধান হোতা। তার পেছনে ছিল বড় বড় নেতার আশীর্বাদ। আর তাদের পেছনে ছিল সচেতন মোনাফেক এবং অপরিপক্ক মুসলমানদের গোষ্ঠী। সবার

পেছনে ছিল অজ্ঞ ও অবুঝ বেদুঈনরা। ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের পেছনে পর্যায়ক্রমে এই সব বিবিধ শ্রেণীর অবদান থাকতো।

মদিনায় মুসলমানরা যে সব বিরোধিতা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ছিল এবং রসূল সা. কে যে সব চক্রান্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার সবগুলোর পেছনে ইহুদী প্রভাবিত মোনাফেকদের এই বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরাট ভূমিকা ছিল। সকল বৈরী তৎপরতার নেতৃত্ব যদিও ইহুদীদের হাতেই নিবদ্ধ থাকতো, কিন্তু রসূলের সা. পথ আগলে দাঁড়ানোর জন্য যতগুলো নেতিবাচক ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তার পেছনে কার্যত সেই মোনাফেকদের ভূমিকাই ছিল প্রধান, যারা ইহুদীদের ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করতো।

অপপ্রচারমূলক তৎপরতা

কর্মবিমুখ নৈরাজ্যবাদী মহল যখন কোন সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক আন্দোলনের কবলে পড়ে, তখন তার নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগে পড়ে। নিজেরা তো কিছু করতে চায়না। আল্লাহ এবং জনগণের প্রতি ও তারা কোন দায়দায়িত্বই অনুভব করেনা। এজন্য সকল শক্তি ও প্রতিভা অতি সহজেই নেতিবাচক তৎপরতায় নিয়োগ করে। এই সব লোক সংস্কারবাদী ও গঠনমূলক আন্দোলনের নেতা কর্মীদেরকে ভূতের মত চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে, দূরবিক্ষণ ও অনুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাদের দোষ অন্বেষণের চেষ্টা করে। তাদের প্রতিটা কথা, কাজ ও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। তারপর বিন্দুপরিমাণ কোন বক্রতা বা ত্রুটি খুঁজে পেলেই ঢেড়া পিটিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করে যে, "ওহে জনমন্ডলী! দেখ, এরা গোমরাহী, বিকৃতি ও কুফরিতে লিপ্ত। অমুক কাজ প্রাচীন মনীষীদের বিরোধী, বড় বড় ইমামদের অবমাননা, বড় বড় বুযুর্গদের সমালোচনা। অন্ধ বিরোধিতার আবেগে যখন কোন ভালো লোকের ও তার জনহিতকর কাজের ক্ষতি সাধন করা কাংখিত হয়, তখন একদিকে প্রত্যেক ভালো কাজের দোষত্রুটি বের করে দেখানো হয়। অপর দিকে যারা কাজ করে, তাদের সামান্য ভুলত্রুটি হলেও তিলকে তাল বানিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। নাশকতাবাদীদের সবচেয়ে বড় সুযোগ হয়ে থাকে তখন, যখন কোন ঘটনা সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঘটে যায়, চাই তা সঠিক ও ন্যায়সংগতই হোক। এটা সর্বজন বিদিত যে, সংস্কারবাদী, গঠনমূলক ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে অনেক জনপ্রিয় জিনিসের বিরোধিতা করতে হয়। তাই বৈরী অপপ্রচারের জন্য সব সময় একটা না একটা বিষয় অবশ্যই পাওয়া যায়। রসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম ইহুদীদের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন ছিলেন। প্রতিদিন সকাল বিকাল একটা না একটা হৈ হাঙ্গামা হতো এবং কোন না কোন অপপ্রচার চালানো হতো।

পদলোভের অভিযোগ

সত্যের নিশানবাহী মাত্রেরই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর একটা না একটা স্বার্থের কালিমা লেপনের জন্য বিরোধীরা প্রত্যেক যুগেই অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, উনি একজন পদলোভী ব্যক্তি। উনি একটা বড় কিছু হতে চান। হযরত মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তোলা হয়েছিল যে, ওঁরা রাষ্ট্রীয় গদি দখল করতে চান। হযরত ঈসার বিরুদ্ধে

কুৎসা রটানো হয় যে, উনি ইহুদীদের বাদশাহ হতে চান। নাজরানের প্রতিনিধি দল যখন এলো, তখন ইহুদীরা রসূল সা. এর ওপর অপবাদ আরোপ করলো যে, ঈসা আ. এর যে মর্যাদা ছিল, সেটা দখল করার জন্যই উনি এত মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। উনি চান খৃষ্টানরা ও অন্যরা তাঁর পূজা করতে লেগে যাক। লক্ষ্য করুন, রসূল সা. কখনো এ ধরনের কোন দাবীই করেননি। এ ধরনের কোন গদি বা পদ লাভের ইচ্ছার আভাসও দেননি। অথচ বিরোধীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এমন কাল্পনিক অভিযোগ গড়া হলো এবং আবিষ্কার করা হলো যে, মুহাম্মদ সা. এর উদ্দেশ্য এটাই হবে যে, ঈসার আ. মত নিজের পূজা করাবেন। মুখে দাবী করেননি, তাতে কী? তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই এই দাবী রয়েছে, আজ না হোক, ভবিষ্যতে কোন না কোন দিন তিনি এ দাবী যে করবেন, তারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নাজরানী প্রতিনিধিদলের কানে এসব প্রলাপোক্তি ঢোকানো হয়েছিল বলেই ঐ দলের জনৈক সদস্য আবু নাফে কারজী রসূল সা.কে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি চান খৃষ্টানরা ঈসা আ. এর যেমন পূজা করে, তেমনি মুসলমানরাও আপনার পূজা করুক? অপর সদস্য জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি আমাদের কাছ থেকে পূজা উপাসনা চান এবং তার জন্যই দাওয়াত দিচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন "আমি এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যে, আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করি কিংবা আর কারো এবাদতের দাওয়াত দেই। আল্লাহ আমাকে এ উদ্দেশ্যে পাঠানওনি এবং আদেশও দেননি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম. ২য় খন্ড) এ পর্যায়ে কোরআনও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলো যে, "এটা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দেবেন, আর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও।"

সর্বসম্মত ধর্মীয় প্রতীক সমূহের অবমাননার অভিযোগ

বিশ্ব মানবের নেতা সা. হিজরত করে মদিনায় চলে আসার পর মক্কায় নতুন করে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগতে শুরু করে এবং মদিনার উপর আক্রমণ পরিচালনার বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তাভাবনা চলে। তাদের গোয়েন্দারা মদিনার আশপাশে ঘোরাফেরা করতো। মদিনার ইহুদীদের সাথে তাদের চিঠিপত্রের আদান প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সামরিক দল যখন তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর জবাবে ইসলামী রাষ্ট্রও টহলদানের ব্যবস্থা চালু করলো। সামরিক ও বেসামরিক দলগুলো টহল দিত এবং কোরায়েশদের গোয়েন্দা ও সামরিক দলগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতো। মদিনা এ সব তৎপরতা দ্বারা কোরায়েশদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইত যে, আমরা ঘুমিয়ে নেই। সেই সাথে তাদেরকে এই মর্মে সাবধানও করা হতো যে, তোমরা যদি শান্তির পরিবেশ নষ্ট কর তাহলে তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়া হবে।

এই টহল ব্যবস্থার আওতায় রসূল সা. দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে আটজনের একটা সেনাদল কোরায়েশদের গতিবিধি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠালেন। এই সেনাদলকে কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু কোরায়েশদের একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে তাদের মুখোমুখি সাক্ষাত হয়ে গেল। এই সাক্ষাতে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাদল

আক্রমণ চালিয়ে ওদের একজনকে হত্যা করে ফেললো। আর বাদবাকীদেরকে গ্রেফতার করে পণ্য সম্ভারসহ মদিনায় আনা হলো। এ ঘটনা যেহেতু রজব মাসের শেষে ও শাবানের শুরুতে রাতের বেলায় ঘটেছিল, এজন্য সন্দেহের সুযোগ নিয়ে একদিকে মক্কার কোরায়েশরা এবং অপরদিকে মদিনার ইহুদী ও মোনাফেকরা অপপ্রচারের তান্ডব সৃষ্টি করলো। তারা এ ঘটনাকে নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ রজব মাসের সাথে সম্পৃক্ত করে জনগণকে উত্তেজিত করতে লাগলো যে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায়, অথচ নিষিদ্ধ মাসেও রক্তপাত করতে দ্বিধা করেনা। (তাফহীমুল কুরআন)

এই অপপ্রচারের ফল মুসলমানদের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। এই ক্ষুদ্র নবীন শক্তিটি এমনিতেই চারদিক থেকে শত্রু ও বিপদে পরিবেষ্টিত ছিল। তার জন্য যে কোন ব্যক্তি ও যে কোন মহলের সমর্থন খুবই মূল্যবান ছিল। এদের সম্পর্কে আরবে এমন ধারণা বিস্তার লাভ করা খুবই বিপজ্জনক ছিল যে, তারা নিষিদ্ধ মাসের সম্মান নষ্ট করে দিচ্ছে। কেননা নিষিদ্ধ মাসের এই সম্মান বহাল থাকার ওপরই আরবের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতি নির্ভরশীল ছিল। এতে মুসলমানদের সমর্থকরাও তাদের বিরোধী হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। তা ছাড়া এ বিষয়টা যেহেতু জনগণের স্পর্শকাতর ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাই এটা উস্কানির কারণও ছিল। বিশেষত এই অপপ্রচার মুসলমানদের খোদাভীতি, দ্বীনদারী ও নৈতিক দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে তাদের ওপর আস্থা নষ্ট করে দিতে সক্ষম ছিল।

নাখলার এ ঘটনা আরো একটা কারণে খোদ ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিতেই অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হলো, রসূল সা. এই সেনাদলকে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। যথারীতি নির্দেশ না পেয়েও এই সেনাদল এমন একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যা ইসলামী রাষ্ট্রের টহল ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকেই পন্ড করে দিতে এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছিল, তার ক্ষতি সাধন করতে পারতো। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অত্যধিক সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল। এখন যেহেতু নাখলার দুর্ঘটনা পুরোপুরি একটা বেআইনী ও নিয়ম বহির্ভূত পদক্ষেপ ছিল, তাই রসূল সা. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তাদেরকে শাস্তি দিলেন, এবং আটককৃত বন্দীদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ ও তাদের পণ্য সম্ভারকে বাইতুল মালে জমা করতে অস্বীকার করলেন।

ইসলামী রাষ্ট্র নিজস্ব নিয়মশৃংখলা মোতাবেক এই নিয়মবহির্ভূত পদক্ষেপের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ছিল তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিরোধীরা এটা নিয়ে যে অপপ্রচার শুরু করলো, ইসলামী রাষ্ট্র অধিকতর যুক্তিনির্ভর, নৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী ও পরিচ্ছন্ন অথচ দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তার মোকাবেলা করলো। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ওহির মাধ্যমে রসূল সা. এর মুখ দিয়ে এর জবাব দেওয়ালেন যে ঃ

"লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা কেমন কথা! হে নবী, আপনি বলে দিন, এটা খুব অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে চলতে মানুষকে বাধা দেয়া, আল্লাহর অবাধ্যতা করা, আল্লাহর বান্দাদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে না দেয়া এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চাইতে অনেক বড় অন্যায়। আর রক্তপাতের চেয়েও অরাজকতা মারাত্মক।" (বাকারা, ২১৭)

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, ইসলাম বিরোধীদের জোরদার প্রচারাভিযানে প্রভাবিত ও বিব্রত হয়ে মুসলমানরা জিজ্ঞেস করেছিল, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন। যারা সততা ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে একটা ভারসাম্যহীন ধারণা পোষণ করতো এবং যারা সামান্য বিরোধিতা দেখলেই ঘাবড়ে যেত, তারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে, আমরা ইসলামের প্রকৃত চেতনা ও খোদাভীরুতা হারিয়ে ফেলছিনা তো? আমরা মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতি প্রীতির অধীন আমাদের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেরাই জনগণকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিনা তো? এ ধরনের লোকদের বিব্রতবোধ অস্বাভাবিক ধরনের ছিল এবং তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাই তারা বিশেষভাবে এ বিষয়ে বুঝ অর্জন করতে চাচ্ছিল। প্রশ্নের পেছনে এই মনমানস বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। এই প্রসংগে ইসলাম বিরোধীদেরকেও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হলো। আল্লাহ বললেন যে, মক্কার যে মোশরেকরা আল্লাহর পথে চলতে মানুষকে বাধা দেয়া, আল্লাহর অবাধ্যতা, হারাম শরীফে আগমনকারীদেরকে আসতে না দেয়া, এবং হারামবাসীকে উত্যক্ত করে হারাম শরীফ থেকে বের করে দেয়ার মত গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তারা এখন নিষিদ্ধ মাসের সম্মানের রক্ষক সেজে কোন্ মুখে ময়দানে আসছে। এর ভেতরে ইহুদী ও মোনাফেকদেরকেও প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা তো মক্কাবাসীর এত সব যুলুম নিপীড়ন এবং ধর্মীয় প্রতীক সমূহের পবিত্রতা বিনষ্টকারী কার্যকলাপের সময় মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলে এবং আজও তোমরা সে সম্পর্কে নীরব। আজ তোমরা নাখলার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে ধর্মীয় পবিত্রতার এমন রক্ষক সেজে গেলে? অথচ এ কাজের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কোন অনুমতি দেয়নি। বরং কতিপয় ব্যক্তির ভুলের কারণে ঘটনাটা ঘটে গেছে। এ ঘটনার সুফল গ্রহণ করতে রাষ্ট্রের শাসক অস্বীকার করেছেন এবং জড়িত ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

এ ঘটনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় বুঝা যায়, ইসলামের শত্রুরা কিভাবে ওৎ পেতে বসে থাকে যে, পান থেকে চুন খসলেই তারা হামলা করে দেবে। কারো দ্বারা সামান্যতম ভুলত্রুটি হয়ে গেলেই তারা তৎক্ষণাত তা সারা দুনিয়ায় নিজস্ব ব্যাখ্যার রং মেখে ছড়িয়ে দেবে।

যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি ব্যাপারে বিভ্রান্তি, খারাপ ধারণা ও উস্কানি ছড়ানোর অপচেষ্টা চলে, সেখানে শত্রু পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী আন্দোলন ও তার পরিচালক কত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন, তা সহজেই অনুমেয়। গোটা পরিবেশ সেখানে সন্দেহ সংশয়, বিভ্রান্তির প্রশ্ন ও আপত্তিতে ভরপুর ছিল। কিন্তু এ ধরনের বাধাবিপত্তি কখনো কোন আদর্শবাদী ও চরিত্রবান সংগঠনের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

ধর্মের আড়ালে স্বার্থোদ্ধারের অপবাদ

আমি আগেই বলেছি, ইসলামের বাস্তবায়িত প্রতিটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ওপর ইহুদী আলেমরা একেবারেই অযৌক্তিকভাবে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। একটা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল ধর্মপুত্র বা মুখবলা পুত্রের মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত। এ নিয়েও বিরূপ প্রচারনা খুবই জোরে শোরে চালানো হয়।

পূর্বতন ধর্মীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা অনুসারে আরবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী প্রথা চলে আসছিল যে, পালিত (তথা মুখবোলা) পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা অবিকল আসল পুত্রবধুর ন্যায় অবৈধ। এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে ঘটনা প্রবাহকে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে অবর্তিত করেন এবং একটা বৈপ্লবিক পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছান। ঘটনাটা ছিল এইযে, মাত্র দশ বছর বয়সে যায়েদ বিন হারেসা ক্রীতদাসে পরিণত হন। রসূল সা. তাকে এত স্নেহ ও যত্নে লালন পালন করতে থাকেন যে, তাঁর গৃহে তিনি পালিত পুত্রের মর্যাদা লাভ করেন। পরবর্তী সময় যায়েদের বাবা ও ভাই তাকে নিতে আসে এবং রসূলও সা. তাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রসূল সা. কে যায়েদ এত গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন যে, এই সম্পর্কটা ছিন্ন হওয়া তিনি মেনে নিতে পারেন নি এবং বাবার সাথে যেতে সম্মত হননি। যায়েদ ঘটনাক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হলেও আসলে সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারের সন্তান ছিলেন বিধায় মক্কার কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রসূলুল্লাহর সা. ফুফাতো বোন যয়নবকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যয়নবের ভাই এ বিয়েতে রাযী হননি। কেননা আরবে বিয়ের জন্য যে মাপকাঠি ও মানদন্ড চালু ছিল, এই বিয়ে সেই মানদন্ডে উত্তীর্ণ ছিলনা। জাহেলী মানসিকতার দৃষ্টিতে হযরত যায়েদের ললাটে তখনো দাসত্বের কলংক চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। তাছাড়া তার সহায় সম্বলহীন ও চালচুলোহীন হওয়াটাও ছিল একটা আলাদা ত্রুটি। ইসলাম এসে এই মানসিকতাকেও পরিবর্তন করা জরুরী মনে করে। মানবতার বন্ধু রসূল সা. বিয়ে শাদীর পথ থেকে বংশগত বৈষম্যের বাধা অপসারণ করে সমগ্র ইসলামী সমাজকে একীভূত পরিবারে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টার ফলে এই বৈষম্যের প্রাচীর সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে যায় এবং 'কুফু' বা পারিবারিক সাম্যের একটা নতুন অর্থের সৃষ্টি হয়। তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী পাল্টান। তিনি তাদেরকে শেখান যে, বিয়ে করার সময় সর্বপ্রথম কনের চরিত্র ও দ্বীনদারী দেখতে হবে। অন্যান্য জিনিসকে বিবেচনায় আনতে হবে এর পরবর্তী পর্যায়ে। একবার তিনি একথাও বলেন, দ্বীনদারী ও নৈতিকতার পরিবর্তে তোমরা যদি অন্য কোন মানদন্ড স্থির কর, তাহলে সমাজে বিরাট অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে যাবে। এভাবে 'কুফু' সম্পর্কে যে ধারণার প্রচলন ঘটে তা এই যে, জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম জীবন সাথী বা জীবন সংগিনী হতে পারবে এবং কার সাথে রুচি ও মানসিকতার দিক দিয়ে সর্বাধিক বনিবনা ও একাত্মতা গড়ে ওঠবে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবন সংগী নির্বাচন করতে হবে। অসংখ্য বিয়ে, বরং অধিকাংশ বিয়ে কার্যত এই নতুন দৃষ্টিভংগী অনুসারে হতে থাকে। এই মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তন কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তার ধারণা হযরত আবু তালহার বিয়ের ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। হযরত আবু তালহা নিজে কাফের থাকা অবস্থায় হযরত উম্মে সুলাইমকে রা. কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। অথচ উম্মে সুলাইম তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি জবাব দিলেন, "তুমি এখনো কাফের রয়েছ, আর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন পরস্পর বিরোধী দুটো জীবন কিভাবে একত্রিত হতে পারে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে 'ইসলাম গ্রহণ' ছাড়া আর কোন মোহর নেবনা।" এ জবাব থেকে বুঝা যায়, এই বিয়ের প্রস্তাব হযরত উম্মে

সুলাইমের কাছেও কাংখিত ছিল। কিন্তু ইসলাম এমন বিপ্লবাত্মক মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, তিনি মনের ওপর বলপ্রয়োগ করে তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। তবে সেই সাথে ইসলামের প্রতি উৎসাহও দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন। বিয়ে হয়ে গেল এবং সত্যই সত্যই তাদের মোহর ধার্য হলো ইসলাম। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক ও উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত, মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী রা.)

সারকথা, বিয়েশাদীতে রুচি ও মানদন্ডে পরিবর্তন আসছিল। কিন্তু তবুও কিছু বাধা অবশিষ্ট ছিল। এ কারণেই হযরত যয়নবের ভাই প্রস্তাবিত বিয়েতে সম্মত হলেন না। রসূলও সা. চাইছিলেন যে বিয়েটা হোক। কিন্তু এর পথে যখন নিছক একটা জাহেলী মানসিকতা বাধ সাধলো, তখন এটা আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত বলে চিহ্নিত হলো। আভাসে ইংগিতে সূরা আহযাবে এর সমালোচনা করা হলো। ৩৫ নং আয়াতে বলা হলো, "মুসলিম নারী ও মুসলিম পুরুষ, মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ.................... এর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।" এ আয়াতের মূল বক্তব্য হলো, ইসলামী মতাদর্শ, ইসলামী মানসিকতা ও ইসলামের চরিত্রের অধিকারী মুসলমান নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পূর্ণ সমান ও সমমনা। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও মমত্ব রয়েছে এবং তারা পরস্পরের কাছে কদর পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং তাদের মাঝে বংশীয় বৈষম্য ও ভেদাভেদ, কৌলিন্য ও অভিজাত্যের জাহেলী ধ্যানধারণা বাধা হয়ে দাঁড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ইংগিত শুধু এতটুকুই ছিলনা। পরবর্তী আয়াত আরো কঠোর। তাতে বলা হলো, যখন আল্লাহ ও তার রসূল সা. কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর এ অধিকার নেই যে, ঐ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে নিজের পছন্দ ও অপছন্দ এবং নিজস্ব মানদন্ডকে গুরুত্ব দেবে। এভাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা বিপথগামী হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।" (সূরা আহযাব, ৩৬) অর্থাৎ যখন মুসলিম পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করা হয়, তখন পুরনো জাহেলী ধ্যান-ধারনাকে গুরুত্ব দিয়ে বাধার সৃষ্টি করা আল্লাহ ও রসূলের পথ নির্দেশনা ও তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্বেচ্ছাচার। এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা পরিণামে গোমরাহীর রূপ ধারণ করে থাকে। এভাবে এ আয়াতে বেশ জোরদার আঘাত করা হয়েছে এবং তা সঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগেছে। যয়নবের ভাই এ আয়াতগুলো শুনে ইংগিতটা বুঝে ফেললেন এবং বিয়েতে রাযী হয়ে গেলেন। এর অর্থ দাঁড়ালো যে, জন্মগতভাবে সম্ভ্রান্ত ও অ-সম্ভ্রান্ত, এবং কুলীন ও অকুলীন হওয়ার জাহেলী মানদন্ডের শৃংখল ভেংগে গেল।

আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা দ্বারাই মুখবলা বা পালিত পুত্র সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাটাও বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি দাঁড়ালো এ রকম যে, স্বামী স্ত্রীতে বনিবনা হলোনা। দু'জনের মধ্যে যে বাস্তব ব্যবধানটা বিদ্যমান ছিল, সেটা সম্পর্ককে প্রভাবিত করলো। রসূল সা. এর কাছে অভিযোগের পর অভিযোগ আসতে লাগলো। কিন্তু সম্পর্কের উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই ঘটতে লাগলো। অবশেষে যায়েদ রসূল সা. এর কাছে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে লাগলেন। রসূল সা. খুবই বিচলিত হলেন। কারণ এমন একটা বিয়ে ভেংগে যাচ্ছে, যা সমাজে একটা বিপ্লবী দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়েছিল। তাছাড়া এ বিয়েতে স্বয়ং রসূল সা. এর উৎসাহ ও পরামর্শেরও

উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তিনি যায়েদের অভিভাবক ছিলেন। তাই এ ক্ষেত্রে তার ওপর বিরাট দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তিনি বারবার এ বিয়েকে বহাল রাখার ও যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেয়। অবশেষে প্রয়োজন দেখা দেয় যে, তিনি নিজেই যয়নবকে বিয়ে করবেন। শরীয়তের এ ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিলনা। কিন্তু সাবেক জাহেলী ধ্যান-ধারণার কারণে আশংকা ছিল যে, জনসাধারণ হয়তো হতবাক হয়ে যাবে এবং সেই সাথে বিরোধীরা অপপ্রচারের আর একটা উপকরণ পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা এটাই ছিল যে, জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা পালিত পুত্র সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন খুবই স্পষ্টভাবে ও সচ্ছভাবে স্বয়ং রসূল সা. এর হাতেই সম্পন্ন করতে হবে, যাতে এই কু-প্রথার মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়ে যায়। কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সুপ্ত দুশ্চিন্তাকে প্রকাশ করে দিলেন। বললেন ঃ তুমি নিজের মনে যা লুকিয়ে রাখছ, তা আল্লাহ্ প্রকাশ করেই ছাড়বেন। তুমি মানুষকে ভয় কর, অথচ আল্লাহকেই বেশী ভয় করা উচিত।" (আহযাব-৩৭) মৃদু সমালোচনার ভংগিতেই বলা হয়েছে যে, তুমি এমন কথা মনে লুকিয়ে রাখছ, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিতে বদ্ধপরিকর। তুমি মানুষকে ভয় পাও, অর্থাৎ যে জিনিস আল্লাহর আইনে বৈধ, তাকে সমাজের জাহেলী ধ্যান-ধারণার আশংকায় মনে লুকিয়ে রাখা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। এটা প্রকাশ পাওয়া দরকার," যাতে মুখবলা ছেলেরা তাদের স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ করলে তাদের ব্যাপারে মুমিনদের ওপর কোন বিধিনিষেধ না থাকে।" (আহযাব-৩৭) অর্থাৎ মুখবলা ছেলেদের ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত প্রাচীন কড়াকড়িকে মুসলমানদের ওপর থেকে চিরতরে তুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। জাহেলিয়তের এই শেকল ভাঙ্গার জন্য এভাবেই চূড়ান্ত আঘাত হানা হলো যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে রসূল সা. এর সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এ ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথেই মদিনার ইসলাম বিরোধী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা এ বলে প্রচারনা চালাতে লাগলো ঃ "দেখলে তো ধার্মিকতা ও পবিত্রতার ভড়ং? পালিত ছেলের বউকে উনি কিনা বিয়ে করে ফেললেন!" এই সাথে কাহিনীটাকে চটকদার ও মুখরোচক করার জন্য নানা রকমের গল্প বানানো হলো। দুর্মুখ ইহুদী ও মোনাফেকরা তখন গুজবও ছড়াতে লাগলো যে, (নাউযুবিল্লাহ) "আসলে উনি পুত্র বধুর প্রেমে মজে গিয়েছিলেন আর কি! এ জন্য তালাক দিতে বাধ্য করেছেন এবং তারপর নিজেই বিয়ে করে ফেলেছেন।"[৩]

---

৩. উল্লেখ্য যে, আধুনিক কালের কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ওরিয়েন্টালিস্ট ইসলামী আন্দোলনের তৎকালীন কট্টর দুশমনদের আরোপিত সমস্ত নোংরা অপবাদকে ইতিহাস থেকে হুবহু গ্রহণ করেছে। এই ঘটনাটাও ঐসব বিদ্বান ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং একে অধিকতর মুখরোচক বানিয়ে তাদের বই পুস্তকে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. নাকি হঠাৎ করেই যয়নবকে দেখে ফেলেন এবং প্রেমে মজে যান। একটু ভেবে দেখা দরকার, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিষ্কলংক যৌবন নিয়ে সার্বক্ষণিক চেষ্টাসাধনা ও অবিশ্রান্ত ব্যস্ততায় পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিলেন এবং যিনি একটা মুহূর্ত স্বস্তিতে কাটাত পারলেন না, তার চরিত্র পরিপক্কতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে এতই ঠুনকো হয়ে গেল যে, একটা মাত্র দৃষ্টিতেই প্রেমে দিশেহারা

বিয়েটাও যা তা বিয়ে নয়, একেবারে আকাশেই সম্পাদিত। এ বিয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নাকি ইচ্ছেমত ওহিও নাযিল করিয়ে নিয়েছেন। ইতিপূর্বে আকীদা ও ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে অনেক বৈরী প্রচারণা চালানো হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে তো সত্য সত্যই নোংরা প্রচারনা চালানো হয়েছে এবং রসূল সা. এর চারিত্রিক মাহাত্ম্যের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এ কথা সুবিদিত যে, কোন সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে নৈতিক দিক দিয়েই সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ চালানো সম্ভব। কোন দাওয়াতের শীর্ষ নেতা সম্পর্কে যদি বিরোধীরা এরূপ প্রচারণায় লিপ্ত হয় যে, সে একজন লম্পট, সে নিজের প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেনা, এবং সে কোন চারিত্রিক মানের প্রতি সম্মান দেখায়না, তা হলে এর চেয়ে ক্ষতিকর আঘাত আর কিছু হতে পারেনা। সহজেই অনুমেয় যে, শত্রুরা মদিনায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কত নোংরা প্রচারনা চালিয়েছে এবং মানবতার এই সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাংখীর কয়েকটা দিন কিরূপ মানসিক যন্ত্রণায় কেটেছে।

ইহুদীদের এই অপপ্রচার নিরীহ ও সরলমনা মুসলমানদের জন্যও অত্যধিক বিব্রতকর ছিল বলে মনে হয়। চলার পথে হয়তো তাদেরকে অনেক আজে বাজে কথা বলে উত্যক্ত করা হতো এবং তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করা হতো। কোন কোন অপরিপক্ক মুসলমান হয়তো এর ফলে ঘাবড়ে যেত। তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী মোনাফেকেরা হয়তো আপন সেজে অনেক উল্টাপাল্টা কথা ছড়াতো। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সান্ত্বনা ও প্রশিক্ষণার্থে কয়েকটা বিষয় তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিলেন। তাদের জানিয়ে দিলেন যে, নবী সা. এর জন্য আল্লাহ যা বৈধ করেছেন, তার ব্যাপারে তার ওপর আর কোন বিধিনিষেধ নেই। (সূরা আহযাব-৩৮) এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্যও জানিয়ে দিলেন যে, মুসলমানদের ওপর তাদের পালিত পুত্রদের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করায় যেন কোন বাধা না থাকে। (সূরা আহযাব-৩৭) এ কথাও ঘোষণা করে দিলেন যে, মুহাম্মাদ সা. তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন। (সূরা আহযাব-৪০) সবার শেষে স্বয়ং রসূলকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ করোনা। এবং তাদের অপপ্রচারে মর্মাহত হয়োনা। আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আহযাব-৪০) এভাবে অত্যন্ত শান্ত ও শালীন পন্থায় এই ঘৃণ্য ও নোংরা অপপ্রচারের জবাব দেয়া হলো, যা ইহুদীরা অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্যে চালিয়েছিল।

হয়ে গেলেন? তার সামগ্রিক চরিত্রের সাথে কি এ অপবাদ আদৌ খাপ খায়? তাছাড়া হযরত যয়নব রসূল সা.-এর আপন ফুফাতো বোন ছিলেন এবং শৈশব থেকেই তার সামনে হেসে খেলে বড় হয়েছেন। তার অস্তিত্বতো রসূলের সা. কাছে নতুন কিছু নয়। এটাও বাস্তব ঘটনা যে, তিনি নিজেই অনেক চেষ্টা করে যায়েদের সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই বিয়েতে তিনিই ছিলেন যায়েদের অভিভাবক। এ সব অকাট্য তথ্যের সামনে কি এই মনগড়া কাহিনীর আদৌ কোন ভিত্তি খুজে পাওয়া যায়, যা মদিনার ইহুদী ও মোনাফেকরা তৈরী করেছিল এবং যাকে পুনরায় ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে? যুক্তি (Rationalism) ও গবেষণার (Research) দাবীদারদের নিজস্ব মানদণ্ডে কি এই কল্পকাহিনী উত্তীর্ণ হয়?

আরো একটা নোংরা অপপ্রচার

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে যখন কোন দিক দিয়েই হামলা করে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ পাওয়া যায়না, তখন শয়তান তাকে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার প্ররোচনা দেয়। আর শয়তানের দৃষ্টিতে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, এর নেতার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ওপর কলংক লেপন করা। এ জন্যই এক পর্যায়ে ক্ষমতার মোহ এবং আর এক পর্যায়ে স্বার্থপরতার জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় রসূল সা. এর বিরুদ্ধে। এরপর অপপ্রচারণার এই ধারা আরো সামনে অগ্রসর হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার পরিবারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। অথচ এই পরিবারকে সমগ্র মানবজাতির জন্য ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় নমুনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সমাজের অবকাঠামো তৈরী হচ্ছিল। আর এই পরিবারের কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানাই ছিল ঐ অবকাঠামোকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। শেষ পর্যন্ত নাশকতাবাদী শক্তি এই শেষ আঘাতটা হানতেও দ্বিধা করলোনা। এই বৈরী আঘাতের মর্মন্তুদ কাহিনী কোরআন, হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে "ইফকের ঘটনা" তথা "হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের কাহিনী" নামে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

মূল ঘটনার তথ্যাবলী তুলে ধরার আগে আমি এ কথা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি যে, এমন জঘন্য অপবাদের ভয়াবহ তান্ডব ইসলামী আন্দোলনের গড়া সৎ ও পূন্যময় সমাজে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুসংগঠিত দলের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হতে পারলো কিভাবে? কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে এই ভয়াবহ ঝড় ইসলামী সংগঠনের সুরক্ষিত দুর্গে ঢুকলো এবং কিছু সময়ের জন্য তা চরম বিভীষিকার সৃষ্টি করার সুযোগ পেল?

বিভ্রান্তি সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে নাশকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য শয়তানের একটা বিশেষ ধরনের অনুকূল পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন। এই পরিবেশ সমাজের শৃংখলা ও নৈতিকতার কোন ত্রুটির কারণেই সৃষ্টি হোক, অথবা পরিস্থিতি ও পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার কারণেই জন্ম নিক, বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হলেই শয়তানের চক্রান্ত কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে। আল্লাহর প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার ধারায় শয়তানের জন্য কাজ করার কিছু ফাঁকফোকর অবশ্যই থেকে যায়, চাই তা যত বড় আদর্শ সমাজই হোক না কেন। আসলে মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কিছু কিছু দুর্বলতা এমন থাকে, যার মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ও ফেতনা প্রবেশের সুযোগ পায়। রসূল সা. এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ব্যাপারেও এমন গ্যারান্টি দেয়া সম্ভব নয় যে, তার অভ্যন্তরে নৈরাজ্যবাদী শক্তি কাজ করার কোন সুযোগই পাবেনা। একজন মানুষ যত স্বাস্থ্যবানই হোক, তার কখনো কখনো জ্বর, কাশী ও সর্দিতে আক্রান্ত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি একটা পবিত্রতম সমাজেরও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। একটা সুস্থ্য ও সজীব সমাজের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশা করা যায় তা হলো, সে সব সময় রোগের প্রতিরোধ ও রোগ জীবানু ধ্বংস করার কাজে ব্যাপৃত

থাকবে। কিন্তু সে সমাজে কখনো কোন রোগের প্রাদুর্ভাবই ঘটবেনা, এমন প্রত্যাশা করা যায়না।

শয়তানের জন্য কোন সমাজে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ হয়ে থাকে গোপন সলাপরামর্শ ও ফিসফিসানির পরিবেশ। কোন সামষ্টিক ব্যবস্থায় যখন সমগ্র জনতার সামনে খোলাখুলি মতামত, পরামর্শ, সমালোচনা ও প্রশ্ন করার পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে বসে গোপন সলাপরামর্শ করে, তখনই এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কোরআনে এ জিনিসটাকে 'নাজওয়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত নাজওয়া আসলে সামষ্টিক জীবনে একটা বিপজ্জনক পথে যাত্রা শুরু করার নাম। প্রকাশ্যে কাজ করতে মানুষ যখন সংকোচ বোধ করে তখন বুঝতে হবে এর পেছনে কিছু ব্যাপার অবশ্যই আছে। সচ্ছতা এড়িয়ে গোপন সলাপরামর্শ ও ফিসফিসানির এই প্রবণতাই শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ও যোগসাজসে রূপান্তরিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশত রসূল সা. এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্দোলনের ভেতরে ইহুদীদের নেতৃত্বে মোনাফেকরা এই ফিসফিসানির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনবরতই বিব্রত করতে থাকে। যারা এই পরিবেশ সৃষ্টি করছিল, কোরআন তাদেরকেও সংশোধন করতে থাকে। আর ইসলামী সংগঠনের পরিচালকদেরকেও সতর্ক করতে থাকে। কোরআন বলে ঃ

"তোমরা দেখতে পাওনা, যাদেরকে গোপন সলাপরামর্শ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল, তারা আবারো সেই নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি করছে? তারা পরস্পরে অপকর্ম, অহংকার ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শে লিপ্ত থাকে। (সূরা মুজাদালা-৮)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখনই পৃথকভাবে পরস্পরে পরামর্শ কর তখন অসৎ কাজ, অহংকার ও রসূলের অবাধ্যতার পরিকল্পনা করোনা। বরং সততা ও খোদাভীতির জন্য পরামর্শ কর।" (সূরা মুজাদালা-১)

"ফিসফিসানি মুমিনদেরকে উত্যক্ত করার জন্য পরিচালিত শয়তানী কাজ। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসই তাদের ক্ষতি করতে পারেনা।" (সূরা মুজাদালা-১০)

"এই সব গোপন পরামর্শকারীরা মানুষের চোখের আড়ালে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর চোখ থেকে লুকাতে পারেনা। তারা যখন রাতের অন্ধকারে ও নিভৃতে আল্লাহর অপছন্দনীয় কথাবার্তা বলে, তখন আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন।" (সূরা নিসা- ১০৮)

"গোপন সলাপরামর্শের জন্য যখনই তিনজন মানুষ একত্রিত হবে, তখন সেখানে আল্লাহ হয়ে থাকেন চতুর্থজন, পাঁচজন জমায়েত হলে আল্লাহ হন তাদের ৬ষ্ঠ জন এবং এর চেয়ে কম বা বেশী সংখ্যক জমায়েত হলেও আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাথে থাকেন, চাই তারা যেখানেই থাক না কেন।" (সূরা মুজাদালা-৭)

"তারা মুখে বলে, আমরা (সামষ্টিক ফায়সালা ও নেতার আদেশের) আনুগত্য করবো। কিন্তু যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়, তখন তাদের একটা দল রাতের বেলা তোমার কথাগুলোর বিরুদ্ধে সলাপরামর্শে লিপ্ত হয়। আর আল্লাহ তাদের পরিকল্পনাগুলো লিখে রাখেন।" (সূরা নিসা-৮)

এ আয়াতগুলোতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন সামষ্টিকভাবে যে স্থিরকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে চলে, এবং যে সব সামাজিক ফায়সালা ও দলীয় ঐতিহ্য চালু থাকে, তার সমর্থন, আনুগত্য, বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য লোকেরা আলাদাভাবে পরস্পরে গোপন বা প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারে। কিন্তু এগুলোকে অমান্য করা, দ্বিমত পোষণ করা, ব্যর্থ করা, এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা, আপত্তি তোলা ও ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য পরস্পরে আলাদা হয়ে গোপন পরামর্শ করা ও কানাঘুষা করা এমন জঘন্য গুণাহ, যা এ সব ব্যক্তির চরিত্র ও পরিণামকে ধ্বংস করে দেয় এবং গোটা সামষ্টিক ব্যবস্থাকে বিব্রত ও সমস্যায় জর্জরিত করে। গোপন বিদ্রোহী কানাঘুষা ও ফিসফিসানির আসল প্ররোচনাদাতা শয়তান। এই প্ররোচনা থেকে কোরআন ইসলামী সংগঠনকে সাবধান করে দিয়েছে।

গোপন সলাপরামর্শ ও কানাঘুষার একটা বিষয় ছিল "রসূলের আদেশ অমান্য করা"। আসলে এটাই ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। মদিনার ইসলামী আন্দোলনের আওতাধীন পরিবেশে এর আদৌ কোন সম্ভবনাই ছিলনা যে, খোদ আন্দোলন এবং তার আদর্শ ও লক্ষ্যকে অপপ্রচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে এবং আল্লাহর নাফরমানী ও তার কিতাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে। মোনাফেকদের জন্য বড়জোর এতটুকু বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ ছিল যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারতো এবং সর্বোচ্চ নেতার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারতো। একটা নৈতিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় ও সহজ পন্থা এটাই হতে পারে যে, তার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানো হোক।

এ প্রসংগে আমি আগেই বলেছি, স্বার্থপরতা ও গদির লোভ সংক্রান্ত অপবাদ আগেই আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু আসলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আরোপ করার মধ্যেই এটা সীমিত ছিলনা, বরং গুজব রটনার একটা অভিযান (Whispering campaign) এবং 'ঠান্ডা লড়াই' স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল।

উদাহরণ স্বরূপ, পরবর্তীকালে যখন যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো, তখন রসূল সা. এর ওপর একটা হীন অপবাদ এই মর্মে আরোপ করা হলো যে, তিনি বাইতুল মালে জমাকৃত যাকাত ছদকার অর্থ নিজের খেয়ালখুশী মোতাবেক আত্মসাত করে ফেলেন। ব্যাপারটা ছিল এইযে, সকল সঞ্চিত সম্পত্তি, বাণিজ্যিক পুঁজি, গবাদিপশু ও কৃষিজাত সম্পদ থেকে যখন নিয়মিতভাবে যাকাত ও উশর আদায় করা হতে লাগলো, তখন বিপুল সম্পদ একই কেন্দ্রে জমা হতে লাগলো এবং রসূল সা. এর হাতে তা বন্টিত হতে লাগলো। ধনসম্পদের এই বিপুলাকৃতির স্তুপ দেখে ধনলোভীরা লালায়িত হয়ে উঠতো। তারা চাইতো জাহেলী যুগের ন্যায় আজও এই সম্পদ তাদের ন্যায় ধনাঢ্যদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হোক। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পদকে দরিদ্রমুখী করে দেয়। বিত্তশালীরা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে দারুণ অসন্তুষ্ট ছিল। তারা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তো আক্রমণ চালাতে পারতোনা, যা তাদের পকেট ভর্তি করার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে আইনের জোরে 'যাকাত' নামক 'জরিমানা' আদায় করছিল। তারা মনের আক্রোশ মেটানোর জন্য রসূল সা. কে

আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতো। তারা বলতো, রসূল সা. নিজের সমর্থক ও আত্মীয় স্বজনের পেছনে সম্পদ ব্যয় করছেন এবং বিশেষভাবে মোহাজেরদের অকাতরে দান করছেন। অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারের অর্থে পরিবার পরিজন ও স্বজন তোষণ করছেন। আল্লাহর নামে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ কেড়ে নিচ্ছেন এবং সেই অর্থ নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারে ব্যয়িত হচ্ছে। সরকারী কোষাগারের অর্থ সম্পর্কে যে কোন শাসন ব্যবস্থায় শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপিত হলে তা গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু বিশেষভাবে একটা ধর্মীয় ও নৈতিক সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে কোষাগারকে আল্লাহর সম্পদ বলা হয়ে থাকে এবং যার প্রতিটি আয় ব্যয় আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে, সেখানে এ ধরনের অভিযোগ থেকে নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করা সম্ভব।

ভাববার বিষয় হলো, এ অপবাদ সেই আদর্শ মানবের বিরুদ্ধে আরোপ করা হচ্ছে যিনি যাকাত সদকার অর্থকে শুধু নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য নয়, বরং গোটা বনু হাশেম গোত্রের জন্য আইনত হারাম করে দিয়েছেন। এমন নিস্বার্থ ব্যক্তিত্বের তুলনা সমগ্র মানবেতিহাসেও হয়তো কোথাও পাওয়া যাবেনা। অথচ সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ললাটেও নিতান্ত হীন চরিত্রের চুনোপুটিরা কালিমা লেপনের ধৃষ্টতা দেখালো।

এই লোকদেরই পরিচয় কোরআন এভাবে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের জঘন্য কথাবার্তা দ্বারা রসূলের সা. মনে কষ্ট দেয়। (সূরা তওবা) অর্থাৎ আন্দোলনের সামষ্টিক সমস্যাবলী নিয়ে খোলা মনে মুক্ত পরিবেশে কথা বলার পরিবর্তে তারা তার শ্রেষ্ঠতম নেতার ব্যক্তিত্বকে ঘায়েল করতে থাকে। এই ঘায়েল করার একটা দৃষ্টান্ত কোরআন নিজেই তুলে ধরেছে। ঘটনা ছিল এইযে, ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে মোনাফেকদের কার্যকলাপ ও চালচলন এমনই একটা বেখাপ্পা জিনিস ছিল যে, তা মুমিনদের কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগতো। মুমিনরা এসব চালচলন দেখে খুবই বিব্রত বোধ করতেন। তদুপরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ছিল মুশকিল, আবার তা নীরবে বরদাশত করাও ছিল দুরূহ। বেচারা মুসলমানরা কী আর করবে? তারা জামায়াতী দাবী অনুসারে বাধ্য হয়ে মোনাফেকদের অশোভন তৎপরতা সম্পর্কে রসূল সা.কে অবহিত করতেন। এভাবে প্রত্যেক মোনাফেক ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে চিহ্নিত হয়ে যেত এবং তার সম্পর্কে রসূল এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। এই প্রতিক্রিয়া প্রথমে অত্যধিক কোমল এবং পরে ক্রমান্বয়ে কঠোর হতে থাকতো। এই পরিস্থিতিতে মোনাফেকীর ব্যাধিতে আক্রান্তরা নিজেদের অবহেলিত ও কোনঠাসা অনুভব করে বলাবলি করতে লাগলো যেঃ (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহর কোন বিচারবুদ্ধি নেই, যার কাছে যা শোনেন, তাই বিশ্বাস করে ফেলেন। মামুলী ধরনের লোকেরা, যারা আমাদের তুলনায় কোন ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী নয়, রসূল সা. এর কাছে চলে যায়, যার সম্পর্কে যা ইচ্ছে বলে আসে এবং তিনি সব কথাই তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস করে ফেলেন। সর্বোচ্চ নেতার এই দুর্বলতার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আজ আমাদেরকে বলা হয় মোনাফেক ও কুচক্রী। আর সেদিনকার উপোষ করা গোলাম ছোকরাগুলো হয়ে গেছে ওঁর ঘনিষ্ঠতম সাথী।

এ ধরনের পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সম্ভবত মোনাফেকদের একটা দল একবার

রসূল সা. এর কাছ থেকে সময় নিয়ে পৃথকভাবে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠক চলাকালে এক একজন মোনাফেক হঠাৎ বলে উঠতো, আমার একটু নিভৃতে আপনার সাথে কিছু কথা আছে। রসূল সা. সৌজন্যের খাতিরে সবার জন্য এই সুযোগ উন্মুক্ত রাখতেন। কিন্তু নিভৃতে বিশেষ কথা বলার এই নাটকীয় ধারার ভিন্নতর উদ্দেশ্য ছিল। এ দ্বারা মোনাফেকরা সাধারণ মুসলমানদের ওপর নিজেদের প্রতিপত্তি জমাতে চাইত এবং এই ধারণা দিতে চাইত যে, আমরা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ভিআইপি গোছের লোক। আমরা শুধু সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বোচ্চ নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলে থাকি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকতো রসূল সা. এর দৃষ্টিতে কৃত্রিম উপায়ে নৈকট্য লাভ করা এবং যতদূর সম্ভব নিষ্ঠাবান মুমিনদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে তাদের এবং সেই অবহেলিত ও কোনঠাসা অবস্থা কিছুটা হালকা করা, যা তাদেরই অপকর্মের ফলে উদ্ভূত হয়ে ছিল। কিন্তু রসূল সা. এর সৌজন্য মোনাফেকদেরকে যে কালক্ষেপণের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, তাকে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আদেশ দ্বারা রহিত করে দিলেন ঃ

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রসূল সা. এর সাথে (বিশেষ সময় নিয়ে) নিভৃত আলোচনায় মিলিত হতে চাও, তখন আলোচনার পূর্বে সদকা দিও।" (সূরা মুজাদালা-১৩)

এই আদেশে ঘোরতর কৃপণ স্বভাবের মোনাফেকদের কোমর ভেংগে গেল এবং বারংবার বিশেষ সময় নিয়ে গোপন আলোচনার ধারা থেমে গেল। তবে এ কাজটা এই ধারণার ভিত্তিতেই শুরু করা হয়েছিল যে, আন্দোলনের নেতা খুবই সরলবিশ্বাসী। কাজেই নিষ্ঠাবানদের মোকাবিলায় আমরাও তার কানে নানা কথা ঢুকিয়ে তাকে নিজেদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু তারা ধারণা করতে পারেনি যে, একনিষ্ঠ মুমিনদের জন্য তিনি যেমন সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি কূচক্রীদের জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। যাহোক একথা সহজেই বোঝা যায়, যারা ইসলামী সংগঠনের ভেতরে বসে তার সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধে এ ধরনের তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথাবার্তা বলে বেড়াতো, তাদের মধ্যে নিয়মশৃংখলার প্রতি যথাযথ ভালোবাসা ও আনুগত্য থাকা সম্ভব নয়। অথচ এই আনুগত্য ও ভালবাসাই দলের কর্মীদেরকে সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল বানিয়ে থাকে। একটা ধর্মীয় ও নৈতিক সংগঠনে যারা তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপমানজনক অপপ্রচারে ও কানাঘুষায় লিপ্ত থাকে, তারা প্রকৃত পক্ষে ঐ সংগঠনকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায়ই নিয়োজিত থাকে।

ইসলামী আন্দোলন যখন দাওয়াত ও প্রচারের স্তর থেকে জেহাদের স্তরের দিকে বৈপ্লবিক মোড় নিচ্ছিল, তখন বিপুল সংখ্যক মোনাফেক আত্মপ্রকাশ করে। এ ধরনের মোড় নেয়ার সময় সব আন্দোলনেই কিছু লোক হতবুদ্ধি ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবল সেই সব কর্মীই ভারসাম্য রাখতে পারে, যারা আগে থেকেই শুনে আসে যে, তারা কোন্ দিকে চলেছে এবং পথে কোন্ কোন্ মনযিল তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। নচেত দুনিয়ার সব আন্দোলনেরই অবস্থা এ রকম হয়ে থাকে যে, কোন বড় মোড় যখন সামনে আসে এবং লাফ দিয়ে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে প্রবেশ করতে হয়, তখন এই পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকে যাদের বুঝ নেই, তারা অকর্মন্য ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনায় অনেক সময় ভালো ভালো কর্মী মনস্তাত্বিক

জটিলতার শিকার হয়ে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ে। ইসলামী আন্দোলনে এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল। আন্দোলন প্রচারের স্তর থেকে সংগ্রামের স্তরে প্রবেশ করলে কিছু লোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। বিশেষত যারা জেহাদের দুসহ বোঝা বহনের জন্য প্রস্তুত ছিলনা, তারা চিরদিনের জন্য মোনাফেক হয়ে গেল। এই পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে মনমানসকে প্রস্তুত না রাখায় তাদেরকে এই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল।

কোরআনে বলা হয়েছে, এক শ্রেণীর লোককে প্রাথমিক যুগে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, "তোমাদের হাত সংযত রাখ"। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে যুলুম ও বাড়াবাড়িকে নীরবে বরদাশত করে যাও এবং সংঘাতে যেয়না। কেবল নামায কায়েম কর ও যাকাত দেয়ার মত কার্যকলাপে লিপ্ত থাক। (নিসা-৭৭) কিন্তু সেই পর্যায়ে এ আদেশ তাদের মনোপূত ছিলনা। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ লোকদেরকেই যখন জেহাদের আদেশ দেয়া হলো, অমনি তারা মানুষকে এত ভয় পেয়ে গেল যে, তাদের কর্মতৎপরতাই থেমে গেল। তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া এরূপ ছিল যে, আল্লাহকে তারা বললো, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করলে কেন? আমরা আরো কিছু দিন দাওয়াত দিতাম, নামায ও যাকাত দ্বারা চরিত্র শুদ্ধির কাজ করে নিতাম, চাঁদা তোলা ও গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যেতাম। এক স্তরের চাহিদাই পূরণ হলোনা, সময় হওয়ার আগে আর এক স্তরের কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে!

কিন্তু তারা ছিল অসহায়। আল্লাহর সাথে তর্কবিতর্কও করতে পারছিলনা। তাঁর আদেশ জারী করাও ঠেকাতে পারছিলনা। তাদের সামনে ছিল শুধু রসূল সা. এর ব্যক্তিত্ব। তাই তারা তাঁকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারেনি। প্রতিটি লড়াই থেকে তারা পালিয়েছে এবং প্রত্যেক নাজুক ঘটনায় তারা নানা রকমের ছলছুঁতোর আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহর আরোপিত দায়দায়িত্বের প্রতিশোধ তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতার কাছ থেকে পুরোদমে নিয়ে ছেড়েছে।

যে কোন আন্দোলন যখন সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন তার পতাকাবাহীরা শত্রুর উপর যেমন আঘাত হানে, তেমনি নিজেরা আঘাত খায়। কোন আঘাত সফল হয়। আবার কোনটা হয় ব্যর্থ। ফলাফল কখনো আশানুরূপ হয়, আবার কখনো হয় হতাশাব্যঞ্জক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন লড়াইর ময়দান কখনো পাওয়া যায়নি, যেখানে সব সময় কেবল এক পক্ষই জয় লাভ করে। যে পক্ষ জয়লাভ করে, সেও বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বিজয়ের মূল্য পরিশোধ করে, অনেকে আহত হয় এবং অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয়। কিন্তু মদিনার ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে কর্মরত মোনাফেকদের إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "প্রত্যেক দুঃখের সাথে অবশ্যই সুখ রয়েছে" এই দর্শনে আস্থা ছিলনা। তারা প্রত্যেক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রত্যেক আঘাতে চিৎকার করে উঠতো যে, এটা আন্দোলনের নেতার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অভাবের কারণেই হয়েছে। (নাউযুবিল্লা) কোরআনে তাদের এই কর্মবিমুখ দার্শনিক প্রচারণার উন্মেষ এভাবে করা হয়েছে ঃ

"তারা যদি কোন সাফল্য লাভ করে, তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলে বলে, এটা তোমার (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কারণে হয়েছে।" (সূরা নিসা-৭৮)

অর্থাৎ বিভিন্ন সংঘাত সংঘর্ষে যে আঘাতই আসতো, যে ক্ষয়ক্ষতিই হতো, যে ত্যাগ ও কুরবানীরই প্রয়োজন পড়তো, এবং যে সব চেষ্টা তদবীরের আশানুরূপ ফল ফলতোনা, সেই সব কিছুর জন্য তারা রসূল সা. কেই দায় করতো। ভাবটা ছিল এমন যে, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সংগঠনের নিয়মশৃংখলা সবই চমৎকার, কিন্তু যিনি এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি অদক্ষ। কিছুটা খোদাভীতির পরিচয়ও দেয়া হয়েছে এ কথা বলে যে, সাফল্য যে টুকু আসছে, তা আল্লাহরই দান। যেন প্রচারণাটা শুধু দার্শনিকই নয় বরং খোদাভীতিমূলকও। কিন্তু এই ভন্ডামীপূর্ণ খোদাভীতি রসূল সা. এর ন্যায় নেতার প্রতি এতটুকু আনুগত্য ও শুভাকাংখিতাও দেখাতে পারলোনা, যা ইসলাম একজন নিগ্রো ক্রীতদাসের নেতৃত্বের প্রতি দেখানোর আদেশ দিয়েছে। আল্লাহর রসূল ও ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম নেতার প্রতি আনুগত্যহীনতা দেখিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই ব্যর্থ চেষ্টার মত আত্মপ্রবঞ্চনা আর কী হতে পারে এবং মানুষ নিজের ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে?

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সাফল্যকে তারা যে আল্লাহর দান বলে স্বীকার করতো সেটা কৃতজ্ঞতা ও নিয়ামতের স্বীকৃতির কারণে নয়, বরং এর দ্বারা তারা এ কথা বুঝাতো যে, পরিস্থিতির কারণে সময়ে সময়ে যে ভালো দিক ফুটে ওঠে এবং যুদ্ধবিগ্রহ থেকে সময় সময় যে সুফল পাওয়া যায়, তাতে রসূল সা. এর অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার কোন হাত নেই, বরং ওগুলো আল্লাহর সৃষ্টি করা কাকতালীয় ঘটনা মাত্র।[৪]

প্রত্যেক কষ্টের সময় আন্দোলনের ভেতরেই সমালোচনা, উপহাস ও তাচ্ছিল্য প্রকাশকারী তথাকথিত সহচর উপস্থিত থাকায় ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতাকে কী ধরনের মর্মপীড়া ভোগ করতে হতো, তা সহজেই বোধগম্য। কথায় কথায় তারা বলতো, এই নেতার কারণেই এখন অমুক মুসিবতটা দেখা দিল, অমুক আঘাতটা খেতে হলো এবং ওদিক থেকে বিপর্যয় এলো, ইত্যাদি। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফল জানার পর তারা বিজ্ঞজনের মত বসে পড়তো আর মন্তব্য করতো, অমুক কাজটা না করা উচিত ছিল, অমুক কাজটা করলে ভালো হতো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হীন মানসিকতা ছাড়াও তারা প্রত্যেক যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রাক্কালে নানা রকমের প্রলাপোক্তি করতো, যেমন "আমাদের আশংকা, কখন না জানি আমরাও কোন্ বিপর্যয়ের কবলে পড়ে যাই।" (মায়েদা- ৫২) অর্থাৎ কিনা আন্দোলনটাকে এমন অদক্ষভাবে চালানো হচ্ছে যে, যে কোন সময় তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যেতে পারে। আমরা কেন অনর্থক জীবনের ঝুঁকি নিতে যাবো?

ওহুদ যুদ্ধের সময় এই মানসিকতার কারণেই মোনাফেকরা আক্ষেপ করেছিল যে, নেতৃত্বে যদি আমাদের কোন হাত থাকতো, তাহলে আমরা এখানে মরতামনা।" (আল

৪. সূরা নিসার সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তাফসীর মুযিহুল কুরআনেও এ কথাই বলা হয়েছে। যুদ্ধের কৌশল নির্ভুল প্রমাণিত হলে এবং বিজয় অর্জিত হলে মোনাফেকরা বলতো , এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে। রসূল (সা) এর রণনৈপুণ্যের স্বীকৃতি দিতনা। আর যদি পরাজয় ঘটতো তাহলে রসূল (সা) এর অদক্ষতাকেই দায়ী করতো।

ইমরান, আয়াত ১৫৪, তাফহীমুল কুরআনে দেখুন) এ মানসিকতার ধারকরা রসূল সা. এর নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতায় সুস্পষ্ট অনাস্থা পোষণ করতো। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান মনে করতো। আর যে ব্যক্তি এত বছর ধরে ওহির দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনা করে আসছেন, তিনি নবী হলেও তাদের দৃষ্টিতে কিছুই ছিলেন না। নবীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব নিয়েও যখন এত অস্বস্তি, তবে কোন সাহাবীর নেতৃত্ব হলে একচেটিয়া দক্ষতা ও বিচক্ষণতার দাবীদার এই গোষ্ঠীটি তার কী দশা করতো, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এই সব উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, সরাসরি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করার পরিবর্তে রসূল সা. এর ব্যক্তিত্বকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে পরোক্ষ হামলা করাকেই সবচেয়ে সাফল্যজনক পন্থা মনে করা হয়েছিল এবং সেটাই অবলম্বন করা হয়েছিল। গোপন সলাপরামর্শের বৈঠকগুলোতে আন্দোলনের এই সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধেই যত আপত্তি ও অপপ্রচারের খসড়া তৈরী করা হতো এবং তার অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করার জন্যই নিত্য নতুন পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা হতো।

ইসলামী সংগঠনের অভ্যন্তরে নৈতিক ব্যবস্থাজনিত জটিলতা

ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল আগাগোড়া একটা নৈতিক ব্যবস্থা। এ পরিবেশটা শয়তানের কাজ করার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত ও উত্তম ক্ষেত্র। বিশেষত এর দুটো দিক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুকূল। নৈতিক ব্যবস্থার একটা বিশেষ জটিলতা হলো, এতে সুস্পষ্ট আপত্তিকর ঘটনাবলী যতক্ষণ প্রামাণ্য তথ্যের আকারে আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে সংগঠনও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনা, আর যারা বিব্রত বোধ করে, তারাও শেষ ফল বের হওয়ার আগে পরিস্থিতির ধাঁধালো পটভূমিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেনা। ইসলামের নৈতিক বিধান ইসলামী সমাজের সদস্যদেরকে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করে। একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ তাঁর সাথীদের প্রতিটি সন্দেহজনক কার্যকলাপের যতদূর সম্ভব ভালো ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। অতঃপর সে যদি একটা অবাঞ্ছিত ঘটনার সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে আপন অন্তরের গভীরে একটা খারাপ ধারণা পোষণ করেও বসে, তাহলেও তাকে এ জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় যে, তার খারাপ ধারণাকে খন্ডন করার মত পাল্টা কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা?

নিছক ধারণা, চাই তা যতই দৃঢ় হোক না কেন, তার ভিত্তিতে কারো বিরদ্ধে কোন আনুষ্ঠানিক মামলা পরিচালনা করা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়না। এ সব কারণে মদিনার নিষ্ঠাবান মুসলমানরা গোপন সলাপরামর্শে লিপ্ত ফেতনাবাজ ও নৈরাজ্যবাদী লোকদের প্রাথমিক তৎপরতাকে কিছু অবাঞ্ছিত আলামত বলে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও নীরবদর্শক হয়ে দেখতে বাধ্য ছিলেন। তবে ফেতনা যখন যথারীতি ফসল ফলাতে শুরু করতো, কেবল তখনই সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিত এবং সামষ্টিক ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার সুযোগ দিত।

নৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় জটিলতা ছিল এইযে, সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা ও অন্যান্য

দায়িত্বশীলদের ওপর যদি কেউ অভিযোগ আরোপ করে, তাহলে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। একদিকে তাদের হাতেই দলের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে, এবং তারাই সমস্ত ফেতনা তথা অরাজকতা ও বিভ্রান্তি খতম করার ক্ষমতা রাখেন। অপর দিকে তারাই ফেতনার শিকার হয়ে এমন অবস্থায় পতিত হন যে, মুসলিম জনগণের সামনে ফেতনাবাজ তথা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের মুখোস খুলে যাওয়ার আগে তাদের বিরুদ্ধে যদি নেতারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে উল্টো নেতারাই সমালোচনা ও ভিন্নমত দমনের দায়ে অভিযুক্ত হন। তারা সত্যের আওয়ায বুলন্দকারীদেরকে স্বৈরাচারী পন্থায় পরাভূত করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় যে, ভদ্রতা সবচেয়ে বড় শক্তি হলেও ভদ্রতা সবচেয়ে বড় দুর্বলতাও বটে, ঠিক তেমনি দলের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, নৈতিক ব্যবস্থা তার সবচেয়ে বড় জটিলতাও বটে। এই জটিলতার একমাত্র সমাধান হলো, দলের সামষ্টিক মনমানসকে এত সজাগ ও সচেতন হতে হবে এবং তার সামষ্টিক চরিত্রকে এত বলিষ্ঠ ও মজবুত হতে হবে যে, সে নিজের মেজাজ বা স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কিছুকেই দলের অভ্যন্তরে চালু থাকতে দেবেনা। দলীয় পরিমন্ডলে কেউ দলীয় শৃংখলা বিরোধী কানাঘুষা, ফিসফিসানি, গুজব বা গোপন সলাপরামর্শে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত হবেনা, কর্ণগোচর হওয়া এ ধরনের কোন বিষয়কে কেউ এদিক সেদিকে ছড়ানোর ধৃষ্টতা দেখাবেনা। কিন্তু এই চূড়ান্ত ও উৎকৃষ্টতম মানদন্ডে কোন দলের সামগ্রিতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া এবং উত্তীর্ণ হয়ে সর্বক্ষণ টিকে থাকা কঠিন। মনমগজ দ্বারা কুচিন্তা করা, মুখ দিয়ে কু-প্ররোচনা দান ও খারাপ বিষয়ে ফুসলানো এবং কান দিয়ে এই সব অবাঞ্ছিত জিনিস শোনা– ইত্যাকার কর্মকান্ডে লিপ্ত মানুষ থেকে কোন মানবসমাজ পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র হতে পারেনা। মানুষ যা ভাবে, যা বলে ও যা শোনে, তাতে শয়তান কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ না করেই ছাড়েনা।

নৈতিক ব্যবস্থার এই নমনীয়তা ও উদারতা থেকে মোনাফেকরা পুরোপুরিভাবে উপকৃত হয়েছে এবং এর সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু পরিণামে তারা এর প্রবল শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি। কোরআনের ভাষায় তাদের সমগ্র কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত সার ছিল এইঃ "তারা যা চেয়েছিল, তা পায়নি।" কিন্তু ইসলামী সংগঠনকে বিব্রত অবশ্যই করেছে এবং তাকে বিশৃংখলায় অবশ্যই ফেলেছে।

গোপন সলাপরামর্শ, গুজব রটনা, কানাঘুষা ও ফিসফিসানির এই পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার ব্যক্তিত্ব শুরু থেকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং একের পর এক আক্রমণ চালানোও হচ্ছিল। এহেন পরিবেশে নাশকতাবাদী কুচক্রী ফেতনাবাজদের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে কুটিল থেকে কুটিলতর এবং জঘন্য থেকে জঘন্যতর অপবাদ রটনা করে কোন প্রলয়ংকরী বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়াও তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিলনা। এই নমনীয় পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ ও মোনাফেকদেরকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগানোর জন্য শয়তানের দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রয়োজন ছিল, তা হলো এমন একজন ঝানু খলনায়ক, যার মস্তিষ্ক কুটিল চক্রান্ত উদ্ভাবনে অত্যন্ত সৃজনশীল ও দক্ষ হবে, এবং যার বুকে গোপন সলাপরামর্শকারীদের সৃষ্টি করা বারুদের স্তূপে জলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপের সাহস থাকবে। এ ধরনের একজন ঝানু খলনায়ক

আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর আকারে আগে থেকেই তৈরী ছিল। এই লোকটার মন নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অনুভূতিতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কেনইবা থাকবেনা? হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার বাদশাহীর মুকুট তো তারই মাথায় পরানোর প্রস্তুতি চলছিল। কেবল মুহাম্মদ সা. এর উপস্থিতি তার আশার গুড়ে বালি দিল। বাদশাহী দূরে থাক, নিজের চরিত্রের কারণে ইসলামী সংগঠনে প্রথম সারির তো নয়ই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির মর্যাদাও তার কপালে জোটেনি। এই দুর্ঘটনা তার মনমস্তিষ্কে অত্যন্ত তিক্ত ও বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়া থেকে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন ফেতনা, নতুন নতুন ষড়যন্ত্র। শয়তান মানুষের ভেতরে প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশী কাজ করেনা। তার প্রয়োজন হয়ে থাকে তার বশংবদ মানুষ-শয়তানদের। আর এই মানুষ শয়তানদেরকে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তৎপর রাখার জন্য তার প্রয়োজন হয় একজন যুতসই নেতার, একজন ষড়যন্ত্র বিশারদ নেতার। শয়তান এ ধরনের একজন যুতসই ষড়যন্ত্র বিশারদ নেতা রেডিমেড পেয়ে গেল। সে ছিল আবার ইসলামী আন্দোলনের বৃত্তের ভেতরেরই লোক। এই লোকটা একদিকে নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে মেনে নেয়ার ঘোষণাও দিয়েছিল, অপরদিকে প্রতিনিয়ত ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংঘাতেও লিপ্ত ছিল।

ঝোপ বুঝে কোপ মারায় অভিজ্ঞ এই দাম্ভিক কূচক্রী খলনায়কটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে নিজের বুকের ভেতরে জ্বলন্ত হিংসার অগ্নিকুন্ড থেকে একটা দগদগে অঙ্গার বের করে রসূল সা. এর পবিত্র পারিবারিক অংগনে নিক্ষেপ করলো। নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই গোটা সমাজ মানসিকভাবে দগ্ধ হতে লাগলো।

হযরত আয়েশার নিজস্ব প্রতিবেদন

এই ভয়াবহ দুর্যোগের সময়ে হযরত আয়েশার অন্তরাত্মার ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে, সে সম্পর্কে প্রামাণ্য বিশদ বিবরণ হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সব বিবরণ স্বয়ং হযরত আয়েশা ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মুখনিসৃত। আমার কাছে এ মুহূর্তে যাদুল মা'য়াদ (২য় খন্ড, পৃঃ ১১৩-১১৫) এবং সীরাতে ইবনে হিশাম (৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪২-৩৪৭) এর ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে তাফহীমুল কোরআনের লেখক হযরত আয়েশার এই বেদনাবিধুর কাহিনীটাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন বিধায়, ওটাই এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

"মদীনায় পৌঁছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং প্রায় এক মাস শয্যাশায়ী থাকলাম। শহরে এই অপবাদ সম্বলিত গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। স্বয়ং রসূলের সা. কানেও তা পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটা দেখে আমার খটকা লাগছিল তা এই যে, রসূল সা. অসুস্থতার সময় আমার দিকে যে রকম বিশেষ মনোযোগ দিতেন, এবারে সে রকম মনোযোগ দিচ্ছিলেন না, ঘরে এসে কেবল "তুমি কেমন আছ" এ কথাটাই জিজ্ঞাসা করতেন। এর চেয়ে বেশী একটা কথাও বলতেন না। এটা দেখে আমার সন্দেহ হতো, কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। অবশেষে আমি তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে চলে গেলাম, যেন তিনি ভালোভাবে আমার সেবা সশ্রুষা

করতে পারেন। একদিন রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেলাম। তখন পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা তৈরী হয়নি। তাই আমরা জংগলেই যেতাম। আমার সাথে মিসতার মাও ছিলেন। তিনি আমার মায়ের খালাতো বোন ছিলেন। (অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক রা. এই পরিবারের সকলের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এত বড় অনুগ্রহ সত্ত্বেও মিসতাহ হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।) জংগলের দিকে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে মিসতার মা একটা ঠোকর খেলেন। সাথে সাথে তার মুখ দিয়ে বে-এখতিয়ার বেরিয়ে গেল ঃ "মিসতার মরণ হোক!" আমি বললাম, আপনি কেমন মা যে, ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন? আর ছেলেও এমন যে, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে।" তিনি বললেন, তুমি ওর কথা শোননি?" এরপর তিনি পুরো ঘটনা শোনালেন। অপবাদ রটনাকারীরা আমার সম্পর্কে কি সব কথা ছড়াচ্ছে, তা খুলে বললেন। মোনাফেকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা এই ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে মিসতাহ, বিখ্যাত কবি হাসসান বিন সাবিত, এবং হাসনা বিনতে জাহশ (উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বোন) উল্লেখযোগ্য। এই বিবরণ শুনে আমার রক্ত শুকিয়ে গেল এবং আমি সেই প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কথা পর্যন্ত ভুলে গেলাম, যার জন্য এসেছিলেন। সোজা ঘরে ফিরে গেলাম এবং সারা রাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম।" (ইবনে হিশামের বর্ণনায় একথাটাও যোগ করা হয়েছে যে, "কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।)

একদিকে হযরত আয়েশা তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। অপরদিকে সমগ্র শহরে যথারীতি কানাঘুষা চলছিল। হযরত আয়েশার পক্ষে সবচেয়ে জোরদার সাফাই তার পিতা ও স্বামীই দিতে পারতেন। কিন্তু দুরাচার লোকেরা যখন এ ধরনের অপবাদ রটিয়ে দেয়, তখন যে যত ঘনিষ্ঠ হয়, সে ততই জটিলতায় পড়ে যায়। কেননা ঘনিষ্ঠ জনের সাফাই একেবারেই নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। তাই পিতা ও স্বামী নির্বাক হয়ে গেলেন এবং চারদিক থেকে নিক্ষিপ্ত কুৎসার তীরে বিদ্ধ হতে লাগলেন।

মানবতার শ্রেষ্ঠতম উপকারী বন্ধু মুহাম্মদ সা. এর কাছে এই মুহূর্তগুলো ব্যক্তিগতভাবেও এবং সংগঠনের স্বার্থের দিক দিয়েও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। যে কোন সম্ভ্রান্ত, সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে রসূল সা. এর এই অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি অনেক ধৈর্য ধারণ করলেন এবং দীর্ঘ সময় নীরবে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু এমন একটা স্পর্শকাতর বিষয়কে বর্তমান অবস্থায় ঝুলন্ত রাখাও সম্ভব ছিলনা। একটা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তাই রসূল সা. নিরপেক্ষভাবে তদন্ত শুরু করে দিলেন। নিজের দু'জন ঘনিষ্ঠ সাথী হযরত আলী রা. ও হযরত উসামা বিন যায়েদকে ডেকে তাদের মতামত চাইলেন। হযরত উসামা রা. বললেন ঃ হে রসূল! তিনি আপনার মহীয়সী স্ত্রী। আমরা তার ভেতরে ভালো ছাড়া আর কিছু পাইনা। যা কিছু ছড়ানো হচ্ছে, সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা।" (সীরাতে ইবনে হিশাম) হযরত আলী রা. অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অভিমত দিলেন। তিনি বললেন, "হে রসূল! স্ত্রী লোকের অভাব নেই। আপনি আয়েশার পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। তবে দাসীকে ডেকে তদন্ত করে নিন।" আসলে হযরত

আলীর উদ্দেশ্য ছিল এইযে, রসূল সা. এর পেরেশানী ভোগ করার চেয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাই উত্তম এবং যে স্ত্রী সম্পর্কে এমন তুলকালাম কান্ড ঘটে গেছে, তাকে তালাক দেয়াই শ্রেয়। প্রকৃত পক্ষে হযরত আলী নিজের বিশেষ আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে ঐ বিষয়টার আন্দোলনগত দিকের চেয়ে রসূল সা. এর ব্যক্তিগত পেরেশানীকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি রসূল সা. কে মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি লাভের পরামর্শ দিলেন।

তবুও রসূল সা. হযরত আলীর পরামর্শের দ্বিতীয় অংশকে গ্রহণ করলেন। তিনি দাসীকে ডাকলেন। হযরত আলী তাকে এক চড় বসিয়ে দিয়ে কঠোরভাবে শাসিয়ে বললেন, "রসূল সা. এর সামনে সত্য বলবে।" সে বললো, "আল্লাহর কসম, আমি তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছু জানিনা। আয়েশার মধ্যে আমি কেবল একটাই ত্রুটি দেখেছি যে, আমি আটা বানানোর সময় যখন বাইরে যেতাম, তাকে বলে যেতাম যে, একটু দেখো। কিন্তু সে ঘুমিয়ে যেত এবং ছাগল এসে আটা খেয়ে ফেলতো।" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

এই স্বতস্ফূর্ত বিবৃতিতে দাসী হযরত আয়েশাকে যেমন নিখুঁত সাফাই দিয়েছিল, অন্য কোন বিবৃতি এর ওপর তেমন কিছু যোগ করতে পারতোনা। সে এমন একটা সরলমতি বালিকার প্রকৃত ছবি তুলে ধরেছিল, যার মধ্যে কোন খারাপ জিনিস কল্পনা করা মানবীয় বিবেকবুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। এই সাথে রসূল সা. দ্বিতীয় যে পদক্ষেপ নিলেন তা হলো, একটা সাধারণ সভা ডাকলেন এবং ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করার পর অত্যন্ত ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন ঃ

"যারা আমাকে আমার পরিবার পরিজন সম্পর্কে কষ্ট দেয় এবং তাদের সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলে বেড়ায়, তাদের উদ্দেশ্যটা কী? আল্লাহর কসম, আমার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া আর কিছু জানিনা। তারা যে ব্যক্তিকে জড়িয়ে এই অপবাদ রটিয়েছে, তাকেও আমি ভালো বলেই জানি। সে আমার অনুপস্থিতিতে কখনো আমার বাড়িতে আসেনি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)

অপর এক বর্ণনা মোতাবেক রসূল সা. শুরুতে বলেছি, "যে ব্যক্তি আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিচ্ছে, তার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে, এমন কেউ আছে কি?" (যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড)

এ কথা শোনার পর আওস গোত্রের সরদার উসাইদ বিন হুযাইর দাঁড়িয়ে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ! এ ধরনের লোকেরা যদি আমাদের গোত্রের হয়ে থাকে, তা হলে আমরা তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেব। আর যদি তারা খাজরাজী হয়ে থাকে, তা হলে আপনি হুকুম দিন। আল্লাহর কসম, এ ধরনের লোকদের সমুচিত শাস্তি মস্তক ছেদন।"

সংগে সংগে অপর দিক থেকে খাজরাজের সরদার সা'দ বিন উবাদা প্রতিবাদ করে উঠলেন যে, "তুমি মিথ্যা বলছ' আল্লাহর কসম, আমরা তাদের মস্তক ছেদন করবোনা। ওহ, বুঝেছি, তুমি এ কথা এ জন্যই বলেছ যে, তুমি তাদেরকে খাজরাজের লোক মনে কর।" হযরত সা'দের এ জবাবে উসাইদ বিন হুযাইর খুবই রুষ্ট হলেন। তিনি হয়তো বুঝেছেন, যে দলে অপরাধী, নৈরাজ্যবাদী ও কুচক্রীরা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়, সে দলের পক্ষে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব নয়। আবদুল্লাহ বিন

উবাই এর মত লোকেরা সব আন্দোলনেই সব সময় জন্ম নিয়ে থাকে। কিন্তু একটা শক্তিশালী ও আত্মসচেতন দল এ ধরনের লোকদের দলে টিকতে দেয়না, বরং বের করে দেয়। তবে যদি কোন কুচক্রী লোক কোন সংগঠনে প্রভাবশালী লোকদের আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়ে যায়, তাহলে গৃহশত্রু বিভীষণরা লালিত পালিত হতে থাকে এবং সমাজ তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই তিক্ত সত্য উপলব্ধি করেই হযরত উসাইদ রা. বলে উঠলেন," মিথ্যা আমি নয়, তুমি বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি একজন মোনাফেক বলেই মোনাফেকদের পক্ষ নিচ্ছ।" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

এই তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ছিল এই যে, আওস ও খাজরাজের মধ্যে উত্তেজনা বাধানোর জন্যও ক্রমাগত চক্রান্ত আটা হচ্ছিল। এজন্যই সামান্য একটা কথার জের ধরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং একটা মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। যিনি উভয় গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গঠন করে দিয়েছিলেন, সেই মহান নেতার এটা ভালো লাগলো না যে, বহু বছরের চেষ্টায় গড়া দু'গোত্রের ঐক্য তাঁরই কারণে আবার নষ্ট হয়ে যাক। তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে উভয় দলকে শান্ত করলেন এবং সভার সমাপ্তি ঘটলো। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

দলের এই দুর্বল দিকটার অভিজ্ঞতা রসূল সা. এর মনোকষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিল। আসলে বনুল মুসতালিক যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যে পুরানো বিভেদ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলেছিল, এটা ছিল তারই ফলশ্রুতি।

কাহিনীর শেষাংশ, যা ট্রাজেডিকে কমেডিতে রূপান্তরিত করেছিল, খোদ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন।

"এই অপবাদের গুজব কমবেশী এক মাস ব্যাপী শহরময় গুঞ্জরিত হতে থাকে। রসূল সা. প্রচন্ড মর্মযাতনা ভোগ করতে থাকেন। আমি সারাক্ষণ কাঁদতে থাকি। আমার পিতামাতা চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত থাকেন। অবশেষে একদিন রসূল সা. এলেন এবং আমার কাছে বসলেন। এই পুরো সময়টায় তিনি একবারও আমার কাছে বসেননি। হযরত আবু বকর ও উম্মে রুমান (হযরত আয়েশার মাতা) ধারণা করলেন, আজ একটা চূড়ান্ত ফায়সালা হতে যাচ্ছে। তাই তারা দুজনেও কাছে এসে বসে গেলেন। রসূল সা. বললেন, "আয়েশা তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এই সব খবর পৌঁছেছে তুমি যদি নিরপরাধ হয়ে থাক, তা হলে আশা করি আল্লাহ তায়ালা তোমার নিরপরাধ হওয়ার বিষয় জানিয়ে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুণাহ করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা কর ও ক্ষমা চাও। বান্দা যখন নিজের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন। এ কথা শুনে আমার অশ্রু শুকিয়ে গেল। (নিরপরাধ মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই আশা করা যায়।– নঃ সিঃ)

আমি নিজের পিতাকে বললাম,"আপনি রসূলুল্লাহর সা. কথার জবাব দিন।" তিনি বললেন, "মা, আমার বুঝেই আসছেনা কী বলবো।" আমি নিজের মাতাকে বললাম, "আপনি কিছু বলুন।" তিনিও বললেন, "আমিও বুঝতে পারছিনে কী বলবো।" আমি বললাম, "আপনাদের কানে একটা কথা ঢুকেছে– সংগে সংগে তা আপনাদের মনেও বদ্ধমূল হয়ে গেছে, এখন যদি বলি যে আমি নিষ্পাপ, বস্তুত আল্লাহ সাক্ষী যে, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ –

তা হলে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি যা করিনি তা অনর্থক স্বীকার করি–বস্তুত আল্লাহ সাক্ষী যে আমি তা করিনি– তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন। আমি এ সময় হযরত এয়াকুবের নাম মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলামনা। (একজন নিরপরাধ মানুষ যখন কোন মারাত্মক অপবাদের শিকার হয়ে দিশেহারা হয়ে যায় তখন তার মনস্তাত্মিক জগতে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক।– নঃ সি) অবশেষে আমি বললাম এ পরিস্থিতিতে আমার আর কী বলার আছে? আমি শুধু হযরত ইউসুফের পিতা যে কথা বলেছিলেন যে فَصَبْرٌ جَمِيلٌ "পরম ধৈর্য" সেই কথাটাই বলবো। (হযরত এয়াকুবের সামনে তার ছেলেরা যখন ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে বলে মিথ্যে বিবরণ দিয়েছিল, তখন তিনি এ কথাটা বলেছিলেন।– অনুবাদক) এই বলে আমি বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লাম। (একজন নিরপরাধ মানুষের ওপর অপবাদ আরোপ করা হলে তার মধ্যে অসহায়াবস্থার পাশাপাশি যে বেপরোয়া মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সেটাই এখানে ফুটে উঠেছে। – নঃ সি) এই সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ আমার নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত তথ্য ফাঁস করে দেবেন। যদিও তখন পর্যন্ত আমি ভাবতেও পারিনি যে, আমার পক্ষে ওহি নাযিল হবে যা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে। আমি নিজেকে এতটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কখনো ভাবতামনা যে, আল্লাহ স্বয়ং আমার পক্ষে কথা বলবেন। তবে আমি মনে করেছিলাম, রসূল সা. কোন স্বপ্ন দেখবেন এবং তার মাধ্যমেই আল্লাহ জানিয়ে দেবেন যে, আমি নিরপরাধ। সহসা রসূল সা. এর মধ্যে এমন ভাবান্তর সৃষ্টি হলো, যা সচরাচর ওহি নাযিল হওয়ার সময় হতো এবং প্রচন্ড শীতের মৌসুমেও রসূল সা. এর মুখমন্ডল থেকে মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরতো। আমরা সবাই নীরব হয়ে গেলাম। আমি তো সম্পূর্ণ নির্ভীক ছিলাম। কিন্তু আমার পিতামাতা ভয়ে এমন জড়সড় হয়ে যাচ্ছিলেন যে, শরীরের কোথাও তখন কেটে দিলে বোধ হয় রক্তই বের হতোনা। তারা শংকিত ছিলেন এই ভেবে যে, আল্লাহ না জানি কী খবর জানান। রসূল সা. এর অবস্থা স্বাভাবিক হলে দেখা গেল, তিনি ভীষণ খুশী। তিনি হাসিমুখে সর্বপ্রথম যে কথাটা বললেন, তা ছিল, "আয়েশা তোমাকে মুবারকবাদ। আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন।" এরপর রসূল সা. দশটা আয়াত শোনালেন। আমার মা বললেন, ওঠো, রসূলুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আমি ওঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবোনা, আপনাদের প্রতিও নয়। আমি শুধু আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আপনারাতো এ অপবাদকে অস্বীকার পর্যন্ত করেননি।" (তাফহীমুল কোরআন, সূরা নূর) হযরত আয়েশার কথায় কেমন তীব্র আত্মসম্ভ্রমবোধ যুক্ত অনুযোগ ফুটে উঠেছে, লক্ষ্য করুন। এটা কি কোন অপরাধী বিবেকের বক্তব্য হতে পারে? এই বিবরণের প্রতিটা শব্দ বলে দিচ্ছে যে, এটা একজন নিরপরাধ মানুষের দুঃখ বেদনার অকৃত্রিম স্বতস্ফূর্ত ও নিখুঁত প্রতিবেদন।

ওহির সাফাই

অপপ্রচারের এই ঝড় এবং তা থেকে সৃষ্ট সংকট দূর করার জন্য সহসাই ওহি নাযিল হলো। এই সংকট দূর করার জন্য যে সূরা নাযিল হলো, তার নাম 'নূর' (আলো)। বাস্তব পরিস্থিতির সাথে চমৎকার মানিয়েছে এ নাম। কেননা একটা গুরুতর সামাজিক সংকটের

সৃষ্ট অন্ধকারকে দূর করে পরিবেশকে আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্যই এই সূরা নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মুসলমানদের সংগঠন ও সমাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা তার দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং এই সব দুর্বলতা থেকে তাদেরকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করার জন্য নৈতিক ও আইনগত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এই সাড়া জাগানো সূরার বক্তব্যের সূচনাই চমকে দেয়ার মত। বলা হয়েছে ঃ

"এ একটা সূরা, যাকে আমি নাযিল করেছি, যাকে আমি দায়িত্ব হিসাবে (ইসলামী সমাজের জন্য) অপরিহার্য করেছি এবং যার মধ্যে আমি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী উপস্থাপন করেছি। হয়তো তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।" (আয়াত-১)

এবার সমাজকে উদ্দেশ্য করে সূরা নূরের সোচ্চার ঘোষণা ঃ

"যারা এই অপবাদ তৈরী করেছে, তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটা গোষ্ঠী। এ অপবাদে যে যতটুকু অংশ নিয়েছে, সে ততটুকুই পাপ কুড়িয়েছে। আর যে এর দায়দায়িত্বের প্রধান অংশ বহন করেছে, তার জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।" (আয়াত-১১)

কী সাংঘাতিক শ্লেষাত্মক ধমক! এমন একটা সাক্ষ্যপ্রমাণহীন অভিযোগ, যার আদৌ কোন সুষ্ঠু আলামত ছিলনা, ঝড়ের বেগে উঠলো এবং বাইরের কোন শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ থেকে নয়-বরং বহু বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম দলের ভেতর থেকেই উঠলো। এটা এক আধজন মানুষের আকস্মিক পদস্খলনও ছিলনা। পুরো এক মাস ধরে একটা গোষ্ঠী চরম মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকলো। সূরা নূরে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের দলীয় পরিমন্ডলে এমন দুর্বলতার অস্তিত্ব রয়েছে যে, তার নির্মাতারাই তাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়ে বসতে পারে। এ পরিবেশে এমন ফাঁকফোকর রয়েছে যার মধ্য দিয়ে সত্যের সৈনিকদের সমাজ ও সংগঠনে মিথ্যা ও বাতিল ঢুকে যেতে পারে। বলা হচ্ছে যে, এটা কেবল একটা বিচ্ছিন্ন অপবাদের ঘটনা ছিলনা, বরং পাপের একটা বহমান স্রোত ছিল। এই স্রোতধারা থেকে কেউ ড্রাম ভরে নিয়েছে, কেউ কলসী ভরে নিয়েছে, আবার কেউ শুধু হাতের তালুতে যতটুকু নেয়া যায় ততটুকু নিয়েছে। এভাবে যে যতটুকু অংশ গ্রহণ করেছে, সে নিজের জন্য ততটুকু পাপ সঞ্চয় করেছে। এরপর এই অপকর্মের মূল হোতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যে প্রথম আগুন জ্বালিয়েছে, এবং তারপর অব্যাহতভাবে বাতাস দিয়ে তাকে দাবানলে পরিণত করেছে।

সূরা নূরে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ঃ

"যখন তোমরা এটা প্রথম শুনলে, তখন মুমিন নারী ও পুরুষরা কেন নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলোনা, কেনইবা তৎক্ষণাত বললোনা যে, এটা একটা ভয়ংকর অপবাদ।" (আয়াত ১২)

এ বক্তব্যে কত জোরদার নৈতিক আবেদন রয়েছে এবং ভদ্রজনোচিত আবেগ ও মুমিন সুলভ অনুভূতির জন্য কত তীব্র কশাঘাত রয়েছে, তা লক্ষ্য করার মত। অর্থাৎ ইসলামী সমাজের এক মহীয়সী নারী ঘটনাক্রমে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং সেই সমাজেরই একজন সম্মানিত সদস্য তাকে পথিমধ্যে পেয়ে সাথে করে নিয়ে এলেন, শুধু এতটুকু ঘটনা তোমাদের জন্য সর্বনিম্ন স্তরের একটা খারাপ ধারণা পোষণের ভিত্তি হয়ে

গেল কেমন করে? তোমাদের মধ্যকার অন্য কোন নারী ও পুরুষ যদি একটা দুর্ঘটনা হিসেবে এরূপ পরিস্থিতির শিকার হতো, তাহলে তারা কি অবশ্যই এরূপ নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হতো? নিজেদের চরিত্র সম্পর্কে কি তোমাদের ধারণা এ রকম? তোমাদের সমাজ কি এতই নীচ যে, তার দুই ব্যক্তি ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করেনা? তোমরা নিজেদের সম্পর্কে যদি এমন হীনতার ধারণা করতে না পার, তাহলে তোমাদের দলের একজন শ্রেষ্ঠ নারী ও একজন বিশিষ্ট সদস্য সম্পর্কে এমন জঘন্য ধারণা পোষণের কী অধিকার তোমাদের ছিল?

বস্তুত এ সমাজের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ এই সংকটকালেও নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিলেন। নচেত গোটা সমাজদেহে যদি এই বিষ সংক্রমিত হবার সুযোগ পেত এবং সমাজ সামগ্রিকভাবে এর মানসিক প্রতিরোধে অক্ষম হতো, তা হলে এ আঘাত তার গোটা অস্তিত্বকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। এ ক্ষেত্রে হযরত আবু আইয়ুব আনছারী সবচেয়ে নির্ভুল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন তাকে এই নোংরা গুজবের কথা জানালেন, তখন তিনি বললেন, "ওহে আইয়ুবের মা, আয়েশার পরিবর্তে তুমি যদি ঐ স্থানে থাকতে, তাহলে কি এমন কাজ করতে? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, কখখনো না।" হযরত আবু আইয়ূব বললেন, "তাহলে আয়েশা তো তোমার চেয়ে অনেক ভালো। আমিও বলি যে, সফওয়ানের স্থলে যদি আমি থাকতাম, তা হলে এ ধরনের চিন্তাও মাথায় আসতোনা। আর সফওয়ান তো আমার চেয়ে ভালো মুসলমান।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)

এই নোংরা অপবাদ রটনাকারীদেরকে সূরা নূরে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা আবু আইয়ূব আনসারীর মত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারলেনা কেন?

এরপর সূরা নূর আইনগত দৃষ্টিভংগী থেকে প্রশ্ন তুলেছে যে ঃ

"তারা তাদের অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ চারজন সাক্ষী কেন নিয়ে আসেনি? আল্লাহর দৃষ্টিতে তো ওরাই মিথ্যুক।" (আয়াত-১৩)

অর্থাৎ কোন পুরুষ ও নারীর চরিত্রের ওপর কলংক লেপন করা নিছক একটা তামাসা নয় বরং এটা একটা গুরুতর অপরাধ এবং এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ একটা জীবন্ত সমাজে অত্যন্ত জরুরী। একজন সৎ ও নিরীহ নাগরিক সম্পর্কে ইচ্ছা হলেই এ কথা বলা যে, সে হত্যা করেছে, চুরি করেছে, অথবা ব্যভিচার করেছে, কোন মামুলী ব্যাপার নয় যে, যা হবার হয়ে গেছে বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। এটা সর্বোচ্চ পরিমাণ দায়িত্ব সচেতনতার দাবী জানায়। এ ধরনের অভিযোগ তোলার পর তার প্রমাণ দেয়া ও আইনানুগ সাক্ষী উপস্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যারা ইসলামী সমাজের দু'জন সম্মানিত ও ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে স্বচোক্ষে না দেখে একটা অপবাদ আরোপ করে, আরোপিত অপবাদের সাক্ষ্য প্রমাণ আনা তাদেরই কর্তব্য। নচেত আইন অনুযায়ী তারাই মিথ্যাবাদী ও অপরাধী।

এরপর সূরা নূর ইসলামী সমাজের দুর্বল সদস্যদের ত্রুটিকে কিভাবে চিহ্নিত করেছে দেখুন ঃ

"ভেবে দেখ, তোমরা কত বড় মারাত্মক ভুল কাজ করছিলে যখন একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে এই মিথ্যার বিস্তার ঘটাচ্ছিলে এবং তোমরা মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যার সম্পর্কে তোমাদের কোনই জ্ঞান ছিলনা। তোমরা একে একটা মামুলী ব্যাপার মনে করেছ। অথচ আল্লাহর কাছে তা গুরুতর। কথাটা শোনা মাত্রই তোমরা বলে দিলেনা কেন যে, এমন কথা উচ্চারণ করা আমাদের জন্য অন্যায়। সুবহানাল্লাহ, এতো একটা জঘন্য অপবাদ!" (আয়াত ১৫-১৬)

এটা যে কোন সমাজ ও সংগঠনের একটা মস্ত বড় দুর্বলতা যে, তার অভ্যন্তরে ভিত্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন গুজব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত যে সংগঠন সারা বিশ্বের নৈতিক সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার নেতৃত্বে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়, তার পক্ষে এটা আরো বড় দুর্বলতা। একজন মানুষ কান দিয়ে যা কিছু শুনবে মন দিয়ে তৎক্ষণাত তা বিশ্বাস করবে, এবং মুখ দিয়ে তা প্রচার করবে, অতঃপর এক মুখ থেকে আর এক মুখে স্থানান্তরিত হতে থাকবে, কেউ তার সত্যাসত্য যাচাই করবেনা, কোন বাছবিচার করবেনা এবং কোথাও গিয়ে এই ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটবেনা, যে যার বিরুদ্ধে যা কিছু বলতে চায় অবাধে বলে যাবে, যার বিরুদ্ধে কলংক রটাতে চায় রটাতে কোন বাধা পাবেনা – এ ধরনের সমাজে কারো মানসম্ভ্রমের নিরাপত্তা থাকতে পারেনা। যে সমাজে স্বয়ং রসূল সা., হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা., হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও সফওয়ানের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ একজন মোনাফেকের ছড়ানো অপবাদ থেকে রক্ষা পায়না, সে সমাজে আর কার মান সম্ভ্রম নিরাপদ থাকতে পারে?

সূরা নূরে এ জন্যই প্রচন্ড ধমকের সুরে বলা হয়েছে ঃ

"যারাা সরলমতি নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায়, তাদের ওপর দুনিয়া ও আখেরাতে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।" (আয়াত-২৩)

এ আয়াতে হযরত আয়েশার চরিত্রের ছবি এঁকে দেয়া হয়েছে। একজন ঈমানদার সচ্চরিত্রা মহিলা, যার ধারণাই নেই যে ব্যভিচার কী জিনিস এবং কিভাবে করা হয়, আর এ ব্যাপারে কেউ তাকে অপবাদ দিতে পারে এ কথা যার কল্পনাই আসেনা। তেমনি এক সরলমতি মযলুম মহিলার এ চিত্র নৈতিকভাবে প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে।

এটা দর্ভাগ্যজনক যে, যে সব একনিষ্ঠ ঈমানদার আল্লাহ রসূলের অনুগত এবং ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এই দুরন্ত ও সতেজ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যিনি ইসলামী আন্দোলনের মূল্যবান সেবা করেছিলেন এবং তার সাহিত্যিক ও আত্মীক সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। ইনি ছিলেন হযরত হাসসান বিন সাবেত রা.। যারা সূরা নূরের ধমক ও তিরস্কারের আওতায় এসেছিলেন, হাসসানও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। অথচ ইসলামী সংগঠনে ও রসূল সা. এর দরবারে তিনি যথেষ্ট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন সময় রসূল সা. তাঁকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিতেন যেন জাহেলী কবি ও সাহিত্যিক মহলের হামলার জবাব তিনি যেন কবিতা ও সাহিত্য দিয়েই দেন এবং ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে হাসসান রা. এই দুর্লভ সৌভাগ্যও লাভ করেন যে, রসূল সা. স্বয়ং তাঁকে

নিজের মিম্বরে বসান এবং ইসলামী আন্দোলনের জাতীয় সংগীত গাইতে বলেন। তাঁর এই মর্যাদা স্বয়ং হযরত আয়েশা রা. এতটা উপলব্ধি করতেন যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি সর্বদাই তাকে সম্মান করতেন। কখনো কখনো তাকে মনে করিয়ে দেয়া হতো যে, এই ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। তখন হযরত আয়েশা উদারতা ও মহানুভবতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে বলতেন "বাদ দাও। উনি ইসলাম বিরোধী কবিদেরকে সব সময় রসূল সা. ও ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং কবিতার অংগনে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।"

সে যাই হোক, বস্তুত ঘটনা এটাই যে, ইসলামী আন্দোলনের এই অসাধারণ ব্যক্তি মোনাফেকদের পাতানো ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। এই হাঙ্গামায় তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা তিনি নিজে আন্তরিকতা সহকারে এবং ন্যায়সংগত মনে করে করলেও আন্দোলনের জন্য তা অত্যধিক ক্ষতিকর ছিল। তার এ ভূমিকা দেখে যে কেউ এ শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, কোন মানুষ যত দৃঢ় চরিত্রের অধিকারীই হোক না কেন, নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনা যে, কোন অবস্থায়ই কোন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হবেনা। অনুরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যতই শীর্ষ পর্যায়ের হোক না কেন, তার সম্পর্কেও কেউ গ্যারান্টি দিতে পারেনা যে, সে কোন ব্যাপারেই কোন মতিভ্রমের শিকার হবেনা। ছোট বা বড় প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে শয়তানের চক্রান্তের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চারপাশে ষড়যন্ত্রের জাল পাতার ব্যাপারে সে অধিকতর উদগ্রীব হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলন সর্বকালে যে মৌল তত্ত্বের অনুসরণ করে থাকে তা হলো, ব্যক্তি নয় নীতি ও আদর্শের প্রতিই দলের আসল আনুগত্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামী আন্দোলনের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে ফাঁদে আটকে ফেলা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাংগ পাংগদের অতি বড় সাফল্য। তারা মোনাফেকসুলভ কৌটিল্য দ্বারা তাড়িত হয়ে অপতৎপরতা চালাচ্ছিল, আর হাসসান বিন সাবেত আন্তরিকতার সাথে তাদের ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এ কথা বলা বেমানান হবেনা যে, আন্দোলনের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর মোনাফেকী যত ক্ষতিকর ছিল, তার চেয়েও বেশী ধ্বংসাত্মক ছিল হাসসানের আন্তরিকতা ও সরলতা। কেননা আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়ে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়, তা ক্ষতি সাধনে স্বেচ্ছায়ও অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের চেয়ে অনেক বেশী সফল হয়ে থাকে।

হাসসান বিন সাবেত কাদের পক্ষে কাজ করছেন এবং কাদের দৃষ্টিভংগী ছড়াচ্ছেন, সেটা তিনি বুঝতেই পারেননি। তিনি অনুভবই করেননি যে, তিনি কাদের ধ্যানধারণা ও সংকল্প বাস্তবায়িত করছেন, তাঁর কার্যকলাপ সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোকদের পক্ষে যাচ্ছে, এবং সংগঠনের কোন্ গোষ্ঠীর হাত সবল করছে। তিনি যে এ ক্ষেত্রে মুমিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারলেন না, সেটা বোধ হয় আল্লাহর ইচ্ছারই ফল।

আবদুল্লাহ বিন উবাই এর সাথে ইসলামী সমাজের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ ও দূরত্বের। তার বৈরী তৎপরতা বরদাশত করা যেত। কিন্তু হাসসান বিন সাবেত ছিলেন ইসলামী

সংগঠনের আপনজন। এ জন্যই তার বৈরী আচরণ অসহ্য মনে হচ্ছিল। কেননা এতে সবার মনে হচ্ছিল যে, আমাদেরই একখানা তরবারী আমদেরকে ঘায়েল করছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কোন আন্দোলনে ও সংগঠনে দেখা দিলেই ধৈর্যের বাঁধ টুটে যাওয়ার উপক্রম হয়। সম্ভবত হয়েছিলও তাই। কিন্তু ইসলামী সংগঠনের কঠোর নৈতিক শৃংখলা ভাবাবেগকে থামিয়ে রেখেছিল। কেবল এক ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। তিনি ছিলেন সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল। দুটো কারনে তিনি বেসামাল হয়ে যান। প্রথমত যে হযরত আয়েশাকে তিনি নিজের মায়ের মত জানতেন, তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, সেই অপবাদ স্বয়ং তাকে জড়িয়েই আরোপ করা হচ্ছিল। সাফওয়ান একেতো ছিলেন বদরযোদ্ধা, ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সেবক, স্পষ্টবাদী হিসেবে খ্যাত। উপরন্তু তাঁর চরিত্রে আজ পর্যন্ত কোন পাপের চিহ্ন দেখা যায়নি এবং একজন লাজুক ছেলের মত হযরত আয়েশার দিকে একটা দৃষ্টিও না দিয়ে, সারা পথে একটা কথাও না বলে, পূর্ণ সতর্কতার সাথে পেছনের অবস্থানস্থল থেকে ইসলামী বাহিনীর পরবর্তী অবস্থানস্থলে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল।

মোনাফেকদের আরোপিত অপবাদের বিবরণ দিয়ে হাসসান যে কবিতা লিখেছিলেন, তার কয়েকটা ছত্র শুনেছিলেন সাফওয়ান। এতে ভাষা ছিল হাসসানোর, কিন্তু বক্তব্য ও মানসিকতা ছিল মোনাফেকদের।

সাফওয়ানের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল হাসসানের সাথে। এক পর্যায়ে তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বসলেন। সাবেত বিন কায়েস মাঝখানে এসে থামানের চেষ্টা করলেন, সাফওয়ানকে বেঁধে ফেললেন ও বনুহারেসের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রসূল সা. পর্যন্ত গড়ায়। হাসসান ও সাফওয়ান দুজনকেই তিনি ডাকলেন। সাফওয়ান বললো, "হে রসূল, এই ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে চরম অশালীন উক্তি করেছে। এ জন্য আমি রাগ সামলাতে না পেরে ওকে মেরেছি।" রসূল সা. নম্র ভাষায় হাসসানকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলেন এবং সাফওয়ানের কাছ থেকে তলোয়ার যখমের বাবদ দিয়াত (জরিমানা) আদায় করে দিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)

সাওয়ানের উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই হাসসান নরম হলেন। কোন প্রতিশোধ স্পৃহা লালন পূর্বক পরবর্তীতে আন্দোলনের জন্য আরো ক্ষতিকর কিছু করার চিন্তা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন।

পরে হযরত হাসসান গভীর অনুশোচনায় পড়েন এবং তা তার একটা কবিতায় ফুটে ওঠে। এ কবিতা দ্বারা তিনি হযরত আয়েশার ওপর লেপন করা কলংক ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ঃ

"তিনি সকল সন্দেহের উর্ধে অবস্থানকারী এক পর্দানশীন সতী নারী। সরলমতি নারীদের মানসম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। তিনি এক সুশীলা ও সচ্চরিত্রা নারী। আল্লাহ তার স্বভাবকে পবিত্র করেছেন এবং তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করেছেন। এ যাবত যা কিছু

বলা হয়েছে, তা তার ওপর আরোপিত হয়না। কেবল একজন চোগলখোরের সাজানো মিথ্যাচার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েই আমি ওসব বলেছিলাম।" (সীরাতে ইবনে হিশাম ৩য় খন্ড)

এই সাথে সূরা নূর একটা সামাজিক তত্ত্বকে নীতিগত যুক্তির আকারে মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করে ঃ

"অসচ্চরিত্র নারীরা অসচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং অসচ্চরিত্র পুরুষেরা অসচ্চরিত্র নারীদের জন্য আর পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষেরা পবিত্র নারীদের জন্য। তারা তাদের মনগড়া কথাবার্তা থেকে মুক্ত।" (আয়াত -২৬)

অর্থাৎ বিয়ের জন্য সচরাচর নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে সমান সাথী খোজা হয়। মানুষ যার মধ্যে নিজের মত চরিত্র দেখতে পায়, তাকেই বাছাই করে। বিশেষত যারা কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পেছনে সমগ্র জীবনটাকে নিয়োজিত করে, তারা দাম্পত্যজীবনের জন্যও এমন সাথীই খোঁজে যে জীবনের ঐ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ও সহযোগী হতে পারে। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত এ সত্য কিভাবে উপেক্ষা করা যায় যে, চরিত্র ও মানসিকতার ঐক্য এবং চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীর সাহায্যই যে কোন দম্পতির মিল ও বনিবনা নিশ্চিত করতে পারে? এটা না হলে তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব কলহ ও অবনিবনা লেগেই থাকবে। এ আয়াত অপবাদ রটনাকারীদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়ে বলে যে, তোমরা কি দেখতে পাওনি, দাম্পত্য জীবনের জন্য ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা যে মহীয়সী নারীকে মনোনীত করেছিলেন, যার সাথে তাঁর হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক ছিল এবং যার সাথে দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাভাবনার একাত্মতা ও সমন্বয় একটা আদর্শ নমুনা ছিল, তিনি কি পুরোপুরিই কেবল একটা সাজানো পুতুল ছিলেন যে, এক মুহূর্তের মধ্যেই সাজগোজ খসে পড়লো এবং শুধু অচল পুতুলটা অবশিষ্ট রইল ?

তিনি ছিলেন এমন একটা পবিত্র ও নিস্কলংক পরিবারের আদরের দুলালী, যে পরিবারের পিতামাতা ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পতাকাবাহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনেরই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে তাঁর শৈশব কেটেছে, রসূল সা. এর জীবন সংগিনী হয়ে তাঁর জ্যোতির্ময় চরিত্র থেকে উপকৃত হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুযোগ তিনিই পেয়েছেন, রসূল সা. এর প্রশিক্ষণের বিশেষ সুযোগ তিনিই পেয়েছেন, এবং তাঁর কক্ষ বহুবার ওহির অলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। এমন পবিত্র পরিবেশে গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠা একজন মহিলার চরিত্র কি এরূপ হওয়া সম্ভব যে, একটা জঘন্যতম অপবাদ তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে? অথচ তার পিতামাতা, রসূল সা. এবং সাধারণ মুসলিম জনতার মনে এই অপবাদ রটনার পূর্বে তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন ধারণা কল্পনাই জন্ম নিতে পারেনি। আগাগোড়া পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সততার ঔজ্বল্যে উদ্ভাসিত এক পারিবারিক পরিবেশে বহু বছর ধরে লালিত ও বিকশিত একটা নির্মল চরিত্র দ্বারা সহসাই এমন একটা জঘন্য কাজ সংঘটিত হওয়া কিভাবে সম্ভব, যার প্রাথমিক লক্ষণও কারো সামনে কখনো প্রকাশ পেলনা? এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে যে, একটা চমৎকার ফলদায়ক গাছ দীর্ঘকাল ব্যাপী সুমিষ্ট ফল দিতে দিতে সহসা একদিন টক ফল দেয়া শুরু করবে?

আইন সক্রিয় হয়ে উঠলো

সূরা নূরের আলোর বন্যায় মুসলমানদের হৃদয়নগরী ঝকমকিয়ে উঠলো, জনমত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে একাগ্র চিত্তে ধাবমান হলো, এবং ইসলামী সমাজ দীর্ঘ অশান্ত পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠায় হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সূরা নূর 'হদ্দুল কাযাফ' (অপবাদের শাস্তি) সংক্রান্ত আইন সাথে নিয়ে এসেছিল। অপবাদ রটানাকারীরা আন্তরিকতার সাথে অনুতপ্ত হওয়া ও অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়া ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণও ছিল। তারা ইসলামী আইনের সামনে নিজেদের পিঠ পেতে দিল এবং আশীটা করে বেত্রাঘাত খেয়ে নিজেদের বিবেকের পবিত্রতা বহাল করে নিল। মিসতাহ, হাসসান বিন সাবেত ও হামনা বিনতে জাহশ— এই তিনজন এ শাস্তি ভোগ করলেন। কিন্তু আসল অপরাধী আইনের ধরপাকড় থেকে রেহাই পেয়ে গেল। তবে জনমতের কাছে তার হীন স্বভাব ও জঘন্য কারসাজি পুরোপুরিভাবে ধরা পড়ে গেল এবং ইসলামী সমাজ তাকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন করে একদিকে ফেলে রাখলো।

ভুলত্রুটি সবারই হয়ে থাকে। নবীগণ ছাড়া কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম আ. এর ঘটনার দুই পরস্পর বিরোধী চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পাপ কাজ সংগঠিত হওয়ার পর পাপীর সামনে দুটো পথ খুলে যায়, একটা শয়তানের মনোনীত পথ। এটা হলো পাপকে আরো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার হঠকারী পথ। দ্বিতীয়টা সুস্থ ও সৎ স্বভাবের অনুকুল হযরত আদমের মনোনীত পথ। অর্থাৎ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে শুধরে নেয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সংগীরা শয়তানী পথ অবলম্বন করলো। আর হাসসান, মিসতাহ ও হামনা অবলম্বন করলেন আত্মশুদ্ধির পথ।

শাপে বর

সময়ের আবর্তনকে কল্পনার চোখে একটু পুনরুজ্জীবিত করুন এবং ক্ষণেকের জন্য নিজেকে মদিনার মাসব্যাপী অপবাদের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে নিয়ে যান। আপনার সামনে একটা ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ভেসে ওঠবে। যে আন্দোলন এক একজন করে কর্মী সংগ্রহ করে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবী কাফেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল, যে আন্দোলন এক দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র নামে একটা ক্ষুদ্র শান্তির নীড় তৈরী করেছিল, যে আন্দোলন বহু বছরের অশান্তি ও অরাজকতার আগুনে পোড়া বিপন্ন মানবতাকে ঐ শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, সেই আন্দোলনের একেবারে ভেতর থেকে যদি কোন ধ্বংসাত্মক তান্ডব জন্ম নেয়, তা হলে এর চেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারেনা। বিশেষত এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন ঐ ইসলামী রাষ্ট্র চারদিক থেকে শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি ছিল, যে কোন মুহূর্তে তার কোন না কোন দিক থেকে সামরিক আগ্রাসনে পতিত হওয়ার আশংকা ছিল, এবং স্বয়ং নিজেরই অমুসলিম অধিবাসীদের একটা বড় অংশের ক্ষতিকর তৎপরতা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

কিন্তু কোরআন তাকে শান্ত্বনা দিল যে, ঘাবড়ানো ও উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।" এই ঘটনাকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করনা, আসলে ওটা তোমাদের কল্যাণের উপকরণ।" (নূর – ১১)

বস্তুত আদর্শবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলো যখন মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী দুর্যোগ ও হাঙ্গামার কবলে পড়ে, তখন পরিণামের দিক দিয়ে তা অধিকতর কল্যাণ ও অগ্রগতি, সংস্কার ও নির্মাণ, এবং শক্তি ও প্রতিঘাত সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেয়, চাই ঐ সব দুর্যোগ তার ভেতর থেকেই স্পষ্ট হোক কিংবা বাহির থেকে। উচ্চাভিলাষী সুযোগ্য ব্যক্তিগণের জন্য যেমন নানা রকমের উত্থান পতন, দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাক উন্নতির সহায়ক হয়ে থাকে, তদ্রুপ চিন্তা ও কর্মের ক্ষমতাসম্পন্ন আন্দোলনগুলোর জন্য বিরোধিতা ও অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি উন্নতি ও স্থিতির পথ সুগম করে থাকে। যে সংগঠন আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকে, যার একটা সামষ্টিক মানসিকতা গড়ে ওঠে, যার নৈতিক ও চিন্তাগত মেযাজ পরিপক্কতা লাভ করে, যার নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকে সদা চঞ্চল, সজাগ, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ লোকদের হাতে, যার কর্মীরা যাবতীয় বৈরী ও নৈরাজ্যবাদী শক্তির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সম্ভাব্য যে কোন বিবাদ ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকে এবং যার জনমত কোন ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও সংগঠনের অভ্যন্তরে চালু হতে দেয়না, সে সংগঠন প্রত্যেক বৈরী আক্রমণ ও বিরোধিতা থেকে কিছুনা কিছু লাভবান হয়ে থাকে।

অপবাদ ও অপপ্রচারের এই নোংরা অভিযান দ্বারাও মদিনার মহান ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠন একাধিক দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছে এবং এর পরিণতিতে তা আগের চেয়েও শক্তিশালী ও সচেতন হয়েছে।

সততা ও ন্যায়পরায়ণতার এই আলোকোজ্জ্বল আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগণ মানবতার এই সব বিপজ্জনক ও সুদূরপ্রসারী দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে প্রত্যক্ষ তিক্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা। পীরমুরীদীর খানকায় বসে এগুলোর জ্ঞান অর্জন দূরে থাক, সামান্যতম ধারণাও লাভ করা যায়না এবং এর মোকাবিলার জন্যও মানুষকে তৈরী করা যায়না। এই ঘটনার মাধ্যমে সামষ্টিক জীবনের এমন বহু ফাঁকফোকর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যার ভেতর দিয়ে সমস্ত বিধ্বংসী দোষত্রুটিগুলো ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণ এর মাধ্যমে চিনে নিয়েছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের জনশক্তির মধ্যে কারা মোনাফেকীর ব্যাধিতে আক্রান্ত, কারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী, কারা স্থূল জ্ঞান ও আবেগপূর্ণ মেজাযের অধিকারী, কারা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও বিপথগামী হয়ে থাকে এবং কারা সরলতার কারণে শত্রুদের ধোকার শিকার হয়ে থাকে। বিশেষত কুচক্রী মোনাফেক নেতা ইসলামী সংগঠনের ভেতরে যে ক্ষুদ্র একটা উপদল সৃষ্টি করে ফেলেছিল, তা কতদূর যেতে পারে, সে কথা সুস্পষ্টভাবে জানা গিয়েছিল।

বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের এই দুর্বল দিকগুলো জেনে নেয়ার পর এমন একটা মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল যাকে কাজে লাগিয়ে একদিকে নতুন নৈতিক নির্দেশাবলী দিয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হলো, অপরদিকে এমন সামাজিক বিধি চালু করা হলো, যা বিভিন্ন চারিত্রিক দোষ থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। তৃতীয়ত, নতুন নতুন আইন ও দন্ডবিধি সম্বলিত একটা কঠোর ফরমান জারী করা হলো, যা মানবতার চিরস্থায়ী সামষ্টিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করলো।

এ ঘটনা মদিনার ইসলামী সমাজের সমষ্টিক বিবেককে ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে তুললো। তার নৈতিকতাকে জাগ্রত ও তার সামষ্টিক সম্ভ্রমবোধকে সক্রিয় করে তুললো অনুভূতির কশাঘাত হেনে। মোনাফেক শক্তির এই বিব্রতকর আগ্রাসন থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ঐ সমাজের প্রত্যেক সদস্য আগের চেয়ে সতর্ক ও মজবুত হয়ে গেল।

এই ঘটনার সময় হযরত আয়েশার সাথে সাথে যিনি সবচেয়ে বেশী যুলুমের শিকার হন, তিনি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ, শান্ত ও আবেগহীন আচরণ দ্বারা যে উদারতা, মহানুভবতা এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, তা মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এ ঘটনায় রসূল সা.-এর পর ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্ব দানকারীদের জন্য একটা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশ্বমানবতাকে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা উপহার দেয়ার জন্য তিনি চরম মানসিক নির্যাতন সহ্য করেন। যিনি সকল মানুষের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, সমকালীন সমাজ তাকে এই প্রতিদান দিল যে, তাঁর মানসম্ভ্রমের ওপর মিথ্যা অপবাদের কালিমা লেপন করলো। আর কেউ যদি এমন অবস্থার শিকার হতো, তাহলে হয় বিরোধীদেরকে পিষে ফেলতো, নচেত চরম হতাশা নিয়ে ঘরের কোণে গিয়ে বসতো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে আপন কর্তব্য পালন অব্যাহত রাখলেন।

উস্কানীমূলক তৎপরতা

মদিনার ইহুদীরা একদিকে নিজেদের সুসংহত শক্তির দম্ভে এবং অপর দিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে রসূল সা. এর সাথে একটা সাংবিধানিক চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের আওতায় এসে গিয়েছিল। সম্ভবত তারা এই নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে যথাসময়ে ভালোমত বুঝতে পারেনি। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তারা আঁচ করতে পারেনি। এই শক্তি যে এত দ্রুত বিকাশ লাভ করবে এবং কতিপয় চালচুলোহীন শরণার্থী ও মদিনার আনসারদের সহযোগিতায় নিছক ঈমান ও চরিত্রের বলে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত হবে, তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, গাছের ঝরে যাওয়া শুকনো পাতার মত মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত এই মুসলমানরা সম্ভাব্য দুর্যোগ দুর্বিপাকের প্রথম আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর যদি কোন মতে টিকেও থাকে, তাহলেও তারা কোন শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে পারবেনা। কিন্তু কলেমায়ে তাইয়েবার বিপ্লবী প্রাণশক্তির অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে চরম বৈরী পরিবেশেও এই ক'জন মানুষ একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুললো। শুধু তাই নয়, কয়েক মাসের মধ্যেই ইহুদীরা বুঝতে পারলো, ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক উদীয়মান সূর্য যার সামনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রদীপ টিমটিমে হয়ে যাবে। বিশেষত, বদরযুদ্ধ থেকে মুসলমানদের শুধু নিরাপদে নয়, বরং বিজয় পতাকা ওড়াতে ওড়াতে মদিনায় ফিরে আসতে দেখে ইহুদীরা এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিশ্চয়ই পুরো বিষয়টা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়েছিল।

রসূল সা. এর সাথে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ইহুদীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের মিত্র ও আইনানুগ নাগরিকে পরিণত করেছিল। কিন্তু তাদের অন্তরে বিদ্রোহ ও হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের পথে পরিচালিত করলো। সুযোগ পেলেই, আর সুযোগ না পেলে সুযোগ সৃষ্টি করে হলেও তারা চেষ্টা করতো যেভাবেই হোক মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করে দিতে তাদেরকে উস্কানী দিতে, কোন না কোন উপায়ে প্রশাসন ও আইনশৃংখলাকে অচল করে দিতে, সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এবং রসূল সা. এর নেতৃত্বকে দুর্বল করে দিতে। ইহুদীদের তল্পীবাহী লোকেরা মোনাফেকের বেশে ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকতো। তারা আনসারদের মধ্য থেকে দুর্বল ঈমানের লোকদের সাথে নিয়ে ইহুদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতো। দুস্কৃতি প্রবণ এই সব কুচক্রী শত্রু শেষ পর্যন্ত একটা কুটিল পন্থা উদ্ভাবন করলো। তারা মুসলিম নারীদের নামে অশ্লীল কবিতা রচনা করতো, শুনিয়ে শুনিয়ে আবৃত্তি করতো ও তা প্রচার করতো। তাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করতো। এই নোংরা কবিতা চর্চার কারণে তাদের মনমগজ এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, সতীত্বের ন্যায় একটা মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের মনে কোন শ্রদ্ধাবোধই ছিলনা। ইহুদীদের এই নির্লজ্জ মানসিকতা একদিন এভাবে আত্মপ্রকাশ করলো যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী যুবক পুরোপুরি গুন্ডাদের মত আচরণ করে বসলো। বনু কাইনুকা নামক একটা ইহুদী গোত্র মদিনায় বাস করতো। তাদের বাজারে জনৈকা আরব মুসলিম মহিলা কেনাকাটা করতে গেল। দোকানদার তার সাথে প্রথমে ফস্টিনষ্টি করলো, তারপর তাকে প্রকাশ্য বাজারে উলংগ করে দিল। এই অপকর্মটা করার পর সে ও তার সাথীরা লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে আরো ব্যংগ বিদ্রুপ করতে লাগলো। মহিলা আরবীয় পদ্ধতিতে চিৎকার করলো ও সাহায্য প্রার্থনা করলো। তার চিৎকার শুনে জনৈক আরব যুবকের সম্ভ্রমবোধ সক্রিয় হয়ে উঠলো এবং সে তীব্র উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে বদমায়েশ ইহুদীটাকে তৎক্ষণাত হত্যা করে ফেললো। কুচক্রীরা যা চেয়েছিল সেটাই হাতে পেয়ে গেল। আরব মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে দাংগা বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। রসূল সা. খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। তিনি বনু কাইনুকা গোত্রকে তাদের ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য তিরস্কার করলেন এবং এই বলে হুঁশিয়ারও করলেন যে, "হে ইহুদী জনতা, (বদর যুদ্ধে) কোরায়েশদের যে পরিণতির হয়েছে, তোমাদেরও সেই পরিণতি হবার আগে ভালো হয়ে যাও।"

ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, বনু কাইনুকা গোত্র যেহেতু তীব্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতার মনোভাব পোষণ করতো, তাই তারা উত্তেজিত স্বরে জবাব দিলঃ "হে মুহাম্মদ! কোরায়েশদের ক'টা লোককে মেরে ফেলেছ বলে ধরাকে সরা মনে করোনা। ওরা শক্তিহীন ও যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষ। আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাদের ওপর তলোয়ার ওঠাও, তাহলে বুঝতে পারবে, আমরাই যথার্থ লড়াকু। আমাদের মত লোকের সাথে তোমার ইতিপূর্বে কখনো পরিচয় হয়নি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা এ যাবত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মেধাগত দিক দিয়ে ইহুদীদের চেয়ে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। অথচ ইসলামী আন্দোলন তাদের মধ্যে নতুন জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল এবং একটা পবিত্র লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার লাগাতার চেষ্টা ও উদ্যম তাদেরকে পরস্পর ও মোহাজেরদের সাথে ঐক্যের

বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। তাদের ভাগ্যের শুভ পরিবর্তন দেখে ইহুদীরা মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইহুদীদের এক কুখ্যাত ধড়িবাজ বুড়ো শাস বিন কায়েস পরিস্থিতির এই পরিবর্তনকে খুবই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করতো। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে তার বুক হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ থাকতো। একবার সে রসূল সা. এর সাহাবীদের একটা বৈঠকের দৃশ্য স্বচোক্ষে দেখতে পায়। ঐ বৈঠকে আওস ও খাজরাজের কিছু লোক পরস্পর কথাবার্তা বলছিল। তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি সম্প্রীতি ও ইসলামের সৃষ্টি করা একাত্মতা দেখে তার কলিজা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোথায় জাহেলী যুগের সেই মারামারি হট্টগোল, আর কোথায় একাত্মতার এই মধুর দৃশ্য। ইহুদী বুড়ো মনে মনে বলতে লাগলো, "ওহ্, বুঝেছি। এ শহর এখন তাহলে কায়লার বংশধর (আওস ও খাজরাজ গোত্রের দাদীর নাম কায়লা) মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল! ওরা যদি এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের পক্ষে স্বস্তিতে জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।" অবশেষে তার গোত্রের লোকেরা একটা ষড়যন্ত্র পাকালো এবং জনৈক ইহুদী যুবককে তদনুসারে কাজ করার জন্য ক্রীড়নক বানালো। তারা তাকে শিখিয়ে দিল, তুমি যেয়ে মুসলমানদের বৈঠকাদিতে বসবে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বুয়াস যুদ্ধ ও তার পূর্ববর্তী সেই সব যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, যা আওস ও খাজরাজের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। ইহুদী এজেন্ট তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করলো। একবার এক মজলিসে আওস ও খাজরাজের লোকেরা মিলে মিশে বসেছিল। কথা প্রসংগে জাহেলী যুগের অন্ধকার অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সৃষ্টি হলো, পরস্পরকে হেয় করার প্রতিযোগিতা চললো এবং তা উত্তেজনায় রূপান্তরিত হলো। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের উত্তেজিত লড়াকুরা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালো যেন নতুন করে যুদ্ধ করে প্রমাণ করবে কার কেমন শক্তি। আওয়ায উঠলো, "অস্ত্র আনো, অস্ত্র! " আওস ও খাজরাজ উভয় গোত্রে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। লড়াইর স্থান ও কাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে গেল। উত্তেজিত লোকেরা সব অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বেরুচ্ছিল। এই সময় রসূল সা. মোহাজেরদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। অতঃপর নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

"হে মুসলিম জনতা, আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, এর মাধ্যমে তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, তোমাদের ঘাড়ের ওপর থেকে জাহেলিয়াতের শেকল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তোমাদেরকে কুফরি থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এর পরও তোমরা আমার উপস্থিতিতেই জাহেলিয়াতের শ্লোগান দিতে শুরু করেছ-এ কেমন কথা ?"

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনেই লোকেরা অনুভব করলো যে, এই সব কিছুই আসলে শয়তানের সৃষ্টি করা ফেতনা ও কুটিল ষড়যন্ত্র। ইসলামের শত্রুরাই এ সব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তারা অনুতপ্ত হয়ে মাথা নোয়ালো এবং আনুগত্য প্রকাশ করে রসূল সা. এর সাথে ফিরে এল।

এ ধরনেরই একটা ঘটনা ঘটেছিল বনুল মুসতালিক যুদ্ধে যাওয়ার পথে। ইহুদীদের বশংবদ মোনাফেকরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে বিপজ্জনক পর্যায়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফেলেছিল। এ ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। রসূল সা. ঐ সময়েও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ ধরনের চক্রান্ত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত কুটিল চক্রান্ত ছিল মসজিদে যেরারের ঘটনা, এই চক্রান্তের আসল হোতা ছিল খাজরাজ গোত্রের আবু আমের নামক এক ভন্ড পীর। রসূল (সাঃ) মদীনায় আসার আগে সে পূর্বতন আসমানী কিতাব সম্পর্কে নিজের পান্ডিত্য ও দরবেশসুলভ জীবন যাপনের সুবাদে বেশ প্রভাবশালী ছিল। রসূল সা. যখন মদিনায় এসে সর্বশ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হলেন, তখন আবু আমেরের প্রভাব প্রতিপত্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ালো। এ কারণে সে মনে মনে ভীষণ খাপ্পা থাকতো। উপরন্তু বদর যুদ্ধের ফলাফল তার সামনে ভবিষ্যতের যে ছবি তুলে ধরলো, তাতে সে উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়লো। সে একদিন মক্কার কোরায়েশ নেতাদেরকে ওহুদ যুদ্ধের জন্য উস্কে দিতে লাগলো, অপরদিকে আরবের অন্যান্য মোশরেক নেতাদের সাথে যোগসাজস করলো, স্বয়ং আনসারদেরকে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিল এবং রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পর্যন্ত মদিনা আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর , ৪র্থ খন্ড)

মোনাফেকদেরকে সে এই মর্মে প্ররোচনা দিল যেন রসূল সা. এর মোকাবিলা করার জন্য তারা একটা বিকল্প কেন্দ্র স্থাপন করে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই মসজিদে যেরার নির্মাণ করা হলো। এই ইসলাম বিরোধী তৎপরতার আখড়ার স্থপতিরা রসূল সা. কে নাটকীয় ভংগীতে আবেদন জানালো যে, যে সমস্ত দুর্বল ও অক্ষম লোকেরা নামায পড়ার জন্য বেশীদূর যেতে পারেনা, তাদের জন্যই আমরা এ মসজিদ নির্মাণ করেছি। তাছাড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে এবং ঝড় বৃষ্টির সময় আশ পাশের লোকজন সহজেই এখানে সমবেত হতে পারবে। আপনি গিয়ে এর উদ্বোধন করে আসুন এবং বরকত মন্ডিত করুন। রসূল সা. তখন তবুক রওনা হচ্ছিলেন। তিনি তবুক থেকে ফেরার সময় পর্যন্ত ব্যাপারটাকে মুলতবী করলেন। ফেরার সময় ওহির মাধ্যমে তাঁকে সাবধান করা হলো ঃ

"যারা (মুসলমানদের) ক্ষতি সাধন, কুফরি করা, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানো, এবং আগে থেকে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তদেরকে ওঁৎ পেতে থাকার ঘাঁটি বানিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ করেছে, এবং কসম খেয়ে খেয়ে বলে যে, আমরা কেবল সদুদ্দেশ্যে কাজ করছি, আল্লাহ সাক্ষী যে তারা মিথ্যুক। আপনি কখখনো তাদের নির্মিত মসজিদে নামায পড়বেননা। তবে যে মসজিদের (অর্থাৎ মসজিদে কোবা) ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরহেজগারীর ওপর স্থাপিত হয়েছে, এই মসজিদই আপনার নামায পড়ার বেশী উপযুক্ত। পবিত্রতা অর্জন করতে চায় এমন বহু লোক সেখানে রয়েছে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনে ইচ্ছুকদেরকে ভালোবাসেন।" (তওবা, ১০৭, ১০৮)

এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, প্রতিহিংসার একটা ক্ষুদ্র বীজ কিভাবে একটা বিশাল বিষবৃক্ষের জন্ম দেয় এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য কুফরি

শক্তিও কিভাবে একটা মসজিদকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। লক্ষ্য করুন, ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য যে সব ফেতনার সৃষ্টি করা হয়, তা কিভাবে ধর্ম ও খোদাভীতির লেবেল এঁটে আত্মপ্রকাশ করে। কত দল উপদল, কত খানকাহ, কত মসজিদ, কত মাদ্রাসা, কত প্রকাশনী এবং কত পত্রপত্রিকা আজও আমাদের সামনে এ মসজিদে যেরারের মতই অসদুদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও লালিত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। এ সবের স্থপতিদেরও দাবী এটাই যে, "আমরা কেবল সদুদ্দেশ্যে কাজ করছি।"

এই মসজিদ যদি আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হতো এবং অক্ষম ও দুর্বল মুসলমানদের জন্য জামায়াতে নামায পড়ার সহজ ব্যবস্থা করাই যদি তার লক্ষ্য হতো, তা হলে এ প্রয়োজনটা রসূল সা. এর বিবেচনার জন্যই পেশ করা হতো। তখন ইসলামী সমাজের নেতাই এ মসজিদ নির্মাণের ফায়সালা করতেন। অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এটাও মুসলমানদের সামষ্টিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্মিত হতো, কিন্তু তা না করে কিছু লোক গোপনে গোপনে সলাপরামর্শ করে ইসলামী সংগঠন ও তার নেতার অজান্তে একটা গোপন পরিকল্পনা করে এবং সবার অলক্ষ্যে তাদের জন্য একটা আলাদা মসজিদ বানিয়ে ফেলে। অথচ নিকটেই কোবার মসজিদটি আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, খোদাভীতির পোশাকে আবৃত হয়ে সম্পাদিত এই কাজটার পেছনে কিছুনা কিছু কারচুপি অবশ্যই রয়েছে। ওহি নাযিল হয়ে এই কারচুপি উদঘাটিত করে সমাজের সামনে রেখে দিল। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কর্মরত একটা সংগঠনের উপস্থিতিতে কিছু লোক যদি তার ভেতরে নিজেদের আলাদা উপদল গড়ার কথা ভাবে এবং সামষ্টিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীর বাইরে নিজেদের আলাদা পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়িত করে, তাহলে তারা তাদের খোদা ভীতিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য যতই বাগাড়ম্বর করুকনা কেন এবং যতই নয়নাভিরাম বেশভূষা ধারণ করুক না কেন, তার ফলাফল ইসলামী সমাজের ক্ষতি সাধন, কুফরির প্ররোচনা ও বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা।

অবশেষে মসজিদের পবিত্র নামে নির্মিত এই অপবিত্র আখড়াকে রসূল সা. এর নির্দেশে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো, যাতে তার সাথে সাথে তার ঘৃণ্য ইতিহাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খন্ড)

মোটকথা, আল্লাহর হেদায়াতের একচেটিয়া দাবীদার ও নবীরসূলদের উত্তরাধিকারী ইহুদী গোষ্ঠী উস্কানী সৃষ্টির কোন সুযোগই হাত ছাড়া করেনি। কিন্তু এই সব বিব্রতকর অপতৎপরতার চেয়েও অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক ছিল তাদের সেই সব ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা, যা তারা প্রতিটি যুদ্ধের সময় ইসলামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য চালাতো। আমরা পরবর্তিতে এ সব অপতৎপরতার বিবরণ দেব।

বিচার ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

যে কোন শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা তার দুটো কাজ সূচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত থাকা চাই। দ্বিতীয়ত তার বিচার ব্যবস্থা সুচারুভাবে কাজ করতে থাকা ও তার আইন কানুন বাস্তবায়িত হতে থাকা চাই। প্রথম কাজটা বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য এবং দ্বিতীয়টা আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী

থেকে নিরাপদ রাখার জন্য। কিন্তু রসূল সা. এর সরকারকে এই উভয় কাজ সম্পাদনে ইহুদী ও মোনাফেকদের পক্ষ থেকে একটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই প্রতিরোধক শক্তিদ্বয় কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় বাধা দিয়েছে এবং বেসামরিক প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য কী কী কারসাজি করেছে, সেটা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একটা নবীন রাষ্ট্রের বেসামরিক প্রশাসনকে যদি প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগই না দেয়া হয়, তাহলে সে তার আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনা, বাইরের শক্তিগুলোরও মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়না। এমতাবস্থায় তার অস্তিত্ব অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ইতিহাসে এমন অসংখ্য নজীর বিদ্যমান যে, বিজেতা বা বিপ্লবীরা যেখানেই কোন নতুন সরকার কায়েম করেছে, সেখানে প্রথম প্রথম বেসামরিক প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অস্বাভাবিক কঠোরতা ও বল প্রয়োগের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু রসূল সা. এর সরকার যে নৈতিক মতাদর্শ ও যে বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে অস্বাভাবিক বা বিধি বহির্ভূত কঠোরতার অবকাশ ছিলনা। এ জন্য মদিনার পঞ্চম বাহিনী কিছুটা খলতা ও কপটতার আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের যে সাংবিধানিক চুক্তির আওতায় মুসলমান মোহাজের আনসার ও ইহুদী গোত্রগুলো একটা একক রাজনৈতিক সংস্থায় একীভূত হয়েছিল, সেই চুক্তিতে স্বীকার করা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Final Authority) মুহাম্মদ সা. এর হাতে নিবদ্ধ থাকবে। সেই দলীল আজও সুরক্ষিত আছে এবং তাতে নিম্নলিখিত দুটো স্পষ্ট ধারা বিদ্যমান ঃ

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيئ فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشجار يخاف فساده فان مر ده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم-

এই সাংবিধানিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর চুক্তিবদ্ধ ইহুদী গোত্রগুলোর ওপর আইনগত, নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা এবং রসূল সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রশাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। একটা অসংগঠিত ও বিশৃংখল সমাজকে আইনের শাসনের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক শৃংখলার আওতায় নিয়ে আসা রসূল সা. এর একটা অসাধারণ ও অমূল্য কীর্তি ছিল এবং অপরাধ ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য ইনসাফের স্বাভাবিক ও চিরন্তন মূলনীতিগুলোর বৈষম্যমুক্ত প্রয়োগ একটা অতীব কল্যাণময় পদক্ষেপ ছিল। এ পদক্ষেপের ফলে সুষ্ঠু নির্মল শান্তি ও নিরাপত্তামূলক পরিবেশ অন্যদের ন্যায় ইহুদীদের জন্যও উপকারী ছিল। তা ছাড়া আল্লাহর আইন চালু করা ইহুদীদেরও জাতীয় লক্ষ্যবস্তু ছিল।

দৃশ্যত ইহুদীরা এই সাংবিধানিক চুক্তির দায়দায়িত্ব স্বেচ্ছায়ও সানন্দে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেখানেই তারা অনুভব করতো, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন দ্বারা তাদের কোন স্বার্থ ব্যাহত কিংবা তাদের কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে, সেখানেই তারা রাজনৈতিক, আইনগত ও নীতিগতভাবে এবং চুক্তির আলোকে অর্পিত দায়দায়িত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতো, আর সমাজ ও মানবতার সার্বিক স্বার্থকে একেবারেই উপেক্ষা করতো। একবার জনৈক ইহুদী বিবাহিত পুরুষ অপর এক বিবাহিত ইহুদী মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো। ঘটনাটা ইহুদী সরদারদের কানে এল। তারা পরামর্শের জন্য বসলো এবং এক ব্যক্তিকে রসূল সা. এর নিকট এ কথা জানতে পাঠালো যে, এ ধরনের কুকর্মের কী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তারা ইতিপূর্বে পরামর্শ করে স্থির করেছিল যে, মুহাম্মদ সা. যদি আমাদের সমাজে প্রচলিত 'তাহমিয়া'র (মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে করে এলাকায় ঘোরানো) নির্দেশ দেন, তাহলে মুহাম্মদ সা. কে একজন রাজা হিসেবে মেনে নেয়া হবে এবং তার আদেশ শিরোধার্য করা হবে। কিন্তু যদি আল্লাহর কিতাবের বিধান মোতাবেক 'রজম' এর নির্দেশ দেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি (সঠিক জ্ঞান, সৎ সাহস ও আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যের দিক দিয়ে) একজন নবী এবং সে অবস্থায় মুহাম্মাদ সা. এর আদেশ মানা যাবেনা। কেননা তাহলে তোমাদের যেটুকু নেতাসুলভ প্রভাব প্রতিপত্তি এখনো অবশিষ্ট আছে তাও শেষ হয়ে যাবে। যাহোক, বার্তাবাহক এসে ইহুদী নেতাদের বার্তা হস্তান্তর করলো। এতে ইহুদী শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে এই মর্মে প্রস্তাবও দেয়া হয়েছিল যে, আমরা আপনাকে বিচারক মেনে নিচ্ছি। তাদের এ প্রস্তাব সাংবিধানিক চুক্তির পরিপন্থী ছিল। কারণ ঐ চুক্তি অনুসারে রসূল সা. স্থায়ীভাবেই মদিনার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই রসূল সা. উঠলেন এবং সরাসরি ইহুদীদের ধর্মীয় কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের আলেমদের ডাকো।' তৎক্ষণাত আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে নিয়ে আসা হলো। কোন কোন বর্ণনা মোতাবেক আব্দুল্লাহর সাথে আবু ইয়াসার বিন আখতা এবং ওহব বিন ইয়াহুদাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলাপ আলোচনার সময় সবাই এক বাক্যে আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে তাওরাত সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ লোক বলে আখ্যায়িত করলো। রসূল সা. আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর ভয় দেখালেন এবং বনী ইসরাইলের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জান যে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাওরাতে তাকে 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? সে জওয়াব দিল, "অর্থাৎ আল্লাহর কসম হাঁ।" ওহির মাধ্যমে যে তথ্য রসূল সা. এর জানা ছিল, বিরোধীদের কাছ থেকেও তার পক্ষে সমর্থন গেল। কিন্তু সাধারণ সভায় ইহুদী সরদাররা ও আলেমরা উল্টাপাল্টা তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলো। তারা জোর দিয়ে বলতে লাগলো যে, আমাদের শরীয়তের বিধানে তাহামিয়াই ব্যভিচারের শাস্তি। এই পরিভাষাটির অর্থ অনুযায়ী ইহুদী ব্যভিচারীদের মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে জনপদে ঘোরানো হতো। তাওরাতের রজমের (পাথর মেরে হত্যা করার) বিধানকে তারা শিকেয় তুলে রেখেছিল। তাদের ভেতরে যখন ব্যভিচারের ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লো এবং তাদের উচ্চস্তরের লোকেরা পর্যন্ত এতে জড়িত হয়ে পড়লো, তখন সমাজ শরিয়তের পক্ষ অবলম্বন করার

পরিবর্তে অপরাধীকে সহায়তা করতে লাগলো এবং শাস্তি লঘুতর করলো। মদিনার ইহুদী নেতারা আশংকা বোধ করলো যে তাওরাতের রজমের বিধান যদি পুনরায় চালু হয়ে যায় তাহলে কারো আর ভালাই থাকবেনা। আজ একজনের শাস্তি হবে, কাল হবে আর একজনের। এ জন্যই তারা রজমের শাস্তির বিধান রহিত করাতে চেয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে রসূল সা. প্রকাশ্য জনসমাবেশে তাদের কাছ থেকে তাওরাত চেয়ে পাঠালেন। তাওরাত আনা হলো এবং জনৈক ইহুদী আলেম সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে পড়ে শোনালো। তাওরাতের ঐ কপিটায় রজম সংক্রান্ত আয়াত অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্য ঐ দুরাচারী আলেম সংশ্লিষ্ট আয়াতকে হাত দিয়ে ঢেকে রেখে আগের আয়াত ও পরের আয়াত পড়ে ফেললো। আব্দুল্লাহ ইবনে ছালাম (খ্যাতনামা ইহুদী আলেম, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) লাফ দিয়ে এগিয়ে তার হাত সরিয়ে দিলেন এবং রসূল সা. কে দেখিয়ে বললেন, "হে রসূল, এই দেখুন রজমের বিধান সংক্রান্ত আয়াত!"[৫] রসূল সা. এই জালিয়াতির জন্য ঐ ইহুদী আলেমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন এবং এই বলে সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তাওরাতে ঘোষিত 'রজম' এর শাস্তি প্রদান করেন ঃ "আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর আইন ও তার কিতাবের বিধান বাস্তবায়নের পুনপ্রচলন করছি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, মুসলিম, ইহুদী জিম্মীদের ওপর রজম কার্যকর করা সংক্রান্ত অধ্যায়, যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড)

এই ছিল সেকালের ইহুদী আলেমদের কারসাজি। বগলে আল্লাহর আইন চেপে রেখে তারা মনগড়া বাতিল আইন চালু করছিল। আর এহেন চরিত্র নিয়ে তারা আল্লাহর আইনকে আসল ও অবিকৃত অবস্থায় বাস্তবায়ন করতে সংকল্পবদ্ধ রসূল সা. এর পথরোধ করতে চাইছিল। তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই কোরআন বলেছে ঃ "যতক্ষণ তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া বিধানকে চালু করে না দেখাবে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই।" অর্থাৎ যতক্ষণ তোমাদের বিশ্বাসে ও কাজে এমন মারাত্মক বৈপরিত্য বিদ্যমান, ততক্ষণ তোমরা একটা অর্থহীন ও গুরুত্বহীন জনগোষ্ঠী।

ইহুদীদের সর্বব্যাপী বিকৃতির একটা প্রধান লক্ষণ ছিল এই যে, তাদের সমাজ উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আইনের চোখে সমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রভাবশালী লোকদের জন্য ও দুর্বলদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন ছিল।

---

[৫] ইউহান্না (জন) লিখিত ইনজীলে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর জন্য মূল তাওরাতে রজমের বিধানই লিপিবদ্ধ ছিল। জন এর ৮ঃ৫ আয়াতের এই উক্তিটি দেখুন ঃ

"তাওরাতে মূছা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন এ ধরনের মহিলাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করি।" তাওরাতের প্রচলিত সংস্করণগুলোতে ইহুদী মুফাসসির, ফকীহ ও বিকৃতকারীদের মিশ্রণ সত্ত্বেও ব্যভিচারের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা ও প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ "কোন পুরুষ যদি এমন কোন মহিলার সাথে ব্যভিচাররত অবস্থায় ধরা পড়ে, যার স্বামী আছে, তাহলে ঐ দু'জনকেই হত্যা করতে হব।" (ব্যতিক্রম অধ্যায়, আয়াত ২১-২২)

"কোন কুমারী মেয়ে যদি কারো সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং অন্য কোন ব্যক্তি তাকে শহরে পেয়ে তার সাথে সংগম করে, তাহলে তোমরা ঐ দুজনকেই শহরের উপকণ্ঠে এনে পাথর মেরে হত্যা করবে।" (ব্যতিক্রম, অধ্যায় ২২, আয়াত ২৩) ২৬ নং আয়াতেও জোরপূর্বক ধর্ষণকারীর জন্য মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বনু নযীর ও বনু কুরায়যার মধ্যে দুর্বলতা ও সবলতার ভেদাভেদের কারণে বৈষম্যপূর্ণ দিয়াত (হত্যার বদলা হিসাব প্রদেয় অর্থ দন্ড) ব্যবস্থা চালু ছিল। বনু নযীরের কোন লোক বনু কুরায়যার কাউকে হত্যা করলে একশো ওয়াসাক পরিমাণ দিয়াত গ্রহণ করা হতো। পক্ষান্তরে বনু কুরায়যার কেউ বনু নযীরের কাউকে হত্যা করলে পঞ্চাশ ওয়াসাক গ্রহণ করা হতো। রসূলের সা. মদিনায় আসা এবং ইসলামী ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বনু নযীরের এক ব্যক্তি বনু কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারীর পক্ষ দ্বিগুণ দিয়াত দিতে অস্বীকার করলো এবং সমতা মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিল। ইসলামী বিধানের সহায়তা পেয়ে এবার তাদের শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। বাদানুবাদে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে এতদূর গড়ালো যে, উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে উভয় গোত্র তাদের বিরোধকে রসূল সা. এর কাছে নিয়ে যেতে এবং তাঁর মীমাংসা মেনে নিতে সম্মত হয়।

রসূল সা. কোরআনের নির্দেশ অনুসারে দিয়াতের এই বৈষম্যকে চিরতরে রহিত করে সমান করে দিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড, সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড) সেই সাথে কোরআন আল্লাহর সু-বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তনকারীদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয় ঃ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি মোতাবেক বিচার ফায়সালা করেনা, তারা কাফের।" (মায়েদা)

ইসলামের সুবিচার ব্যবস্থা ও দন্ডবিধি (হুদুদ) বাস্তবায়নে যদি শুধু মদিনার ইহুদীরাই অন্তরায় হতো তা হলেও চলতো। আসলে সমস্যা ছিল এই যে, সামগ্রিকভাবে গোটা আরব সমাজেই বৈষম্য বিরাজ করতো। প্রভাবশালী শ্রেণীর জন্য আইন ছিল এক রকম, আর দুর্বল ও সাধারণ লোকদের জন্য অন্য রকম।

মক্কা বিজয়ের সময় বনু মাখযুম গোত্রের ফাতেমা নাম্নী এক মহিলা চুরির দায়ে ধরা পড়লো। সে একটা প্রভাবশালী গোত্রের সদস্য ছিল বলে কোরায়েশের লোকেরা তার ধরা পড়ায় বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা এ কথা ভাবতেও পারছিলনা যে, এমন এক অভিজাত মহিলার ওপরও আইনের সেই শাস্তিই চালু হবে যা সর্ব সাধারণের জন্য বিধিবদ্ধ। তারা পরামর্শক্রমে স্থির করলো, রসূল সা. কে অনুনয় বিনয় করে তাকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এইযে, এই অনুনয় বিনয়টা করবে কে? অনেক ভেবে চিন্তে তারা উসামা বিন যায়েদকে সুপারিশ করতে পাঠালো। উসামা বক্তব্য পেশ করতেই রসূল সা. এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটা শাস্তি সম্পর্কে (রহিত করার) সুপারিশ করতে এসেছ?" শুধু এই কথাটুকু শুনেই উসামা বুঝে ফেললেন। তিনি ক্ষমা চাইলেন। অবশেষে রসূল সা. সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে কোন সবল লোক অপরাধ করলে তা দেখেও না দেখার ভান করা হতো। কিন্তু কোন দুর্বল লোক একই অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে, তবে আমি তার হাতও কেটে

ফেলবো। (সহীহ মুসলিম ঃ দন্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়)

উম্মে হারেসা নাম্নী অপর এক মহিলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ মানসিকতা দেখা দেয়। এই মহিলা একজনের দাঁত ভেংগে দিয়েছিল। মামলা রসূল সা. এর আদালতে নেয়া হলে তিনি কিসাসের (দাঁতের বদলে দাঁত) আদেশ দিলেন। উম্মে রবী (সম্ভবত অপরাধিনীর বোন। কিন্তু এ ব্যাপারে রেওয়ায়াতে অস্পষ্টতা রয়েছে) এ আদেশ শুনে অবাক হয়ে রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, "ওর কাছ থেকেও কিসাস নেয়া হবে? আল্লাহর কসম, এটা সম্ভব নয়।" রসূল সা. বললেন, "ওহে উম্মে রবী! কিসাস তো আল্লাহর বিধান।" কিন্তু ঐ মহিলা তবুও বলতে লাগলো, "আল্লাহর কসম, তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া সম্ভব নয়।" তার বুঝেই আসছিলনা যে, এই পর্যায়ের অপরাধিনীর দাঁত কিভাবে ভাঙ্গা যাবে?

ওদিকে কার্যত উভয় পক্ষ দিয়াতের ব্যাপারে সম্মত হয়ে গেল। এভাবে কিসাসের বিধিও (যার ব্যাপারে দিয়াতের অবকাশও ছিল) পালিত হলো, আবার উম্মে রবীর কথাও ঠিক থাকলো। এ জন্য রসূল সা. রসিকতা করে বললেন, "আল্লাহর এমন বান্দাও আছে, যারা কসম খেলে আল্লাহ নিজেই কসম পূরণ করে দেন।" (সহীহ মুসলিম ঃ কিসাস সংক্রান্ত অধ্যায়)

ইহুদীরা শুধু ইসলামী বিচার বিভাগের কাজেই বাধা দিতনা। বরং সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনের যেখানেই তারা সুযোগ পেত, সেখানেই বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পেত। এর একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এই যে, খয়বর বিজয়ের পর যখন খয়বরের ইহুদীদের আবেদনক্রমে তাদেরকে তাদের যমীতে অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে ভাগচাষী করে রাখা হলো এবং ইসলামী সরকারের তহশীলদার তাদের কাছ থেকে প্রথমবার সরকারের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে গেল, তখন তারা ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করে। দুর্নীতির যে ভয়ংকর রোগে তারা আক্রান্ত ছিল, নতুন প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকেও তাতে জড়িত করতে তারা সচেষ্ট হলো। এই তহশীলদার ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। রসূল সা. এর পাঠানো বিশ্বস্ত তহশীলদার খয়বরের ইহুদীদের ধারণার চেয়ে অনেক উর্ধে ছিলেন। তিনি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোমরা কি আমাকে হারাম খাদ্য খাওয়াতে চাও?" (সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী)

তিনি বলেন, "রসূল সা. আমাকে তোমাদের কাছে এজন্য পাঠাননি যেন আমি তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করি। বরঞ্চ আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের ও মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করার জন্য। তোমরা রাজি থাকলে আমি অনুমান করে অর্ধেক তোমাদেরকে দিয়ে দেই, আর যদি তোমরা চাও, তবে তোমরাই অনুমান করে অর্ধেকটা আমাদেরকে দিয়ে দাও।"

অতপর ইবনে রাওয়াহা মোট ৪০ হাজার ওয়াসাক অনুমান করলেন এবং তা থেকে ২০ হাজার ওয়াসাক মুসলমানদের প্রাপ্য নিয়ে নিলেন। এই ন্যায্য বন্টনে কিছু সংখ্যক নিচাশয় ইহুদী ক্ষেপে গিয়ে বললো, এটা যুলুম। তবে ইনসাফ প্রিয় জনসাধারণ স্বীকার করলো যে, এটাই ন্যায়সংগত। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাই আজীবন এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। (বুখারী, মুযারায়া ও শিরকাত অধ্যায়)

মোটকথা একটা আধা সংগঠিত সমাজকে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করায় ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ইনসাফের নীতিমালার বাস্তবায়নে ধর্ম ও সভ্যতার আদি একচেটিয়া দাবীদার ইহুদী জাতি রসূল সা. কে সহযোগিতা করার পরিবর্তে পদে পদে বাধা দিতে থাকে এবং ইসলামী ব্যবস্থার শেকড়কে প্রাথমিক যুগেই উৎখাত করার অমার্জনীয় অপচেষ্টা চালায়।

রসূলের সা. পরিবারে কলহ্ বাধানোর অপচেষ্টা

মদিনায় বসবাসকারী ইসলামের শত্রুরা রসূলের সা. পরিবারেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে। তাদের দৃষ্টিতে রসূল সা. এর পরিবার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথীদের মধ্যে কলহ্-কোন্দল বাধানোর জন্য এটাই ছিল সব চেয়ে মোক্ষম পন্থা। ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে ঘরোয়া বিবাদে জড়িয়ে ফেলার চক্রান্ত সফল হলে তার ফলাফল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারতো। মদিনার সাধারণ মহিলারা তো এমনিতেই রসূল সা. এর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। তারপর তারা যা কিছুই দেখতো, নারী জাতির স্বভাবসুলভ মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তা সবার কাছে বলে বেড়াতো। এতে করে মোনাফেক ও দুশ্চরিত্র শ্রেণীর লোকেরা ভালোভাবেই জানতে পারতো যে, রসূল সা. এর পরিবারে কি ধরনের ক্ষুধা ও দারিদ্র বিরাজ করে। রসূল সা. এর স্ত্রীগণ অভিজাত পরিবারের মহিলা ছিলেন এবং তাদের রুচি কারো চেয়ে নিম্নমানের ছিলনা। কিন্তু অপর দিকে এই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যে পর্যায়ের ছিল, তাতে রসূল সা. আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকলেও তা তাদের মনোপুত সাবেক মানের চেয়ে অনেক নিম্নে ছিল। রসূল সা. এর সাথে তাঁর স্ত্রীগণও এরূপ পরিস্থিতির ওপর ধৈর্য ধারণ করতেন। তারা এটা বিলক্ষণ বুঝতেন যে, নতুন বিশ্বের স্থপতি যে প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে সর্বাংগীন সুখ-শান্তি আশা করা যায়না। কিন্তু তবু মানুষ মানুষই। মানুষ সব সময়ই তার স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতি ও আশা-আকাংখা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। রসূল সা. এর স্ত্রীগণ ঈমান ও চরিত্রের দিক দিয়ে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও একাত্মতার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত বিশ্বের সামনে পেশ করেছিলেন, তা সত্য। তথাপি একই পরিবারের সদস্যা হওয়ার কারণে তাদের কখনো কখনো পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীসূলভ মানসিকতা দ্বারা সামান্য পরিমাণে হলেও প্রভাবিত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিলনা। এ ছাড়া কোরায়েশ বংশীয়া মহিলাদের মধ্যে স্বামীর ভক্ত ও অনুগত থাকার ঐতিহ্য যতটা কঠোরভাবে পালিত হয়ে আসছিল, সেটা মদিনার মহিলাদের মধ্যে ততটা ছিলনা। মদিনার মহিলারা বরং স্বামীর ওপর বেশ খানিকটা তেজস্বিতা দেখাতো। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ওমরের ন্যায় দোর্দন্ড প্রতাপশালী পুরুষ একবার মদিনায় থাকাকালে যখন আপন স্ত্রীকে ধমক দিলেন, তখন তিনিও সতেজে পাল্টা জবাব দিলেন। এতে অবাক হয়ে গিয়ে হযরত ওমর বললেন, "তুমি আমার মুখের ওপর জবাব দিলে?"

এই সময়ে তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনে মক্কার ঐতিহ্য ও ভাবধারার ওপর মদিনার পরিবেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

মোনাফেক ও দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে এ পরিস্থিতি স্পষ্ট ছিল এবং এর মধ্য দিয়েই তারা চক্রান্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। তারা রসূল সা. এর পরিবারের অভ্যন্তরে বিভেদ ও

বিভ্রান্তির আগুন জ্বালানোর জন্য কিছু সংখ্যক মহিলাকে গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করে। এ ধরনের জনৈকা মহিলার নাম উম্মে জালদাহ। তাঁর কাজ ছিল রসূলের সা. স্ত্রীদেরকে উস্কে দেয়া। এ ধরনের মহিলা গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্রেই হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করা সম্ভব হয়েছিল।

দুশ্চরিত্র লোকদের এ জাতীয় চক্রান্তের ফলে একাদিক্রমে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে, যা খুবই ক্ষতিকর হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য, রসূল সা. এর চরিত্র, বিশিষ্ট সাহাবীদের সহায়তা ও স্ত্রীগণের সৌজন্যের প্রভাবে যথাসময়ে সমস্যার নিরসন হয়ে যায়।

এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা ছিল ভরন পোষণ বাবদ বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য স্ত্রীগণের দাবী। এই দাবীর ফলেই 'ঈলা' (রসূল কর্তৃক স্ত্রীদের সংশ্রব সাময়িকভাবে পরিত্যাগ) সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে রসূল সা. এর পক্ষ নিয়েছিলেন এবং তাদের কন্যাদ্বয়কে উৎসাহ দেয়ার পরিবর্তে কঠোরভাবে ধমকে দিয়েছিলেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ এলো যে ঃ

"হে নবী তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার বিলাসব্যসন চাও, তবে (তা এই বাড়ীতে পাওয়া যাবে না) এস, আমি তোমাদের বিদায়ের পোশাক দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের জীবনকে চাও, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ সৎ কর্মশীলা মহিলাদের জন্য বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব)

বস্তুত রসূল সা. এর স্ত্রীদের সামনে দুটো পথ খোলা রাখা হয়েছিল। দুটো পথের যে কোন একটা তারা গ্রহণ করতে পারতো। স্ত্রীরা আপন মহত্ত্বের গুণে তৎক্ষণাত সাবধান হয়ে গেলেন। যিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অসাধারণ মেধা প্রতিভার কারণে এই দাবীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেই হযরত আয়েশাকেই রসূল সা. সর্ব প্রথম আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত জানালেন। আর হযরত আয়েশাই সর্ব প্রথম ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহ ও রসূল ছাড়া আর কিছু চাইনা। তারপর একে একে অন্য সব স্ত্রীও সর্বান্তকরণে দাবীদাওয়া পরিহার করলেন।

শত্রু পরিবেষ্টিত একটি পরিবারে দুষ্ট লোকদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের ফলে এবং নিকৃষ্ট ধরনের গুপ্তচর মহিলাদের অপতৎপরতার কারণে যদি কোন এক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। বরং এত ষড়যন্ত্রের পরও এই পরিবারটির নিরাপদে টিকে থাকাটাই তার সদস্যদের দৃঢ়তা, একাত্মতা ও মহত্ত্বের লক্ষণ।

এবার বুঝে নিন, রসূল সা. এর চারদিকে কত রকমের ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হচ্ছিল।

হত্যার ষড়যন্ত্র

সত্যের আহ্বান যখন আন্দোলনে পরিণত হয়, তখন তার বৈরী শক্তিগুলো অন্যায় বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্রমাগত হীনতা ও নীচতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মূল দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুক্তিতেও হেরে যায়, এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও সহিংসতার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়, তখন তাদের আজন্ম লালিত ঘৃণা বিদ্বেষ,

গোয়ার্তুমি ও ইতরামি তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণ খুনী ও ডাকাতসুলভ মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়। এই পর্যায়ে এসে তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ ধরনের কুচক্রী শত্রুরা যদি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গদিতে আসীন হয়, তাহলে তারা প্রতিপক্ষের ওপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালায় এবং আইনের তরবারী চালিয়ে বিচারের নাটক মঞ্চস্থ করে মানবতার সেবকদের হত্যা করে। আর ক্ষমতা থেকে যারা বঞ্চিত থাকে, তারা সরাসরি হত্যার ষড়যন্ত্রমূলক পথই বেছে নেয়। মক্কার জাহেলী নেতৃত্ব এই শেষোক্ত পথই বেছে নিয়েছিল। আর এবার মদিনার ভন্ড ধর্মগুরুরাও এই নোংরা পথই বেছে নিল।

হিজরী চতুর্থ সালের কথা। আমর বিন উমাইয়া যামরী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করলো। রসূল সা. এই হত্যাকান্ডের দিয়ত আদায় করা ও শান্তি চুক্তির দায়দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বনু নাযীর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন। সেখানকার লোকেরা রসূল সা. কে একটা দেয়ালের ছায়ার নীচে বসালো। তারপর গোপনে সলাপরামর্শ করতে লাগলো যে, একজন উপরে গিয়ে তাঁর মাথার ওপর বিরাটকায় পাথর ফেলে দিয়ে হত্যা করবে। আমর বিন জাহ্‌হাশ বিন কা'ব এই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। রসূল সা. তাদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে আগে ভাগেই উঠে চলে এলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড; রাহমাতুল্লিল আলামীন ঃ কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী; রসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী ঃ ডক্টর মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ)

কুখ্যাত ইহুদী নেতা কা'ব বিন আশরাফের পিতা ছিল তাই গোত্রের লোক, আর তার মা ছিল বিত্তশালী ইহুদী নেতা আবু রাফে ইবনে আবি হাকীকের কন্যা। এই দ্বিমুখী সম্পর্কের কারণে কা'ব ইবনে আশরাফ আরব ও ইহুদীদের ওপর সমান প্রভাবশালী ছিল। একদিকে সে ছিল ধনাঢ্য, এবং অপরদিকে নামকরা কবি। ইসলামের বিরুদ্ধে তার বুক ছিল বিষে ভর্তি। (ফাতহুল বারীর) অপর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কা'ব একদিকে রসূল সা. কে দাওয়াত দিয়েছিল। অপর দিকে কিছু লোককে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যেন রসূল সা. আসা মাত্রই তাকে হত্যা করে। এই রেওয়ায়াত সূত্রের দিক দিয়ে কিছুটা দুর্বল হলেও কা'বের আক্রোশ ও তার সঠিক তৎপরতার আলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

যে সময় রসূল সা. বনু কুরায়যার সাথে চুক্তি নবায়ন করেন, সে সময় বনু নাযীর রসূল সা. কে খবর পাঠায়, আপনি তিনজন লোক নিয়ে আসবেন। আমরাও তিনজন আলেম উপস্থিত করবো। আপনি এই বৈঠকের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন। আমাদের আলেমরা যদি আপনার বক্তব্য সমর্থন করে, তাহলে আমরা সবাই আপনার প্রতি ঈমান আনবো। রসূল সা. রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানতে পারলেন, ইহুদীরা তাঁকে হত্যার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাই তিনি ফিরে এলেন।

খয়বর বিজয়

খয়বর যুদ্ধের সময় জনৈকা ইহুদী মহিলা যয়নব বিনতুল হারস (ছালাম বিন মুশকিমের স্ত্রী) একটি বকরীর গোশ্‌ত ভুনে রান্না করে এবং তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। এর পরে সে জিজ্ঞেস করে, বকরীর কোন অংশ রসূল সা. বেশী ভালোবাসেন। যখন জানতে পারলো

যে, সামনের পায়ের গোশত বেশী প্রিয়, তখন তাতে আরো বেশী করে তীব্র ধরনের বিষ মেশালো। তারপর সে সেই গোশত রসূল সা. ও তার সাথীদের জন্য উপঢৌকন হিসাবে পাঠালো। রসূল সা. এক লোকমা গোশত মুখে নিলেন (কিছুটা হয়তো গিলেও ফেলেছিলেন) এবং তৎক্ষণাত থুথু করে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, এই গোশত আমাকে বলছে যে, তার সাথে বিষ মিশ্রিত। তারপর নিজেও খেলেন না, সাহাবীদেরকেও খেতে দিলেন না। পরে ঐ ইহুদী মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকারোক্তি করলো। আসলে এই ঘটনার পেছনে ছিল বহু ইহুদীর সম্মিলিত কারসাজি। রসূল সা. যখন সাধারণ জনসমাবেশে তাদের সবাইকে ডেকে কথা বললেন, তখন সবাই স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তারা সুকৌশলে বললো, আমরা আপনাকে যাচাই করতে চাইছিলাম যে, আপনি সত্য নবী হলে প্রকৃত সত্য জেনে ফেলবেন। নচেত আমরা আপনার কবল থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। (সীরাতুন্নবীঃ শিবলী নোমানী, ১ম খন্ড, সূত্র ঃ ফাতহুল বারী)

এই ভোজ সভায় সাহাবাদের মধ্যে হযরত বারা ইবনে মা'রুরও ছিলেন। তিনি গ্রাস মুখে নিয়ে বিষের তীব্রতা অনুভব করলেও বেআদবীর আশংকায় গ্রাস ফেললেন না। ঐ এক গ্রাসেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল। (যাদুল মায়াদ ঃ ২য় খন্ড; শামায়েলে তিরমিযী; আসাহহুস সিয়ার)

তাবুক থেকে ফেরার পর মুসলমানদের বিজয়ে মোনাফেকদের মন ক্রোধের আগুনে ভাজা ভাজা হয়ে গেল। এই সব গোপন দুশমনের আশা ছিল মুসলমানরা পরাজয় বরণ করুক। কিন্তু সে আশা সফল না হওয়ায় তারা রসূল সা. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। এই ষড়যন্ত্রে বারো জন শরীক হয়। তাদের নাম হলো ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, সা'দ বিন আবি সারাহ, আবু ফাতের আরাবী, আমের, আবু আমের রাহেব, জাল্লাস বিন সুয়াইদ, মাজমা বিন জারিয়া, মালীহ তায়মী, হাসান বিন নুমায়ের, তুয়াইমা বিন উবাইরিক, আব্দুল্লাহ ইবনে উয়াইনা ও মুররা বিন রবী।

ষড়যন্ত্র সভায় জাল্লাস বললো ঃ "আজ রাতে আমরা মুহাম্মদকে সা. পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে না দিয়ে ছাড়বোনা, চাই মুহাম্মদ সা. ও তার সাথীরা আমাদের চেয়ে ভালোই হোক না কেন। কিন্তু আমরা যেন ছাগল আর ওরা আমাদের রাখাল হয়ে গেছে। আমরা যেন বোকা আর ওরা বুদ্ধিমান হয়ে গেছে।"

সে আরো বল্লো ঃ "মুহাম্মাদ সা. যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে আমরাতো গাধার চেয়েও অধম।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

আব্দুল্লাহ বল্লো ঃ "আজ রাত যদি জাগো, তবে আজীবন শান্তিতে থাকবে। এই লোকটাকে হত্যা করাই আজ তোমাদের একমাত্র কাজ।"

মুররা বললো ঃ "আমরা যদি শুধু একটা লোককে হত্যা করি তবে সবাই নিরাপদ হয়ে যাবে।"

এই বারোজনের মধ্যে হাসান বিন নুমায়েরের বড় একটা 'কৃতিত্ব' ছিল এই যে, সে দানের সম্পদ ডাকাতি করেছিল।

অপরজন আবু আমের রাহেব দেখতে সুফী, দরবেশ ও সংসার বিরাগী ছিল। কিন্তু সে

মসজিদে যেরারের উদ্যোক্তা ছিল। রোম ও গাসসানের শাসকদের সাথে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো। তার মুত্তাকী সুলভ পোশাকে ভন্ডামি ও দস্কৃতি প্রতিফলিত হতো।

স্থির হয় যে, রসূল সা. পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে নিচে ফেলে দেয়া হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এই বারো জন কুচক্রী রসূল সা. এর সাথে সাথে চলতে লাগলো। রসূল সা. যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছলেন, সবাইকে বললেন, যারা সমতল ভূমির প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে যেতে চায় তারা সেখান দিয়ে যেতে পারে। তিনি নিজের পাহাড়ী পথ ধরে চললেন। সাহাবাদের অনেকেই সমতলের পথ ধরে গেলেন। কিন্তু কুচক্রীরা রসূল সা. এর সাথে থাকলো। রসূল সা. এর দৃষ্টি এমনিতে এত সুক্ষ্ম ছিল যে, অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে যেত এবং গোপন আবেগ অনুভূতিও বুঝে ফেলতেন। মোনাফেকরা তো রসূল সা. এর সামনেই বেড়ে উঠেছে। তাই মোনাফেকদেরকে তাঁর চেয়ে বেশী কে আর চিনবে? তদুপরি গায়েবী ইশারা দিয়েও আল্লাহ তাকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। তিনি হুযাইফা বিন ইয়ামান এবং আম্মার বিন ইয়াসার এই দু'জনকে সাথে নিয়ে পাহাড়ী পথে চললেন। আম্মারকে সামনে রসূল সা. এর উটের লাগাম ধরে চলতে বললেন। আর হুযাইফাকে পেছনে পেছনে চলতে বললেন। বিশেষ জায়গাটা এসে গেলে কুচক্রী দলটি লাফাতে লাফাতে এসে গেল। একে অন্ধকার রাত। তদুপরি দুস্কৃতিকারীরা ছিল মুখোশপরা। রসূল সা. পায়ের আওয়ায পাওয়া মাত্রই সাথী দ্বয়কে নির্দেশ দিলেন, পেছনে যারা আসছে তাদেরকে হটিয়ে দিতে। হযরত হুযাইফা লাফিয়ে চলে গেলেন। তাদের উট দেখে তার থুতনীতে তীর নিক্ষেপ করলেন। তারা হযরত হুযাইফাকে দেখে ভাবলো, ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। অগত্যা পেছনে পালিয়ে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিশে গেল।

হযরত হুযাইফা যখন ফিরে এলেন, তখন রসূল সা. নির্দেশ দিলেন, এখান থেকে উট জোরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।' আর হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওদের চিনেছ? হুযাইফা বললেন, অমুক অমুকের বাহন চিনেছি। কিন্তু মানুষ চিনিনি। রসূল সা. বললেন, তুমি তাদের মনোভাব বুঝেছ? তিনি নেতিবাচক জবাব দিলেন। এরপর রসূল সা. নিজে তাকে জানালেন, ওরা আমাকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল।

পরদিন সকালে রসূল সা. ঐ বারোজন কুচক্রীকে নাম ধরে ধরে তলব করলেন। প্রত্যেকের মনোভাব ও ষড়যন্ত্র পাকানোর সমাবেশে যে যা বলেছিল, তা তাদের সামনে তুলে ধরে প্রত্যেকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন।

তাদের সবার জবাব ছিল কৌতুকপ্রদ। যেমন হাসান বিন নুমায়ের বললো, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলনা যে, আপনি এসব জানবেন। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম, আপনি যথার্থই আল্লাহর রসূল। এ যাবত আমি সাচ্চা মুসলমান ছিলামনা। আজ আমি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম গ্রহণ করলাম।"

প্রত্যেকেই এ ধরনের ছলছুতো ও ওযর বাহানা পেশ করলো। কেউ কেউ মাফ চাইল। রসূল সা. সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। (আসাহ্হুশ্ সিয়ার-মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী)

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একাধিক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল সা. শুধু হযরত হুযাইফাকে গোপনে এই ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের নাম জানিয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের সামনে ফাঁস করেননি। তাছাড়া এই বারো জনের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদও রয়েছে। দু'তিন জন সম্পর্কে অনেকে এ কথাও বলে থাকেন যে, তাদের মধ্যে পরবর্তীকালে আর কোন মোনাফেকীর লক্ষণ দেখা যায়নি।

তবে আসল ঘটনা যথাস্থানে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কোরআনে সেই বিষয়ই বলা হয়েছে যে, "তারা যা করতে চেয়েছিল, তা করতে পারেনি।"

রসূল সা. এর এই মহানুভবতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানবতার সেবার জন্য বিপ্লব সংগঠিত করলেন। অথচ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আসল নাযুক মুহূর্তে কয়েকজন দুস্কৃতিকারী তাঁর সমগ্র কীর্তির মূলোৎপাটনের জন্য তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের সমস্ত অপকর্মের রহস্য ফাঁসও হয়ে যায় এবং তারা স্বীকারোক্তিও করে। অথচ এই মহামানব এত বড় অপরাধকেও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দেন। রসূল সা. কে বলাও হয়েছিল যে, "আপনি এই অপরাধীদের প্রত্যেকের গোত্রকে নির্দেশ দিন তারা যেন ওদের মাথা কেটে আপনার কাছে এনে জমা দেয়।" কিন্তু রসূল সা. জবাব দেন, "আমি পছন্দ করিনা যে আরবরা বলাবলি করুক, মুহাম্মদ সা. কতক লোককে সাথে নিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং বিজয় লাভ করার পর নিজেই সাথীদেরকেই হত্যা করতে আরম্ভ করেছে।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড) এ কথা দ্বারা রসূল সা. বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, এ রকম প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ইসলামী আন্দোলনের আসল শক্তি স্বীয় বৈশিষ্ট বজায় রাখতে পারবেনা। এ জন্য নিজের জীবনের ওপর ঝুকি আসুক, এবং নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র ও নাশকতার মোকাবিলা করতে হোক-তাও তিনি সহ্য করতেন। কিন্তু এটা পছন্দ করতেন না যে, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বল প্রয়োগ করা হোক এবং বিশৃংখলা দেখলেই তা ক্ষমতা ও আইনের জোরে নির্মূল করা হোক। মানব সমাজের শাসন ও ব্যবস্থপনার কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সূক্ষদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়, অনেক স্বার্থ ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং প্রতিকূলতা ও বক্রতা শোধরানোর অনেক কৌশল বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ইসলামী বিপ্লব যে অন্যান্য বস্তুগত বিপ্লবের চেয়ে কঠিন, তার একটি কারণ হলো, এর অত্যন্ত নাযুক ও স্পর্শকাতর নৈতিক প্রাণসত্তাকে প্রতিমুহূর্তে সংরক্ষণ করতে হয়, যাতে এর স্বচ্ছতা কোন সাধারণ ভুলবুঝাবুঝি ও কোন বিরূপ প্রচারণা দ্বারা কলংকিত হতে না পারে।

রসূল সা. এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের ঘটনাবলীর মধ্যে ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদুর আক্রমণও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রকাশ্যে আক্রমণকারীরা শত্রু হলেও তারা বীর হয়ে থাকে। কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে তাকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার পর আক্রমণ করাই ন্যায় সংগত রীতি। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সেই বীরত্ব ও সৎসাহস ছিলনা। এ জন্য তারা গোপন ও কুটিল ষড়যন্ত্রের কাপুরুষোচিত ও নারকীয় পথ অবলম্বন করে। কিন্তু এর চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে জাদুটোনা, মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকের শক্তি প্রয়োগ করে কারো

ওপর আক্রমণ চালানো সেই সব লোকের কাজ যারা কাপুরুষতা ও পাশবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়। ইহুদী নরপশুরা হিংসা ও ক্রোধের আতিশয্যে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে এই জঘন্যতম কাজও করতে দ্বিধা করেনি।

বনী রুযাইক গোত্রের লাবীদ বিন আসেম নামক এক ব্যক্তি ইহুদীদের মিত্র এবং বর্ণচোরা মুসলমান ছিল। তার হাত দিয়েই জাদুর আক্রমণটা চালানো হয়। একজন ইহুদী কিশোর স্বীয় জন্মগত সৎস্বভাবের কারণে রসূল সা. এর প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং তাঁর খিদমত করতো। কতিপয় ইহুদী তাকে বাধ্য করে রসূল সা. এর মাথার চুল ও চিরুনীর দাঁত আনিয়ে নিল। ঐ চুলের ওপর জাদুমন্ত্র পড়ে ১২টা গিরে দিয়ে যারওয়ান নামক এক কূঁয়ার মধ্যে রাখা হলো।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এই জাদুক্রিয়ার ফলে, রসূল সা. এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। একটা কাজ না করেও ভাবতেন যে করেছেন। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ওহির মাধ্যমে তিনি এই জাদুক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হন। সেই চুল বের করা হয় এবং তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান। (তাফহীমুল কুরআন, ২য় খন্ড, টীকা– ১১৪)

এ ঘটনা প্রসংগে একটা বিতর্ক চলে আসছে যে, নবীর ওপর জাদু কার্যকর হতে পারে কিনা? একটা অভিমত হলো, মোটেই হতে পারেনা। এই মত প্রয়োগ করে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছে। অথচ একজন নবীর মানবীয় দেহ যেমন রোগ ব্যাধি, আঘাত, বিষ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি তার মানসিক ক্ষমতাও যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য কার্যকলাপ দ্বারা উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন ফেরাউনের জাদুকরদের জাদু দেখে হযরত মুসার ওপর মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তাদের রশীগুলোকে সাপের আকৃতিপ্রাপ্ত হতে দেখে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ঃ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

"মূসা নিজের মধ্যে ভীতি অনুভব করলো। (সূরা তোয়াহা ঃ ৬৭) তবে নবীদের ওপর জাদুর যে প্রভাবটা হয়না বলা হয়েছে, সেটা হলো, জাদু তাঁর নবীসুলভ তৎপরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনা। তাঁর মনমস্তিষ্কের ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তির ওপর থেকে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারেন না।

এই বিতর্কের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেও এটা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, ইহুদীরা রসূল সা. এর ওপর জাদুর আক্রমণ সত্যই চালিয়েছিল। তাদের এ অপরাধ অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটা বাস্তবতা।

এ সব ঘটনা যখন আমাদের সামনে আসে, তখন আমরা বুঝতে পারি কী কারণে মুসলমানরা মাদানী যুগে রসূল সা. এর জীবনাশংকায় উদ্বিগ্ন ও তটস্থ থাকতো? রাতের বেলা তাঁর কখনো বাড়ীর বাইরে যেতে হলে তাঁর সাথীরা প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হতেন। এই পরিস্থিতির কারণেই হযরত তালহা বিন বারা তার মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতায় ওসিয়ত করেন, আমি রাতের বেলা মারা গেলে কেউ রসূল সা. কে খবর দিওনা। কেননা ইহুদীদের দিক থেকে তাঁর প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। আল্লাহ না করুন, তিনি যেন আমার জানাযায় আসতে

গিয়ে শত্রুদের হাতে কোন আঘাত না পান। কখনো ঘটনা চক্রে রসূল সা. সাহাবীদের চোখের আড়াল হলেই তারা ঘাবড়ে যেতেন এবং তাঁর খোঁজে বের হতেন।

হযরত আবু হুরায়রার একটা প্রসিদ্ধ হাদীস, যাতে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিলেই বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি সুনিশ্চিত বলা হয়েছে, তাতে এই পরিস্থিতির কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে। হযরত আবু হুরায়রা বলেন ঃ

"আমরা রসূল সা. এর চার পাশে বসেছিলাম। আমাদের সেই বৈঠকে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরও ছিলেন। রসূল সা. আমাদের ভেতর থেকে উঠে কোথাও চলে গেলেন এবং অনেক দেরী করলেন। আমরা গভীর উদ্বেগে পড়ে গেলাম যে, রসূল সা. এর সাথে আমরা কেউ না থাকায় তার কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। আমরা সবাই অস্থির হয়ে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সবার আগে আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি তার সন্ধানে বেরিয়েই পড়ি।" (মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, ৩য় অধ্যায়)

খুঁজতে খুঁজতে হযরত আবু হুরায়রা বনু নাজ্জারের জনৈক আনসারীর বাগানে গিয়ে পৌঁছেন। প্রাচীরের চার পাশে ঘুরে দেখলেন কোথাও কোন দরজা আছে কিনা। কিন্তু প্রাচীরটা হয়তো লম্বা ছিল এবং ভীতি ও তাড়াহুড়োর কারণে কোন নিকটতর পথ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে দেখলেন প্রাচীরের নীচ দিয়ে একটা ছোট পানির নালা বেরিয়ে এসেছে। তিনি খুব গুটি গুটি হয়ে (তাঁর নিজের বিবরণ মোতাবেক শৃগালের মত গুটি গুটি হয়ে) নালীর ভেতর দিয়ে প্রাচীরের ভেতরে ঢুকলেন। রসূল সা. কে সেখানে দেখতে পেয়ে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এরপর তাঁর সাথে আবু হুরায়রার কথা হলো। এই সময়েই রসূল সা. সেই বিখ্যাত সুসংবাদ দেন।

একজন বিশিষ্ট সাহাবীর এই বিবরণ পড়ে বুঝা যায় যে, ইহুদী ও মোনাফেকদের প্রতিনিয়ত হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে মদিনার পরিবেশ কী ধরনের ছিল এবং রসূল সা. এর জীবন কি রকম ঝুঁকির মধ্যে ছিল। কিন্তু সেখানে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এত বেশী ছিল যে, একবার এই সব আশংকা ও উৎকণ্ঠার কারণে সাহাবায়ে কেরাম রসূল সা. এর চার পাশে প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রসূল সা. কে যেহেতু আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, والله يعصمك من الناس

"আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন।" (সূরা মায়িদা : ৬৭) তাই তিনি নিজের তাঁবুর ভেতর থেকে মাথা বের কর প্রহরীদের বললেন :

"তোমরা চলে যাও। আল্লাহ নিজেই আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন।" (তফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড)

এই ঈমানই রসূল সা. কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসে গ্রেফতার হওয়া অন্য এক অপরাধীকেও মুক্তি দেয়ার প্রেরণা যোগায়। তিনি বলেছিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও। কেননা সে আমাকে হত্যা করতে চাইলেও করতে পারতোনা।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর)

একটু ভেবে দেখুন, মানবতার প্রাসাদের এই মহান স্থপতি কত উদার মনের অধিকারী ছিলেন যে, তার বিরুদ্ধে চারদিকে ক্রমগত হত্যার ষড়যন্ত্র চলতে থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পর্বতের মত স্থির ও অবিচল। মদিনায় কতকগুলো মাকড়সা যেন ক্রমাগত জাল বুনে চলছিল এই দুঃসাহসী শার্দুলকে ধরার জন্য।

ওদিকে মক্কার, আগ্নেয়গিরিও ক্রমেই বিস্ফোরনমুখ হয়ে উঠছিল। মক্কার বুকের ভেতরে পাশবিকতা ও হিংস্রতার লাভা ক্রমেই জোরদার হচ্ছিল। হিজরতের প্রাক্কালে রসূল সা. কে হত্যার যে বিরাট সম্মিলিত ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, সেটা হিজরতের পর বড় বড় আগ্রাসী যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু তাদের সেই সব প্রকাশ্য আগ্রাসনের ব্যর্থতা হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র পাকাতে প্ররোচনা দিচ্ছিল।

বদরের যুদ্ধে রসূল সা. এর ক্ষুদ্র মুসলিম দলটি জাহেলিয়তের সন্তানদের এমন উচিত শিক্ষা দিয়েছিল যে, তার ব্যথা তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। মক্কার কোন পরিবারই এমন ছিলনা, যার বাছাই বাছাই জোয়ান কিংবা সরদার এই যুদ্ধে মারা যায়নি। কিন্তু হাতে গনা কয়েকজন সহায় সম্বলহীন বিপ্লবী মুসলমানের হাতে মার খেয়ে তখন উহ্ আহ্ করাটাও অধিকতর লজ্জার কারণ ছিল। তাই কোরায়েশ নেতারা এই মর্মে আদেশ জারী করিয়ে দিয়েছিল যে, বদরের নিহতদের জন্য কোন শোক মা'তম করা যাবেনা। এই লড়াইতে আসওয়াদের তিন ছেলে নিহত হয়েছিল। শোকে তার কলিজা চৌচির হবার উপক্রম হলেও সে মুখে টুশব্দটিও করতে পারছিলনা। একদিন পাশের এক বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ শুনে ভৃত্যকে পাঠালো, যাও, কাঁদার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিনা জেনে এসো। ভৃত্য খোঁজ খবর নিয়ে এসে জানালো যে, এক মহিলার উট হারিয়ে যাওয়ায় সে কাঁদছে। এই খবর শুনে আসওয়াদ তার আবেগকে আর ধরে রাখতে পারলোনা। সে স্বতস্ফুর্তভাবে একটা কবিতা আবৃত্তি করে ফেললো। এই কবিতাটা আরবী সাহিত্যে বিশেষ কদর লাভ করেছে। এর তিনটে লাইনের অনুবাদ নিম্নরূপ :

"একটা উট হারিয়ে যাওয়ায় ঐ মহিলা কাঁদছে এবং তার ঘুম হারাম হয়ে গেছে? উটের জন্য কেঁদনা। কাঁদতে হলে বদরের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য কাঁদো। কাঁদতে হলে আকীলের জন্য কাঁদো। কাঁদতে হলে বীরকেশরী হারেসের জন্য কাঁদো।"

মক্কার এহেন শোকাতুর পরিবেশে উমাইর বিন ওহাব ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া এক জায়গায় বসে বদরের নিহতদের জন্য কাঁদছিল। সাফওয়ান বললো ঃ এখন আর বেঁচে থাকার কোন মজা নেই। উমাইর বললো ঃ আমি যদি ঋণগ্রস্ত না থাকতাম এবং আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাবনা না থাকতো, তাহলে এক্ষুনি গিয়ে মুহাম্মদকে সা. হত্যা করে আসতাম। আমার ছেলেটাও এখনো মদিনায় বন্দী। সাফওয়ান তার ছেলে মেয়ে ও ঋণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করলো। উমাইর তৎক্ষনাত বাড়ীতে এসে তলোয়ারে বিষ মেখে নিল এবং মদিনা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। মদিনায় পৌঁছার পর তার মুখমন্ডলের হাবভাব দেখে হযরত ওমর তার মনোভাব বুঝে ফেললেন এবং ঘাড় ধরে রসূল সা. এর কাছে নিয়ে এলেন। রসূল সা. ওমরকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তারপর কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বললো, ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। জিজ্ঞেস করলেন, তলোয়ার ঝোলানো কেন? উমাইর বললেন, তাতে কী হয়েছে। তলোয়ার বদরে কোন্ কাজে লেগেছে?

এবার রসূল সা. তার মনের গোপন কথাটা বের করে তার সামনে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, "তুমি ও সাফওয়ান একটা কক্ষে বসে আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছ। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের এ ষড়যন্ত্র সফল হতে দেননি।"

কথাটা শুনে উমাইর হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে বললো, "আল্লাহর কসম, আপনি সত্যই নবী। আমি ও সাফওয়ান ছাড়া আর কেউ এ বিষয়টা জানতোনা।"

উমাইর মুসলমান হয়ে মক্কায় ফিরলো। সে সাহসিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বহু লোককে মুসলমান বানিয়ে ফেললো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

মক্কা বিজয়ের সময় ফুযালা বিন উমাইরও প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে মনে মনে রসূল সা. কে হত্যা করার সংকল্প নিল। রসূল সা. কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলেন। সহসা ফুযালা আবির্ভূত হলো। কাছে এলে রসূল সা. ডাকলেন, "কে, ফুযালা নাকি?" সে জবাব দিল, "জ্বী, ফুযালা।" রসূল সা. বললেন। "তুমি মনে মনে কী মতলব এঁটেছ? ফুযালা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, "কিছুই না, আমি তো আল্লাহকে স্মরণ করছি।"

রসূল সা. তার জবাব শুনে হেসে দিয়ে বললেন, "আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।" এই কথাটা বলার সাথে সাথে তিনি ফুযালার বুকের ওপর হাত রাখলেন। সংগে সংগে তার মন স্বাভাবিক হয়ে গেল। ফুযালা বলেন, রসূল সা. আমার বুকের ওপর থেকে হাত তুলে নেয়ার পর আল্লাহর সৃষ্টি জগতে রসূল সা. এর চেয়ে আর কেউ আমার কাছে প্রিয় ছিল না।" এই মনস্তাত্বিক বিপ্লবের পর ফুযালা বাড়ী ফিরে গেল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)

শুধু মক্কা নয়, সমগ্র আরবের বিজেতাকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যে এলো, সে নতুন জীবন নিয়ে ফিরে গেল। যেই এসেছিল আঘাত হানতে, সে বরং নিজের ক্ষত স্থান সারানোর মলম নিয়ে চলে গেল।

কোরায়েশ, ইহুদী, মোনাফেক-সবাই নিজ নিজ সাধ্যমত চক্রান্ত চালিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ নিজের ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং তাঁর বান্দা ও রসূলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করলেন।

এই সব ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল এক ব্যক্তিকে হত্যা করা ছিলনা, বরং এরা সবাই হত্যা করতে চেয়েছিল গোটা ইসলামী আন্দোলনকে। সত্য ও ন্যায়ের সেই উজ্জ্বল প্রভাতকে তারা বদ্ধভূমিতে পাঠাতে চেয়েছিল, যার আবির্ভাব ছিল অন্ধকারের জন্য মৃত্যুঘন্টা। যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা শত শত বছরের শোষিত নির্যাতিত মানুষকে প্রথম বারের মত জীবনের স্পন্দন, সাম্য, স্বাধীনতা ও মান মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছিল, সেই নজীরবিহীন চমৎকার সমাজ ব্যবস্থাকে তারা গলা টিপে মারতে চেয়েছিল।

সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতা

ওপরে আমি মদিনার ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলোর যে সব অপতৎপরতার উল্লেখ করেছি, তা নৈতিক ও আইনগত দিক দিয়ে জঘন্যতম অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এগুলোর দায়ে যদি কঠোরতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, তাহলে ধর্ম ও রাজনীতির আলোকে তা হতো সর্বোত্তম ন্যায়বিচার। কিন্তু রসূল সা. অত্যন্ত শান্ত ও ধৈর্যশীল আচরণ করলেন। যে আন্দোলনের আসল লক্ষ্য হয় মানবতার নৈতিক সংশোধন ও পুনর্গঠন, তা ক্ষমতা ও আইনের অস্ত্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে পারেনা। মানুষ যতই হীনতা ও পাশবিকতা প্রদর্শন করুক, ইসলামী আন্দোলন কখনো মানুষের স্বভাব সম্পর্কে হতাশ হয় না, বরং দীর্ঘমেয়াদী আশাবাদের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। এর আসল শক্তি হয়ে থাকে

শেখানো, বোঝানো ও পড়ানো, শাস্তি দেয়া ও হুমকি ধমকি দেয়া নয়। শাসন ক্ষমতা ও আইনের শক্তি কিছু না কিছু প্রয়োগ না করে তো কোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারেনা। কিন্তু মানুষের চরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তনের কাজ তরবারী ও লাঠি দিয়ে হয়না, নৈতিক আবেদন ও যুক্তি দ্বারা হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধের পরিবর্তে সংযম এবং প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে। মানবতার সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু রসূল সা. ইতিহাসের পরিমণ্ডলকে নৈতিক সদাচারের আলো দিয়ে উদভাসিত করতে চেয়েছিলেন এবং শত্রুদের বাড়াবাড়ি ও কুটিল চক্রান্তকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য দ্বারা জয় করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসে এত বড় ক্ষমার কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যায়না যা তিনি এ ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন। রসূল সা. বহু বছরের চেষ্টা সাধনা দ্বারা যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছিলেন, গুটিকয় লোক তাকে হাঙ্গামা ও গোলযোগ বাধিয়ে ধ্বংস করে দিতে চাইল। আইন শৃংখলা ও প্রশাসনকে অচল করে দিতে চাইল। হত্যার ষড়যন্ত্র পাকালো এবং নিকৃষ্টতম পন্থায় উত্যক্ত করলো। অথচ সারা পৃথিবী মধ্যে নিজস্ব মডেলের প্রথম নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের এই রাষ্ট্রপ্রধান বিপর্যয় ও ষড়যন্ত্রের তান্ডবের মধ্য থেকে অত্যন্ত শান্তভাবে, তরংগমালাকে একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে নিজের নৌকাকে নিরাপদ স্থানে বের করে নিয়ে গেলেন।

এতদসত্ত্বেও বৈরী শক্তিগুলো অপরাধ প্রবণতা ও পাপাচারের শেষ সীমা পর্যন্ত না গিয়ে ছাড়লোনা। তারা একবার নয়, বারবার বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করলো এবং তাও চরম ধৃষ্টতা সহকারে খোলাখুলিভাবেই করলো। একটা সাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে যে রাষ্ট্রের তারা নাগরিক হয়েছে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক–উভয় দিক দিয়েই যে তার আনুগত্য করা তাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে, তার কোন তোয়াক্কাই তারা করলোনা। বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ এমন এক কাজ, যার শাস্তি কোন কালেই নাগরিকত্ব হরণ ও মৃত্যুদন্ডের চেয়ে কম ছিল না এবং আজও নেই। কিন্তু যিনি সভ্যতার ভাগ্য পরিবর্তন করতে এসেছিলেন, তিনি এত বড় ও গুরুতর অপরাধেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন, যাতে বৈরী শক্তির মধ্যে ভদ্রতা চেতনার উন্মেষ ঘটে, তাদের চিন্তাশক্তি জেগে ওঠে, তারা যুক্তির দিকে ফিরে যায়, এবং একবারে নাহোক, দু'বারে না হোক, তৃতীয়বারে যেন শুধরে যায়। কিন্তু যারা বাঁকা পথে চালিত হয়ে গিয়েছিল, অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে তাদের চোখ ব্যর্থতার গহবরে পতিত না হওয়া পর্যন্ত খোলেনি।

ধ্বংসাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার কয়েকটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমি এখানে পেশ করছি, যা দ্বারা বুঝা যাবে, সত্য ও ন্যায়ের বিধান প্রতিষ্ঠাকারীদের কত কঠিন ও কণ্ঠকাকীর্ণ পথ ধরে চলতে হয়।

এ কথা সুবিদিত যে, আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের বৈঠকে যে সব একনিষ্ঠ মু'মিন বান্দা রসূল সা. এর হাতে হাত দিয়ে অংগীকার করেছিল, তারা একথা বুঝে শুনেই করেছিল যে, রসূল সা. এর মদিনায় যাওয়া এবং সেখানে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়। এ ঘটনা নানা কারণে কোরায়েশদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা প্রচন্ড আবেগে ও উত্তেজনায় বেসামাল হয়ে অস্ত্র ধারণ করবে। এ

কারণে এ বিষয়টাও স্পষ্ট ছিল যে, রসূল সা. এর জীবন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের অস্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের অন্যান্য কেন্দ্রের সংরক্ষণ আল্লাহর সাহায্যের অধীনে পুরোপুরি মদিনাবাসীর সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যেই রসূল সা. আনসারদের প্রতিনিধি ও কর্মঠ যুবকদের কাছ থেকে অংগীকার নেন এবং এই উদ্দেশ্যেই হিজরতের প্রথম বছরেই সব কয়টা ইহুদী গোত্রের সাথেও চুক্তি সম্পাদন করেন। আনসারগণ তো সামগ্রিকভাবে নিজেদের অংগীকার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কিতাবের আমানতদার ও নবীদের উত্তরাধিকারীরা এবং তাদের ভক্তরা নিজেদের কৃত এইসব চুক্তিকে বারংবার লংঘন করেছে।

সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা এই যে, মক্কার কোরায়েশরা মোনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে যোগ্যতম ব্যক্তি বুঝতে পেরে তাকে একটা গোপন চিঠি পাঠালো। এই চিঠির মাধ্যমে তারা মদিনার সমস্ত দুষ্কর্মপ্রবণ, উচ্ছৃংখল ও দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে নিজেদের প্রভাবাধীন করার জন্য একটা সর্বাত্মক বার্তা পাঠায়। চিঠিতে তারা লেখে :

"তোমরা আমাদের লোককে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. কে) আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, হয় তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল, নচেত মদিনা থেকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবো, তোমাদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীদের প্রমোদ সংগিনী বানাবো।" (সুনানে আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যদি সৎ ও ঈমানদার লোক হতো, তাহলে এই চিঠি তৎক্ষণাত রসূল সা. এর কাছে পৌঁছাতো এবং সে আন্তরিকভাবে কামনা করতো যে, কোরায়েশের হুমকির মোকাবিলায় সমগ্র মদিনাবাসীর আত্মমর্যাদাবোধকে সংগঠিত করা হোক। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তার মজ্জাগত। সে তার ক্ষমতা হারানোর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কোরায়েশের অভিলাষ পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর হলো। সে জানতো, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী রয়েছে। কিন্তু এই চিঠির রহস্য শীঘ্রই ফাঁস হয়ে গেল এবং স্বয়ং রসূল সা. ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তিনি নিজেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কাছে চলে গেলেন এবং তাকে বুঝালেন, স্বয়ং তোমাদেরই ছেলে, ভাতিজা ও ভাগ্নেরা যৌবনের পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইসলামের পতাকা বহন করে চলেছে। কোন অনাকাংখিত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দেখে নিও, তোমাদেরই সন্তানরা তোমাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের সন্তানদের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কথাটা বুঝলো এবং তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলো। উল্লেখ্য যে, বদরের যুদ্ধের পর কোরায়েশরা পুনরায় এ ধরনের একটা চিঠি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কাছে পাঠিয়েছিল।

এই কুচক্রী নেতা এক চরম নাযুক মুহূর্তে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতক সুলভ একটা কাজ করে বসলো। ইহুদী গোত্র বনু নযীরের বারংবার ওয়াদাখেলাপী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের কারণে যখন তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরম পত্র দেয়া হলো, এবং বনু নযীর এ জন্য প্রস্তুতিও নিতে লাগলো, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদেরকে বার্তা পাঠালো, খবরদার! তোমরা এই আদেশ মানবেনা এবং নিজ বাড়ীঘর ত্যাগ করবেনা।

আমি তোমাদেরকে দু'হাজার লোক দিয়ে সাহায্য করবো। একদিকে ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা তোমাদের সাহায্য করবে, অপর দিকে আরব মোশরেক গোত্র বনু গিতফান তো তোমাদের মিত্র আছেই। এই আশ্বাসের ফল দাঁড়ালো এই যে, বনু নযীর রসূল সা. কে জানালো, "আমরা এখান থেকে যেতে পারছিনে। আপনি যা ইচ্ছে করুন।" অবশেষে ইসলামী সরকারকে বাধ্য হয়ে নিজের হুকুম বাস্তবায়িত করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

এরপর এই লোকটি ওহুদ যুদ্ধের অতীব নাযুক ও সিদ্ধান্তকরী মুহূর্তে নগ্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বেরিয়ে 'শুতা' নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই সে তিনশো মোনাফেককে সাথে নিয়ে মদিনায় ফিরে গেল। এ কাজটা মুসলিম বাহিনীর পিঠে ছুরিকাঘাত সমতুল্য ছিল। সে বললো, আমাদের মতামত অনুসারে যখন কাজ করা হয়না এবং ক্ষমতা যখন অন্যদের হাতে কেন্দ্রীভূত, তখন আমরা খামাখা জীবন দেব কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মত ছিল মদিনার বাইরে না গিয়ে মদিনার ভেতরে বসেই লড়াই করার পক্ষে। (আসাহহুস্ সিয়ার! আব্দুর রউফ দানাপুরী)

বিশ্বাসঘাতকতামূলক যোগসাজশের দিক দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল আবু আমের। মসজিদে যেরার প্রসংগে তার পরিচিতি ইতিপূর্বেই দিয়েছি। বদরের যুদ্ধে রসূল সা. এর বিজয়ের সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে এই কুচক্রী মক্কা সফর করে এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাত করে প্রতিশোধ গ্রহণের উসকানি দেয়। এভাবে ওহুদ যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে সেও অবদান রাখে। সে নিজেও কোরায়েশী বাহিনীর সহযোগিতায় যুদ্ধে নামে। তার ধারণা ছিল, তার কথায় আওস গোত্র ইসলামের সহযোগিতা পরিত্যাগ করে কোরায়েশদের পক্ষ নেবে। সে যুদ্ধের ময়দানে আওসীদেরকে ডাকলো। কিন্তু যে জবাব পেল, তাতে তার ভ্রান্তি দূর হয়ে গেল। অন্যরা দূরে থাক, স্বয়ং তার ছেলে হযরত হানযালা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রসূল সা. এর নির্দেশে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ওহুদের পর সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গেল তাকে মদিনা আক্রমণ চালাতে প্ররোচনা দেয়ার জন্য। এদিকে মোনাফেকদেরকেও সে গোপন আশ্বাস দিল যে, তোমরা প্রস্তুত থেক, আমি সহায়ক বাহিনী নিয়ে আসছি। এই লোকটি হুনায়েনের নিকটে রসূল সা. কে কষ্ট দেয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়েছিল। রসূল সা. একটা গর্তে পড়ে গিয়ে বেশ ব্যথা পান। (আসাহহুস সিয়ার ও সীরাতুন্নবী : শিবলী)

তৃতীয় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ছিল কা'ব বিন আশরাফ। এর সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই ব্যক্তি একদিকে বেতন দিয়ে দিয়ে মদিনায় ভাড়াটে দালাল বাহিনী সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে মক্কাবাসীকে মদিনার ওপর হামলা চালাতে উস্কানি দিত। এ উদ্দেশ্যে সে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থ সম্পদ ও কবি প্রতিভাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতো। তার প্ররোচনায় আবু সুফিয়ান ও অন্যান্যরা কাবার গেলাফ ধরে প্রতিশোধ গ্রহণের অংগীকার করে।

এই ষড়যন্ত্রপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানগণ বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। রসূল সা. নিজেও রাত জাগতেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে পালাক্রমে রাত জেগে পাহারা দিতে আদেশ দিতেন। এই সময়কার একটি ঘটনা এই যে, তিনি একবার সমাবেশে

বললেন, "আজ কোন সুযোগ্য লোক পাহারা দিক।" এ কথা শুনে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে সারা রাত পাহারা দিলেন। এই সময় সাহাবীগণ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত অস্ত্র নিয়ে ঘুমাতেন। সম্ভবত এই সময়ই তিনি বলেছিলেন :

"আল্লাহর পথে একদিন পাহারা দেয়া গোটা পৃথিবী ও তার ভেতরকার যাবতীয় সহায় সম্পদের চেয়েও উত্তম।" (মিশকাত)

তিনি আরো বলেন : "একদিন ও একরাত আল্লাহর পথে পাহারা দেয়া একমাস রোযা ও একমাস রাত জেগে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।" (ঐ)

এই পাহারা দানের কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, এর সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তেই থাকে এবং কবর আযাব থেকেও তা রেহাই দেয়। (রিয়াদুস্ সালেহীন)

মদিনার এই সব বর্ণচোরা পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাতের সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ পেত জেহাদের সময়। রসূল সা. মদিনায় যে দশ বছর কাটান, তার বেশীর ভাগ সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে কাটান। কিন্তু হক ও বাতিলের সংঘর্ষ যখনই পুরোদস্তুর যুদ্ধের রূপ ধারণ করতো (স্বল্প বিরতি দিয়ে বারবার এরূপ হয়েছে), তখন ইহুদী ও মোনাফেকরা ষড়যন্ত্র শুরু করে দিত। অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি এই সব যুদ্ধবিগ্রহ ও গৃহশত্রু বিভীষণদের অপতৎপরতা মিলিত হয়ে এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সৃষ্টি করতো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রহরীদের জন্য।

ওহুদের ঘটনা আমরা একটু আগেই বলেছি যে, ইসলামী বাহিনী রণাঙ্গনে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ষড়যন্ত্রের হোতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তিনশো যোদ্ধাকে নিয়ে মদিনায় চলে যায়। রসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের স্থলে অন্য কোন বস্তুবাদী শক্তি যদি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হতো, তাহলে হিম্মত হারিয়ে তৎক্ষণাত রণে ভংগ দিত। কেননা শত্রু বাহিনীর সংখ্যা যেখানে তিন হাজার, সেখানে তাদের মোকাবিলায় গমনরত মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট এক হাজার। এর মধ্য থেকে আবার তিন শো ফেরত গেল। বাদবাকী সাত শোর মধ্যেও কিছু বর্ণচোরা মোনাফেক ছিল। এ পরিস্থিতিতে বনু সালমা ও বনু হারিসার মোজাহেদরা ফেরত যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সাহাবীদের উপদেশে তারা সাহস ফিরে পায় এবং ময়দানে টিকে থাকে। আল্লাহর ওপর ঈমান, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস, নৈতিক শক্তির সাফল্যের ধারণা এবং গায়েবী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা– এ সবই ছিল ইসলামী বাহিনীর আসল পুঁজি। ফলে তাদের মনে আর কোন দুর্বলতা থাকলোনা। পূর্ণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারা ওহুদের ময়দান অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তারপর ওহুদের ময়দানে যখন মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং রসূল সা. এর শাহাদাতের গুজব রটে গেল, তখন মোনাফেকরা প্রস্তাব দিল, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হাতে পায়ে ধরে ফিরিয়ে এনে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দিতে অনুরোধ করা হোক। এই ময়দানে মুসলমানদের কিছু ত্রুটি সংশোধনের জন্য আল্লাহ যে এক ধরনের পরাজয় দিলেন, তা নিয়ে মোনাফেকরা বলতে লাগলো, উনি যদি নবী হতেন, তা হলে পরাজিত হতেন না। এতো দুনিয়ার অন্যান্য রাজা বাদশার মত অবস্থাই হলো যে, কখনো জয় কখনো পরাজয়। এই অপপ্রচারের ফলে মুসলমানদের কারো কারো মধ্যে কিছু কিছু সন্দেহ সংশয় সৃষ্টিও হলো। কেউ কেউ এভাবে চিন্তা

করতে লাগলো যে, আল্লাহর নবীর নেতৃত্বে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়েও পরাজয় বরণ করতে হলো, এ কেমন কথা? এর জবাবে কোরআনে বলা হয়েছে, "এ বিপর্যয় তোমাদেরই সৃষ্টি।" অর্থাৎ তোমাদেরই ত্রুটির ফল।

এরপর প্রতিটি যুদ্ধেই শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে গোপন শত্রুরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে। যেখানে বাস্তবে কিছু করা সম্ভব হয়নি, সেখানে অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চলেছে।

পঞ্চম বাহিনী নিজেদের কারসাজি সবচেয়ে বেশী দেখিয়েছে খন্দক যুদ্ধের সময়। বদরের যুদ্ধে কোরায়েশদের শক্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে হামলা চালায় এবং ওহুদের যুদ্ধ হয়। কিন্তু তারা তাদের বিজয়কে পূর্ণতা না দিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য নয়। ৫ম হিজরীতে তারা নিজেদের, মদিনার ষড়যন্ত্রীদের এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে উস্কিয়ে আনা বিপুল এক বাহিনী নিয়ে মদিনাকে ঘিরে ফেলে। এটা ছিল চূড়ান্ত যুদ্ধ। এরপর কোরায়েশ ও অন্যান্য শত্রুদের শক্তি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর মুসলমানরা আত্মরক্ষার নীতি পরিত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদেরকে নিস্তেজ করার জন্য আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে। বস্তুত খন্দক যুদ্ধের সমাপ্তির দিনেই মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই চূড়ান্ত লড়াই বাধাতে যে সব কুচক্রী মহল সর্বাধিক অবদান রেখেছিল তাদের মধ্যে বনু নযীরের ইহুদীরা অন্যতম। এদের মধ্যে যারা খয়বরে গিয়ে অবস্থান করছিল, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ছিল। তারা যখন জানতে পারলো, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এবং কোরায়েশরা পুরো বিজয়ী না হলেও যথেষ্ট দাপট দেখিয়ে এসেছে তখনই তারা সক্রিয় হয়ে ইতিহাসের গতিধারাকে তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নিল। বন নযীরের ছালাম ইবনে আবিল হাকীক, ছালাম বিন মুশকিম, হুয়াই বিন আখতাব, কিনানা বিন রবী প্রমুখ নামকরা সরদাররা বেরিয়ে পড়লো এবং বনু ওয়ায়েলের হাওযা বিন কায়েস, আবু ইমারা এবং অন্যান্যদেরকে সাথে নিল। মক্কায় গিয়ে তারা কোরায়েশদেরকে মদিনা আক্রমণ চালাতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাস দিল। এরপর তারা বনু গিতফানের কাছে গিয়ে তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করলো। এরপর অন্যান্য গোত্রের কাছেও ঘোরাফিরা করলো। কেরায়েশরাও অন্যান্য গোত্রকে সংঘবদ্ধ করলো। এভাবে দশ হাজার সৈন্য মদিনাকে অবরোধ করলো। (আসাহ্হুস সিয়ার, সীরাতে ইবনে হিশাম)

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হুয়াই বিন আখতাব কা'ব বিন আসয়াদের সাথে যোগসাজ করে রসূল সা. এর সাথে কৃত বনু কুরায়যার চুক্তি ভাঙ্গালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম) এ খবর শুনে মুসলমানরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলো। তারা যে কোন মুহূর্তে বনু কুরায়যার হামলার আশংকা করতে লাগলো। শিশু ও মহিলাদের রক্ষার জন্য রসূল সা. তিনশো সৈনিক নিয়োগ করলেন। ওদিকে মোনাফেকরা অনিশ্চয়তা ও ভয়ভীতি সৃষ্টিকারী গুজব ছড়াতে লাগলো এবং তাদের অনেকে পরিবার পরিজনকে রক্ষার নামে ঘাঁটি থেকে ভেগে যেতে লাগলো। তারা এভাবে অপপ্রচার শুরু করে দিল যে, "একদিকে তো মুহাম্মাদ সা. আমাদেরকে রোম ও পারস্যের সাম্রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখান, অপরদিকে আমাদের

অবস্থা হলো, আমরা নিরাপদে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতেও যেতে পারিনা।" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

একবার এমনও হলো যে, লড়াই এর সময় যখন মহিলাদের থাকার জায়গার হেফাজতের সন্তোষজনক ব্যবস্থা হয়নি, তখন তার আশেপাশে একজন ইহুদীকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। হযরত সফিয়া বিনতে আব্দুল মোত্তালেব একখানা কাঠ নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদের জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য তারা পেয়েছিলেন। প্রথমত খন্দকের নতুন প্রতিরক্ষা কৌশল, দ্বিতীয়ত কোরায়েশ ও বনু কুরায়যার যোগসাজশ ছিন্ন করার ব্যাপারে নঈম বিন মাসউদের বিস্ময়কর দক্ষতা, তৃতীয়ত রসূল, তাঁর সুপ্রশিক্ষিত নেতৃবৃন্দ ও গোটা মুসলিম জামায়াতের বলিষ্ঠ মোজাহেদ সুলভ ভূমিকা এবং চতুর্থত আল্লাহর প্রেরিত আকস্মিক ঘুর্ণিঝড় শত্রু বাহিনীকে ময়দান থেকে পিটিয়ে বিদায় করলো।

এ ধরনের আর একটা ঘটনা ছিল তবুক অভিযান। মদিনার কুচক্রী পঞ্চম বাহিনী এ সময় তাদের সুনিপুন কলাকৌশলের কিছু উচ্চতর নমুনা প্রদর্শন করে। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস রসূল সা. এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাওয়ার পর থেকেই ক্ষিপ্ত ছিল। মাঝে ষড়যন্ত্রের হোতারাও সম্রাটের দরবারে পৌঁছে তাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে। এই হিরাক্লিয়াস সম্পর্কে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, মদিনা আক্রমণ করার সে জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে।

মদিনায় তখন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সময়টা ছিল দুর্ভিক্ষের। তবে গাছে গাছে ফল পেকেছে। প্রচন্ড গরম আবহাওয়া। বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে অনেক দূরে পাঠাতে হবে। অথচ সরকারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, উট-ঘোড়া ও রসদপত্রের নিদারুণ অভাব। এ কারণে তবুক অভিযাত্রী বাহিনীকে "জাইশুল উছরাহ" 'সংকটকালীন বাহিনী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে এবং এ লড়াইতে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম অনুমান করে মোনাফেকরা অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করলো। নানা রকমের মিথ্যা ওযর দেখিয়ে তারা ঘরে বসে রইল। এদিক থেকে একে "গুয্ওয়ায়ে ফাদেহা" অর্থাৎ মোনাফেকদের "মুখোস উন্মোচনকারী অভিযান" নামেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মোনাফেকরা কী কী ধরনের হাস্যকর ওযর আপত্তি পেশ করতো তার একটা চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায় জাদ্দ ইবনে কায়েসের কাছ থেকে। সে এসে রসূল সা. কে বললো, "লোকেরা জানে আমি নারীদের প্রতি একটু বেশী আবেগ প্রবণ। আমার আশংকা যে, সুন্দরী রোমক নারীদের দেখে আমি প্রলুব্ধ হয়ে যাবো। তাই আমাকে বাড়ীতে থাকার অনুমতি দিন।" এই সব মোনাফেক শুধু নিজেরাই জেহাদে যাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকতোনা, বরং অন্যদেরকেও বলতো, "আরে, ঘরে বসে আল্লাহ আল্লাহ কর। পাগল হয়ে গেছ নাকি যে, এমন টাকফাটা গরমে জেহাদ করতে যেতে চাও? সুয়াইলিম নামক ইহুদীর বাড়ীতে তাদের সলাপরামর্শের আড্ডা বসতো। সেখানে যারা আসতো, তাদের জেহাদে যেতে নিষেধ করা হতো। শেষ পর্যন্ত এই আড্ডাখানাটা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়।

ওদিকে সদাতৎপর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সানিয়াতুল বেদা নামক স্থানে ইহুদী ও মোনাফেকদের সমন্বয়ে গঠিত আলাদা একটা বাহিনী অসদুদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে গড়ে তুললো। এ বাহিনীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তবে এ বাহিনী রসূল সা. এর সাথে যাত্রা করতে পারেনি।

বাহিনী যাত্রা শুরু করার পর তারা আরো একটা বিভ্রাট সৃষ্টি করলো। রসূল সা. স্বীয় পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আলীকে মদিনায় রেখে এসেছিলেন। মোনাফেকরা তা দেখে অপপ্রচার শুরু করে দিল, আজকাল মুহাম্মাদ সা. এর মন আলীর প্রতি প্রসন্ন নয়। সে জন্যই তাকে সাথে নেননি। হযরত আলীর আত্মমর্যাদাবোধ এতে প্রচন্ড ধাক্কা খেল, তিনি তৎক্ষণাত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রসূল সা. সাথে মিলিত হলেন এবং মোনাফেকদের উস্কানিমূলক তৎপরতার বিবরণ দিলেন। রসূল সা. তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে মদিনায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, মদিনায় ঐ লোকদের দ্বারা অঘটন ঘটার আশংকা আছে।

তবুক পৌঁছার পর মোনাফেক সহযাত্রীরা (কিছু না কিছু মোনাফেক অঘটন ঘটানোর জন্য সব সময়ই সামরিক অভিযানে শরীক হতো) মুসলিম মোজাহেদদেরকে এই বলে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো, রোমক বাহিনীর দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদেরকে তোমরা আরবদের মত ভেবেছ। কাল যখন তোমরা সবাই গোলাম হিসেবে বন্দী হয়ে যাবে, তখন বুঝবে ধারণাটা কত ভুল ছিল।' এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জন্য যখন তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হলো, তখন তারা বললো, "আমরা তো কেবল রসিকতা করছিলাম, ওটা কোন গুরুত্ববহ ব্যাপার ছিলনা।" (আসাহাহুস সিয়ার, পৃঃ ৩৬১-৩৮৫ দেখুন)

রোমক বাহিনী তো রণাঙ্গণেই আসেনি। তবে এই অভিযান দ্বারা একদিকে রোমকরাও বুঝতে পারলো, মদিনা পুরোপুরি সচেতন এবং আমাদের মোকাবিলায় আসতে সক্ষম, অপরদিকে এ অভিযানের ফলে আয়লা, জাবরিয়া ও দুমাতুল জানদাল নামক এলাকাগুলো মুসলিম শক্তির প্রভাবাধীন আসায় বহিরাক্রমণের আশংকা কমে গেল।

এই অভিযানকালে দুই জায়গায় রসূল সা. মুসলিম বাহিনীকে পথিপার্শের জলাশয় থেকে পানি খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু কিছু কিছু মোনাফেক নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে নিজেদের মনের ব্যাধিকে প্রকাশ করে দেয়।

এই অভিযানকালেই গিরিপথে রসূল সা. কে হত্যার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র করা হয়। এই ঘটনার বিবরণ আমি ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি।

মোনাফেকদের এত বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও রসূল সা. এই অভিযানে সফলকাম হয়ে ফিরে আসেন এবং মোনাফেকদের নির্দ্বিধায় ক্ষমা করতে থাকেন। রসূল সা. এর তিনজন নিষ্ঠাবান সাহাবী কা'ব বিন মালেক, হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবী অলসতার কারণে মদিনায় থেকে যান। তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। তবুও তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হয়। এই পরীক্ষায় তারা সর্বতোভাবে সফল হন এবং তাদের তওবা কবুল হয়। কিন্তু মোনাফেকরা বলছিল, "এরা কী বেকুফ! আমাদের মত যে কোন একটা বাহানা পেশ

করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। খামাখা নিজেদেরকে বিপদে ফেলে রেখেছে। এখন বুঝুক মজা।

এ থেকে বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আন্দোলনকে কত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মানব জাতিকে যিনি কল্যাণের পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁকে হযরত মূসার কপট অনুসারীরা ও তাদের তৈরী করা মোনাফেকদের কাছ থেকে কী কী ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্ত ভোগ করতে হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি তাতে থেমে থাকেনি, বরং বেড়েই চলে। একনিষ্ঠ ঈমান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে, আর গাদ্দারী ও ভন্ডামি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।

কোরায়েশদের ঘৃণ্য প্রতিশোধমূলক তৎপরতা

মদিনার প্রাথমিক যুগে, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হওয়ার আগে, আওস গোত্রের বিশিষ্ট নেতা সা'দ বিন মুয়ায ওমরা করার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। যেহেতু উমাইয়া বিন খালফের সাথে সা'দের অনেক দিনের পুরানো সম্পর্ক ছিল, তাই তিনি তার বাড়ীতেই অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে সাথে নিয়ে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে আবু জাহল সেখানে উপস্থিত হলো। সে উমাইয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সাথে ঐ ব্যক্তি কে?" উমাইয়া বললো, "সা'দ।" আবু জাহল ক্রুদ্ধ স্বরে হযরত সাদকে বললো, "তোমরা ঐ ধর্মচ্যুতদেরকে আশ্রয় দিয়েছ তাই না? তোমার মত লোকেরা কা'বা শরীফের চত্তরে পা রাখবে, এটা আমার অসহ্য। তুমি যদি উমাইয়ার আশ্রয়ে না থাকতে, তাহলে আজ জ্যান্ত ফিরে যেতে পারতেনা।" (সীরাতুন্নবী; শিবলী নুমানী, প্রথম খন্ড, সহীহ মুসলিম, বুখারীর বরাতসহ)

লক্ষ্য করুন যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কোরায়েশ নেতার স্পর্ধা এতদূর বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তার ঘরে প্রবেশকে নিষিদ্ধ করে দিতে উদ্যত! তাদেরকে হজ্জের ন্যায় এবাদাত থেকে বঞ্চিত করতে চায়! যেন কা'বা শরীফও তাদের সম্পত্তি। আসলে মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লীগিরিকে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত করে রেখেছিল। রসূল সা. ও তাঁর যে সব সাথীকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের জন্য তো হারাম শরীফের দ্বার রুদ্ধ ছিলই। কিন্তু সা'দ ইবনে মায়াযকে এরূপ খোলাখুলিভাবে হারাম শরীফে প্রবেশের অযোগ্য আখ্যা দিয়ে আবু জাহল তার অন্যায় অবস্থানকে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে নগ্ন করে দিয়েছিল। ও দিকে সা'দ বিন মায়া'যও তো কোন আত্মমর্যাদাহীন দরবেশ ছিলেন না। তাঁর ভেতরে ইসলামী সম্ভ্রমবোধ পুরোমাত্রায় সক্রিয় ছিল এবং তিনি মদিনার রাজনৈতিক শৌর্যবীর্যের অর্থ জানতেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষায় এমন জবাব দিলেন যে, আবু জাহল ও কোরায়েশ সম্প্রদায়ের চোখের সামনে এক ভয়াবহ বিপদ ভেসে উঠলো। সা'দ বললেন, "তোমরা যদি আমাদের হজ্জ বন্ধ করে দাও, তবে আমরা তোমাদের মদিনার (বাণিজ্যিক) পথ বন্ধ করে দেব।" অন্য কথায় এটা ছিল কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি। এ হুমকি সমগ্র মক্কাবাসীকে সচকিত করে তুললো। পরবর্তীকালে হযত সা'দের এই উক্তি অনুসারেই মদিনার নীতি নির্ধারিত হয়। ফলে কোরায়েশ একেবারেই অনন্যোপায় হয়ে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

আবু জাহল উত্তেজনার বশে এমন কথা বলে ফেলেছিল বটে। তবে এই অনাকাংখিত হুমকি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে প্রচন্ড ধাক্কা দেয়। পবিত্র কোরআন হারাম শরীফের ওপর তাদের এই একচেটিয়া কর্তৃত্বের কঠোর সমালোচনা করে। কেননা এটাকে পুঁজি করেই তারা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করছিল। আল্লাহ বলেন ঃ

"সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে আল্লাহর স্মরণ বন্ধ করে এবং ওগুলোকে জনশূন্য করার চেষ্টা করে?" (আল-বাকারা, ১১৪)

"লোকেরা জিজ্ঞেস করে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা কেমন? তমি বল, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ঠেকানো, আল্লাহর সাথে কুফরি করা, আল্লাহর বান্দাদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে না দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা তার চাইতে বড় অন্যায়।" (বাকারা, ২১৭)

"এখন কোন্ কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যখন তারা মসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে? অথচ তারা এই মসজিদের বৈধ মুতাওয়াল্লী নয়।" (আনফাল, ৩৩)

কোরআনের এ সব উক্তি ক্রমশ সারা আরবে ছড়িয়ে পড়লো এবং কোরায়েশদের ধর্মীয় ভাবমূর্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগলো।

হোদাইবিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে) সময় কোরায়েশরা মসজিদুল হারামে যেতে মানুষকে বাধা দেয়ার' কাজটা আরো বড় আকারে করলো। আল্লাহ তালায়ার পক্ষ থেকে একটা ইংগিত পেয়ে রসূল সা. কেবল ওমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। কোন যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সাহাবীগণ ওমরার জন্য বের হন। কুবরানীর পশুও সাথে নেয়া হয়। সামরিক প্রয়োজনে অস্ত্রসজ্জিত না হয়ে নিছক মামুলী আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার নিয়ে কাফেলা রওনা হয়। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে সুপরিচিত বিধি অনুযায়ী কুরবানীর উটগুলোকে চিহ্নিত করা হয় এবং ওগুলোর গলায় মালা পরানো হয়। এসব দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই যে কেউ অনুমান কতে পারে যে, এই উট হারাম শরীফে কুরবানী করার জন্য নেয়া হচ্ছে এবং এগুলো সামরিক বাহক নয়। পথিমধ্যেই বার্তাবাহক বিশর বিন সুফিয়ান আল কা'বীর মাধ্যমে জানা গেল, কোরায়েশরা সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং কোনক্রমেই হারাম শরীফে যেতে দেবেনা। হুদাইবিয়া পৌছে রসূল সা. বার্তা পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, বরং ওমরা করতে এসেছি। বনু খুযায়া গোত্রের বুদাইল বিন ওয়ারাকা মধ্যস্থতার চেষ্টা করলো। তারপর উরওয়া বিন মাসউদ আলাপ আলোচনা কিছুটা এগিয়ে নিলেন। এরপর বনু কিনানার এক ব্যক্তি হুলাইস মধ্যস্থতা করার জন্য ছুটে এল। সে যখন স্বচোক্ষে মালা পরা উটের এক বিরাট বহর মাঠে চরতে দেখলো তখন অভিভূত হয়ে গেল। সে গিয়ে কোরায়েশদেরকে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তারা "তুমি মিয়া গ্রাম্য মানুষ এ সবের কী বুঝবে?" বলে তাকে নিদারুণভাবে নিরুৎসাহিত করলো। হুলাইস খুবই মর্মাহত হলো। সে বললো ঃ

"হে কোরায়েশ, এটা আমাদের ও তোমাদের চুক্তি নয়। এর ভিত্তিতে আমরা মৈত্রী সম্পর্কও স্থাপন করিনি। আল্লাহর ঘরের মর্যাদা বাড়াতে এসেছে, এমন লোকদেরকে কোন্

যুক্তিতে আল্লাহর ঘরে আসতে বাধা দেয়া হবে? আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সা. যা করতে চায়, তা তাকে করার সুযোগ দাও। নচেত আমরা আমাদের সকল লোকজনকে ফেরত নিয়ে যাবো।"

রসূল সা. এর সরল ও স্বচ্ছ নীতি এই লোকটার ভালো লেগেছিল। তার ভালোমন্দ বাদবিচারের ক্ষমতা কাজ করতে আরম্ভ করেছিল এবং তার বিবেক কোরায়েশদের অন্যায় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অবশেষে তার মন রক্ষার খাতিরে তাকে এই বলে শান্ত করা হলো যে, আমাদের উদ্দেশ্য কিছু সংগত শর্ত মানানো। তুমি একটু চুপ থাক।" এরপর এমন শর্তাবলী আরোপ করা হলো যে, আর কিছু না হোক রসূল সা. ও তার সাথীগণের ৬ষ্ঠ হিজরীর ঐ ওমরা কার্যত এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হলো। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খন্ড, সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, আসাহহুস সিয়ার)

এ পর্যায়ে আল কোরাআন কা'বার রক্ষকদের হীন মানসিকতার মুখোস কিভাবে খুলে দিয়েছে দেখুন ঃ

"এরাই সেই সব লোক, যারা (সত্য দ্বীনকে) অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেছে, তোমাদের মসজিদুল হারামে যাওয়া বন্ধ করেছে এবং কুরবানীর পশুকে বদ্ধভূমি পর্যন্ত যেতে দেয়নি।" (আলফাতাহ, ২৫)

হযরত ইবরাহীম আ. এর আমল থেকে যে সব ধর্মীয় রীতিপ্রথা সর্বসম্মতভাবে চলে আসছিল, তাতে কোরায়েশদের হস্তক্ষেপ ও রদবদল তাদের ভাবমূর্তিকে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন করে। তারা নিছক বোকামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে সমগ্র আরবে নিজেদের সম্পর্কে একটা বিরূপ জনমত গড়ে তোলে। জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, কোরায়েশদের মধ্যে সততা, ধর্মপরায়ণতা ও ভদ্রতার নামগন্ধও নেই এবং তারা যা-ই করছে নিছক জিদের বশে করে চলেছে।

কোরায়েশদের প্রতিশোধ স্পৃহা যে পাশবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তারা নিজেদের মনের আক্রোশ মেটানোর জন্য রসূল সা. এর দুই মেয়েকে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে তালাকে আনিয়ে ছাড়ে। এটি ছিল মানবতার মুক্তিদূতের ঠিক কলিজার ওপর এক নিদারুণ বিষাক্ত ছোবল।

হযরত রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়েছিল আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিকটতম আত্মীয়ের পরিবারের সাথে তাদের এ সম্পর্ক নবুয়তের আগে থেকেই চলে আসছিল। চরম বদরাগী আবু লাহাবের মধ্যে এতটুকু সৌজন্যবোধের অস্তিত্বই ছিলনা যে, সে আদর্শিক বিরোধকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উর্দ্ধে রাখবে এবং আত্মীয়তার অধিকারকে বিরোধের সাথে জড়িয়ে ফেলবে। তার হিংসা বিদ্বেষ সব সময়ই অতিমাত্রায় তীব্র ছিল এবং তার কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত হীন ও ইতরসুলভ। তার ঘৃণ্য কার্যকলাপের কারণে যখন সূরা লাহাব নাযিল হলো এবং তাতে "আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক" বলে অভিশাপ দেয়া হলো, তখন সে ক্ষেপে গেল। দুই হাত ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, সে সব রকমের বিরোধী ও ক্ষতিকর কাজ করেও ইসলামী আন্দোলনের কিছু মাত্রও ক্ষতি সাধন কতে পারবেনা এবং সততার শক্তি তার দুই

হাতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কথাটার এই মর্ম উপলব্ধি করেই সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিল। সে নিজের দুই ছেলেকে এই বলে চাপ দিতে লাগলো যে, এখন আর মুহাম্মাদের সা. মেয়েদেরকে ঘরে রাখা তোমাদের জন্য কিছুতেই বৈধ হতে পারেনা। ওদেরকে তালাক দিতেই হবে। হযরত রুকাইয়া নিজ ঘরে চরম অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। উতবা বাপের ইংগিতে তাকে তালাক দিল। পরে হযরত উসমানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আবু লাহাবকে উত্তেজিত করতে ও তার ছেলে দুটিকে দিয়ে এই ঘৃণ্য কাজ করাতে কোরায়েশদের অন্যান্য সরদারও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। তারা পরস্পরে আলোচনা করতো যে, আজকাল মুহাম্মাদকে সা. উত্যক্ত করার তৎপরতা অনেকটা কমে গেছে। তাই নতুন একটা কিছু উদ্ভাবন করা দরকার। তারা স্থির করলো তার মেয়েদেরকে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে তালাক দেয়াতে হবে। এতে অন্তত মুহাম্মাদের সা. জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে। তারা আবু লাহাবের ছেলে উতবাকে বললো, কোরায়েশের যে মেয়েকেই চাও, যোগার করে দেয়া হবে। শর্ত শুধু এই যে, মুহাম্মাদের সা. মেয়েকে বিদায় করে দেবে। উতবা কাল বিলম্ব না করে তালাক দিয়ে দিল। উতায়রা আরো খানিকটা তেজ দেখালো। সে হযরত উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে গুন্ডা পান্ডার মত রসূল সা. এর কাছে উপস্থিত হলো। তারপর চরম ধৃষ্টতার সাথে বললো, "আমি তোর ধর্মকেও অস্বীকার করেছি, তোর মেয়েকেও তালাক দিয়েছি, তুইও আমাকে ভালোবাসিসনে, তোকেও আমি পসন্দ করিনে।" অতঃপর চরম বেআদবীর সাথে হাত বাড়িয়ে রসূল সা. এর জামার একাংশ টেনে ছিড়ে ফেললো। যুবক জামাতা হিংসুটে বাপের কথা মত একদিকে নিরীহ ও ভদ্র মেয়েকে তালাক তো দিলই, তদুপরি এমন গুন্ডার মত আচরণ করলো যে, দুঃখের চোটে স্বতস্ফূর্তভাবে রসূল সা. এর মুখ দিয়ে এই বদদোয়া বেরিয়ে গেল যে, "হে আল্লাহ, তোমার হিংস্র জন্তুগুলোর মধ্য থেকে কোন একটা জন্তুকে তার ওপর লেলিয়ে দাও।" আবু তালেব যখন ঘটনা শুনলেন, বললেন, "এখন আর আমার ভাতিজার এই বদদোয়া থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবেনা।" এরপর উতাইবা এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে যখন সিরিয়ায় রাত্র যাপন করছিল, তখন রাতের অন্ধকারে কোথা থেকে এক বাঘ এসে সমগ্র কাফেলার মধ্য থেকে বাছাই করে ওর মাথাটাই চিবিয়ে খেয়ে গেল। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৭)

হযরত রুকাইয়ার মৃত্যুর পর রসূল সা. তাঁর এই দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুমকেও হযরত উসমানের সাথে বিয়ে দেন। এ জন্য তাকে "যুন্নুরাইন" নামে আখ্যায়িত করা হয়।

কোরায়েশ কুচক্রীরা আবু লাহাবের ছেলে উতবার ওপর যেভাবে চাপ প্রয়োগ করেছিল, রসূল সা. এর তৃতীয় কন্যা যয়নবের স্বামী আবুল আসের ওপরও চাপ প্রয়োগ করেছিল এবং তাকেও এই বলে প্রলুব্ধ করেছিল যে, তুমি যদি মুহাম্মাদের সা. মেয়েকে তালাক দাও, তবে যত সুন্দরী মেয়েই চাও, তোমাকে দেয়া হবে। আবুল আসের মধ্যে মহত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। সে বললো, "ছি ছি! এটা কখনো হতে পারেনা যে, আমি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করবো। যয়নবের পরিবর্তে আর কোন নারী আমার ঘরে আসুক–এটা আমার পছন্দ নয়। পরবর্তী সময় রসূল সা. আবুল আসের চরিত্রের এই দৃঢ়তার প্রশংসা করতেন। তার এই ভদ্র আচরণের প্রতিদান স্বরূপ তিনি দুটো ঘটনায় তার ওপর বিরাট

অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। প্রথমত যখন আবুল আস বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এল এ সময় মুক্তিপণ হিসাবে হযরত যয়নব কর্তৃক প্রেরিত হারটি রসূল সা. ফেরত দেন এবং তাকে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দেন। দ্বিতীয়বার যখন তার বাণিজ্যিক পণ্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গিয়েছিল, তখন রসূল সা. এর ইংগিতে যাবতীয় জিনিস অক্ষতভাবে তাকে ফেরত দেয়া হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯৬)

বদর যুদ্ধের পর যখন রসূল সা. আবুল আ'সকে বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দেন, তখন কথা প্রসংগে তার কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, সে হযরত যয়নবকে মদিনা আসবার সুযোগ দেবে। এই প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। হযরত যয়নবের মদিনায় রওনা হবার নির্ধারিত সময় দু'জন সাহাবী হযরত যায়েদ বিন হারিসাকে এবং অপর একজন আনসারীকে পাঠানো হয়। এই দু'জনকে রসূল সা. নির্দেশ দিয়ে দেন যে, তোমরা ইয়াজিজ (মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী একটি জায়গার নাম) নামক স্থানে দাঁড়াবে। যয়নব ওখানে এলে তাকে নিয়ে চলে আসবে। ওদিকে আবুল আস যয়নবকে প্রস্তুত করলো এবং আসবাবপত্র গুছিয়ে দিল। তার দেবর কিনানা বিন রবী খুব ভোরে উটের পিঠে চড়িয়ে দিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন কোরায়েশরা ব্যাপারটা জেনে ফেললো। ঐ নরপশুরা ভাবলো, মুহাম্মাদের মেয়ে সা. এভাবে নিরাপদে আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাবে, এটাতো কলংকজনক ব্যাপার হবে। কিছু লোক পেছনে গেল এবং যী তুয়াতে গিয়ে ধরলো। জনৈক হাব্বার বিন আসওয়াদ যয়নবের হাওদা লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। হযরত যয়নব তখন গর্ভবতী ছিলেন। তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি মারাত্মক অবস্থার শিকার হলেন এবং গর্ভপাত ঘটে গেল। পরক্ষণে তার দেবর যখন তীর ধনুক নিয়ে হাঁক ছাড়লো, অমনি মক্কার সেই কাপুরুষ গুন্ডাটা দ্রুত পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু সুফিয়ানও এসে হাজির। সে দূর থেকে আক্রমণকারীদেরকে ডেকে বললো, "আমার কথা শোন।" সে কিনানা বিন রবীকে বললো, "তুমি এমন কাজ করতে গেলে কেন যে, প্রকাশ্যে এই মহিলাকে নিয়ে সফরে বেরুলে? অথচ কেমন শত্রুতার পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতো জানই। মুহাম্মাদ সা. এর কারণে আমাদের মাথার ওপর এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ বিরাজ করছে। এভাবে দুপুরে এ ধরনের পদক্ষেপে মক্কার মানুষ অপমান বোধ করে। আমার জীবনের কসম, মুহাম্মাদের মেয়ের যাত্রা থামানোর কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। এখন ওকে ফেরত নিয়ে চল। কোন এক সময় গোপনে নিয়ে যেও।"

এ থেকে বুঝা যায়, মক্কাবাসী রসূল সা. কে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার জন্য কী জঘন্যতম ইতরামির আশ্রয় নিচ্ছিল। তাদের অন্তরে আত্মীয়তার কোন গুরুত্ব ছিলনা। একজন নারীর ওপর অত্যাচার চালাতে তাদের একটুও লজ্জা বোধ হতোনা। যুলুমকে যুলুম মনে করার মত বোধশক্তিও তাদের ছিলনা। তাদের দৃষ্টিতে মানবতার কোন মূল্য ও অধিকার অবশিষ্ট ছিলনা। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, আসাহহুস্ সিয়ার)

এবার অন্য একটা ঘটনা শুনুন। এ ঘটনা ইসলামের শত্রুদের চরম রক্ত পিপাসু মানসিকতা ব্যক্ত করে। রসূল সা. মদিনার সন্নিহিত এলাকাগুলোতে ইসলামের শিক্ষা

বিস্তার কল্পে শিক্ষক দল পাঠানোর যে প্রক্রিয়া চালু করেন, তার আওতায় ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর (সফর মাসে) আজল ও কারাহ (বনু হুযায়েল) গোত্রের অনুরোধে ছয়জনের একটি দল পাঠান। এই অনুরোধের পেছনে ছিল ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। রসূল সা. যে ছ'জনকে পাঠালেন, তাদের চারজনকে রজী নামক স্থানে পৌঁছুলে শহীদ করে দেয়া হলো। বাকী দু'জন হযরত খুবাইব ও যায়েদ বিন দাসনাকে বন্দী করে মক্কায় পাঠানো হলো। (রজী'র ঘটনার অপরাপর বিবরণ এবং অন্যান্য শিক্ষক দলের বিবরণও পরে আসছে) কোরায়েশদের কাছে বনু হুযায়েলের দু'জন কয়েদী ছিল। এই দু'জনকে দিয়ে বিনিময়ে সেই দু'জনকে মুক্ত করা হলো। হুযায়ের বিন ইহাব তামিমী হযরত খুবাইবকে উতবা বিন হারেস বিন আমেরের জন্য নিল, যাতে সে হারেসের প্রতিশোধ নিতে পারে। এই হারেসকে বদর যুদ্ধে হযরত খুবাইব হত্যা করেছিলেন। আর যায়েদ বিন দাসনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া খরিদ করলো তার পিতা উমাইয়া বিন খালফের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

বীরত্ব ও পৌরুষের সদম্ভ আস্ফালনকারীরা যুদ্ধের ময়দানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক সহায় সম্বলহীন মুসলমানের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পর এখন এই দুই অসহায় বন্দীকে হত্যা করে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চাইছিল। ইসলামী সমাজের এই দুই মূল্যবান ব্যক্তিত্বকে যদিও শহীদ করে দেয়া হলো, কিন্তু এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের চরিত্রের যে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হলো, তার প্রভাব ইতিহাসের শীরায় শীরায় ছড়িয়ে পড়লো।

সাফওয়ান যায়েদ বিন দাসনাকে স্বীয় গোলাম ফুসতাসের হাতে সোপর্দ করে আদেশ দিল যে, তাকে হারাম শরীফের বাইরে তানয়ীমে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর। এই মজাদার নাটক দেখে আনন্দ উপভোগ করার জন্য ঘটনাস্থলে কোরায়েশদের এক জনসমাবেশ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে স্বয়ং আবু সুফিয়ানও ছিল। আবু সুফিয়ান কাছে গিয়ে যায়েদকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে যদি এখন ছেড়ে দেয়া হয় এবং তুমি গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের সাথে হাসিখুশী মনে বসবাস করতে থাক, আর তোমার বদলায় যদি আমরা মুহাম্মাদকে সা. খতম করে দেই, তাহলে এটা তোমার কাছে কেমন লাগবে? যায়েদের সামনে তখন মৃত্যু মুচকি হাসছে তবু ঈমানের অভাবনীয় উচ্চস্তর থেকে তিনি জবাব দিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, আমরা এতটুকুও পছন্দ করিনা যে, মুহাম্মাদ সা. যেখানে আছেন, ওখানেও তার গায়ে একটা কাঁটা বিধুঁক, আর তার বিনিময়ে আমরা মুক্ত হয়ে পরিবার পরিজনের কাছে গিয়ে থাকার সুযোগ লাভ করি।"

এ জবাব শুনেতো আবু সুফিয়ান হতবাক। সে বললো, মুহাম্মাদ সা. কে তার সহচররা যেভাবে ভালোবাসে, অমন ভালোবাসা আমি আর কোথাও দেখিনি। তারপর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই মূর্ত প্রতীককে তরবারীর গ্রাসে পরিণত করা হলো। যায়েদ শহীদ হলেও তার এই চরিত্র কতজনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং কতজনের অন্তরাত্মা কোরায়েশদের এই অত্যাচার ও পাশবিক হিংস্রতার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেছে কে তার ইয়ত্তা রাখে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, আসাহহুস্ সিয়ার)

হযরত খুবাইব এর পরও কিছুদিন বন্দী থাকেন। বন্দী অবস্থায় তিনি নিজের ঈমান ও আখলাকের যে উদাহরণ পেশ করেন, তার একটা ফল দাঁড়ালো এই যে, হুজাইর বিন ইহাবের দাসী মাবিয়া পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকেই খুবাইবের বন্দী দশার বিবরণ জানা গেছে। মাবিয়া বর্ণনা করেছে যে, খুবাইবের হত্যার সময় যখন ঘনিয়ে আসলো তখন একদিন তিনি খেউরি হওয়ার জন্য ক্ষুর চাইলেন। ক্ষুর দেয়া হলো। কিন্তু এরপর একটা দৃশ্য দেখে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগলো। দেখলাম, খুবাইবের হাতে ক্ষুর আর তার কোলে আমার শিশু সন্তান বসে আছে। যে বন্দীকে এমন অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রস্তুতি চলছে তার নাগালে যদি তার শত্রু পক্ষের কোন শিশু এসে যায় এবং তার হাতে উপযুক্ত অস্ত্রও থাকে, তাহলে কি আশংকা দেখা দিতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। খুবাইব আমার আশংকা বুঝতে পেরে আশ্বাস দিলেন যে, আমি কোন অবস্থাতেই এই নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করবোনা। তারপর ঐ শিশুটাকে কোল থেকে সরিয়ে দিলেন। এমন মহৎ চরিত্র কি মক্কার তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে মশাল হয়ে জ্বলে ওঠেনি?

এরপর তাকে শূলে চড়াতে নিয়ে যাওয়া হলো তানয়ীমে। সেখানে গিয়ে তিনি অনুমতি নিয়ে জীবনের শেষ নফল নামায পরম একাগ্রতার সাথে পড়লেন। এভাবে তিনি শাহাদাতের বধ্যভূমিতে গমনকারীদের জন্য একটা চমৎকার ও মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যা আজও পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে।

এরপর দ্রুত নামায শেষ করে বললেন, তোমরা ভেবনা যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি। তারপর এভাবে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার রসূলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। তুমিও রসূল সা. কে জানিয়ে দিও যে আমাদের ওপর কি রকম যুলুম করা হচ্ছে। হে আল্লাহ! এই শত্রুদের সংখ্যা কমিয়ে দাও, তাদেরকে কলহ কোন্দলের কবলে ফেলে ধ্বংস কর এবং এমন হিংস্র নরপশুদের কাউকে জীবিত ছেড়ে দিওনা।"

খুবাইবকে শূলে চড়ানো হলো। সবার শেষে আবু মুগীরা বর্শা মেরে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে কয়েকটা কবিতা উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চরণটি এই ঃ وَلَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى اَىِّ شَقٍّ كَانَ فِىْ مَضْجَعِىْ

"আমাকে যখন মুসলিম হবার কারণে হত্যা করা হচ্ছে তখন মৃত্যুকালে আমি যে যাতনাই ভোগ করি, তাতে আমার কিছুই আসে যায়না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)

এই দু'জনকে হত্যা করে কোরায়েশরা হয়তো ভেবেছিল, তারা ইসলামের শক্তিকে অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা কল্পনাও করতেও পারেনি এই মজলুমদের শাহাদাতের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ঈমানের ফসলকে কত বেশী পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই সব জঘন্য প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোরায়েশদের সেই রাজনৈতিক বিশ্বাস ঘাতকতাও আমরা তুলে ধরছি, যা তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভংগের মাধ্যমে করেছিল। এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্থির করা হয়েছিল যে, আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যেটি

কোরায়েশদের মিত্র হতে চাইবে, হতে পারবে এবং যেটি মুসলমানদের মিত্র হতে চাইবে হতে পারবে। গোত্রগুলো এ ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে। কারো ওপর কেউ কোন বল প্রয়োগ করতে পারবেনা। এই বিধান অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে বনুবকর কোরায়েশদের সাথে এবং বনু খুযায়া মুসলমানদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করলো।

প্রাগৈসলামিক যুগ থেকে ঐ দুটো গোত্রের মধ্যে একটা হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে প্রতিশোধের পর প্রতিশোধের এক অশুভ চক্র চলে আসছিল। ইতিমধ্যে উভয় গোত্রের মধ্যে একাধিক হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সর্বশেষ প্রতিশোধ গ্রহণের পালা ছিল বনু বকরের এবং তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সময় ইসলামী আন্দোলন ইতিহাসের প্রচন্ডতম ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে সকল গোত্রের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে ঐ সব গোত্র নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ কলহ আপাতত স্থগিত রেখে এই নয়া দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায়। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা ও বিদ্বেষ তাদের মধ্যে যে বাহ্যিক ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সেই ঐক্যের তেজ স্তিমিত হতে থাকে। পুরানো বিরোধগুলো তাদের মনে পড়তে থাকে। বনু বকরের একটা শাখা ছিল বনু ওয়েল। এই বনু ওয়েলের এক ব্যক্তি আসওয়াদ বিন রজনের কয়েকটি ছেলে বনু খুযায়া গোত্রের হাতে নিহত হয়েছিল। সেই হত্যাকান্ডের বদলা নেয়ার জন্য বনুওয়েলের সরদার নওফেল বিন মুয়াবিয়া সমগ্র গোত্রকে সংঘবদ্ধ করে। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে যে যুদ্ধ বিরতি চলছিল, সেই সুযোগে তারা বনু খুযায়ার ওপর হামলা চালিয়ে বসলো। এই হামলায় সর্বপ্রথম নিহত হলো আল-ওয়াতীর নামক জলাশয়ের কাছে অবস্থানরত এক নিরপরাধ খুযায়ী। খুযায়া গোত্রের অন্যান্যরা এই অপ্রত্যাশিত চুক্তি লংঘন দেখে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। আক্রমণকারীরা তাদেরকেও ধাওয়া করে হত্যা করলো।

কোরায়েশরা হুদাইবিয়ার সন্ধির দায়দায়িত্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বনু বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করলো, আবার রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে খুযায়ীদের সাথে সন্ধিও চালাতে লাগলো। বনু খুযায়া হারাম শরীফে (কা'বার চত্তরে) আশ্রয় নিয়ে বনু বকরের সরদারকে ডেকে বললো, "ওহে নওফেল! দেখ, এখন আমরা হারাম শরীফে প্রবেশ করেছি। আল্লাহর দোহাই এখন আক্রমণ থামাও।" কিন্তু তারা জয়ের নেশায় অন্ধ হয়ে পড়েছিল। নওফেল বললো, "আজ কোন আল্লাহ নেই। ওহে বনু বকর! পুরোপুরি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। হারাম শরীফের সম্মানের খাতিরে তোমরা কি নিজেদের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে ভুলে যাবে?" অবশেষে বনু বকর হারাম শরীফে ঢুকেও রক্তপাত করলো। কিছু সংখ্যক খুযায়ী অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে বুদাইল বিন ওয়াবরা ও তার গোলাম রাফের বাড়ীতে গিয়ে লুকালো।

কোরায়েশরা গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উদ্ভূত প্রচন্ড উত্তেজনার বশে এ কাজটা করেছিল। কিন্তু এটা তাদের এত বড় নির্বুদ্ধিতা ছিল যে, এর কুফল তারা হাতে হাতেই পেয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাটা মক্কা বিজয়ের কারণ ঘটায়। কোরায়েশরা এ কথা মোটেই ভেবে দেখেনি যে, ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলায় তাদের শক্তি নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই চরম অধোপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাই

তাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা বাড়ানো উচিত ছিল। এ ঘটনার কারণে আরবের গোত্র শাসিত সমাজে কোরায়েশদের প্রতিশ্রুতি লংঘনের বিষয়টা ব্যাপক নিন্দা না কুড়িয়ে পারেনি। তাদের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তাছাড়া কোরায়েশদের আস্কারা পেয়ে বনু বকর যে চরম নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড চালায় এবং বনু খুযায়া যে লোমহর্ষক অত্যাচার ভোগ করে, তা আরবের সব ক'টা গোত্রকে সচকিত করে দেয় যে, কোরায়েশ নেতৃত্ব শান্তি ও সুবিচারের নিশ্চয়তা দিতে অক্ষম। তাছাড়া এ ঘটনায় শত শত বছরের ঐতিহ্যের মুখে কালিমা লেপন করে আল্লাহর নামের মাহাত্ম্য ও হারাম শরীফের পবিত্রতাকে যেরূপ ন্যাক্কারজনকভাবে পদদলিত করা হয়, তাতে জনমনে ব্যাপক অস্থিরতা ও অস্বস্তি জন্মে। এই দাংগা হাঙ্গামায় কোরায়েশ জুলুমবাজ পক্ষকে আস্কারা দিয়ে নিজের মান মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। কোরায়েশ হয়তো ভেবেছিল, ইসলামী রাষ্ট্রের মিত্র বনু খুযায়াকে ধ্বংস করতে পারলে মুহাম্মাদ সা. এর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহা কিছুটা হলেও চরিতার্থ করা যাবে। কিন্তু তারা এ কথা ভেবে দেখেনি যে, এতে করে তারা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক গোত্রগুলোর ঐক্য নিজ হাতেই বিনষ্ট করতে চলেছে। এমনকি কোন কোন প্রতিবেশী গোত্রকে মদিনার আশ্রয়ে পাঠাতে চলেছে।

আসলে প্রত্যেক মান্ধাতা আমলের সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক পুরানো নেতৃত্ব, যাদের না আছে কোন উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য, না আছে নৈতিক মূল্যবোধ ও গঠনমূলক সংস্কৃতি, এবং যাদের একমাত্র সম্বল হলো প্রত্যেক গঠনমূলক ও সংস্কারকামী শক্তিকে দমন করা ও ধ্বংস করার নেতিবাচক লক্ষ্য, তাদের ভাগ্যলিপি সাধারণত এটাই হয়ে থাকে যে, তাদের বুদ্ধিই তাদেরকে নির্বুদ্ধিতার পথে নিয়ে যায়, তাদের শক্তিই তাদেরকে দুর্বলতার গভীর খাদে নিক্ষেপ করে, তাদের আভিজাত্যবোধই তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকারে পরিণত করে এবং তাদের অগ্রগতিই তাদের পশ্চাদপদতাকে ও তাদের উন্নতিই অধোপতনকে অনিবার্য করে তোলে।

বনু খুযায়া গোত্রের আমর বিন সালেম মদিনায় রওনা হয়ে গেল এবং রসূল সা. এর কাছে পৌঁছে বনু বকর ও কোরায়েশদের যুলুম নির্যাতনের মর্মান্তিক কাহিনী শোনালো। রসূল সা. মসজিদে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে আমর বিন সালেম চিরাচরিত আরবীয় রীতি অনুযায়ী নিজের করুণ কাহিনীকে একটা মর্মবিদারী কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করলোঃ

لَا هُمَّ اِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا   حِلْفَ اَبِيْنَا وَاَبِيْهِ الاَتْلَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللّٰهُ نَصْرًا اَعْتَدًا   وَادْعُ عِبَادَ اللّٰهِ يَاْتُو مَدَدًا

فِى فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِىْ مُزْبِدًا–   اِنَّ قُرَيْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدًا

هُمْ بَيَّتُوْنَا بِالْوَتِيْرْ هُجَّدًا   –   وَقَتَلُوْنَا رُكَّعًا وَّ سُجَّدًا

"হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদকে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব, যা আমাদের ও তাঁর প্রাচীন পরিবারগুলোর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। হে নবী, আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্যের জন্য সমবেত হবার আহ্বান জানান। ফেনা রাশি তোলা

সমুদ্রের ঢেউ এর ন্যায় বিশাল বাহিনী নিয়ে ময়দানে নামুন। কেননা কোরায়েশ আপনার চুক্তি ভংগ করেছে। তারা রাতের অন্ধকারে ওয়াতীরের কাছে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা যখন ঘুমন্ত ছিলাম, তখন তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা যখন রুকু সেজদার অবস্থায় ছিলাম, তখন আমাদের ওপর আঘাত হেনেছে।"

জবাব দেয়া হলোঃ "হে আমর বিন সালেম, তোমাকে সাহায্য করা হবে।"

এবার কোরায়েশরা বুঝতে পারলো, তারা কী ধ্বংসাত্মক কাজ করে ফেলেছে। আবু সুফিয়ান চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মদিনায় ছুটে গেল। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ ছিল এ রকম যে, আবু সুফিয়ান নিজের মেয়ের ঘরে গিয়ে যখন বিছানার ওপর বসতে উদ্যত হলো, তখন মেয়ে বিছানা গুটিয়ে ফেললো এবং বললো, এটা আল্লাহর রসূলের বিছানা। আপনি একজন অপবিত্র মোশরেক হয়ে ওটার ওপর বসতে পারবেন না।" আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরলো এবং কয়েকদিন পরই দেখলো, এক বিশাল বাহিনী মক্কায় উপস্থিত। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খন্ড, আসাহহুস সিয়ার, সীরাতুন্নবী শিবলী নোমানী, প্রথম খন্ড)

এই ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জাহেলী নেতৃত্বের নেতিবাচক শক্তিকে তার নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ষড়যন্ত্র, প্রতিটি প্রতিশোধমূলক তৎপরতা এবং প্রতিটি প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ড ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছে। অপর দিকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক শক্তি ইসলামী আন্দোলন ক্রমেই শক্তি অর্জন ও সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে।

পক্ষান্তরে রসূল সা. এর আচরণ দেখুন, উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলছে। এ সময় ইয়ামামার শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে মক্কা অভিমুখে খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ঠিক এই সময় মক্কায় চলছিল দুর্ভিক্ষ। মানবতার ত্রাণকর্তা মুহাম্মাদ সা. দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের কথা ভেবে নিজেই অনুরোধ করে ইয়ামামা থেকে খাদ্য শস্য সরবরাহ পুন চালু করালেন এবং নিজের কাছ থেকে মক্কার দরিদ্র লোকদের জন্য পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। এই মহানুভবতা মক্কার জনগণকে বিপুলভাবে অভিভূত করে। এক বর্ণনায় জানা যায়, মক্কাবাসী স্বয়ং রসূল সা. কে লিখেছে যে, "আপনি তো আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করার নির্দেশ দেন, কিন্তু আপনি আমাদের সাথে এই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন।" কেউ কেউ এও লিখেছে যে, "তুমি পিতাদেরকে তরবারী দিয়ে এবং সন্তানদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছ।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খন্ড, আসাহহুস্ সিয়ার, রসূলে আকরাম কি সিয়াসী জিন্দেগী, ডঃ হামীদুল্লাহ)

৫

❊

নীতি-কৌশল

ঘটনাবলী-শিক্ষা

❊

ইসলামী আন্দোলন সিনাই উপত্যকা থেকেই আবির্ভূত হোক, কিংবা ফারানের ঘাঁটি থেকে, তার পথ সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়েই অতিক্রান্ত হয়ে থাকে।

ইসলামের বিপ্লবী আন্দোলন যুক্তির বলে মানুষের হৃদয় জয় করছিল, গোত্রীয় উচ্ছৃংখলতার বিপরীত একটা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলছিল, অসংগঠিত মানবগোষ্ঠীগুলোকে সংঘবদ্ধ করছিল, এবং নৈরাজ্যবাদী ও আইন মেনে চলতে নারাজ একটি সমাজের স্থলে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রাষ্ট্র তৈরী করছিল। ইসলামী আন্দোলন মানুষের সুপ্ত জ্ঞানগত শক্তির ভেতরে নতুন করে প্রেরণার সঞ্চার করছিল।

জাহেলিয়াতের অন্ধকারে জ্ঞানের মশাল জ্বালাচ্ছিল, আল্লাহভক্তির হারানো প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করছিল এবং নৈতিক মূল্যবোধের নিভে যাওয়া প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করছিল। প্রাচীন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার ওপর বিরক্ত বিশ্বকে এবং সামজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত নিষ্পেষিত শ্রেণীসমূহকে সামাজিক ন্যায়বিচারের বেহেশতী পথ দেখাচ্ছিল, আর তার কোলে বেড়ে উঠছিল মানবতার উৎকৃষ্টতম নমুনা।

এর বিপরীত দিকে অবস্থান করছিল সেই জাহেলিয়াত, যার কাছে কোন প্রেরণাদায়ক আদর্শ ছিলনা, যা নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাকে সংরক্ষণ করে যাচ্ছিল, যা স্বার্থপরতার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করছিল, যা ধর্মকে হাস্যকর করে তুলেছিল এবং তার ভিত্তিতে পবিত্র ব্যবসা চলছিল। সমাজে যেটুকু প্রাচীন নৈতিক মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল, তাও এই জাহেলিয়াতের হাতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। মোটকথা, সে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, ইনসাফ ও উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। নিজের এই দুর্বলতার কারণেই সে পিছপা হতে হতে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। তার যুক্তিপ্রমাণ তখন নিশেষ হয়ে গেছে। তার হিংস্রতার হাতিয়ার ভোতা হয়ে গেছে। তার ষড়যন্ত্রগুলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং তার লোকেরা নিকৃষ্টতম মানুষে পরিণত হচ্ছে।

জাহেলিয়াতের প্রধান হোতারা নিজেদের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাথীদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে একটা মারাত্মক আঘাত হেনেছিল বটে। তবে অনতিবিলম্বেই তারা বুঝতে পেরেছিল, আকাবার বায়য়াত দ্বারা রসূল সা. আনসারদের যে সহযোগিতা পেয়ে গিয়েছিলেন তার অর্থ এই যে, এখন মদিনা ইসলামী আন্দোলনের একটা মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত হবে, সেখানে একটা সরকার গঠিত হবে এবং ইসলামী সমাজ এমন এক শক্তিতে পরিণত হবে, যার পথ রোধ করা আর কখনো সম্ভব হবেনা।

তাছাড়া মদিনা পৌঁছে যখন রসূল সা. মদিনার ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের সাথে রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করলেন, তখন কোরায়েশদের জন্য বিপদাশংকা আরো বেড়ে গেল। এর অব্যবহিত পরই রসূল সা. প্রতিরক্ষা শক্তি সংগঠিত করা শুরু করেন। সেই সাথে মদিনা রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা এবং সন্নিহিত এলাকাগুলোতে শত্রুর গতিবিধি তদারক করার জন্য টহলদারী হিসেবে সেনাদল প্রেরণ করতেও আরম্ভ করেন। এতে কোরায়েশদের চোখে ভেসে উঠলো আরো বহু ভীতিপ্রদ আশংকা। তাদের সিরিয়ামুখী বাণিজ্যপথ মদিনার নিকট দিয়েই প্রবাহিত। ফলে সমগ্র বাণিজ্য ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিল। বরঞ্চ সা'দ ইবনে মুয়াযকে যখন আবু জাহল ওমরা করতে বাধা দিল, তখন তিনি পরিষ্কার হুমকি দিলেন যে, এমন করলে তোমাদের বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। রসূল ও তাঁর সাথীরা ইতিপূর্বে কোরায়েশদের জালে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি তাদের কবল থেকে মুক্ত। আগে শুধু দাওয়াত দিতেন। এখন তিনি ক্ষমতার গদিতেও আসীন। আগে মজলুম ছিলেন এবং প্রত্যেক জুলুম নীরবে সহ্য করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি জুলুমের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার যোগ্য হয়ে গেছেন। বস্তুত ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে কোরায়েশরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার পরবর্তী ধাপ যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া আর কিছু হতে পারতোনা। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ওপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালানো ও রসূল সা. এর হত্যার পরিকল্পনা করার পর তাদের ভেতরে অনিবার্যভাবে একটা খুনী ও রক্তপিপাসু মানসিকতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে রসূল সা. নতুন যুগ সৃষ্টির মানসে মদিনায় যে সামান্য পুঁজি সঞ্চিত করেছিলেন, তা যদি লুণ্ঠিত হয়ে যায়, তবে তার অর্থ হবে এ যাবত যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছিল, তা সব পন্ড হয়ে যাওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়ার আশা পুরোপুরি নস্যাৎ হয়ে যাওয়া। এই রাষ্ট্রের বিকাশ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সময়ের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী ছিল। প্রত্যেক বিপদাশংকাকে যদি সঠিক সময় অনুভব করা না হয় এবং সময়মত তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে কোন নেতৃত্বের এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও অক্ষমতা কল্পনা করা যায়না। অনুরূপভাবে এটাও জরুরী যে, যে পদক্ষেপের জন্য যেটা সর্বোত্তম সময়, এবং সর্বোত্তম সময়ের মধ্যেও যেটা সর্বপ্রথম সময়, পদক্ষেপটা সেই সময়েই নেয়া উচিত। নচেত বিদ্যুৎ গতিতে প্রবহমান সময় কখনো কারো পথ চেয়ে থাকেনা। প্রত্যেক দাওয়াত ও আন্দোলনের শুধু নিজের দিকে তাকালেই চলেনা, বরং নিজেকে প্রতিপক্ষের শক্তির সাথে তুলনা করে দেখতে হয় যে, কে কখন কতখানি আগে বা পিছে চলছে। বিশ্বমানবের পরম সুহৃদ মহানবী সা. ও তাঁর বিচক্ষণ সাথীরা ভালোভাবেই জানতেন, হিজরতের পরে এখন সামনে

জেহাদই অবধারিত পরবর্তী ধাপ। তারা বুঝেছিল যে, বাঁচতে হলে এখন কোরায়েশদের সাথে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। তাই মোহাজেরদের পুনর্বাসন ও মদিনার নতুন শক্তির ভারসাম্য বহাল হওয়ার অব্যবহিত পরই রসূল সা. একটি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে সর্বোতভাবে মনোযোগ দিলেন।

যুদ্ধ ও জেহাদের ইসলামী দৃষ্টিভংগি

এখানে আমি একটা মৌল তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি। মৌল তত্ত্বটা এইযে, যে কোন রাষ্ট্রের অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ ও আদালতের ব্যবস্থা যেমন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তেমনি জেহাদও তার একটা স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু একটা নবীন রাষ্ট্র, একটা সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং স্বতন্ত্র যুগ সৃষ্টিকারী একটা সরকারের জন্য একটা কঠোর জেহাদী যুগ অতিবাহিত করা শুধু স্বাভাবিক নয় বরং অনিবার্যও বটে। বিশেষত যখন কোন নতুন সমাজ ব্যবস্থা কোন বিপ্লবী মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তখন প্রাচীন বিপ্লব বিরোধী শক্তিগুলো যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে আসবে, তা অবধারিত। এ ধরনের বিপ্লব বৈরী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শুধু প্রতিরক্ষাই যথেষ্ট হয়না, বরং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া ছাড়া কোন বিপ্লবের পক্ষে নিজের বর্তমান সীমানা ও মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামের জেহাদ তত্ত্ব নিছক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নয় যে কেবল কেউ আক্রমণ চালালেই বাধ্য হয়ে তার মুখোমুখী হতে হয়। বরঞ্চ ইসলাম এই নির্দেশও দেয় যে, ইসলামী বিপ্লবের আহ্বায়কগণ একদিকে তাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি ইঞ্চি জমি, তার যাবতীয় সহায় সম্পদ এবং নাগরিকদের প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজেদের জান ও মালের সর্বাত্মক কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকবে। অপরদিকে আল্লাহর কোটি কোটি বান্দাকে জুলুম শোষণ, অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নৈতিক অধোপতন থেকে উদ্ধার করার মাধ্যমে বিল্পবের পূর্ণতা সাধনের জন্য বিপ্লব বিরোধী শক্তিগুলোকে উৎখাত করবে। কোন বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে এ কাজ না করে গত্যন্তর থাকেনা।[১] আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তবে এ বিষয়টি আমরা বিশদভাবে আলোচনা

---

১. প্রসংগত এখানে এ কথা বলা খুবই জরুরী মনে হচ্ছে যে, সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক কাজ যে কোন পর্যায়েই করা হোক না কেন, তার জন্য কোন না কোন ভাবে শক্তি প্রয়োগ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। মা বাপ যেমন ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য এবং সরকার যেমন দেশবাসীর ভালাইর জন্য যুক্তি, সদুপদেশ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শক্তিও প্রয়োগ করে থাকে, তেমনি গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক বিপ্লবের পতাকাবাহীরাও কিছু না কিছু শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়ে থাকে। প্রশ্ন করা হতে পারে যে, আরবের জাহেলী যুগে গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থার যে কাঠামো ও পদ্ধতিই চালু থাকনা কেন, এবং জনগণ তার আওতায় যে অবস্থায়ই কাটাক না কেন, তা পাল্টাবার অন্যদের কী অধিকার ছিল? সংস্কার ও গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিপ্লব সংগঠিত করা, অতপর তার পূর্ণতা সাধন এবং এ ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করাকে আদৌ বৈধ কাজ বলে মেনে নেয়া যায় কি? এই প্রশ্নকে যদি কিছুমাত্র আমল দেয়া হয়, তাহলে কোন পিতা বা মাতাকে কিসের ভিত্তিতে এ অধিকার দেয়া যাবে যে, তারা তাদের সন্তানদের মগজে কোন বিশেষ ধারণা ঢুকাতে পারবে, কোন বিশেষ ধরনের আদব আখলাক, চালচলন ও রীতিনীতি তাকে জোর করে শেখাবে, কোন বিশেষ নৈতিক চেতনা তার ওপর জোরপূর্বক প্রয়োগ করবে? কিভাবেই বা কোন সরকারকে নাগরিকদের কোন কোন কাজে বাধা দান ও কোন কোন কাজ করতে বাধ্য করার জন্য শক্তি প্রয়োগের অধিকার দেয়া

করবো পুস্তকের সেই খন্ডে, যাতে রসূল সা. এর যুগের সামরিক অভিযানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা রয়েছে।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কুটিল মানসিকতা নিয়ে একটা বিভ্রান্তির বিতর্ক তোলা হয়েছে। আর এর কারণে আত্ম বিস্মৃত মুসলমানদের পাশ্চাত্যমনা অংশটিও নিদারুণ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে। আপত্তিকারীরা সামরিক অভিযানগুলোর এরূপ অর্থ করেছে যে একটা ধর্মকে বলপ্রয়োগে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য সামরিক আক্রমণগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এটা নিছক একটা ধর্মের ব্যাপার ছিলনা। এটা ছিল সর্বাত্মক বিপ্লবী আন্দোলন। এ বিপ্লব জান ও মালের বহু মূল্যবান কোরবানীর বিনিময়ে মানবতার পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল এবং স্বার্থপর বিপ্লব বিরোধীরা এ বিপ্লবকে পূর্ণ সফলতার মুখ দেখার আগেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। এখানে লক্ষ্য ছিল একটা রাষ্ট্র গড়া। এই রাষ্ট্রের পত্তন করার জন্য এর নির্মাতারা তেরো বছর যাবত চরম নির্যাতন সহ্য করেছে, অতঃপর ঘরবাড়ী জায়গা জমি সব ত্যাগ করে এসেছে এবং একেবারেই সর্বহারা হয়ে নিজেদের এমন একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমিত করে নিয়েছে, যেখানে তারা নিজেদের পছন্দসই জীবনপদ্ধতি অনুসারে জীবন যাপন করতে পারবে এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখাতে পারবে।

মহা সমারোহে ইতিহাসের এই নয়া সোনালী অধ্যায়টা উদ্বোধন করার আয়োজন চলছিল। কিন্তু মদিনার ইহুদী, মোনাফেক, মক্কার কোরায়েশ, তাদের তাবেদার গোত্রগুলো, এবং বাইরের কতিপয় বড় বড় শাসক - সবাই মিলে এই আয়োজনকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে চাইছিল। তারা মুসলমান বিপ্লবীদেরকে এই সুযোগই দিতে চাইছিল না যে, এই বিপ্লবকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিক। এ কথা সত্য যে ইসলাম ধর্ম ইসলামী আন্দোলনের

হবে? কোন্ অধিকারে সে অজ্ঞতা, দুষ্কর্ম, অপরিচ্ছন্নতা, ও চারিত্রিক অসততার বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক কৌশল প্রয়োগ করবে এবং যে শক্তি এই কৌশল প্রয়োগে বাধা দেবে, তাদের বাধা অপসারণ করবে? সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ করতে কোন বাধা আসবেনা এবং সেই বাধা দূর করতে শক্তি প্রয়োগ করার দরকার হবেনা–এটা কোন ক্ষেত্রেই কল্পনা করা যায়না। আপনি যদি বাধা দানকারী শক্তিগুলোকে অবাধ সুযোগ দিয়ে দেন, তাহলে কোন সংস্কারমূলক বা গঠনমূলক কাজ করাই সম্ভব হবে না। সংস্কার ও গঠনমূলক প্রতিটি কাজের পক্ষে খোদ মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি সর্বশক্তি নিয়ে বর্তমান থাকে। একটি দেশ বা জাতিকে পতিত দশা থেকে উদ্ধার পূর্বক কল্যাণের পথে চালিত করার জন্য যখন কোন গঠনমূলক বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন মানুষের স্বভাব প্রকৃতি তথা সহজাত মনোবৃত্তি, সদিচ্ছা ও বিবেক তার পক্ষে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে। এই সাক্ষ্যপ্রমাণই ঐ বিপ্লবের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। তখন যে প্রশ্নটার জবাব আবশ্যক তা এই যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির দাবী যেহেতু অস্পষ্ট, সেহেতু কোন বিপ্লব গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক, না বিভ্রান্তিকর ও ধ্বংসাত্মক, সেটা যাচাই বাছাই করার অকাট্য পন্থা কী? এর জবাব এইযে, এই অকাট্য পন্থাটা হলো, মহানবীর (সা) দেয়া আদর্শ আল্লাহর বিধান। মানুষের অসংখ্য গালভরা বুলির মধ্যে কোনটি কল্যাণকর ও কোন্টি অকল্যাণকর, তা পরখ করার হলো, নির্ভুল পথ হলো ওহির প্রদর্শিত পথ। আরব জাতিকে নৈরাজ্য থেকে সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার পর্যায়ে নিয়ে আসা, গোত্রে গোত্রে বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা একক জাতি সত্তায় রূপান্তরিত করা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে জ্ঞান ও সচ্চরিত্রের অলংকারে সজ্জিত করা এবং তাদেরকে শক্তি, নিরাপত্তা ও ইনসাফের একটা নবযুগ উপহার দেয়া এমন একটা মহান ও পবিত্র কাজ যে, এর জন্য যদি শক্তি প্রয়োগ বৈধ না হয়, তাহলে মানবেতিহাসে শক্তি প্রয়োগের আর কোন ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ স্থান আর অবশিষ্ট থাকেনা।

একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল (অবশ্য ধর্মের যে বিকৃত অর্থ আজকাল প্রচলিত, তা থেকে ভিন্ন অর্থে), কিন্তু এর সাথে আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিলিত হয়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এ জন্যই দেখা যায়, মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মের সীমিত পরিসরে অমুসলমানদেরকে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। সে ধর্মকে চাপিয়ে দেয়ার জন্য তরবারী ধারণ করেনি, বরং আন্দোলন, সামগ্রিক জীবন বিধান ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে তরবারী ধারণ করেছিল। তার আসল সমস্যা ছিল নিজের পবিত্র রাজনৈতিক কাঠামোর স্থায়িত্ব ও সুস্থ বিকাশ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, কেননা তাতেই সমগ্র আরব জাতি ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিহিত ছিল। মুসলমানদের সর্বব্যাপী সংগ্রাম সংঘাতের পরিমণ্ডল ছিল রাজনৈতিক। সততা ও খোদাভীরুতার নৈতিক ভিত্তির ওপর রাজনীতি করার এক নতুন চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করতে শুরু করেছিল। আর এই মহৎ কাজটাকেই পন্ড করে দিতে চেয়েছিল কোরায়েশ, ইহুদী ও বেদুইন গোত্রগুলো। এ পরিস্থিতিতে এই নিরর্থক বিষয়টা আলোচনায় আসেই বা কিভাবে যে, রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা ধর্ম প্রচারের জন্য তরবারী ব্যবহার করেছিলেন কিনা? এ প্রশ্নই বা ওঠে কিভাবে যে, রসূল সা. এর সামরিক অভিযানগুলো আত্মরক্ষামূলক ছিল, না আক্রমণাত্মক? তথাপি আমাদের স্পর্শকাতর মুসলমানরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হয়ে গেছে। পশ্চিমাদের অন্যায় ও অর্থহীন যুক্তিকে মেনে নিয়ে তারা ভেবেছে, এতে নিজেদের ইতিহাসের পাতা থেকে তথাকথিত কিছু কলংকের দাগ মুছে ফেলা যাবে। সমস্ত আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তারা প্রাচ্যবিদদের দরবারে করজোড়ে ওযর ব্যক্ত করতে আরম্ভ করেছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও সীমিত ধারণা অন্তরের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল করে নিয়েছে এবং জেহাদ তত্ত্বকেও বিকৃত করে ফেলেছে। তাদের পশ্চিমা গুরুদের অবস্থা এইযে, তাদের ধর্মীয় নেতারা নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এবং তাদের রাজারা নিছক রাজ্য বিস্তারের জন্য যে জঘন্য যুদ্ধগুলো করেছে, তা তাদের কবিতায় ও সাহিত্যে আজও গৌরবের বিষয় বিবেচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন স্বাধীন দেশকে গোলাম বানানোর জন্য যে অন্যায় পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে, তাকে তারা সব সময় গর্বের বিষয় বলে মনে করে। তাদের নৌ দস্যুতার অপরাধ যদি উপনিবেশ গড়ার কাজে সহায়ক হয়, তাহলে তাকে তারা হিরো বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র যদি চতুর্মুখী হুমকিতে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজের নতুন শাসনব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষণ করা, কয়েকটা ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতিরোধ করা এবং ঐক্য, শৃংখলা, শান্তি, নিরাপত্তা, সুবিচার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ন্যায় দুর্লভ সম্পদে সজ্জিত হবার জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তাহলেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা তৈরী করা ও অপরাধ প্রমাণ করার জন্য পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ মানের প্রতিভাধারীরা নিরলস পরিশ্রম করে যেতে থাকে। এই সব দাবীদার ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের আদালতে মামলা চালানোর সময় এখন ঘনিয়ে এসেছে। তাদের ধাপ্পাবাজী ও জালিয়াতির মুখোস উন্মোচনের জন্য চার্জশীট তৈরী করার সময় এখন সমাগত। আমাদের এই জাতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য ইতিহাস ও সীরাত শাস্ত্রের যুবক ছাত্রদেরকে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামের জেহাদ তত্ত্ব আদৌ প্রচলিত প্রতিরক্ষার ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরী হয়নি। তবে তা এই অর্থে প্রতিরক্ষামূলক যে, তার উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সমাজের সংরক্ষণ, যে আদর্শের ভিত্তির ওপর ইসলামী বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শকে সংরক্ষণ করাই তার উদ্দেশ্য। এমন যে কোন কার্যকর নাশকতাবাদী শক্তির প্রতিরোধ তার লক্ষ্য, যা ইসলামী বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার পূর্ণতা অর্জনের পথে অন্তরায়, এবং এমন যে কোন অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করা তার উদ্দেশ্য, যা সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কোরআনের সমর দর্শন

এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। তবে কোরআনের কয়েকটি অতীব জরুরী অংশের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ঃ

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়, তাদেরকে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা যুলুমের শিকার। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তাদেরকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, "আল্লাহই আমাদের একমাত্র প্রভু।" আল্লাহ যদি (এভাবে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে) কিছু লোককে (যারা বিকৃতি ও বিপথগামিতার হোতা) অন্য কিছু লোকের দ্বারা (যারা গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজের পতাকাবাহী) ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করতেন, তাহলে (অপশক্তির দাপট বেড়ে যাওয়ার কারণে) সংসার বিরাগীদের আশ্রম, খৃস্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের এবাদতখানা ও মুসলমানদের মসজিদ, যাতে আল্লাহর নাম খুব বেশী উচ্চারিত হয়ে থাকে, ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহ শুধু তাদেরকেই সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর কাজে সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই (তাদেরকে সাহায্য করতে) আল্লাহ সর্বতোভাবে ক্ষমতাবান ও বিজয়ী। তারা এমন লোক, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করলে তারা (আত্মপূজা ও ধ্বংসাত্মক কাজের পরিবর্তে) নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, খারাপ কাজ প্রতিহত করবে এবং সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।" (হজ্জ ঃ ৩৯,৪০,৪১)

"আল্লাহর পথে (তাঁর ন্যায়সংগত বিধানের বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের জন্য) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে বাড়াবাড়ি করোনা।[২] যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। শত্রুদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল, সেখান থেকে তোমরাও তাদেরকে বের কর। কেননা ফেতনা (সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় প্রতিরোধ ও বাধা দান) হত্যার চেয়েও

---

২. এখানে বিস্তারিত তাফসীর আলোচনা করার অবকাশ নেই। তবে ততটুকু আভাস দেয়া জরুরী যে, বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করার অর্থ হলো, অশান্তিকামী ও নৈরাজ্যবাদীদেরকে দমন করতে গিয়ে শান্তিকামীদের ওপরও যেন শক্তি প্রয়োগ না করা হয়। দ্বিতীয়ত, সামরিক তৎপরতা একান্ত প্রয়োজনের সীমার বাইরে না চালানো উচিত। তৃতীয়ত, যুদ্ধের সময় ইসলামের নৈতিক বিধিবিধান ও যুদ্ধ আইন মেনে চলা উচিত।

খারাপ। মসজিদুল হারামের চত্তরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোনা। তবে তারা যখন (মসজিদুল হারামের মর্যাদা রক্ষা না করে) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তখন তোমরাও যুদ্ধ কর। তারপর যদি তারা সত্যিই (হারাম শরীফের সীমানার ভেতরে) তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরাও (কোন দ্বিধা সংকোচ না করে) তাদের সাথে যুদ্ধ কর। এ সব কাফেরকে (ইসলামী বিপ্লবের শত্রুদেরকে) এভাবেই উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যায়। এরপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু আছেনই। (অন্যথায়) তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ ইসলামী বিধান কায়েম করার পথ থেকে সকল বাধা অপসারিত না হয়ে যায় এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর বিধানের অনুসারী না হয়ে যায়। এরপর যদি তারা বাধা দেয়া থেকে বিরত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে অত্যাচারীদের কথা স্বতন্ত্র।" (বাকারা; ১৯০ থেকে ১৯৩)

"তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে, এবং বিশেষ করে ঐ সব অসহায় নরনারী ও শিশুকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করনা, যারা দোয়া করে যে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার কর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে কাউকে রক্ষক বানিয়ে পাঠাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে সাহায্যকারী বানিয়ে পাঠাও।" (নিসা-৭৫)

"এরপর যদি তারা চুক্তি করে তা ভংগ করে এবং তোমাদের ধর্মের ওপর টিটকারি দেয়, (এবং এভাবে প্রমাণ করে দেয় যে তারা ষড়যন্ত্র করতে বদ্ধপরিকর) তাহলে তোমরা ঐ সব ইসলাম বিরোধী শক্তির নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। তাদের দৃষ্টিতে তাদের চুক্তি ও অংগীকারের কোন মূল্য নেই। হয়তো তারা বিরত হবে। যারা তাদের চুক্তি লংঘন করে, রসূলকে (মদীনা থেকে) বের করে দেয়ার চক্রান্ত আঁটে, এবং তোমাদের ওপর সর্বপ্রথম আক্রমণ চালায়, তাদের সাথে কি তোমরা লড়বেনা? (তওবা-১২)

"তোমরা যদি (জেহাদের জন্য) বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। এবং তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসাবেন, তার কোন ক্ষতিই তোমরা করতে পারবেনা। আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম।" (তওবা-৩৯)

ইসলামের জেহাদ তত্ত্ব ও রসূল সা. এর অনুসৃত সমর নীতি সম্পর্কে কোরআনে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণার যোগ্য আয়াত রয়েছে। কিন্তু আমি সেগুলোর মধ্য থেকে কেবলমাত্র সেই আয়াতগুলোরই উদ্ধৃতি দিয়েছি, যা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যা থেকে শুধু মৌলিক তত্ত্বই পাওয়া যায়। এ আয়াতগুলোতে যে ক'টি বিষয় বুঝানো হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১- সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা বছরের পর বছর ধরে নির্যাতন ভোগ করে আসছিল এবং রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে সামষ্টিক যুলুমের সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল। প্রতিপক্ষ শুরু থেকেই নিপীড়নমূলক আচরণ করে আসছিল। কেননা মুসলিম সমাজকে তারা তিষ্টাতেই দিচ্ছিলনা। সত্যনিষ্ঠ লোকেরা আল্লাহকে প্রভু ও প্রতিপালক মেনে নিয়ে তার নির্দেশের অধীন জীবন গড়ে তুলুক-সে সুযোগই তারা দিতে চাইছিলনা। তারা আকীদা বিশ্বাস ও মতামত পোষণ, স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ, সত্যের

দিকে মানুষকে ডাকা এবং সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করে নিয়েছিল। এক নাগাড়ে কয়েকটি বছর ধরে তারা নিরীহ, ভদ্র শান্তিপ্রিয় ও ধৈর্যশীল বিপ্লবী মুসলমানদের ওপর বর্বরোচিত হিংস্র আঘাত হেনে হেনে আপন জন্মভূমিতে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

২- ইসলাম তার বিরোধীদেরকে বক্তব্য অনুধাবন ও আপন আচরণে পরিবর্তন আনার সর্বাধিক সুযোগ দিয়ে থাকে এবং এই সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যেই সে তার অনুসারীদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক সুদীর্ঘ যুগ অতিবাহিত করায়। কিন্তু তার এই ধৈর্যশীল অনুসারীরা চিরদিন কেবল মযলুম ও নির্যাতিতই হতে থাকবে এবং অত্যাচারীদের দর্প ও অহংকার বৃদ্ধি করতে থাকবে, এটা সে কখনো বরদাশত করতে পারেনা। মানব সমাজে কিছু সংখ্যক হিংস্র নরপশুকে লালন পালন করার জন্য সস্তা শিকার যোগাড় করে দেয়া ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। সে ধৈর্যশীলদেরকে গড়ে তোলেই এ জন্য যে, তারা যুলুমবাজদেরকে উচ্ছেদ করে মানব জাতির জন্য মুক্তির পথ উন্মোচিত করুক।

৩- নির্যাতন নিপীড়ন ও যুলুম শোষণকারী ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোর মূলোৎপাটন সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজ। কেননা এই নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোকে যদি বলপ্রয়োগে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ না করা হয় এবং তারা স্থায়ীভাবে কাজ করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। তাহলে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শান্তিপ্রিয়তা ও আল্লাহ প্রীতিমূলক সমস্ত মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য।

৪- ইসলামের বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রয়োজনের সময় অস্ত্রের শক্তির প্রয়োগ করে সেই সব লোকের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়, যারা বিশৃংখলা, অজ্ঞতা, দুষ্কর্ম-দুর্নীতি ও অন্যায় অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষক। অতপর এমন লোকদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে চায়, যারা আল্লাহর আনুগত্য, নামায ও যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করবে, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার বিস্তার ও বিকাশ ঘটাবে এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে।

৫- "যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর" এ কথার অর্থ এটা নয় যে, শত্রুরা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়ার পরই আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ কর। এখানে যে বিষয়টির দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে তা হলো, ইসলামের শত্রুদের মধ্যে যারা বিরোধিতায় ও প্রতিরোধে সক্রিয় নয়, তাদের পেছনে তৎপর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা তোমাদের কাজে প্রতিনিয়ত বাধার সৃষ্টি করে এবং আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে ও তোমাদের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ছাড়া গত্যন্ত নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর তারা কখন কার্যত হামলা চালাবে, সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় বসে থাকা জরুরী নয়। বরঞ্চ তাদেরকে যেখানেই বাগে পাওয়া যায়, সেখানেই খতম করা যেতে পারে। এর সপক্ষে সুস্পষ্ট ও অকাট্য যুক্তিও দেয়া হয়েছে যে, খুনখারাবি মূলতঃ কোন ভাল কাজ নয়। তবে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানো, গোলযোগ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং অবরোধ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা বহু গুণ বড় অন্যায় কাজ। ইসলামের শত্রুদেরকে এ কাজ চালিয়ে যেতে দেয়া হলে তারা ইসলামেরই মূলোৎপাটন করে ছাড়বে। এজন্য এই বৃহত্তর অন্যায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সশস্ত্র জেহাদের উদ্যোগ ও

সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া অপরিহার্য। সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রতিরোধ ও অবরোধ সৃষ্টিকারীদেরকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল না করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন চালু না হওয়া পর্যন্ত এই সশস্ত্র সংগ্রাম সর্বশক্তি নিয়োগ করে চালিয়ে যেতে হবে।

৬- একদিকে যদিও ধর্মীয় পবিত্র স্থান, সময় ও রীতিনীতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে ধর্মভীরুতার এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হয়েছে যে, শত্রুরা যদি এই সব পবিত্র জিনিসের সম্মান ও মর্যাদা পদদলিত করে মুসলমানদেরকে যবাই করতে থাকে, তবুও তারা টু শব্দটিও করবেনা এবং নিষিদ্ধ ও পবিত্র স্থান ও মাসের সম্মান রক্ষা করার বাধ্যতাবাধকতাকে গুরুত্ব দিয়ে অকাতরে বিনা প্রতিরোধে যবাই হতে থাকবে। বলা হয়েছে, তারা যদি কোন স্থান ও সময়ের মর্যাদাহানি করে আক্রমণ চালায় তবে সেই আক্রমণ সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

৭- মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব শুধু নিজেদের জানমাল ও সম্ভ্রম রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং অন্য কোন এলাকায়ও যদি দুর্বল ও অসহায় লোকেরা নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে থাকে এবং তারা অত্যাচারীদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে থাকে, তবে তাদের ফরিয়াদে সাড়া দেয়া ইসলামী সরকারের কর্তব্য। অর্থাৎ ইসলামী শক্তিকে গোটা মানব জাতির মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ধর্ম ও সভ্যতার উত্তম মূল্যবোধগুলোকে সংরক্ষণ করা তার ব্যাপকতর ও আসল কর্তব্য।

৮- যুলুম অন্যায় দূর করার জন্য চুক্তি করাও একটা শান্তিপূর্ণ উপায়। রসূল সা. এই উপায়টাও সর্বতোভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভংগকারীদের সম্পর্কে কোরআন কঠোর নির্দেশ দিয়েছে যে, শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। বিশেষতঃ যারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ইসলামী কেন্দ্রকে ধ্বংস করা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা প্রশাসনকে উৎখাত করা ও বিরাজমান শৃংখলাকে ধ্বংস করে অরাজকতা সৃষ্টির চক্রান্ত করে এবং প্রথম উস্কানী দেয়, তারা যদি খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা নাও করে থাকে, তথাপি তাদের এ জাতীয় প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে এক একটা যুদ্ধ ঘোষণা মনে করতে হবে এবং তাকে বিনা প্রতিরোধে চলতে দেয়া যাবেনা।

৯- এ প্রসংগে মুসলিম সরকারকে যে বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে, সেটি হলো, সামরিক তৎপরতার আসল উদ্দেশ্য নিরীহ ও নিরস্ত্র জনসাধারণকে হতাহত করা নয়, বরং ইসলামী বিপ্লবের বিরোধী ও কুফরি শক্তির মূল হোতাদেরকে খতম করা।

১০- জেহাদের ফরয আদায়ে শৈথিল্য ও উদাসীনতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, জেহাদে উদাসীন হলে তোমাদের এই রাষ্ট্র, সরকার ও ক্ষমতা- সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা যদি সাহস করে এগিয়ে না যাও, তবে বিরোধীরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে, এবং তোমাদেরকে হটিয়ে ও পদদলিত করে নিজেদের শাসন চালু করে ফেলবে। তখন তোমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে এবং টু শব্দটিও করতে পারবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তোমাদের কেমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে ভেবে দেখ।

ইসলামী যুদ্ধ-বিগ্রহের ধরন

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইসলামী জেহাদ তত্ত্বকে ভালো করে বুঝে নেয়া ছাড়া ইসলামী বিপ্লবের সংগঠকদের ও ইসলামী বিপ্লবের শত্রুদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ধরন ও প্রকৃতি বুঝা সম্ভব নয়। যে মূল কথাটা বুঝা দরকার তা হলো, আরবের দুটো ঐতিহাসিক শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটা শক্তি বাতিল ও অত্যাচারমূলক জাহেলী শাসন ত্রাসন থেকে জনগণকে মুক্তি দিয়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের নব যুগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আর অপর শক্তিটি গতানুগতিক জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন আছে তেমনভাবেই বহাল রাখার নিমিত্তে ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল। উভয়ের আদর্শে ও উদ্দেশ্যে কোন ধরনের স্থায়ী সমঝোতা বা আপোষ যেমন সম্ভব ছিলনা, তেমনি লেনদেন করেও দুইপক্ষের মধ্যে কোন সহাবস্থানের অবকাশ ছিল না। অবস্থাটা ছিল এ রকম যে, “হয় তোমরা থাকবে, না হয় আমরা থাকবো।” অথবা, সুপরিচিত ইংরেজী প্রবাদ অনুসারে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, “তুমি আগে ওকে মেরে ফেল, নচেত ও তোমাকে মেরে ফেলবে।” ব্যাপারটা অনেকাংশে এ রকম ছিল যে, একজন কর্মঠ কৃষক অনেক পরিশ্রম করে একটা পতিত জমিকে আবাদ করে তাতে ফলের বাগান বানালো। ঐ এলাকার পাশেই ছিল অরন্য। সেখান থেকে বুনো পশুরা এসে বাগান নষ্ট করে ফেলতে প্রবল ছিল। এমতাবস্থায় সে যদি বুনো পশুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে তার বাগান উজাড় হবে। আর যদি বাগানকে রক্ষা করতে চায়, তবে বুনো পশুদের প্রতি তাকে নিষ্ঠুর হতেই হবে। ইতিহাসে যখনই কোন সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটেছে, তখনই এ ধরনের আপোষহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ বিষয়টা ভালো করে বুঝে নিলে ইসলামী যুদ্ধগুলো আত্মরক্ষামূলক ছিল কি ছিলনা, সেই বিতর্কে যাওয়ার আর প্রয়োজন হয়না। মুসলমানরা তলোয়ার প্রয়োগ করে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে - এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অপপ্রচারের পথও বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এরও প্রয়োজন থাকে না যে, এক একটা লড়াই নিয়ে আলাদা আলাদা পর্যালোচনা চালিয়ে তার তাৎক্ষণিক কারণগুলো চিহ্নিত করা হবে এবং জেনেশুনে অপপ্রচারে লিপ্ত লোকদেরকে আশ্বাস দেয়া হবে যে, ইসলামী সরকারকে এ যুদ্ধটা অনন্যোপায় হয়ে লড়তে হয়েছিল। এর মূল দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ওপরই বর্তে।

আজ যখন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের পূর্ববর্তী কিছু কিছু বিজ্ঞজন বিভিন্ন যুদ্ধের, বিশেষত বদর যুদ্ধের কারণ পর্যালোচনা ও পরিস্থিতির একটা বিশেষ চিত্র অংকন করার জন্য ব্যাপকভাবে মাথা খাটিয়েছেন, তখন ভেবে কুলকিনারা পাইনা যে, এত চুলচেরা বিশ্লেষণকারীরা এমন সহজ সরল কথাটা কেন বুঝলেন না, যা একবার মাত্র বলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায় এবং আর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার পড়েনা? নবী জীবনী নিয়ে লেখা তাদের মূল্যবান গ্রন্থাবলী পড়ে এরূপ ধারণা পাওয়া যায় যে, আসল কারণটা কী ছিল বা ছিলনা, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেয়ার অধিকার যেন পাশ্চাত্যবাসীর। আমরা যেন শুধু তাদের দরবারে আমাদের সাফাই পেশ করারই অধিকার রাখি, এর চেয়ে বেশী নয়।' আমরা বিচার বিবেচনার এই রীতিটা পাল্টে ফেলতে চাই। আমাদের দ্বীন, আমাদের

ইতিহাস এবং আমাদের নবী জীবনী বুঝা ও বুঝানোর সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা আমাদের, অন্য কারো নয়। আমাদের দ্বীন ও আমাদের রসূল আমাদেরকে চিন্তাগবেষণা ও বিচার বিবেচনার যে মানদণ্ড ও মাপকাঠি দিয়েছেন, সেটাই আমাদের সব কিছু বুঝার সর্বোত্তম মাপকাঠি। আমরাই আমাদের অবস্থা যাচাই করার সবচেয়ে বেশী হকদার। পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণ - যে দিকেরই লোক হোক না কেন, আমাদেরকে আমাদের ধর্ম ও আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার তারা কেউ নয়। বরঞ্চ আমাদের কাছ থেকেই তাদের জেনে নেয়া উচিত আমাদের ধর্ম ও ইতিহাসের কোন্ জিনিসটার মর্ম কী? আমাদের অতীতের কীর্তিকলাপের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা এবং আমাদের পরিভাষার অর্থ বুঝানো আমাদেরই দায়িত্ব, অন্য কারো নয়। আমাদের ধর্ম, আমাদের ইতিহাস ও আমাদের নবীর জীবনেতিহাস যাচাই করার জন্য প্রাচীন খ্রীষ্টীয় গীর্জা অথবা আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার তৈরী করা মানদণ্ড আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ সব বাতিল মানদণ্ডে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে যাঁচাই করে দেখাতে আমরা প্রস্তুত নই।

মদিনার সামরিক কর্মকান্ডের ধরন

ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক কর্মকাণ্ডকে দুই সাম্রাজ্যের পারস্পরিক সংঘাত কিংবা দুই ধর্মীয় উপদলের সংঘর্ষ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এখানে আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়নের মত বিশ্বজয়ের কোন পরিকল্পনা যেমন ছিলনা, তেমনি ছিলনা হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মত স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কোন উচ্চাভিলাষ। এখানে একই দেশ ও একই জাতির লোকদের মধ্যে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল যে, এক পক্ষ জাতির পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নিস্বার্থভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছিল, আর অপর পক্ষ তাকে ব্যর্থ করে দেয়ার মতলবে তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মল, নিষ্কলংক ও ন্যায়নিষ্ঠ এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোরায়েশ, ইহুদী ও বেদুঈন গোত্রগুলো নিছক নেতিবাচক অন্ধ ভাবাবেগের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে জঘন্যতম অপকর্ম, অপরাধ, চক্রান্ত ও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বহু বছর ব্যাপী গোয়ার্তুমিপূর্ণ কর্মকাণ্ড চালানোর পর এখন পরবর্তী একটামাত্র পদক্ষেপই তাদের নেয়া বাকী ছিল, সেটা হলো প্রকাশ্য সশস্ত্র আগ্রাসন চালিয়ে ময়দানে নামা এবং সম্ভব হলে চিরতরে এই বিরোধের অবসান ঘটানো। কোরায়েশ আগে আগে এবং অন্যরা পেছনে পেছনে চললো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরই অস্তিত্ব খতম হয়ে গেল। এই যুদ্ধগুলোর সাথে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সেই সব সংঘর্ষের সাদৃশ্য রয়েছে, যা রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব থেকে শুরু করে অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে অথবা ফরাসী বিপ্লবের নামে রাজভক্তদের ও বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। অথবা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মতও বলা যেতে পারে। মক্কা ও মদিনার যুদ্ধগুরো মূলতঃ এক ধরনের গৃহযুদ্ধই ছিল। এই গৃহযুদ্ধের সর্বপ্রথম কারণ ছিল এই যে, একদিকে রসূল সা. পৈতৃক জাহেলী ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে আল্লাহর নির্দেশে একটা নির্ভুল কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অপর দিকে কোরায়েশ তাকে তার বিবেক ও মতের স্বাধীনতা প্রয়োগ করে কাজ করতে দিতে চাইছিলনা। জাহেলিয়তের হোতারা বলপ্রয়োগে সহিংস পন্থায় যুবকদের সচেতন বিবেকবুদ্ধিকে স্বাধীন মত ও বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত করতে

চেয়েছিল। আর এই সচেতন বিবেক নিজের স্বাভাবিক অধিকার অর্জন করতে ও অন্যদেরকে তা দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

মদিনার প্রাথমিক ইসলামী রাষ্ট্রের দশ বছরের সামরিক তৎপরতার এই ধরনটা প্রাণক্ষয়ের পরিসংখ্যান দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ কথা না মেনে উপায় থাকে না যে, রসূল সা. ন্যূনতম রক্তপাতের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। নামমাত্র প্রাণক্ষয়ের মাধ্যমে তিনি দশ লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখান। বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্যের স্তরে পৌঁছা পর্যন্ত সবমোট ২৫৫ জন মুসলিম শহীদ ও ৭৫৯ জন কাফের খুন হয়। (রহমাতুল্লিল আলামীন ঃ কাযী সুলায়মান মানসুর পুরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫) লক্ষ কোটি মানুষের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করার জন্য মাত্র ৭৫০ জন বিরোধীকে হত্যা করতে হয়। অপবাদ রটনাকারীদের উচিত এই পরিসংখ্যানের আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে দেখা। এই যুদ্ধগুলো যদি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে করা হতো, তাহলে তাতে শুধু যে ইহুদী ও খৃস্টানদের মত জঘন্যতম নৃশংসতা চালানো হতো তা নয়, বরং এর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক মানুষকে এক একটা যুদ্ধেই হত্যা করা হতো। রসূল সা. যদি দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষী হয়েই যুদ্ধে নামতেন, তাহলে বড় বড় সমর নায়করা যেভাবে অকাতরে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, তেমনি তিনিও আরবের মরুভূমিতে রক্তের ঢল বইয়ে দিতে পারতেন। দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সংঘর্ষ হলেও তাতে অনেক বেশী লোক ক্ষয় হতো, অনুরূপভাবে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা যেখানে ৬৫৬৪ ছিল, সেখানে তাদের মধ্যে থেকে মাত্র দু'জন বন্দীকে তাদের প্রমাণিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সর্বমোট ৬৩৪৭ জন বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। 'রহমাতুল্লিল আলমীন' গ্রন্থের লেখক অনেক গবেষণার পর বলেছেন যে, মাত্র ২১৫ জন বন্দীর পরিণাম সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। হয়তো পরবর্তীকালে জানা যাবে। খুব সম্ভবত তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম সমাজে বিলীন হয়ে গেছে। মদিনায় প্রকৃত পক্ষে একটা বিকাশমান ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং একই ভূখণ্ডের আত্মীয় অধিবাসীদের মধ্যে সংঘাত বেধে গিয়েছিল। অত্যন্ত স্বল্প পরিসর সময়ে তিন চারটে বড় বড় যুদ্ধে অতি সামান্য প্রাণক্ষয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আসলে এ নিষ্পত্তিটা জনমতের ব্যাপকতর গণ্ডীতেই হচ্ছিল।

ভাববার বিষয় যে, রসূল সা. এর স্থলে যদি অন্য কোন সমরনায়ক হতো, তাহলে এটা কি সম্ভব হতো হলো, সে বদরের ময়দানে নিজ সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিত যে, বনুহাশেমের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করোনা, কেননা তারা স্বেচ্ছায় আসেনি, বাধ্য হয়ে এসেছে, আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালেবকে হত্যা করোনা, আবুল বুখতারী বিন হিশামকে হত্যা করোনা? (ভুলক্রমে আবুল বুখতারীকে হত্যা করা হয়েছিল।) এটা কি কল্পনা করা যায় যে, বদরের বন্দীদের ছটফটানিতে অস্থির হয়ে মদিনার বিজয়ী শাসনের চোখের ঘুম আসেনা এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে তাদের বাঁধন ঢিলা করে দেন? এটা কি হতবুদ্ধিকর ব্যাপার নয় যে, ঠিক যুদ্ধ চলার সময়ে তিনি মক্কার লোকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে খাদ্যশস্যের অবরুদ্ধ চালান ইয়ামামা থেকে ছাড়িয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং আরো পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা দুর্ভিক্ষপীড়িত মক্কাবাসীকে নিজের পক্ষ থেকে পাঠালেন? উপরন্তু মক্কা বিজয়ের দিন যে

ব্যক্তির বিজয়পতাকা আকাশে উড়ছিল, তিনি যদি মুহাম্মাদ সা. ছাড়া আর কেউ হতেন এবং তার লক্ষ্য ইসলামের বিজয় ছাড়া অন্য কিছু হতো, তবে কি সে পারতো ১৫/২০ বছরের পাশবিক নির্যাতনের মর্মন্তুদ কালো ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে "আজ তোমাদের ওপর কোন অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত–" এ ঘোষণা দিতে? কখখনো নয়। অন্য কেউ হলে মক্কার অলিগলি কোরায়েশদের রক্তে ভেসে যেত।

আসলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রসূল সা. কে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হয়েছিল। কেননা এই পথ শাহাদাতের বধ্যভূমির ওপর দিয়েই চলে গেছে। কিন্তু তিনি ভূখণ্ড জয়ের পরিবর্তে মানুষের হৃদয় জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি তরবারী দিয়ে মানুষের দেহকে অনুগত করার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে মনমগজকে ও সুন্দর স্বাভাবিক চরিত্র দিয়ে মনকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আসল যুদ্ধ ছিল জনমতের ময়দানে। এই ময়দানে তাঁর শত্রুরা ক্রমাগত পরাভূত হয়েছিল। বস্তুত ইসলামী বিপ্লবের শত্রুদের সাথে রসূল সা. কে যে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছিল, সশস্ত্র যুদ্ধ ছিল তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

রসূল সা. এর সমর কৌশল

রসূল সা. এর সমরকৌশলের মূল কথা ছিল, শত্রুর রক্ত ঝরানোর চেয়ে তাকে অসহায় করে দেয়াকে অগ্রাধিকার দান, যতক্ষণ না সে সহযোগিতা করে অথবা প্রতিরোধ ত্যাগ করে। রসূল সা. এর পবিত্র জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণকারী উপমহাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী রসূল সা. এর সামরিক কৌশলকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আসলে রসূলুল্লাহ সা. শত্রুকে ধ্বংস করার পরিবর্তে বাধ্য করা পসন্দ করতেন।" (আহদে নব্বীকে ময়দানহায়ে জং, পৃঃ ৪৪)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

'রসূল সা. এর রাজনীতির লক্ষ্য কোরায়েশকে ধ্বংস করা ছিল না, বরং সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রেখে অক্ষম ও পরাভূত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য।" (আহদে নববী মে নিযামে হুকুমরান ঃ পৃঃ ২৪৯)

রসূল সা. এর অনুসৃত কলাকৌশলগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়ে ও ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা করে লেখক তাঁর এই অভিমতকে নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই কৌশলের আওতায় রসূল সা. নিম্নরূপ বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করেন ঃ

"তিনি নিজের প্রতিরক্ষা শক্তিকে সংখ্যা, সংঘবদ্ধতা, পরিশ্রম, সামরিক প্রস্তুতি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের দিক দিয়ে দ্রুত বিকশিত করেছেন, অতঃপর তাকে একটা যন্ত্রের মত সদা সক্রিয় রেখেছেন এবং তা দ্বারা বিরোধীদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্থ করে রেখেছেন।

মক্কাবাসীর বাণিজ্যপথকে অবরোধ (Blockade) করে তাদেরকে নিস্তেজ করে দিয়েছেন।

সমঝোতাও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রকে ক্রমান্বয়ে শত্রুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের সাথে নিয়ে নিয়েছেন।

সামরিক অভিযানের জন্য তিনি রকমারি কৌশল অবলম্বন করেছেন। কখনো অবলম্বন করেছেন শত্রুকে প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে আক্রমণের পন্থা (যেমন মক্কা

বিজয়)। কখনো অপ্রত্যাশিত পথ অবলম্বন করে এবং অভিযানের গন্তব্যস্থলকে গোপন রেখে বিরোধীদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছেন (যেমন বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ)। কখনো নিজের যুদ্ধের নীলনকশা আগে থেকে নিজের পক্ষে করে রেখেছেন (যেমন বদরের যুদ্ধ), আবার কখনো এমন কোন নতুন প্রতিরক্ষাকৌশল অবলম্বন করেছেন, যার পূর্বাভিজ্ঞতা শত্রুর ছিলনা (যেমন খন্দক যুদ্ধ)।

মদিনা রাষ্ট্রের গোটা দশ বছরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উল্লিখিত মৌলিক নীতির সুস্পষ্ট উদাহরণ। উপরন্তু আমরা যখন এর সাথে রসূল সা. এর সেই মহানুভব ও উদার দৃষ্টিভংগিকে যুক্ত করি, যা কোন বিজেতাসুলভ নয়, বরং মিশনারীসুলভ প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিল, এবং যা একজন হানাদার সমরনায়কসুলভ ক্রোধ ও আক্রোশের পরিবর্তে একজন দীক্ষাগুরুসুলভ গভীর হিতকামনা ও সমবেদনার প্রতীক ছিল, তখন বিভিন্ন মহল থেকে তোলা আপত্তি ও অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে হয়। অথচ ওগুলোর সাফাই দিতে গিয়ে প্রশ্চিমানুগতরা সমগ্র ঘটনা স্রোতকেই বিকৃত করতে বসেছে। রসূল সা. এর হৃদয়ে মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের যে মনোভাব সক্রিয় ছিল, তা ব্যক্ত করার জন্য আমরা কয়েকটা ঘটনার দিকে ইংগিত দিচ্ছি।

মক্কায় যখন যুলুম নির্যাতন চরম আকার ধারণ করলো এবং কোরায়েশদের আক্রোশ অতিমাত্রায় আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করলো, তখন সেই নারকীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতার প্রধান হোতা ছিল দু'জন-আবু জাহল ও ওমর ইবনুল খাত্তাব। এমন কট্টর দুশমনদের ব্যাপারে কোন দুনিয়াদার রাজনীতিক চরম রুষ্ট মনোভাব পোষণ না করে এবং মনে মনে তার ধ্বংস কামনা না করে পারতোনা। কিন্তু হিংস্রতার আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হয়েও রসূল সা. কাতর কণ্ঠে দোয়া করতেন, আল্লাহ যেন এই দু'জনের অন্তত কোন একজনকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দেন। এই দোয়া থেকে প্রমাণিত হয়, মানবতার এই সংগঠক নিজের শত্রুদের ধ্বংসের চেয়ে তাদের সংশোধনের বিষয় অগ্রাধিকার দিতেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে ভালো আশা পোষণ করতেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর দোয়া সফল হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো, তায়েফের অধিবাসীদের হিতকামনার অপরাধে তাদের হাতে রসূলের লাঞ্ছিত ও আহত হওয়ার ঘটনা। কোন দুনিয়াবী রাজনীতির পতাকাবাহীর কাছ থেকে এ ক্ষেত্রে এ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না যে, তার হৃদয় তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত, এবং সম্ভব হলে সে গোটা শহরকে তৎক্ষণাত উল্টে দিত। অন্যথায় সারা জীবন তাদের ওপর রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ থাকতো এবং ক্ষমতা হাতে পাওয়ার প্রথম সুযোগেই এমন অসভ্য শহরটাকে ধ্বংস করে দিত। তায়েফের এই নির্যাতনে রসূল সা. এর সাথী মর্মাহত হয়ে ঠিক এই ধারায়ই চিন্তা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এই নরপশুদের জন্য বদদোয়া করুন। এমনকি জিবরীলও তাঁর প্রচ্ছন্ন মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য জানান যে, তাঁর ইংগিত পেলে পাহাড়ের ফেরেশতারা মক্কা ও তায়েফকে পাহাড়ের মাঝে পিষে ফেলে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু রসূল সা. বললেন, না, ওরা অজ্ঞতার কারণে ভুল পথে চলছে। ওরা যদি ঈমান নাও আনে, তবে ওদের বংশধররা সত্যের দাওয়াত কবুল করে এক আল্লাহর অনুগত হয়ে যাবে।

তৃতীয় ঘটনা ওহুদের ময়দানের। মুসলমানদেরকে যখন কিছু ভুলত্রুটির কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কতার সংকেত স্বরূপ পরাজয় বরণ করানো হলো এবং স্বয়ং রসূল সা. গুরুতর আহত হলেন, তখন এক চরম তিক্ততার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে দৃশ্যত সঙ্গতভাবেই মর্মাহত কোন কোন সাহাবী রসূল সা. কে অনুরোধ করলেন, আপনি মোশরেকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন, তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তিনি জবাব দিলেন, আমাকে অভিশাপকারী করে পাঠানো হয়নি। আমাকে পাঠানো হয়েছে বার্তাবাহক ও সুসংবাদদাতা হিসাবে। এই বলে তিনি শত্রুদের জন্য দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতির লোকদেরকে সুপথ দেখাও। কেননা তারা জানেনা।" অর্থাৎ কোরায়েশদের কাছ থেকে আঘাতের পর আঘাত খেয়েও তার মধ্যে এমন আকাংখা জন্মেছিল যে, ওরা ধ্বংস হয়ে না যাক। বরং যুদ্ধাবস্থায়ও তিনি এই আকাংখ্যায় সোচ্চার থাকেন যে, তারা হেদায়াত লাভ করুন।

খয়বর অভিযানকালে কামুস দুর্গ জয়ের জন্য রসূল সা. হযরত আলী রা. কে বিশেষ পতাকা দিয়ে বললেন ঃ

"হে আলী, তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়াত পায়, তবে সেটা তোমার জন্য মস্ত বড় নিয়ামত হবে।"

অর্থাৎ শত্রুর শারীরিক ক্ষতি সাধন ও রক্তপাত করাই আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং যত বেশী সম্ভব, মানুষের মন মগজে পরিবর্তন আসুক এবং তারা নয়া জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করুক - এটাই অগ্রগণ্য।

এই কয়েকটা ঘটনা আমরা কেবল নমুনা হিসাবেই গ্রহণ করেছি, নচেত এমন প্রমাণের অভাব নেই যা রসূল সা. এর মৌলিক দৃষ্টিভংগি স্পষ্ট করে দেয়। যুদ্ধবাজ লোকেরা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো প্রিয় ও রগচটা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানবতার বন্ধু রসূল সা.কে আমরা অত্যন্ত শান্ত, দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চাভিলাষী দেখতে পাই। তাঁর রাজনীতিতে শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে কৌশল ও কল্যাণকামিতা সক্রিয়। রাজনৈতিক কুশলতা ও বিচক্ষণতার এর চেয়ে বড় অলৌকিক প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, তিনি মদিনায় যাওয়ার অব্যবহিত পরই বিভিন্ন পর্যায়ের লোকেদের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করে ফেললেন। কোন বৈপ্লবিক মতবাদের ওপর এক ফোঁটা রক্ত না ঝরিয়েই এভাবে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার দৃষ্টান্ত সম্ভবত সমগ্র মানবেতিহাসেও পাওয়া যাবে না। একমাত্র এটাই ছিল সঠিক অর্থে রক্তপাতহীন (Bloodless) বিপ্লব, যার গোঁড়ায় কোন মানুষের এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি এবং একটা লাশও পড়েনি। এমন হতবুদ্ধিকর ঘটনা স্বয়ং নবুয়তের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে।

এ কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় সামরিক তৎপরতা কোরায়েশ ও ইহুদী গোত্রগুলোর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল, যারা তাকে যুদ্ধের ময়দানে জোর করেই টেনে নিয়েছিল। কোরায়েশ ও ইহুদীরা ছাড়া অবশিষ্ট আরবরা সবাই নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে কর্মব্যস্ত ছিল। সামান্য কিছু এলাকা ছাড়া সমগ্র আরবের কোথাও যুদ্ধ হয়নি। বরঞ্চ আরবের সাধারণ জনতা উভয় শক্তির উদ্দেশ্য, চরিত্র ও রাজনৈতিক শক্তি সামর্থ নীরব দর্শক হয়ে পর্যবেক্ষণ করতো। যখন মুসলিম শক্তি সর্ব দিক

দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে, তখন বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের প্রতিনিধি দল এগিয়ে এসে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ সত্যটাও কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ছাড়েনি যে, সব ক'টা বড় বড় যুদ্ধ যথা বদর, ওহুদ ও খন্দক - শত্রুরা নিজেরাই হানাদার হয়ে মদিনার আশপাশে এসে করেছে। এভাবে তারাই রসূল সা. কে বাধ্য করেছে যেন শত্রুর শক্তির উৎসগুলোকে তিনি পদানত করে নেন। এ জন্য কোরায়েশ ও তাদের বশংবদদের শক্তি খর্ব করার জন্য মদিনার দিক থেকে মাত্র একবারই চূড়ান্ত অভিযান চালানো হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর হুনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধ প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়। অপর দিকে ইহুদীদের শক্তির কেন্দ্রগুলোকেও উৎখাত করা হয় ন্যূনতম প্রাণ ক্ষয়ের মাধ্যমে।

একটা ব্যাপক ভুল বুঝাবুঝি

হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে 'গুয্ওয়া' ও 'সারিয়া' নামে সামরিক অভিযান সমূহের যে লম্বা তালিকা দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণে অমুসলিমদের তো কথাই নেই, স্বয়ং অনেক মুসলমানও সাংঘাতিক রকমের ভুল বুঝাবুঝিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অথচ 'গুযওয়া' ও 'সারিয়া' হাদীস ও মাগাযীর (ইসলামের সামরিক ইতিহাস) গ্রন্থাবলীর বিশেষ পরিভাষা। এই পরিভাষা দুটোর প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা অর্থ নির্দিষ্ট রয়েছে। সামরিক প্রতিরক্ষামূলক অভিযান, টহল বা প্রহরা, বিদ্রোহী ও অপরাধীদের দমন, শিক্ষা বিস্তার ও দাওয়াত দান, কিংবা চুক্তি সম্পাদন ইত্যাকার রকমারি প্রয়োজনে যখনই কোন সেনাদল (তা সে মাত্র দু'জনেরই হোক না কেন) পাঠানো হতো তখন তাকে 'সারিয়া' বলা হতো। আর যে সেনাদলের সাথে রসূল সা. নিজে শরীক থাকতেন, তাকে বলা হতো 'গুযওয়া'। এ ধরনের সেনাদলের কার্যত কোন সংঘর্ষে বা অন্য কোন ধরনের তৎপরতায় জড়িত হতে হোক বা নাহোক, উভয় অবস্থায় তাকে সারিয়া অথবা গুয্ওয়া বলা হতো। ছোটখাটগুলো বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য বড় বড় সামরিক অভিযান মাত্র কয়েকটাই থাকে। যেমন বদর, ওহুদ, আহযাব বা খন্দক, খয়বর ও মক্কা (হোনায়েনসহ)। উল্লেখ্য যে, তবুক ও সন্নিহিত অঞ্চলে যে 'জায়শে উসরাত' ('কষ্টকর অভিযান') পাঠানো হয়েছিল, তার একমাত্র কারণ ছিল সিরিয়ার বিদেশী সরকারের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা এবং তার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি এখন সংক্ষেপে এই সামরিক অভিযানগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টার ওপর দৃষ্টি পড়ে তা হলো, সংঘর্ষের সূত্রপাত কিভাবে হলো। এর জবাব দেয়ার জন্য আমি আগে উভয় পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা পর্যালোচনা করবো।

কোরায়েশের আগ্রাসী মানসিকতা

কোরায়েশের মানসিকতা একটা ঘটনা থেকে আপনা আপনিই চিহ্নিত হয়ে যায়। তারা যখন রসূল সা. কে সামষ্টিকভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন মক্কার নেতারা আলোচনা করার সময় নিজেদের মানসিকতা খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছিল। একটা প্রস্তাব এসেছিল রসূল সা. কে লোহার নির্মিত কারাগারে দরজা তালাবদ্ধ করে আটকে রাখা হোক, যাতে তিনি ভেতরে ছটফট করে মরে যান। এ প্রস্তাব শুনে নাজ্দ থেকে

আগত এক প্রবীণ ব্যক্তি-শায়খ নাজদী বললো, "তোমরা যদি ওকে কারাবন্দী কর, তাহলে তার দাওয়াত লোহার কারাগারের বদ্ধ দরজা ভেদ করে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁর সাথীদের ওপর তার প্রভাব পড়বে। এমনকি এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা তাকে বের করে নিয়ে যাবে। তারপর তারা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হয়ে তোমাদের পরাজিত করবে।" আর একটা প্রস্তাব ছিল এই যে, "আমরা মুহাম্মাদ সা. কে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। তাড়িয়ে দেয়ার পর সে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে তা দিয়ে আমাদের কী কাজ? সে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেই হলো, আমরা নিজেদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নিলেই হলো এবং আমাদের পারস্পরিক প্রীতি বহাল হলেই হলো।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য শায়খ নাজদী এর যে পর্যালোচনা করলো তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মজলিসে তা গৃহীত হয়েছিল। শায়খ নাজদী বললো ঃ

"না, আল্লাহর কসম, এটা তোমাদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। তোমরা কি তার ভাষার মিষ্টতা ও লালিত্য দেখতে পাওনা, যা দিয়ে সে জনগণের মনে নিজের প্রভাব বদ্ধমূল করে? আল্লাহর কসম, তোমরা যদি এটা কর, তাহলে তোমরা তার কবল থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবেনা। সে আরবের যে কোন গোত্রে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারে, তারপর নিজের কথা দিয়ে জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, লোকেরা তার অনুসারী হয়ে যেতে পারে, সেই অনুসারীদের সাথে নিয়ে সে তোমাদের ওপর চড়াও হতে পারে, তোমাদের জনপদে প্রবেশ করতে পারে এবং তোমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদের সাথে যেমন খুশী আচরণ করতে পারে। কাজেই অন্য কোন কৌশল অবলম্বন কর।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ ৯৪)

শায়খ নাজদীর এ কথাগুলো পড়লে অনুমান করা যায়, সে কত চালাক এবং কত ধড়িবাজ ছিল। সে রসূল সা. এর ব্যক্তিত্বকে বুঝে নিতে মোটেই ভুল করেনি। সেই সাথে এই সমস্ত আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মক্কার কর্তাব্যক্তিরা তেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে রসূল সা. এর ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, বাণী, ও চরিত্র মাধুর্যকে তখন একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিপদ ও মারাত্মক হুমকি মনে করতে শুরু করেছিল। এ সময় তাদের ঔদ্ধত্য এতদূর পৌঁছে যায় যে, মানবতার এই মুক্তিদূত পৃথিবীর কোন একটা ভূখণ্ডে গিয়েও জীবিত থাকুক এবং কোথাও গিয়ে নিজের দাওয়াতী কাজ চালাতে সক্ষম হোক- এটা বরদাশত তারা করতে প্রস্তুত ছিলনা। নচেত তারা জানতো, তারা যে অত্যাচার চালিয়েছে এবং মুসলিম যুবকদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে তাড়িয়ে যে অপরাধ করেছে, তার হিসাব একদিন তাদেরকে দিতে হবে। তারপর তারা যেভাবে রসূল সা. কে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হলো এবং তিনি প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁকে ধরার জন্য যে ছুটোছুটি করা হলো এবং বড় আকারের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, তা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাধ্যে কুলালে তারা রসূল সা. কে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে চাইছিলনা। তাঁর অস্তিত্বই তাদের জন্য হুমকি এবং তাঁর জীবনই তাদের জন্য চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোরায়েশদের এই মনোভাব রসূল সা. তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারবেন না এর কোনই কারণ ছিল না।

এই ঘটনারও আরো একটু পেছনে চলে যান। আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের সময় হযরত আব্বাস আনসারদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "যে উদ্দেশ্যে তোমরা রসূল সা. কে দাওয়াত দিচ্ছ, সে উদ্দেশ্য যদি সফল করতে পার, এবং তার যে বিরোধিতা করা হবে তার যদি মোকাবিলা করতে পার, তাহলে তোমরা যে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, সেটা গ্রহণ করা সঠিক হবে।" তাছাড়া ঐ বায়য়াতের ভাষায় এই উদ্বোধনী কথাগুলোও খুবই তাৎপর্যবহ ছিল ঃ "তোমরা তোমাদের সন্তান ও পরিবার পরিজনকে যেভাবে রক্ষা করে থাক, সেইভাবে আমাকেও রক্ষা করবে।" তারপর আনসারদের জবাব লক্ষণীয় ঃ "আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা যুদ্ধবাজ লোক"। অতঃপর তাদের এই প্রশ্ন তোলা যে, "আপনার কারণে আমাদের বহু চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, এরপর এমন হবে না তো যে, আপনার জন্য আমরা এত কষ্ট ভোগ করবো, আপনি জয়ী হবেন, তারপর আমাদেরকে ছেড়েছুড়ে আপনি নিজ পরিবারে ফিরে যাবেন?" এবং রসূল সা. কর্তৃক "আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার" বলে আশ্বাস দেয়া খুবই তাৎপর্যবহ। অতপর আব্বাস বিন উবাদা আনসারী কর্তৃক নিজ সাথীদেরকে এই বলে হুশিয়ার করে দেয়াও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ঃ "তোমরা সারা বিশ্বের সাদা কালো সকল মানুষের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছ। সাবধান এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অনেক সম্পদ বিনষ্ট এবং গোত্রের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিহত হতে দেখে তোমরা রসূলকে সা. শত্রুর হাতে সোপর্দ করে দেবে। সব কিছু এখনই ভেবে চিন্তে স্থির করে নাও।"

এসব কথাবার্তার তাৎপর্য এই যে, কোরায়েশ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছিল, তার আলোকে শুধু রসূল সা. ও হযরত আব্বাসই নন, বরং দূর দূরান্ত থেকে আগত আনসাররাও দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তারা যে বায়য়াত করছেন, তা যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর।

এই বায়য়াতের বৈঠকের কথাবার্তা এক শয়তান আড়ি পেতে শুনে কোরায়েশদের জানিয়ে দিল। তারপর কোরায়েশের বাঘা বাঘা নেতারা আনসারদের আবাসস্থানগুলোতে যেয়ে যেয়ে বলতে লাগলো, "শুনেছি তোমরা মুহাম্মাদের সা. সাথে সাক্ষাত করেছ এবং তাকে আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাও। এও শুনেছি যে, তোমরা তার হাতে হাত দিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার চুক্তি করেছ। অথচ আরবের অন্য যে কোন গোত্রের তুলনায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের কাছে ঢের বেশী অপছন্দনীয়। অর্থাৎ আনসাররা যদি রসূল সা. কে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং তাকে নিজেদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখে, তাহলে মক্কাবাসী তাকে যুদ্ধ ঘোষণা গণ্য করবে। সেটা যদি মদিনাবাসী সত্যিই করে তবে সে ক্ষেত্রে কোরায়েশ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে আগাম যুদ্ধ ঘোষণা জানিয়ে দেয়া হলো। তবে কিছু লোক তো এ ঘটনা জানতোনা। যারা জানতো, তারা ব্যাপারটা চেপে রাখলো।

এরপর যখন বায়য়াতকারী আনসাররা মক্কা থেকে চলে গেল, তখন কোরায়েশরা এ বিষয়টা নিয়ে পরামর্শ করলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, ওদের পিছু ধাওয়া করা দরকার। মদিনার হজ্জ কাফেলা ভালোয় ভালোয় চলে গেল। তবে সা'দ বিন উবাদা ও মুনযির বিন আমরকে মক্কাবাসী ধরে আনলো এবং মারপিট করলো। এ ঘটনা থেকেও বুঝা যায়,

রসূল সা. মক্কা থেকে অক্ষতভাবে বেরিয়ে যান- এটা তাদের কাছে কতখানি অসহনীয় ছিল এবং রসূল সা. কে নিরাপদ আশ্রয় নেয়ার অঙ্গীকারকারীদের ওপর তাদের কত ক্রোধ ছিল।

এছাড়া আবিসিনিয়ার মোহাজেরদেরকে ফিরিয়ে আনা এবং মদিনাগামী মোহাজেরদেরকে প্রথম দিকে হিজরত থেকে ঠেকানোর যে চেষ্টা কোরায়েশরা করেছিল তা থেকেও বুঝা যায়, অন্য কোন ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলন শেকড় গাড়ুক, সেটাও তাদের মনোপুত ছিলনা। এ ধরনের যে কোন সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল।

এই সব ঘটনা থেকে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হিজরতের আগেই কোরায়েশদের পক্ষ থেকে এমন যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল, যে রসূল সা. কে নিজের কাছে আশ্রয় দেবে এবং ইসলামী আন্দোলনের ফসল তাদের ভূখণ্ডে ফলতে দেবে। ইসলামী বিপ্লবের সংগঠকরা এত বেকুফ ছিলনা যে, তারা এই চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করবে।

অবশেষে এই অলিখিত যুদ্ধের ঘোষণার খবর লিখিতভাবে একটা ষড়যন্ত্রমূলক চিঠির মাধ্যমে মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছে গেল। মদিনার বিশ্বাসঘাতকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর হাতে পৌঁছা এই চিঠিতে মদিনার আনসার ও ইহুদী সবাইকে এই মর্মে হুমকি দেয়া হয়েছিল যে, হয় তোমরা স্বেচ্ছায় মুহাম্মাদকে সা. মদিনা থেকে বের করে দাও, নচেত আমরা মদিনা আক্রমণ করে তোমাদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে প্রমোদ সংগিনী বানাবো।

এরপর ইহুদীদের সাথে যোগসাজশ করে কোরায়েশরা সরাসরি মুসলমানদের জানালো, "তোমরা মক্কা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পেরে উল্লোসিত হয়োনা। আমরা মদিনায় এসে তোমাদের মজা দেখাবো।"

এই সময়ই আবু জাহল সা'দ বিন মুয়াযকে কা'বার তওয়াফ করতে বাধা দেয় এবং খোলাখুলিভাবে বলে যে, তোমরা কা'বার চত্তরে পা রাখবে এটা আমি পছন্দ করিনা।

তথাপি এ সময় মক্কা থেকে অনবরতই দুষ্কৃতি ও লুটপাট চালানোর জন্য ছোট ছোট সেনাদল বেরুতে লাগলো। রসূল সা. এ খবর জানা মাত্রই পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে টহল গ্রুপ পাঠাতে লাগলেন। একাধিকবার মদিনার এ সব টহল গ্রুপ মক্কার ঐ সব সেনাদলকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়েই তারা পালিয়ে গেছে।

হিজরতের ত্রয়োদশ মাসে ঘটলো এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কিরয বিন জাবের ফেহরী মদিনায় এসে ডাকাতি করলো এবং মদিনার চারন ক্ষেত্র থেকে রসূল সা. এর পালিত পশু, সরকারী উট ও অন্যান্য লোকদের পশু হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনার সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল এইযে, আমরা তিন শো মাইল দূর থেকে এসেও তোমাদের রাষ্ট্রের সম্পত্তি এভাবে লুটপাট করে নিয়ে যেতে পারি।' (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮, আসহাহুস্ সিয়ার; পৃঃ ১২৫, রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪০)

রসূল সা. স্বয়ং একটা ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং যায়েদ বিন হারিসাকে মদিনার অস্থায়ী শাসক নিযুক্ত করে গেলেন। (বদরের নিকবর্তী) ওয়াদিয়ে

সাফওয়ান পর্যন্ত গিয়েও তাদেরকে ধরতে পারলেন না। এ ঘটনা শত্রুর এমন একটা ধৃষ্টতা ছিল, যাকে কোন ক্রমেই বরদাশত করা যায় না। যে সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে কিছুমাত্র বীরত্ব ও সাহসিকতা আছে এবং যাদের মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতা ও নিজেদের জন্মভূমির প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা আছে, তারা এ ধরনের স্পর্ধাকে সহ্য করতে পারেনা। এটা ডাকাতি হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল আক্রমণের সমার্থক। এবার মদিনার সামনে প্রতিভাত হলো একটা অনিবার্য যুদ্ধের যুগ এবং একটা রক্তঝরা ভবিষ্যত।

মদিনার ওপর মক্কার আক্রমণ দ্বিতীয় হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়ার পেছনে কোন গুরুতর কারণ ছিল। কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে থাকলে কোরায়েশরা এরও আগে হামলা চালাতো এবং মদিনার নয়া ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিরও সময় দিত না। মক্কা ও মদিনার মাঝখানে ছিল বনু কিনানা গোত্রের এলাকা। এদের সাথে কোরায়েশদের বহু পুরনো শত্রুতা ছিল। বনু কিনানা প্রথমত তাদের এলাকা দিয়ে কোরায়েশকে যেতেই দেবেনা বলে আশংকা ছিল। আর যেতে দিলেও দ্বিতীয় আশংকা ছিল, বনু কিনানা মক্কাকে অরক্ষিত দেখে আক্রমণ করে বসতে পারে। অন্তত পক্ষে, কোন নাযুক মুহূর্তে তারা মক্কার সাথে মদিনায় হামলারত কোরায়েশী বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে- এ আশংকা বিদ্যমান ছিল। সুরাকা ইবনে মালেক মাদলাজী কিনানী এই মধ্যবর্তী এলাকার সরদার ছিল। সে যখন জানতে পারলো, কোরায়েশ এসব আশংকার কারণে মদিনায় হামলা করতে পারছে না, তখন সে উপযাচক হয়ে মক্কা যেয়ে কোরায়েশদের সহযোগিতার আশ্বাস দিল। এই গাটছড়ার পরিণামেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কোরায়েশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন হামলার অপেক্ষায়ও ছিল না, সামরিক আগ্রাসন চালাতে কোন ফাঁকফোকরেরও সন্ধানে ছিল না। তাদের মধ্যে আগ্রাসনের মনোভাব ও সংকল্প পুরো মাত্রায় সক্রিয় ছিল। (রহমাতুলিল আলামীন)

মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

এবার আসুন দ্বিতীয় পক্ষের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

যখন আমরা রসূল সা. ও তাঁর বিপ্লবী সংগঠনের অবস্থা যাচাই করি, তখন প্রত্যেক দিক দিয়ে এই মর্মেই সাক্ষ্যপ্রমাণ পাই যে, তাঁদের কাছে সবচেয়ে অনাকাংখিত বিষয় ছিল যুদ্ধ। একে তো তারা ছিল অচেনা জায়গায় আগত চালচুলোহীন ও সহায়সম্বলহীন একটা দল, তদুপরি এই দলের অর্ধেক লোকই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য নিজেরাই সচেষ্ট ছিল। উপরন্তু ইসলামী বিপ্লবের সংগঠকদের সামনে একই সাথে হাজির হয়েছিল একটা নতুন পরিবেশকে ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলা, বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা, তাদের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দান এবং সর্বোপরি একটা নতুন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তার সকল বিভাগের প্রশাসনকে গড়ে তোলার কর্মসূচী। এগুলোর মধ্যে প্রতিটা কর্মসূচী দীর্ঘ সময় ব্যাপী অখণ্ড মনোযোগ ও শ্রম দাবী করে। এমন কঠিন সমস্যাবলীতে পরিবেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র দল কখনো যুদ্ধ চাইতে পারে না। কিন্তু অন্য দিকে তাদের ছিল একটা বিরাট আন্ত

মানবিক মিশন। সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা ছিল তাদের পবিত্র লক্ষ্য। জীবনের বৃহত্তম সত্য-অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের মশাল জ্বেলে গোটা সভ্যতাকে উদ্ভাসিত করে দেয়ার জন্য তারা নিজেদের জীবনের সকল সুখ শান্তি কুরবানী করে দিয়েছিলেন। ধৈর্য ও অন্যকে অগ্রাধিকার দানের ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর গুণগুলো অর্জন করে তারা সামনে এগুচ্ছিলেন। ইসলামের মহাসত্যই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র পুঁজি। তারা সংখ্যায় ছিল নিতান্তই কম এবং মদিনার রাষ্ট্রটাও ছিল একেবারেই নবীণ। এই পুঁজিটুকুর সাথেই জড়িত ছিলেন তাদের সমগ্র ভবিষ্যত। তারা এ রাষ্ট্রটাকে সংরক্ষণের জন্য যে স্বাভাবিক আগ্রহ লালন করতেন, তা ছিল আকাশে চিল উড়তে দেখে মুরগী কর্তৃক সব কিছু ভুলে নিজ বাচ্চাদেরকে পালক ও পাখনা দিয়ে ঢাকার ব্যাকুলতা ও উদগ্র বাসনার মতই। তারা তাদের শুকিয়ে যাওয়া জীর্নশীর্ণ দেহ নিয়েও পাহাড়ের সাথে টক্কর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সকল স্বাদ, আনন্দ ও স্বার্থ ভুলে গিয়ে এমন প্রতিটা শক্তির ডানা ভেঙ্গে দিতে তারা প্রবল আবেগ ও উদ্যম পোষণ করতেন, যে শক্তি তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাঁকা চোখে দেখে থাকে। তারা মদিনার প্রাণোচ্ছল বাতাসে ও বাগানে এবং ভ্রাতৃত্বের অনুপম পরিবেশে এসেও কখনো এক মুহূর্তের জন্য মক্কার সেই দুঃখবেদনাকে ভুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উদাসীনভাবে ঘুমাননি। তাদের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও মক্কার রাঘব বোয়ালদের তরবারীর ওপর থেকে সরেনি, যার কোন নিশ্চয়তা ছিল না যে কখন তারা তাদের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে না রসূল সা. কোন উদাসীনতা দেখিয়েছেন, আর না তাঁর সাথীরা দায়িত্ব পালনে কসুর করেছেন। তারা কোন যোগী বা সন্যাসী ছিলেন না, বরং অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কর্মঠ লোক ছিলেন এবং একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইছিলেন। এমন ইতিহাস সৃষ্টিকারী লোকদের মধ্যে বিরোধীদের শক্তির জবাব পাল্টা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেয়ার প্রয়োজনীয় মেধা ও বুদ্ধির অভাব ছিল না।

রসূল সা. এর প্রতিরক্ষা কৌশল

আসুন এবার দেখা যাক, রসূল সা. কী কী প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

মদিনায় রসূল সা. এর সাথে আগত মোহাজেরগণ শুধু নিজেদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান খুঁজবেন এমন লোক ছিলেন না। তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে আসার উদ্দেশ্যও কোন অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণ ছিল না। বরঞ্চ তারা এসেছিলেন একটা উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্যকে ভুলে গিয়ে তারা নিজেদের আখের গোছানো ও অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণের কাজে নিয়োজিত হননি। রসূল সা. সুশৃংখল পন্থায় তাদের পুনর্বাসিত করেছিলেন এবং আনসারদের সাথে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তাদেরকে মসজিদ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সাংগঠনিক শৃংখলার আওতায় নিয়ে আসেন। এবাদত, ওয়ায, কোরআন শিক্ষা ও অন্যান্য পন্থায় তাদের মানসিক, বাস্তব ও নৈতিক প্রশিক্ষণের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করে দেন এবং অত্যন্ত দ্রুততা ও ক্ষীপ্রতার সাথে এ কাজের বিস্তার ও বিকাশ ঘটান। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। এভাবে সেই সহায়সম্বলহীন মোহাজেররা

আনসারদের সাথে মিলিত হয়ে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হন এবং এই শক্তি ক্রমশ দৃঢ়তর হতে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, মানবীয় শক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

আনুসঙ্গিকভাবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো খুবই জরুরী। সেটা হলো, মক্কার মত মদিনাও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে অত্যন্ত উপযোগী স্থান ছিল। উপরন্তু মদিনার ভৌগলিক অবস্থানও এত চমৎকার ছিল যে, তা সিরীয় ও ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর একেবারেই সামনে অবস্থিত ছিল। আরবের শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্যিক সড়কের পাশেই এবং সমুদ্র থেকে মাত্র ৭০/৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এ শহর প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার এক মজবুত দুর্গ স্বরূপ ছিল। একটুখানি সচেতনতা, অধিবাসীদের সংঘবদ্ধতা ও প্রতিরক্ষার যুতসই কৌশল তাকে আরো শক্তিশালী বানাতে পারতো। মদিনা শহরটা প্রায় দশ মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া ময়দানে বিস্তৃত ছিল এবং খানিক দূরে দূরে বিভিন্ন গোত্রের ছোট ছোট বস্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই এলাকাকে 'মদিনার উদর' এবং 'হারাম' বা নিষিদ্ধ এলাকা বলা হতো। এই অসমান মাঠের মাঝখানে 'সালা' নামক পাহাড় এবং আরো কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। ঈর ও সূর পর্বত দ্বয় একে ঘিরে রেখেছে। গোত্রীয় বস্তিগুলোতে আজাম ও আতাম নামক মজবুত প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যুহ রয়েছে। এ ধরনের ব্যুহ এক সময় একশো পর্যন্ত ছিল।

মদিনার যে অংশটি 'মদিনাতুন্নবী' নামে পরিচিত ছিল, তা অবস্থিত ছিল মদিনার মধ্যখানে। এই অংশে মসজিদে নববী, নবী পরিবারের বাসস্থান এবং রাজধানী অবস্থিত। এর দক্ষিণে ছিল নিবীড় বাগান, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কোবা পল্লী ও আওয়ালী পল্লী ও তৎসহ বাগবাগিচা। পূর্ব দিকে কোবা থেকে ওহুদ পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ইহুদী মহল্লাগুলো। দক্ষিণ পশ্চিম দিকেও বহু সংখ্যক জনবসতি ও বাগবাগিচা ছিল। মদিনার প্রাচীন প্রাচীরের বাবুশ্শামী নামক দরজার কাছেই অবস্থান করতো বনু সায়েদা গোত্র (যাদের চাদঘেরা চত্তরে প্রথম খলিফার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছিল।) তারও সামনে সালা' পাহাড়ের ওপর বাস করতো বনু হারাম গোত্র। উত্তর পশ্চিমে 'ওয়াদী আল-আকীকে'র কিনারে বীরে রোমা পর্যন্ত বহু সংখ্যক বাগান ছিল, দক্ষিণে উঁচু উঁচু পাহাড় ছিল এবং বহু উচ্চ ভূমি ও সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে দুর্গম পথ চলে গিয়েছিল। মদিনার পূর্বে ও দক্ষিণে পাথুরে মাঠ ছিল। সে মাঠ না ছিল সামরিক শিবির স্থাপনের উপযোগী, আর না ছিল রণাঙ্গন হবার যোগ্য। কেবল উত্তর দিক দিয়ে শহরের রাস্তা সামরিক দিক দিয়ে উন্মুক্ত ছিল। তাই বদর ও ওহুদের যুদ্ধ করার জন্য কোরায়েশরা ঐ দিকটাই পছন্দ করলো। কিন্তু মক্কার সৈন্যদের উত্তর দিক দিয়ে যেয়ে হামলা করা সামরিক দিক দিয়ে জটিল ব্যাপার ছিল এবং মদিনার জন্য ছিল উপকারী।

কিন্তু মদিনার অবস্থান ও তার পরিবেশগত উপযোগিতাকে কাজে লাগাতে হলে তার সমগ্র জনশক্তিকে একটা শৃংখলার মধ্যে আনা অপরিহার্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে রসূল সা. এর দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃতিত্ব ছিল এইযে, চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইহুদী, আওস, খাজরাজ ও অন্যান্য গোত্রকে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ সত্ত্বেও একটা শৃংখলার আওতায় এনে ফেললেন। একেবারেই অজানা ও অচেনা পরিবেশে গিয়ে

পরস্পর বিরোধী মানুষদের কয়েক মাসের মধ্যে একই রাজনৈতিক এককে তথা রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত করে ফেলা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দক্ষতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর কুশলতার আরো বড় সাক্ষর এইযে, এই রাজনৈতিক এককের বা রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিচার, আইন রচনা, যুদ্ধ পরিচালনা ও সমালোচনার যাবতীয় ক্ষমতা রসূল সা. এর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মৌল চেতনা তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক দলীলে অংশ গ্রহণকারী সকলকে এই মর্মে অংগীকার করানো হয় যে, আরব গোত্র সমূহের সাথে যে সব মোশরেক ও ইহুদী যোগদান করবে, তারা মুসলমানদের অনুসারী এবং যুদ্ধের সময় তাদের সহযোগী হবে। তারা মক্কার কোরায়েশদের জীবন ও ধনসম্পদের রক্ষকও হবেনা, এবং মুসলমানরা যখন কোরায়েশদের ওপর আক্রমণ চালাবে, তখন মুসলমানদেরকে বাধাও দেবেনা। এতে এ কথাও স্বীকার করিয়ে নেয়া হয় যে, যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারটা হবে সামষ্টিক। যে কোন যুদ্ধ সবার জন্য যুদ্ধ হবে, এবং সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া সবার জন্য অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক হবে। তবে প্রত্যেক মিত্র নিজ নিজ অংশের যুদ্ধের ব্যয় নিজেই নির্বাহ করবে। ইহুদীদের সাথে এ বিষয়টা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্থির হলো যে, মুসলমানরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে তারাও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, এবং মুসলমানরা যাদের সাথে আপোষ ও সন্ধি করবে, ইহুদীরাও তাদের সাথে আপোষ ও সন্ধি করবে। মদিনার রক্ষণাবেক্ষণে তারা সমানভাবে অংশ গ্রহণ করবে। মুসলমানদের ওপর কেউ আক্রমণ চালালে ইহুদীরা মুসলমানদের সাহায্য করবে। এর জবাবে ইহুদীদের ওপর কেউ যদি আক্রমণ চালায়, তাহলে মুসলমানরা তাদেরকে সাহায্য করবে। (আহদে নববী মেঁ নিযামে হুকুমরানী ঃ ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী)

মদিনার সাংবিধানিক দলীলের এতদসংক্রান্ত ধারাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূল সা. কোরায়েশদের পক্ষ থেকে সামরিক আগ্রাসনের সুস্পষ্ট আশংকা অনুভব করছিলেন এবং তার মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিকভাবে যথাযথ আগাম প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন।

মদিনাকে হারাম তথা নিরাপদ শহর বা City of peace ঘোষণা করা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ সিদ্ধান্তটাও ঐ সাংবিধানিক দলীলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে এর তাৎপর্য ছিল এই যে, সমগ্র পরিবেশটা পবিত্র এবং এই পরিবেশকে সম্মান দেখানো তার অধিবাসীদের অপরিহার্য কর্তব্য। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য এই ছিল যে, কোরায়েশরা যেমন একটা নিরাপদ শহরে সংরক্ষিত ছিল, তেমনি রসূল সা. মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকেও একটা নিরাপদ বাসস্থান দিলেন। তাই এ দিক দিয়ে মক্কা ও মদিনার অবস্থা ছিল সমান সমান। এতে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা যদি মদিনার পবিত্রতা লংঘন করে তার অধিবাসীদের ওপর বাড়াবাড়ি কর, তাহলে তোমরাও মক্কার নিরাপত্তা ও পবিত্রতার বেষ্টনীর মধ্যে অক্ষত থাকতে পারবে না।

মদিনার নিরাপত্তা বেষ্টনী ইসলামী সরকারের সদর দফতর বা রাজধানীর সীমানাও চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ঐ সীমানাকে স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করার কাজে রসূল সা. বিশেষভাবে

মনোযোগ দেন। তিনি হযরত কা'ব ইবনে মালেককে আদেশ দেন, মদিনার চতুসীমায় উঁচু উঁচু মিনার নির্মাণ করাও। এই আদেশ অনুসারে তিনি যাতুল জায়েশের (যা নাকি বায়দার মাঝখানে অবস্থিত হুফায়রা পাহাড়ের সাথে অবস্থিত। এটা মক্কা মদিনার রাস্তায় বিদ্যমান) এর টিলার ওপর, হুশাইরিব (যাতুল জায়েশের সাথে যুক্ত) আর মাখীযের পাহাড়ের ওপর (সিরিয়ার পথে) হুফাইয়াতে (মদিনার উত্তর দিকে জংগলে) এবং যুল উশাইর নামক স্থানে (হুফাইয়ার কিনারে অবস্থিত) আর তীম পাহাড়ে (মদিনার পূর্ব দিকে) জায়গায় জায়গায় প্রতীকী স্তম্ভ নির্মাণ করেন, যার ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এই চিহ্নিত বেষ্টনী প্রায় এক মনযিল লম্বা ও এক মনযিল চওড়া। (আহদে নববীকে ময়দানহায়ে জংঃ ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী, পৃঃ ১১-১২)

মদিনার অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বহাল করার পর রসূল সা. অবিলম্বে পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন। মদিনার দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা এবং লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে তিনি একধিকবার সফর করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভ্রমণ করেন দুয়ান নামক স্থানে। এটা মক্কার পথে আবওয়া থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে তিনি বনী হামযার সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে ইয়ামবুর আশপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথেও দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এলাকায় তিনি প্রথম হিজরীতে জুহায়না গোত্রের সাথে, দ্বিতীয় হিজরীর শুরুর দিকে বনু যামরা, বনু যুরয়া, বনু রাবয়া, এবং দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকে বনু মাদলাজের সহযোগিতাও পেয়ে গেলেন। কোন কোন গোত্রের সাথে তো যৌথ প্রতিরক্ষার চুক্তিও সম্পাদিত হলো যে, তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানরাও তাদেরকে এবং মুসলমানরা আক্রান্ত হলে তারা ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করবে। কোন কোন চুক্তিতে শুধু এতটুকু বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় যে, রসূল সা. এর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা চলবে না। কোন কোনটায় শুধু নিরপেক্ষতার স্বীকৃতি আদায় করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যদি কোন শত্রুর লড়াই চলে, তবে চুক্তিবদ্ধ গোত্র নিরপেক্ষ থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, রসূল সা. এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় যথেষ্ট নমনীয়তা ছিল। (আহদে নববীকে ময়দান হায়ে জং)

এই মৈত্রীর পরিবেশ এই সব গোত্রের ভেতরে ইসলামের প্রসারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, এবং এর কারণে এসব গোত্রে যে ইসলামী আন্দোলনের প্রচুর সমর্থক ও কর্মী গড়ে উঠেছিল, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তীকালে রসূল সা. এর রাজনীতির এই কৌশল একটা স্বতন্ত্র নীতিতে পরিণত হয় এবং তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক এলাকায় সফর করেন। সামরিক অভিযানের জন্যই হোক কিংবা টহলের উদ্দেশ্যেই হোক, যখনই তিনি মদিনা থেকে বেরুতেন, মৈত্রীর সম্পর্ক সম্প্রসারণ সব সময়ই তার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। এখানে আমি বিশদ বিবরণ দিচ্ছি না। এর সুযোগ পরবর্তীতে আসবে। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলবো যে, শত্রুকে দুর্বল করা, ইসলামী আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নেয়া, নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতিকে সবল করা এবং রাষ্ট্র সীমা সম্প্রসারণের একটা অত্যন্ত প্রভাবশালী পন্থা ছিল এই মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন।

এই সব কৌশলের পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবের আহবায়ক রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা এই বাস্তবতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝখানে কোন রকমে মাথাগুজে থাকার জন্য যে ক্ষুদ্র দ্বীপটা তারা পেয়েছেন, তার অস্তিত্ব সর্বদাই হুমকির সম্মুখীন। তাই হয় ঝড়ের গতি উল্টে দিয়ে সমুদ্রকে বসে আনতে হবে, নচেত এই দ্বীপও একটা বুদবুদের মত চিরতরে সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। তাঁরা অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে নিজেদেরকে একটা সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিলেন। তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের নিত্য নতুন দাবীগুলোকে এত নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করতেন যে, নতুন ধাপগুলোতে যাওয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের মধ্যে যোগ্যতার সৃষ্টি করে নিতেন। মদিনায় যখন জেহাদের ডাক এল, তখন তারা এক সেকেন্ডের জন্যও নিজেদের সাবেক অবস্থা থেকে নতুন ভূমিকায় স্থানান্তরিত হতে দ্বিধা সংকোচ বোধ করেননি। তাদের মধ্যকার কেউ কখনো এ কথা ভাবেনি যে, আমরা তো দাওয়াতদানকারী ও বক্তা, যুদ্ধাবিগ্রহের সাথে আমাদের কিসের সম্পর্ক? ওটাতো দুনিয়াবী রাজনীতিবিদ ও রাজ্যজয়ীদের কারবার। আমাদের ন্যায় সংস্কারকদের এসব শোভা পায় নাকি? রাজনীতি ও শাসন, কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ তো ধর্ম প্রচারকদের কাজ হতে পারে না।

প্রচারকদের কাজ তো পড়ে থেকে মার খেতে থাকা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। মদিনার ইসলামী দল যদি এ রকম চিন্তা করতো, তাহলে ইসলামী আন্দোলন ওখানেই খতম হয়ে যেত। তাকে খতম করার জন্য বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন হতোনা।

এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক সাহাবী নিজেদের দ্বীন প্রচারেও দক্ষ ছিলেন, আবার এই দ্বীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায়ও সর্বোত্তম আত্মনিবেদিত সিপাহী ছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে সুসংগঠিত সৈনিকে রূপান্তরিত করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যে মদিনা একটা নিরাপদ শহর, একটা বিদ্যালয় এবং ইসলামী সভ্যতা চর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল, সেই মদিনা একটা মজবুত সামরিক ঘাটিতে ও পরিনত হলো।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সা. এর ওপর একজন সেনাপতির দায়িত্ব এসে পড়লো। এ দায়িত্ব তিনি এত সুষ্ঠুভাবে পালন করেন যে, কেবল এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেই অসংখ্য বড় বড় বই লেখা হয়ে যাবে।

টহল দানের ব্যবস্থা ও তার উদ্দেশ্য

মদিনা রাষ্ট্রের মহান রাষ্ট্রপ্রধান হিজরতের মাত্র চার ছ'মাস পরই আশপাশের এলাকায় টহল দানের জন্য সেনাদল পাঠানো শুরু করেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে নিম্নোক্ত সেনাদলগুলো পাঠানো হয় ঃ

১- সেনাপতি হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ৩০ জন সৈনিকের একটা দল সাইফুল বাহর নামক স্থান অভিমুখে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। আবু জাহল তিনশো লোক নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের চৌকিরত দেখে ফিরে গেল। (এ ছিল রমযান, হিজরী-১)।

২- আবু উবাইদা বিন হারিসের নেতৃত্বে ৬০ সদস্যের সেনাদল মক্কাবাসীর সামরিক অবস্থা জানার জন্য পাঠানো হয়। শত্রুর ২০০ লোককে ইকরামা অথবা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ছানিয়াতুল মাররা নামক জায়গায় পাওয়া যায়। এই সেনাদল টহল দিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। (এটা ছিল শওয়াল- হিজরী ১)।

৩- সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বের ৮০ সদস্যের একটা সেনাদল টহল দানের জন্য জাহফা পর্যন্ত পাঠানো হয়। তারা কোন আক্রমণ ছাড়াই ফিরে আসে। (জিলকদ- হিজরী-১)।

৪- রসূল সা. স্বয়ং ৭০ ব্যক্তিকে নিয়ে আবওয়া অঞ্চলে গমন করেন। কোরায়েশদের বাণিজ্য পথ আবওয়ার ভেতর দিয়েই যায়। রসূল সা. আমর বিন ফাহ্শী যামরীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই ফিরে আসেন। (সফর, হিজরী -২)।

৫- রসূল সা. স্বয়ং ২০০ সৈনিককে নিয়ে বুয়াতের দিকে (ইয়াম্বুর নিকট রাজভী পাহাড়ের এলাকা) যান। পথিমধ্যে উমাইয়া বিন খালফের নেতৃত্বে একশো ব্যক্তির এক কোরায়েশী কাফেলার সাক্ষাত পান। তবে কোন চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। (এটা ছিল রবিউল আওয়াল, হিজরী ২)।

৬- কিরয বিন জাবের আল ফেহরী মদিনার পশু ডাকাতি করে নিয়ে গেলে রসূল সা. ৭০ জন সৈন্য নিয়ে ধাওয়া করেন। কিরয প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে এই ধাওয়া করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মদিনা এক সদাজাগ্রত ও সদা তৎপর শক্তি। (রবিউল আউয়াল, হিজরী ২)।

৭- রসূল ১৫০ ব্যক্তির এক বাহিনী নিয়ে যুল উশাইর (মক্কা ও মদিনার মাঝখানে ইয়াম্বুর নিকট) চলে যান এবং সেখানে বনু মাদলাজ ও বনু যামরার সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। (জমাউদিউস্ সানী, হিজরী ২)।

৮- আব্দুল্লাহ বিন জাহসের নেতৃত্বে ১২৫ ব্যক্তির এক সেনাদল নাখলার দিকে টহল দিতে পাঠানো হয়। এই বাহিনী কোরায়েশের এক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। (রজব, হিজরী ২)।

এই সমস্ত সেনা অভিযান সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতোনা। বরং নাখলায় তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির প্রভাবে মদিনার স্থিরীকৃত নীতির বিরুদ্ধে যে সংঘর্ষ ঘটে, তাতে রসূল সা. অসন্তোষ প্রকাশ করেন, বন্দীদেরকে মুক্তি দেন এবং নিহত ব্যক্তির জন্য রক্তপণ দেন। এ সব অভিযানের আরো বড় বড় কিছু উদ্দেশ্য ছিল। যেমন ঃ

মদিনা রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা, শত্রুর গতিবিধি তদারক করা, কোরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রকে জানিয়ে দেয়া যে, মদিনায় এখন যথারীতি সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং মদিনাই তার রাজধানী, মুসলিম বিপ্লবী দলের সেচ্ছাসেবকগণের আশপাশের এলাকা, জনপদ সমূহ ও তার ভেতরকার অবস্থা, রাস্তাঘাট ও জলাশয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। সেনাপতিত্ব করা, সেনাপতি থাকা অবস্থায় দায়িত্ব পালন করা, পারস্পরিক দায়িত্ব বণ্টন, সময় ভাগ করা, কৌশল উদ্ভাবন করা। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ। কেননা এ ছাড়া কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারেনা। তা ছাড়া কোরায়েশদের এটা জানিয়ে দেয়াও উদ্দেশ্য

ছিল যে, এখন তাদের অর্থনীতি মদিনার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। মুসলমানরা যখন ইচ্ছা, তাদের বাণিজ্যিক পথ অবরোধ করে তাদের কাফেলার চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে। উল্লেখ্য, রসূল সা. বাল্যকালে বসরা ও মদিনায় এবং যৌবনে পুনরায় সিরিয়ায় সফর করেছিলেন। এই সময় তিনি মদিনার ভৌগলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝে নিয়েছিলেন এবং কোরায়েশদের বাণিজ্যিক পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছিলেন। এই পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভীতি প্রদর্শন ও চাপ দেয়ার নীতি উদ্ভাবনে তিনি কোন জটিলতার সম্মুখীন হননি। অপরদিকে রসূল সা. কোরায়েশদের একজন হওয়ায়, বিশেষত ব্যবসায়ী হওয়ায় কোরায়েশদের উপার্জনের সবচেয়ে বড় উপায় তাঁর জানা ছিল। তায়েফ, ইয়ামান ও নাজরানের বাণিজ্যের কথা বাদ দিলেও কেবল সিরিয়া ও ইরাকের ব্যবসায় থেকে কোরায়েশের প্রতি বছর আড়াই লাখ আশরাফী উপার্জিত হতো। (তাফহীমুল কুরআন)

এই সেনাদলগুলোকে যে প্রশিক্ষণমূলক পরিকল্পনার অধীন পাঠানো হতো, তাতে সৈনিকদের যুদ্ধ পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করা হতো, যাতে তারা একটা কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে যন্ত্রের মত সচল ও সক্রিয় হতে পারে, তাদের কাতারবন্দীর ট্রেনিং হয়, পতাকা ও সামরিক প্রতীক সমূহের ব্যবহার শেখে, কঠিন পরিস্থিতিতেও নামায রোযা ও শরীয়তের অন্যান্য বিধান মেনে চলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এই সাথে তিনি খবর সংগ্রহের এক জোরদার ব্যবস্থারও প্রচলন করেন। এর কারণে তিনি মক্কা ও আশপাশের গোত্রগুলো ও সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখতে পারতেন। এই সাথে তিনি রাজধানী ও সরকারের কেন্দ্রীয় দফতরের হেফাজত ও প্রহরার ব্যবস্থাও করেন।

এই ছিল দো'তরফা পরিস্থিতি, যার কারণে কোরায়েশরা বদরের যুদ্ধ সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

দুটো বাস্তব কারণ

একটা যুদ্ধের জন্য পরিস্থিতি যে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল, তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কিরয বিন জাবের ফেহরীর ডাকাতি মদিনার জন্য নিঃসন্দেহে একটা যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছিল। কেননা কোন জ্যান্ত জাগ্রত সরকার নিজ সীমানার অভ্যন্তরে বহিরাগতদের এমন অপরাধজনক অনুপ্রবেশকে আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করতে পারেনা। অপর দিকে নাখলার ঘটনা ঘটে গেল। ঐ ঘটনা যদিও সীমান্ত সংঘর্ষের মতই ছিল, যা সরকার ও সেনাপতিদের অনুমতি ছাড়াই দু'দেশের সৈনিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ ঘটনার জন্য মক্কাবাসী অপপ্রচার চালানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। তারা ব্যাপক হৈ চৈ করলো যে, দেখলে তো, নতুন ধর্মের ধ্বজাধারীরা নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতাও পদদলিত করে ফেললো। এদিকে রসূল সা. ঐ ঘটনায় আটক বন্দীদের ছেড়ে দিলেন, নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধ করলেন এবং নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হিসেবে ঐ ঘটনার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু সাথে সাথে কুরআন মক্কাবাসীর প্রচারণাকে এই বলে খণ্ডন করলো যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ ভালো নয় ঠিকই, কিন্তু তোমরা যে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে বাধা দিয়ে চলেছ, তাদেরকে হারাম শরীফ থেকে বের করে দিয়েছ, এবং মানবতার সংস্কার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছ, সেটা যুদ্ধ ও হত্যাকান্ডের চেয়েও খারাপ কাজ। তোমাদের এই অপকর্মের

মূলোৎপাটনের জন্য যদি মুসলমানরা অস্ত্র ধারণ করে, তবে সেটা হবে তাদের একটা কল্যাণমূলক কাজ। নাখলার ঘটনার একটা ভালো দিক ছিল এইযে, কোরায়েশরা সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, যাদেরকে তারা সর্বহারা করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং যাদেরকে তারা ভাবতো বিড়ালের মুখের সহজ গ্রাস, তারা ঢিলটির জবাব পাটকেলটি দিয়ে দিতে সক্ষম। তবুও মক্কার প্রচারবিদরা ক্রোধের আগুন জ্বালাতে নাখলার ঘটনার থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করলো।

কোরায়েশদের তিনটে প্রয়োজন

মদিনার ওপর আক্রমণ চালাতে কোরায়েশদের সামনে তিনটে বড় বড় সমস্যা ছিল। এক, বনু কিনানার সহযোগিতা পাওয়া। দুই, যুদ্ধ করার জন্য লড়াকু যোদ্ধা সরবরাহ। তিন, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ। প্রথম সমস্যাটার সমাধান কিভাবে হলো, তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় সমস্যাটার সমাধান হলো এভাবে যে, আহাবশীদের সাথে কোরাশেদের চুক্তি সম্পাদিত হলো। মক্কার কাছেই হুবশী নামক একটা পাহাড় রয়েছে। ঐ পাহাড়ের কাছে বসবাসকারী বনু নযীর, বনু মালেক ও মুতাইয়িরীন প্রমুখ গোত্র পরস্পরে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করে। তাদেরকে আহাবীশ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মক্কার অধিবাসীদের তুলনায় আহাবীশদের যোদ্ধাসুলভ যোগ্যতা অনেক বেশী ছিল। তারা শুধু মৈত্রীর ভিত্তিতে নয়, বরং ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেও কাজ করতো। অবশ্য তাড়াহুড়োর কারণে বদরযুদ্ধে তাদেরকে সাথে নেয়া সম্ভব হয়নি। বদরযুদ্ধের ফলাফল দেখে কোরায়েশ নেতাদের এই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়েছিল। ওদিকে (বারো শাখা বিশিষ্ট) ইহুদী গোত্র বনুল মুসতালিকের সাথে কোরায়েশদের সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। (রহমাতুল্লিল আলামীন)

তৃতীয় সমস্যার সমাধান করা হলো এভাবে যে, কোরায়েশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া যাচ্ছিল, তাকে মক্কাবাসী বিপুল পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করলো। এমনকি গৃহবধুরা পর্যন্ত নিজ নিজ অলংকারাদি ও অন্যান্য সঞ্চয় এনে দিল। আবু সুফিয়ানের সাক্ষ্য এইযে, মক্কায় এমন কোন নারী বা পুরুষ ছিল না যে এই কাজে অংশ গ্রহণ করেনি। (সীরাতুন্নবী, শিবলী, ১ম খন্ড, পৃ ২৯২) উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক পুঁজি বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা লাভ করা এবং এই উপার্জন দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়া।

বাণিজ্য কাফেলা ছিল যুদ্ধের অগ্রবর্তী বাহিনী

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যুদ্ধের অন্যান্য প্রস্তুতির পাশাপাশি (যার সংবাদ রসূলুল্লাহ সা. তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যেতেন) এই কৌশল অবলম্বনের অর্থ ছিল এইযে, কোরায়েশদের এই বাণিজ্য কাফেলা সামরিক অভিযানেরই অগ্রবর্তী বাহিনী ছিল। অন্য কথায় বলা যায়, এ কাফেলা ইসলামী আন্দোলনের গলা কাটার জন্য সোনার তরবারী যোগাড় করতে বেরিয়েছিল। পরিস্থিতি যখন এমন হয়, তখন আজও পৃথিবীর কোন সুসভ্য সরকারও নিজের সীমান্ত ঘেষা স্থল, নৌ ও আকাশ পথ দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরাপদে চলাচল করতে দিতে পারেনা। বিমান গুলী করে ভূপাতিত করা হয়, সামুদ্রিক জাহাজকে আটক করা বা টরপেডো দিয়ে ধ্বংস করা হয়, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, ডাক চলাচলে

বাধা দেয়া হয় এবং বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। শুধু মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের কাছেই এ নজীরবিহীন আবদার কেন করা হয় যে, তার প্রতিপক্ষকে তার বুকে ছুরি চালানোর অবাধ অনুমতি দেয়া উচিত ছিল? তা না দেয়াতে তার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে কেন লুঠতরাজ নাম দেয়া হয়? একথা যখন সবার জানা যে, চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী থাকার কারণে যে সব এলাকা মদিনার আওতাধীন, সে সব এলাকা দিয়েই বাণিজ্যিক পথ গিয়েছে, তখন কোন্ কারণে ইসলামী সরকারের পক্ষে স্বীয় এলাকা দিয়ে শত্রুপক্ষকে চলাচল করতে দেয়া সমীচীন হতো?

মদিনায় এই কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানোর যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তার জন্য সাফাই দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। তাকে কোন পর্যায়েই রাজনৈতিক বা প্রতিরক্ষামূলক পাপ মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এই কাফেলার ওপর আক্রমণ করার কোন ইচ্ছা যদি মুসলমানদের থেকে থাকে তবে তা ছিল সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আবু সুফিয়ানের মনে যদি এ ধরনের আশংকা জন্মে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। এরূপ আশংকাযুক্ত পরিবেশে মদিনার কোন একটা পদক্ষেপের কারণে আগে ভাগেই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, কাফেলার ওপর হামলার প্রস্তুতি চলছে। ওদিকে আবু সুফিয়ান সিরিয়া যাওয়ার সময়ও মদিনার পরিবেশ যাচাই করে গিয়েছিল এবং ফেরার পথে খুবই সন্তর্পণে পা ফেলছিল। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর সে যখন অনুভব করলো, রহস্যময় তৎপরতা চলছে এবং বিপদ একেবারেই আসন্ন, তখন সে সামরিক সাহায্য চাওয়ার জন্য মক্কায় দূত পাঠিয়ে দিল এবং কাফেলার পথ পরিবর্তন করলো। দূত মক্কায় পৌঁছে আরবদের বিশেষ ভংগীতে উটের কান কাটলো, নাক চিরলো, উটের পিঠের আসন উল্টে দিল, জামা ছিড়ে ফেললো এবং ঐতিহ্যগত নিয়মে নগ্ন হয়ে চিল্লাতে লাগলো ঃ "ওহে মক্কাবাসী, তোমাদের কাফেলাকে মুহাম্মাদের সা. কবল থেকে বাঁচাতে বেরিয়ে এস, এত দেরী করোনা যে, তোমাদের পৌঁছার আগেই কাফেলা ধ্বংস হয়ে যায়।" এই পরিচিত নাটুকে পদ্ধতির হাঁকডাক সমগ্র মক্কায় প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিশাল বাহিনী তৈরী হয়ে গেল। এ বাহিনীতে আবু লাহাব ছাড়া সমস্ত প্রবীণ নেতারা সশরীরে উপস্থিত ছিল এবং সবাই ছিল সশস্ত্র। বাহিনীর নেতাদের লক্ষ্য শুধু কাফেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা ছিলনা, বরং তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা প্রথম সুযোগেই মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করে চিরদিনের মত এ উপদ্রব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল।

এ সময় মুসলিম শক্তি যদি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখাতো, চুপচাপ বসে থাকতো, এবং সামরিক তৎপরতা না চালাতো, তবে তার ফলে আবু সুফিয়ান তার কাফেলাকে নিরাপদে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তো পেতই, অধিকন্তু কোরায়শী বাহিনীও মদিনার এলাকায় ঢুকে, বাহাদুরী দেখিয়ে নিরাপদে ফিরে যেত। আর এর ফল দাঁড়াতো এই যে, এই নবীন ইসলামী রাষ্ট্রটার প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। মদিনার মোনাফেক ও ইহুদী শক্তির দর্প ও অহংকার আরো বেড়ে যেত, আশপাশের গোত্রগুলোর চোখে ইসলামী রাষ্ট্রের আর কোন গুরুত্ব থাকতোনা এবং মৈত্রীর সম্পর্ক সম্প্রসারণ তো দূরের কথা, তার মুষ্টিমেয় সংখ্যক নাগরিকের জান, মাল ও সম্ভ্রম রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়তো। সংঘাত

ও সংঘর্ষে লিপ্ত শক্তিকে এমন বহু স্তর অতিক্রম করতে হয় যে, নিজের জনসংখ্যা ও সম্পদের স্বল্পতা এবং কঠিন সমস্যাবলী সত্ত্বেও তাকে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের সুযোগ খুব কমই আসে। যখন তা আসে, তখন তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার ও তখনকার দায়িত্ব সাহসিকতার সাথে পালন না করলে, এমন শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হতে হয় যে, বহু বছর কেটে গেলেও তার আর প্রতিকার করা যায় না। বরঞ্চ কখনো এমনও হয় যে, সময়ের পেছনে পড়ে গেলে চিরদিনের জন্য গোটা কাজই পন্ড হয়ে যায়। এ ধরনের ঐতিহাসিক সংঘাতের সময় যখন এসে পড়ে, তখন শুধু সৈনিকের সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদের পরিমাণ দেখে পদক্ষেপ গ্রহণের ও অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়না। বরং তখন এটাই ভেবে দেখা হয় যে, সময়ের দিক থেকে পেছনে পড়ে গেলে ইতিহাসের প্রবাহ মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে না যায়। আসলে এরূপ পরিস্থিতিতেই নেতৃত্বের মানও যাঁচাই হয়ে যায়, অনুসারীদেরও যোগ্যতা নির্ণয় হয়ে যায়। মদিনায় এ ধরনেরই একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত এসে পড়েছিল। ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র যদি পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী হতো, তাহলে কাফেলাকেও নিরাপদে যেতে দেয়া তার উচিত হতোনা, আর কোরায়েশ বাহিনীকেও উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে তার কসুর করা সমীচীন হতোনা। কিন্তু একই সাথে এই দুটো কাজ সম্পন্ন করা তার সাধ্যাতীত ছিল। তাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, যে কোন একটাকে পর্যুদস্ত করা চাই। আল্লাহ চেয়েছিলেন, যুদ্ধ হলে তা যেন এমনভাবে হয় যে, সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল বলে প্রমাণ করতে পারে এবং কুফরীর মূল উৎপাটিত হয়ে যায়।

রসূল সা. স্বীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থা দ্বারা কাফেলা ও বাহিনী উভয়ের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ওয়াদিয়ে যাফরানে পরামর্শ সভা ডাকলেন। তিনি সভার সামনে সমগ্র পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরলেন এবং জানতে চাইলেন, মুসলিম বাহিনীর একটা বড় রকমের ঝুঁকি নেয়ার শক্তি ও সাহস আছে কিনা।[৩] তিনি নিজে সাহস ও হিম্মত

---

[৩] আমাদের সময়কার সীরাত লেখকদের মধ্যে এ ব্যাপারে তীব্র মতবিরোধ ঘটেছে যে, রসূল (সা) মদিনাতেই মোহাজের ও আনসারদের বিশেষ বৈঠক আহবান করে কাফেলাকে বাদ দিয়ে কোরায়েশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে ছিলেন, না মদিনা থেকে বেরুবার সময় কাফেলার ওপর আক্রমণ এবং পরে ওয়াদিয়ে যাফরানে পৌছে যখন জানলেন কাফেলা ভিন্ন পথ ধরে চলে গেছে তখন ওখানেই জরুরী বৈঠক ডেকে কোরায়েশ বাহিনীর সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন? এই বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ হলো প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘৃণ্য অভিযোগ আরোপ যে, মদিনার সরকার (নাউজুবিল্লাহ) লুটতরাজ চালিয়ে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সচেষ্ট ছিল। এ জন্য তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রসূল (সা) বাহিনী নিয়ে কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্য বের হননি, বরং মদিনায় বসেই পরামর্শ করে কোরায়েশ বাহিনীর সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বপ্রধান প্রবক্তা ছিলেন মাওলানা শিবলী নু'মানী। তিনি মনে করেন কোরআনও তার মতের সমর্থক। অথচ কোরআন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সমূহ ও ঘটনা প্রবাহ কোনটাই তাঁর মতের সমর্থক নয় এবং যে অভিযোগ থেকে এই বিতর্কের উৎপত্তি, তাও সঠিক নয়। যথাস্থানে আমরা এ আলোচনা সবিস্তারে করবো ইনশাল্লাহ। আসলে দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগীটাই সঠিক।

রাখতেন যে, যা কিছু শক্তিসামর্থ আছে, তাকে জীবন মরণ সংগ্রামে লাগিয়ে দেয়া হোক। তিনি পরামর্শ সভার সামনে দুটো সম্ভাবনাই তুলে ধরলেন যে, একদিকে কোরায়েশ বাহিনী অপর দিকে বাণিজ্যিক কাফেলা রয়েছে। এর যে কোন একটার ওপর আক্রমণ করো হোক। বিরাট সংখ্যক সাহাবী কাফেলার ওপর আক্রমণ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কোরআনের ইংগিত অনুসারে এই দলে এমন কিছু লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা অপেক্ষাকৃত সহজ পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং আর্থিক স্বার্থটা তাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ববহ ছিল। রসূল সা. পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এর অর্থ ছিল এইযে, তিনি কাফেলার ওপর আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই ইংগিতকে বুঝতে পেরে মোহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও মিকদাদ বিন আমর নিজেদের শর্তহীন সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে যেদিকেই পদক্ষেপ নেবেন, আমরা আপনার সাথে থাকবো। আমরা বনী ইসরাইলের মত এ কথা বলে বসে থাকবোনা যে, তুমি ও তোমার খোদা গিয়ে লড়াই কর, আমরা এখানে বসে রইলাম। রসূল সা. পুনরায় তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। এর অর্থ ছিল তিনি আনসারদের দৃষ্টিভংগী জানতে চাইছিলেন। আকাবার চুক্তিতে তাদের কাছ থেকে শুধু এই মর্মে অংগীকার নেয়া হয়েছিল যে, মদিনার ওপর আক্রমণ হলে তারা তা প্রতিহত করবে। তারা রসূল সা. এর সাথে কেবল কাফেলার ওপর আক্রমণের জন্যই বেরিয়েছিল। কিন্তু পরের পরিস্থিতি পুরোদস্তুর যুদ্ধ অনিবার্য করে তুললো। কাজেই তাদের মনোভাব জানা তাঁর প্রয়োজন ছিল। তাঁর এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আনসারদের পক্ষ থেকে সা'দ বিন মুয়ায পরিপূর্ণ ঈমানী আবেগ নিয়ে বললেন, আপনি নিজের মর্জী অনুযায়ী কাজ করুন। আমরা আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমযান মদিনা রাষ্ট্রের শাসক সা. সশরীরে তিন শতাধিক লড়াকু সৈনিক সাথে নিয়ে (৮৬ মোহাজের, ১৭০ খাজরাজী এবং ৬১ আওসী- মোট ৩১৭ জন, যদিও সাধারণভাবে প্রচলিত সংখ্যা ৩১৩) শহর থেকে বেরুলেন। রসূল সা. এমন বিচক্ষণতার সাথে রওনা হলেন যে, দু'দিকেই আক্রমণ চালানোর ইচ্ছা প্রতীয়মান হয়। এক দৃষ্টি কাফেলার দিকে ছিল, যাতে আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে, পথ বিপজ্জনক। অপর দৃষ্টি কোরায়েশ বাহিনীর দিকে ছিল। কিন্তু কাফেলা কোন্ দিকে, বাহিনী কোন্ দিকে, এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু, তা জানা প্রয়োজন ছিল। উভয়টা একত্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং কাফেলা পেছনে থেমে রইল, না সমুদ্রের কিনারের দিকে চলে গেল, তাও জানা যাচ্ছিলনা। অবশেষে সাফরা নামক জায়গায় গিয়ে তিনি বিছবিছ বিন আমর আল জুহানী এবং আদী বিন আর রাগবাকে কাফেলার খোঁজ নিতে বদরের দিকে পাঠালেন। আর নিজে ওয়াদিয়ে যাফরানে উপনীত হলেন। জানা গেল যে, কাফেলা বদরের পথ ত্যাগ করে সমুদ্র তীরের দীর্ঘ পথ ধরে এগিয়ে গেছে এবং অনেক দূরে চলে গেছে। অগত্যা রসূল সা. বদরের দিকে রওনা হলেন।

ওদিকে আবু সুফিয়ান উপকূলীয় এলাকায় পৌঁছার পর নিজেকে নিরাপদ পেয়ে কোরায়েশী বাহিনীকে বার্তা পাঠালো, আমি ও আমার কাফেলা এখন বিপদমুক্ত। কাজেই তোমরা ফিরে এস। কিন্তু আবু জাহল তখন অন্য রকম স্বপ্নে বিভোর। সে বদরে যেতে ও

মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাতে মরিয়া হয়ে উঠলো। যোহরা ও আদি গোত্রের সরদারদের সাথে করে আনা হয়েছিল কাফেলাকে মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচাতে। তাই তারা ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগলো। তাদের কথা যখন শোনা হলোনা, তখন তারা নিজেদের লোকজন নিয়ে ফিরে গেল। হাকীম বিন হিযাম এবং উতবা আবু জাহলকে যুদ্ধ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আবু জাহল তাদের অনুরোধ শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। যারা শান্তির পক্ষে ওকালতি করছিল, তাদেরকে সে প্রচন্ডভাবে গালাগালি করলো এবং সেই সাথে নাখলার ঘটনায় নিহত হাযরামীর ভাই আমেরের ভাবাবেগকে উস্কে দিল। আমের হৈ চৈ করে একটা তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দিল। অবশেষে কোরায়েশ বাহিনী বিপুল রণসাজে সজ্জিত হয়ে বদরের ময়দানে এসে উপনীত হলো।

রসূল সা. সাহাবীদের পরামর্শে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গা দখল করলেন এবং যথোচিত যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাহিনীকে কিভাবে বিন্যস্ত করা হবে, তা স্থির করলেন। শত্রুবাহিনীর সংখ্যা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে গোপন তথ্য সংগ্রহ করলেন। যখন কোরায়েশ বাহিনীর প্রত্যেক যোদ্ধার নামধামসহ পরিচয় জানতে পারলেন, তখন সাথীদের বললেন, "মক্কা নিজের কলিজা-গুর্দাগুলোকে তোমাদের সামনে হাজির করেছে।" শত্রুবাহিনীর যোদ্ধা সংখ্যা ছিল এক হাজার। এর মধ্যে ছয় শো বর্ম পরিহিত ও একশো সওয়ারী ছিল। তাদের সাথে ছিল অজস্র উট, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ। যোদ্ধাদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল বহু সংখ্যক মদের মটকা ও গান গাওয়ার জন্য গায়িকার দল। এর মোকাবেলায় তিনশোর সামান্য কিছু বেশী সহায় সম্বলহীন লোককে ময়দানে নামিয়ে দেয়া ছিল এক অকল্পনীয় দুঃসাহসিকতা। সামরিক বাহিনী সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া ও আরো বহু সংখ্যক উপাদন নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। রসূল সা. ভালো করেই জানতেন, তিনি যে সৈনিকদেরকে 'তিনজনের মোকাবেলায় একজন' অনুপাতে ময়দানে নামাচ্ছেন, তাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে নির্যাতিত সুলভ তেজবীর্য, রয়েছে নিজ নিজ মতাদর্শের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবিচল আস্থা এবং তারা সাংগঠনিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় শ্রেষ্ঠতর। তাদের মধ্যে এই চেতনা ছড়িয়ে আছে যে, প্রশ্ন শুধু একটা যুদ্ধে হারজিতের নয়, বরং গোটা আন্দোলন টিকে থাকবে কি ধ্বংস হয়ে যাবে তার। তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুই পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল বদরের ময়দানে। সর্বোপরি, আল্লাহর সাহায্যের ওপর তাদের ছিল অখন্ড বিশ্বাস। এই আল্লাহর সাহায্যই ছিল তাঁদের দৃষ্টিতে আসল নিষ্পত্তিকারী শক্তি। তারপর আল্লাহর সাহায্য সম্ভবত একেবারেই আসন্ন হয়ে উঠলো তখন, যখন রসূল সা. অশ্রুভেজা চোখে, সকাতর কণ্ঠে ও বেদনাবিধুর ভাষায় দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ, এই সেই কোরায়েশ, যারা নিজেদের আভিজাত্যের অহংকারে মাতোয়ারা হয়ে ছুটে আসছে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমার বান্দাদের তোমার আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং তোমার রসূলকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সেটা এখন পাঠিয়ে দাও। হে আল্লাহ, কালই ওদেরকে ধ্বংস করে দাও।" তারপর তিনি এ কথাটাও বললেন, "হে আল্লাহ, আজ যদি এই ক'টা

প্রাণ খতম হয়ে যায়, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আর তোমার এবাদত হবেনা।" রসূল সা. এর মত ব্যক্তিত্ব যখন নিজের আন্দোলনের গোটা পুঁজি ময়দানে হাজির করে এমন মর্মস্পর্শী দোয়া দ্বারা আল্লাহর আরশে করাঘাত করেন তখন ফেরেশতাদের বাহিনী না নেমে কিভাবে পারে? তাই এ পর্যায়ে যথার্থই বিজয়ের সুসংবাদ এসে গেল।

বদরের যুদ্ধের ফলাফল

কালের গোটা ইতিহাস সম্ভবত বদরের ক্ষুদ্র ময়দানে পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল। এই ইতিহাসকে সচলকারী দু'ধরনের শক্তি নিজ নিজ চেতনা ও প্রেরণায় পুরোপুরি উজ্জীবিত হয়ে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছিল। পৈতৃক ধর্ম, প্রাচীন রসম রেওয়াজ, নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এক পক্ষের মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল। আর অপর দিকে ছিল দিগন্ত প্রসারী এক আলোর বন্যা, যা মদিনার আকাশ থেকে উদ্ভাসিত নতুন প্রভাতকে মানবতার সমগ্র জীবনক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল এবং যার দৃষ্টিতে জাহেলিয়তের অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করা ছিল এক পবিত্র কর্তব্য। এ যুদ্ধে পিতাপুত্র, চাচাভাতিজা, ভাই ভাই, শ্বশুর জামাতা - সবাই রক্তের সম্পর্ককে ভুলে গিয়ে নিজ জীবনাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আনসাররা নিজেদেরকে সমগ্র আরবের তীর ও তরবারীর শিকার হতে হবে জেনেও মন প্রাণ দিয়ে রসূল সা. এর সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। এটা ছিল এক সুকঠিন পরীক্ষা। রসূলের প্রিয় সাথীগণ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিলেন, তারা ইসলামী আন্দোলনের সাচ্চা ও নিঃস্বার্থ পতাকাবাহী। অকল্পনীয় ফলাফলের দিক দিয়ে মানবেতিহাসে এ যুদ্ধের কোন জুড়ি নেই। বলা যেতে পারে, ইতিহাসে এটা ছিল আবাবীলের ঝাঁকের হাতে হস্তিবাহিনীর বিধ্বস্ত হওয়ার আর এক দৃষ্টান্ত। ১৭ই রমযান যুদ্ধ হলো। ইসলামী বাহিনীর ২২ জন বীর যোদ্ধা নিজেদের আদর্শের জন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তারা শ্রেষ্ঠতম সত্যের একনিষ্ঠ সাক্ষী। অপর দিকে তারা শত্রুর ৭০ জন যোদ্ধাকে হত্যা করলো এবং নিজেদের কাউকে তাদের হাতে বন্দী হতে না দিয়ে আরো ৭০ জনকে যুদ্ধবন্দী বানালো। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ গনীমতের সম্পদও তাদের হস্তগত হলো। উতবা, শায়বা, আবু জাহল, আবুল বুখতারী, যাময়া ইবনুল আসওয়াদ, আস বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ, মুনাব্বিহ ইবনুল হুজ্জাজ সহ বহু সংখ্যক নামকরা কোরায়েশ সর্দার মুসলিম মোজাহেদদের তরবারীর গ্রাসে পরিণত হলো। তাদের নেতৃত্বে লড়াইরত শত্রু সৈন্যদের কাতারকে কাতার লন্ডভন্ড হয়ে গেল। প্রকৃত পক্ষে এই প্রথম যুদ্ধেই কোরায়েশদের কোমর ভেঙ্গে গেল এবং তাদের শক্তির গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। এই যুদ্ধের ফলেই ইসলামী আন্দোলন সহসা মাথা উঁচু করে ভবিষ্যতের নতুন জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের যোগ্যতা অর্জন করলো। এ কারণেই আল কুরআনে বদর যুদ্ধের দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা হক ও বাতিলের ছাঁটাই বাছাইয়ের কষ্টিপাথর বলে আখ্যায়িত করেছে। প্রকৃত পক্ষে এই যুদ্ধই নিষ্পত্তি করে দেয় যে, কোরায়েশদের প্রিয় জাহেলী ব্যবস্থাই টিকে থাকবে এবং টিকে থাকার যোগ্য, না মুহাম্মাদ সা. এর উপস্থাপিত ইসলাম টিকে থাকার অধিকারী। এ জন্যই কুরআন তার পর্যালোচনায় বলেছে, ঐ দুই আদর্শের মধ্যে এখন সেই আদর্শেরই টিকে থাকার অধিকার আছে, যার কাছে নিজের টিকে থাকার

বৈধতার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আর জনগণও এ দুটোর যে আদর্শকেই গ্রহণ করতে চায়, প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে। তারপর ইচ্ছা করলে ধ্বংসের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে, আর ইচ্ছা করলে ইসলামের সুউচ্চ মার্গে উন্নীত হবে।

বন্দীদেরকে মাথা পিছু চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। (কোন কোন সরদারের কাছ থেকে আরো বেশী মুক্তিপণ নেয়া হয়।)

এভাবে কোরায়েশকে আড়াই লাখ দিরহামের চেয়েও বেশী অর্থদন্ড দিতে হয়। এই অর্থনৈতিক আঘাত তাদের শক্তিকে আরো অধোপতিত করে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বদরের এই অপ্রত্যাশিত (কোরায়েশদের দৃষ্টিভংগী অনুসারে) ফলাফলের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এই যে, আরব গোত্রগুলোর দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলন ও মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। এই শক্তি ভবিষ্যতের আশাভরসার কেন্দ্রস্থল রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য হয়ে গেল। (এক বর্ণনা অনুসারে) মদিনার কতিপয় ইহুদী গোত্র বদর যুদ্ধের পরই মদিনার সাংবিধানিক চুক্তিতে শরীক হয়েছিল তার আগে নয়। মদিনার বিপুল সংখ্যক অধিবাসী এ যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে। বদর যুদ্ধের পরই ইসলাম সঠিক অর্থে একটা সর্বস্বীকৃত ও জননন্দিত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কেননা এখন সে নিজের রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "স্মরণ কর ঐ সময়টাকে, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে খুবই কম। পৃথিবীতে তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো এবং তোমরা শংকিত থাকতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল যোগাড় করে দিলেন, নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে সবল করলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবিকা দিলেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।" (সূরা আনফাল– ২৬)

এ আয়াত আসলে সকল যুগের ইসলামী আন্দোলনের দুটো প্রধান যুগকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। একটা হলো, সংখ্যার স্বল্পতা, দুর্বলতা ও ভয়ভীতির যুগ। আর অপরটা প্রাবল্য, ক্ষমতা, বিজয়, সাফল্য ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার যুগ। ইসলামে প্রথম যুগটা যেমন স্বাভাবিক ও অনিবার্য, তেমনি দ্বিতীয়টাও স্বাভাবিক ও অবধারিত। এ ধরনের সূচনার যৌক্তিক পরিণতি এটাই। কিন্তু ইসলামের যে ধারণা ব্যক্তি ও জাতিকে চিরস্থায়ীভাবে প্রথমোক্ত অবস্থায় ফেলে রাখে, তাতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করে এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল যুগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোন পথ উন্মুক্ত করেনা, তা রসূলের সা. শেখানো ইসলাম নয়, বরং তা থেকে বিচ্যুতি ও বিকৃতির কারণেই সে ধারণা সৃষ্টি হয়।

এ পর্যায়ে কাফেরদেরকে উপদেশ সহকারে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত চেয়ে থাক, তবে এই নাও, সে সিদ্ধান্ত তোমাদের সামনে এসে গেছে। এখন ফিরে আস। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি পুনরায় সেই বোকামী কর, তবে আমিও পুনরায় তোমাদেরকে উচিত শিক্ষা দেব।......" (সূরা আনফাল, ১৯) তারপর মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এখন শত্রুর কোমরের বাধন খুলে দেয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। বরং তাদের হাত অবশ ও অচল করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হও, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধের সূচনা করেছে ঃ "এখন তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ ফেতনা ফাসাদ ও অরাজকতা দূর না হয় এবং সবাই একমাত্র আল্লাহর অনুগত না হয়ে

যায়।" (আনফাল-৩৯) অর্থাৎ যুদ্ধের যে আগুন কোরায়েশরা জ্বালিয়েছে, তাকে তখন পুরোপুরি নেভানো ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা।

দুটো শক্তির পার্থক্য

বদরের যুদ্ধকে আল্লাহ তায়ালা যে কারণে 'ইয়াওমুল ফুরকান" তথা 'হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ ও ছাটাই বাছাই করার দিন' নামে অখ্যায়িত করছেন, যে কারণে বলা হয়েছে, 'এই নাও, সিদ্ধান্ত এসে গেছে। যে কারণে সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে, উভয় বাহিনীর সংঘর্ষে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, এবং যে কারণে বলা হয়েছে, অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে', সে কারণটা আসলে এইযে, এই দুই বাহিনীর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিরাট আদর্শিক ও নৈতিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা বাহিনী পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্য, এবং গোত্রীয় ও বংশীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নিছক আল্লাহর পথে মানব জাতির সঠিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে প্রাণপণ সংগ্রামে নামে। আর অপর বাহিনী নিজেদের নেতৃত্ব, আধিপত্য, বংশীয় আভিজাত্য, রাজনৈতিক স্বার্থ ও অন্ধ ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে সামনে অগ্রসর হয়। এ বাহিনী আল্লাহর সামনে বিনীয় সহকারে, নামায রুকু ও সিজদায় মগ্ন থেকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ময়দানে নামে। একটা বাহিনী বিরাট বিরাট ভোজসভা, মদের আসর, গানবাজনার জলসা ও নর্তকীদের নৃত্য ইত্যাদি উপভোগ করতে করতে এগিয়ে আসে। আর অপর বাহিনী ময়দানে আসে সংখ্যার স্বল্পতা, ও অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রতুলতার পাশাপাশি ঈমান, ঐক্য, শৃংখলা ও চরিত্রের দিক দিয়ে অধিকতর মজবুত ও শক্তিশালী অবস্থায়। একটা বাহিনী সংখ্যায় বড় এবং সাজসরঞ্জামে শক্তিশালী, কিন্তু নৈতিক শক্তির বিচারে নিতান্ত হীনবল ও অকর্মন্য। এরপর আল্লাহ উভয়ের মধ্যে হারজিতের এত স্পষ্ট ফায়সালা করে দেন যে, অন্ধরাও দেখতে পায়, কোন্ পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার যোগ্য আর কোন পক্ষ ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে টিকে থাকার যোগ্য। কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করলে এ পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আবু হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও আবু হিয়াল নামক দু'জন মুসলিম যুবক এই সময় মক্কা থেকে মদিনায় আসছিলেন। পথিমধ্যে কাফেররা তাদের গতিরোধ করে বলে, আমরা তোমাদের মুহাম্মাদের সা. সাহায্য করতে যেতে দেবনা। তারা যুদ্ধে শরীক না হবার অংগীকার করে অব্যাহতি পান। রসূল সা. এর কাছে এসে তারা পুরো ঘটনা শুনালেন। সংখ্যা স্বল্পতার কারণে মুসলমানদের জন্য এ সময়টা এত নাজুক ছিল যে, একটা পিঁপড়ের সাহায্য পাওয়া গেলে তাও মূল্যবান বিবেচিত হতো। তথাপি রসূল সা. সিদ্ধান্ত দিলেন যে, তোমরা যে ওয়াদা করে এসেছে, তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাহায্য করবেন। ইতিহাসে এমন গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ক'টা পাওয়া যাবে?

বদর যুদ্ধে নিহত কোরায়েশ নেতাদের লাশ রসূল সা. একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে দাফন করেন। কোন লাশের অবমাননা হতে দেননি।

গনীমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে প্রচলিত রীতি ছিল এই যে, যার হাতে যা পড়তো, তা তারই হয়ে যেত। এই রীতির কারণে বিজয়ের লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্রই

উচ্ছৃংখলতা, লুটপাট ও হাতাহাতি হতো। কিন্তু কুরআন গনীমতের সম্পদের ব্যাপারে নতুন বিধি জারী করলো। এই বিধির মূল কথা ছিল, গনীমতের সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের। কাজেই এ সম্পদ বন্টন করা ইসলামী সরকারের কাজ। এই নতুন বিধির আলোকে সমস্ত গনীমতের মাল সেনাপতির সামনে স্তূপ করে রাখা হতো। তারপর তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রেখে বাকীটুকু সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হতো।

জাহেলী ব্যবস্থায়, যুদ্ধবন্দীরা বিজেতা পক্ষের করুণার পাত্র হতো। সাধারণত তাদের ওপর যুলুম নির্যাতন ও অসদাচরণ করা হতো এবং তাদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করা হতো। এমনকি আজকের সভ্য যুগেও যুদ্ধ বন্দীদের সাথে পাশবিক আরচণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রসূল সা. যুদ্ধ বন্দীদেরকে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। তাদেরকে আরামে রাখার নির্দেশ দিলেন। কোন কোন সাহাবী এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজে খেজুর খেয়ে বন্দীদেরকে পেটপুরে উন্নতমানের খাবার খাওয়াতো। হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইরের ভাই বদরযুদ্ধের যুদ্ধবন্দী আবু উমাইর জানিয়েছে যে, যে আনছারীর কাছে আমাকে রাখা হয়েছিল, তারা নিজেরা খেজুর খেয়ে আমাকে ভালো ভালো খাবার খাওয়াতো। এই ব্যবহারে আমি খুবই লজ্জা পেতাম। যে সব বন্দীর কাপড় চোপড় কম থাকতো, তাদেরকে কাপড় দেয়া হতো। হযরত আব্বাস অপেক্ষাকৃত লম্বা আকৃতির লোক হওয়ার কারণে কারো জামা তার গায়ে গালছিলনা। এজন্য মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর জন্য নিজের জামা পাঠিয়েছিল। এই অনুগ্রহের বদলা হিসাবেই রসূল সা. আবদুল্লাহর কাফনের জন্য নিজের জামা দিয়েছিলেন। বন্দীদের মধ্যে সোহায়েল বিন আমরও ছিল। সে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে জোরদার ভাষণ দিয়ে বেড়াতো। হযরত ওমর রা. পরামর্শ দিলেন, এই ব্যাটার সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে দেয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে আর ভাষণ দিতে জোর না পায়। অন্য কেউ হলে নিজের কাছে রক্ষিত একজন অসহায় বন্দীর সাথে যত খারাপ আচরণ সম্ভব হয়, করতে দ্বিধা করতোনা। কিন্তু রসূল সা. বললেন, আমি যদি কারো শরীরের কোন অংশ বিকৃত করি, তাহলে আমি নবী হওয়া সত্তেও আল্লাহ্ আমার দেহের ঐ অংশ বিকৃত করে শাস্তি দেবেন।

বিজয়ী শক্তি সাধারনত অহংকারে মত্ত হয়ে অত্যন্ত অশালীন ও অভদ্র হয়ে যায়। কিন্তু রসূল সা. ও তাঁর সাথীদের মধ্যে তেমন কোন ন্যাক্যারজনক আচরণের হদিস মেলেনা। এমনকি যখন রসূল সা. আবু জাহলের নিহত হওয়ার খবর পেলেন এবং তার মাথা তাঁর সামনে আনা হলো, তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

বিজয়ী শক্তি যখন মদিনার দিকে মার্চ করলো তখনও না কোন গান বাজনার ব্যবস্থা করা হলো, না মদিনায় পৌঁছে কোন আনন্দোৎসব করা হলো। কেবল সবার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। এ বিজয় আল্লাহর পুরস্কার—এই অনুভূতির ভিত্তিতেই সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

মুসলিম সৈন্যরা যাতে শক্তির নেশায় বিভোর হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের মানসিক ও নৈতিক দুর্বলতাগুলো দূর করতে সচেষ্ট হয়, সে জন্য তাদের সেনাপতি রসূল সা. কুরআনের আয়াতের আলোকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাদের সামরিক

তৎপরতার ওপর সমালোচনা সুলভ পর্যালোচনা করে অবাঞ্ছিত দিকগুলো তুলে ধরেন। এভাবে তাদের মধ্যে অধিকতর গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজের জন্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করা হয়।

সমস্ত সামরিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয় জেনেও প্রথম যুদ্ধটার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিয়েছি। এর উদ্দেশ্য হলো, এদ্বারা পাঠক যেন সেই দৃষ্টিভঙ্গীটা অর্জন করতে পারে, যা ছাড়া পরবর্তী যুদ্ধগুলো বুঝা সম্ভব নয়। (তথ্যসূত্র ঃ তাফহীমুল কুরআন-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সূরা আনফালের ভূমিকা ও টীকা, সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী। আসাহুস সিয়ার। আহদে নববীকে ময়দানহায়ে জং। হাদীসে দেফা)।

বদর যুদ্ধের পর

যদিও বদর যুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের একটা ক্ষুদ্র বাহিনী রসূল সা. এর নেতৃত্বে কোরায়েশকে পরাজিত করে একটা সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু সেই সাথে ভবিষ্যতে সংঘাত-সংঘর্ষের একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনিবার্য হয়ে উঠলো। মক্কার তলোয়ার একবার খাপ থেকে বেরিয়ে আসার পর এবার শান্তি প্রতিষ্ঠার একটামাত্র উপায়ই অবশিষ্ট রইল। সে উপায়টা হলো, এই তলোয়ারকে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে এবং এই তলোয়ার উত্তোলনকারী হাতকেও অবশ করে দিতে হবে। আহত শত্রু লেজকাটা সাপের মত প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে থাকে। এ কথা যদিও দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, কোরায়েশ নেতৃত্বে সদাতৎপর, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সরদারদের উপস্থিতি সহসাই শূন্যের কোটায় নেমে গেছে, তাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের দীর্ঘকালের অর্জিত প্রভাব প্রতিপত্তি প্রথমবারের মত উৎখাত হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এটাও ইতিহাসের একটা স্বতসিদ্ধ মূলনীতি যে, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য যারই হাতে থাকে, সে তা রক্ষা করার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে। বিশেষত যে সব ব্যক্তি বা শ্রেণী পুরুষানুক্রমিকভাবে সমাজের ওপর আধিপত্য অর্জন করে, তারা তাদের ধড়ে প্রাণ থাকতে এমন কোন শক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ দিতে চায়না, যার বিকাশ বৃদ্ধির ফলে তাদের নেতৃত্বের অবসান অনিবার্য হয়ে ওঠবে। তারা টিকে থাকার জন্য সর্বাত্মক লড়াই করে থাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই রসূল সা. ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন, বদরের বিজয় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কত বড় দায় দায়িত্ব বহন করে এনেছে। তিনি জানতেন, কোরায়েশ তার সমগ্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে, নিজের পুরনো মৈত্রীর বন্ধনগুলোকে, এবং নিজের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েও নিজের এই সামরিক পতাকাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করবে। যে পতাকা উড়িয়ে সে সর্বপ্রথম মক্কার বাইরে এসেছে, তাকে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় রেখে সে মক্কায় গিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারেনা। এ পরিস্থিতিতে কার্যত গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজের আহ্বায়ক এবং সত্য ও ইনসাফের পতাকাবাহীকে গঠনমূলক কাজের পাশাপাশি নিজের ক্ষুদ্র দলটাকে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক ও নিত্য নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে বাধ্য থাকতে হলো। এ জন্যই বদর যুদ্ধের পর রসূল সা.কে ক্রমাগত সামরিক কর্মকান্ড পরিচালনা

করতে হয়। বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মাত্র সাতদিন পরই রসূল সা. কে একটা সামরিক অভিযানে 'মাউল কাবার' নামক স্থানে যেতে হয়। কেননা ওখান থেকে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, বনু সুলাইম ও বনু গিতফান নামক গোত্র দুটোর কিছু লোক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কিছু শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ সামনে এলনা। তিন দিন অবরোধ রাখার পর তিনি ফিরে গেলেন। পরে আবার ঐ লোকদের জড়ো হওয়ার খবর পাওয়া গেল। তাদেরকে দমন করতে গালেব বিন আব্দুল্লাহ একটা সামরিক দল নিয়ে গেলেন। সামান্য কিছু সংঘর্ষ হলো এবং নৈরাজ্যবাদীরা পালিয়ে গেল। রসূল সা. যখন বদরের যুদ্ধ উপলক্ষে মদিনার বাইরে ছিলেন, তখন বনু কাইনুকা চুক্তি ভঙ্গ করে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে বসলো। তাই বলে এত বড় ঘটনাকে উপেক্ষাও করার উপায় ছিলনা। উপেক্ষা করার অর্থ হতো ভবিষ্যতের জন্য মদিনাকে ধ্বংসের সম্মুখীন করা। এ জন্য ২য় হিজরীর শওয়াল মাসে রসূল সা. তাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি দ্বারা এক ধরনের পুলিশী অভিযান চালালেন এবং তাদের ইচ্ছা অনুসারে শালিশী করানো হলো। সেই শালিশী অনুসারে এই গোষ্ঠীটাকে মদিনার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

বদর যুদ্ধের দু'মাস পর (জিলহজ্জ মাসে) আবু সুফিয়ান দু'শো লোক নিয়ে মদিনা অঞ্চলে এল। সে গোপনে সালাম বিন মুসকামের সাথে সাক্ষাত করে যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্র করতে চাইল। কিন্তু সাফল্যের কোন উপায় না দেখে আরীয নামক স্থানে কিছু গাছগাছালি নষ্ট করে এবং জনৈক আনসারীকে হত্যা করে পালালো। রসূল সা. তার পিছু ধাওয়া করে 'কারকারাতুল কাযর' পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু লুটেরার দল পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। পালাতে গিয়ে তারা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্য কিছু ছাতুর বস্তা ফেলে দিয়ে গেল এবং তা মুসলিম বাহিনীর দখলে এল। এ কারণে এই অভিযান 'গুযওয়ায়ে সাওয়ীক' নামে পরিচিত হয়ে যায়। জিলহজ্জের বাকী ক'দিন মদিনায় কাটলো। কিন্তু ৩রা হিজরীর মুহাররম মাসে জানা গেল, বনু সালাবা ও বনু মাহারেব হামলা করার জন্য সমবেত হচ্ছে। মাসের শেষে রসূল সা. নাজদে গেলেন এবং প্রায় পুরো সফর মাস ঐ এলাকায় অবস্থান করলেন। শত্রুরা মোকাবিলায় এলনা এবং কোন সংঘর্ষ ছাড়াই তাঁরা ফিরে এলেন। এতদিন অবস্থান করার উদ্দেশ্য ছিল ঐ এলাকায় মৈত্রী সম্পর্কের বিস্তার ঘটানো, যাতে কোরায়েশরা ওদিক দিয়ে বাণিজ্যের পথ না পায়। এ অভিযানকে 'গুজওয়ায়ে যি আমার' এবং 'গুযওয়ায়ে আনমারও বলা হয়ে থাকে।

রবিউস সানী মাসে কোরায়েশদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা দেখা দিল। তাই মদিনায় ইবনে উম্মে মাকতুল রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রসূল সা. সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে বুহরান পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং জমাদিউল উলা পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক শিবির স্থাপন করে রাখলেন। ওখান থেকেও তিনি কোন সংঘর্ষ ছাড়াই ফিরে এলেন। ৩য় হিজরীতে আবারো কোরায়েশদের একটা বাণিজ্যিক কাফেলা বেরুলো। তাদের সম্ভাব্য গমন পথে সতর্কতামূলক সামরিক তৎপরতা চালানো হলো। যায়েদ বিন হারেসা জমাদিউস্ সানীতে একশো সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। কাফেলার পথপ্রদর্শক কুরাত বিন হাইয়ান গ্রেফতার হয়ে মুসলিম দলের অন্তর্ভুক্ত হলো। এক লাখ দিরহাম মূল্যের রৌপ্য কাফেলার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো।

এভাবে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে ওহুদ যুদ্ধের দিকে গড়ালো।

দ্বিতীয় বৃহত্তম যুদ্ধ ওহুদ

মানবেতিহাসে যখনই দুটো ইতিবাচক ও নেতিবাচক আদর্শিক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং তাদের একটা মানবজাতিকে কল্যাণ ও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে ও অপরটা পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত বিধিব্যবস্থা বহাল রাখতে চায়, তখন এ ধরনের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ওহুদ যুদ্ধে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের যে সংঘর্ষ ঘটে, তাতেও এ ধরনেরই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। কোরায়েশরা বদর যুদ্ধে যে সব অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিটা ছিল তন্মধ্যে খুবই গুরুতর। আড়াই লাখ দিরহামেরও বেশী কেবল বন্দীদের মুক্তিপণ দিতে হয়েছিল। তদুপরি কাফেলার লম্বা রাস্তা ঘুরে আসতেও ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল এবং মুনাফার পরিমাণ আগের চেয়েও কম হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু ভবিষ্যতের জন্য ব্যবসায়–বাণিজ্য স্থায়ীভাবে হুমকীর সম্মুখীন হয়ে রইল। কোরায়েশের বাণিজ্যিক কাফেলার কাছ থেকে এক লাখ দিরহামের রৌপ্য মুসলমানরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যা কিছু চলাচল ও মালামাল পরিবহন হতো, তা ইয়েমেন ও মক্কার পথ ধরেই হতো এবং মক্কার কোরায়েশদের পথ ধরেই হতো। আর মক্কার কোরায়েশরা নিজেদের চুক্তিভিত্তিক আচরণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রহরা ট্যাক্স বসিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতো। তায়েফ ও অন্যান্য এলাকার বাণিজ্যিক আয়ের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র সিরিয়ার পথ দিয়ে কোরায়েশরা বাৎসরিক আড়াই লাখ আশরাফী আয় করতো। এবার মক্কার আকাশে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মেঘ জমে উঠলো। এরূপ পরিস্থিতিতে বদরের প্রতিশোধের ইচ্ছাটা ভেতরে ভেতরে পেকে উঠতে লাগলো।

নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি খুব দ্রুতই শুরু হয়ে গেল। সিরীয় কাফেলার অর্জিত মুনাফা তার কাছ থেকে পুরোপুরি আদায় করে সামরিক তহবিলে জমা দেয়া হলো। আমর জামহী ও মুসাফে'র ন্যায় নামজাদা কবিরা তাদের কবি প্রতিভাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধের আগুন উস্কে দিল। মক্কার মহিলারা তাদের হারানো ভাই ও ছেলের শোকে দিশেহারা হয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করতে লাগলো। যেমন কেউ কেউ প্রতিজ্ঞা করলো পরবর্তী যুদ্ধে মুসলিম শহীদদের রক্তপান করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কার্যত কোরায়েশ বাহিনীর সাথে বড় বড় অভিজাত পরিবারের বিশিষ্ট মহিলারা রণাঙ্গনের দিকে যাত্রা করতে লাগলো। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলো হিন্দ (উতবার মেয়ে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও আমীর মোয়াবিয়ার মা), উম্মে হাকীম (আবু জেহেলের ছেলে ইকরামার স্ত্রী), ফাতেমা (হযরত খালেদের বোন) বারযা (তায়েফের নেতা মাসউদ সাকাফীর মেয়ে) রীতা (আমর ইবনুল আসের স্ত্রী) হান্নাস (হযরত মুসয়াব বিন উমাইরের মা) প্রমুখ।

কোরায়েশগণ নিজেদের স্বেচ্ছাসৈনিকদের প্রস্তুত করা ছাড়াও এবার আহাবীশদেরকেও সাথে নিতে ভুল করলোনা। তাছাড়া আমর ইবনুল আ'স, আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যাবয়ারলী, হীরা ইবনে আবি ওহাব, মোসাফে বিন আবদ মানাফ এবং আমর বিন আব্দুল্লাহ জাহমীকে পাঠালো বিভিন্ন আরব গোত্রকে মদিনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এভাবে বিপুল শক্তি অর্জিত হয়ে গেল। সাতশো বর্মপরিহিত ও দু'শো অশ্বারোহী

সৈনিকসহ তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী নিজেই এক ত্রাস সৃষ্টিকারী শক্তি ছিল। পুরো এক বছর ব্যাপী প্রস্তুতির পর এই বিশাল সামরিক বাহিনী মক্কা থেকে রওনা হলো। তারা মদিনার চারণভূমিতে পৌঁছে নির্দ্বিধায় নিজেদের পশুগুলোকে ঘাসপাতা খাইয়ে মোটা করলো এবং কয়েকদিন রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়ে বুধবারে ওহুদে গিয়ে শিবির স্থাপন করলো।

রসূলের সা. চাচা হযরত আব্বাস আন্তরিকভাবে তাঁর অনুগত ও অনুরক্ত এবং ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। শত্রুদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি বিশেষ অনুমতিক্রমে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে কোরায়েশদের এসব প্রস্তুতির খবর রসূল সা. কে জানালেন। তদুপরি রসূল সা. নিজস্ব বিশেষ গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৫ই শওয়াল জানতে পারলেন, কোরায়েশী বাহিনী মদিনার কাছে পৌঁছে গেছে। তিনি এও জানতে পারলেন যে, আরীযের চারণক্ষেত্র তাদের পশুগুলো খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। উপরন্তু কোরায়েশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ও তার শক্তি সামর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সংক্রান্ত রিপোর্টও তিনি পেয়ে গেলেন। মদিনায় রাতের বেলা প্রহরীর ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে করা হলো। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন। অধিকাংশ মোহাজের ও আনসার নেতৃবর্গ শহরে বসেই মোকাবিলা করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি– এমন যুবকরা উৎসাহ উদ্দীপনার আতিশয্যে শহরের বাইরে যেয়ে যুদ্ধ করার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করলো। রসূল সা. উভয় দৃষ্টিভংগী জানার পর বাড়ীতে চলে গেলেন এবং বর্ম পরিধান করে ফিরে এলেন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি মদিনার বাইরে যেয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তাবটাই গ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও মদিনার ভেতরে বসে লড়াই করার পক্ষপাতী ছিল। সবাই এও জানতো যে, তার সাথে কোরায়েশদের যোগসাজশ রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম এই ওহুদ যুদ্ধের আগেই কোরায়েশ তার সাথে দহরম বহরম পাতিয়ে নিয়েছিল। রসূল সা. এ বিষয়টা জানতেন বলেই কোন আলোচনা না করেই দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগীটা নীরবে মেনে নিলেন। শুক্রবার জুময়ার নামাযের পর তাঁর নেতৃত্বে এক হাজার মুসলমান সৈন্য রওনা হলো। আব্দুলাহ বিন উবাইও সাথে গেল। তার প্রথম প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর সে একটা দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব দিল যে, একটা স্বতন্ত্র যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলা হোক। এ প্রস্তাবও যখন রসূল সা. প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন এই কুচক্রী হতাশ হয়ে পড়লো। সে শওত নামক স্থান থেকে তিনশো সৈন্য ভাগিয়ে নিয়ে ফিরে চলে গেল। তার অভিযোগ এই ছিল যে, আমাদের কথা যখন মানাই হয়না এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতায় যখন আমাদের কোন অংশই নেই, তখন আমরা কেন যুদ্ধ বিগ্রহ করবো। এই বিশ্বাসঘাতকতা মূলক কাজের প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়লো। উদাহরণ স্বরূপ, বনু সালমা ও বনু হারেসা গোত্র ভগ্ন মনে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু প্রাজ্ঞ মুসলিম নেতারা তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলেন এবং তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিলেন।

মদিনার বাইরে গিয়ে ময়দানে নামার আগে রসূল সা. সৈন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। একাধিক কিশোরও জেহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধে রওনা হলো। রসূল সা. তাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তবু এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদের চেষ্টার অবধি ছিলনা। কিশোর রাফে বিন খাদীজ পায়ের পাতার সামনের অংশের ওপর

দাঁড়িয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলো, সে যুদ্ধ করার যোগ্য। আর অপর কিশোর সামুরা কুস্তিতে রাফেকে পরাজিত করে নিজের শক্তি প্রমাণ করলো। একটা নির্মল সততাপূর্ণ পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রাণোৎসর্গের মানসিকতা গড়ে উঠতে পেরেছিল। মুসলিম নারীদের ওপর যদিও জেহাদ ফরয ছিলনা। কিন্তু আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত নাযুক পরিস্থিতি দেখে তাদের মধ্যেও স্বতস্ফূর্ত আবেগের জোয়ার সৃষ্টি হলো। অবশেষে হযরত আয়েশা রা., উম্মে সালীত (হযরত আবু সাঈদ খুদরীর মা), উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মা) ও উম্মে আম্মারা সহ বেশ কয়েকজন মহিলা মুসলিম বাহিনীর সাথে রওনা হয়ে গেলেন। তারা রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। মুসলিম বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশো। এদের মধ্যে একশো ছিল বর্মধারী। নিজেদের চেয়ে বারগুণ অধিক সংখ্যক সৈন্য ও সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে যাচ্ছিল নিছক ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে।

রসূল সা. ওহুদ পাহাড়টাকে পেছনে রেখে রণাঙ্গনের অত্যন্ত চমৎকার নকশা তৈরী করলেন। মুসয়াব বিন উমাইয়ের হাতে দিলেন ইসলামী পতাকা। যুবাইর বিন আওয়ামকে একটা সেনাদলের সেনাপতি এবং হযরত হামযাকে বর্মহীন সৈন্যদের সেনাপতি নিয়োগ করা হলো। পেছন দিকে আইনাইন পাহাড় (জাবালে রুমাত) এর সুড়ংগে পঞ্চাশজন তীরান্দাজ সৈন্যকে নিযুক্ত করা হলো। এই সৈন্যদের নেতা বানানো হলো আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে। কোরায়েশরাও বদরের অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানদের অনুসৃত সুশৃংখল যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করলো। ডানদিকের যোদ্ধা দল (মাইমানা), বামদিকের যোদ্ধাদল (মাইছারা), অশ্বারোহী যোদ্ধা দল ও তীরান্দাজ যোদ্ধাদল প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেনাপতির অধীনে সংঘবদ্ধ করা হলো।

যুদ্ধের সূচনা হিসাবে হিন্দার নেতৃত্বে চৌদ্দ জন কোরায়েশ মহিলা ঢোল বাজিয়ে সামরিক গান গাইতে আরম্ভ করলো। যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে এই গানের সুর কত জোরালো, তা নিম্নের কবিতাটা থেকেই আঁচ করা যায়ঃ

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقِ   نَمْشِىْ عَلَى النُّمَارِقِ

اِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقِ   اَوْتُدْبِرُوْا نُفَارِقِ

"তারকার কন্যা মোরা, নিপুণ চলার ভংগি, সামনে যদি এগিয়ে যাও জড়িয়ে নেবো বুকে, আর যদি হটে যাও পিছে, পৃথক হয়ে যাবো চিরদিনের তরে।" এক পক্ষে চলছিল এরূপ কবিসুলভ প্রণয়োদ্দীপক ও কামোদ্দীপক সরস সুড়সুড়ি, আর অপর পক্ষে আল্লাহর সন্তোষ কামনা ছাড়া আর ছিলনা কিছুই।

সহসা ময়দানে নামলো আবু আমের নামক ভন্ডপীর। আনসারগণ তার ভন্ডামী সম্পর্কে অবহিত ছিল। কোরায়েশদের জাহেলী, পৌত্তলিক ও চরম বিকারগ্রস্ত সংস্কৃতির সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। তাকে দেখা মাত্রই মুসলমানরা বলে উঠলো, "ওহে পাপিষ্ঠ, তোকে আমরা চিনি!" মানবেতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল যে, এই আবু আমেরের ছেলে হযরত হানযালা নিজের পিতার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য রসূল সা. এর কাছে অনুমতি

চাইলেন। কিন্তু রসূল সা. এর দয়া ও করুণা অনুমতি দিলনা। পুত্রের হাতে পিতা খুন হবে এটা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। এরপর তালহা হাক ডাক শুরু করলো। হযরত আলী তৎক্ষনাত এগিয়ে গিয়ে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন। এরপর তার পুত্র উসমান নিজেদের বীরত্বের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে এল। তার পেছনে একদল গায়িকা গান গাইছিল। হযরত আলীর তরবারী তাকেও এক নিমেষে খতম করে দিল। এরপর শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ।

মুসলমানদের গোটা বাহিনী নিজেদের সংখ্যা ও সাজ সরঞ্জামের ঘাটতি ঈমানী জযবা ও উদ্দীপনা দ্বারা পুরণ করেছিল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা বাহকরা জাহেলিয়তের অন্ধকারের সাথে এভাবেই লড়াই করে যাচ্ছিল। এর মধ্যে হযরত হামযা, হযরত আলী ও হযরত আবু দুজানার প্রাণপণ লড়াই ছিল সবচেয়ে দর্শনীয়। শেষ পর্যন্ত জাহেলিয়ত পুজারীদের পরাজয় ঘটলো এবং তাদের গায়িকারা পালিয়ে চলে গেল। মুসলিম বাহিনী বুঝতে পারলো, তারা বিজয়ী হয়েছে। তাই তারা শত্রুদের ভবিষ্যতের জন্য নিসম্বল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম রসদপত্র ও অন্যান্য জিনিস দখল করা শুরু করলো। রণাঙ্গনের শৃংখলা ভেঙ্গে গেল এবং অরাজকতা ছড়িয়ে পড়লো। সৈন্যরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশনার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়লো। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হলো, সর্বাধিক নাযুক পাহাড়ী সুড়ঙ্গটাকেও তীরন্দাজরা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। অথচ তাদেরকে কড়াকড়ি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, জয় বা পরাজয় যাই ঘটুক, তোমরা কোন অবস্থায় এই জায়গা থেকে সরবেনা। রসূল সা. এর ভাষা ছিল এ রকম ঃ 'তোমরা যদি দেখতে পাও, পাপীরা আমাদের দেহের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তবুও তোমরা এখান থেকে নড়বেনা।'

কিন্তু মুসলমানরা এ সব নির্দেশ ভুলে গিয়ে বিজয়ের ফসল ঘরে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এ ব্যস্ততার অত্যন্ত ভয়ংকর ফলাফল তাদেরকে ভোগ করতে হলো। তাদের অর্জিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। কোরায়েশ বাহিনীতে তখনো খালেদ বিন ওলীদের ন্যায় বিচক্ষণ ও দুর্ধর্ষ বীর ছিল। সে দূর থেকে রণাঙ্গনের এলোমেলো পরিবেশ দেখতে পেয়ে কয়েকজন অশ্বারোহীকে নিয়ে পাহাড়ের পিছন থেকে সেই প্রহরীহীন পাহাড়ী সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বসলো। তারপর কোরায়েশ বাহিনীর আরো যোদ্ধা আক্রমণে শরীক হলো। বিজয়ের আনন্দের ভেতর থেকে সহসা মাথার ওপর তরবারী দেখে মুসলমানদের টনক নড়লো। ওদিকে শত্রুরা স্বয়ং রসূল সা. এর আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করলো। তিনি দৌড়ে দৌড়ে মুসলমানদের ডাকতে লাগলেন ঃ 'ওহে আল্লাহর বান্দারা! আমার কাছে এস।' কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। এক সময় তাঁর চার পাশে মাত্র এগারজন সাহাবী রয়ে গেল। সুযোগ বুঝে আব্দুল্লাহ বিন কুমাইয়া তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। এতে তার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে কয়েকটা টুকরো চোয়ালের ভেতর ঢুকে গেল। আর একবার শত্রুদের আক্রমণে তিনি গর্তের মধ্যে পড়ে যান এবং কিছু আঘাতও পান। মুষ্টিমেয় ক'জন সাথী ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতার প্রাণ বাঁচাতে যেরূপ বেপরোয়াভাবে লড়াই করলেন, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এহেন প্রলয়ংকরি সংঘর্ষে

রসূল সা. এর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, বরং চৌকসভাবে আত্মরক্ষা করা এবং উবাই ইবনে খালফের ঘাড়ে বর্শা দিয়ে আহত করা অসাধারণ বীরত্বের নিদর্শন। তবু এ সময় রসূল সা. এর আহত হওয়া গর্তে পড়ে গিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া এবং তাঁর সাথে চেহারায় সাদৃশ্য সম্পন্ন সাহাবী জুময়ার ইবনে উমাইরের শহীদ হওয়ার কারণে বিরোধীরা রসূল সা. এর মৃত্যুর গুজব রটানোর সুযোগ পেয়ে যায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে অধিকতর অস্থিরতা ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। এই গুজবের দু'ধরনের ফল ফললো। হযরত ওমর রা. অস্ত্র ফেলে দিয়ে বললেন, রসূল সা. যখন শহীদ হয়ে গেছেন, তখন আর যুদ্ধ করে কী হবে? রসূল সা. এর ভালোবাসা তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তার দৃষ্টিতে তাঁর মত অমূল্য রত্ন হারানোর পর যত বড় বিজয়ই অর্জিত হোক, তা আর বিজয় মনে হয়না। হযরত আনাস আনসারীর বাবা ইবনে নযর তাঁর কথা শুনে বললেন, 'রসূল সা.-এর পর আমরা বেঁচে থেকে কী করবো?' তারপর এমন প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করলেন যে, প্রায় ৮০টা আঘাত খেয়ে শহীদ হলেন। এই বিশৃংখল অবস্থার কারণে মুসলমানদের কেউ কেউ স্বপক্ষীয় ভাইদের হাতেও হতাহত হয়েছেন। হযরত হুযায়ফার পিতা মুসলমানদের হাতেই শহীদ হয়ে যান।

এরপর পরিস্থিতি পাল্টাতে লাগলো। প্রত্যেক মুসলিম সৈনিক নিজ নিজ স্থানে তরবারী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং রসূল সা. কে দেখার জন্য ব্যাকুল ছিল। সর্বপ্রথম হযরত কা'ব ইবনে মালেক রসূল সা. কে দেখতে পান। তিনি সবাইকে ডেকে রসূল সা. এর জীবিত থাকার খবর জানিয়ে দেন। এই সুখবর যখন সবার কাছে গেল, তখন সবাই কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। শত্রুর ভীড় কমলে রসূল সা. পাহাড়ের চূড়ায় চলে গেলেন। আবু সুফিয়ান সেদিকে অগ্রসর হলে সাহাবীগণ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হটিয়ে দিলেন। এবার শত্রুরা শংকিত হলো, অতর্কিতভাবে যে বিজয় তারা অর্জন করেছে, তা আবার হাতছাড়া হয়ে না যায়। তাই মক্কার বাহিনী দ্রুত সঠকে পটতে লাগলো।

আবু সুফিয়ান পার্শ্ববর্তী একটা পাহাড়ের ওপর আরোহন করে রসূল সা. সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলো। সে উচ্চস্বরে রসূল সা., আবু বকর ও ওমরের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এরা কেউ জীবিত আছে নাকি?

এদিক থেকে কোন জবাব দেয়া হলো না কৌশলগত কারণে। তখন সে বলে উঠলো" "সবাই মরেছে।"

হযরত ওমর রা. আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "ওরে আল্লাহর শত্রু। আমরা সবাই জীবিত।" আবু সুফিয়ান শ্লোগান দিল ঃ

"হুবাল, তুমি শির উঁচু করে থাকো।"

এদিক থেকে পাল্টা শ্লোগান দেয়া হলো ঃ

"আল্লাহই চির পরাক্রান্ত, সর্ব শ্রেষ্ঠ!"

আবু সুফিয়ান আবার হুংক দিল ঃ

"আমাদের সাথে উয্যা আছে। তোমাদের উয্যা নেই।"

এদিক থেকে জবাব দেয়া হলো ঃ

"আল্লাহ আমাদের মনিব, তোমাদের কোন মনিব নেই।"

আসলে এই ছোটখাট শ্লোগানগুলোর মধ্য দিয়ে সেই দুটো মতবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, যে দুটো মতবাদের টক্করে ইতিহাসের এত বড় তান্ডব সৃষ্টি হয়েছিল। এই যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ এবং ৪০ জন আহত হন। অপরদিকে শত্রু বাহিনীর মাত্র ৩০ ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্ভব হয়। রসূল সা. এর চাচা হযরত হামযার ন্যায় বীর সেনানী, তাঁর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ, নামকরা সাহাবীদের মধ্যে মুসয়াব ইবনে উমাইর, হানযালা ইবনে আবি আমের, রাফে বিন মালেক বিন আজলান (শেষোক্ত তিনজনই আকাবার উভয় বায়য়াতে শরীক ছিলেন) আব্দুল্লাহ বিন আমর খাযরাজী, আমর বিন জামূহ এবং বহু সংখ্যক বদরযোদ্ধা সাহাবী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সত্যের বৃক্ষকে নিজেদের রক্ত সিঞ্চন করে গেলেন।

অবশেষে যখনই মুসলিম বাহিনী নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল, এবং হাই কমান্ডের সাথে তাদের যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো, তখন শত্রুসেনারা দ্রুত পিছু হটে রণাঙ্গন থেকে চলে গেল। এভাবে আকস্মিক বিজয়ের আড়ালে লুকানো দুর্বলতার মুখোস খুলে গেল এবং মুসলিম বাহিনী আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল।

মুসলমানরা নিজেদের একটা পদস্খলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা পরাজিত হয়নি, তাদের শক্তিও ভেঙ্গে পড়েনি। তাই রসূল সা. এর নির্দেশে ৭০ জন মোজাহেদের এক বাহিনী কোরায়েশী বাহিনীর পিছু ধাওয়া করলো। ওদিকে আবু সুফিয়ান রওহাতে পৌঁছে যখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলো, তখন সে ভীষণ অনুতপ্ত হলো। সে বুঝলো যে, ওহুদে অর্জিত বিজয়ের সুফল সে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ময়দানেই ফেলে এসেছে। মদিনার শক্তি ধ্বংস করার লক্ষ্যটা তার অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। এখন সে হারানো লক্ষ্য পুনরুদ্ধারের কথা ভাবতে লাগলো। কিন্তু গুড়ে বালি! এখন তো সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। যাকে বলে চোর চলে যাওয়ার পর মাথায় বুদ্ধি আসার মত অবস্থা! রসূল সা. আগেই এ আশংকা পোষণ করছিলেন। তিনি মদিনায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁর সমগ্র বাহিনীকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে ৮ মাইল দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন। ইতিমধ্যে খুযায়া গোত্রের (যারা ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামী সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল) নেতা মা'বাদ স্বয়ং গিয়ে আবু সুফিয়ানকে ভয় দেখালো "মুহাম্মাদ সা. এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে।" এ খবর শুনে আবু সুফিয়ান আতংকগ্রস্ত হয়ে দ্রুত চলে গেলো।

ওহুদ যুদ্ধের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণীয় দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেব ঃ

(১) শৃংখলা যে কোন আন্দোলনের আসল শক্তি। সব ধরনের যুদ্ধ ও সংঘাতে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী ও মৌলিক। শৃংখলার ভিত্তি যে নৈতিক গুণটার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার নাম ধৈর্য। অর্থাৎ ভয়ভীতি ও লাভ লোকসানের পরোয়া না করে স্থির ও অবিচল থাকা যায়। ইসলামী সংগঠন এ সময় প্রশিক্ষণাধীন ছিল এবং বিশেষত রণাঙ্গনের ইসলামী চরিত্র মজবুত করার জন্য এখনো ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি। কেননা ওহুদের আগে মাত্র একটা যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল। কোন মানবীয় সংগঠন কোন আদর্শের ভিত্তিতে

নতুন সমাজ গড়ে তোলার সময় পদস্খলন থেকে একেবারে মুক্ত থেকে পূর্ণ সাফল্য ও পরিপক্কতা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু এই সামান্য একটা পদস্খলনের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের এমন একটা বাস্তব শিক্ষা দিয়ে দিলেন, যা কেবল উপদেশের মাধ্যমে অন্তরে বদ্ধমূল করা যায়না। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ কথাটাও স্পষ্ট করে জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার প্রাকৃতিক আইন একেবারেই নিরপেক্ষভাবে ও বেপরোয়াভাবে কাজ করে থাকে। এ আইন ভঙ্গ করলে নিতান্ত সৎ লোকও শাস্তি থেকে রেহাই পায়না।

এই যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে তখনো বিদ্যমান ভুলত্রুটি ও দুর্বলতার কঠোর সমালোচনা করে। তাদেরবে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেয়। (আল ইমরান-১২৫) ধন-সম্পদের যে বাছবিচারহীন লালসা সুদী লেনদেনের প্ররোচনা দিয়ে থাকে এবং যুদ্ধের ময়দানে গনীমত লাভের জন্য অস্থিরতার সৃষ্টি করে থাকে, সেই লোভ লালসা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। তাদেরকে পরোক্ষভাবে বুঝায় যে, সুদখোরী ও লোভাতুর মানসিকতা নিয়ে ধৈর্য ধারণ, শৃংখলা রক্ষা এবং কোন উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐতিহাসিক লড়াই করা যায়না। এই মানসিক প্রেক্ষাপটের সুযোগ নিয়ে সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়। (আল-ইমরান-১৩০) তাদেরকে বলা হয় যে, ইসলামী বিপ্লবের ঝাণ্ডা তারাই বহন করতে পারে, যারা সুদ ও ধন সম্পদের মোহে অন্ধ না হয়ে বরঞ্চ ধন সম্পদ মহত উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ভাবাবেগে প্রবাহিত না হয়ে ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। (আল ইমরান-১৩৪) এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থ অর্জনের জন্য কাজ করবে, সে দুনিয়ায় যা কিছু পাবে, তা-ই হবে তার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। আখেরাতে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবেনা। আর যে ব্যক্তি নিজের পার্থিব স্বার্থের ক্ষতি করে আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করতে চাইবে। তার কাজের উপযুক্ত মূল্য দেয়া হবে। (আল-ইমরান ঃ ১৪৫) তাদেরকে এ কথাও বুঝানো হয় যে, একটা আঘাত খেয়েই তোমরা মর্মাহত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে থেকনা। আজ যদি তোমরা আঘাত খেয়ে থাক, তবে কাল শত্রুরাও তোমাদের হাতে আঘাত খেয়েছে। যে কোন সংঘাত সংঘর্ষে চড়াই-উৎরাই বা জয় পরাজয় তো থাকবেই। কিন্তু নিশ্চিত থাক যে, চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। (আল-ইমরান, ১৩৯-৪০) এরপর তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সতর্ক করা হয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কোন সস্তা পণ্য নয়। এ সৌভাগ্য কেবল তারাই লাভ করতে পারে, যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করতে পারে এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে। ছাঁটাই বাছাই করে সাচ্চা ঈমানদার ও সত্যের সাক্ষ্য দানের যোগ্য লোক নির্ধারণ কেবল এই সব কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। (আল-ইমরান, ১৪০-১৪২) (ওহুদের ময়দানে রসূল সা. এর শাহাদাতের গুজবের ফলে সৃষ্ট) চরম হতাশাব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ নন, তিনি একজন রসূল মাত্র। অতীতের নবী রসূলগণ যেমন মারা গেছেন, তেমনি মুহাম্মাদকেও সা. একদিন না একদিন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবেই। সুতরাং তাঁর তীরোধানে তোমরা ইসলামী আন্দোলন সংগ্রামের সমস্ত কর্মসূচী সিঁকেয় তুলে রাখবে এবং হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে-এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে। (আল-ইমরান ঃ ১৪৪) বস্তুত রসূল সা. এর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসার কারণেই অমন হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। আরো বলা হয়েছে যে,

পূর্বতন নবীগণের সাথে জেহাদ করে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে এবং বাতিলের সামনে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত হয়নি, তাদের আদর্শের অনুসারী হয়ে তোমাদের গড়ে ওঠা উচিত। কেননা আল্লাহ ঐ ধরনের ধৈর্যশীলদেরকেই ভালোবাসেন। (আল-ইমরান ঃ ১৪৬) এই মৌলিক শিক্ষাগুলো দেয়ার পর মুসলিম বাহিনীকে শৃংখলা ভঙ্গ করার কারণে যে মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল, কোরআন তার ছবি তুলে ধরেছে ঃ

"আল্লাহ সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করেছেন। প্রথমে আল্লাহর হুকুমে তোমরাই তাদের হত্যা করছিলে। কিন্তু পরে যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং পরস্পর দ্বিমত পোষণ করলে, তখন আল্লাহ তোমাদের লোভনীয় জিনিস তোমাদের দেখানো মাত্রই তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে। কেননা তোমাদের কিছু লোক দুনিয়ার জন্য লালায়িত ছিল এবং কিছু লোক আখেরাতের অভিলাষী ছিল। তখন আল্লাহ তোমাদেরকে কাফেরদের মোকাবিলায় পিছু হটিয়ে দিলেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তারপরও আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন। কেননা মোমেনদের ওপর আল্লাহ খুবই অনুকম্পাশীল।

স্মরণ কর, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে, কারো দিকে ফিরে তাকানোর হুঁশ পর্যন্ত তোমাদের ছিলনা এবং রসূল সা. পেছন থেকে তোমাদের ডাকছিল। তখন আল্লাহ তোমাদের এই কাজের প্রতিফল এভাবে দিলেন যে, তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যাতে ভবিষ্যতের জন্য তোমরা শিক্ষা পাও এবং তোমরা যা হারাও বা তোমাদের ওপর যা কিছু বিপদ আসে, তাতে তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হও। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত।" (আলে ইমরান ঃ ১৫২-১৫৩)

রসূল সা. এর মুখ দিয়ে ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তৎপরতা ও ভূমিকা সম্পর্কে কৃত এই সমালোচনা ও পর্যালোচনা লক্ষ্য করুন এবং ভাবুন যে, দুনিয়ার সাম্রাজ্য লোলুপ সমরনায়ক শাসকদের থেকে এ সমালোচনার প্রকৃতি ও মেযাজ কত পৃথক। এতে না দেয়া হয়েছে সৈনিকদেরকে যা হচ্ছে তা করার অবাধ অনুমতি, না করা হয়েছে তাদেরকে আত্ম প্রবঞ্চনায় নিক্ষেপ করার চেষ্টা, এবং না করা হয়েছে ঘটনাবলীর ভুল ব্যাখ্যা করার কোন কসরত। এ ছিল একটা বেপরোয়া কঠোর সমালোচনা। আল্লাহর ভয় ছিল এ সমালোচনার মূলমন্ত্র এবং নৈতিক প্রশিক্ষণই ছিল এর উদ্দেশ্য।

(২) এই যুদ্ধে রসূল সা. এর মুষ্টিমেয় সংখ্যক সহচর যেরূপ জীবন বাজি রাখা ভালোবাসা ও আন্তরিক ত্যাগী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, তা মুসলিম উম্মাহকে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জানমাল কুরবানী করার পবিত্র প্রেরণা জোগাতে থাকবে। আসলে যে কোন আন্দোলনই হোক না কেন, তার প্রথম আহবায়ক ও সর্বোচ্চ নেতার ব্যক্তিত্ব তার প্রধান শক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে আহ্বায়ক ও নেতার জন্য গভীর ভালোবাসার দাবী করা হয়েছে। বিশেষত এই পদে যখন নবী ও রসূলের ব্যক্তিত্ব বিরাজমান থাকে, তখন তার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ আত্মোৎসর্গের মনোভাব অত্যন্ত জরুরী। ইসলামী আন্দোলন কোন অবস্থায়ই তার আহ্বায়ক ও নেতাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারেনা। আন্দোলন ও তার আহ্বায়ক-উভয়ের শক্তি, পরাক্রম, ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। যে দল নিজের আহ্বায়ক ও নেতাকে উপেক্ষা করে, তাকে

প্রভাবহীন করে অথবা নিছক "আমাদের একজন" আখ্যায়িত করে শুধুমাত্র আন্দোলনের নীতিমালাকে বিজয়ী করে নিয়ে যেতে চায়, সে দল একেবারেই একটা অন্ধ ও অবিবেচক দল। আন্দোলনের জন্য নীতি ও নেতৃত্ব উভয়ই অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য উপাদান। নীতি ও আদর্শের ওপর অটুট ঈমান ও প্রত্যয় আর নেতার জন্য গভীর ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। রসূলের সা. সাহাবীগণ তাঁর সত্তা ও ব্যক্তিত্বের ওপর জানমাল ও যথাসম্ভব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতেন। এর প্রথম কারণ, তিনি রসূল সা.। আর দ্বিতীয় কারণ, তারা জানতেন ও বুঝতেন যে, তাঁর অস্তিত্ব গোটা আন্দোলনের প্রাণ। এ জন্য তার প্রাণ রক্ষা, তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তির প্রসার ঘটানোর জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতেন। ওহুদ রণাঙ্গনে তারা রসূল সা. এর নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন।

শত্রুরা যখন দলে দলে হানা দিতে লাগলো, তখন রসূল সা. উচ্চস্বরে বললেন, "আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কে প্রস্তুত আছে?" যিয়াদ বিন সাকান এ আওয়ায শুনে কয়েকজন আনসারকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং একে একে সাতজন রসূল প্রেমিক প্রাণোৎসর্গ করলেন। যিয়াদকে মুমূর্ষ অবস্থায় রসূল সা. এর কাছে আনা হলে তিনি অতি কষ্টে মাথা বাড়িয়ে রসূল সা. এর পা স্পর্শ করলেন। আব্দুল্লাহ বিন কুমাইয়া যখন তরবারী দিয়ে রসূল সা. কে আঘাত করলো, তখন মহিলা সাহাবী উম্মে আম্মারা এক লাফ দিয়ে রসূলের সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন এবং নিজের ঘাড়ে গভীর যখম নিলেন। তিনি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানোর কারণেই এই আগাত রসূল সা. কে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আবু দুজানা রসূল সা. কে নিজের শরীর দিয়ে ঢালের মত ঢেকে ফেলেন। তার শরীরে অসংখ্য তীর এসে বিদ্ধ হয়। তালহা শত্রুর তরবারী হাত দিয়ে ঠেকান। তার এক হাত কেটে নীচে পড়ে যায়। আবু তালহা রসূল সা. এর সামনে ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং এত জোরে তা দিয়ে আঘাত করেন যে, দুতিনটে ধনুক ভেঙ্গে যায়। একজন সহজ সরল মুসলমান খেজুর খেতে খেতে ঘটনাক্রমে এসে পড়ে। এ অবস্থা দেখে তার মধ্যেও লড়াই এর আবেগ সৃষ্টি হয়। সে রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, "আমি যদি লড়াই করে মারা যাই, তাহলে আমার পরিণাম কী হবে?" রসূল সা. বললেন, "জান্নাত।" সে বললো, "তাহলে এই খেজুর খেতে খেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।" এই বলে খেজুর ছুড়ে ফেলে দিয়ে তুমুলভাবে যুদ্ধ শুরু করে দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদী কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যে আন্দোলনে নেতার প্রতি এমন তীব্র ভালোবাসা সক্রিয় থাকে, সে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে এমন শক্তি কারো নেই। সা'দ বিন রবীও একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রসূল সা. যেহেতু নিজেও তাঁর সাথীদের প্রতি গভীর স্নেহ পোষণ করতেন, এবং প্রত্যেকের ওপর তাঁর মনোযোগ ও দৃষ্টি থাকতো, এ জন্য যুদ্ধ শেষে এক এক করে প্রত্যেকের অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সা'দ বিন রবী কোথায়? খোঁজ নেয়া হলে দেখা গেল, তিনি একদিকে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে কাঁতরাচ্ছেন। শেষ মুহূর্তে রসূল সা. এর জন্য সালাম, মহব্বত ও দোয়ার হাদিয়া পেশ করলেন এবং সাথীদেরকে ওসিয়াত করলেন যে, "তোমরা সবাই বেঁচে থাকতে যদি শত্রুরা রসূল সা. কে স্পর্শ করারও সুযোগ পায়, তবে আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য

হবেনা।" নিজের ব্যথা বেদনার দিকেও লক্ষ্য নেই, প্রিয়জনদের কথাও খেয়াল নেই, নিজের ধন সম্পদের ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তাভাবনা নেই, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা শুধু ইসলামী আন্দোলন ও তার আহ্বায়ককে নিয়ে।

(৩) মক্কার ইসলাম বিরোধী বাহিনী তাদের ঘৃণ্য মানসিকতা প্রকাশার্থে মুসলিম শহীদদের লাশগুলোর অবমাননা করলো। বিশেষত তাদের মহিলারা তাদের মান্নত পূর্ণ করার জন্য লাশগুলোর পেট চিরলো ও তাদের নাক, কান কেটে মালা বানিয়ে গলায় পরলো। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও মহিলা বাহিনীর সর্দারনী হিন্দা হিংস্রতার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। সে হযরত হামযার মুখমন্ডল বিকৃত করলো এবং বুক চিরে কল্জে বের করে চিবালো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশেরও মুখমন্ডল বিকৃত করা হলো। স্বয়ং আবু সুফিয়ান ধনুক দিয়ে হযরত হামযার মুখে আঘাত করতে লাগলো আর বলতে লাগলো। 'নাও, এখন মজা উপভোগ কর।" অপর দিকে রসূল সা. মুসলিম বাহিনীকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন যে, শত্রুদের লাশের অবমাননা ও মুখমণ্ডল বিকৃত করোনা। ইসলামী আন্দোলনের মূলনীতিতে মানবতার মর্যাদা সমুন্নত রাখার শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ইসলাম তার অনুসারীদের এ অনুমতি দেয়না যে, অন্য কেউ ইতরসুলভ আচরণ করলে জবাবে সেও তা করতে পারবে।

আবু সুফিয়ান যখন তার লোকদের এই সব তৎপরতার কথা শুনলো তখন সানন্দে এগুলোকে অভিনন্দন জানালো। কিন্তু তার এক সংগী এর সমালোচনা করায় তার টনক নড়লো। সে ভাবলো, এ সব কাজ করতে গিয়ে কোথাও ইটের বদলে পাটকেল না খেতে হয় এবং জনমতের কাছে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে না যায়। আবু সুফিয়ান যখন যুদ্ধের শেষে পাহাড়ের ওপর এল, তখন এই অনুভুতির কারণেই সে বললো যে, "এ সব ঘটনা আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঘটানো হয়নি। তবে আমি এগুলোতে ব্যথিতও নই।"

আজ এটা অনুমান করা সহজ নয় যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির এই পাশবিক আচরণ জনমনে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছিল কিনা। তবে একটা ঘটনা জানা যায় যে, শাহাদাতপ্রাপ্ত হযরত হামযার লাশের মুখমন্ডলে আবু সুফিয়ানকে ধনুক দিয়ে আঘাত করতে দেখে জালীস বিন যুবান কিনানী নামক জনৈক মোশরেক নিজ গোত্রের লোকদের বলেছিল, 'ওহে বনী কেনানা, কোরায়েশের বড় সরদার নিজের চাচাতো ভাই এর সাথে কী আচরণ করছে দেখছ? এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান সচেতন হয়।

(৪) রসূল সা. মুসলমানদেরকে রণাঙ্গনের যে মার্জিত ও সুসভ্য আচরণ পদ্ধতি শেখাচ্ছিলেন, তার একটা ঝলক আবু দু'জানার ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়। আবু দু'জানা যখন শত্রু সেনাদের কাতারের পর কাতার লন্ডভন্ড করে সামনে এগুতে থাকেন, তখন হামযার কলজে চিবানো হিন্দ তাঁর সামনে পড়ে যায়। হিন্দ যুদ্ধে শরীক ছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার আবেগ ছিল অত্যন্ত বিষাক্ত। তাই তাকে হত্যা করা দোষের কাজ হতোনা। আবু দু'জানাও তার মাথা তাক্ করে তরবারী উঁচু করেছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাত তিনি এই ভেবে সচকিত হয়ে তরবারী নামিয়ে ফেললেন যে, রসূল সা. এর দেয়া তরবারী দিয়ে কোন নারীর প্রাণ সংহার করা সমীচীন নয়।

(৫) মুসলিম নারীরা ওহুদ যুদ্ধের সময় যেভাবে ঈমানদারী, বীরত্ব, ধৈর্য ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকে বুঝা যায়, রসূল সা. পরিচালিত আন্দোলন নারীদেরকে নিষ্ক্রিয় রাখেনি, বরং তাদেরকে সক্রিয় করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং কাজে লাগিয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ দেখুন।

উম্মে আম্মারার কথা আমরা কিছু আগেই আলোচনা করেছি যে, একজন মহিলা হয়েও তিনি কিভাবে রসূল সা. এর জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

হযরত হামযার বোন সফিয়া মর্মবিদারী ঘটনাবলী শুনে যখন মদিনা থেকে ওহুদের রণাঙ্গনে এসে পৌঁছলেন, তখন রসূল সা. হামযার ছেলে যুবায়েরকে বললেন, ওকে তোমার আব্বার লাশের কাছে যেতে দিওনা। কেননা সে ঐ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারবেনা, সফিয়া বললেন, আমি সব কিছু শুনেছি। সত্য ও ন্যায়ের পথে এ ত্যাগ বড় কিছু নয়। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। সফিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে লাশ দেখলেন, মাগফেরাতের দোয়া করলেন এবং চলে আসলেন।

আমর বিন যামূহের স্ত্রী ও খাল্লাদ বদরীর মা হিন্দ আনসারীর জন্য এটা ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। তাঁর বাবা ও স্বামী দু'জনই শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত আঘাতকে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বারবার কেবল এ কথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, 'আল্লাহর রসূল সা. নিরাপদে আছেন তো? যখন নিশ্চিত হলেন যে, তিনি ভালো আছেন, তখন বেএখতিয়ার বলে উঠলেন 'হে রসূল, আপনি সুস্থ ও নিরাপদ থাকলে আর কোন মুসিবতই অসহনীয় নয়।'

হযরত আয়েশা, উম্মে সুলায়েম ও উম্মে সলীতের ন্যায় সম্ভ্রান্ত পর্দানশীল মহিলারাও দুর্যোগকালে দৌড়ে দৌড়ে মসক ভরে পানি এনে আহত সৈনিকদের পান করিয়েছিলেন।

মুসলমানদের বিপর্যয় ও রসূল সা. এর শাহাদাতের ভুল খবর শুনে হযরত ফাতেমাও ওহুদে হাজির হয়েছিলেন। তিনি রসূলের সা. ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে দেন এবং পট্টি বেঁধে দেন।

(৬) মানবতার বন্ধু রসূল সা. যখন নিজের তরবারী আবু দুজানাকে দিয়েছিলেন, তখন আবু দুজানা মাথায় লাল রুমাল বেঁধে তরবারী দুলিয়ে হেলে দুলে চলতে চলতে শত্রুর কাতারের দিকে অগ্রসর হলেন। এ দৃশ্য দেখে রসূল সা. বললেন," এ ধরনের চাল চলন আল্লাহর খুবই অপছন্দ। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে তিনি এটা পছন্দ করেন। এভাবে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝিয়ে দিলেন। জীবনের সাধারণ কর্মকান্ডে কোন ভাবেই অহংকার প্রদর্শন করা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই অনভিপ্রেত। কিন্তু শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ চলার সময় অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। বিনয় খুবই ভালো জিনিস। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানেও একটা উত্তম নৈতিক বিধির অপপ্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুর সামনে বিনয় প্রকাশ করা অত্যন্ত নির্বোধ সুলভ কাজ। যে নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ধর্মীয় মানসিকতা সততাপ্রীতির নামে কিছু কিছু নৈতিক মূল্যবোধকে বেখাপ্পাভাবে বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। রসূল সা. এই একটা বাক্য দ্বারা সেই মানসিকতার বিলুপ্তি ঘটালেন। শুধু রণাঙ্গনেই নয় বরং তৎকালের অন্যতম রাজনৈতিক প্রচার মাধ্যম রূপে বিবেচিত হতো কবিতা ও বাগ্মীতা। তিনি মুসলিম কবি ও বাগ্মীদের দিয়ে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করাতেন। অনুরূপভাবে

উমরাতুল কাযার সময়ও রসূল সা. সাহাবাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে শক্তি প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছিলেন আর সাফা ও মারওয়ায় দৌড়ানোর সময় বুক টান করে পা ওঠানো এবং হেটে চলার পর দৌড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এটাই একটা সুন্নত তথা ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এ সময় তিনি এই মর্মে দোয়া করেন, যে ব্যক্তি আজ কাফেরদের সামনে শক্তি প্রকাশ করবে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। বস্তুত সংঘাত-সংঘর্ষের যে কোন পর্যায়ে বিনয় প্রকাশ ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। যে ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ স্থান কাল ও পাত্রের পার্থক্য বুঝে করতে পারেনা, সে এক ধরনের পাগলামিতে আক্রান্ত। এ ধরনের পাগলামি দিয়ে আর যাই চলুক, ইসলামী আন্দোলন চলতে পারেনা।

(৭) সততা ও সত্যনিষ্ঠতা এমন শক্তি, যা মানুষকে প্রচন্ডভাবে আকৃষ্ট করে। মদিনায় ওমর বিন সামেত নামে একজন সৎ যুবক বাস করতো। মুসলমানদের সাথে তার আচরণ ছিল সমর্থন ও সহানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। ওহুদের যুদ্ধ তার সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুললো। সে ঈমান আনলো এবং কাউকে কিছু না বলে তরবারী নিয়ে যুদ্ধে শরীক হলো ও শাহাদাত লাভ করলো। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের লোকেরা তাকে সনাক্ত করলো। তারা ওর খবরাদি জানতে চাইলে সে বললো! আল্লাহ ও তার রসূলের প্রেমে সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে লড়াই করছি। রসূল সা. সুসংবাদ দিলেন, জীবনে এক ওয়াক্ত নামাযও না পড়ে সে জান্নাতবাসী হবে। আর একটা উদাহরণ বনু সা'লাবা নামক ইহুদী গোত্রের সদস্য মুখাইরীকের। সে সত্যিকার ইহুদী ধর্মের অনুসরণ করতে গিয়ে রসূল সা. এর পক্ষে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। শুধু নিজে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ক্ষান্ত থাকলোনা, অন্যান্য ইহুদীদেরকেও যুদ্ধ করার আহ্বান জানালো। তার স্বগোত্রীয় ইহুদীরা ধর্মীয় ওযর পেশ করলো যে, আজ তো শনিবার যুদ্ধে যাওয়া অবৈধ। কিন্তু মুখাইরীক বললো, আজ কোন শনিবার নেই। অবশেষে সে একাই রণাঙ্গনে পৌঁছলো, যুদ্ধ করলো ও জীবন উৎসর্গ করলো। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটা উদাহরণ কিযমানের। রসূল সা. তার দোজখবাসী হবার আগাম খবর দিয়েছিলেন। সে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে কোরায়েশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যুদ্ধ শেষে তাকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেলে লোকেরা তার প্রশংসা করলো যে, তুমি তো অসাধারণ শৌর্যবীর্য দেখালে। সে বললো, আমি তো কেবল আমাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার্থে লড়েছি। হতভাগা সৈনিকটা ক্ষতস্থানের ব্যথা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। আল্লাহ তাকে দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করালেন, আবার সে নিহত ও হলো এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আল্লাহ এমন শোচনীয় পরিণত থেকে মুমিনদের রক্ষা করুন।

(৮) আমরা আগেই ইংগিত করেছি যে, এই সময় জাহেলিয়তের নেতিবাচক শক্তি ভীষণ দম্ভে বিভোর ছিল এবং কুফরি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দীপনায় অতিমাত্রায় উজ্জীবিত ছিল। কোরায়েশের পতাকা উত্তোলনকারীরা যদিও একে একে নিহত হলো এবং কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলোনা। কিন্তু নতুন লোকেরা সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের স্থান গ্রহণ করতে লাগলো। অবশেষে যখন সাওয়াব নামক এক ব্যক্তি ঝান্ডা তুললো,

তখন এমন একটা তরবারীর আঘাত খেল যে, তাতে তার দু'খানা হাতই কেটে পড়ে গেল। ঝান্ডা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই সে ঝান্ডার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং "আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি" বলতে বলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। কিছুক্ষণ ঝান্ডা মাটিতেই পড়ে রইল। অবশেষে উমরা বিনতে আলকামা নাম্মী জনৈক মহিলা বীরোচিতভাবে সামনে অগ্রসর হয়ে ঝান্ডা তুলে নিল। এ থেকে বুঝা যায়, ইতিবাচক বিপ্লবী শক্তির আবির্ভাবে রক্ষণশীল শিবিরেও কিছুকালের জন্য উদ্দীপনা বিরাজ করে। ওহুদে সেটাই ঘটেছে। সেখানে মক্কার রক্ষণশীল কুফরি কায়েমী শক্তি তার সর্বশেষ দাপট ও প্রতাপ দেখিয়েছে।

(৯) এই যুদ্ধে মুসলিম শিবিরের বস্তুগত দৈন্যদশা ও রিক্ততার অনেক হৃদয়বিদারক দৃশ্য চোখে পড়ে। মোট সত্তর জন শহীদের লাশ পড়ে ছিল। কিন্তু তাদের জন্য কাফনের ব্যবস্থা করাও কঠিন ছিল। মুসয়াব বিন উমাইরের লাশের ওপর শুধু মাথার দিকে কাপড় দেয়া যাচ্ছিল। কিন্তু পা ঢাকা হয়েছিল আযখার ঘাস দিয়ে। পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতির কথা যখনই মনে পড়তো, মুসলমানদের চোখে পানি এসে যেত। এই অবস্থা থেকেই আন্দাজ করা যায়, মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করা কত কষ্টকর, অনিচ্ছাকৃত অথচ অনিবার্য পদক্ষেপ ছিল, এবং পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ছাড়া কোন মতেই তাদের এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর ছিলনা। কিন্তু বাধ্য হয়ে যখন এ কাজ করতেই হলো, তখন তারা নিজেদের জীবন দর্শনের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, নিজেদের মহান লক্ষ্যের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা এবং রসূল সা. এর অকৃত্রিম সাহচর্য দ্বারা সব রকমের ঘাটতি পূরণ করে নিলেন।

(১০) কোরআন মুসলমানদেরকে তাদের সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করা এবং তার সংশোধনে মনোযোগ দেয়ার পরামর্শ দানের সাথে সাথে তাদের মধ্যে সৈনিক সুলভ গুণাবলীও সৃষ্টি করে। তাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, রণাঙ্গনে নৈতিক শক্তিই হয়ে থাকে আসল নিষ্পত্তিকারী শক্তি। এই নৈতিক শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ধৈর্য। তাদেরকে এও শিক্ষা দেয়া হয় যে, হক ও বাতিলের লড়াইতে তারা যেন বংশীয়, গোত্রীয় ও জাতিগত ভাবাবেগ এবং পার্থিব স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে সিঁকেয় তুলে রাখে। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ, সত্য ও ন্যায়ের বিজয় এবং আখেরাতের সাফল্যকে অগ্রাধিকার দেয়। কোরআন তাদের হৃদয়ে এ কথাও বদ্ধমূল করে যে, জয় পরাজয়ের ফায়সালা সর্বাবস্থায়ই নিরংকুশভাবে আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। একমাত্র তাঁরই সাহায্য কোন শক্তিকে বিজয়ী করতে সক্ষম। কাজেই তাঁরই আইন ও তাঁরই সন্তোষকে সব সময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিষয়টাকেই সূরা আল ইমরানের ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে একটা দোয়ার আকারে শেখানো হয়েছে ঃ

"বল ঃ হে আল্লাহ, রাজাধিরাজ, তুমি যাকে চাও রাজত্ব দাও, যার কাছ থেকে চাও রাজত্ব ছিনিয়ে নাও, যাকে চাও সম্মানিত কর এবং যাকে চাও অপমানিত কর। কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারাধীন। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। প্রাণহীনের মধ্যে থেকে প্রাণীকে এবং প্রাণীর মধ্য থেকে প্রাণহীনকে বের কর, আর যাকে চাও বিনা হিসাবে জীবিকা দাও।"

তাদের মন থেকে মৃত্যুভীতি দূর করা হয়েছে এই বলে যে, মৃত্যু নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর অনুমতিক্রমে আসবেই। তাই জীবন বাঁচানোর খাতিরে কর্তব্য পালনে ক্রটি করলে আয়ু দীর্ঘতর হবেনা। সুতরাং মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কাজ করে যেতে হবে। এই মূল্যবান শিক্ষাগুলোর পাশাপাশি আরো যে শিক্ষাটা দেয়া হলো তা এই যে, যারা সত্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আল্লাহর পথে প্রাণোৎসর্গ করে, তাদের মৃত্যু সাধারণ লোকদের মত মৃত্যু নয়। তাদের মৃত্যু অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কাজেই তাদেরকে সাধারণ মৃত লোকদের মত মৃত ভেবনা এবং মৃত বলোনা। তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নবজীবন লাভ করে, তাদের আত্মাগুলো জ্যোতির্ময় জীবিকা লাভ করে, আল্লাহর মহামূল্যবান উপহার ও পুরস্কার পেয়ে তারা আনন্দিত এবং তাদের সমমনা সাথীদের ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত। এভাবে শাহাদাতের একটা উচ্চাংগের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ফলে আল্লাহর পথে সংঘটিত মৃত্যুর অর্থ এত পাল্টে গেছে যে, মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে, তার জন্য দোয়া করা শুরু হয়েছে। এ প্রসংগে রসূল সা. এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যে, শহীদদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য সুর করে, চিৎকার করে বা বুক চাপড়ে কাঁদা চলবেনা। একটা সত্যনিষ্ঠ বিপ্লবী আন্দোলন যখন গড়ে ওঠে, তখন তা ঐ বিপ্লবী আন্দোলনের সাথেই মানানসই বিশেষ ধরনের পরিভাষার প্রচলন করে, তার ভেতরে বিশেষ ধরনের তাৎপর্য সন্নিবেশিত করে এবং প্রচলিত ধ্যানধারণার মর্ম পাল্টে দেয়। এই সমস্ত শিক্ষা থেকে বুঝা যায়, ইসলামে যুদ্ধ কোন দুনিয়াবী ও বৈষয়িক কাজ নয়। বরং এটা খালেস আল্লাহর এবাদত ও নির্ভেজাল ধর্মীয় দাবী।

(১১) কিছু সংখ্যক মোনাফেক ময়দানে বসেছিল। যুদ্ধের আগে যেমন একটা চরম নাযুক মুহূর্তে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা ও সংগঠনের ঐক্যে ফাটল ধরানোতে তাদের যথেষ্ট হাত ছিল, তেমনি যুদ্ধের পরেও তারা অনেক কানা ঘুষা করেছিল যে, অমুক অমুক কাজ করলে এমন বিপর্যয় ঘটতোনা। তারা এও বলাবলি করছিল যে, নেতৃত্বে যদি আমাদের কিছু দখল থাকতো, তাহলে ওহুদ যুদ্ধের এমন ফল দেখা দিতনা। পেছনের সুড়ংগে যে তীরান্দাজ দল ছিল, তাদের মনও পরিস্কার ছিলনা। মদিনায় যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তোমরা অবস্থান ত্যাগ করলে কেন, তখন তারা নানা রকম খোঁড়া ওজুহাত পেশ করলো। ঐ সব ওজুহাত শুনে রসূল সা. বললেন, "ওসব কিছুনা। আসলে তোমরা আমার সম্পর্কে ভুল ধারণায় লিপ্ত ছিলে যে, আমি তোমাদের সাথে খেয়ানত করবো এবং তোমাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবনা।" কোরআন এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যই বলেছে ঃ "কোন নবীর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করা ঠিক নয় যে, তিনি খেয়ানত করবেন।" (আল-ইমরান, ১৬১)

(১২) শত্রুরা যখন রসূল সা. কে আহত করে দিল, তখন জনৈক সাহাবী তাঁকে পরামর্শ দিলেন, আপনি এই পাষন্ডদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করুন যেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। রসূল সা. জবাব দিলেন, "আমাকে বিশ্ববাসীর জন্য অভিসম্পাতকারী স্বরূপ নয়, অনুগ্রহ স্বরূপ পাঠানো হয়েছে।" তারপর দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমার জাতিকে সুপথে চালিত কর। তারা (আমাকে, আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এবং জীবন ও জগত সংক্রান্ত তথ্যসমূহকে) জানেনা।" আমরা আগেই বলেছি, এই জবাবে ও এই দোয়ায়

রসূল সা. এর সেই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে, যার আলোকে তিনি বিরোধীদেরকে বিবেচনা করতেন। তিনি যে কোন প্রকার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করতেননা, তা সুস্পষ্ট। তিনি তাদের ধ্বংস নয় বরং তাদের সংশোধন চাইতেন। তাদের সামরিক কর্মকান্ডের জবাবে তিনি যদি অস্ত্র ধারণ করে থাকেন, তবে তিনি নেহাত বাধ্য হয়েই তা করেছেন। কেননা তা না করে তাঁর উপায়ান্তর ছিলনা।

ওহুদের পর

যদিও মুসলমানরা ওহুদ যুদ্ধে প্রথমে বিজয়ী ও পরে সাময়িক বিপর্যয়ের শিকার হয়, কিন্তু সর্বশেষে পাল্লা তাদের দিকেই ঝুঁকতে আরম্ভ করেছিল। বিশেষ করে কোরায়েশ কর্তৃক বিজয়কে অসম্পূর্ণ রেখে সটকে পড়া, মুসলিম বাহিনী কর্তৃক তাদের পিছু ধাওয়া করা, এবং আবু সুফিয়ান কর্তৃক আরো একবার ফিরে আসার ইচ্ছা করার পরও মক্কায় চলে যাওয়া মুসলিম বাহিনীর হিম্মত বাড়াতে সহায়ক হয়েছিল। আসলে কোরায়েশ বাহিনী এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা না করেই একে স্থগিত রেখে চলে গিয়েছিল। দু'পক্ষের কেউই অপর পক্ষকে সুস্পষ্টভাবে পরাজিত করতে পারেনি। এ ধরনের পরিস্থিতির অর্থ এটাই হয়ে থাকে যে, "বাকীটা পরে দেখা যাবে।" কোরায়েশের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ান পরিষ্কার ভাষায় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার টক্কর দিতে আসবো। বদরের যুদ্ধের যেমন একটা চূড়ান্ত নিস্পত্তি বেরিয়ে এসেছিল, ওহুদের যুদ্ধের তেমন কোন চূড়ান্ত নিস্পত্তি পাওয়া যায়নি। চূড়ান্ত নিস্পত্তি পরবর্তী সময়ের জন্য মুলতবী হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম বাহিনী বিজয়ী নাহলেও তা পরাজয়ও ছিলনা। কিন্তু তবু বদরের যুদ্ধের যে প্রভাব আশপাশের এলাকায় পড়েছিল, তাতে কিছুনা কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এবং রক্ষণশীল মোশরেক গোত্রগুলোর আশা আকাংখা পুনরায় জাহেলী শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে শুরু করেছিল। কোন কোন অপরাধপ্রবণ অপশক্তির বিদ্রোহী আচরণ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। মদিনার চার পাশের উচ্ছৃংখল গোত্রগুলো নতুন করে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা ঔদ্ধত্যের সাথে চালাতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানদের সংগঠন এত সংহত ও চৌকস ছিল এবং নেতৃত্ব এত মজবুত ছিল যে, তা প্রতিটি অপতৎপরতাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করে পরিস্থিতিকে ক্রমান্বয়ে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে। এভাবে জনগণকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, ইসলামী সরকার যথেষ্ট প্রাণবন্ত, সে আইন শৃংখলা রক্ষা, নাগরিকদের জানমালের হেফাজত ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষায় কোন ত্রুটি করবেনা। তবু ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পুনর্বহালে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

যেসব বিদ্রোহী অপশক্তি ওহুদ যুদ্ধের পর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল, তাদের মধ্যে কুতুনের তালহা বিন খুয়াইলিদ ও সালমা বিন খুরাইলিদই অপতৎপরতার সূচনা করেছিল। তারা বনু আসাদ গোত্রকে মদিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তৎপরতা চালাতে প্ররোচিত করে। বিশুদ্ধতর অভিমত সম্ভবত এটাই যে, এক ধরনের সশস্ত্র ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাসের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই এ পরিকল্পনার খবর জানা গেল। সংগে সংগে এই বিপদ প্রতিহত করার জন্য আবু সালমা মাখযূমীর নেতৃত্বে

দেড়শো যোদ্ধার একটা বাহিনী পাঠানো হলো। তারা কুতুন পৌঁছামাত্রই ডাকাত দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাদের ছেড়ে যাওয়া পশুর পাল ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করলো ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। ৫ই মুহাররম তারীখে অপর এক দিক থেকে খবর এল যে, বনু হুযায়েল গোত্রের খালেদ বিন সুফিয়ান মদিনা আক্রমণ করার জন্য একটা বাহিনী তৈরী করেছে। আব্দুল্লাহ বিন আনীস জুহানী আনসারীকে এদের মোকাবিলায় পাঠানো হলো। আব্দুল্লাহ বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে খালেদের মাথা কেটে নিয়ে এলেন। সম্পূর্ণ একাকী এক কৃতিত্বপূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শনের পুরস্কার স্বরূপ রসূল সা. তাকে নিজের লাঠি প্রদান করেন।

এর দু'তিন সপ্তাহ পর পুনরায় একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলো। সফর মাসের প্রথম দিকে আযাল ও কারা গোত্রের লোকেরা একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে মদিনায় এল। তারা রসূল সা. এর কাছে আবেদন জানালো, আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য আপনি কয়েকজন শিক্ষক পাঠান। রসূল সা. দশজন জ্ঞানীগুণী লোককে পাঠালেন (এ সংখ্যা সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী প্রদত্ত। ইতিহাস ও সীরাত লেখকদের বর্ণনা অনুসারে তারা সাতজন ছিলেন।) এদের আমীর ছিলেন মুরছাদ ইবনে আবুল মুরছাদ। বনু হুযায়েলের আবাসস্থল রজীতে পৌঁছামাত্রই তারা খুবায়েব ও যায়েদ ছাড়া আর সবাইকে হত্যা করে ফেললো। খুবায়েব ও যায়েদকে তারা মক্কায় কোরায়েশদের কাছে বিক্রি করে দিল। কোরায়েশরা উভয়কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। এ ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ ঘটনা থেকে বেশ বুঝা যায় যে, ওহুদ যুদ্ধের পর বিরোধীদের স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা কত বেড়ে গিয়েছিল। একটা ক্ষুদ্র দলের একাধিক মূল্যবান ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে সফরে গিয়ে পথিমধ্যেই এমন নৃশংসভাবে শহীদ হলেন। এতে রসূল সা. যে মনে কত বড় আঘাত পেয়েছিলেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যাদেরকে ইসলামের জ্ঞান দানের লক্ষ্যে তারা গিয়েছিলেন, সেই নরপশুরা তাদের কাছ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ তো দূরের কথা, বিনা অপরাধে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। একই মাসের মধ্যে এর চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটলো বীরে মাউনায়। আবু বারা আমের বিন মালেক নাজদ অঞ্চল থেকে এসে রসূল সা. এর সাথে দেখা করলো। রসূল সা. তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে দাওয়াত গ্রহণও করলোনা, প্রত্যাখ্যানও করলোনা। তবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দিল যে, আপনি আপনার সাথীদের একটা দল নজদে পাঠান। আশা করা যায়, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে। রসূল সা. নাজদ সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করলেন। রাজীর ঘটনা মাত্র কয়েকদিন আগেই ঘটেছে। আবু বারা হেফজতের দায়িত্ব নিল। নাজদ এলাকায় ইসলামী সরকারের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্প্রসারিত করা বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদেই জরুরী হয়ে পড়েছিল, তাই রসূল সা. আবু বারার কথায় বিশ্বাস করে সত্তর জনের একটা দল (এ সংখ্যা বুখারীতে উদ্বৃত, ইবনে ইসহাকের মতে ৪০ জন) পাঠিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হাফেয, কারী ও প্রচারকরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের নেতা ছিলেন মুনযির বিন আমর। এই দাওয়াতী প্রতিনিধি দল যখন বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন সেখান থেকে হারাম ইবনে মিলহান বনু আমের গোত্রের সরদার আমের বিন তুফায়েলের

নিকট রসূল সা. এর চিঠি নিয়ে গেলেন। আমের বিন তুফায়েল চিঠি পড়ার আগেই নিজের লোককে ইংগিত দিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে ফেললো। এরপর সে বনু আমের গোত্রে ঘোষণা করিয়ে দিল যে, "তোমরা যে যেখানেই থাক, মদিনা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের ওপর আক্রমণ চালাতে চলে এস।" কিন্তু বনু আমের আবু বারার প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে রাযী হলোনা। তখন এই নৈরাজ্যবাদী বনী সুলায়েম গোত্রের শাখা রা'য়ান, যাকওয়ান, উসাইয়া, ও বনু লিহয়ানকে দাওয়াত দিলো। তারা প্রস্তুত হলো এবং মদিনার দাওয়াতী প্রতিনিধি দলকে ঘেরাও করে ফেললো। প্রতিনিধি দল বললো, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এখানে থাকতেও চাইনা। আমরা আরো সামনে এগিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তাই আমাদের ওপর আক্রমণ করোনা।" কিন্তু নরঘাতকরা কোন কথাই শুনলোনা। তারা ৬৯ জনকে শহীদ করে ফেললো। ৭০তম সদস্য কা'ব বিন যায়েদ রক্তাক্ত দেহ নিয়ে লাশের স্তূপে লুকিয়েছিলেন এবং কোন মতে প্রাণে বেঁচে মদিনায় পৌঁছে সমস্ত ঘটনা রসূল সা. কে জানালেন। শত্রু পরিবেষ্টিত একটা নবীন দলের এ পরীক্ষা কত মর্মান্তিক ভেবে দেখুন। তার ৬৯ জন সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে একই সাথে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। রসূল সা. এর স্পর্শকাতর এ ঘটনায় নিদারুণভাবে ব্যথিত ও শোকাতুর হন। তিনি এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য এক মাস যাবত ফজরের নামাযে তার প্রিয় সাহাবীদের খুনীদের জন্য বদদোয়া করেন। এই বদদোয়ার পরিভাষাগত নাম কুনুতে নাযেলা।

এই নরপশুদের পাশবিক কর্মকান্ডের বিপরীত বিশ্ব মানবতার ত্রাণকর্তা মহানবীর সা. আচরণটাও লক্ষ্য করুন। ৭০ জন প্রতিনিধির মধ্যকার একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি আমর বিন উমাইয়া মদিনায় ফেরার পথে এক জায়গায় দু'ব্যক্তিকে গাছের ছায়ার নীচে ঘুমন্ত দেখতে পান। ঐ দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে খুনীদের দোসর বলে মনে হওয়ায় তিনি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। তাঁর এ ধারণা ভুল ছিল এবং তারা উভয়ে একটা মিত্র গোত্রের সদস্য ছিল। রসূল সা. এ জন্য রক্তপণ দিয়ে তার খুনের খেসারত দিলেন। কেননা প্রচলিত জুলুমের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই রসূল সা. এত ত্যাগ স্বীকার করছিলেন।

মদিনা অভ্যন্তরীণভাবে স্থিতিশীল না থাকলে এই সব বাহ্যিক জটিলতা সংশোধন সম্ভব ছিলনা। কিন্তু এখানে কিছু কুচক্রী অপশক্তি বিদ্যমান ছিল এবং তারা নিজেদের জমিজমা, ধনসম্পদ ও বড় বড় দুর্গের সুবাদে খুবই প্রভাবশালী ছিল। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসে চরম বিশ্বাসঘাতক সুলভ ষড়যন্ত্র চালাতো এবং মুসলমানদের প্রত্যেক কাজে বাধা দিত। বিশেষত ইহুদী গোত্রগুলো মদিনার ঐক্য সংক্রান্ত চুক্তিতে সাক্ষর করা সত্ত্বেও প্রতিদিন বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা চালাতো। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটির অধিকারী ছিল বনু নযীর গোত্র। তারা হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমীতে মত্ত হয়ে বেপরোয়াভাবে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওহুদ, রজী, ও বীরে মাউনার ঘটনাবলীর পর তাদের ধৃষ্টতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, এহেন নাজুক মুহূর্তে রসূল সা. কে হত্যা করার জন্যও তারা প্রকাশ্যে চেষ্টা চালায়। (এ বিষয়ের উল্লেখ আগেই করেছি)। অতীতের অপকর্মগুলোর পর নতুন করে এই প্রকাশ্য অপচেষ্টা চালাতেও যখন ইহুদীদের বিবেকে বাধলোনা, তখন তাদের

সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়লো। রসূল সা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও প্রাণহানি এড়িয়ে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন।[৪] এ জন্য শুধু নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার নোটিশ দিয়ে তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদিনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চরম পত্র দিয়ে দিলেন। বেরিয়ে না গেলে তাদের সাথে শত্রুর মত আচরণ করা হবে– এ কথাও জানিয়ে দিলেন। মোনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই পর্যাপ্ত সাহায্য দেয়ার অংগীকার করে তাদেরকে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করলো। বনু নযীর তার প্ররোচনায় পড়ে ইসলামী সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিল যে, আমরা তোমাদের চরমপত্রের পরোয়া করিনে। যা করতে চাও কর। অগত্যা চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূল সা. মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে অভিযানে বেরুলেন এবং বনু নযীরকে অবরোধ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অংগীকার রক্ষা করলোনা এবং কেউ তাদের সাহায্যে ছুটে এলনা। অসহায় হয়ে তারা তাদের জনপদ খালি করে দিল। রসূল সা. এর অনুগ্রহে তারা শুধু প্রাণেই রক্ষা পেলনা বরং উটের পিঠে চড়িয়ে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্রও নিয়ে গেল। এই চরম উত্তেজনার পরিবেশেও বনু নযীরের ভেতর থেকে দু'জন ভাগ্যবান ব্যক্তি বেরিয়ে এল, যারা আপন গোত্রের অযৌক্তিক ও অন্যায় আচরণের সাথে সাথে রসূল সা. এর দাওয়াতের সত্যতা ও যথার্থতাও উপলব্ধি করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা ছিল ইয়ামীন বিন উমাইর ও আবু সা'দ বিন ওহাব।

এ সময় মুসলিম বাহিনী কিছু গাছগাছালি কাটতে বাধ্য হয়। এটা তেমন গুরুতর ব্যাপার ছিলনা। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রচারনাবিদরা এখান থেকেও অপপ্রচারের মালমশলা খুঁজে বের করেছে। এটা ছিল একটা অনিবার্য সামরিক তৎপরতা। আজকালও কোন কোন সেনাবাহিনীকে রাস্তা বানানো, শত্রুর গোপন ঘাঁটি ধ্বংস করা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে এ জাতীয় কাজ করতে হয়। এমনকি পুলিশকেও অপরাধীদের পাকড়াও করতে অনেক সময় এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। দালান-কোঠা ভেংগে ফেলতে হয় এবং ক্ষেত খামার ও বাগবাগিচায় প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে হয়।

চরম বিপদসংকুল অবস্থায়ও দুস্কৃতিকারীদেরকে দমন করার মাধ্যমে রসূল সা. শুধু নিজের সমস্যাবলীই কমাননি, বরং আশপাশের লোকদের ওপর নিজের প্রতাপ ও ভাবমূর্তি অম্লান রেখেছেন। তারা বুঝেছে যে, ইসলামী সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবেই বহাল আছে।

আবু সুফিয়ান ওহুদের ময়দানে যে আস্ফালন দেখিয়ে এসেছে, সে অনুসারে একটা শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালানোর জন্য বেরুলো। এবার তার বাহিনীতে ছিল দু'হাজার পদাতিক ও ৫০ জন আরোহী। রসূলও সা. খবর পাওয়ার সাথে সাথে দেড় হাজার পদাতিক ও দশজন আরোহী নিয়ে বদরের ময়দানে উপস্থিত হলেন। সেখানে শিবির

---

৪. কারণ একে তো ইসলামী আন্দোলন স্বভাবতই হিংস্র ও জংগীবাদী নয়। উপরন্তু বিষয়টা কিন্তু দুনিয়ার একটা স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। ইসলামী আন্দোলনকে এই গোষ্ঠীর প্রভাবাধীন এলাকায়ই কাজ করতে হতো। নচেত তাদের অপরাধ এত জঘন্য ধরনের ছিল যে, তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার ছিলনা।

স্থাপন করে একটানা আটদিন কোরায়শী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে মাত্র এক মঞ্জিল দূরে দাহ্রান বা উসফান নামক জায়গায় এসে ফিরে গেল। কেননা অনাবৃষ্টির কারণে ঐ বছরটা তার কাছে যুদ্ধের উপযোগী মনে হয়নি। আবু সুফিয়ানের ফিরে যাওয়ার খবর শুনে শেষ পর্যন্ত রসূল সা. মদিনায় ফিরে গেলেন।

৪র্থ হিজীরীর মুহাররম মাসে (মতান্তরে জমাদিউল উলাতে) বনু গিতফান গোত্রের দুটো শাখা গোত্র বনু মোহারেব ও বনু সা'লাবার পক্ষ থেকে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে- এ কথা জানা মাত্রই রসূল সা. চারশো (মতান্তরে সাতশো) সেচ্ছাসেবক যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলার জন্য একটা বাহিনী প্রস্তুত ছিল সত্য। কিন্তু তারা কার্যত যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। এই সময়কারই ঘটনা। গুরস নামক এক মোশরেক নিজ গোত্রের কাছে এই সংকল্প প্রকাশ করে বাড়ী থেকে বের হয় যে, আমি মুহাম্মাদ সা. কে হত্যা করেই বাড়ী ফিরবো। সে যখন এল, তখন রসূল সা. একাকী একটা গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর তলোয়ার গাছের ডালে ঝুলছিল। গুরস ঐ তলোয়ার খানাই হাতে নিয়ে উত্তোলন করে বললো, "বল এখন তোমাকে কে বাঁচাতে পারে।" রসূল সা. সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বললেন, "আল্লাহ্ বাঁচাতে পারেন।"

দু'মাতুল জানদাল বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর মিলনস্থল ছিল, আবার সেখানে খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারক এবং রাজনৈতিক গোয়েন্দরাও সক্রিয় ছিল। অন্যদিকে বনু নযীর খয়বর প্রভৃতি জায়গায় যেয়ে আশ্রয় নেয়ার কারণে মদিনার বিরুদ্ধে তাদের নানা রকম ষড়যন্ত্র করার আড্ডাখানা হয়ে উঠেছিল। বিশেষত এ ঘটনাটা খুবই রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন যে, মক্কার কোরায়েশ ও খয়বরের ইহুদীদের যোগসাজসের আওতাধীন খৃষ্টান নেতা উকায়দার মদিনার জন্য খাদ্যশস্য বহনকারী কাফেলাগুলোকে উত্যক্ত করা শুরু করে। রসূল সা. জানতে পারলেন, দুমাতুল জানদালে শুক্ররা তাদের বাহিনী একত্রিত করে মদিনায় আক্রমণ করতে চায়। ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূল সা. একজাহার সৈন্য নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ জায়গা অভিমুখে রওনা দিলেন। দুমাতুল জান্দালের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর রওনা হওয়ার খবর পৌঁছামাত্রই শত্রুরা ছাত্রভংগ হয়ে গেল। রসূল সা. আর সামনে এগুনোর প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তিনি পথিমধ্যে মিত্র সংগ্রহের জন্য কাজ করলেন। এই পর্যায়ে আইনিয়া বিন হাসীনের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হলো। পরে ৭ম হিজরীতে হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ একটা দাওয়াতী রাজনৈতিক অভিযান নিয়ে গেলেন এবং কাল্‌ব গোত্রের মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হলো। এরপর নবম হিজরীতে তবুক অভিযানের সময় এ এলাকার ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়।

এবার বনুল মুসতালিক সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল যে, তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুরাইদা আসলামীকে পাঠিয়ে তদন্ত করানো হলেও ঘটনা সত্য বলেই প্রমাণিত হলো। অগত্যা রসূল সা. ৩রা শা'বান সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই তিনি মুরাইদীতে (জলাশয়) গিয়ে পৌঁছলেন। বনুল মুসতালিকের সরদার হারেস বিন যিরার যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু রসূল সা. অতর্কিতে সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তার সৈন্যরা ছত্রভংগ হয়ে গেল। থেকে গেল শুধু তার নিজ গোত্রের লোকজন। প্রথম

আঘাতেই হারেসের বাহিনী পুরোপুরি পরাজিত হলো। বহুসংখ্যক পশু গনীমতের সম্পদ হিসেবে হস্তগত হলো এবং গোত্রের সকল নারীপুরুষ যুদ্ধবন্দীতে পরিণত হলো। এই সব বন্দীর মধ্যে ছিলেন জুয়াইরিয়া নাম্নী এক মহিলা। তিনি রসূল সা. এর সামনে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বললেন, আমি মুসলমান অবস্থায় হাজির হয়েছি। রসূল সা. তাঁর সম্মতিক্রমে তাকে বিয়ে করলেন। এর ফল হলো এই যে, মুসলিম বাহিনী বনুল মুসতালিকের সমস্ত বন্দীকে এই বলে মুক্ত করে দিল যে, আমরা রসূল সা. আত্মীয়স্বজনকে বন্দী রাখতে পারিনা।

এই যুদ্ধেই ইসলামের বিজয়ের দৃশ্য দেখে মোনাফেকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা প্রথমে পানি নিয়ে ঝগড়া বাধায় এবং মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। ফেরার পথে মোহাজেরদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেয়ার জন্য আনসারদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে। এই সফরেই হযরত আয়েশা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে অপবাদের কবলে পড়তে হয়। এ সব কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

ওহুদ যুদ্ধের পর খন্দক যুদ্ধের আগে এই সব ছোট ছোট ঘটনা ঘটে। ইসলামী রাষ্ট্রকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, আইন শৃংখলা বহাল করা ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই এ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এ সবের মধ্যে কেবল শিক্ষক প্রতিনিধি সংক্রান্ত ঘটনাবলী ছাড়া অন্য সব ঘটনায় কখনো শুধু সীমান্তে সৈন্য পাঠানো হয়, আর কখনো নিছক পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নির্ভেজাল সামরিক সংঘর্ষ খুবই কম ঘটেছিল এবং খুবই ক্ষুদ্র আকারের ছিল। ওগুলোকে অনর্থক গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে পাঠকের মনে ভুল ধরণা জন্মাতে পারে। আসল অবস্থা ছিল এই যে, আরবের সমাজ বিভিন্ন ছোট বড় গোত্রে বিভক্ত ছিল। আর প্রত্যেকটা গোত্র, এমনকি গোত্রের শাখাগুলোও নিজ নিজ বলয়ে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক একক ছিল। কখনো একটা গোত্র বিদ্রোহ করতো, আবার অন্যটা আক্রমণ বা ডাকাতি করতে উদ্যত হতো। একটার দুস্কৃতি বন্ধ করলে আর একটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। এ পরিস্থিতিতে যখনই একটা কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হতো, তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট বড় গোত্রগুলোর সাথে সংঘাত সংঘর্ষের ঝুঁকি না নিয়ে কখনো তাতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনা ছিলনা।

তৃতীয় বড় যুদ্ধ-খন্দক

ওহুদের যুদ্ধে যদিও কোরায়েশ মুসলমানদেরকে এক হাত দেখানোর একটা সুযোগ ঘটনাক্রমে পেয়ে গিয়েছিল এবং দৃশ্যত তারা এর মধ্য দিয়ে বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে ও নিয়েছিল। কিন্তু তারা ভালো করেই বুঝেছিল যে, আসলে তারা ওহুদের ময়দান থেকে বিজয়ীর বেশে বাড়ী ফেরেনি। তারা এও বুঝতে পেরেছিল যে, এখন তারা তাদের বর্তমান ক্ষমতার জোরে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে পরাভূত করতে সক্ষম নয়। তাই তারা এক বছরের বিরতিতে আরো বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ ও সৈন্য সংগ্রহের পরে যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে ওহুদ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এ সংকল্প আবু সুফিয়ান প্রকাশও করেছিল। কিন্তু এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কা থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হওয়ার পর পরিস্থিতির

প্রতিকূলতার কারণে তারা ফিরে গেল। কোরায়েশ ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্যটা হলো, কোরায়েশের জাহেলী শিবির স্বীয় প্রাণশক্তির দিক দিয়ে স্থবির ও দুর্বল ছিল এবং তার মধ্যে বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভের কোন যোগ্যতা ছিলনা। বরঞ্চ তার কিছু কিছু শক্তি সব সময় তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের পাল্লায় পড়ছিল। মদিনার ইসলামী শক্তি ছিল একটা আদর্শবাদী, দাওয়াতী ও গণমুখী শক্তি। তাই এটা ছিল সদা সক্রিয়, কর্মব্যস্ত, বিকাশমান ও সম্প্রসারণশীল। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে সময়ের আবর্তন মদিনার পক্ষে লাভজনক প্রমাণিত হচ্ছিল। নৈতিক প্রশিক্ষণ ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী সম্পর্ক, প্রতিরক্ষামূলক শক্তি, জনশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি স্বত্বের প্রসার–সব দিক দিয়েই মদিনা ক্রমেই স্ফীত, সম্প্রসারিত ও শক্তিমান হয়ে চলছিল। ইসলামী রাষ্ট্র কোরায়েশদের বাণিজ্যিক পথ কার্যত বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মক্কা অর্থনৈতিক সংকটে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র ওহুদ যুদ্ধের পর দু'বছর বহু জটিলতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। পক্ষান্তরে কোরায়েশ যে যুদ্ধকে এক বছরের জন্য স্থগিত করেছিল, সে যুদ্ধ এক বছর বিলম্বিত হওয়ার কারণে তা এখন তাদের কাছ থেকে আরো বেশী আগ্রাসী শক্তি সঞ্চয়ের দাবী জানাচ্ছিল। একা কোরায়েশদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এত শক্তি যোগান দেয়া সহজসাধ্য ছিলনা। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের রকমারি শত্রুরা পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে পারস্পরিক ঐক্যের পথ খুঁজে নিয়েছিল। মদিনা থেকে বিতাড়িত যে সব ইহুদী খয়বর ও ওয়াদিওল কুরাতে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা কোরায়েশকে মদিনায় হামলা করতে প্ররোচিত করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াচ্ছিল। মদিনার জন্য খাদ্যশস্য বহনকারী কাফেলাগুলোর পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের অপতৎপরতার সূচনা করে। এই সব নির্বাসিত ইহুদী যখন ওহুদ যুদ্ধের ফলাফল জানতে পারলো এবং আবু সুফিয়ানের পুনরায় আক্রমণ চালানোর সংকল্পের কথা শুনলো, তখন তাদের উদ্যম ও উৎসাহ আর দেখে কে। তারা জনশক্তির অধিকারী বনুগিতফানকে খয়বরের খেজুরের পুরো এক বছরের উৎপন্ন ফসল এবং ভবিষ্যতেও একটা নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার অংগীকার করে মদিনার ওপর আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করলো। এতখানি কাজ সম্পন্ন করার পর তারা মক্কায় একটা প্রতিনিধিদল পাঠালো। এই প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল সালাম বিন আবিল হাকীক, সালাম বিন মুশকাম, হুয়াই বিন আখতাব, কিনানা বিন রবী (বনু নযীর) হাওযা বিন কয়েস, ও আবু আম্মারা (বনু ওয়েল) প্রমুখ বড় বড় ইহুদী নেতারা। তারা কোরায়েশকে নিশ্চয়তা দিল যে, তোমরা আক্রমণ চালালে আমরা মুহাম্মদ সা. সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা দিতে থাকবো। এই প্রতিনিধি দল মক্কা থেকে পুরোপুরি কৃতকার্য হয়ে ফিরলো এবং ফেরার পথে বনু গিতফান ও অন্যান্য গোত্রের সাথেও দেখা করলো। কোরায়েশরাও তাদের মিত্র ও সমর্থকদের সাথে আলাপ আলোচনা চালালো এবং আহাবীশদেরকেও সাহায্যের জন্য ডাকলো। মোটকথা, এবার জাহেলী শক্তি সমগ্র আরব থেকে তার সমর্থক শক্তি যোগাড় করলো।

আবু সুফিয়ানের সেনাপতিত্বে চার হাজার সৈন্য মক্কা থেকে রওনা হলো। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল তিন হাজার ঘোড়া ও এক হাজার উট। এই বাহিনী যখন মাররুয্ যাহরান পৌঁছলো,

তখন কোরায়েশের অন্যতম মিত্র বনী সুলায়েম, বনু আসাদ, ফাযারা, আশজা ও বনু মাররা প্রভৃতি গোত্র নিজ নিজ এলাকা থেকে বেরিয়ে কোরায়েশ বাহিনীর সাথে যুক্ত হলো। বনু গিতফান উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে বেরুলো। এভাবে কোরায়েশী বাহিনীর লোকসংখ্যা সর্বমোট কততে দাঁড়ালো, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে ৬ থেকে ৭ হাজার, কারো মতে ১০ হাজার এবং কারো মতে ২৪ হাজার। তবে অধিকাংশের মতে সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং এটাই অগ্রগন্য মত।

রসূল সা. যখন দুমাতুল জানদাল সফরে ছিলেন, তখই এসব প্রস্তুতির কথা জেনে ফেলেছিলেন। এ জন্যই তিনি দ্রুত ফিরেও এসেছিলেন। পরামর্শ সভা বসলো। স্থির হলো যে মদিনায় বসেই হামলা প্রতিহত করা হবে। শহরের প্রতিরক্ষার জন্য ইরানী পদ্ধতিতে পরিখা বা খন্দক খনন সংক্রান্ত হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ গ্রহণ করা হলো। এর একটা উপকারিতা এই ছিল যে, অভিনব এই প্রতিরক্ষা কৌশল আরব হানাদারদের বেকায়দায় ফেলে দিতে সক্ষম ছিল। তা ছাড়া একটা উঁচু ও মজবুত প্রাচীর দ্বারা যে কাজ সমাধা হতে পারতো, সেই কাজ নিছক শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই সমাধা করা যেত। এই পদ্ধতিতে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা বিপুল সংখ্যক শত্রু সেনাকে ঠেকানো সম্ভব ছিল এবং এতে প্রাণহানিও অপেক্ষাকৃত কম হবার সম্ভাবনা ছিল। রসূল সা. ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নিজেই পরিখার নকশা স্থির করতে বেরুলেন। মদিনা শহরটা তিন দিক থেকেই বাড়ী-ঘর ও প্রাচীর ঘেরা বাগবাগিচায় আবদ্ধ ছিল। তাই ঐ তিন দিক পরিখা খননের কোনই প্রয়োজন ছিলনা, পরিখার প্রয়োজন ছিল শুধু উত্তরের খোলা দিকে। স্থির হলো, হাররায়ে শারকী ও হাররায়ে গারবী (পূর্বের প্রস্তরময় প্রান্তর ও পশ্চিমের প্রস্তরময় প্রান্তর) কে যুক্ত করে এমন একটা অর্ধবৃত্তাকার পরিখা সিলা পর্বতের পশ্চিম কিনার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এই অংশটার খনন কার্যতো সামরিক ব্যবস্থাপনায় করানো হলো। তবে কোন কোন গোত্র নিজ নিজ বাড়ীঘরের রক্ষণাবেক্ষণের খাতিরে নিজস্ব উদ্যোগে পরিখা আরো বাড়িয়ে নিল। ফলে পরিখা দক্ষিণে ঈদগাহের (মসজিদে গামামার) পশ্চিম দিক দিয়ে টেনে নিয়ে কোবার দিকে অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা করা হলো। যে তিন হাজার মুসলিম মোজাহেদের ওপর পরবর্তীতে সরাসরি যুদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তারাই খন্দক খননে স্বেচ্ছা শ্রমিকের ভূমিকা পালন করলো। দশ দশ জনের এক একটা গ্রুপ বানানো হলো এবং প্রত্যেক গ্রুপকে দশ গজ করে খন্দক খননের কাজ অর্পন করা হলো। খন্দক আনুমানিক দশ গজ চওড়া করা হয়েছিল। কেননা কোন কোন ঘোড় সওয়ার শত্রুসেনা খন্দকের ওপর দিয়ে ঘোড়াকে লাফিয়ে পার করতে গিয়ে ভেতরে পড়ে মারা গিয়েছিল। খন্দকের গভীরতাও সম্ভবত ৫ গজের কম ছিলনা। আর এর দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে তিন মাইল। মুসলিম সেচ্ছাসেবকরা মাত্র তিন সপ্তাহে এত বড় কাজ কিভাবে সম্পন্ন করলো, তা ভাবতেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। প্রায় তিন লাখ আট হাজার বর্গগজ মাটি খনন করতে ও তা স্থানান্তর করতে হয়েছে। এটা কোন সহজ কাজ ছিল না। মাথা প্রতি একশো বর্গগজের চেয়ে বেশী মাটি কাটতে ও স্থানান্তর করতে হয়েছে। সরঞ্জামাদির ব্যাপারে অবস্থা ছিল এ রকম যে, মাটি কাটা ও খনন করার কিছু কিছু উপকরণ চুক্তির আওতায় বনু কুরায়যার কাছ থেকে ধার নেয়া হয়েছিল। ঝুড়ি-টুকরীর অভাবে সাধারণ

মুসলমানরা তো দূরের কথা, আবু বকর ও ওমরের রা. মত ব্যক্তিরাও চাদরে ও আঁচলে ভরে ভরে মাটি তুলছিলেন। খন্দকের সাথে জায়গায় জায়গায় উঁচু উঁচু পর্যবেক্ষণ মঞ্চ বানানো হয়েছিল। ঐ সব মঞ্চ থেকে খন্দকের সকল অংশ এক সাথে তদারক করা যেত।

খন্দক খননের কাজ কোন মতে হতে না হতেই ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলো। কোরায়েশ কিনানা ও আহাবিশ সৈন্যরা ওয়াদিয়ে আকীকের কাছাকাছি রওমার কূপের কাছে শিবির স্থাপন করলো। গিতফান ও বনু আসাদ পূর্বদিকে ওয়াদিউন নুমানের কাছে যাম্ব নকমা নামক জায়গা থেকে নিয়ে ওহুদ পর্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে শিবির স্থাপন করলো। অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী সিল্আ পর্বতকে পেছন দিকে রেখে কেন্দ্রীয় শিবির স্থাপন করলো, এখানে যে স্থানটায় রসূল সা. এর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার স্মৃতি হিসাবে সেখানে আজও মসজিদুল ফাত্হ বিদ্যমান।

ইসলামের শত্রুরা যদিও বিপুল সংখ্যায় কাতারবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই খন্দক বা পরিখা তাদের জন্য এক নতুন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এ ধরনের প্রতিরোধব্যূহ তারা আর কখনো দেখেনি। এই কৌশল সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। তাদের ঘোড়া ও উট খন্দকের বহিসীমান্ত পর্যন্তই কার্যোপযোগী ছিল। দু'একজন ঘোড় সওয়ার সৈনিক অতি উৎসাহে লাফিয়ে খন্দক পার হবার চেষ্টা করতে গিয়ে খন্দকে পড়ে মারা গিয়েছিল। তারা বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসতো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সৈনিকরা কোন রকম শৈথিল্য না দেখিয়ে তৎক্ষণাত তাদের সামনে এসে দাঁড়াতো এবং তীর নিক্ষেপকারী শত্রুদের মুখ ফিরিয়ে দিত। তরবারী ও বর্শা একেবারেই অকর্মণ্য ছিল। প্রতিদিনই উভয় পক্ষ থেকে কিছু কিছু তীর নিক্ষেপণ চলতো। কয়েকদিনের অবরোধে বিরক্ত হয়ে একদিন শত্রুবাহিনী খুব জোর দেখালো। কখনো এখান থেকে এবং কখনো ওখান থেকে হামলা করলো কিন্তু কোনই লাভ হলোনা। অবশেষে কোরায়েশ বাহিনীর খ্যাতনামা প্রবীণ ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা ওমর বিন আবদু উদ আবেগে মাতোয়ারা হয়ে ছুটলো। সে আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা, হুবাইরা বিন আবু ওহব, এবং যিরার ইবনুল খাত্তাবকে উস্কে দিল এবং বনু কিনানার কিছু লোককে সাথে নিয়ে নিল। অবশেষে একটা সুবিধাজনক জায়গা দেখে ঘোড়াকে লাফিয়ে পার করলো। তার পিছু পিছু দু'একজন সাথীও খন্দক পার হয়ে গেল। অন্যরা সবাই খন্দকের কিনারে দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে গিয়ে সে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিল। হযরত আলী তার মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন এবং সামান্য আঘাত খেয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। এই একটা দিন মুসলিম বাহিনীর জন্য এত কঠিন ছিল যে, বিভিন্ন দিক থেকে আগত শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে চার ওয়াক্ত নামাজ কাযা হয়ে গেল।

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়াটা মুসলমানদের জন্য উদ্বেগজনক ছিল। কিন্তু শত্রুরাও এতে বিচলিত ছিল। অনেক সলাপরামর্শের পর একটা চূড়ান্ত হামলা করার জন্য স্থির করা হলো যে, ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যাকে রসূল সা. এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তারা ভেতর থেকে হামলা চালাবে। আবু সুফিয়ানের অনুরোধে হুয়াই বিন আখতাব এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো। সে বনু কুরায়যার সরদার কা'ব বিন আসাদের সাথে

দেখা করলো এবং নিজের বক্তব্য পেশ করলো। কা'ব প্রথমে তো অস্বীকার করলো। সে বললো, আমি মুহাম্মাদ সা. কে সব সময় ওয়াদা পালন করতে দেখেছি। কাজেই তাঁর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করা অত্যন্ত অমানুষিক কাজ হবে। কিন্তু হুয়াই বিন আখতাব সর্বাত্মক জোর দিয়ে অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলো এবং বললো, "আমরা অগণিত সৈন্য নিয়ে এসেছি। সমগ্র আরব জাতি আমাদের সাথে চলে এসেছে। গোটা বাহিনী মুহাম্মাদের সা. রক্তের নেশায় বিভোর। এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক নয়। এখন ইসলামের অন্তিম সময় উপস্থিত।" মোটকথা, প্ররোচনার কৌশলটা সফল হলো। আর বিষয়টা তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদের কানে চলে গেলো। রসূল সা. ব্যাপারটার সত্যাসত্য তদন্ত করলেন। তদন্তেও সঠিক প্রমাণিত হলো। সাহাবাদের একটা দল যখন বিষয়টা সত্য বলে সাক্ষ্য দিল, তখন রসূল সা. এর মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারিত হলো, "আল্লাহু আকবর! হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল। ("আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি উৎকৃষ্টতম অভিভাবক।")

রণাঙ্গনের ব্যাপকতা, অবরোধের দীর্ঘস্থায়িত্ব, সৈন্য স্বল্পতা, সাজ সরঞ্জামের অভাব, ক্ষুধার প্রচণ্ডতা, সেই সাথে নিদ্রাহীনতা, মোনাফেকদের নানা রকমের খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে রণাঙ্গন থেকে সটকে যাওয়া এবং ব্যস্ততার আতিশয্যে নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে যাওয়া– এ সব কোন মামুলী পরীক্ষা ছিলনা। উপরন্তু যখন মদিনার অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা ছড়িয়ে পড়লো এবং দেড় হাজারেরও বেশী যোদ্ধা পুরুষ যোগান দিতে সক্ষম বনু কুরায়যার অতর্কিতভাবে গৃহশত্রু বিভীষণের ভূমিকায় নেমে যাওয়ার মত পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তিন হাজার মরণপণ মোজাহেদের মানসিক অবস্থা কী হতে পারে, তা আজ অনুমান করা কঠিন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. জানান, এ খবরটা জানার পর আমাদের মধ্যে আশংকা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আমাদের বাড়ীতে নারী ও শিশুদের ওপর হামলা হতে পারে। এই আশংকার কারণে আমরা বারবার পাহাড়ের ওপর উঠে দেখতাম, কোন ঘটনা ঘটে গেল নাকি। নিজেদের বাড়ীঘর শান্ত দেখলে আল্লাহ শোকর আদায় করতাম। রসূল সা. তিনশো মোজাহেদের একটা বাহিনী মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পাঠালেন। এই সময়কার পরিস্থিতির চিত্র কোরআন যেভাবে তুলে ধরেছে, তা হলো ঃ

"স্মরণ কর, যখন শত্রুরা ওপর থেকেও এবং নীচ থেকেও তোমাদের দিকে অগ্রসর হলো, যখন তোমাদের চক্ষুগুলো স্থির হয়ে গেল এবং হৃদয়গুলো মুখের কাছে এসে গেল, আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের মনে নানা রকমের ধারণা ঘুরপাক খেতে লাগলো।" (আহযাব–১০)

বস্তুত এই ঘটনায় মুসলমানদের যে ধরনের কঠিন পরীক্ষা হয়েছিল, তেমন পরীক্ষা পূর্ববর্তী বড় বড় দুটো যুদ্ধের কোনটাতেই হয়নি। ওহুদ যুদ্ধে অবর্ণনীয় কষ্ট হয়েছে সত্য। কিন্তু যা কিছুই হয়েছে, একদিনে হয়ে গেছে। কিন্তু এবারের দুঃখকষ্ট ছিল দীর্ঘস্থায়ী, আর হানাদার শুধু কোরায়েশরা ছিলনা, আরো অনেকে ছিল। মুসলমানদের দুঃখ কষ্ট দেখে রসূল সা. এই কৌশল উদ্ভাবন করলেন যে, শত্রু বাহিনীর কোন না কোন অংশকে আপোষমূলক চেষ্টাতদবীর দ্বারা রণাঙ্গণ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। প্রচন্ড অর্থলোলুপ বনু

গিতফানের দুই সরদারকে তিনি ডেকে আনালেন এবং কথাবার্তা বললেন। তাদেরকে তিনি মদিনার মোট উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে আপোষ রফা করাবার প্রস্তাব দিয়ে সমঝোতায় উপনীত হলেন এবং চুক্তির খসড়াও তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু সাক্ষর দেয়ার আগে তিনি সাদ বিন মুয়ায ও সাদ বিন উবাদা (আওস ও খাজরাজের সরদার) এর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী মনে করলেন। তিনি তাদের উভয়কে বুঝালেন যে, "তোমরা এত বিপুল সংখ্যক শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছ যে, তাদেরকে প্রতিহত করা সহজ নয়। তাই শত্রুর শক্তি খর্ব করার এ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই।" উভয়ের আত্মাভিমান জেগে উঠলো। তারা বললো, "হে রসূল, আমরা যখন কাফের ছিলাম তখনো তো এইসব গোত্র আমাদের ধনসম্পদ এভাবে নিতে পারেনি। আর আজ যখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে গেছি, তখন তাদের হাতে আমাদের সম্পদ এভাবে সোপর্দ করবো? আল্লাহর কসম, এটা কখনো হতে পারেনা। আমাদের এমন চুক্তির দরকার নেই।" রসূল সা. এই জবাব শুনে যারপর নাই খুশী হলেন। তিনি চুক্তির খসড়াটা হযরত সাদের কাছে দিলে সা'দ তা ছিঁড়ে ফেললেন।

তথাপি পরিস্থিতির জটিলতা যথাস্থানে বহালই ছিল। আল্লাহ তায়ালা সহসা একটা সমাধান বের করে দিলেন। এটা ছিল একটা বিস্ময়কর ঘটনা এবং ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সত্যতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এহেন প্রলয়ংকরী মুহূর্তে সহসা নঈম ইবনে মাসউদ সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি রসূল সা. এর কাছে এসে বললেন, "হে রসূল, আমি মুসলমান হয়ে গেছি।" এই বলে তিনি প্রকাশ্যে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে নিজের বিশুদ্ধ আকীদা ঘোষণা করলেন। তারপর বললেন, "এখনো যেহেতু শত্রুরা আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানেনা। সুতরাং যদি অনুমতি দেন, তবে আমি কোরায়েশ ও বনু কুরায়যার ঐক্য ভাঙ্গার জন্য কিছু কাজ করতে পারি।" রসূল সা. অনুমতি দিলেন। নঈম বনু কুরায়যার কাছে গেলেন। তাদের সাথে প্রাথমিক কথাবার্তার পর তিনি তাদের বললেন 'যদি বিজয় অর্জিত হয় তাহলে তো ভালো কথা। কিন্তু পরাজয় যদি কপালে জোটে, তাহলে কী হবে ভেবে দেখ। পরাজিত হলে কোরায়েশ ও গিতফান সবাই চলে যাবে এবং তোমরা একাই মুহাম্মদ সা. এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে। কাজেই তোমরা কোরায়েশ ও গিতফানকে বল, তারা যেন তাদের কয়েকজন লোককে তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে রেখে দেয়। এই শর্ত পূর্ণ করলে তাদের সাথে সহযোগিতা কর, নচেত ওদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। এরপর নঈম কোরায়েশ নেতাদের কাছে গেলেন। তাদেরকে বললেন যে, আমার কাছে কিছু তথ্য রয়েছে, যা তোমাদেরকে জানানো আমি জরুরী মনে করছি। বনু কুরায়যা এখন মত পাল্টে ফেলেছে। এর প্রমাণ আপনারা অচিরেই পেয়ে যাবেন। তারা আপনাদের কাছে কিছু লোক যিম্মী হিসাবে চাইবে। ফলে কোরায়েশ বনু কুরায়যাকে জানালো যে আমরা এই দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ আর সহ্য করতে পারছিনা। এখন তোমরা যদি আমাদের সাথে সহযোগিতা কর, তবে একটা চূড়ান্ত হামলা চালাবো। বনু কুরায়যা তাদের কিছু লোক যিম্মী রাখার দাবী জানালো। এবার কোরায়েশ নঈমের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলো। বনু কুরায়যার ওপর তাদের আর আস্থা থাকলোনা। এই কৌশলের ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতির চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

ইসলামের শত্রুদের ঐক্যে ফাটল ধরার কারণে তারা ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলো। প্রায় এক মাস হয়ে গেল, তারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। কাজকর্মের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। অনেক টাকা পয়সা ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। অথচ তাতে কোন ফায়দা হলোনা। এদিকে এত বিশাল বাহিনী ও তার পশুদের রসদের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করলো। কোরায়েশদের রসদের একটা বিরাট অংশ পথিমধ্যে একটা মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হলো। তাছাড়া আবহাওয়াও প্রতিকূল হয়ে গেল। ঠান্ডা সহ্যের বাইরে চলে গেল। এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর প্রভাব খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছার সামান্য একটা ইংগিত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করে দেয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত হয়ে অনেক সময় অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় সত্যের পাল্লাকে ভারী করে দেয়। এক রাতে সহসা এমন ঝড় এল যে, হানাদারদের তাবু উৎপাটিত হয়ে গেল, চুলো নিভে গেল, হাড়িপাতিল ও তৈজসপত্র সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল, পশুরা ভড়কে গেল। এক কথায়, তাদের যুদ্ধের উৎসাহ উদ্দীপনা একেবারেই বরফ হয়ে গেল। তারা ভীষণ আতংক গ্রস্ত হয়ে যুদ্ধ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলো। এই গায়েবী সাহায্যের ব্যাপার আল্লাহ বলেন ঃ

"আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যসামন্ত সমবেত হলো, আর আমি তাদের ওপর ঝড় পাঠিয়ে দিলাম এবং সেই গায়েবী বাহিনী পাঠালাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি।" (সূরা আহযাব-৯)

সৈন্যদের মধ্যে সর্বব্যাপী ত্রাস, হতাশা দেখে আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো যে, তাদের পক্ষে আর বেশী দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই অকস্মাৎ তারা মদিনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। রসূল সা. বললেন, "এখন কোরায়েশদের আক্রমণের যুগ শেষ হলো।" অর্থাৎ তাদের নিজেদের একক শক্তির ধার তারা বদর ও ওহুদে পরীক্ষা করেছে। আর খন্দকে তারা সারা আরব থেকে মিত্রদেরকে সাথে নিয়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়েছে। এ আক্রমণও বিফলে গেল। এখন যেহেতু এত শক্তি একত্রিত করা তাদের পক্ষে আর ভবিষ্যতে সম্ভব হবেনা, কাজেই কোরায়েশ আর কিভাবে ভবিষ্যতে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে? পরবর্তীকালের যুদ্ধে তো আরো বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে।

এ যুদ্ধে উভয় পক্ষেই খুব কম প্রাণহানি হয়েছে। মুসলিম বাহিনীতে হয়েছে অনেক কম। তাদেরর মোট ৬ ব্যক্তি শহীদ হন। তবে এদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি তীরের আঘাতে আহত হন এবং কয়েকদিন পর ইন্তিকাল করেন।

খন্দক যুদ্ধের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

এ যুদ্ধের শিক্ষামূলক বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

১- সবচেয়ে বেশী ঈমান বৃদ্ধিকারী বিষয় ছিল মুসলিম সেচ্ছাসেবকদের মরণপণ উৎসাহ উদ্দীপনা। তারা শুধু যে এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে পরম ধৈর্য ও অটুট মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, বরং খন্দক খননের কাজটা এমনভাবে সম্পন্ন করলেন যেন জ্বিনদের কোন বাহিনী পৃথিবীটাকে ধরে উল্টে দিল। তারা ইসলামী গান

গাইতে গাইতে এ কাজ করেছেন।

نَحنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা সেই সব লোক, যারা মুহাম্মাদের হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে আজীবন জেহাদ করে যাবো।"

অপর এক দল গেয়ে ওঠে ঃ

اِنَّ الاَوْلِىَ قَدْ بَغُوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

"শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে আমাদেরকে সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু আমরা তা মানিনা।" বিশেষত 'মানিনা' 'মানিনা'। এই শব্দটা যখন সমস্বরে জোরদার আওয়াজে গাওয়া হতো, তখন এক দুর্দম সংকল্প আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো।"

তাদের এই উৎসাহ উদ্দীপনার একটা কারণ ছিল এইযে, তারা সারা জীবন সংগ্রাম করে এ যাবত যা কিছু অর্জন করেছে, তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। ইসলামী আন্দোলন ও মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র ছিল তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। এর জন্য তারা তাদের জানমাল সব কিছু উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতো। মানবজাতির ইহপরকালীন সর্বময় মংগল সাধনের পবিত্র সংগ্রাম ও সাধনা ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। আর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ছিল এইযে, তাদের প্রিয়তম নেতা তাদের সাথে কর্মক্ষেত্রে শুধু সশরীরে উপস্থিতই ছিলেন না, বরং সক্রিয়ভাবে প্রতিটি কাজে অংশ গ্রহণ করছিলেন। খননের কাজ যখনই শুরু হলো, রসূল সা. নিজের বাড়ী থেকে কর্মক্ষেত্রে চলে এলেন এবং সন্নিহিত একটা পাহাড়ে তাঁর থাকার জন্য তাঁবু স্থাপন করা হলো। বর্তমানে এই স্থানটাতে 'মসজিদুয্ যুবাব' প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দশ দশ জন করে যে গ্রুপ গঠিত হয়েছিল, তেমনি একটি গ্রুপে রসূল সা. নিজেও সদস্য ছিলেন। এটা একটা সুপ্রসিদ্ধ ব্যাপার যে, হযরত সালমান ফারসী অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে দশগুণ বেশী কাজ করতে সক্ষম ছিলেন। এ জন্য প্রত্যেক গ্রুপ তাকে নিজের অর্ন্তভুক্ত করার চেষ্টা করতো। এই টানাপোড়নের নিস্পত্তি রসূল সা. এভাবে করলেন যে, তিনি বললেন ঃ 'সালমান আমাদের পরিবারের গ্রুপের সদস্য।' এভাবে হযরত সালমানকে সম্মানিতও করা হলো এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের আশংকা ও দূর হলো। রসূল সা. মাটি কাটা ও বহন করা উভয় কাজই করলেন। এমনকি কোদালে কঠিন পাথর বেধে গেলে সেই পাথর ভাঙ্গার জন্যও তিনি নিজে হাজির হতেন। তিনি নিজ হাতে এ রকম দু'টো পাথর ভেঙ্গেছেন বলে বর্ণিত আছে।

২– এই যুদ্ধের সময় মুসলমানদের অভাব অভিযোগ ও দৈন্যদশা কত তীব্র ছিল, তা আমি আগেই বলে এসেছি। খননের সরঞ্জাম বনু কুরায়যার কাছ থেকে ধার নেয়া হয়েছিল। মাটি বহনের জন্য ঝুড়ির পর্যন্ত সংস্থান ছিলনা। এ জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ কাপড় ব্যবহার করতো। সেই সাথে খাদ্য দ্রব্যেরও ছিল নিদারুণ সংকট। যেহেতু তিন হাজার লোক এক নাগাড়ে দু'তিন সপ্তাহ খননের কাজে এবং আরো দু'তিন সপ্তাহ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং সমস্ত কৃষি ও বাণিজ্যিক তৎপরতা বন্ধ ছিল, তাই অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়া

অবধারিত ছিল। মুসলিম মোজাহেদেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেও একাধারে তিনদিন ধরে উপোষ করেছে। এটাও সবাই হাসিমুখে সহ্য করেছে। কারণ এই উপোষে মুসলমানদের নেতা রসূল সা. নিজেও অংশীদার ছিলেন। বরং তিনি অন্যদের চেয়েও বেশী ক্ষুধা সহ্য করেছেন। কেউ এসে যখন দেখিয়েছে যে, সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে নিয়েছে, তখন রসূল সা. কাপড় সরিয়ে দেখিয়েছেন যে তিনি দুটো পাথর বেঁধেছেন, ত্যাগ ও কুরবানীর এই গুণ ততক্ষণই বহাল থাকে, যতক্ষণ দলের সবাই তাতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু লোক যদি নিজেকে ত্যাগের উর্দ্ধে রেখে ত্যাগ ও কুরবানীর দায়িত্ব শুধু অন্যদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করে, তাহলে এ গুণ পুরো দল থেকেই উধাও হতে আরম্ভ করে। বিশেষত ইসলামী দলের নেতা ও দায়িত্বশীলদের উচিত যেন এই গুণটিতে অন্য সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকতে চেষ্টা করে।

৩– সাধারণভাবে সমাজে শৃংখলা বজায় রাখা এমনিতেও ইসলামী আন্দোলনের অপরিহার্য দাবী। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তো সর্বাত্মক শৃংখলা ছাড়া শত্রুর মোকাবিলা কার্যকরভাবে করাই সম্ভব নয়। রসূল সা. প্রথম যুদ্ধ থেকেই সামরিক শৃংখলার শিক্ষা দিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত এসে অভিজ্ঞতা অনেক ব্যাপকতর হয়েছিল। তাই খন্দকের যুদ্ধে শৃংখলার দিকটা যথেষ্ট মজবুত ছিল। খন্দকের খনন কার্য পূর্ণ শৃংখলা ও কর্মবন্টনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। তাছাড়া এ কাজের তত্ত্বাবধান ও রণাঙ্গনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পর্যবেক্ষণ মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল এবং পালাক্রমে প্রহরার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এমনকি মুসলিম মোজাহেদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় বিনিময়ের জন্য সংকেতও নির্ধারিত ছিল। বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা তদন্তকারী দল ফিরে এসে যখন অভিযোগের সমর্থনে রিপোর্ট দেয়, তখন সেই দলও সাংকেতিক পন্থায় রিপোর্ট দেয়। তদন্তকারী দলের সদস্যরা শুধু বলেছিল "আযাল ও কারা"। অর্থাৎ আযাল ও কারার লোকেরা শিক্ষক দলের সাথে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বনু কুরায়যাও তদ্রূপ করেছে। এতদসত্ত্বেও একটা ক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে ভুলবশত মুসলিম মোজাহেদদের দুটো গ্রুপে সংঘর্ষ ঘটে যায় এবং এক ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেন। খনন কার্য শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কেউ রসূল সা. এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেনি।

৪– রসূল সা. বনু গিতফানের সাথে আপোষমূলক চুক্তি করার যে পথ বের করেছিলেন, তা থেকে জানা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনকে বিপজ্জনক বিরোধিতা থেকে রক্ষা করার এবং শত্রুর শক্তি খর্ব করার জন্য কখনো যদি কিছুটা পিছু হটতে হয় কিংবা কিছুটা নমনীয় হতে হয়, তবে সেটা তেমন অকল্পনীয় ব্যাপার হবেনা। দীর্ঘ দ্বন্দ্ব–সংঘাতে জড়িত হয়ে যে রকমারি লোকজনের সাথে পরিচয় ঘটে, তাদের সাথে মাঝে মাঝে আপোষমূলক লেনদেন করার প্রয়োজন হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের বহু জটিল প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং সে সব প্রয়োজন মেটাতে তাকে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেই হয়। পরিস্থিতিকে বুঝা ও তা থেকে সর্বোত্তম পথ খুঁজে বের করার যোগ্যতা যে কোন দক্ষ ও সুক্ষ্মদর্শী নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হওয়া উচিত। নীতি ও আদর্শ এক জিনিস, কর্মপদ্ধতি অন্য জিনিস। নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে কোন নমনীয়তা ও আপোষহীনতার

কোনই অবকাশ থাকেনা। কিন্তু কর্মপদ্ধতিতে থাকে। যারা নীতির ন্যায় কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও একই ফর্মূলাকে সব অবস্থায় ব্যবহার করতে চায়, তারা ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য কীর্তি সম্পাদনে প্রায়ই সক্ষম হয়না।

এ কথা স্বতন্ত্র যে, মদিনার আনসারগণ তাদের ঘাড়ে একটা অসহনীয় বিপদ এসে পড়েছে ভেবে ঘাবড়ে যেতে পারে এই আশংকায় রসূল আগে ভাগেই তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন, আর এ কারণেই তিনি গিতফানের সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আওস ও খাজরাজের নেতৃদ্বয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করায় তিনি সান্ত্বনা পেয়ে যান।

৫– এই সমঝোতা প্রস্তাবকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার আগে রসূল সা. আনসার নেতাদের সাথে পরামর্শ করার মাধ্যমে শুরাতন্ত্রকে সুসংহত করে দিলেন। রণাঙ্গণেও তিনি এককভাবে কোন বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না।

৬– নঈম বিন মাসউদ শত্রুদের ভেতরে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য যে ভূমিকা পালন করেন তা রসূল সা. এর অনুমতি নিয়েই করেছিলেন। রসূল সা. "যুদ্ধ এক ধরনের প্রতারণা" এই মূলনীতির ভিত্তিতেই ঐ কাজের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, (অলংঘনীয় নৈতিক সীমারেখার আওতার মধ্যে থেকেই) দ্বন্দ্ব সংঘাতে বা যুদ্ধ বিগ্রহে বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। বরঞ্চ ক্ষেত্র বিশেষে তা অনিবার্য হয়েও পড়তে পারে। চরম বিপদসংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে যদি সরলতার সাথে নীরব ও নিস্ক্রিয় দর্শক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকা হয় এবং কৌশলের পথ অবলম্বন করা না হয়, তবে মহা সর্বনাশও ঘটে যেতে পারে। ইবনে ইসহাকের একটা দূর্বল বর্ণনা হিসেবে না ধরলে নঈম ইবনে মাসউদ একটা মিথ্যে কথাও না বলে এবং কোন নৈতিকতার সীমা লংঘন না করে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে একটা অসাধারণ কাজ সমাধা করেছিলেন।

৭– রসূল সা. এর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেন, খনন কার্য চালানোর সময় প্রকান্ড এক পাথরের দেখা পেয়েছিলাম যা আমি কোন ক্রমেই ভাংতে পারিনি। রসূল সা. নিকটেই ছিলেন। আমার কাছ থেকে কোদাল নিয়ে তিনি আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন। প্রথম আঘাতের পর তিনি বললেন, আমার জন্য ইয়ামান বিজিত হলো, দ্বিতীয় আঘাত হেনে তিনি বললেন, সিরিয়া ও মরক্কো আমার সামনে মাথা নুইয়েছে। তৃতীয়বারে বললেন, প্রাচ্য অঞ্চল (ইরান) আমার দখলে এসেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী দু'দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এ দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূল সা. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের স্তরগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেন। আর এই ধারণার স্বপক্ষে তার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহিও আসতো। দ্বিতীয়ত চরম প্রতিকূল পরিবেশেও যখন শক্তি সর্বনিম্ন পর্যায়ে এবং বিপদ মুসিবত সবচেয়ে মারাত্মক পর্যায়ে ছিল, তখনো তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতেন যে, ইসলামের বিজয় অবধারিত।

বরঞ্চ আমরা এ কথাও না বলে পারিনা যে, মক্কী যুগ থেকে মাদানী যুগ পর্যন্ত রসূল সা. এর মুখে ইসলামের হাতে আরব বিশ্ব ও অনারব বিশ্ব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে— এই কথাটা এতবার উচ্চারিত হতে দেখা যায় এবং তা সর্বমহলে এত বেশী কথিত যে, এটা ইসলামী আন্দোলনের একটা স্থায়ী শ্লোগানের রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র

বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিভিন্ন দুর্যোগের মুহূর্তে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ঠাট্টা–বিদ্রুপ করতে গিয়ে মুয়াত্তাব বিন কুশাইর নামক এক মোনাফেক বলেছিলো যে, একদিকে মুহাম্মাদ সা. রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সম্রাজ্যের চাবিকাঠি আমাদের হাতে দিয়ে দেন, অপরদিকে আমাদের বাস্তবতা এই যে, আমাদের কোন ব্যক্তি ভয়ে পায়খানায় যাওয়ার জন্যও বাড়ীর বাইরে যেতে পারেনা।

৮– এই যুদ্ধে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে যদিও 'নারী ও শিশুদেরকে দুর্গের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এ সময়ও মুসলিম নারীগণ উচ্চাংগের ভূমিকা পালন করেছিলেন। রশীদা নাম্নী এক মহিলা কিছু ওষুধপত্র ও ব্যান্ডেজের সরঞ্জামাদি নিয়ে রণাঙ্গনে চলে এসেছিলেন এবং তিনি আহতদের অনেক সেবা করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুয়াযের ক্ষতস্থানেও তিনি ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন। নারীদের একটা শিবিরের আশে পাশে জনৈক ইহুদী যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। রসূল সা. এর ফুফু হযরত সফিয়া ওখানেই ছিলেন। অসুস্থতার কারণে হযরত হাসসান ইবনে ছাবেতকে ওখানে রাখা হয়েছিল। হযরত সফিয়া হাসসানকে বললেন, ঐ লোকটাকে ধরে ধোলাই দিতে। অসুস্থ হাসসান অপারগতা প্রকাশ করলে দুঃসাহসী নারী হযরত সফিয়া নিজেই একটা কাঠ নিয়ে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেললেন। তারপর তার মাথাটাও কেটে দুর্গের বাইরে ছুঁড়ে মারলেন, যাতে অন্যান্য দুষ্কৃতকারীরা সাবধান হয়ে যায়। এ ঘটনার পর আর কোন শত্রু ওদিকে যাওয়ার সাহস পায়নি। হযরত আয়েশা যে দুর্গে ছিলেন, সেই দুর্গে হযরত সা'দ বিন মুয়াযের মাও ছিলেন। হযরত আয়েশা রা. দুর্গ থেকে বেরিয়ে পায়ের আওয়ায শুনে তাকিয়ে দেখেন সা'দ বিন মুয়ায একটা বর্শা হাতে নিয়ে বীর দর্পে এগিয়ে চলেছেন রণাঙ্গনের দিকে। চলার পথে একমনে কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন ঃ

'একটু থামো, আরো একজন যুবক যুদ্ধে শরীক হোক,
মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন মৃত্যুকে
ভয় করা কী প্রয়োজন?'

সা'দের মা যখন ছেলের কবিতা শুনলেন, তখন উচ্চস্বরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলে যাও সা'দ। তোমার তো অনেক দেরী হয়ে গেছে।' একটু পরই যখন সা'দ তীরবিদ্ধ হলেন এবং সে আঘাতেই তিনি পরে শাহাদাত বরণ করলেন, তখন সা'দের কবিতার মর্ম বাস্তব রূপ লাভ করলো।

একজন মুসলমান মায়ের আবেগ দেখলেন তো!

৯– খন্দক যুদ্ধের লোমহর্ষক পরিস্থিতিতে নিপতিত নিষ্ঠাবান মুসলমানরা বিপদ মুসিবতের এই তান্ডব দেখে কিছুমাত্র ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে স্বতস্ফূর্ত কণ্ঠে বলে উঠলোঃ "এতো অবিকল সেই পরিস্থিতি, যার সম্মুখীন হতে হবে বলে আল্লাহ ও তার রসূল আমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।" বস্তুতঃ এরূপ বিপদসংকুল পরিস্থিতি অতিক্রম না করে পৃথিবীতেও যেমন সত্যের বিজয় সম্ভব নয়, তেমনি আখেরাতেও জান্নাতের নাগাল পাওয়া যায়না। সূরা আহযাবে এরূপ নিবেদিতপ্রাণ মোমেনদের প্রশংসা করা হয়েছে। এরাই আন্দোলনের আসল প্রাণশক্তি ও আসল মূলধন।

১০- রসূল সা. সম্পর্কে এ কথা সবার জানা যে, তিনি মুসলমানদেরকে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের মনে এই মূলনীতি খুব ভালোভাবে বদ্ধমূল করেছিলেন যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংগনে বিজাতীয় অনুকরণ অবাঞ্ছিত। তার পরিবর্তে নতুন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিজস্ব আদর্শের আলোকে গঠন করতে হবে। নিজস্ব ইসলামী অভিরুচি অনুসারে প্রতিটি সাংস্কৃতিক ধারাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। কিন্তু যখন আমরা রসূল সা.কে পরিখা তৈরীর ইরানী প্রতিরক্ষা কৌশলকে খোলা মনে গ্রহণ করতে দেখি, তখন বুঝা যায় যে, বস্তুগত উপায় উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি তথ্যের আদান প্রদানকে সমগ্র মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কোন এক সময় যে সব উপায় উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি তথ্য ও রীতিনীতি কার্যকর থাকবে সেগুলোকে সকল যুগে, সকল সংস্কৃতিতে ও সকল পরিস্থিতিতে অবিকল সেইভাবে কার্যকর করা অপরিহার্য মনে করতে হবে, এটা জরুরী নয়। এ সব জিনিসকে শরীয়ত বা সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করতে হবে, এটাও জরুরী নয়। এ সব ব্যাপারে অন্যান্য জাতি ও সংস্কৃতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করা উচিত। একটা ইসলামী রাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতেই এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে তারা সমকালীন সর্বাধিক প্রভাবশালী উপায় উপকরণকে কাজে লাগাবে, কারিগরি বিদ্যা ও প্রযুক্তিতে নিজ জনগণকে এগিয়ে নেবে এবং সর্বাধিক সফল প্রযুক্তি অন্যদের কাছ থেকেও শিখবে, নিজেরাও উদ্ভাবন করবে।

খন্দক যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত

খন্দক যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী এই দু'বছরে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও ছোট ছোট সামরিক অভিযান সংঘটিত হয়। পরিস্থিতির ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই জরুরী

ইহুদী জাতির নৈতিক ও মানসিক বিকৃতির নিকৃষ্টতম উদাহরণ ছিল বনু কুরায়যা গোত্র। কু-প্রথা ও কু-কর্ম ছিল তাদের মজ্জাগত স্বভাব ও সর্বব্যাপী চরিত্র। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সব ধরনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে আসছিল। তবে খন্দক যুদ্ধে খোলাখুলি চুক্তি লংঘন করে হানাদার শত্রুদের সাথে গাঁটছড়া বাধা ছিল তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা সুলভ কাজ। এ অপরাধের সাথে জড়িতদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া কোন যুগে ও কোন দেশেই অন্যায় বা যুলুম বলে বিবেচিত হতে পারেনা। তারা রসূল সা., ইসলামী দল, ইসলামী আন্দোলন ও মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কোন চেষ্টাই বাদ রাখেনি। তাই তাদেরকে সমুচিত শাস্তি না দেয়ার কোনই যুক্তি ছিলনা। হানাদার কোরায়েশ ও তাদের মিত্রদের বাহিনীগুলো বিদায় হওয়ার পর রসূল সা. ও মুসলমান সেচ্ছাসেবকগণ সকালে খন্দকের ঘাঁটিগুলো ত্যাগ করে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেলেন। অস্ত্র রেখে রসূল সা. গোসল করলেন। ঠিক এই সময়ই তাঁর কাছে ওহি এল, বনু কুরায়যার দিকে রওনা হয়ে যাও। এখনো মোজাহেদরা যুদ্ধের পোশাকও খোলেনি, এমতাবস্থায় তাদেরকে একটা নতুন অভিযানে ডাকা হলো। মুসলিম বাহিনী এই বিশ্বাসঘাতক গোত্রটাকে অবরোধ করলো। এ অবরোধ অব্যাহত থাকলো এক নাগাড়ে ২৫ দিন। ঠিক এই নাজুক মুহূর্তেও তারা দুর্গের ওপর

থেকে রসূল সা. কে গালি দিল। অবশেষে বনু কুরায়যা অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের সরদার কা'ব বিন আসাদ উৎকণ্ঠা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কয়েকটা প্রস্তাব মুসলমানদের কাছে পেশ করলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনী এর কোনটাই গ্রহণ করলোনা। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা বিনাশর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। রসূল সা. তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদেরই সম্মতিক্রমে সা'দ বিন মুয়াযকে সালিশ নিয়োগ করলেন। উভয় পক্ষ থেকে সা'দকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হলো। সা'দ ইহুদীদের কিতাব তাওরাতের বিধান অনুসারে রায় দিলেন যে, বনু কুরায়যার সকল যুবক পুরুষকে হত্যা করা হোক। এভাবে একটা কুচক্রী গোষ্ঠীর সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি খর্ব করা হলো। উল্লেখ্য যে, এহেন চরম তিক্ততার মুহূর্তেও বনু কুরায়যার এক ব্যক্তি উমর বিন সা'দ ইসলাম গ্রহণ করে। এই সৎ ব্যক্তি বনুকুরায়যাকে চুক্তি লংঘন করতে বারবার নিষেধ করেছিল। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি।

এ ঘটনার পর ইসলামের দুর্ধর্ষ কুচক্রী শত্রুদের একজন আবু রাফে আব্দুল্লাহ বিন আবুল হাকীক (যাকে সাল্লামও বলা হতো) সিরিয়ায় কতিপয় খাজরাজী যুবকের হাতে নিহত হয়। সে খন্দক যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছিল।

মুহাম্মদ বিন মুসলিমা আনসারী যখন ৩০ ঘোড় সওয়ার জওয়ানকে সাথে নিয়ে সীমান্ত টহলে নিয়োজিত ছিলেন, তখন তার সাথে নাজদ আঞ্চলের সরদার ছামামা বিন আছালের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। ছামামাকে মদিনা অভিমুখে যেতে দেখে ঐ সেনাপতি তাকে গ্রেফতার করেন এবং রসূল সা. এর কাছে নিয়ে আসেন। সে রসূল সা. কে বললো ঃ "হে মুহাম্মদ, আমাকে যদি তুমি হত্যা কর, তবে তুমি জানবে যে হত্যার যোগ্য ব্যক্তিকেই হত্যা করেছ। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে জানবে যে, অনুগ্রহের কদর দিতে জানে এমন ব্যক্তিকেই ছেড়ে দিয়েছ। আর যদি তুমি অর্থ সম্পদ চাও তবে পরিমাণ বল। দেয়া হবে।" রসূল সা. তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিলেন। সে এই অনুগ্রহে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর সে অকপটে স্বীকার করলো যে, "আজকের পূর্বে আমার কাছে মুহাম্মাদ সা. এর চেহারার চেয়ে ঘৃণিত আর কারো চেহারা ছিলনা, আর আজ তাঁর চেহারার চেয়ে প্রিয় কোন চেহারা আমার কাছে নেই।" এভাবে নাজদের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঞ্চলে ইসলামের জন্য পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। এই ছামামাই মক্কায় গিয়ে কোরায়েশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, এখন তোমরা এক দানাও খাদ্যশস্য পাবেনা।

হযরত খুবায়েব সহ সাত সদস্যের শিক্ষক দলকে হত্যাকারী রজীবাসীকে শাস্তি দেয়ার জন্য রসূল সা. দু'শো ঘোড়সওয়ার জওয়ানকে নিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু তারা পালিয়ে গেল এবং কোন সংঘর্ষ ছাড়াই তিনি ফিরে এলেন। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে রসূল সা. দশজনকে টহল দিতে 'কুরাউন নাঈম' পর্যন্ত পাঠালেন, যাতে কোরায়েশরা বুঝতে পারে যে, মদিনা অত্যন্ত সজাগ।

মদিনা থেকে এক মনযিল দূরে বনু গিতফানের অঞ্চলের দিকে 'যী কিরদ' নামক একটা জলাশয় রয়েছে। এর কাছেই মদিনার সরকারী উট ও গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্র ছিল। উসফানের এক ব্যক্তি সেখানে রাখাল হিসেবে নিয়োজিত ছিল। রসূল সা. রাবাহ নামক

এক ভৃত্যকে খোঁজখবর নেয়ার জন্য পাঠালেন। সালমা ইবনুল আকওয়া সামরিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনিও (কেন্দ্রস্থলে যাচ্ছিলেন। সকাল বেলা তারা যখন পথিমধ্যেই ছিল, তখন উয়াইনা বিন হিসন ফিযারী (বা আবদুর রহমন বিন উয়াইনা) ও তার সাথী একদল ডাকাত উটগুলোকে লুণ্ঠন করলো এবং হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। ডাকাত সরকারী রাখালকে হত্যা করলো এবং তার স্ত্রীকেও অপহরণ করে নিয়ে চললো। সালামা ইবনুল আকওয়া এই নৃশংস হত্যা ও লুটপাটের দৃশ্য দেখে মদিনার দিকে মুখ ফিরিয়ে "ইয়া সাবাহা" বলে উচ্চস্বরে হাঁক দিলেন এবং রাবাহকে সাহায্য আনার জন্য পাঠালেন। এদিকে নিজে একাকী ডাকাতদের ধাওয়া করে ছুটে গেলেন। ডাকাতদের পেছন থেকে হাঁক দিয়ে তীর মেরে মেরে এক এক ডাকাতকে ধরাশায়ী করতে করতে তিনি এগিয়ে গেলেন। তীরের আঘাতে যখনই একজন ডাকাত ধরাশায়ী হয়, তখন তিনি চিৎকার করে বলেন, "আমি ইবনুল আকওয়া। আজ পরীক্ষার সময় যে, কে তার মায়ের বুকের দুধ কতটা খেয়েছে।" পথটা ছিল পর্বত সংকুল এবং আশপাশে ছিল গাছগাছালি। ডাকাতরা পেছনে তাকাতেই ইনি আত্মগোপন করতেন এবং তীর নিক্ষেপ করতেন। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। একবার পাথর মেরে ডাকাতদের এত পর্যুদস্থ করে ফেললেন যে, তারা দিশেহারা হয়ে প্রথমে অপহৃত উটগুলো ছেড়ে দিল, তারপর দেহের বোঝা কমানোর জন্য চাদর ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলতে লাগলো। ওদিকে মদিনা থেকে সালামার সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মেকদাদ বিন আমরকে পাঠিয়ে, অতপর রসূল সা. স্বয়ং একটা সেনাদল নিয়ে রওনা হলেন। কয়েকজন মুসলিম সৈনিক ডাকাতদের একবারে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলে ডাকাতরা আরো দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগলো। এই মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে মেহরায় বিন নাযলা ওরফে আখরমকে হয়তো শাহাদাতের নেশায় পেয়ে বসেছিল। তিনি একাকী ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করে অনেক দূরে চলে গেলে ডাকাতরা তার সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিল। আখরম শহীদ হলেন। এরপর আবু কাতাদা একজন বড় ডাকাতকে হত্যা করলেন। হযরত সালামা বিন আকওয়া আরো ধাওয়া করতে থাকলেন এবং ঘোড়াগুলো কেড়ে নিয়ে ফিরে এলেন। এসে রসূল সা. এর সাথে দেখা করে বললেন, আপনি একশো সৈনিক যদি আমার সাথে দিতেন, তবে আমি ওদের সবাইকে খতম করে আসতাম। রসূল সা. বললেন, "আল্লাহ যখন তোমাকে বিজয়ী করেছেনই, তখন এবার নমনীয় হও।" এই সাহাবীদের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখুন। প্রত্যেকের মধ্যে যেন বিদ্যুত প্রবাহিত। তাদের ভূমিকা ও চরিত্র সাধারণ দাঙ্গাবাজ লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্যের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করতেন। সেই লক্ষ্যের সাথে তাদের এমন প্রেম ছিল যে, কোন পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ছাড়াই তারা জীবনের ঝুঁকি নিতে পারতেন এবং যে যুদ্ধেই নামতেন, প্রতিপক্ষকে চোখ না দেখিয়ে ছাড়তেন না।

একটা টহল দল উক্কাশা বিন হিসন আযদীর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রহরা দিতে বেরুলেন। গুজব রটেছিল যে, বনী আসাদ গোত্র মদিনা আক্রমণ করার জন্য সমবেত হচ্ছে। মুসলিম সেনাদল যখন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পৌঁছলো তখন ষড়যন্ত্রকারীরা নিজ নিজ বাড়ীঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। চারণভূমি থেকে মুসলিম সৈন্যরা তাদের দু'শো উট বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে এলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে মুহাম্মদ বিন মোসলেমার নেতৃত্বে একটা শিক্ষামূলক ও দাওয়াতী দল বনু সালাবা গোত্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা 'যিল কুচ্ছা' নামক স্থানে পৌঁছলে রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় তাদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়। কেবল দলনেতা মুহাম্মদ বিন মোসলেমা নিদারুন আহত অবস্থায় বেঁচে যান। একজন মুসলমান তাকে ঘাড়ে করে মদিনায় পৌঁছে দেয়। রবিউস্‌সানী মাসে হযরত আবু উবায়দা চব্বিশজন সৈন্য নিয়ে অপরাধীদেরকে শাস্তি দিতে রাতের বেলা রওনা হলেন এবং খুব ভোর বেলা আক্রমণ চালালেন। নৈরাজ্যবাদীরা পালিয়ে গেল এবং তাদের সকল সহায়সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো।

যায়েদ বিন হারেসা একটা টহল দল নিয়ে (বাতনে নাখলার কাছে অবস্থিত) জামুহের দিকে গেলেন। এখানে ছিল বনু সুলাইমের পল্লী। তারা পরস্পরে যুদ্ধরত দু'টো পক্ষ একে অপরের ক্ষতি সাধনের কোন সুযোগই হাতছাড়া করতোনা। তাছাড়া হালিমা নাম্নী এক মহিলা তাদের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরিও করেছিল। টহল দল হালকা ধরনের আক্রমণ চালিয়ে তাদের কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও কিছু গবাদি পশু হস্তগত করলো। পরে রসূল সা. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সবাইকে মুক্তি দিলেন। কেননা হালিমা ভুল তথ্য জানিয়েছিল।

যায়েদ বিন হারেসা (নিজে বাদে) ১৪ জনের একটা ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে যিল কুচ্ছার অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য বনু সালামার জলাশয়ের দিকে চলে গেলেন। অপরাধীরা পালিয়ে যায়। তাদের ২০টা উট বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুমাতুল জান্দালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন এই জায়গাটা এখনো ঝুঁকির মধ্যে ছিল। রসূল সা. প্রথমে ওদিকে মনোযোগ দিলেও ইঙ্গিত লক্ষ্য পূর্ণ না করেই ফিরে এসেছিলেন। এবার হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফকে দাওয়াতী কাজে দুমাতুল জান্দাল পাঠানো হলো। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রথমে স্থানীয় বড় গোত্রের খৃষ্টান নেতা আসম বিন আমর কালবী এবং তার সাথে সাথে গোটা খৃষ্টান গোত্র মুসলমান হয়ে গেল। গোত্রের নেতা স্বীয় কন্যা তামাযুরকে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফের সাথে বিয়ে দিল। এভাবে সে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে নিজের রাজনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করে নিল।

ফিদক থেকে মদিনায় খরব এলো যে, বনু সা'দ বিন বকর গোত্রটি সামরিক শক্তি সংগ্রহ করছে, যাতে ইসলামী সরকারের ক্ষতি সাধনে খয়বরের ইহুদীদেরকে সাহায্য করা যায়। হযরত আলী দুশো সৈন্য নিয়ে অতি সন্তর্পনে রওনা দিলেন। রাতের বেলা পথ চলতেন এবং দিনে লুকিয়ে থাকতেন। পথিমধ্যে বনু সা'দের এক দূতকে খয়বরের দিকে যাত্রারত অবস্থায় পাকড়াও করা হলো। সে খয়বরের ইহুদীদের কাছে বার্তা নিয়ে যাচ্ছিল যে, খয়বরের সমস্ত খেজুর বনু সা'দকে দিলেই তবে সাহায্য দেয়া হবে। হযরত আলী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে বিপর্যস্ত করে দিলেন। তারা পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর কোন ক্ষয়ক্ষতি হলোনা। উপরন্তু তারা বনু সা'দের পশুগুলো ধরে নিয়ে এলেন।

একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল এইযে, যায়েদ বিন হারেসা নিজের ও অন্যান্য সাহাবীর পুঁজি নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে যান। ফেরার পথে ওয়াদিউল কুরায় বনুবদর তাদের কাফেলায়

ডাকাতি করে। কাফেলার লোক সংখ্যা কম ছিল। তাই ডাকাতরা ৯ জনকে শহীদ করে ফেলে। একজনকে আহত করে সমস্ত পণ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিল। অবশেষে দু'মাস পর হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য একটা সেনাদল পাঠানো হয়। এতে কতিপয় ডাকাত নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়।

আকল ও উরাইনা নামক দুটো গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এসে মুসলমান হয়। কিন্তু নতুন আবহাওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। মদিনার বাইরে সরকারী ব্যবস্থায় তাদেরকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়। সুস্থ হলে তারা সরকারী রাখালকে পাকড়াও করলো, তার চোখে উত্তপ্ত লোহার শলাকা ঢুকালো, অতপর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে পশুগুলোকে নিয়ে পালিয়ে গেল। রসূল সা. কারজ বিন খালেদ ফেহরীর নেতৃত্বে ২০ জন ঘোড় সওয়ার সৈনিকের একটি দল তাদেরকে ধরে আনার জন্য পাঠালো। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো এবং তাদের ইসলাম পরিত্যাগ, ডাকাতি, হত্যা, যুদ্ধ ও নিষ্ঠুর কর্মকান্ডের দায়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হলো। তাদের কাছ থেকে ন্যায়সংগতভাবে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিল। নচেত একটা সুসংগঠিত ও জনসমর্থনপুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে যদি যে কোন লোক এ ধরনের ধৃষ্টতা দেখাতে থাকে, তাহলে সবকিছু তামাশায় পরিণত হয়ে যেতে বাধ্য এবং একদিনের জন্যও কোন প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়।

এ সময়কার সবচেয়ে বড় ঘটনা তথা রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পরিস্থিতির ওপর সবচেয়ে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা ছিল হোদাইবিয়ার সন্ধি। রসূল সা. ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হোদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। ওখানে কোরায়েশদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে তিনি সবচেয়ে বড় শত্রুর দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে যান এবং দাওয়াতী ও গঠনমূলক কাজ করার জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া মদীনার সন্নিহিত অঞ্চলে নৈরাজ্যবাদীদের উচ্ছেদ করা সহজ হয়ে যায়।

হোদাইবিয়া থেকে রসূল সা. জিলহজ্জ মাসে মদিনায় ফিরে আসেন এবং কয়েকদিন পর ৭ই মুহাররম, খয়বর রওনা হয়ে যান। খয়বর ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় একটা রাজনৈতিক ঘাঁটিও ছিল এবং সামরিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রও ছিল। খয়বরের ইহুদীরা শুধু যে ওহুদ যুদ্ধের সময় ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করেছিল তাই নয়, বরং খন্দক যুদ্ধেও তারা অত্যন্ত সক্রিয় বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল। মদিনার জাগ্রত ও সচেতন সরকার নিজের গলার ওপর এমন একটা ধারালো ছোরা ঝুলতে থাকবে– এটা কোন অবস্থাতেই বরদাশত করতে সক্ষম ছিলনা। খয়বরের যুদ্ধ একটা অসাধারণ ও বড় আকারের যুদ্ধই ছিল। কিন্তু আমি এটাকে একটা মামুলী অভিযান হিসেবে গণ্য করেছি এ জন্য যে, এটা বদর, ওহুদ ও খন্দকের পর্যায়ের যুদ্ধ নয় এবং তার ধারাবাহিকতাও নয়। এটা একটা ভিন্ন ধরনের সামরিক কার্যক্রম। যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত তখনো আন্তর্জাতিক যুগে প্রবেশ করেনি এবং কোরায়েশ ও আরব জনগণের মত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য ধর্মের লোকদেরকে এ দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে সম্বোধন করা হয়নি, তাই খয়বরের ইহুদীদের সাথে এ দাওয়াত গ্রহণ না করার কারণে কোন সংঘাত বাধেনি, সংঘাত বেধেছিল তাদের রাজনৈতিক অপরাধের কারণে। এ জন্য তাদের সাথে আচরণও করা হয়েছে রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবে। তারা

যখন যুদ্ধে হেরে গেল, তখন তাদের এলাকাকে বিজিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হলো এবং তাদেরকে প্রজার মর্যাদা দেয়া হলো। রসূল সা. এ ধরনের আচরণ শুধু খয়বরেই চালু করেছিলেন আর কোথাও নয়। যাহোক, কোরায়েশদের দিক থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়ার পর খয়বরে আক্রমণ চালানোর পথে আর কোন বাধা থাকলোনা। এতে শুধু সেই সব লোককেই অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হলো, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জেহাদের আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবে। উল্লেখ্য যে, এই অভিযানে মুসলমান মহিলারাও রসূল সা. কে না জানিয়ে যোগদান করেছিল। পরে রসূল সা. যখন জানতে পারলেন, তখন তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কেন এসেছ? তারা যখন জানালো যে তারা মুসলিম যোদ্ধাদের সেবা করার জন্য এসেছে, তখন তিনি সম্মতি দিলেন। এমনকি পরে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের অংশও তাদেরকে দিয়েছিলেন। মদিনায় সিবা বিন আরাফতাকে অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করে চৌদ্দশো সৈন্য সাথে দিয়ে রসূল সা. রওনা হলেন। 'রজী' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। মুসলিম সৈন্যরা যখন খয়বরের ইহুদীদের সামনে হঠাৎ করেই আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তারা পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারপর শুরু হলো যুদ্ধ। উভয় দিক থেকে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধ চলতে লাগলো। অবশেষে মুসলমানদের জয় হলো। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল নাতাত দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এবার অবরোধ করা হলো সা'ব দুর্গকে। মুরাহহাব নামক ইহুদী মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করলো। আমের ইবনুল আকওয়া তার সাথে সম্মুখ সমরে শহীদ হলেন। তথাপি এ অবরোধ সফল হলো। সবচেয়ে মজবুত ছিল কামূস দূর্গ। রসূল সা. প্রচন্ড মাথা ব্যথার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তিনি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে হযরত আলীকে রা. এই অভিযানে পাঠালেন। ইহুদী বীর মুরাহহাব যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এলো। মুহাম্মাদ বিন মোসলেমা নিজের ভাই এর হত্যার প্রতিশোধের ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং মুরাহহাবের পা কেটে ফেললেন। তারপর হযরত আলীর রা. তরবারী তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। মুরাহহাবের পর এল তার ভাই ইয়াসির। তার সাথে সম্মুখ সমরে এলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তাকে খতম করে দিলেন। ২০ দিন অবরোধের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গ মুসলমানদের দখলে এল। হযরত আলীর নেতৃত্বে এই দুর্গ জয় করা হয় বলে তাঁকে 'খয়বর বিজয়ী' বলা হয়ে থাকে। ইহুদীরা যখন এই দুর্গ থেকে পালায়, তখন ইসলামের কুখ্যাত শত্রু ইহুদী নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সফিয়া তার দু'জন চাচাতো বোন সহ বন্দী হয়ে আসেন। তিনি একজন গণ্যমান্য গোত্রপ্রধানের কন্যা বিধায় সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে রসূল সা. তাকে নিজের পারিবারিক হেফাজতে রাখেন। এরপর ইহুদীরা আযযুবাইর দুর্গে সমবেত হয়। এখানে তিন দিন অবরুদ্ধ থাকার পর বেরিয়ে এসে তারা তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দশজন ইহুদী নিহত হয় এবং কয়েকজন মুসলমান শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত এই দুর্গও বিজিত হয়। এবার তিনটে দুর্গ অবশিষ্ট রইল। তা হচ্ছে আল কুতাইবা, আল ওয়াতীহ ও আস্-সালালেম। ইহুদীদের সমস্ত জনবল ও অর্থবল ঐ তিনটে দুর্গে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী চৌদ্দ দিন অবরোধ অব্যাহত রাখলো। অবশেষে কামান চালিয়ে পাথর বর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া

হলো। অবরুদ্ধরা যখন জানতে পারলো, তখন আর কোন উপায়ান্তর ছিলনা। তারা আপোষ–আলোচনা চালালো। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা শুধু জীবন নিয়ে পালাতে পারবে। কিন্তু তারা যখন আবদেন জানালো যে, তাদেরকে ক্ষেত ও বাগানের কাজে লাগানো হোক এবং থাকতে দেয়া হোক, তখন রসূল সা. মহানুভবতা দেখালেন এবং সম্মতি দিলেন। অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তাদের সাথে বন্দোবস্ত হলো। ফিদিকবাসী যখন এ বন্দোবস্তের কথা জানলো, তখন তারাও এর জন্য আবেদন জানালো। তাদেরকেও একই ধরনের বন্দোবস্ত দেয়া হলো। এই কার্যক্রমের সময় দু'জন ইহুদী যুবক হুয়াইসা ও মাহীসা ইসলাম গ্রহণ করে।

নাতাত দুর্গে অবরোধ চলাকালে খয়বরবাসীর মধ্য থেকে জনৈক নিগ্রো রাখাল আসওয়াদের মধ্যে মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে ইহুদীদের কাছে জিজ্ঞেস করে, কার সাথে যুদ্ধ হচ্ছে? তারা বললো, নবুয়তের দাবীদারের সাথে। এই কথা শুনেই তার মনে কৌতুহল জাগে এবং সে রসূল সা. এর কাছে এসে জানতে চায়, আপনার দাওয়াত কী? রসূল সা. ইসলামের তাওহীদের বিস্তারিত বিবরণ তাকে অবহিত করেন। আসওয়াদের মনমগজ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, ইহুদীদের ছাগল ভেড়ার পাল আমার দায়িত্বে রয়েছে। এগুলো কী করি? রসূল সা. ইচ্ছে করলে ঐ সব যুদ্ধরত ইহুদীর ছাগল ভেড়া দখলে নিয়ে মুসলিম সৈন্যদের রসদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই পরিস্থিতিতে আসওয়াদ রাখালকে আমানতদারী বজায় রাখার নির্দেশ দেন। সে রসূলের নির্দেশ অনুসারে ছাগল ভেড়াগুলোকে দুর্গের কাছে নিয়ে যেয়ে পাথর মেরে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর সে রসূল সা. এর কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি যদি যুদ্ধ করে মারা যাই, তাহলে আখেরাতে আমার কী হবে? রসূল সা. তাকে বললেন, জান্নাত পাবে। সে আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধ করলো ও শাহাদাত লাভ করলো।

জনৈক নওমুসলিম বেদুঈন খয়বরের যুদ্ধে শরীক হলো। তার জন্য যখন গনীমতের অংশ নির্ধারণ করা হলো, তখন সে বললো, "হে রসূল, আমি এ জিনিসের লোভে আপনার পেছনে আসিনি, আমি এসেছি যাতে সত্যের পথে জান দিতে পারি এবং জান্নাত পাই।" রসূল সা. তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার সে উদ্দেশ্যও সফল হবে। অতপর সেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং শাহাদাত লাভ করলো।

খয়বর বিজয়ের অল্প পর যখন আকস্মিকভাবে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (হযরত আলীর ভাই) তার বহু সংখ্যক সাথী সমেত আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে রসূল সা. ও অন্যান্য মুসলিম ভাইদের সাথে মিলিত হলেন, তখন খয়বর বিজয়ের আনন্দ বহুগুণ বেড়ে গেল।

বনু সুলাইম অধ্যুষিত অঞ্চলের খনিগুলোর মালিক হুজ্জাজ বিন আলাত সালামী খয়বরের অবরোধ কালেই মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি খয়বর বিজয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই রসূল সা. এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দ্রুত মক্কায় যান এবং সেখানে অবস্থানরত হযরত আব্বাসকে খয়বর বিজয়ের আগাম সুসংবাদ জানান।

খয়বরের বিষয়টি নিস্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম সৈন্যরা ওয়াদিউল কুরা অভিমুখে রওনা হলো। ওটাও ছিল ইসলামের শত্রুদের একটা জঘন্য আখড়া। ওখানে ইহুদীদের পাশাপাশি কিছু আরবও থাকতো। মুসলিম সৈন্যরা যাওয়া মাত্রই সামনের দিক থেকে পাথর বর্ষণ করা হলো এবং মুদয়াম নামক একজন ক্রীতদাস আহত হলো। রসূল সা. এর পক্ষ থেকে বারবার ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতে লাগলো। কিন্তু ওদিক থেকে এক একজন যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো এবং মুসলিম সৈন্যদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মারা পড়তে লাগলো। এভাবে এক নাগাড়ে এগারো জন আসলো। রাত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকলো। পরদিন ভোর বেলা চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলো। অতপর পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত সমূহ অনুসারে ওয়াদিউল কুরার অধিবাসীদেরকেও ক্ষেতখামারে ও কৃষি কাজে নিযুক্ত করা হলো এবং তাদের জন্য তাদের মধ্য থেকেই শাসনকর্তা নিয়োগ করা হলো। তায়মার ইহুদীরা যখন এখানকার বন্দোবস্তের কথা জানতে পারলো, তখন তারা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করলো এবং তাঁদেরকেও তাদের ভূমিতে কৃষিকাজে নিযুক্ত করা হলো।

এই বিজয়াভিযানের ফলে যে বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি মুসলমানদের দখলে আসে, তার মধ্য থেকে ফিদিক ও খয়বরের ভূমিকে সরকারী খাস ভূমিতে (State land) পরিণত করা হয়। এ ভূমির লব্ধ সম্পত্তি থেকে রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকজন এবং সমাজের দরিদ্র লোকদের ভরণ পোষণ চালানো হতো। এই সব খাস জমি সম্পর্কেই কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল রসূল সা. এর ইন্তিকালের পর। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এবং দূরদর্শী সাহাবীগণ ঐ জমিগুলোকে যথারীতি সরকারী খাস জমি হিসেবেই বহাল রাখেন। অন্যান্য জমি মুসলমানদের মালিকানায় অর্পিত হয় এবং তার ফসল তাদের মধ্যে বন্টিত হয়।

হযরত ওমরের নেতৃত্বে একটা টহলদার সেনাদল বনু হাওয়াযেনকে সতর্ক করতে যায়। ফলে বনু হাওয়াযেন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বশীর বিন ওয়ারিক (বা উসাইর বিন রাযাম) নামক জনৈক ইহুদী সম্পর্কে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে সে বনু গিতফানকে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা একটা সেনাদল নিয়ে গেলেন এবং বশীরকে কোন প্রকারে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাযী করালেন মদিনায় গিয়ে রসূল সা. এর সাথে আলাপ আলোচনা করতে। মুসলমানরা যেহেতু সংখ্যায় ত্রিশজন ছিল, তাই সেও সতর্কতাবশত ত্রিশজন লোক সাথে নিল এবং প্রত্যেকটা উটের ওপর একজন ইহুদী ও একজন মুসলমান যৌথভাবে আরোহন করলো। বশীর রাতের অন্ধকারে আব্দুল্লাহর তরবারীতে হাত দেয়া মাত্রই তিনি চমকে উঠে উটের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন এবং তরবারী কোষমুক্ত করে ওর মুখোমুখী হলেন। উভয় নেতাকে এ অবস্থায় দেখে উভয়ের সাথীরাও লড়াই শুরু করে দিল এবং শেষ পর্যন্ত একত্রিশজন ইহুদী সবাই একে একে নিহত হলো।

সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের কথা। বনু গিতফান, বনু মুহারিব, বনু ছালাবা ও বনু আনমার– এই চারটে গোত্র মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে শোনা গেল। রসূল সা.

৪০০ লড়াকু মুসলমানকে সাথে নিয়ে অভিযানে বেরুলেন। আক্রমণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এ অভিযানকে বলা হয় 'যাতুর রিকা অভিযান'।

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলমানদের জন্য বাণিজ্যিক সড়ক উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আবু জান্দাল কোরায়েশদের আটকাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যখন মক্কা ছেড়ে পালালেন, তখন ঐ সন্ধি চুক্তির একটা কঠোর ধারার দরুন মদিনা না যেতে পেরে সমুদ্রোপকূলবর্তী একটা সিরীয় পাহাড়ে থাকতে লাগলেন। পরে আবু বছীর ও অন্যান্য মুসলমানরাও তার সাথে যোগ দিতে লাগলো। এভাবে মুসলমানদের রীতিমত একটা সেনাদল গঠিত হয়ে গেল সিরীয় ভূমিতে। তারা কোরায়েশদের একটা কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তার মালামাল কেড়ে নিল। কিন্তু রসূল সা. তাদেরকে ঐ সব মালামাল ফেরত দিতে নির্দেশ দিলে তারা তৎক্ষণাত নির্দেশ মান্য করলো। এবার কোরায়েশ বুঝলো ও অনুতপ্ত হলো যে, সন্ধি চুক্তিতে অমন কঠোর ধারা যুক্ত করে তারা কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে রসূল সা. আবু জানদালকে মদিনায় ডেকে নেন।

বনু মালুহ বশীর বিন সুয়াইদের সাথীদেরকে হত্যা করলে তাদেরকে সতর্ক করা জন্য আব্দুল্লাহ লাইসী একটা সেনাদল নিয়ে গেলেন। সামান্য সংঘর্ষ হলো এবং শত্রুদের কিছু জিনিস পত্র বাজেয়াপ্ত করা হলো।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবার থেকে রসূল সা. এর দূত দিহ্‌য়া কালবী উপঢৌকনাদি নিয়ে মদিনায় ফিরছিলেন। হুনাইদ বিন ইওয়ায জাফরী ডাকাতি করে তার কাছ থেকে সমস্ত উপঢৌকন ছিনিয়ে নেয়। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এহেন জঘন্য আক্রমণ পরিচালনাকারী হুনায়েদকে শাস্তি দিতে যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে একটা সেনাদল প্রেরিত হলো। সংঘর্ষে হুনায়েদ নিহত হলো। তবে তার সাথীরা তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলো।

বনু কিলাব বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বিদ্রোহ দমন করতে সসৈন্যে রওনা হয়ে গেলেন। সংঘর্ষের পর শত্রু সেনারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

জুহাইনা অঞ্চলে বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিলে সে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে উসামা ইবনে যায়েদকে একটা সেনাদলসহ পাঠানো হলো। তিনি প্রথমে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ হলো। এই সময় হযরত উসামা সুহাইক বিন মিরদাসকে ধাওয়া করলে সে কলেমা তাইয়েবা পড়লো। কিন্তু উসামা মনে করলেন, সে পরাস্ত হয়ে জান বাঁচানোর ফন্দি এঁটেছে। তাই তাকে তিনি হত্যা করলেন। পরে ঘটনা শুনে রসূল সা. মর্মাহত হন। কেননা তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সংশোধন করা– হত্যা করা নয়।

খয়বরের ইহুদীদেরকে সাহায্যকারী ফাযারা ও আযরা নিবাসীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য বশীর বিন সা'দ খাজরাজীকে ক্ষুদ্র একটা সেনাদলসহ পাঠানো হয়। সামান্য সংঘর্ষেই প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়।

বনু সুলাইম মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে– এই মর্মে তথ্য অবহিত হওয়ার পর ইবনে আবিল ইওজাকে পঞ্চাশজন সৈন্যসহ পাঠানো হয়। এখানে শত্রুর সংখ্যা বেশী ছিল।

তারা হামলা করে সমগ্র মুসলিম সেনাদলকে শহীদ করে ফেলে। কেবল সেনাপতি আহত অবস্থায় মদিনায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হন। বনু কুয়াযার বিদ্রোহ দমনের জন্যও অত্যধিক ক্ষুদ্র সেনাদলসহ কা'ব বিন উমাইর আনসারীকে পাঠানো হলে তারা পুরো মুসলিম দলকে শহীদ করে। কোন একজন সাহাবীও জীবিত ফিরে আসতে পারেনি।

ইসলাম বিরোধী একাধিক শক্তিকে সাহায্য দিয়েছিল বনু হাওয়াযেন। তাদের সম্পর্কে জানা গেল যে, মদিনা থেকে পাঁচ মনযিল দূরে তারা হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুজা বিন ওহব আসাদীর নেতৃত্বে একটা ক্ষুদ্র দল পাঠানো হলো। কিন্তু তাদেরকে কোন সংঘর্ষে যেতে হয়নি।

এ সময়ে বড় আকারের যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় তা হচ্ছে মূতার যুদ্ধ। এটি সংঘটিত হয় ৮ম হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসে। তবে এ যুদ্ধটা পুরোপুরি একটা বিদেশী শক্তির সাথে সংঘটিত বলে সে সম্পর্কে আমি তবুকের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

কয়েস বিন রিফায়া সম্পর্কে জানা গেল যে, সে আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। এ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য মাত্র দু'জনের একটা দলসহ আবু হাদরায়া আসলামীকে পাঠানো হলো। নিছক সুক্ষ্ম কৌশলে ভীত সন্ত্রস্ত করে তিনি শত্রু সৈন্যদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং তাদের পশুগুলোকেও বাজেয়াপ্ত করে আনেন। এখানে কোন সংঘর্ষই ঘটেনি।

বনু কুযামা সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল যে, তারা অন্যদের সাথে গাঁটছড়া বেধে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনশো সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলায় চলে গেলেন আমর ইবনুল আ'স। যাতুস্ সালাসিল নামক এই জায়গা ওয়াদিউল কুরার পরেই অবস্থিত। এ জায়গাটা বহু বছর যাবত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক ছিল। যথাস্থানে পৌঁছে জানা গেল যে, শত্রুদের জনবল অনেক বেশী। আমর ইবনুল আ'স দূতের মারফত আরো সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের নেতৃত্বে আরো দুশো সৈন্য তৎক্ষণাত পৌঁছে গেল। আক্রমণ চালানোর সাথে সাথে শত্রু সেনারা পালিয়ে গেল। তাদের ফেলে যাওয়া কিছু গবাদি পশু হস্তগত করা হলো।

আবু কাতদা ও মুহাল্লাম বিন জুসামা একবার টহল দেয়ার সময় ঘটনাক্রমে আমের ইবনুল আজবাত আশজায়ী কয়েক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করলো। তারা মুসলমানদের মত সালাম করলো। কিন্তু মুহাল্লাম তাদের সালামকে একটা আত্মরক্ষার কৌশল মনে করলেন এবং শত্রু ভেবে সবাইকে হত্যা করলেন। এই ঘটনায় কোরআন তাদেরকে নিম্নরূপ ভর্ৎসনা করে ঃ

বলা হয় টহল দিতে বেরুলে লোকজনকে চিনে নিও এবং কেউ সালাম দিলে অনর্থক তাকে অমুসলিম গণ্য করোনা। রসূল সা. কঠোরভাবে সতর্ক করেন। পরে নিহতের গোত্রের সরদার হত্যার পণের দাবী নিয়ে আসে। রসূল সা. তৎক্ষণাত ৫০টা উট দিয়ে দেন এবং অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে বাকী ৫০টা পরে নিতে রাজী করেন।

৮ম হিজরীর রজব মাসে রসূলের সা. নির্দেশে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ তিনজন সৈনিকসহ সাইফুল বাহর গেলেন এবং কেবল সমুদ্রের তীর পর্যন্ত টহল দিয়ে কয়েকদিন

উপকূলবর্তী এলাকায় কাটিয়ে ফিরে এলেন। সম্ভবত সড়কের পর্যবেক্ষণ করা ও কোরায়েশকে এ কথা বুঝানোই এর উদ্দেশ্য ছিল যে, ইদানিং মদিনা এ দিকেই মনোনিবেশ করেছে। উল্লেখ্য যে, হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি কোরায়েশ কর্তৃক ভঙ্গ করার পর মুসলমানদের এইসব তৎপরতা মক্কা বিজয়ের দ্বারোদঘাটন করে।

চতুর্থ বৃহৎ অভিযান– মক্কা বিজয়

এ যাবত আমি কোরায়েশ ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তির বড় বড় আক্রমণের বিবরণ দিয়েছি। এ বিবরণ থেকে স্পস্ট হয়ে গেছে যে, বদর ওহুদ ও খন্দক এই সব কটা যুদ্ধে জাহেলী শক্তিগুলোই মদিনায় এসে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং সব কটা সংঘর্ষ মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের আশপাশেই সংঘটিত হয়েছে। এ সব সংঘর্ষে মদিনার সরকার নিছক আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। খন্দকের যুদ্ধের পর রসূল সা. নিজের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার আলোকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এখন কোরায়েশের আগ্রাসী অভিযানের অবসান ঘটেছে। তিনি এই আভাসও দেন যে, এখন থেকে ইনশায়াল্লাহ আমরাই কোরায়েশদের ওপর হামলা চালাবো। মধ্যবর্তী সময় যখন হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং কোরায়েশরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালানো থেকে বিরত থাকে। তখন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রসূল সা. একদিকে মনিদার বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন, অপরদিকে উত্তর দিকে ইহুদীরা তাদের শক্তির যে মজবুত কেন্দ্রগুলো স্থাপন করেছিল এবং যে গুলোকে সামরিক চক্রান্ত তৈরীর আখড়ায় পরিণত করেছিল, সেগুলোকে উৎখাত করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গোত্রের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ, সামরিক প্রস্তুতি ও ষড়যন্ত্রকে এমন দ্রুত ও কঠোরভাবে প্রতিহত করেন যে, মদিনার পরিবেশ অনেকাংশে নিরাপদ ও পরিষ্কার হয়ে যায়। খন্দকের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই বিরতির সময় ইসলামী রাষ্ট্রের দোর্দন্ড প্রতাপ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব মেনে নিতে সকলকে বাধ্য করে। সকলেই অনুভব করতে আরম্ভ করে যে, সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের এই উদীয়মান শক্তিকে উৎখাত বা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। সর্ব শ্রেণীর জনতা উপলব্ধি করে যে, ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আর কোরায়েশদের হাতে নেই। বরং মুহাম্মাদ সা. এর হাতে চলে গেছে।

এখন শত্রুর হাত থেকে পুরোপুরি ও স্থায়ীভাবে মুক্তি লাভের একটা মাত্র উপায়ই অবশিষ্ট রয়েছে। সেটা হলো, শত্রুর আসল আখড়ার মূলোৎপাটন এবং জাহেলিয়াতের নেতৃত্বের প্রদীপ তার নিজ বাড়ীতেই নিভিয়ে দেয়া। এ জন্য প্রতিরক্ষার সংগ্রামকে পূর্ণতা দানের জন্য একদিন না একদিন আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো অবধারিত ও অনিবার্য ছিল। এটা ছিল কোরাযেশদেরই কর্মফল যে, তারা নিজেরাই হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে দু'পক্ষের মধ্যকার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রাচীর গুড়িয়ে দিয়েছিল।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, বনু বকর ও বনু খুযায়ার মধ্যে আগে থেকেই শত্রুতা চলে আসছিল এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও পাল্টা প্রতিশোধের অবিরাম ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। কিন্তু মাঝখানে সহসা ইসলামী আন্দোলন একটা

উদ্বেগজনক সমস্যা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কোরায়েশ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্র নিছক ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। তাদের পারস্পরিক শত্রুতার আগুন সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেল। অবশেষে যখন হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হলো, তখন তার একটা ধারার সুযোগ করে বনু খুযায়া রসূল সা. এর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করলো। পক্ষান্তরে বনু বকর মৈত্রী স্থাপন করলো কোরায়েশদের সাথে। কিছুদিন নীরবে কেটে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরানো শত্রুতার বারুদ বিস্ফোরণ ঘটলো। বনু বকর এই আপোষের যুগটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো। কেননা এ সময় অন্য কোন দিক থেকে সংঘাতের আশংকা ছিলনা। তারা বনু খুযায়া গোত্রের একজনকে হত্যা করলো। তারপর জোরদার হামলা চালিয়ে ব্যাপক নির্যাতন নিপীড়ন চালালো। এমন কি হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণকারী খুযায়ীদেরকেও তারা অব্যাহতি দিলনা এবং উপাসনারত অবস্থায়ও তাদেরকে ক্ষমা করলোনা। বনু বকরের এই রক্তপাতে কোরায়েশ তাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছিল। এই নিবুদ্ধিতাপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিকে পদদলিত করলো। বনু খুযায়ার পক্ষ থেকে আমর ইবনে সালেম রসূল সা. এর কাছে গিয়ে বনু বকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানালো। অতপর বুদাইল বিন ওয়ারাকা একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়ে অত্যাচারের বিবরণ দিল। মৈত্রীচুক্তির আলোকে রসূল সা. এর জন্য বনু খুযায়া গোত্রের সাহায্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। রসূল সা. কোরায়েশের কাছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য তিনটে দাবী জানালেন। এক, নিহত ব্যক্তির জন্য বনু খুযায়াকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও। দুই, বনু বকরের সমর্থন পরিহার কর। তিন, প্রথম দুটো দাবীর বিকল্প হিসেবে হোদায়বিয়া চুক্তি বাতিল হবার ঘোষণা দাও। কোরায়েশরা ভারসাম্য তো আগেই হারিয়ে ফেলেছিল। তাই তারা জানালো যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি বাতিল করাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পরে এ জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল।

এবার কোরায়েশ নেতারা দুশ্চিন্তায় পড়লো। লড়াই করার ক্ষমতা তারা আগেই হারিয়ে ফেলেছিল। কয়েকটা যুদ্ধে তাদের মূল্যবান বীরযোদ্ধারা মারা গিয়েছিল এবং তাদের সামরিক শক্তির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। তাদের অর্থনীতিরও প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল। তাদের সাহায্যকারী ইহুদীরা প্রায় সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। পক্ষান্তরে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র দাওয়াতী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজের প্রভাব এত ব্যাপক করে ফেলেছিল যে, মক্কার আশপাশেও ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থক গোত্রসমূহের একটা বৃত্ত গড়ে উঠেছিল। মৈত্রীর পরিধিও বিস্তৃত করা হয়েছিল। আর নৈরাজ্যবাদী ও বিদ্রোহী শক্তিগুলোকে কঠোরভাবে দমন করে বিশাল এলাকা জুড়ে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছিল। এরপর কোরায়েশের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়া তো দূরের কথা, আত্মরক্ষা করাও কঠিন ছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধিই ছিল তাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। এই রক্ষাকবচও তারা নিজেরাই বাতিল করে দিয়ে মদিনাকে যেন আহ্বান জানালো, এস, আমাদেরকে আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দিয়ে যাও।

অবশেষে মক্কার সবচেয়ে বড় কাফের নেতা আবু সুফিয়ান দিশেহারা হয়ে সন্ধি নবায়নের উদ্দেশ্যে মদিনা রওয়ানা হলো। সেখানে সে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো যে,

তা বোধহয় তার কল্পনায়ও কখনো আসেনি। সে নিজের মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবার ঘরে গিয়ে বিছানায় বসতে উদ্যত হওয়া মাত্রই মেয়ে ছুটে এসে বিছানা সরিয়ে নিয়ে বলল, "আপনি মোশরেক থাকা অবস্থায় আল্লাহর রসূলের পবিত্র বিছানায় বসতে পারেন না।" তারপর সে একে একে হযরত আবু বকর, ওমর ও আলীর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতাদের সাথে যেয়ে যেয়ে সাক্ষাত করে এবং প্রত্যেকের কাছে সাহায্য চায়। এমনকি সে হযরত ফাতেমাকেও রসূল সা. এর কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ জানালো। এতেও যখন সে সফল হলোনা, তখন শিশু ইমাম হাসানকে সুপারিশ করার অনুমতি দিতে ফাতেমা রা. কে অনুরোধ করলো। কোন কিছুতেই যখন কাজ হলোনা, তখন সে অনন্যোপায় হয়ে হযরত আলীর পরামর্শ মোতাবেক মুসলমানদের সাধারণ সভায় নিজের পক্ষ থেকে এক তরফা সহাবস্থানের ঘোষণা করে রসূল সা. এর পক্ষ থেকে কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই মক্কায় ফিরে গেল। মক্কাবাসী তার সফরের বিবরণ জানতে চেয়ে যখন এক তরফা সহাবস্থানের ঘোষণার কথা শুনলো, তখন সবাই বললো, "এতো আলী রা. তোমার সাথে তামাসা করেছে।" লক্ষ্য করুন, পতনোম্মুখ নেতিবাচক লোকদের বুদ্ধিবিবেকও কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

রসূল সা. কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করে দিলেন, মুসলিম সেচ্ছাসেবক দল তৈরী করা হোক। তিনি নিজের ঘরেও অস্ত্র তৈরী করার আদেশ দিলেন। তবে কোথায় কোন্ দিকে এবারের যুদ্ধ যাত্রা করা হবে, সেটা কাউকেই জানতে দিলেন না। এমনকি হযরত আয়েশাও তা জানতে পারলেন না। অথচ তিনি নিজ হাতেই রসূল সা. এর জন্য অস্ত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ লোক হয়তো ধারণা করেছিল যে এবার মক্কায় আক্রমণ করা হবে। কেননা এত বিপুল পরিমাণ সৈন্য আর কোথাও নিয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিলনা।

বদর যোদ্ধা হাতেব ইবনে আবি বালতায়ার পরিবার পরিজন তখনো মক্কায় কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং কোন গোত্র তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। এ জন্য তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মদিনার প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটা গোপন চিঠি কোরায়েশদের কাছে পাঠালেন, যাতে তারা তার এই অনুগ্রহের বদলা হিসেবে মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর পরিবারকে যে কোন রকম কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে। এই সাথে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, এই গোপন তথ্য সরবরাহ করা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত এবং তার চিঠি ইসলামের কোন বড় রকমের ক্ষতি করতে পারবেনা। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় বাহ্যিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও মানসিক অবস্থার চাপে পড়ে কখনো অত্যন্ত সৎ লোকের পক্ষ থেকেও মারাত্মক পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। রসূল সা. ওহির মাধ্যমে এ চিঠির খবর জানতে পারেন। তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দারা মক্কা গমনরত এক মহিলাকে রওযায়ে খাখ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করে তার কাছ থেকে ঐ চিঠি উদ্ধার করেন। এত বড় ভ্রান্তি রসূল সা. শুধু এজন্য ক্ষমা করেন যে, হাতেব নিষ্ঠাবান, ঈমানদার, সৎ ও বদরযোদ্ধা সাহাবী ছিলেন এবং এই পদস্খলনটা ছিল তার মানবীয় দুর্বলতা থেকে উদ্ভুত।

রসূল সা. দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ১০ই রমযান মদিনা থেকে রওনা হলেন। তিনি একজন অসাধারণ কুশলী সমরনায়ক হিসাবে এমন পেচালো রাস্তা ধরে অগ্রসর হন যে, কোরায়েশের যে টহলদার দলটি পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়েছিল, তারা ঘূর্ণাক্ষরেও কোথাও মুসলিম বাহিনীর সন্ধান পেলনা। এদিকে তারা ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকলো, আর ওদিকে মুসলিম বাহিনী সবাইকে হতবাক করে দিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হলো।

রসূল সা. যখন হাজফা পৌঁছলেন, তখন তাঁর চাচা আব্বাস সপরিবারে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তারপর যখন আবওয়াতে পৌঁছলেন, তখন আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব (ইনি রসূল সা. এর আপন চাচাতো ভাই ও বিবি হালিমার মাধ্যমে দুধ ভাই এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া (রসূলের ফুফাতো ভাই ও উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমার সৎ ভাই) হাজির হয়ে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে ইসলামের বিরোধিতায় রসূল সা. কে এত কষ্ট দিয়েছিলেন যে, রসূল সা. তার সাথে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। আবু সুফিয়ান হতাশ হয়ে বললো, যদি ক্ষমা না পাই, তবে আমি আরবের অগ্নিক্ষরা মরুভূমিতে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে চলে যাবো এবং সবাই মিলে ক্ষুধায় পিপাসায় মরে যাবো। হযরত উম্মে সালমা রা. ভাই এর জন্য সুপারিশ করলেন। আর হযরত আলী উভয়কে পরামর্শ দিলেন, হযরত ইউসুফের ভাই এর ভাষায় ক্ষমা চাও। তাই তারা গিয়ে বললোঃ

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে আমাদের ওপর অগ্রগণ্য করেছেন, আর আমরা অপরাধী ছিলাম।" এ কথা শুনে রসূল সা. এর মন গলে গেল। তিনিও হযরত ইউসুফের জবাবেরই পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ

"আজ তোমাদের ওপর কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি দয়াশীলদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু।"

'মাররুয যাহরান' পৌঁছে যখন সেনা শিবির স্থাপন করা হলো, তখন রসূল সা. বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে আদেশ দিলেন যেন প্রত্যেক সৈনিক রাত্রে নিজের জন্য আলাদা আলাদা আগুন জ্বালায়। আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকীম বিন হিযাম ও বুদাইল বিন ওয়ারাকার ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতারা যখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বেরুলো, তখন পাহাড়ের ওপর থেকে দশ হাজার চুলো জ্বলতে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভাবলো, "কি সর্বনাশ, এত বড় সেনাবাহিনী চলে এসেছে মক্কার দোরগোড়ায়?" হযরত আব্বাস তাদের কাছ দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনি কণ্ঠ চিনতে পেরে আবু সুফিয়ানকে কাছে ডাকলেন এবং কথাবার্তা বললেন। হযরত আব্বাস বললেন, "হযরত মুহাম্মাদ সা. আজ তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে চলে এসেছেন। আজ কোরায়েশের উপায় নেই।" আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলো, "এখন বাঁচার উপায় কী?" আব্বাস রা. বললেন, "আমার সাথে আমার খচ্চরের ওপর বসে পড়। রসূল সা. এর কাছে গিয়ে কথা বলবে।" খচ্চর সামনের দিকে অগ্রসর হবার সময় কদমে কদমে সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, "কে যাচ্ছে?" হযরত আব্বাস নিজের পরিচয় দিতেই পথ ছেড়ে দেয়া হতে লাগলো। নিকটে গেলে হযরত ওমর রা. দেখে ফেললেন এবং আবু সুফিয়ানকে চিনতে পেরে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "ওহে আবু

সুফিয়ান, আজ তোকে মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে।" বলেই হত্যার অনুমতি নেয়ার জন্য রসূল সা. এর কাছে ছুটে যেতে লাগলেন। হযরত আব্বাসও খচ্চর জোরে ছুটালেন। হযরত ওমর রা. আগে আগে পৌঁছে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন, আর হযরত আব্বাস বললেন, "আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়ে এনেছি।"

এই পর্যায়ে আবু সুফিয়ানের সাথে রসূল সা. এর নিম্নরূপ কথোপকথন হলোঃ

রসূল সা. ঃ "কি হে আবু সুফিয়ান, এখনো কি তোমার বিশ্বাস আসেনি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই?"

আবু সুফিয়ান ঃ "আর কোন মাবুদ থাকলে আজ আমাদেরকে রক্ষা করতো।"

রসূল সা. ঃ "আমি যে আল্লাহর রসূল, সে ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ আছে।"

হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানের মনস্তাত্মিক দুর্বলতাকে বুঝতে পেরে বললেন, "আরে ওসব বাদ দাও, সোজাসুজি ইসলাম গ্রহণ করে নাও।" সকাল পর্যন্ত মক্কার প্রধান নেতা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে গেল। এদিকে ইসলামী সেনা শিবির মক্কায় সেনাবাহিনী পৌঁছার আগে আবু সুফিয়ানকে এমন সুকৌশলে আটক করে রেখেছিল যে, সে বুঝতেই পারেনি, সকাল বেলা শহরে প্রবেশের জন্য মুসলিম বাহিনী 'কাদা'র পথ ধরে মার্চ করে গেল। হযরত আব্বাস রসূলের সা. নির্দেশে আবু সুফিয়ানকে একটা পাহাড়ের ওপর নিয়ে দাঁড় করালেন, যাতে সে মুসলিম বাহিনীকে এক নজর দেখতে পারে। প্রথমে বনু গেফার, তারপর একে একে জুহায়না, বুযায়েম, সুলায়েম, এবং সবার শেষে আনসারী বাহিনীগুলো নিজ নিজ পতাকা বহন করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো। আবু সুফিয়ান প্রতিটি বাহিনীর পরিচয় জিজ্ঞেস করছিল। সা'দ বিন উবাদা যখন সামনে দিয়ে গেলেন তখন সৈনিক সুলভ আবেগে উজ্জীবিত হয়ে বলে উঠলেন ..... "আজ তুমুল যুদ্ধের দিন", ... "আজ কা'বার চত্তর উন্মুক্ত করার দিন।" তাঁর এই বিশেষ আবেগ ও বিশেষ শ্লোগানের পেছনে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সংঘাতের ইতিহাস সক্রিয় ছিল। সবার শেষে রসূল সা. কে বহনকারী প্রাণীটি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলে গেল। তাঁর সামনে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম পতাকা বহন করে যাচ্ছিলেন। রসূল সা. যখন সা'দ বিন উবাদার শ্লোগানের খবর শুনলেন, তখন তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তাঁর কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তার ছেলের হাতে অর্পণ করলেন। অতপর তিনি বললেন, "আজকের দিন কা'বার শ্রেষ্ঠত্বের দিন, এবং সদাচার ও ওয়াদা পালনের দিন।" এই একটা কথার মধ্য দিয়েই রসূল সা. তাঁর বিজয়োৎসবের নীতি স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর বিজয়োৎসব হবে আগাগোড়া দয়া ও ক্ষমার মহিমায় উজ্জ্বল। তারপর ঘোষণা করে দেয়া হলো, "যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, যে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে এবং যে অস্ত্র বহন করবেনা, তার প্রাণ নিরাপদ। তবে কেউ যদি কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, সে শাস্তি পাবে।" আবু সুফিয়ান স্বয়ং মক্কায় উচ্চস্বরে এ ঘোষণা দিতে দিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। তার মুখ দিয়ে রসূল সা. এর ঘোষণা উচ্চারিত হতে শুনে তার স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎতা তার গোঁফ টেনে ধরে চিল্লাতে লাগলো, "হে বনু কিনানা, এই হতভাগাকে মেরে ফেলো। ও কী বলছে?" হিন্দা আবু সুফিয়ানকে গালি দিতে লাগলো।

তা শুনে লোকজন সমবেত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান তাকে বুঝিয়ে বললো, এখন এসব কথা বলে কোন লাভ হবেনা। এখন কারো ক্ষমতাই নেই যে, মুহাম্মদের সা. অগ্রযাত্রা ঠেকায়। অতপর যখন রসূল সা. শহরে প্রবেশ করলেন তখন সারা দুনিয়ার বিজয়ীদের ঠিক বিপরীত বিনয়াবনত মস্তকে প্রবেশ করলেন। তাঁর কপাল যেন বাহক জন্তুটির পিঠ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তিনি মুখে সুরা আল ফাতাহ আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন।

ওদিকে ইকরামা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং সুহায়েল ইবনে আমর খান্দামা নামক পাহাড়ে কোরায়েশের কয়েকজন নির্বোধ গুন্ডাপান্ডাকে একত্রিত করে নানা রকম অপকর্ম সংঘটিত করতে প্ররোচিত করলো। হিমাস বিন কয়েস বিন খালেদও তাদের সাথে মিলিত হলো। দু'জন সাহাবী কারয বিন জাবের ফেহরী, এবং খুনায়েস বিন খালেদ বিন রবী বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন পথ ধরে যাচ্ছিলেন। এই গুন্ডাপান্ডারা তাদের উভয়কে শহীদ করে ফেললো। হযরত খালেদ ঘটনা জানতে পেরে তৎক্ষণাত তাদেরকে উচ্ছেদ করলেন। মোট বারোজন নিহত হলো। হিমাস সমেত কয়েকজন পালিয়ে গেল। এ ধরনের আরো একটা ক্ষুদ্র প্রতিরোধকামী জমায়েত শহরে দেখা গেল। রসূল সা. জানতে পেরে হযরত আবু হুরায়রার মাধ্যমে আনসার বাহিনীকে তলব করলেন। তাদেরকে ঐ দৃশ্যটা দেখিয়ে বললেন, "দেখছ ওদের ফাজলামী?" অর্থাৎ একদিকে তো দয়া ও ক্ষমার বন্যা বয়ে যাচ্ছে এবং বিজয়ী শক্তি এক ফোঁটা রক্তও ঝরাতে চাইছেনা। অপর দিকে এই সব দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা বিজয়ী বাহিনীকে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করছে। অনন্যোপায় হয়ে রসূল সা. হুকুম দিলেন, "ওরা বাধা দিতে চেষ্টা করলে ওদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হোক।" রসূল সা. এর এই আদেশের খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান ছুটে এসে কাতর কণ্ঠে বললো, "হে রসূলুল্লাহ! সা. কোরায়েশের শক্তি এমনিতেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন যেন না হয় যে, পৃথিবী থেকে তাদের নাম নিশানাই মুছে যাবে।" অতপর হালকা আক্রমণ করা হয় এবং তাতেই দুষ্কৃতিকারীরা মার খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

রসূল সা. -এর এই দয়ার্দতা দেখে আনসারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কানাঘুষা করতে আরম্ভ করে যে, "ঐ দেখ, শেষ পর্যন্ত গোত্রের প্রেম রসূল সা. এর ওপর প্রবল হয়েই গেছে।!" আসলে রসূল সা. এর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যেই তারা সব সময় এই আশংকায় অস্থির থাকতেন যে, রসুল সা. মক্কা বিজয়ের পর তাদেরকে ছেড়ে মক্কাবাসীর সাথে থাকতে আরম্ভ করেন কিনা এবং তারা তাদের প্রিয়তম ব্যক্তিত্বের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যান কিনা। আনসারদের এই আশংকার কথা জানতে পেরে রসূল সা. তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, তোমরা যা আশংকা করছ, তা সত্য নয়। আমি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহর কাছে ও তোমাদের কাছে হিজরত করেছিলাম। এখন তোমরাই আমার জীবন মরণের সাথী।" এ কথা শুনে আনসারদের মন আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো। তারা তাদের ধারণার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং রসূল সা. তা গ্রহণ করলেন।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, শহরে আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? নাকি, পৈতৃক বাসস্থানে? রসূল সা. খুবই ব্যথাতুর কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আকীল আমাদের জন্য ঘর

রেখেছেই বা কোথায় যে, তাতে থাকবো? রসূল সা. এর পতাকা হুজুনে (জান্নাতুল মুয়াল্লাতে) স্থাপন করা হলো এবং ওখানেই তিনি অবস্থান করবেন বলে স্থির হলো। প্রথমে তিনি সেই ঐতিহাসিক স্থান 'খায়ফে' গেলেন, যেখানে তার পুরো গোত্র সহ অবরোধকালীন দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। তারপর হারাম শরীফে পৌঁছলেন। ঘনিষ্ঠতম সাহাবীদের কয়েকজন সাথে ছিলেন। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। হাতে ধনুক নিয়ে হারাম শরীফে স্থাপিত প্রতিটি মূর্তির কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, "হক এসে গেছে, এবং বাতিল অপসৃত হয়েছে। বাতিলকে তো অপসৃত হতেই হবে।" ধনুকের ইশারায় এক একটি মূর্তি পড়ে যেতে লাগলো। তারপর কা'বার চাবি আনিয়ে দরজা খোলালেন। ভেতরে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল আ. এর ছবি আঁকা ছিল। তাদের উভয়ের হাতে জুয়ার তীর ছিল। ঐ সব ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহ কাফেরদের ধ্বংস করুন। এরা উভয়ে আল্লাহর নবী ছিলেন। তারা কখনো জুয়া খেলেননি। এরপর রসূল সা. এর নির্দেশে দীর্ঘকাল ধরে আশপাশের স্থাপিত অন্যান্য মূর্তিগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হলো। এরপর তিনি কিছুক্ষণ নামায ও যিকরে মশগুল হলেন। মসজিদুল হারামের সামনে তখন বিপুল জনসমাগম ঘটেছে। জনতা নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা শুনতে উদগ্রীব। রসূল সা. তাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন ঃ

"এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সমস্ত কাফের সৈন্যদেরকে পরাস্ত করেছেন। আজ সমস্ত অহংকার, আভিজাত্য, রক্তের সমস্ত দাবীদাওয়া এবং সমস্ত আর্থিক দাবী আমার পায়ের নীচে। তবে কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি সরবরাহের পদগুলো বহাল থাকবে।"

"হে কুরায়েশ! এখন আল্লাহ তোমাদের জাহেলিয়তের অহংকার ও বংশীয় আভিজাত্যের সমস্ত দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা সকল মানুষ আদমের বংশধর। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অতপর তিনি কোরআনের আয়াত পড়লেন ঃ

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি শুধু এ জন্য যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। কিন্তু আল্লাহর কাছে কেবল সেই ব্যক্তিই সম্মানিত, যে অধিকতর সৎ ও সংযত। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।"

এরপর একটা আইনগত ঘোষণা দিলেন ঃ

"আল্লাহ মদের কেনাবেচা হারাম করেছেন।"

তারপর রসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমরা কি জান আমি আজ তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করবো ?"

এ বাক্যটা শোনার সাথে সাথে সম্ভবত কোরায়েশদের চোখের সামনে তাদের কৃত যুলুম নির্যাতন, হিংস্রতা ও বর্বরতার দুই দশকের কালো ইতিহাস একটা সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠেছিল। তাদের বিবেক হয়তো অনুশোচনায় বিদীর্ণ হবার উপক্রম হয়েছিল। হয়তো চরম অসহায়ত্ব ও অনুতাপের অনুভূতি নিয়েই তারা বলে উঠেছিল ঃ

"একজন মহানুভব ভাই এবং মহানুভব ভ্রাতুস্পুত্রের মত।" জবাবে রসূল সা. ঘোষণা করলেন ঃ

"তোমাদের ওপর আজ আর কোন অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা মুক্ত।"

কোরায়েশদের যুলুম নিপীড়ন ও আগ্রাসী যুদ্ধের ইতিহাস দৃষ্টিপথে থাকলে কেউ কি এ ধরনের জবাব আশা করতে পারে? তবে যে ব্যক্তি রসূল সা. এর দয়া ও করুণা সম্পর্কে অবহিত সে তাঁর কাছ থেকে এরূপ জবাবই প্রত্যাশা করবে। আর কেউ হলে অহংকারের সাথে মক্কায় প্রবেশ করতো, এক একটা ঘটনার প্রতিশোধ নিত, বেছে বেছে বিরোধীদের মধ্যে যারা অতীতে বিন্দুমাত্রও বাড়াবাড়ি করেছে, তাদেরকে হত্যা করতো, বিজিত শহরে গণহত্যা সংঘটিত করতো, মানুষের ধন সম্পদ ও নারীদের সতীত্ব নির্বিচারে লুণ্ঠিত হতো। কিন্তু বিজেতা যেহেতু মানবতার শ্রেষ্ঠ দরদী ও ত্রাণকর্তা ছিলেন, তাই তিনি ভূমি দখলের সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ও জয় করার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি মোহাজেরদেরকে নিজ নিজ ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদের মালিকানাও ত্যাগ করতে বলেন। যে উসমান বিন তালহাকে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা কালে তিনি কাবা শরীফের দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করলে সে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছিল, মক্কা বিজয়ের পরও কা'বার চাবি কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সেই ওসমানের হাতেই সমর্পন করলেন। অতপর রসূল সা. অতীতের দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে অতীতের একটা কথপোথন উসমানকে স্বরণ করিয়ে দিলেন ঃ "একদিন এই চাবি আমার নিয়ন্ত্রণে আসবে। আমি যাকে তা দিতে চাইবো, দেবো।" উসমান এত দূর-দৃষ্টি কোথায় পাবেন যে, এ কথার মর্ম বুঝবে? তাই সে বললো, "সেই দিনের আগেই বোধহয় কোরায়েশরা সবাই মরে যাবে।" রসূল সা. বললেন, "না, সেই দিনটা হবে কোরায়েশদের জন্য সত্যিকার সম্মানের দিন।" এই কথোপকথনকে লক্ষ্য করলে মনে এই ধারণাই জন্মে যে, রসূল সা. এর পরিবর্তে আর কেউ হলে নিজের ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য অবশ্যই কা'বার চাবি উসমানের কাছ থেকে নিয়ে অন্য কারো হাতে অর্পণ করতেন। কিন্তু রসূল সা. কা'বার চাবি হস্তগত করার জন্য বনু হাশেমের পক্ষ থেকে হযরত আলীর রা. ন্যায় ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তির আবেদনও প্রত্যাখ্যাত করেন এবং তা চিরদিনের জন্য সাবেক ব্যক্তিগণের হাতেই থাকতে দেন। রসূল সা. চাবি দেয়ার সময় যখন রসিকতার ছলে উসমান বিন তালহাকে বহু বছর আগের সেই কথাবার্তা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন সে বললো, "নিসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল।" রসূল সা. বললেন, "আজকের দিন সদাচার ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন।"

এরপর রসূল সা. এর আদেশে হযরত বিলাল রা. কাবার ওপর আরোহন করে আযান দিলেন। এ আযান ছিল ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের ঘোষণা স্বরূপ। যে কা'বা শরীফে আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অপরাধে পরিগণিত হয়েছিল, এবং এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গিয়ে রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা সীমাহীন যুলুম নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, সেই কা'বার ছাদের ওপর থেকে আজ আযান ধ্বনিত হচ্ছে! অথচ পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে রুখতে পারছেনা। এ সময় আবু সুফিয়ান বিন হাবর, ইতাব বিন উসাইদ এবং হারেস বিন হিশামের ন্যায় শীর্ষ নেতারা কা'বার নিকটবর্তী এক কোনে বসে নিজেদের পরাজয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিল। ইতাব ক্ষোভের সাথে বললো,

'ভালোই হয়েছে যে, আমার বাবা উসাইদ এই আযানের শব্দ শোনার জন্য জীবিত থাকেনি।' রসূল সা. পরক্ষণেই তাদের কাছে এলেন এবং তারা যা যা বলছিল, তা হুবহু তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এতে কোরায়েশদের এই শীর্ষ নেতৃবর্গ লজ্জা পেল।

এরপর রসূল সা. মক্কা বিজয়ের শোকর আদায় কল্পে উম্মে হানীর ঘরে গিয়ে গোছল করে আট রাকাত নামায পড়লেন।

বিজয়ের পরদিন রসূল সা. সাফা পর্বতের ওপর থেকে আরো একটা ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সংক্ষেপে হারাম শরীফের মর্যদা বর্ণনা করলেন, এই মর্যাদাকে চিরদিনের জন্য বহাল করলেন এবং তার নিয়ম বিধি সমূহ বর্ণনা করলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এত বড় বৈপ্লবিক বিজয় উপলক্ষেও মক্কায় জানমালের নিরাপত্তার শাশ্বত বিধান মাত্র একদিনের জন্য লংঘিত হয়েছে আর তাও একান্ত বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। কেননা রসূল সা. এর সম্মতি ছাড়াই মক্কার কতিপয় কান্ডজ্ঞানহীন গুন্ডাপান্ডা দু'জন মুসলিম সৈনিককে হত্যা করে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করতে। এই অতি ক্ষণস্থায়ী বাধ্যবাধকতা শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় দিন থেকে রসূল সা. হারাম শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা পুনর্বহাল করার ঘোষণা দেন।

সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা তো দেয়াই হয়েছিল। সে ঘোষণা জনগণকে এত অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিল যে, কারো মধ্যে প্রতিরোধের স্পৃহাই আর থাকেনি। তবে বিশেষ বিশেষ অপরাধ সম্পর্কে তিনি নামসহ ঘোষণা করে দেন যে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক হত্যা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মক্কা দখল করা ও তার আইন শৃংখলা বহাল করার জন্য কয়েকদিন সামরিক আইন চালু ছিল। অর্থাৎ যাবতীয় ক্ষমতা সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল[৫] এবং রসূল সা. সেনাপতি হিসাবেই নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, অমুক অমুক অপরাধীকে যেখানেই পাওয়া যাবে, হত্যা করা হবে। আধুনিক পরিভাষায় এটা "দেখামাত্র গুলি করার" আদেশের অনুরূপ। অপরাধীদের এই তালিকায় কয়েকজন পুরুষ ও নারীর নাম ছিল। কিন্তু রসূল সা.-এর সাধারণ ক্ষমা এদের মধ্যে থেকেও অধিকাংশের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সর্বোচ্চ চারজন অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। একটি সুচিন্তিত অভিমত এইযে, মাত্র একজন অপরাধীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল। এর

---

৫. যে এলাকায় যুদ্ধ চলতো, সেখানে সাধারণ বেসামরিক নিয়মশৃংখলা পুরোপুরিভাবে বহাল হওয়ার আগে ইসলামী আইন অনুসারে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে কিছুটা কড়া অস্থায়ী প্রশাসন চালু করা হতো। এ ধরনের প্রশাসনে কিছু কিছু আইন ও বিধি সাধারণ বেসামরিক প্রশাসন থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমার মতে এ ধরনের প্রশাসনকেই আধুনিক পরিভাষায় সামরিক আইন বা মার্শাল ল' বলা হয়। সামরিক আইন সাধারণভাবে প্রত্যেক সুসভ্য সরকারের অধীনে এবং বিশেষভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধরত অঞ্চলে শুধু অনিবার্য প্রয়োজনের আওতায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য চালু হয়ে থাকে, আর তাও বিজিত অমুসলিম শত্রুদের ওপর। আজকাল সামরিক আইনের নামে কোন দেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক নিজ দেশেরই জনগণকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দীর্ঘ ও অনির্দিষ্টকালের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা। মক্কা বিজয়ের সময়কার যে ব্যবস্থাকে আমরা 'সামরিক আইন' নামে আখ্যায়িত করেছি, আজকালকার সামরিক আইনের সাথে তার কোন মিল নেই। এ যুগের প্রচলিত সামরিক আইন ও সামরিক শাসন ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

নাম হলো আব্দুল উয্যা বিন হানযাল। এই ব্যক্তি প্রথমে মুসলমান হয়। অন্য একজন মুসলমান সাথীসহ তাকে যাকাত সদকা আদায় করতে পাঠানো হয়। পথিমধ্যে সাথীর সাথে ঝগড়া হয় এবং তাকে হত্যা করে সে সদকার জন্তুগুলোকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ছাড়া আরো বহু ফৌজদারী অপরাধে সে জড়িত ছিল।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া এ ধরনের আরো একজন গুরুতর অপরাধী। সে ইসলামী ছিল আন্দোলনের কট্টর শত্রু। প্রথমে পালিয়ে ইয়ামান যাওয়ার পথে জেদ্দায় পৌঁছে। উমাইর বিন ওহব জামহী রসূল সা. এর কাছ থেকে তার জন্য ক্ষমা মঞ্জুরী নিয়ে তাকে জেদ্দা থেকে ফিরিয়ে আনে। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইকরামা বিন আবু জাহলও ইয়ামানে পালিয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতুল হারিস (আবু জাহলের ভাই এর মেয়ে) নিজে মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজের স্বামীর জন্য রসূল সা. এর কাছ থেকে ক্ষমার মঞ্জুরী গ্রহণ করে। তারপর নিজে ইয়েমেন গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন। ইকরামা যখন নিজের জন্য ক্ষমা প্রাপ্তির খবর পেল, তখন সে অবাক হয়ে যায় যে, তার মত কট্টর শত্রুকেও রসূল সা. ক্ষমা করে দিলেন! তিনি হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ এক সময় মুসলমান ছিল এবং ওহির লেখক হবারও সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু মুরতাদ হয়ে শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে। এমনকি সে এ কথাও প্রচার করতে থাকে যে, ওহি তো আসলে আমার কাছে আসতো। মুহাম্মদ সা. আমার কাছ থেকে শুনে তা লিখিয়ে নিতেন। অপরাধ ছিল সংগীন। কিন্তু হযরত উসমানের পক্ষ থেকে বারবার সুপারিশ করার কারণে রসূল সা. সর্বোচ্চ শাসক হিসাবে ক্ষমা করে দেন। ক্ষমার পর সে মুসলমান হিসেবে বহাল থাকে।

মুকাইয়াস বিন সাবাবা বা সাবাতা বর্ণচোরা হিসেবে ইসলামী দলের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে সে প্রতারণার মাধ্যমে জনৈক সাহাবীকে হত্যা করে পালিয়ে আসে। এই হত্যাকান্ডের কারণ ছিল এই যে, মুকাইয়াসের ভাই ভুলক্রমে এই আনসারী সাহাবীর হাতে নিহত হয়। রসূল সা. এজন্য দিয়াত তথা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেন। তা সত্ত্বেও সে আনসারী সাহাবীকে হত্যা করে। মুরতাদ হওয়া ও ধোকাবাজী করা ছাড়াও নিছক এই হত্যাকান্ডের জন্যও তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যেত।

হাববার ইবনুল আসওয়াদ ছিল সেই ব্যক্তি, যে অন্যান্য ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড ছাড়াও রসূল সা. এর মেয়ে হযরত যয়নবের ওপর হিজরতের দিন হামলা করে এত কষ্ট দিয়েছিল যে, তার গর্ভপাত ঘটে গিয়েছিল। সে প্রথমে পলাতক ছিল। পরে নিজেই হাজির হয়ে বিনয়ের সাথে অপরাধ স্বীকার করে এবং রসূল সা. এর কাছে প্রবল অনুশোচনা প্রকাশ করে। সেই সাথে সে ইসলামও গ্রহণ করে। রসূল সা. ঘোষণা করেন যে, আমি হাব্বারকে ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত হামযার খুনী ওয়াহশী রসূল সা. এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তার কাছে হামযা হত্যার বিবরণ শোনেন। তিনি তাকে মাফ করে দেন। তবে তাকে পরামর্শ দেন, তুমি আমার সামনে এসনা। এতে স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়। এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পরও নানা ধরনের গুনাহর কাজ বিশেষত মদখুরি থেকে মুক্তি পায়নি।

খ্যাতনামা জাহেলী কবি আব্দুল্লাহ বিন যিবয়ার এক সময় কবিতার অস্ত্র প্রয়োগ করে ইসলামের সাথে শত্রুতা করতো এবং মানুষকে উস্কে দিত। সে রসূল সা. এর সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

কবি কা'ব বিন যুহায়েরও ইসলাম ও রসূল সা. এর বিরুদ্ধে বহু নিন্দামূলক কবিতা লিখেছিল। হিজরী নবম সালে নিজের ভাই এর সাথে এসে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করে। পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে "বানাত্ সুয়াদ" শীর্ষক এক ঐতিহাসিক চমকপ্রদ কবিতা ইসলামের পক্ষে রচনা করে। রসূল সা. তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং নিজের চাদরও পুরস্কার দেন।

মক্কায় অবস্থানকালে একবার রসূল সা. কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলেন। এই সময় ফুযালা বিন উমাইর তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। রসূল সা. নিজেই তার কাছে এগিয়ে যান এবং তার মনের ইচ্ছাটা তাকে জানান। ফুযালা এভাবে ধরা পড়ে ভীষণ লজ্জা পায়। তিনি তাকে ক্ষমা চাইতে বলেন এবং তার বুকের ওপর হাত ঘোরান। সংগে সংগে তার দুনিয়া পাল্টে যায়। হত্যার ইচ্ছা পোষণকারী এক অপরাধীকে এভাবে ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবেনা।

মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ছিল হিন্দ বিনতে উতবা। সে ইসলামের সক্রিয় বিরোধিতা তো করেছেই, এমনকি হযরত হামযার লাশকে বিকৃতও করেছে এবং তার কলিজা পর্যন্ত চিবিয়েছে। নিজের চেহারা লুকানোর জন্য নিকাব পরে রসূল সা. এর সামনে হাজির হয়। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও ধৃষ্টতা সহকারে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন রসূল সা. এর কাছে করেছিল। রসূল সা. এর সাথে তার কথোপকথন ছিল নিম্নরূপ ঃ

হিন্দ ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাদের কাছ থেকে কী কী অংগীকার গ্রহণ করছেন?
রসূল সা. ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা।
হিন্দ ঃ এ অংগীকার আপনি পুরুষদের কাছ থেকে তো নেননি। তবুও ওটা আমি মেনে নিলাম।
রসূল সা. ঃ চুরি করবেনা।
হিন্দ ঃ আমি আমার স্বামী আবু সুফিয়ানের সম্পত্তি থেকে কখনো কখনো দু'চার দিরহাম নিয়ে থাকি। জানিনা এটাও জায়েজ, না নাজায়েজ।
রসূল সা. ঃ নিজের সন্তানদের হত্যা করবেনা।

হিন্দ ঃ আমরা তো শৈশবে তাদের লালন পালন করেছি। বড় হলে বদরের ময়দানে আপনারাই তাদের হত্যা করলেন। এখন তাদের কী হবে, সেটা আপনারাই জানেন।

এটা কী ধরনের ইসলাম গ্রহণ, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কথাবার্তার ভেতরে এমন ঔদ্ধত্য ও বেআদবী অন্য কেউ হলে সহ্য করতোনা। রসূল সা. এর সীমাহীন ধৈর্যকে সে অপব্যবহার করছিল মাত্র।

ইবনে হানযালের দাসী ছিল কারতানা। সে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক গান গেয়ে বেড়াতো। মক্কা বিজয়ের সময় সে পালিয়ে যায়। পরে তওবা করে ও ইসলাম গ্রহণ করে।

এক মহিলা হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়ে নিহত হয়।

কয়েকজন নারী ও পুরুষ সম্পর্কে হাদীস ও সীরাতের রেয়ায়েতসমূহে যথেষ্ট মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাদের কেউ মৃত্যুদন্ড পেয়েছে বলে নিশ্চিত কোন তথ্য নেই।

তবে এমন কট্টর শত্রুদের জন্য এমন পূর্ণাংগ বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কোন বিজেতার জীবনে পাওয়া যায় না।

মক্কার ভূমি দখল করার চেয়েও বড় বিজয় ছিল এই যে, রসূল সা. সাফা পাহাড়ে উঁচু জায়গায় বসে ছিলেন, আর লোকেরা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল। তাদের কাছ থেকে তাওহীদ ও রিসালাতের মৌলিক তত্ত্ব মেনে নেয়া ছাড়াও বিশেষভাবে কিছু প্রচলিত খারাপ কাজ ও খারাপ প্রথা থেকে সংযত থাকার অংগীকার গ্রহণ করা হচ্ছিল। বায়য়াতের বিশেষ বিশেষ অংগীকারগুলো ছিল এরকম :

* আমি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করবোনা, তাঁর সত্তায়, গুণাবলীতে, এবাদাতে ও অধিকারে কোনটাতেই নয়।
* চুরি করবোনা, ব্যভিচার করবোনা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবোনা, শিশু মেয়েদেরকে হত্যা করবোনা, কারো ওপর অপবাদ আরোপ করবোনা।
* ভালো কাজে যথা সাধ্য রসূল সা. এর আদেশ মেনে চলবো।

পনেরো দিন বা তার দু'একদিন কম বা বেশী মক্কায় অবস্থান করার পর যখন রসূল সা. বিদায় নিলেন, তখন জনগণকে ইসলামী জীবন পদ্ধতি, ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, ইসলামী চরিত্র, ইসলামী আইন ও ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়ার কাজে হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে নিযুক্ত করে রেখে গেলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময় তিনি ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ নিজের হাতে ইসলামী শাস্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। ফাতেমা বিনতে আবুল আসাদ নাম্নী এক মহিলার চুরি প্রমাণিত হলে তিনি অনেকের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেও তার হাত কেটে দেয়ার সেই ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন করেন। হোনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধ জয়ের পর রসূল সা. মক্কায় ফিরে এসে ইতাব বিন উসায়েদকে সহকারী শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তার জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন।

মক্কা বিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

১- মক্কা বিজয় ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয়ের পর ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়। আরবের প্রাচীন জাহেলী নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল ছিল মক্কা। এই কেন্দ্রের পতন না ঘটা পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লবের সামনে অগ্রসর হওয়ার কোন উপায় ছিল না। জাহেলী নেতৃত্বের পতাকা যখন অবনমিত হলো, তখন আর জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার টিকে থাকার সাধ্য থাকলোনা এবং জাহেলিয়তের চার পাশে জনগণের সমবেত হওয়ার সম্ভবনাও রইলনা।

মক্কা বিজয় জনসাধারণের বহু জটিলতা দূর করে দেয়। অনেকগুলো গোত্র শুধু এ কারণেও ইসলামের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি যে, তাদের সাথে কোরায়েশদের হয়

মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল, নচেত অর্থনৈতিকভাবে তারা কোরায়েশদের নিকট মুখাপেক্ষী বা ঋণগ্রস্ত ছিল। কেউবা তাদের সামাজিক প্রাধান্য ও ধর্মীয় পৌরহিত্যের দাপটের কাছে অসহায় ছিল। কোরায়েশের এই দাপট যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাদের পথ আর কে আটকায়। তাদের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

জাহেলী সমাজের কোন কোন স্তরে এই ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল যে, মক্কায় শুধু সে-ই বিজয়ী থাকতে পারে, যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন। যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে আল্লাহর সাহায্যও পায়না এবং মক্কায় তার জয়ডংকাও বাজেনা। এ ধরনের ধারণা বিশ্বাস বিশেষত আবরাহার আক্রমণের পর আরো জোরদার হয়ে ওঠে। লোকেরা ভাবতে থাকে যে, কোরায়েশ আল্লাহর প্রিয় জনগোষ্ঠী। লোকেরা রসূল সা. ও কোরায়েশের বিরোধে হস্তক্ষেপ না করে বলতো ঃ

"মুহাম্মদ সা. কে ও তার গোত্রকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দাও। সে যদি তাদের ওপর বিজয়ী হয়, তবে বুঝতে হবে, সে যথার্থই নবী।" এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মক্কা বিজয়ের পর জনতার স্রোত বাধভাঙ্গা জোয়ারের মত ইসলামের দিকে ধাবিত হতে থাকে। শুধু মক্কাবাসী নয় বরং আশপাশের এলাকার গোত্রগুলো থেকেও দলে দলে লোকেরা ছুটে এসে সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ইসলামী আন্দোলনের সেবক ও মুহাম্মদের সা. অনুসারী হওয়াকে তারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করতে থাকে।

ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য এরপর ময়দান একেবারেই পরিষ্কার ও বাধামুক্ত হয়ে গেল। তখন প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হলো। বাধা দেয়ার কেউ রইলনা।

২- রসূল সা. যখন মক্কা অভিযানে বের হন, তখন প্রথম থেকেই এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যাতে আদৌ কোন রক্তপাত না হতে পারে। তিনি নিজের উদ্দেশ্যও কারো কাছে ব্যক্ত না করে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। কোরায়েশকে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কোন দিক থেকে কোন সাহায্য গ্রহণের আদৌ কোন সুযোগ না দিয়ে সহসাই মক্কার উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হন। এভাবে যে বিরোধী শক্তি আগেই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, এই আকস্মিকতায় তারা একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আবু সুফিয়ানের মানসিক পরাজয় তো আরো আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করে সবার আগে তাকেই ভীতসন্ত্রস্থ করে দেয়া হয়। আবু সুফিয়ানের নতি স্বীকার করার কারণে আর কারো পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করার কোন অবকাশ থাকলোনা। রসূল সা. যে একজন সেনাপতিকে শুধু একটু উস্কানীমূলক ও উত্তেজনাপূর্ণ শ্লোগান দেয়ার কারণে সেনাপতিত্ব থেকে বরখাস্ত করেছিলেন, তাও এই উদ্দেশ্যেই করেছিলেন। তিনি মক্কাবাসীকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, আজকের দিন কা'বার মর্যাদা পুনর্বহালের দিন, তথা পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার দিন।

৩- রসূল সা.-এর নিজের ওপর এবং নিজের প্রিয় সাথী ও আপনজনদের ওপর দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে নিকৃষ্টতম নির্যাতন পরিচালনাকারী, ঠাট্টাবিদ্রুপকারী, নোংরা বর্জ্য নিক্ষেপকারী, পথে কাটা বিস্তারকারী, আটককারী, হত্যার ষড়যন্ত্রকারী, দেশ থেকে বিতাড়ণকারী এবং বিনা উস্কানীতে আক্রমণকারী ইসলামের কট্টর শত্রুদের সমস্ত

বর্বরোচিত অপরাধকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলেন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয় ও কোমল আচরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি কোন দুনিয়াবী বিজেতা ছিলেন না যে, শক্তি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কিছু লোককে বশীভূত করা এবং ডান্ডার জোরে হুমকি ধমকির মাধ্যমে তাদেরকে নিজের হুকুমের গোলাম বানানোই যথেষ্ট হবে। তিনি ছিলেন একটা দাওয়াত, একটা মিশন, একটা নৈতিক আন্দোলন, এবং একটা পবিত্র ও নির্মল শাসন ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার পতাকাবাহী। তিনি যদি একদল লোককে নিছক ধরে বেঁধে জবরদস্তিমূলকভাবে নিজের অনুগত বানাতেন, তাহলে তাতে তাঁর ঐ উদ্দেশ্য সফল হতোনা। তাঁর প্রয়োজন ছিল এমন একদল মানুষের, যাদের মনমগজে পরিবর্তন এসেছে। আর মনমগজের পরিবর্তন একমাত্র ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ ও কোমলতার মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল তখনই সফল হতে পারতো, যখন মক্কাবাসী তাদের অতীতের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে রাজী হতো। একটা সত্য আদর্শ ও গঠনমূলক বিপ্লব বাস্তবায়ন যাঁর লক্ষ্য ও মূলমন্ত্র, তাঁর জন্য অন্য কোন বিজেতাসুলভ নীতি মানানসই হতোনা।

আরো একটা বাস্তবতাকেও রসূল সা. গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। সেটি হলো, কোরায়েশ অতীতে যা-ই করুক না কেন, আরব জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তারাই সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও উপযুক্ত জনগোষ্ঠী। সারা আরবে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্রগুলোর মধ্যে তারা এমন অটুট সেতুবন্ধন স্বরূপ ছিল যে, তাদেরকে যদি বিনষ্ট করে দেয়া হয়, তবে সহজে এর কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবেনা। নীতিগতভাবে ইসলামের এ নীতি অকাট্য সত্য ও একে মেনে নেয়া অপরিহার্য যে, ঈমান ও সততায় যে যত অগ্রগামী, নেতৃত্বের জন্যও সে ততই যোগ্য। কিন্তু ঈমানদারী ও সততার সাথে সাথে নেতৃত্বের মানসিক ও বাস্তব যোগ্যতাও তো একটা সুস্পষ্ট যৌক্তিক প্রয়োজন। এ কাজের জন্য প্রভাব প্রতিপত্তি দরকার, শাসনকার্য পরিচালনা ও সামরিক অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা আবশ্যক, কৌশল জ্ঞান, কল্যাণ চেতনা ও প্রজ্ঞা থাকা আবশ্যক, ভাষা ও অন্যান্য ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর দক্ষতা চাই এবং মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা চাই। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিরা কেবল তখনই সফলতা লাভ করতে পারে, যখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আগে থেকে জনগণের কাছে স্বীকৃত এবং তাদের শেকড় থাকে জনমতের অনেক গভীরে। কোন নেতৃত্ব শূন্যে দাঁড়িযে থাকতে পারে না। কোরায়েশের নেতৃত্বের যোগ্যতা জাহেলিয়াতের অনুসারী ছিল বলেই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত ছিল। কিন্তু ঐ নেতৃত্ব ইসলামের অনুসারী হয়ে ঈমানদারী ও সততার গুণাবলী অর্জন করলেই তা মহামূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। রসূল সা. বিজয়োত্তরকালে কোরায়েশদের সাথে আচরণের যে নীতি নির্ধারণ করেন, তা এই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করেন যেন ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আন্দোলন কোরায়েশের কাছ থেকে পর্যাপ্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ নেতা ও প্রশাসন লাভ করতে পারে। বলপ্রয়োগ ও অবমাননাকর আচরণ দ্বারা যদি তাদেরকে দমন ও দলন করা হতো, তবে তাদের দ্বারা এই প্রয়োজনটা পূরণ হতোনা।

৪- বিজয়ীর বেশে মক্কা প্রবেশকালে রসূল সা. খোদাভীতির যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, কোন দুনিয়াদার রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা যায় না। তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন, অথচ ঢাকঢোল বা তবলা দামামা বাজেনি, গর্ব ও অহংকারের প্রদর্শনী হয়নি, বড় বড় কৃতিত্বের দাবী নিয়ে গলাবাজী করা হয়নি, বরঞ্চ জনতা ঠিক তার বিপরীত দৃশ্য দেখেছে। 'সিজদারত অবস্থায়' প্রবেশের আদেশ পালন করে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করা হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসাসহ গান গাওয়া হয়েছে। মুখে যদি কোন শ্লোগান উচ্চারিত হয়ে থাকে, তবে তাও ছিল আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বেরই শ্লোগান। আযান, নামায ও দোয়া মক্কার পরিবেশে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। নিজের কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করা হয়নি, বরং মোহাজেরদের যে সমস্ত সম্পত্তি কোরায়েশরা জোর পূর্বক ও জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে হস্তগত করেছিল, তাও কোরায়েশদের অধিকারেই থাকতে দেয়া হলো। দুঃখের বিষয় যে, রসূল সা. এর কিছু কিছু বিবেকহীন সমালোচক রসূল সা. এর ইসলামী আন্দোলনের খোদাভীতিমূলক দিকগুলোকে নিছক স্বার্থপরতামূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি কেউ কেউ একে খোলাখুলি লোক দেখানো ভড়ং বলেও প্রমাণ করতে চেয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ!) তারা কখনো ভেবে দেখেনি যে, যারা লোক দেখানো ভড়ং করে, তারা সর্বাত্মক সাফল্য লাভ করলে মুখোস খুলে যায় এবং তাদের আসল রূপটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ না করুন, এটা যদি কোন রাজনৈতিক ভেলকিবাজী হতো, তাহলে মক্কা বিজয় এমন সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, তাদের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়তো এবং 'আল্লাহ বড়' আল্লাহ বড়' বলে যারা গলা ফাটাচ্ছিল, সহসাই দেখা যেত যে তারা নিজেদের বড়াই জাহির করা শুরু করে দিয়েছে। অথচ এখানে অবস্থা ছিল এ রকম যে, রসূল সা. তার বিজয়োত্তর প্রথম ভাষণে সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহর বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও বিজয়ী করেছেন।

৫- মক্কা বিজয়ের সময় রসূল সা. শুধু রাজনৈতিক অপরাধই ক্ষমা করেননি, বরং কোন কোন ব্যক্তির এমন সব ফৌজদারী অপরাধও মাফ করে দেন, যার জন্য তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া জরুরী ছিল। এ সব দৃষ্টান্তের আলোকে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগের পরিস্থিতিকে ভেবে দেখতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে শাস্তি কমানো বা মাফ করার ক্ষমতা কতখানি দেয়া যেতে পারে।

মক্কা বিজয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তি

মক্কার আশে পাশে কোরায়েশদের পুরানো সমর্থক ও সহযোগী এবং প্রায় একই ধরনের প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপটের অধিকারী যে গোত্রগুলো বাস করতো, মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে সেই দুর্ধর্ষ গোত্রগুলোকেও যদি শায়েস্তা না করা হতো, তবে মক্কা বিজয় সঠিক অর্থে বিজয় বলেই গণ্য হতোনা, আর হলেও তা টেকসই হতোনা। মক্কার জাহেলী নেতৃত্বের নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রতাপ যেটুকু ছিল, সেটুকুকে জোরদার করার ব্যাপারে বনু হাওয়াযেন, তায়েফবাসী ও বনু সাকীফেরও প্রচুর অবদান ছিল। এরা বলতে গেলে একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন ডালপালা ছিল। সাধারণ আরবদের মোকাবিলায় মক্কার পার্শ্ববর্তী এই সব গোত্রও নেতৃত্বের মর্যাদা ভোগ করতো। অবশ্য কোরায়েশদের সামনে তারা ছিল দ্বিতীয়

স্তরের নেতৃত্বের সারিতে। মক্কার সাথে তাদের মিত্রতাপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পর্কও ছিল যথেষ্ট প্রাচীন, আর অর্থনৈতিক সম্পর্কও ছিল নিবীড় ও গভীর। সামরিক প্রয়োজনেও তারা পরস্পরের সাথী ছিল, আবার সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও তারা উঁচু স্তরের লোক ছিল। মক্কা বিজয় যে বিনা রক্তপাতে সম্পন্ন হয়েছিল, সেটা নেহাৎ অলৌকিকভাবেই হয়েছিল। নচেত বনু হাওয়াযেন, বুন সাকীফ ও তায়েফবাসী সম্মিলিতভাবে কোরায়েশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসার কথা ছিল। তা যদি সত্যিই ঘটতো, তবে মক্কায় ইতিহাসের একটা চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হতো। কিন্তু রসূল সা. এর পরিকল্পনা এত নিপুণ ও দক্ষতাপূর্ণ ছিল যে, মক্কাবাসী আশপাশ থেকে কোন সাহায্যই পায়নি। একেবারেই একাকী ও অতর্কিতভাবে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়েছে।

হাওয়াযেন গোত্রের নেতারা আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল যে, কী ঘটতে যাচ্ছে। যে সংঘাতের সূচনা বদরে হয়েছে, তার শেষ পরিণতি যে এখনো বাকী রয়েছে, তা তারা বুঝতে পেরেছিল। কোরায়েশের পক্ষ থেকে হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভংগ, রসূল সা. এর পক্ষ থেকে প্রেরিত নতুন শর্তাবলী, প্রস্তাব রক্ষাকারী দূতকে ফেরত পাঠানো এবং এরপর আবু সুফিয়ানের চুক্তি নবায়নের চেষ্টায় ব্যর্থতা - এসব ঘটনার ধারাবাহিকতা শুভ লক্ষণ ছিলনা। এ জন্য হাওয়াযেন গোত্রের নেতারা সারা বছর শক্তি সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত ছিল। তারা বিভিন্ন গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছিল। কিন্তু যখন সময় এল, তখন রসূল সা. এর রহস্যপূর্ণ কার্যকলাপকে তারা ভুল বুঝলো। বনু হাওয়াযেন ভাবলো, রসূল সা. তাদেরকে লক্ষ্য করেই যাবতীয় যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। তাই তারা নিজেদের অঞ্চলেই সেনা সমাবেশ ঘটালো এবং মহা ধুমধামে প্রস্তুতি চালাতে লাগলো।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তাদের অনুমানের বিপরীত অন্য রকমের রূপ ধারণ করলো। তারা তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিজ জায়গায় বসে রইল। আর মক্কার পতনের ন্যায় বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা অত্যন্ত সহজে সংঘটিত হয়ে গেল। মক্কা বিজয়ে অন্যান্য গোত্রের প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তাদের পক্ষ থেকে লোকেরা দলে দলে রসূল সা. এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। কিন্তু বনু হাওয়াযেন ও বনু সাকীফের প্রতিক্রিয়া হলো অন্য রকম। কেননা একেতো তাদের বিপুল জনবল, অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক দক্ষতায় তারা সংগঠিত ছিল। অপর দিকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত শত্রুতামূলক আচরণ করতে করতে তাদের এমন হটকারি মেজাজ গড়ে উঠেছিল যে, তারা নিজেদের প্রতিরোধ কর্মসূচীকে চূড়ান্ত রূপ দিতে বাধ্য ছিল। তারা তাদের শেষ লড়াই লড়বার জন্য তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী আওতাস বা হোনায়েনে সৈন্য সমবেত করলো। শুধুমাত্র বনু কাব ও বনু কিলাব পুরোপুরি নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করলো।

রসূল সা. বনু হাওয়ানের প্রস্তুতির কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন আবি হাদরুকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন এবং সঠিক তথ্য জেনে নিলেন। এবার যুদ্ধ প্রস্তুতির পালা। সামরিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রসূল সা. আবদুল্লাহ বিন রবীয়ার কাছ থেকে তিন হাজার দিরহাম এবং মক্কার বিশিষ্ট নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকে সমরাস্ত্র বিশেষত ১০০ বর্ম ধার নিলেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, রসূল সা. কোন অসাধারণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে

বের হননি। আগে থেকেই কোন রক্তপাতের চিন্তা তাঁর ছিলনা। কেবল ঘটনাস্থলেই নতুনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। কেমন নজীরবিহীন ঘটনা! যে বিজেতা কোরায়েশকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেছেন, তিনি তাদের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র জবরদস্তিমূলকভাবেও আদায় করতে পারতেন। এত উঁচু পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি নৈতিকতার প্রতি এত লক্ষ্য রাখতেন যে, যা কিছুই নিলেন, ধার হিসেবেই নিলেন। ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্টই হলো তার এই নৈতিক চেতনা।

৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে ১২ হাজার মুসলিম সৈন্য মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করলো। এই মুসলিম সৈন্যদের মনে এবার এরূপ মনোভাব জাগ্রত হলো যে, আমরা এখন মক্কা বিজয়ী সেনাবাহিনী। আমাদের জনবল বিপুল। অস্ত্রবল ও আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশী। এ ধরনের আত্মম্ভরী মনোভাব যে মানুষকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এটা ছিল তাদের মানবীয় দুর্বলতা। তাদের খেয়াল ছিল না যে, তারা সেই বিশ্ব সম্রাটের সৈনিক, যিনি এক তিল পরিমাণ অহংকারও সহ্য করেন না। অহংকার ও আত্মম্ভরিতা মানুষের ও আল্লাহর মাঝে লোহার প্রাচীর স্বরূপ। এর কারণে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। অথচ আল্লাহর সাহায্য যে কোন ইসলামী লড়াই এর প্রাণ হয়ে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য এই আত্মম্ভরিতার এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হলো যে, তা ঐতিহাসিক স্মৃতিতে পরিণত হলো। কোরআন এ ঘটনাকে স্থায়ী শিক্ষার উৎসে পরিণত করেছে।

ঘটনা ছিল এই যে, মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে এবার মক্কা থেকে একদল নতুন ধরনের সৈনিক যোগ দিয়েছিল। খালেদ বিন ওলীদের নেতৃত্বে পরিচালিত অগ্রবর্তী বাহিনীতে নও মুসলিম তরুণরা ভর্তি হয়েছিল। তারা আবেগে এতই উদ্দীপ্ত ছিল যে, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত হয়ে যায় নি। তাছাড়া মক্কার দু' হাজার "তোলাকাবা মুক্ত লোক"ও ছিল, যারা ইসলামী সরকারের অনুগত ছিল বটে, তবে এখনো সঠিকভাবে তাদের ইসলামী চরিত্র গড়ে ওঠেনি। ওদিকে প্রতিপক্ষের লোকেরা ছিল যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী, বিশেষত তীর নিক্ষেপে তাদের সমকক্ষ সারা আরবে কেউ ছিল না। তারা রণাঙ্গনের সবচেয়ে ভালো জায়গা আগেই দখলে নিয়েছিল এবং প্রত্যেক পাহাড়ে, পাহাড়ের গর্তে, গিরিপথে তীরন্দাজ বাহিনী গোপনে বসিয়ে রেখেছিল।

হামলার শুরুতেই যখন সকল দিক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো, তখন অগ্রবর্তী বাহিনী ছত্রভংগ হয়ে গেল। সেই সাথে মুসলিম সৈন্যরা ঘাবড়ে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এক সময় এমন অবস্থাও হলো যে, রসূল সা. এর পাশে কেউ ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। এটা রসূল সা. এর সামরিক জীবনের কয়েকটি বিরল ও নাজুক মুহূর্তের অন্যতম, যখন তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর নির্ভরতা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে সাথীদেরকে ডাকলেন এবং বাহন জন্তুর পিঠ থেকে নেমে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন ঃ

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ
أَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ

"আমি সত্য নবী, এতে নেই কোন মিথ্যার লেশ।
আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র জানো বেশ।"

হযরত আব্বাস নিকট থেকেই ডাক দিলেন ঃ "ওহে আনসারগণ! ওহে গাছের নীচে বসে বায়য়াত গ্রহণকারীগণ!" এ আওয়ায শুনেই বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা চারদিক থেকে ছুটে এল এবং অমিত বিক্রমী নেতা রসূল সা. এর চার পাশে সমবেত হলো। এরপর তারা এমন বীরোচিতভাবে যুদ্ধ করলেন যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যুদ্ধের গতিধারা পাল্টে গেল। শত্রুর ৭০ জন মারা গেল। তাদের পতাকাবাহক মারা গেলে। তাদের গোটা বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গেল। পরাজিত কাফের বাহিনীর একাংশ আওতাস দূর্গে গিয়ে আত্মগোপন করলো। আবু আমের আশয়ারী ক্ষুদ্র একটা দল নিয়ে সেখানে গেলেন। শত্রুরা ছিল কয়েক হাজার। আবু আমের আশায়ারী নিজে শহীদ হলেন। তবে তার দল জয় লাভ করলো।

তায়েফ অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গা ছিল। কেননা তার চারপাশে ছিল প্রাচীর। এই প্রাচীর মেরামত করা হয়েছিল এবং সারা বছরের প্রয়োজনীয় রসদ আগে থেকেই সেখানে সঞ্চিত করা হয়েছিল। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। রসূল সা. এর আসল লক্ষ্য ছিল এই কেন্দ্রীয় জায়গাটি দখল করা। কিন্তু তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যে, তায়েফবাসীকে বনু হাওয়াযেনের সাহায্য থেকে প্রথমে বঞ্চিত করলেন। কিন্তু হেরে যাওয়া লোকেরা এখানেই সমবেত হয়েছিল। তায়েফের ওপর আক্রমণ এমন একটা দিক দিয়ে করা হলো, যেদিক থেকে আক্রমণ হওয়ার কথা তায়েফবাসী কল্পনাও করতে পারেনি। প্রথমে হযরত খালেদ একটা সেনাদল নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। পরে রসূল সা. স্বয়ং গোটা বাহিনীকে নিয়ে হাজির হলেন। এটা ছিল প্রথম ঘটনা, যখন দুর্গ ভাঙ্গার জন্য কামান ও ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। (উল্লেখ্য যে, রসূল সা. জুরাশ নামক স্থানে দূর্গ ভাঙ্গার ভারী অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে পাঠিয়েছিলেন। জুরাশ ছিল এই জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কেন্দ্র। সম্ভবত এই কেন্দ্র ইহুদীদের দখলে ছিল।) কিন্তু ভেতর থেকে সৈন্যদের ওপর ব্যাপক তীর বর্ষণের সাথে সাথে দূর্গভাঙ্গা অস্ত্রগুলোর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে গরম লৌহ শলাকা নিক্ষেপ করা হতে লাগলো। বহু মুসলিম যোদ্ধা আহত হলো এবং তাদেরকে পিছু হটতে হলো।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রসূল সা. নওফেল বিন মুযাবিয়ার মতামত তলব করলেন। তিনি এক মজার জবাব দিলেন। সে বললো, "শেয়াল গর্তে ঢুকে গেছে। চেষ্টা অব্যাহত রাখা হলে সে নিয়ন্ত্রণে আসবেই। আর যদি তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তেমন মারাত্মক কোন ক্ষতির আশংকাও নেই।" এই জ্ঞানগর্ভ পরামর্শের ভিত্তিতে রসূল সা. মনে করলেন, গোটা আরব যেখানে ইসলামের অধীন এসে গেছে, সেখানে তায়েফ ভিন্ন মতাবলম্বী তো হতে পারে না। তাকে যদি এখনই বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হয় তাহলে দুটো ক্ষতি হবে। আর যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি তায়েফবাসীর মধ্যে স্বেচ্ছা ভিত্তিক আনুগত্যের প্রেরণা জাগাবে। তাদের মনের দরজা ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি ইসলাম ও তায়েফবাসী উভয়ের বৃহত্তর কল্যাণার্থে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন। রসূল সা. রক্তপাত এড়িয়ে চলতে কত যত্নবান ছিলেন, এটা তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

সাথীরা বললো, "হে রসূল, আপনি তায়েফবাসীর জন্য বদদোয়া করুন।' রসূল সা. দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ্ সকীফকে সঠিক পথ দেখাও এবং তাদেরকে আমাদের সাথে যুক্ত করে দাও।" যে তায়েফবাসী একদিন রসূল সা. কে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, তাদের জন্য তিনি এ দোয়া করলেন। এ দোয়াও তাঁর হৈ দয়ালু হৃদয়ের পরিচায়ক, যে হৃদয় একান্ত বাধ্য না হলে কোথাও শক্তি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিল না। তবে সে হৃদয় ক্ষমা ও দয়া বিতরণে কখনো কার্পণ্য করেনি।

জারানায় ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল এবং ৪ হাজার উকিয়া রৌপ্য গণিমত হিসেবে হস্তগত হয়। এর মধ্য থেকে কোরআনের বিধান অনুসারে এক পঞ্চমাংশ সমাজের অভাবী শ্রেণীর জন্য ও সমষ্টিক প্রয়োজনের জন্য বাইতুলমালে জমা করা হয়। আর বাদবাকী সব সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এভাবে গণিমত হস্তগত করা একদিকে যেমন শত্রুপক্ষের আর্থিক ও সামরিক শক্তি হ্রাস করার একটা উৎকৃষ্ট পন্থা, অপর দিকে তেমনি শত শত বছর ধরে সঞ্চিত সম্পদকে এই প্রথম বারের মত অবাধ বিতরণের সুযোগ পাওয়া গেল এবং ধনী ও গরীব গোত্রসমূহের পুরানো অর্থনৈতিক বৈষ্যম্য দূর হবার অবকাশ সৃষ্টি হলো।

কোরআন যাকাতের অর্থ বিতরণের জন্য 'চিত্ত আকর্ষণ' বা 'তালীফুল কালব' শীর্ষক একটা খাত বরাদ্দ করেছে। (এর পারিভাষিক অর্থ হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে যে সমস্ত ব্যক্তিকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সহনশীল বা সহানুভূতিশীল করা প্রয়োজন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা– অনুবাদক) এই খাতের আওতায় রসূল সা. মক্কার অধিবাসীদেরকে ও তাদের নেতৃবৃন্দকে মুক্ত হস্তে অনেক অর্থসম্পদ দান করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনের জ্বালা প্রশমিত করা। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং গোটা সামাজিক পরিবেশ তাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের মত দুস্থ ও অসহায় পৃথিবীতে আর কেউ ছিলনা। রসূল সা. এ ঘনিষ্ঠ জন হয়েও যখন তারা পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর আনসার ও মোহাজেররা রসূল সা. এর ডান হাত ও বাম হাত হিসেবে অবস্থান করতেন, তখন তাদের অনুভূতি কেমন হতে পারে তা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহর আদালত দীর্ঘ দু'দশক ধরে প্রতিষ্ঠিত মামলার রায় ঘোষণা করলো। এ মামলায় কোরায়েশরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও হেরে গেল। তাই তাদের চেয়ে বড় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ সেদিন আর কেউ ছিলনা। তাদের পরাজয়ের গ্লানী ও হতাশা ভোলানোর ব্যবস্থা যদি না করা হতো, তাহলে তাদের হতাশা থেকে বারবার চাপা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠতো এবং তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোক দেখানো আনুগত্যের আড়ালে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ভেতরে ভেতরে সাবোটাজ করতে থাকতো। আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম, নাযর বিন হারিস, সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও আকরা বিন হারিসের মত শীর্ষস্থানীয় কোরায়েশ নেতারা আজ সেই ব্যক্তির কাছ থেকেই দান গ্রহণ করছে, যাকে তারা বহু বছর ধরে গাল দিয়েছে, মিথ্যুক বলেছে, ব্যংগ বিদ্রুপ করেছে, শারীরিক কষ্ট দিয়েছে, অবরোধ করেছে, হত্যা করতে চেয়েছে, ঘরবাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, এবং হিজরত করে চলে যাওয়ার পরও তাঁর বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে তাকে এক

মুহূর্ত শান্তিতে ও নিরাপদে থাকতে দেয়নি। এমন বিস্ময়কর দৃশ্য কে কোথায় দেখেছে? মানবতার সেবার এমন ক'টা দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবে?

বদান্যতা ও মহানুভবতার এমন উত্তাল সমুদ্র কোরায়েশ নেতাদের ওপর আছড়ে পড়ছে দেখে আনসারদের কারো কারো মনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো। তাদের মধ্যে কিছু কিছু হীন ভাবাবেগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, বংশীয় স্বজন প্রীতি ও মাতৃভূমির টানেই হয়তো রসূল সা. তাদেরকে এত খাতির তোয়াজ করছেন এবং আমাদেরকে অবহেলা করছেন। কেউ কেউ মুখ ফুটে বলে ফেললো, "ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করার বেলায় তো আমরাই আছি এবং আমাদের তরবারী দিয়ে এখনও রক্তের ফোঁটা টপকাচ্ছে। কিন্তু দান দক্ষিণার বেলায় আমাদের ওপর কোরায়েশরাই অগ্রাধিকার পেল।"

যাদের মাথায় এ ধরনের চিন্তাভাবনা কিলবিল করছিল, তারা এ কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করলোনা যে, রসূল সা. নিজ পরিবারভুক্তদেরকে এই দান দক্ষিণা দিচ্ছেননা। নিজের নিকটাত্মীয় মোহাজেরদেরকেও দিচ্ছেননা এবং নিজেও নিচ্ছেন না। এমতাবস্থায় কোরায়েশদের সাথে যদি একটু বিশেষ ধরনের আচরণ করা হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তার পেছনে কোন বৃহত্তর কল্যাণ রয়েছে।

বিষয়টা যখন রসূল সা. এর কানে গেল, তখন একটা শামিয়ানা টানানো হলো এবং সেখানে আনসারদেরকে ডাকা হলো। রসূল সা. তাদের সামনে এক মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। (এই ভাষণ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে।) এ ভাষণের শেষ বাক্যটা ছিল এ রকম: "হে আনসার! তোমাদের কাছে কি এটা পছন্দীয় নয় যে, অন্যরা উট ছাগল নিয়ে যাক, আর তোমরা মুহাম্মদ সা. কে সাথে নিয়ে যাও?" এ ভাষণ শুনতে শুনতে আনসারদের চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছিল। শেষের বাক্যটি শুনে তারা চিৎকার করে বলে উঠলো, "আমাদের জন্য শুধু মুহাম্মদই সা. যথেষ্ট।" এরপর তিনি কোমল ভাষায় তাদেরকে বুঝালেন কোন্ কোন্ কারণে কোরায়েশদের মনভোলানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এদিকে ছ' হাজার যুদ্ধবন্দী তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অপেক্ষায় ছিল। রসূল সা. পুরো দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন যে, কেউ এসে তাদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য পেশ করে কিনা। এ জন্য তিনি গণিমতের ভাগবাটোয়ারাও স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু কেউ যখন এলনা, তখন ভাগবাটোয়ারা হয়ে গেল। ভাগবাটোয়ারার পর রসূল সা. এর দুধমাতা হালীমা সা'দিয়ার গোত্রের মান্যগণ্য লোকদের একটা দল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এল। দলনেতা যোহায়ের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বললো ঃ

"যে মহিলারা এখানে ছাপড়ায় আটক রয়েছে, তাদের ভেতরে আপনার ফুফুরাও আছে, খালারাও আছে। আল্লাহর কসম, আরবের কোন রাজাও যদি আমাদের গোত্রের কোন মহিলার দুধ পান করতো, তবে তার কাছেও আমরা অনেক কিছু আশা করতাম। তবে আপনার কাছ থেকে আমরা আরো বেশী আশা করি।"

রসূল সা. তাদেরকে বুঝালেন যে, আমি নিজেই দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় ছিলাম যে, কোন দাবীদার আসে কিনা। শেষ পর্যন্ত কেউ না আসায় বাধ্য হয়ে বন্টন করে দিয়েছি। এখন যে সব বন্দীকে বনু হাশেমের লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে, তাদেরকে তো আমি এই মুহূর্তেই তোমার হাতে অর্পন করছি। অন্যদের জন্য নামাযের পর মুসলমানদের বৃহত্তর সমাবেশে তুমি বক্তব্য রাখবে। নামাযের পর যোহায়ের তার বক্তব্য পেশ করলো। রসূল সা. বললেন, "আমি শুধু আমার গোত্র (বনু হাশেম) সম্পর্কে দায়িত্ব নিতে পারি। তবে সকল মুসলমানকে আমি সুপারিশ করছি।" তৎক্ষণাত সকল আনসার ও মোহাজের বলে উঠলোঃ "আমাদের অংশও আমরা মুক্ত করে দিচ্ছি।" কেবল বনু সুলায়েম ও বনু ফাযারার কাছে বিজিত শত্রুদের আটককৃত যুদ্ধবন্দী বিনা মূল্যে স্বাধীন করে দেয়ার ব্যাপারটা অভিনব মনে হলো এবং তারা ইতস্তত করতে লাগলো। অবশেষে রসূল সা. বন্দীপ্রতি ৬টি করে উট দিয়ে বাদবাকী বন্দিদেরকেও মুক্ত করিয়ে আনলেন। এভাবে ৬ হাজার যুদ্ধবন্দীর সবাই মুক্ত হয়ে গেল। বহু বন্দীকে রসূল সা. পোশাকও দিলেন। সাধারণ বিজেতাদের যা কল্পনারও বাইরে, সেটাই এখানে সংঘটিত হলো। বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া হলো। কেননা লোকদেরকে হত্যা করা বা গোলাম বানানো তার আসল উদ্দেশ্য ছিলনা। আসল উদ্দেশ্য ছিল সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মনকে তার জন্য প্রস্তুত করা।

এই কাজ সম্পন্ন করে তিনি ওমরা করলেন এবং ইতাব বিন উসাইদকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মদিনায় চলে গেলেন।

মক্কা বিজয়ের পর

আমার মতে, মক্কা বিজয়ের পরবর্তী হোনায়েন যুদ্ধে ইসলাম বিরোধী নাশকতাবাদী শক্তি অভ্যন্তরীণভাবে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। এ যুদ্ধের পর আরবের ভাগ্যে ইসলামী বিধান চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। অন্য কারো জন্য সামনে অগ্রসর হবার কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকেনি। এরপরও ছোট ছোট কয়েকটা সামরিক ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত দুষ্কৃতিকারীদের দমন ও আইন শৃংখলা পুনর্বহালের জন্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। তবে সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়।

বনু তামীম গোত্র অন্য কয়েকটা গোত্রকে প্ররোচিত করে ইসলামী সরকারের রাজস্ব আদায় বন্ধ করে দিয়েছিল। এটা ছিল একটা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। উয়াইনা বিন হিসনকে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য সমেত পাঠানো হয়। হামলা হওয়া মাত্রই বনু তামীম পালিয়ে যায়। কয়েকজনকে বন্দী করে মদিনায় আনা হয় এবং পরে মুক্তি দেয়া হয়।

খাসয়াম গোত্র (তাবালা অঞ্চলের অধীবাসী) বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিল। কাতবা বিন আমেরের নেতৃত্বে ২০ জন সৈন্যের একটা সেনাদল তাদের দমনের জন্য পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। কিছু লোককে বন্দী করা হয়। কিন্তু রসূল সা. পরে তাদেরকে ছেড়ে দেন।

হযরত দাহাককে বনু কিলাবের কাছে পাঠানো হয়। তাঁর সাথে ছিল একই গোত্রের আসীদ বিন সালমাও। এ দলটা ছিল প্রধানত দাওয়াতী ও শিক্ষামূলক দল। গোত্রের লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। আসীদের পিতা নিহত হয়। এ সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি।

একবার জানা গেল আবিসিনিয়ার কিছু নৌদস্যু জেদ্দায় সমবেত হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা কারশী (বা আলকামা বিন মুজাযযাজ) তিনশো সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে রওনা হতেই দস্যুরা পালিয়ে যায়।

নবম হিজরীর রবিউস সানী মাসে হযরত আলী রা.কে দেড়শো অশ্বারোহী সৈন্য সমেত বনী তাঈ গোত্রে পাঠানো হলো এবং নির্দেশ দেয়া হলো ওখানকার বড় মন্দিরটাকে ধ্বংস করে দিতে। এখানে বিষয়টার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র ছিল। এ রাষ্ট্র যে মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ তার বিরোধী আকীদা বিশ্বাস পোষণ করলে তা ঐ রাষ্ট্র বরদাশত করতে পারতো। কিন্তু এই মৌলিক আকীদা বিশ্বাস তথা তাওহীদ রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সে কিভাবে চলতে দিতে পারে? এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে প্রাগৈতিহাসিক আরবের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় সেখানকার মূর্তিগুলো ছিল জীবন্ত প্রেরণার উৎস স্বরূপ। ঐ সব মূর্তির অস্তিত্ব কল্পনা করতেই এমন মানসিক ভাবাবেগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হতো, যা জাহেলী সমাজের লোকদেরকে উস্কানী দিয়ে দিয়ে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতো। এই সব মূর্তির নামে বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রেক্ষাপটে জাহেলী যুগের মন্দিরগুলোকে সামষ্টিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বহাল রাখা এবং পৌত্তলিক চিন্তাধারাকে বারবার অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টির সুযোগ দেয়া কোনমতেই যুক্তিসংগত কাজ হতোনা। এই মূর্তিগুলো প্রকৃত পক্ষে একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতার প্রতীক এবং একটা বাতিল জীবন ব্যবস্থার নিদর্শন ছিল। তাই বনী তাই গোত্রের মন্দির ধ্বংসের এই পদক্ষেপকে কোন স্বীকৃত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের পর্যায়ভুক্ত বলা যাবেনা, বরং এটা ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টিকারী প্রবণতা থেকে পরিবেশকে মুক্ত করার একটা অনিবার্য পদক্ষেপ ছিল। ব্যাপারটা কার্যত কেবল আদর্শিক পর্যায়েই যে সীমাবদ্ধ ছিল; তাও নয়। তাঈ গোত্র পৌত্তলিক আকীদা বিশ্বাস দ্বারা তাড়িত হয়ে কিছু বিদ্রোহী মনোভাবও পোষণ করতে আরম্ভ করেছিল। মদিনার সাথে টক্কর দেয়ার চিন্তাভাবনা তাদের ভেতরে যথেষ্ট পেকে উঠেছিল। এর অকাট্য প্রমাণ এইযে, হাতেম তাঈ এর খ্যাতনামা পরিবারে তার ছেলে আদী ইবনে হাতেম স্বয়ং এ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক বাহক পশু ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিল। আদীর মত ঐ গোত্রে আরো অনেকেই যে এ ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল তা বিচিত্র কিছু ছিলনা।

যাহোক, হযরত আলী কুল্‌স নামক স্থানে পৌঁছে সকাল বেলাই আক্রমণ চালালেন। আদী বিন হাতেম কিছু শক্তি সংগ্রহ করে আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া পালিয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা সামান্য প্রতিরোধ করেছিল। তাদের মন্দির ভেংগে ফেলা হলো। আদীর বোনসহ আরো কয়েকজনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হলো এবং কিছু পশু ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা হলো। আদীর বোন রসূল সা. এর কাছে নিজের মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলো। সে বললো ঃ "আমার বাবা মারা গেছেন। আমার প্রহরী আমাকে ছেড়ে পালিয়ে

গেছে। আমি বৃদ্ধা ও দুর্বল। কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার ওপর অনুগ্রহ করবে।" রসূল সা. এই মহিলার ইচ্ছা অনুযায়ী তার জন্য বাহক পশুর ব্যবস্থা করলেন এবং তাকে মুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন। এই মহিলা বাড়ী গিয়ে তার ভাইকে রসূল সা. এর মধুর স্বভাব ও আচরণের কথা জানালো। সে বললো, "অবিকল আমাদের পিতার মত আচরণ দেখে এলাম। অমুক এলে তার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ দেখানো হলো, অমুক এলে তাকে এরূপ বদান্যতা প্রদর্শন করা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। রসূল সা. এর সাথে যুদ্ধ করার চিন্তা ছেড়ে দাও। নিজে যাও। দেখবে কত উপকার লাভ করবে।" এর অল্প কিছুদিন পরই আদী ইবনে হাতেম মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলো।

দুটো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ

রসূল সা. এর জীবদ্দশায় যে আসল কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল, তা ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও ইসলামী বিপ্লবের পূর্ণতা সাধনের কাজ। কিন্তু তিনি আশপাশের দেশগুলোর শাসকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আন্দোলনের আন্তর্জাতিক যুগের সূচনা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করেন। একজন দূতের নাম হলো হারেস বিন উমায়ের আয্দী। তাঁকে সিরিয়ার খৃষ্টান শাসকের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু খৃষ্টান শাসক শুরাহ্বীল বিন আমের গাসসানী রসূল সা. এর এই দূতকে পথিমধ্যেই হত্যা করে। এ কাজটা ছিল মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও সমকালীন প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের এমন জঘন্য লংঘন, যাকে কোন সরকার নীরবে বরদাশত করলে সে সরকারের কোন মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকতোনা। এ জন্য ৮ম হিজরীতে রসূল সা. স্বীয় মুক্ত গোলাম যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন। এক ব্যক্তি গোলামীর অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে কিভাবে সেনাপতি হয়ে গেল এবং ইসলামী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো, সেটাই এ ঘটনায় পরিস্ফুট হয়েছে। এই যায়েদ বিন হারেসার ছেলে উসামাকেও রসূল সা. জীবনের শেষ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই বাহিনীকে বিদায় জানাতে রসূল সা. স্বয়ং সানিয়াতুল ওদা পর্যন্ত যান। বাহিনী যখন মুয়ান নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন জানা গেল যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া সফরে এসেছে এবং ঐ অঞ্চলের প্রায় এক লাখ খৃষ্টান সৈন্য তার সাথে রয়েছে। ইতিপূর্বে মুসলিম বাহিনীর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের যে প্রস্তাব বিবেচনাধীন ছিল, সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলো এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সামনে অগ্রসর হতেই মাশারেফ নামক স্থানে শত্রুর এক বিরাট বাহিনীর সাথে সাক্ষাত হলো এবং তুমুল লড়াই হলো। যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হলেন। এরপর পতাকা বহন করলেন হযরত জাফর। জাফরের ডানহাত কেটে গেলে বাম হাত দিয়ে পতাকা ধরলেন। বাম হাতও কেটে গেলে বুকের ওপর রাখলেন। অবশেষে ৯০টি আঘাত খেয়ে শাহাদাত লাভ করলেন। এরপর রসূল সা. এর নির্দেশিত ধারাবাহিকতা অনুসারে পতাকাবাহী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। তিনিও যখন শহীদ হলেন, তখন সর্বসম্মত রায়ে সেনাপতি হলেন খালেদ ইবনুল ওলীদ। তিনি এমন দুর্ধর্ষতার সাথে যুদ্ধ করলেন যে, তার হাতে একে একে ৯ খানা তরবারী ভেঙ্গে গেল। অবশেষে

শত্রুসৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হলো। হযরত খালেদ বাহিনীকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন। মোট ১২ ব্যক্তি এই যুদ্ধে শহীদ হন। শহীদদের মধ্যে খুবই মূল্যবান ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মুসলমানরা সাময়িকভাবে এই বিজয়কে যথেষ্ট মনে করলেন। কেননা শত্রুর সৈন্য সংখ্যা খুবই বেশী ছিল, স্থানটা ছিল বিদেশ এবং পরিস্থিতি ছিল একেবারেই অপরিচিত। রসদের ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল এবং বাড়তি সৈন্য আনারও কোন আশা ছিলনা। এ জন্য এই বাহিনী মদিনায় ফিরে এল। রসূল সা. ও মুসলমানগণ মদিনা থেকে বেরিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। কেউ কেউ কৌতুক করে এই বাহিনীকে "ফেরারী" বলে আখ্যায়িত করলে রসূল সা. বললেন, না "ফেরারী" নয়, এর "কেরারী", অর্থাৎ তারা পুনরায় যুদ্ধে যাবে। হযরত খালেদ এই যুদ্ধে যে কৃতিত্ব দেখান, সে অনুসারে তাকে 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারী' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

এই পর্যায়ে দ্বিতীয় অভিযান ছিল তবুক অভিযান।

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীর রজব মাস চলছে। সিরিয়া থেকে আগত এক কাফেলা খবর দিল যে, রোম সম্রাটের সৈন্যরা মদিনার ওপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। রোম সাম্রাজ্য তৎকালীন দুনিয়ার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিছুদিন আগে এ সাম্রাজ্য ইরানকেও ঘায়েল করেছিল। রসূল সা. ও মুসলমানগণ সারা পৃথিবীতে ঈমান ও সততার আলো ছড়ানোর জন্য মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে একটা আলোর মিনার হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। অনেক পরিশ্রমের গড়া এই ইসলামী রাষ্ট্রকে তারা ধ্বংস হতে দিতে পারেন না। কেননা এই রাষ্ট্রই ছিল তাদের দ্বীন দুনিয়া, তাদের ধন সম্পদ ও আত্মীয় স্বজন সব কিছু। তাই তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেল। স্থির হলো যে, কায়সারের সৈন্যরা আরবের ভূমিতে প্রবেশের আগেই অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হবে, যাতে এই ভূখন্ডে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে না পারে। সময়টা ছিল প্রচন্ড গরম, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও শোচনীয় দারিদ্রের। রসূল সা. যুদ্ধের চাঁদার জন্য আবেদন জানালেন। মুসলমানরা এ আবেদনের এমন স্মরণীয় জবাব দিল যে, তা বিশ্বমানবতাকে চিরদিন মূল্যবান প্রেরণা যোগাতে থাকবে। হযরত উসমান ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া, ও এক হাজার দিনার দান করলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ৪০ হাজার দিরহাম দিলেন। হযরত ওমর নিজের সহায় সম্পদের বেশী অর্ধেক হাজির করলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক পুরো ঘর খালি করে নিজের যথা সর্বস্ব এনে জমা দিলেন। দানের প্রতিযোগিতায় তাঁর পাল্লা সবার চেয়ে ভারী হয়ে গেল। তবে সবচেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার সম্ভবত একজন দরিদ্র দিনমজুর আনসারী করেছিলেন, যিনি সারা দিন পানি বহন করে পাওয়া মজুরী দু'ভাগ করে অর্ধেক পরিবারের জন্য রেখে বাকী অর্ধেক রসূল সা. এর কাছে হাজির করে দেন। রসূল সা. তাঁর দেয়া জিনিসগুলোকে অন্যদের দেয়া সমস্ত মূল্যবান জিনিসের ওপর ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসলিম মহিলারা জেহাদের ফান্ডে নিজেদের অলংকারাদি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন।

দশ হাজার ঘোড়াসমেত ৩০ হাজার সৈন্য তবুক অভিযানে রওনা হয়। মদিনার উপকণ্ঠে ছানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে বসেই সৈনিকদের শ্রেণী বিন্যাস, সেনাপতি নিয়োগ ও পতাকা

বন্টনের কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। তবুক পৌঁছার পর জানা গেল, শত্রুরা আরবের ওপর হামলা করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। আসলে তাদেরকে কে যেন ভুল খবর দিয়েছিল যে, মদিনার নবী সা. মারা গেছেন। (নাউজুবিল্লাহ) এজন্য তারা ভেবেছিল যে এখন হামলা করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে। পরে যখন তারা জেনেছে, নবীও জীবিত আছেন এবং মদিনাও জীবিত, তখন তাদের আগ্রাসী উচ্চাভিলাষ স্তব্ধ হয়ে গেছে। যাহোক, এই সামরিক অভিযানের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল খুবই সন্তোষজনক। রসূল সা. একমাস পর্যন্ত তবুকে সেনা শিবির বহাল রেখে অবস্থান করেন। এই সময় চতুর্দিকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কাজ সাফল্যজনকভাবে চলতে থাকে। আয়লার শাসনকর্তা এসে সাক্ষাত করে এবং জিযিয়া দিতে সম্মত হয়ে আপোষমূলক সম্পর্কের সূচনা করে। জারাবা ও আযরাদের অধিবাসীরাও এসে জিযিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। দুমাতুল জান্দালের সমস্যা বহু দিন ধরে রসূল সা. এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদকে চারশোরও বেশী সৈন্যসহকারে জুমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দারের কাছে পাঠানো হয়। সে ও তার ভাই শিকার করছিল। তার ভাই মারা গেল এবং উকায়দার গ্রেফতার হলো। জিযিয়ার ভিত্তিতে তার সাথে সন্ধি হয়। রসূল সা. তাকে দুমাতুল জান্দাল, আইলা, তায়মা ও তবুকের জন্য মদিনার সরকারের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং এই মর্মে লিখিত সনদ অর্পণ করেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত খালেদ সুকৌশলে বিনাযুদ্ধে দুমাতুল জান্দালের দূর্গ দখল ও মূল্যবান গনিমত অর্জন করেন। রসূল সা. তবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করলে মদিনায় তাঁকে জাকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই অভিযান সম্পর্কে মোনাফেকরা যে সব চক্রান্ত চালায়, সেগুলো আমি ইতিপূর্বে একটা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। প্রচুর সংখ্যক (প্রায় ৮০ জন) মোনাফেক মদিনায় বসেছিল। তাদেরকে যখন তবুকে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা নানা রকম মনগড়া ওজুহাত খাড়া করে। রসূল সা. তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তবে কিছু কিছু নিষ্ঠাবান মুমিনও থেকে গিয়েছিল। আবু খায়সামা এদেরই একজন গণ্য হয়েছেন। তিনি মদিনায় থেকে গেলেও সহসাই তার ভেতরে সম্বিত ফিরে আসে। রসূল সা. রওনা হয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পর একদিন প্রচন্ড গরমে স্ত্রীর সাথে গাছগাছালির শীতল ছায়ায় আরাম করতে এলেন। সেখানে তিনি পানি ছিটানোর ব্যবস্থা ও ভোজনের আয়োজন করে রেখেছিলেন। সহসা খেয়াল হলো এবং স্ত্রীকে বললেন, "হায়, রসূল সা. রোদে ধূলায় ও গরমে কষ্ট পাচ্ছেন, আর আমি আবু খাইসামা কিনা সুশীতল ছায় সুন্দরী স্ত্রীর সাথে মজার মজার খাবার খাচ্ছি। এটা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত নয়' আল্লাহর কসম, আমি স্ত্রীদের কক্ষে যাবনা। আমার জন্য সফরের আয়োজন করা হোক।" উট আনিয়েই তাতে চড়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং অনেক দূরে গিয়ে তিনি বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু তিনজন মুমিন কা'ব বিন মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রবী যাই যাই করেও যেতে পারেননি। তাদেরকে রসূল সা. না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমাদের ক্রটি হয়ে গেছে। রসূল সা. আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদেরকে সমাজ থেকে পৃথক এবং নিজ নিজ স্ত্রী থেকে দূরে থাকার আদেশ দেন। এটা ছিল এক ধরনের নির্জন কারাবাসের শাস্তি। তাদের হাত পায়েও

শেকল পরানো হয়নি, তাদেরকে কোন আলাদা কারাকক্ষেও আটকানো হয়নি। সামষ্টিক জীবন থেকে আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন শাস্তি। তাও এমনভাবে যে সমস্ত কড়াকড়ি স্বয়ং আসামীকেই নিজের ওপর প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু তারা আনুগত্যের এমন বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমনকি বিষয়টা গাসসানী খৃষ্টান শাসক যখন জানতে পারলো, তখন সে একটা চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক সুযোগ ভেবে কা'ব বিন মালেককে চিঠি লেখে যে, "তোমাদের নবী তোমাদের ওপর যুলুম করেছে। অথচ তোমরা খুবই মূল্যবান লোক। তোমরা আমাদের কাছে চলে আসলে আমরা তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেব।" এটা ছিল একটা কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু কা'ব এই চিঠিকে চুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। অবশেষে পুরো ৫০ দিন পর ওহি নাযিল হয়ে তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দরুন তাদের তওবা কবুল করার কথা ঘোষণা করে। এতে মদিনায় আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সর্ব দিক থেকে লোকেরা মোবারকবাদসহ ঐ তিনজনকে সুসংবাদ দিতে দিতে ছুটে আসে। হযরত কা'ব তাঁর তওবা কবুল হওয়ার আনন্দে আধিকাংশ সম্পদ ছদকা করে দেন। এ রকমই ছিল ইসলামী আন্দোলনের গড়া মানুষের চরিত্র।

তবুক সফরকালেই আব্দুল্লাহ যুলবিজাদাইন ইন্তিকাল করেন। রসূল সা. এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এই যুবক। তিনি খুবই বিপ্লবী আবেগ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তরুণ বয়সেই তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার মন প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চাচার ভয়ে নিজের মনোভাব চেপে রাখেন। অবশেষে রসূল সা. যখন মক্কা জয় করে ফিরে এলেন, তখন তিনি তাঁর চাচাকে বললেন ঃ

"প্রিয় চাচাজান, আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম কখন আপনার মনে ইসলামী চেতনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আপনি যেমন ছিলেন তেমনি রয়ে গেলেন। এখন আমাকে মুসলমান হওয়ার অনুমতি দিন।"

পাষাণ হৃদয় চাচা জবাব দিল ঃ "তুমি যদি মুহাম্মদের সা. দাওয়াত গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে সমস্ত সহায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবো। এমনকি তোমার পরনের কাপড়ও কেড়ে নেব।" আব্দুল্লাহ বললেন, "চাচা, আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। মূর্তিপূজা এখন আমার আর ভালো লাগেনা। কাজেই এখন আমি অবশ্যই মুসলমান হব। আপনার সমস্ত সহায়সম্পদ আপনি নিয়ে নিন।" এই বলে পরনের কাপড় পর্যন্ত খুলে দিলেন। তার মা তার শরীর ঢাকবার জন্য একটা কম্বল দিল। কম্বল দুভাগ করে তিনি অর্ধেক দিয়ে লুংগি বানালেন এবং অর্ধেক দিয়ে দেহের ওপরের অংশ ঢাকলেন। এই অবস্থায় তিনি মদিনায় রসূল সা. এর কাছে হাজির হলেন এবং 'আসহাবে সুফফা' দলে যোগদান করলেন। এই বিপ্লবী যুবক জেহাদের আবেগে উদ্দীপিত হয়ে রসূল সা. এর সাথে তবুক রওনা হলেন। সেখানে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর দাফন কাফন সম্পন্ন হয়। হযরত বিলাল বাতি উঁচু করে ধরলেন। রসূল সা. স্বয়ং এবং আবু বকর ও ওমর রা. কবরে নামেন। রসূল সা. তাদেরকে বলেন, "তোমাদের ভাই এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ।" রসূল সা. স্বহস্তে তার কবরে ইট রাখেন। অতপর দোয়া করেন, "হে আল্লাহ, আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও আমি তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলাম। তুমিও তার ওপর সন্তুষ্ট থাক।"

আব্দুল্লাহর এত কদর দেখে ইবনে মাসউদ রা. আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "হায়, এই কবরে যদি আমি যেতে পারতাম!"

মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমি মদিনার ইসলামী সরকারের গৃহীত সব ক'টা সামরিক পদক্ষেপ বর্ণনা করেছি। এই যুদ্ধ-বিগ্রহগুলো এবং যে পরিস্থিতিতে এগুলো করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, তা মনে রাখলে এ কথা অস্বীকার করার অবকাশ থাকেনা যে, রসূল সা. সংঘাত সংঘর্ষ এড়িয়ে গঠনমূলক কাজ করতে বদ্ধপরিকর থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুরা নেহাৎ জোর করেই যুদ্ধের ময়দানে টেনে এনেছিলো। যে ব্যক্তি ক্ষমতার মসনদের পরিবর্তে কেবল সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, যিনি তরবারীর জোরে প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টির পরিবর্তে যুক্তি ও চরিত্র দ্বারা গোটা দুনিয়াকে জয় করতে চেয়েছিলেন, যিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা এবং হিংসা ও বলপ্রয়োগের পরিবর্তে নম্র ব্যবহার ও সদাচারের পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং যিনি রক্ত ঝরানো তরবারীর পরিবর্তে চুক্তি লিপিবদ্ধকারী কলম দিয়ে বিরোধ মীমাংসার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন, সেই মহামানবকে তারা আট নয় বছরের মধ্যে একটা মুহূর্তও শান্তিতে বাস করতে দেয়নি। এহেন পরিস্থিতিতেও রসূল সা. ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দেয়ার সেই অসাধারণ গঠনমূলক কাজ কিভাবে সম্পন্ন করলেন, ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। রসূল সা. এর গঠনমূলক কাজের বিস্তারিত বিবরণ আমি এ পুস্তকের একটা পৃথক অধ্যায়ে তুলে ধরবো ইনশায়াল্লাহ।

বস্তুত রসূল সা. এ দিক দিয়ে মানবতার সবচেয়ে বড় উপকারী বন্ধু ছিলেন যে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা প্রথমে সারা আরবে এবং পরে সারা পৃথিবীতে পৌঁছানোর জন্য তলোয়ারের ভেতর থেকেও নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ খুজে নেন। চরম দাঙ্গাবাজ শত্রুদের প্রতিরোধব্যুহ ভেঙ্গে ন্যায় ও সত্যের বিধানকে প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণতা দান করেন। নচেত অন্য কেউ যদি হতো, সে শত্রুর যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ শুনে নিজস্ব সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতো। তাহলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার স্মৃতি ইতিহাস থেকে মুছে না গেলেও তাকে আমরা বড় জোর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে উপস্থিত দেখতে পেতাম, একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আকারে তাকে আমরা কল্পনা করতে পারতাম না। সে ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়ায় অন্যান্য ধর্মের মতই ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নিছক একটা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ধর্ম হিসেবে টিকে থাকতো। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তার কোন সংশ্রব থাকতোনা। এ ধরনের ইসলামের আওতায় যত উচ্চাংগের সাধু সজ্জনই তৈরী হোক না কেন, তারা প্রত্যেক কুফরি, বাতিল, অত্যাচারী ও শোষক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সহযোগীতে পরিণত হতো। সে ক্ষেত্রে মানব সমাজ সামাজিক যুলুম শোষণ ও দুর্নীতি উচ্ছেদের কোন প্রেরণা রসূল সা. এর কাছ থেকে পেতনা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বিশ্ববাসী ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও মংগল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রসূল সা. কত দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নিপীড়ন সহ্য করেছেন, কত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রুদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেক যুলুমবাজ ও দুর্নীতিবাজ শক্তিকে দমন করেছেন, ছত্রভংগ গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তাদেরকে জাহেলী নেতৃত্ব থেকে

নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ও পরিশুদ্ধ করেছেন। শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলেছেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজকে ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচারের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরামর্শ ভিত্তিক করে গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা করেছেন।

এটাও রসূল সা. এর সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতার পরিচায়ক যে, এত যুদ্ধ করলেন এবং এত সেনাদল পাঠালেন, কিন্তু তাতে সর্বনিম্ন পরিমাণ রক্তপাত ঘটেছে ও সর্বনিম্ন পরিমাণ প্রাণ নাশ হয়েছে। এত কম রক্ত ঝরিয়ে আরবের মত বিশাল ভূখন্ডে সর্বপ্রথম একটা আদর্শবাদী একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা মানবেতিহাসের একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজ আমাদের প্রতিটি মানুষ, এ সত্যটা জানুক বা না জানুক, তাঁর অনুগ্রহের কাছে ঋণী। তিনি যদি মুষ্টিমেয় সংখ্যক দলকে সাথে নিয়ে যুলুমের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতেন, তা হলে আমরা জীবনে সফলতা লাভের যে মূলনীতি, যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং যে নৈতিক ঐতিহ্য তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, মনুষ্যত্বের যে দৃষ্টান্ত তাঁর মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সর্বোত্তম ভারসাম্যপূর্ণ রূপকাঠামো তিনি নির্মাণ করে দেখিয়েছেন, সেই সব অমূল্য সম্পদ আমাদের কপালে কোনকালেও জুটতোনা। রসূল সা. তাঁর যে উৎকৃষ্টতম ও প্রিয়তম সাথীদেরকে পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে কুরবানী করেছেন, তাদেরই রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীতে নতুন প্রভাতের সূচনা হয়েছে। আল্লাহ মুহাম্মদ সা. ও তাঁর অনুসারীদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

❊

আলো ছড়িয়ে পড়লো সবখানে

❊

ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি

এ বিশ্বে অনেকেই তরবারীর জোরে বহু ভূখন্ডের মালিক হয়েছে। অনেক রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র নিছক অস্ত্র বল ও বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বার্থ সংক্রান্ত টানাপোড়েনের অনেক ফায়সালা রণাঙ্গনেও হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের যে কোন বিপ্লবী আন্দোলনকে নিজের ভাগ্যের ফায়সালা সব সময় জনমতের আওতায় থেকেই করতে হয়। মানুষের হৃদয় যতক্ষণ ভেতর থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে কোন দাওয়াতের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত না হয় এবং নিজের চরিত্র ও মানসিকতাকে তার আলোকে গড়ে তুলতে রাজি না হয়, ততক্ষণ নিছক বলপ্রয়োগ করে সমর্থন আদায় করা লাভজনক হতে পারেনা। বরঞ্চ সেটা হয় তার মারাত্মক ধ্বংসের কারণ। তাই প্রত্যেক আদর্শবাদী আন্দোলনের আসল প্রকৃতি ও মেজাজ হয়ে থাকে আবেদন ও শিক্ষামূলক। আর তার পরিচালকদের মধ্যে সক্রিয় থাকে মুরব্বী সুলভ ও গুরুজনসুলভ স্নেহ মমতা ও প্রেরণা। আদর্শবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিতে জীবন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুল্য এবং সমাজের সব মানুষ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র স্বরূপ। এই ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এবং দুর্বৃত্তদের সংশোধন এবং কু-প্রভাব থেকে সমাজের ভদ্র ও মধ্যম পন্থী শ্রেণীর লোকদের নিরাপদে রাখার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও মাঝে মাঝে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সামগ্রিক পরিবেশ সব সময় ছাত্রদের জন্য স্নেহ-মমতা ও করুণার পরিবেশ হয়ে থাকে এবং উস্তাদের শাস্তিমূলক পদক্ষেপেও মুরুব্বীসুলভ মনোভাবই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। সত্যের বাণী ও সততার দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর যে পবিত্র বান্দারা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুষ্কৃতি, দুর্নীতি ও অসততার উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তরবারীকে আংশিকভাবে শিক্ষা দানের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাদের সামগ্রিক কাজ সব সময় মুরব্বী ও স্নেহময় শিক্ষকের মনোভাব নিয়ে অবিকল শিক্ষাদানের ভংগীতেই অব্যাহত থেকেছে। তারা যে আসল যুদ্ধটা করেছেন, তা যুক্তির অস্ত্র দিয়ে জনমতের বিশাল ও বিস্তৃত রণাঙ্গনেই করেছেন। সব সময়

তাদের নীতি এই ছিল যে, কেউ যদি নতুন জীবন লাভ করতে চায় তবে সে যেন তা যুক্তির মাধ্যমেই লাভ করে, আর যদি কেউ জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের জন্য মৃত্যু পছন্দ করে, তবে সেং যেন যুক্তির আলোকেই মৃত্যু বরণ করে।

রসূল সা.-এর সামরিক পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বদর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত (খয়বর বিজয়সহ) মোট পাঁচটি বড় আকারের যুদ্ধ হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই সব ক'টা যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। তন্মধ্যে প্রথম তিনটে তো হয়েছে শত্রুরা আগ্রাসন চালিয়ে মদিনার ওপর হানা দেয়ার কারণে। মদিনা থেকে সৈন্য নিয়ে গিয়ে নিজ উদ্যোগে রসূল সা. বড়জোর দুটো অভিযানই চালিয়েছেন ঃ একটা মক্কা বিজয়ের (হোনায়েন যুদ্ধসহ) অভিযান অপরটা খয়বর বিজয়ের অভিযান।

আর এই দুটো অভিযানেই চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। সময়ের দিক দিয়ে দেখলে বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মোট ছয় বছরের ব্যবধান। রসূল সা. তাঁর মহান শিক্ষামূলক, প্রচারমূলক, গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে মোট ২৩ বছর সময় কাটিয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ছ'টা বছর ছিল এমন, যখন শিক্ষামূলক কাজের পাশাপাশি বিরোধীদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাব ও আচরণের মোকাবিলাও করতে হয়েছে। সর্বাধিক অতিরঞ্জিত করেও যদি অনুমান করা হয়, তবুও মনে হয়, সব ক'টা যুদ্ধে সর্বমোট ১৫ হাজারের চেয়ে বেশী লোক রসূল সা. এর মোকাবিলায় আসেনি এবং তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৭৫৯ জীবনকে পথ থেকে সরানোর মাধ্যমে আরবের কয়েক লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণরূপে শুধরে যায়। দশ বছর ইতিহাসে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়। এত অল্প সময়ে আরবের ন্যায় মরুভূমিকে মানুষের জীবনের সঠিক কল্যাণের লক্ষ্যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী, চরম উচ্ছৃংখল, হিংস্র ও দাঙ্গাবাজ গোত্র ও ব্যক্তিবর্গকে এর আওতাভুক্ত করা, তারপর তাদেরকে সুমহান নৈতিক শিক্ষা দানে সাফল্য অর্জন করা এবং শুধু শিক্ষা দেয়া নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাদেরকে শিক্ষক ও উস্তাদে পরিণত করা সম্ভবত রসূল সা.-এর নবুয়তের সবচেয়ে বড় বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক প্রমাণ।

সুতরাং এ বিষয়টি সকল সন্দেহ ও বিতর্কের উর্ধ্বে যে, ইসলামের বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘাতের নিস্পত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহের যতটুকু অবদানই থাকুক না কেন, জনমতের অবদানই ছিল সর্বাধিক এবং জনমতের অংগনই ছিল নিস্পত্তির আসল অংগন। কিছুটা আধ্যাত্মিক ভাষায় যদি বলি তবে বলা যায়, মানুষের হৃদয় জয় করাই ছিল রসূল সা.-এর আসল বিজয় ও আসল সাফল্য। আরবের লক্ষ লক্ষ নর নারীকে তিনি যদি জয় করে থাকেন, তবে তাদের হৃদয়ই জয় করেছেন এবং তা করেছেন যুক্তি ও চরিত্রের অস্ত্র দিয়ে। এ বিষয়টা যে, সর্বদিক থেকে নিত্য নতুন প্রতিবন্ধকতার মুখেও অল্প দিনের মধ্যে দশ বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক আদম সন্তানকে ইসলামের অনুসারী বানানো কিভাবে সম্ভব হলো? আসল ব্যাপার হলো, দাওয়াত যদি সত্য ও সঠিক হয়, আন্দোলন যদি মানব কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং এর পতাকাবাহীরা যদি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান হয়, তবে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ বিপ্লবী কাফেলার জন্য অধিকতর সহায়ক হয়ে থাকে। প্রত্যেক বাধা এক একটা পথ প্রদর্শক হয়ে আসে।

এই জন্যেই যদিও সংখ্যালঘু দিয়েই সত্যের সূচনা হয়ে থাকে, কিন্তু তা সংখ্যাগুরুকে জয় করে থাকে। আসুন, এবার দেখা যাক, ইসলামী আন্দোলন কোন্ কোন্ শক্তিকে ব্যবহার করে জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা লাভে দ্রুত সাফল্য লাভ করেছিল।

যুক্তি প্রমাণের শক্তি

ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল যুক্তি প্রমাণের শক্তি। ইসলামী আন্দোলনের পরিবর্তে যদি রসূল সা. পীর মুরিদীর কোন ব্যবস্থা চালু করতেন, তাহলে শ্রোতাদের বিবেক বুদ্ধিকে অবশ করে দিতেন। প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মত নিছক ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ কোন ধর্ম যদি প্রবর্তন করতেন, তাহলে অলীক কল্পনা ও ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার প্রতি মানুষের ঝোঁক ও আগ্রহ বৃদ্ধি করতেন, আর বৈরাগ্যবাদী আধ্যাত্মিক দর্শন শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা যদি চালু করতেন, তাহলে তো চোখ কান ও মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু রসূল সা. যে ইসলামী আন্দোলন চালু করেন, তাতে এমন সচেতন লোকদের প্রয়োজন ছিল, যারা আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে পুরো একটা সভ্যতাকে গড়ে তুলতে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে। এজন্যই ইসলামী আন্দোলন যখন শুধু দাওয়াত পর্যায়ে ছিল, তখন সে মানুষের সুপ্ত বিবেকবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুললো। মনমগজকে ঝাঁকুনি ও ধাক্কা দিয়ে সচকিত করে তুললো। চোখ খুলে দেখতে ও কান খুলে শুনতে উদ্বুদ্ধ করলো। বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তাগবেষণা করতে উৎসাহ যোগালো। মানব সত্তার অভ্যন্তরের ও তার পারিপার্শিক জগতের পরিস্থিতির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করার শিক্ষা দিল। নিত্য নতুন প্রশ্ন তুলে চিন্তাধারাকে শানিত ও গতিশীল করলো। অন্ধ অনুকরণের বন্ধন ছিন্ন করলো। অর্থহীন রসম রেওয়াজের বিলুপ্তি ঘটালো। অতীত পূজা ও পুরুষানুক্রমিক রীতি প্রথার অন্ধ আনুগত্য বাতিল করলো। পশুর মত নির্বোধ মানুষের ভেতর থেকে বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টির কৌশল উদ্ভাবন করলো। অন্ধ বোবা ও বধির' শ্রেণীর লোকদের ঠোকা দিয়ে দিয়ে সচেতন করে তুললো এবং বিবেকবুদ্ধির মরিচা দূর করে দিল। এক কথায়, ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হলো, তা মানুষের ওপর জাহেলিয়াতের চাপিয়ে দেয়া বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার অবসান ঘটায়। এর ফলে যাদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত ও সচেতন হয়, তাদের সামনে সে জীবনের মৌলিক সত্যগুলোকে পেশ করে এবং নিজের শানিত যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তাদের প্রভাবিত করে এবং সত্যগুলোর প্রতি তাদের অটুট বিশ্বাস গড়ে তোলে।

ইসলামী আন্দোলন যখন একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, মালিক, জীবিকাদাতা, হুকুমদাতা, ও সুপথ প্রদর্শক হিসেবে পেশ করলো, তখন এমন বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে পেশ করলো যে, এর বিপরীত ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পনার হাতিয়ারগুলো ভোতা ও অকার্যকার হয়ে গেল। সে মানুষের বিবেচনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে দাওয়াত দিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর বিচিত্র সৃষ্টি, গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন, ঋতু ও আবহাওয়ার বিবর্তন, বৃষ্টি ও বাতাসের নিয়মবিধি, তরুলতার জন্ম ও বিকাশ বৃদ্ধির দৃশ্য, পশুপাখীর বংশবৃদ্ধি ও লালনপালন, মানবগোষ্ঠী সমূহের বৈচিত্র, সভ্যতা সমূহের উত্থান পতন এবং আপন সত্তা সমূহের গভীরতা পর্যবেক্ষণ করো ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। দেখবে, সর্বত্র অটল

আইন–কানুন চালু রয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অংশে একটা সুষ্ঠ ও সুশৃংখল শাসন কার্যকর রয়েছে। ছোট কিংবা বড় প্রতিটি ঘটনার কোন না কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিণতি নির্দিষ্ট রয়েছে। বিচিত্র সব পরস্পর বিরোধী বস্তু পরস্পর সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে। সমগ্র সৃষ্টির কারখানায় এক ধরনের সমন্বয় ও একাত্মতা বিরাজ করছে। একের মধ্যে বাঁধা রয়েছে অনেক। প্রতিটি জিনিস গতিশীলও বিকাশমান। কোথাও স্থবিরতা ও গতিহীনতা নেই। প্রতিটি বস্তু উৎকর্ষের দিকে ধাবমান। প্রতিটি উপকরণ ও কার্যকারণ কোন গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য দিয়ে চলেছে। অতঃপর প্রতিটি ফলাফল আবার আরেকটি ফলাফলের জন্য উপকরণে পরিণত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগতের এই আইন, এই শৃংখলা, এই সমন্বয়, এই সহযোগিতা, এই ঐক্যতান এবং এই বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা আপনা আপনি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার আকারে উদ্ভূত হয়নি। জিনিসগুলো নিজের পরিকল্পনা নিজে করেনা, নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনা এবং পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমেও পরস্পরকে সহযোগিতা করেনা। বরং সর্বোচ্চ, সদাসক্রিয়, স্বয়ম্ভু, সার্বভৌম, মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় স্রষ্টা আল্লাহই এগুলোর একমাত্র পরিচালক, ব্যবস্থাপক শাসক ও আইন রচয়িতা হিসাবে কাজ করে চলেছেন। মহাবিশ্বের সকল শক্তি ও বস্তু তাঁরই গুণগানে নিয়োজিত। সকল বস্তু তাঁরই সামনে সিজদারত। সকল সৃষ্টি তাঁরই প্রাকৃতিক আইনের অনুগত। বিশালাকায় সূর্য থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস তাঁরই দরবারে মাথা নুইয়ে রেখেছে। ইসলাম এ কথাও বলেছে যে, এত বড় সৃষ্টির এই বিশাল কারখানায় যদি একাধিক মালিক ও ব্যবস্থাপক থাকতো, তাহলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যেত এবং যে পারস্পরিক সহযোগিতা, একাত্মতা ও ঐকতান তোমরা মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান দেখতে পাচ্ছ, তা কোনক্রমেই কায়েম থাকতোনা। বিশ্ব প্রকৃতির এই বিশাল পুস্তকের পাতায় পাতায় শুধু তাঁর অস্তিত্বের নয়, বরং সেই সাথে তাঁর একত্ব ও তাঁর গুণাবলীর অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইসলামী আন্দোলন যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই মহাবিশ্ব সর্বোতভাবে আল্লাহর আইন ও বিধানের আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ এবং এর প্রতিটি অনুপরমাণু তাঁর সামনে 'মুসলিম' বা আত্মসমর্পিত দাস। কোন সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহর সামনে আনুগত্য, দাসত্ব ও আত্মসমর্পণের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা অবলম্বনের অবকাশ নেই। মানুষ যদি আল্লাহর অনুগত হয়,তবে সে সমগ্র বিশ্বজগতের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। তাদের সমাজ ও সভ্যতা ঠিক তেমনি নিরাপত্তা ও সহযোগিতার প্রতীকে পরিণত হবে, যেমন রয়েছে বস্তুর জগতে। আর যদি তারা আল্লাহর অবাধ্য তথা কাফের হয়, তাহলে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে তাদের সমাজ সভ্যতা বেখাপ্পা, বেমানান ও সংযোগহীন হয়ে যাবে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যে ভারসাম্য, ঐকতান ও সহযোগিতা বিরাজমান রয়েছে, মানব সমাজে তা থাকবেনা। অথচ এরই কারণে বিশ্বের সকল সৃষ্টি শান্তি ও নিরপত্তার মধ্য দিয়ে উন্নতি উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভ করছে। এ বিশ্বে মানুষের জন্যেও শান্তি ও নিরাপত্তার পথ এটাই যে, সে আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর আইনের অনুগত থাকবে। মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি, তাঁরই দেয়া জীবিকায় লালিত পালিত, তার দেহের প্রতিটি অংগ, এবং অংগের প্রতিটি অনুপরমাণু 'মুসলিম' হিসেবে আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের আনুগত্যের

অটুট শৃংখলে আবদ্ধ। সুতরাং মানুষের জন্য জীবন যাপনের কোন সরল ও সঠিক পথ যদি থেকে থাকে, তবে তা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যেরই পথ। মানুষ জন্ম সূত্রেই আল্লাহর দাস ও গোলাম এবং দাসত্বের অনুভূতি ও চেতনা তার মনমগজে আজন্ম লালিত।

ইসলামী আন্দোলন একই বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতাসহ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এ কথাও প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত বা দিক নির্দেশনা লাভ করা প্রত্যেক সৃষ্টিরই প্রয়োজন। কেননা তিনিই সকল জিনিসের ভাগ্যবিধাতা এবং মহাকাশে বিচরণশীল প্রতিটি বস্তুর কক্ষপথ ও গতিবিধি নির্ধারক। তিনিই বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট দান করেন। প্রত্যেক শক্তিকে তার উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করেন। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য কর্মপন্থা স্থির করেন। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মানুষও আল্লাহর দিকনির্দেশনার ঠিক তেমনি মুখাপেক্ষী, যেমন আলো, বাতাস ও পানি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে নিজের পথনির্দেশনা জানানোর জন্য ওহির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। এই ওহি নিষ্প্রাণ পদার্থের জন্য প্রাকৃতিক বাধ্যবাধকতা, উদ্ভিদের জন্য স্বতস্ফূর্ত প্রবৃদ্ধির ক্ষমতা, এবং জীবনের জন্য সহজাত প্রক্রিয়া। কিন্তু মানুষ যেহেতু চেতনা বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী, তাই তার জন্য ওহির সেই পূর্ণাংগ রূপই নির্ধারিত হয়েছে, যা দ্বারা তার বিবেকবুদ্ধিও চেতনাকে সম্বোধন করা হয়।

ইসলামী আন্দোলন স্বীয় আদর্শিক দাওয়াতের এ অংশটাকেও যুক্তির বলেই গ্রহণযোগ্য করেছে যে, এই বিশ্ব জগতে যখন কারণ ও ফলাফলের নিয়ম চালু রয়েছে, তখন মানুষের নৈতিক কর্মকাণ্ডেরও এই সর্বব্যাপী নিয়মের আওতায় একটা পরিণতি ও ফলাফল থাকা অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে যে প্রতিফল বিধান কার্যকর রয়েছে, সেটা দেখিয়ে সে প্রমাণ করেছে যে, মানুষের সামাজিক কর্মকান্ডও এই বিধানের আওতাধীন হওয়া অনিবার্য। এই সাথে সে এটাও দেখিয়েছে যে, মানুষের সীমিত পরিসরের ইহকালীন জীবনে সীমিত প্রতিফল বিধানের অধীন পরিপূর্ণ কর্মফল প্রকাশ পায়না। এমনকি অনেক সময় একটামাত্র কর্মধারারও পূর্ণতা অর্জিত হয়না। তাছাড়া অনেক সময় মানুষকে একেবারে বিপরীত ফলাফলও ভোগ করতে হয়। সুতরাং আল্লাহর এই সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থার কাছ থেকে আশা করা উচিত যে, পার্থিব জীবনের পর একটা নতুন জীবনের আবির্ভাব ঘটবে এবং তখন মানুষকে তার পূর্ণ কর্মফল ভোগ করতে হবে। সর্বত্র ক্রিয়াশীল আল্লাহর এই ন্যায় বিচারের যৌক্তিক দাবী এই যে, যে যেমন কাজ করবে, সে তার তেমনই ফল ভোগ করবে। এভাবে সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, আখেরাতের বিচার এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ধারণা দিয়েছে।

এইসব মৌলিক সত্যকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করার জন্য ইসলাম মানবজাতির সমগ্র অতীত ইতিহাস তুলে ধরেছে। এক একটা জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছে এবং দেখিয়েছে, যেসব জাতি ও গোষ্ঠী ঐ সত্য গুলোকে মেনে নিয়ে সেগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলেছে, তারা সফলতা লাভ করেছে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। যে সব ব্যক্তি ঐ সত্যগুলোকে গ্রহণ করেছে, তাদের মন মগজ অলোকিত হয়েছে এবং তাদের চরিত্র দেদিপ্যমান হয়েছে। আর যারা ঐ সত্যের বিরোধিতা করেছে, তাদের অধোপতন

ঘটেছে। সে দেখিয়েছে যে, এই মহাসত্যগুলোর দাওয়াত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির সামনে যারা পেশ করেছে, তারা মূলত একই ধরনের স্বভাব চরিত্রের অধিকারী। তারা শুধু পেশ করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং তাকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং জানমালের সর্বাধিক ত্যাগ ও কুরবানী সহকারে চেষ্টা সাধনা করেছে।

ইসলামী আন্দোলনের এই মৌলিক দাওয়াত তার সমস্ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ সহকারে কোরআনে সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। চমৎকার বর্ণনা ভঙ্গিতে একে বারবার পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে বিরোধীদের আপত্তি, ব্যংগবিদ্রুপ ও উপহাসেরও জবাব দেয়া হয়েছে শান্তশিষ্ট ও স্বাভাবিক ভাষায়। তারপর কোথাও উপদেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও সতর্ক করা হয়েছে, কোথাও হুমকি দেয়া হয়েছে, কোথাও লজ্জা দেয়া হয়েছে, কোথাও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, কোথাও কোমলতা ও নম্রতা দ্বারা মানুষের মনকে গলিয়ে দেয়া হয়েছে। মোটকথা বিভিন্ন ভংগীতে মানুষের মনমগজকে এমনভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছে যে, বুদ্ধিমান ও সচেতন লোকদের জন্য পালানোর কোন পথ রাখা হয়নি।

বস্তুত বিজয় যদি তরবারীর জোরেই অর্জন করা হবে, তাহলে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার কী দরকার ছিল যে, কোরআনের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী জায়গা জুড়ে এর অবস্থান?

সত্য কথা হলো, ইসলামী আন্দোলনের ক্ষুরধার যুক্তির সামনে শ্রোতাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। যারা ভাগ্যবান, তারা একে খোলা মনে গ্রহণ করেছে। আর যারা বুদ্ধির বক্রতার কারণে গ্রহণ করেনি, তারা যুক্তির প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে হিংস্র প্রতিরোধে নেমেছে। যে আন্দোলন শ্রোতাদেরকে এই পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, সে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ না করে ছাড়েনা।

হিতাকাংখী সুলভ আবেদনের শক্তি

কোরআনের যুক্তিগুলো শুধু যুক্তি নয়, বরং তার সাথে সাথে মন গলিয়ে দেয়া, পলায়নপর লোকদের আকৃষ্ট করে কাছে ডেকে আনা এবং বন্ধ হৃদয়কে খুলে দেয়ার আবেদনও যুক্ত হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের এ জাতীয় আবেদনগুলো পাষাণ হৃদয় মানুষকেও মোমের মত গলিয়ে দিত। কোরআন খুললেই দেখা যাবে তার প্রতিটি বাক্যে কিভাবে যুক্তির আলোর সাথে আবেগের উষ্ণতা মিশ্রিত রয়েছে। এ জন্যই তো ইসলামের বড় বড় পাষাণ হৃদয় শত্রুও সত্যের সেবকে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া এর সাহিত্যিক মান এত উন্নত ও যাদুকরী শক্তিসম্পন্ন যে, তা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আরব কবি সাহিত্যিকদের পর্যন্ত হতবাক করে দিয়েছিল। কোরআনের এ ধরনের প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ও হৃদয় জয়কারী কিছু আবেদন এখানে উদ্ধৃত করছি:

"(হে নবী, আমার পক্ষ থেকে তাদের) বল: হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে ফিরে আসো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, যে সময় তোমাদের ওপর আযাব এসে যাবে এবং তোমরা কোন সাহায্য পাবে না সেই সময় আসার আগেই। আর এই সর্বোত্তম

হেদায়েতের অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই সময়ের পূর্বেই হেদায়াতের অনুসরণ কর যখন তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসবে, অথচ তোমরা টেরও পাবেনা। তখন কোন ব্যক্তি আক্ষেপ করে বলবে, হায় আফসোস! আমার এই ত্রুটির জন্য যা আমি আল্লাহর সামনে করেছি এবং আমি বিদ্রুপ করেছিলাম। অথবা সে (হতাশ হয়ে) বলবে, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত করতেন, তাহলে আমি পরহেজগার হয়ে যেতাম। অথবা যখন সে আযাব দেখবে, তখন বলবে, আবার যদি সুযোগ পাই, তাহলে আমি সৎ লোক হয়ে যাবো।" (সূরা আয্ যুমার, ৫০-৫৮)

এই ক'টা আয়াতে সংক্ষেপে সেই মৌলিক সত্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে, যা রসূল সা. এর দাওয়াতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে যুক্তিও প্রদর্শন করা হয়েছে, তার পাশাপাশি মন গলানো আবেদনও রয়েছে। এতে সুসংবাদও আছে, সতর্কবাণীও আছে। কোরআনে এ ধরনের রকমারি আবেদন অনেক রয়েছে। মাটির তৈরী মানুষ এহেন বৈপ্লবিক ভাষার শক্তি সামনে তিষ্ঠাতে পারতোনা, বিশেষত এ ধরনের আহ্বান যখন বারবার প্রতিদিন সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় আসতো। তেইশ বছর ধরে এভাবে ওহির সয়লাব আসতে থাকে। এ ধরনের আরো কয়েকটা আবেদন লক্ষ্য করুন ঃ

"হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের সাবধান করে দেইনি যে, শয়তানের দাসত্ব করোনা? সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আমি কি বলিনি যে, আমারই দাসত্ব কর? কেননা এটাই সঠিক পথ। তথাপি সে তোমাদের অনেককে বিপথগামী করেছে। তবুও কি তোমারা বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করবেনা? (সূরা ইয়াসিন ঃ ৬০-৬২)

"(হে নবী!) বলে দাও ঃ হে জনগণ তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি সুপথ প্রাপ্ত হবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যে বিপথগামী হবে, সে নিজের ক্ষতির পথই প্রশস্ত করবে। তোমাদের ভালো মন্দের ব্যাপারে আমি দায়িত্বশীল নই।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৮)

যারা বিরোধিতার ফ্রন্ট খুলে বসেছিল, তাদেরও সর্বোত্তম অনুভূতির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। মোশরেক হোক বা আহলে কিতাব হোক, প্রত্যেক গোষ্ঠীর উত্তম মানুষদের উত্তম ভংগীতে আহ্বান জানানো হয় এবং তাদের সর্বোত্তম ভাবাবেগকে সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। এমনকি মোনাফেকদেরও সংশোধনের আহ্বান জানানো হয়। এ পর্যায়ের উদাহরণগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে পেশ করা হলো।

মক্কার মোশরেকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

"আল্লাহ একটা জনপদের উদাহরণ দিচ্ছেন। ঐ জনপদের লোকেরা সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। চারদিক থেকে তার জীবিকা আসছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। তারপর তার অধিবাসীরা আল্লাহর নেয়ামতের নাশোকরী করলো। তাই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের ক্ষুধা ও নিরাপত্তাহীনতার স্বাদ আস্বাদন করালেন। তাদের মধ্য থেকেই একজন নবী এসেছিল। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলো। তাই আযাব তাদের পাকড়াও করলো। তারা আসলে যুলুমবাজ ছিল।" (সূরা আন্-নাহল ঃ ১১২-১১৩)

আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

"হে আহলে কিতাব! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসে গেছে। তোমরা যে সব জিনিস গোপন কর, তার অনেকগুলো এই রসূল প্রকাশ করে। আর অনেকগুলো জিনিস থেকে তোমাদের অব্যাহতি দেয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। তার মাধ্যমে আল্লাহ এমন সব লোককে শান্তির পথে চালিত করেন, যারা তার মর্জি মোতাবেক চলে এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে তাঁর বিশেষ নির্দেশ মোতাবেক আলোতে নিয়ে আসে। আর তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১৬)

"হে নবী! বল ঃ হে আহলে কিতাব, নিজেদের ধর্ম নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করোনা। যারা পথভ্রষ্ট, যারা অন্যদেরকে বিপথগামী করে এবং সোজা পথ থেকে দূরে সরে যায়, তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৭)

"হে আহলে কিতাব! নবী রসূলদের আগমনের ধারায় দীর্ঘ বিরতির পর আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। সে প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। যেন তোমরা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা আসেনি। এখন তোমাদের কাছে সতর্কবাণী ও সুসংবাদদাতা এসেছে।' (সূরা আল মায়েদাঃ ১৯)

"আমি বনী ইসরাইল সম্পর্কে কিতাবে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার অরাজকতা ছড়াবে এবং খুবই মারাত্মকভাবে অহংকার করবে। সুতরাং হে বনী ইসরাইল! প্রথম প্রতিশ্রুতির সময় যখন সমাগত হলো, তখন আমি তোমাদের ওপর আমার যুদ্ধাংদেহী বান্দাদের চাপিয়ে দিলাম। তারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। বস্তুত সেই ওয়াদা পূরণ হওয়ারই কথা ছিল। এরপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে আরো একটা সুযোগ দিলাম এবং ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলাম ও তোমাদের সংখ্যা বাড়ালাম। (তোমাদেরকে পুনর্বার সুযোগ দিলাম এ জন্য যে) তোমরা ভালো কাজ করলে নিজেদেরই উপকার সাধন করবে, আর মন্দ কাজ করলে তাও নিজেদের জন্যই করবে। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় এল, যাতে তারা তোমাদের মুখমন্ডলকে (দুঃখ ও লাঞ্ছনার কালিমা দ্বারা) কলংকিত করতে পারে, (বাইতুল মাকদিসের) মসজিদে প্রথম বার যেভাবে ঢুকেছিল, সেইভাবে ঢুকতে পারে এবং যেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে, (তখন তো তোমরা তার স্বাদ ভালোভাবেই উপভোগ করলে)। (এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অভ্যুদয় ঘটায় তোমাদের সামনে আরো একটা চূড়ান্ত সুযোগ হাজির হয়েছে, তাই) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করতে চান। তবে তোমরা যদি পুনরায় আগের মতই কাজ কর, তাহলে আমিও আগের মতই শিক্ষা দেব। আর (আখেরাতে) আমি অবাধ্য লোকদের ঠিকানা বানিয়েছি জাহান্নাম।" (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৪-৮)

"(হে নবী,) বল ঃ হে আহলে কিতাব, এসো, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যে কথাটা অবিসংবাদিত, সেই কথাটা আমরা মেনে নেই। সে কথাটা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ

ছাড়া আর কারো হুকুম মানবোনা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবোনা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেরাই পরস্পরকে প্রভুর আসনে বসাবনা।" (আল ইমরান–৬৪)

খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

"আর যারা বলে, আমরা নাসারা, তাদেরকে তুমি (ইহুদীদের চেয়ে) মুসলমানদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে নিকটতর পাবে। কেননা তাদের মধ্যে বহু আলেম ও দরবেশ রয়েছে, যারা দাম্ভিক নয়। তারা যখন রসূলের কাছে নাযিল হওয়া বাণী শোনে, তখন তুমি তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই আমাদের নাম সত্যের সাক্ষীদের সাথে লিখে নাও।" (আল মায়েদা)

মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

"তারা (মোনাফেকরা) কি দেখেনা যে, তারা প্রতি বছর একবার কি দু'বার পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়? তবুও তারা তওবাও করেনা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করেনা। আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় আর জিজ্ঞেস করে, কেউ কি তোমার দিকে তাকাচ্ছে? অতপর সে উঠে চলে যায়। তাদের মনকে আল্লাহ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কারণ তারা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করেনা। শোনো, তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের যে কোন কষ্টই তার মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে। তোমাদের প্রতি সে অত্যন্ত উদগ্রীব। মুমিনদের প্রতি সে অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহময়।" (সূরা তওবা– ১২৬–১২৮)

এ ধরনের আরো অনেক মর্মস্পর্শী বক্তব্যে কোরআন পরিপূর্ণ। হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার মত, বিবেকে সাড়া জাগানোর মত এবং চেতনাকে উদ্দীপিত ও শানিত করার মত এ ধরনের আরো কত চমকপ্রদ কথা যে কোরআনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে, তা বলে শেষ করা কঠিন। বস্তুত কোরআন যে কত শক্তিশালী গ্রন্থ এবং সত্যের দাওয়াত যে কত প্রতাপশালী তা উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকেই আঁচ করা যায়। সত্যের এই তীব্র আলোকরশ্মিগুলো যখন একের পর এক নাযিল হয়েছে, তখন মধ্য পন্থী মানুষের পক্ষে চিন্তা ও কর্মের অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরে থাকা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। যুক্তির সাথে আবেগময় আবেদন যখন মিলিত হয় তখন এই শক্তির সম্মিলনে এমন দোধারী তলোয়ার তৈরী হয়, যা পাথরও কেটে ফেলতে পারে। তাছাড়া কোরআনের পাশাপাশি রসূল সা. এর বাণীগুলোও বিভিন্ন ভাষণ বা বৈঠকি বক্তব্যের আকারে অনবরতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সব বাণী হাদীস গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত রয়েছে। ছোট ছোট বাক্যে এত ব্যাপক তাৎপর্যবহ, প্রভাবশালী ও জাগরণ সৃষ্টিকারী বক্তব্য পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি দিতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের কবি, সাহিত্যিক ও বক্তাদের বিপ্লবী বক্তব্যগুলিও জনমনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আজও সেকালের হাসসান বিন ছাবেত ও কা'ব বিন মালেকের ইসলামী কবিতাগুলো পড়ে দেখলে বুঝা যায় তা জনতার আবেগের সমুদ্রে কী সাংঘাতিক ঢেউ তুলেছিল! মোটকথা, সত্যের বাণীই ছিল আসল অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যার সামনে বাতিলের টিকে থাকার সাধ্যই ছিলনা। "বাতিলের উচ্ছেদ অবধারিত" কোরআনের এই শাশ্বত বাণীটির প্রকৃত মর্মার্থ এখানেই নিহিত।

সমালোচনার শক্তি

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত যুক্তির সাথে শুধু কেবল আবেদনেরই সমাবেশ ঘটায়নি, বরং আবেদনের সাথে সাথে তীব্র সমালোচনাও করেছে। সুফীবাদী মতাদর্শে তো দাওয়াতের একটাই পদ্ধতি চলে। অর্থাৎ অনুরোধ, আবেদন, তোষামোদ ও মিনতি করার পদ্ধতি। যেখানে ব্যক্তির সংকীর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের পরিশুদ্ধির মধ্যেই দাওয়াত সীমাবদ্ধ এবং সামষ্টিক জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠেনা, সেখানে বিনীত আবেদন নিবেদনের বাইরে আর কোন পদ্ধতির প্রয়োজনই বা কী? সুফীবাদী মতাদর্শ ও ব্যক্তিমুখী ধর্মগুলিতে শুধুমাত্র এতটুকু লক্ষ্য রাখা হয় যেন শিষ্যদেরকে কিছু আকীদা বিশ্বাস ও কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলী শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদেরকে অপশক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়। কিন্তু সংঘবদ্ধ সামষ্টিক অপশক্তি ও দুস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং বিকৃত পরিবেশের সাথে টক্কর দেয়ার কোন প্রেরণা তাদের মধ্যে জন্মেনা। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মসনদে বসে যুলুমবাজরা দোর্দন্ড প্রতাপে শোষণ ত্রাসণ চালিয়ে যায় তো যাক, আর তাদের বেদীতে মানবতা যবাই হতে থাকে তো থাক। এ সব দুনিয়াবী ঝামেলায় আল্লাহর পাগল সুফী দরবেশদের কী করার আছে? এ ধরনের সংকীর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যবস্থায় এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় সদগুণ বিবেচিত হয় যে, সে দুনিয়াবী কায়কারবার ও রাজনীতির ঝামেলা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। সবার সাথেই সমান বিনয় ও তোষামোদী আচরণ করবে। মুসলমানদের সাথে "আল্লাহ আল্লাহ" আর ব্রাহ্মণের সাথে "রামরাম" জপ করতে থাকবে। সবার সাথেই নম্র ব্যবহার করবে, কারো সাথেই কঠোরতা প্রয়োগ করবেনা। এ ধরনের মতাদর্শে যেহেতু মানুষকে সংঘাত সংঘর্ষে নামানোর কোন পরিকল্পনাই থাকেনা, বরং তাকে সমাজ ও সভ্যতামুখী তৎপরতা থেকে বের করে নিভৃত স্থানে ও খানকায় নিয়ে বসানোই লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাই সমালোচনার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা সমালোচনা তো মানস জগতে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাই সংকীর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিগত পরিসরে সীমিত ধার্মিকতার দৃষ্টিতে কারো বিরুদ্ধে সমালোচনা করা অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয় কাজ বিবেচিত হয়ে থাকে। অনেকটা তাকওয়া বিরোধী কাজের মতই গণ্য হয়ে থাকে, যা কিনা আত্মার শান্তি বিঘ্নিত করে।

কিন্তু যে মতাদর্শ ও দাওয়াত সভ্যতার বিপ্লব সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়, তার বাহকদের চিন্তার কারখানায় যুক্তি ও আবেদনের মত সমালোচনাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সত্যের প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, বরং বাতিলের বিলুপ্তি সাধনও জরুরী। কেননা বাতিলের বিলুপ্তি ছাড়া সত্যের প্রতিষ্ঠাও পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনা। এখানে আল্লাহর ওপর ঈমান আনা ও তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা পরস্পর নির্ভরশীল। একটা না করে অপরটা করা যায়না। পাশাপাশি অসৎকাজ প্রতিহত না করলে সৎকাজের আদেশ দেয়া ফলপ্রসু হয়না। এখানে 'ইল্লাল্লাহ' বলবার আগে 'লা-ইলাহা' বলতেই হয়।

ইসলামী আন্দোলনের অভ্যুদয় যখনই ঘটে, তখন তা জনগণের চিন্তাধারা পাল্টে দেয়ার জন্য প্রচলিত সভ্যতা সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষত প্রচলিত চিন্তাধারা, আকীদা বিশ্বাস ও মূল্যবোধের কঠোর সমালোচনা করে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আধিপত্যশীল শ্রেণীগুলো , যারা জনগণকে

নিজেদের দাসত্বের জালে আবদ্ধ করে আয়েশী জীবন কাটায়, তাদের মুখোস খুলে না দিয়ে সে পারেনা। সামষ্টিক জীবনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যাদের হাতে নিবদ্ধ, সাধারণ জনতার কাছে তাদের আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয়া ছাড়া তার উপায়ান্তর থাকেনা। অন্যায়কে অন্যায়, বাতিলকে বাতিল এবং ভুলকে ভুল না বলা পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের চাহিদাও সৃষ্টি হয়না এবং পরিবর্তনের আকাংখাও জন্মেনা। যে কোন নবীর দাওয়াত ও কার্যবিবরণী দেখুন। দেখবেন, তাতে শুধু যে সমাজের খারাপ ধ্যান ধারণা ও পরিস্থিতির সমালোচনা করা হয়েছে তা নয়, বরং প্রত্যেক নবী তৎকালীন প্রতাপশালী শাসকদেরকে তাদের দরবারে যেয়েই বিপথগামী বলেছেন। ইসলামী আন্দোলনে সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত গঠন প্রণালী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক দেশে ও জাতিতে কিছু "রাঘব বোয়াল অপরাধী" থাকে যারা প্রতারণার রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের মতলব উদ্ধার করে। (সূরা আল আনয়াম, ১২৪) তাদেরকে স্বপদে বহাল রেখে তাদের সংশোধন সম্ভব নয়।

জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও ইতিহাসে নতুন স্বর্ণালী অধ্যায়ের উদ্বোধন কল্পে যখন আরবে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটলো, তখন সে সর্বপ্রকারের মিথ্যা, যুলুম ও অসততার নির্মম সমালোচনা করলো। তৎকালে যত রকমের লোক জাহেলী সমাজব্যবস্থা ও তাগুতী পরিবেশের রক্ষক, সমর্থক ও সহযোগী হয়ে সমাজের ওপর চেপে বসেছিল এবং যারা নিজেদের মর্যাদা ও কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য মানব জাতির কল্যাণ বিধানকারী এই দাওয়াতের কণ্ঠরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, ইসলাম অভাবনীয় দুঃসাহসিকতার সাথে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল এবং তাদের চমকপ্রদ পোশাকে আবৃত অপকর্মগুলোকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তুলে ধরেছিল। এভাবে মানবতা বিরোধী কুফরি শক্তির আসল পরিচয় সমাজের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে এবং জনমতে সচেতনতা বিস্তার লাভ করতে থাকে। আর সেই সাথে পরিবর্তনের আকংখাও তীব্রতর হতে থাকে। ইসলামী আন্দোলনের সমালোচনা সোচ্চার জনগণের ভেতর সুষ্ঠু চিন্তা, উপলব্ধি, যাচাই-বাছাই, তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের যোগ্যতা সৃষ্টি ও বিকশিত করে। দাওয়াতের এই দিকটাই হক ও বাতিল, ভালো ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের বাছবিচার করে। এ দ্বারাই সুপথ ও বিপথগামিতার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। বাতিল শক্তির যুলুম নির্যাতন তো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা মুখবুজে সহ্য করতে থাকে। কিন্তু যুলুমবাজদের জঘন্য চরিত্রের ওপর থেকে সুদৃশ্য আভরণ খুলে ফেলতে তারা কোন ভুল করেনি। তাদের তৎপরতা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে দিয়ে পরিচালিত হতোনা। জাহেলী ব্যবস্থার সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে তারা কখনো এ আশ্বাস দেয়নি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে তোমাদের পদ মর্যাদায় বহাল থেকে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চালিয়ে যাও। আমরা আল্লাহওয়ালা মানুষ। আমরা তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ এবং তোমাদের স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবোনা। আমরা তো কেবল আল্লাহর নাম জপ করবো এবং মানুষকে তাঁর কলেমা শেখাবো। এভাবে ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বের সামনে সবিনয়ে কিছু চাটুকার সুলভ কথাবার্তা বলে তাদের যুলুম থেকে অব্যাহতি লাভ নিশ্চিত করার পর সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাকামী এই বিপ্লবী কলেমা উচ্চারণ করা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতোনা।

ইসলামী আন্দোলন তার প্রধান আহবায়কের পবিত্র মুখ দিয়েই সর্ব প্রথম এই তিক্ত দায়িত্ব

পালন করেছে। ওহির ভাষার অস্ত্র দিয়েই সমাজের রোগাক্রান্ত অংগে অপারেশন চালিয়েছে। এই সমালোচনা শুধু আদর্শ ও মূলনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রতিরোধরত প্রভাবশালী শক্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ-সবই এর আওতায় এসেছে। এই সমালোচনা দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটেই করা হতো এবং শত্রু পক্ষের কৃত কর্মকান্ডের পর্যালোচনাও সাথে সাথেই করা হতো। এভাবেই গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কাজ যদি না করা হতো, তবে কিছু পুণ্যবান ও মনোমুগ্ধকর সৎ ব্যক্তি তৈরী হওয়া হয়তো সম্ভব হতো, সমকালীন দুনিয়া হয়তো তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো এবং অনাগতকালেও হয়তো তাদের স্মৃতি মানুষকে অভিভূত করতো। কিন্তু সমাজ পরিবেশ জাহেলিয়াতের অন্ধকারে যেমন আচ্ছন্ন ছিল, তেমনি থেকে যেত। মুসলিম জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা এবং সংগ্রামী প্রবণতা কখনো সৃষ্টি হতোনা। হেরার গুহার মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ থেকে যেত। আরব জয় করে ফের মক্কায় প্রবেশ করা তার পক্ষে কখনো সম্ভব হতোনা।

মানবতার মুক্তিদূত রসূল সা. কোরআনের ভাষায় সমালোচনা করে সমকালীন সমাজপতিদেরকে শুধু যে যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়ে দেউলে প্রমাণ করেছেন তা নয়, বরং জগতবাসীর সামনে এটাও ফাঁস করে দিয়েছেন যে, বড় বড় পদ মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসনে আসীন প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত নোংরা ও ঘৃণ্য চরিত্র নিয়েও সমাজের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমালোচনার ফলেই জনগণ বুঝতে পেরেছে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করে এই সব ঘৃণ্য অপশক্তিকে সক্রিয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ না করা পর্যন্ত জনজীবনে সৌন্দর্য, শৃংখলা ও সৌষ্ঠব ফিরে আসার কোনই সম্ভাবনা নেই।

ইসলাম কোরায়েশ ও মোশরেকদের সমালোচনা যখন করেছে, তখন তাদের পৌত্তলিক কৃষ্টি, তাদের কু-সংস্কার ও অলীক ধ্যান–ধারণা, তাদের হাস্যকর ধর্মীয় রীতিপ্রথা, তাদের হীন ও নিকৃষ্ট চরিত্র এবং তাদের নেতৃত্বের দম্ভ ও আস্ফালন সব কিছুরই মুখোশ খুলে দিয়েছে। তাদের প্রাণপ্রিয় উপাস্যদের অসহায়ত্ব তুলে ধরার জন্য উদাহরণ দিয়ে বলেছে যে, এই সব উপাস্যরা মিলিত হয়েও একটা মাছি পর্যন্ত তৈরী করতে পারেনা। এমনকি একটা মাছি যদি তাদের কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে ওরা সেটা ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম নয়। হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী হওয়া নিয়ে তাদের যে গর্ব ও দম্ভ ছিল, কোরআন সেই দম্ভ চূর্ণ করেছে এভাবে যে, হযরত ইবরাহীমের গোটা জীবনেতিহাসকে বারবার তাদের সামনে বিবৃত করে তাঁর আসল পরিচয় তুলে ধরেছে। কোরআন বলেছে, যে মহান কাজ সমাধা করার জন্য তিনি নিজের গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছিলেন, নিজের জন্য সংরক্ষিত পুরোহিতের গদিতে লাথি মেরেছিলেন, নমরূদের সামনে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যুদন্ড লাভের লোমহর্ষক রায় পেয়েছিলেন, তারপর আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আগুন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আল্লাহর মোহাজের হয়ে নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন, তারপর তিনি একটা জনহীন মরুপ্রান্তরে নিজের দাওয়াত ও আল্লাহর এবাদতের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাকে তোমরা নিজেদের অর্থোপার্জন ও ধর্মীয় পৌরহিত্যের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছ, সেই মহান কাজের ধারে

কাছেও না গিয়ে তার উত্তরাধিকারী হবার গালভরা দাবী তোলা কোরায়েশদের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান। আপাদমস্তক শেরক ও জাহেলিয়াতে ডুবে থেকে কোন্ অধিকারে তারা তাওহীদের সেই মহান আহ্বায়কের উত্তরাধিকারী সাজে এবং তাঁর নাম মুখে আনে? কোরআন দেখিয়েছে কিভাবে তারা হারাম হালালের মনগড়া শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। পূজার বেদিতে বিভিন্ন জিনিস উৎসর্গ করার কী অদ্ভুত সব নিয়ম তৈরী করে নিয়েছে, পাশা ও জুয়া খেলাকেও কিভাবে ধর্মীয় পবিত্রতার মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, কিভাবে তারা মেয়ে জন্ম নিলে লজ্জায় পালিয়ে বেড়ায়, কিভাবে তারা সীমাহীন নিষ্ঠুরতা নিয়ে মেয়ে সন্তানকে জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলে, আর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে আখ্যায়িত করতে তাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হয়না। এভাবে তাদের প্রতিটি অর্থহীন ও হাস্যকর কার্যকলাপকে তাদের সামনে তুলে ধরে কোরআন বলেছে, তোমরা মসজিদুল হারাম ও কা'বা গৃহের অভিভাবকত্ব নিয়ে গর্বীত। অথচ নিজেদের কুফর ও শেরকের কারণে তোমরা তার যোগ্য নও। তোমরা জনগণকে আল্লাহর পথ থেকে ও কা'বা শরীফ থেকে ফিরিয়ে রাখ, নিজেদের ভাইদেরকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দাও এবং ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কর।

কোরআন যখন আহলে কিতাবের সমালোচনা করেছে, তখন তাদের শত শত বছরের কর্মকান্ডের ফিরিস্তি দিয়ে বলেছে, তোমরা হযরত মূসা আ. কে পদে পদে যন্ত্রণা দিয়েছ, বারবার তার নাফরমানী করেছ, বারবার ভ্রষ্টতা ও বিকৃতির পথে পা বাড়িয়েছ, কলহ কোন্দলে লিপ্ত থেকেছ, দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছ, বাছুর পূজা করেছ, জেহাদ থেকে পালিয়েছ, পরস্পরের রক্তপাত করেছ, আত্মীয় স্বজনকে দেশান্তরিত করেছ, তাদের ওপর যুলুম ও আগ্রাসন চালিয়েছ, আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছ, সত্য কথাকে লুকিয়েছ, দরবেশ ও আলেমদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছে, এমনকি স্বহস্তে মনগড়া কথা লিখে বলেছ যে এটা আল্লাহর কালাম, মানুষকে ধোকা দিয়ে অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছ, নিজেরাও আল্লাহর পথে চলনা, অন্যদেরকেও চলতে দাওনা, কেউ যদি মানব কল্যাণের জন্য কাজ করতে চায়, তবে তাকে সহযোগিতা দেয়ার পরিবর্তে বাধা দাও। মুহাম্মদ সা. এর আগমনের পূর্বে তোমরা আল্লাহর কিতাবে লেখা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সবাইকে সুসংবাদ দিতে যে, শেষ নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই নবী যখন সত্যই এল, তখন তোমরা সবাই তার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে গেলে। মুসলমানরা নানা দিক দিয়ে তোমাদের নিকটতর, তারা তোমাদের নবীদেরকে এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মান্য করে। অথচ তোমরা মোশরেকদের সাথে দহরম মহরম পাতাও। তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব থাকা সত্ত্বেও তোমরা এ সব অপকর্মে লিপ্ত থেকেছ।

গাধার পিঠে আল্লাহর কিতাবের স্তুপ থাকলেও সে যেমন তার কিছুই পরোয়া করেনা, তোমরাও তেমনি আচরণ করছ। তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হতে, তাহলে তোমরা আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। তোমরা যতক্ষণ আল্লাহর কিতাবকে অবজ্ঞা করতে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের এ দাবীর কোন মূল্য নেই যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তোমাদের চরিত্রের এমন অধোপতন ঘটেছে যে, একটা মুদ্রাও যদি তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তবে তা ফেরত পাওয়া খুবই

কঠিন হয়ে পড়ে। এই আচরণের কারণে তোমরা আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছ এবং তোমাদের জন্য লাঞ্ছনা ও মিসকিনী বরাদ্দ হয়েছে।

এরপর মোনাফেকদের সমালোচনা যখন করা হয়েছে, তখন তাদের সর্বাত্মক মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা প্রতিটি জিনিসকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে থাক, তোমরা যখন নির্জনে মিলিত হও, তখন ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিরূপ সমালোচনা করে থাক, জনসমক্ষে এলে তোমাদের হাবভাব পাল্টে যায়, পরস্পরকে ইশারা ইংগিতে কথা বল, কখনো নীরব হয়ে যাও, কখনো যুদ্ধ বিগ্রহের খবরে তোমাদের চোখ ভয়ে ছানাবড়া হয়ে যায়। কখনো চুপে চাপে সটকে পড়। মুসলমানদের সাথে থাকার সময় এক রকম আর কাফেরদের সাথে থাকার সময় আর এক রকম কথা বল। সকল ব্যাপারে তোমাদের ভূমিকা মুসলমানদের সামষ্টিক ভূমিকা থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। অন্যেরা যদি ওহির বাণী থেকে জীবনের জন্য শিক্ষা পায় এবং প্রবোধ পায়, তাহলে তোমরা তাতে খুবই বিরক্ত হও। অন্যদের কাছে রসূল সা. এর সত্তা হলো পরম ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। অথচ তোমরা তাঁর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা পসন্দ কর। অন্যরা উৎসাহের সাথে নামায পড়ে। আর তোমরা নামাযের জন্য আস এমন বিরক্তির সাথে, যেন তোমাদেরকে ধরে বেঁধে আনা হয়েছে। অন্যান্য মুসলমানরা ইসলামের জন্য যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করতে উদগ্রীব থাকে। অথচ তোমরা নিজেরাও আল্লাহর পথে ব্যয় করোনা, অন্যদেরকেও করতে বাধা দাও। অন্যেরা স্বতস্ফূর্ত ঈমানী আবেগের বশেই জেহাদ করতে যায়। তোমরা সব সময় কেবল জান বাঁচাতে চাও এবং নানা রকম খোঁড়া ওজুহাত দিয়ে পালাতে চেষ্টা কর। অন্যেরা যে ঘটনায় খুশী হয়, তাতে তোমরা হও অসন্তুষ্ট। অন্যেরা যে ঘটনায় কষ্ট পায়, তোমরা তাতে আনন্দিত হও। সাধারণ মুসলমানদের সাথে কোনভাবেই তোমাদের মিল হয়না। এভাবে ইসলামী আন্দোলন মোনাফেকদেরকে চিহ্নিত করেছে।

যে সব জাহেলী কবি ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও কুৎসা সম্বলিত কবিতা লিখতো, এবং খোদ্ রসূল সা. সম্পর্কে নিন্দা রটাতো, অতি সংক্ষেপে তাদের এমন বিবরণ দেয়া হয়েছে , যা তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি সত্য ও বাস্তব এবং তা দেখে একজন সাধারণ আরবও তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নৈতিক অধোপতনের মাত্রা বুঝতে পারতো। জাহেলী কবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, একমাত্র বিপথগামী লোকেরাই তাদের অনুসারী। তারা তাদের নীতিহীনতার কারণে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় এবং মুখে যা ভালো কথা বলে, তদনুসারে কাজ করেনা।

ইসলামী আন্দোলন সমকালের বিশেষ বিশেষ ঘৃণ্য চরিত্রের লোকদেরকেও অত্যন্ত উঁচু মানের সাহিত্যিক বর্ণনা দ্বারা চিহ্নিত করেছে এবং সমাজ তা দ্বারা গণচেতনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে, যাতে করে যে কেউ তাদেরকে দেখতে পারে, বুঝতে পারে ও বাস্তবতার জগতে নিজেরাই তাদেরকে চিনতে পারে। কোথাও এদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে দেখিয়েছে যে অত্যধিক বাগাড়ম্বর দ্বারা মানুষকে হতচকিত করে দেয়। কিন্তু কর্মের জগতে নিজের ভালো ভালো কথাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে মানব সমাজে নিত্য নতুন গোলযোগ ছড়ায় এবং ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। কোথাও এমন ব্যক্তিকে দেখিয়েছে, যে গোত্রীয়

ও নেতৃসুলভ আভিজাত্যের অহংকারে মাতোয়ারা থাকে এবং অতিমাত্রায় সম্ভ্রম সচেতন। কেয়ামতের দিন তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। আবার কোথাও সেই মানবীয় চরিত্রটাকে তুলে ধরা হয়েছে, যে লোভের আতিশয্যে কুকুরের মত হয়ে গেছে, যাকে তাড়া দিলেও জিভ বের করে, আর তাড়া না দিলেও জিভ বের করে। এ সব চরিত্র সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সমালোচনার কারণে তাদের হীনতা ও নিকৃষ্টতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা জনগণের জন্য মোটেই কষ্টকর থাকেনি।

এ সমালোচনা নিছক তাত্বিক ছিলনা, বাস্তব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এতে ইসলামী আন্দোলনের মঞ্চ থেকে বিরোধী শক্তিকে সম্বোধন করে কথা বলা হতো। বক্তাও জানতেন কাকে বলছে, আর শ্রোতারাও জানতো কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এ সমালোচনা আকাশ থেকে মাইক যোগে করা হতোনা বরং রসূল সা. এর মুখ দিয়ে প্রচারিত হতো। মুসলমানরা এগুলো সমাজের কোণে কোণে ছড়িয়ে দিত। তাই তাদের আবেগ অনুভূতিও এর অন্তর্ভুক্ত হতো এবং তাদের অন্তরাত্মা এর সাথে মিলে একাকার হয়ে যেত। এ সমালোচনা বাস্তব ঘটনা প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই করা হতো আর শ্রোতারাও তাকে চলতি ইতিহাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিত। জনগণ বুঝতো, এটা আমাদের মধ্যে নব আবির্ভূত গঠনমূলক বিপ্লবী আন্দোলনেরই বক্তব্য। এ সমালোচনা প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং তা বিপ্লব বিরোধীদের ওপরই আঘাত হানছে। জনগণ উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা ও উভয় পক্ষের তুলনামূলক পর্যালোচনা করার সুযোগ পেত। এভাবেই তাদের চেতনা গড়ে উঠেছে।

যুক্তি প্রমাণ উপলব্ধির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা আবেগকে উদ্দীপিত করেনা। আবেদন আবেগকে নাড়া দিয়ে দাওয়াতে উষ্ণতার সৃষ্টি করে। তবে আবেদন ইতিহাসে কার্যকর সংগ্রামের সৃষ্টি করেনা। একমাত্র সমালোচনাই এমন শক্তি যা যুক্তি ও আবেদনের সাথে মিলিত হয়ে যখন কাজ করে, তখন সভ্যতার সকল উপাদান এক সাথে সক্রিয় হয়ে ওঠে। একমাত্র সমালোচনাই সমাজ জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সার কথা হলো, ইসলামী আন্দোলন মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে যুক্তি, আবেদন ও সমালোচনা-এই তিন ধরনের উপকরণকে কাজে লাগিয়েছে এবং তেইশ বছর ধরে অবিরাম কাজে লাগিয়েছে। এই তিনটে শক্তিই বিরোধীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তারা যুক্তির দিক দিয়ে দুর্বল, উদ্দেশ্যের প্রতি আবেগ সৃষ্টিতে পশ্চাদপদ এবং চরিত্রের দিক দিয়ে খুবই নিম্নস্তরের। এ কারণে বিরোধীদের মধ্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এবং নিজেদের হীনতার অনুভূতি অবচেতনভাবে বেড়ে গেছে। অপর দিকে জনগণও উভয় পক্ষকে সর্বদিক দিয়ে যাচাই বাছাই করে উভয়ের পার্থক্য বুঝতে পেরেছে। ইসলামী আন্দোলনের আসল শক্তি ছিল এটাই এবং এটাই আরবের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মন জয় করেছিল। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলন যদি সত্য কেন্দ্রিক না হতো, জনগণের মনকে আকৃষ্ট করতে না পারতো, আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদেরকে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারতো এবং যুক্তি, আবেদন ও সমালোচনা দ্বারা নিজের শক্তি ও পরাক্রমের স্বীকৃতি আদায় করতে না পারতো, তাহলে মুসলমানরা রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রেও জয়লাভ করতে পারতোনা, রণাঙ্গনেও বিজয় অর্জন করতে

পারতোনা। এই সব ময়দানেও যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা এ জন্যই হয়েছে যে, জনমতের বিশাল অঙ্গনে ইসলামের অগ্রযাত্রা ছিল অত্যন্ত বিজয়মুখী।

মুসলমানদের নৈতিক শক্তি

যে কোন দাওয়াত, যদি শুধু শাব্দিক দাওয়াত হয় এবং তার সাথে নৈতিক জোর না থাকে, তবে তা যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন এবং সাময়িকভাবে যতই যাদুকরি প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলুক না কেন শেষ পর্যন্ত ধূঁয়ার কুণ্ডলির মত বাতাসে মিলিয়ে যায়। ইতিহাসের ওপর কেবল কথা দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা যায়না। শুধু কথা দিয়ে কোন কালেই কোন বিপ্লব সাধিত হয়না। কথা দ্বারা তখনই কিছু প্রভাব সৃষ্টি হয়, যখন কাজের মাধ্যমে তার কিছু অর্থ নির্ণিত হয়। ভাষার যাদু সাবানের মত সুদর্শন ফেনা ও রংগীন বুদবুদ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এই সব বুদবুদ মাটির একটা কণাকেও তার জায়গা থেকে সরাতে সক্ষম হয়না। বরং তা সংগে সংগেই বিলীন হয়ে যায়।

যুক্তি যখন আচরণ ছাড়াই আসে, আবেদন যখন আন্তরিকতাহীন হয় এবং সমালোচনা যখন নৈতিক দিক দিয়ে শূন্যগর্ভ হয়, তখন তা মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়না। নৈতিক শক্তিই কোন আন্দোলনকে প্রভাশালী ও কার্যকর করে। কর্মের সাক্ষ্য ছাড়া মুখের সাক্ষ্য নিষ্ফল হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে "মানুষ যা করেনা, তা যখন বলে, তখন তা আল্লাহর কাছে প্রচণ্ড বিরাগভাজনের কারণ হয়ে থাকে।"

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত নিছক তাত্ত্বিক বা যুক্তি ভিত্তিক দাওয়াত ছিলনা। ইসলামের দাওয়াত ছিল পুরোপুরি কর্মের আহ্বান। এ দাওয়াত এক বিশেষ ধরনে নতুন মানুষ তৈরী করার জন্য এসেছিল। প্রথম দিন থেকেই সে তার এই ইপ্সিত মানুষ তৈরীর কাজ শুরু করেছিল। এই মানুষের চিন্তাধারা, চারিত্রিক গুণাবলী, এবং মনোমুগ্ধকর আচরণই তার যুক্তিকে যথার্থ গুরুত্ববহ, তার আবেদনকে সত্যিকার আকর্ষণীয় এবং তার সমালোচনাকে কার্যকর করেছিল। ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্টি করা এইসব নতুন মানুষ নিজেরাই একটা অকাট্য যুক্তি ছিল। তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী আবেদন ছিল। এই মানুষগুলোর সমগ্র সত্তা পুরানো সমাজ ব্যবস্থা, পাশবিক প্রকৃতির মানুষ, বিকারগ্রস্ত জাহেলী পরিবেশ, স্থবির সমাজ, এবং তার অযোগ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক মূর্তিমান সমালোচনা ছিল। এই জ্যান্ত যুক্তি, জ্যান্ত আবেদন ও জ্যান্ত সমালোচনার কোন জবাব জাহেলিয়াতের কাছে ছিলনা। এসব জ্যান্ত যুক্তির কাছে জাহেলিয়াত ছিল একেবারে অসহায়। সেই নতুন মানুষ, যার সবচেয়ে পূর্ণাংগ নমুনা ছিলেন স্বয়ং রসূল সা. এবং যার প্রেরণায় আরো বহু মানুষ তৈরী হচ্ছিল, এক বাস্তব ও অকাট্য সত্য ছিল। সে সত্যের সামনে চোখ বন্ধ করে রাখাও তার আলোরই তীব্রতার প্রমাণ বহন করতো। যারা এ সত্যকে অস্বীকার করতো, প্রত্যাখ্যান করতো এবং তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো, তারাও তাদের আচরণ দ্বারা এর শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষণা করেছিল। মক্কায় এই নতুন মানুষ তার ব্যক্তিগত রূপ বিকশিত করেছিল, আর মদিনায় এসে সে নিজের সামষ্টিক রূপ দেখিয়েছিল।

ইসলামী আন্দোলন ও রসূল সা. এই নতুন মানুষ তৈরীর আসল কাজ থেকে কখনো উদাসীন হননি, অন্যদের সংশোধনের উৎসাহে ইসলাম এ কাজকে ভুলে যায়নি। অন্যদের

সংশোধনের চেয়ে আত্মশুদ্ধির গুরুত্বই এখানে বেশী ছিল। অন্যের সমালোচনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আত্মসমালোচনা। বাইরে পরিবর্তন আনার আগে তার কাছে নিজের ভেতরে পরিবর্তন আনা ছিল অধিকতর জরুরী।

যে সমাজের দৃষ্টিতে উপার্জন করা ও পানাহার করার চেয়ে উচ্চতর ও মহত্তর কোন লক্ষ্য ছিলনা। যার প্রতিটি মজলিস ছিল এক একটি মদ্যশালা, এক একটি জুয়ার আড্ডা এবং এক একটি নৃত্যক্লাব। যেখানে বীরত্ব কেবল দাঙ্গা ফাসাদ, হত্যা, লুটতরাজ ও প্রতিশোধ গ্রহণেই ব্যবহৃত হতো। যেখানে সমাজ একটা জংগলে পরিণত হয়েছিল, সেই জংগলে মানুষরূপী হিংস্র জন্তু গর্জন করে বেড়াতো এবং ভদ্র ও দুর্বল লোকেরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত হতো, সেখানে রসূল সা. একদল সৎ, শুদ্ধ ও সুসভ্য মানুষকে সাথে নিয়ে আবির্ভূত হলেন। এই দলটা প্রথম দিন থেকেই সমাজে খুব লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল এবং সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। মানবতার এই নতুন নমুনাগুলোকে লোকেরা অবাক হয়ে দেখতো এবং তাদেরকে সমাজের অন্য সবার থেকে সর্বদিক দিয়েই ভিন্নতর ও বৈশিষ্টমন্ডিত বোধ করতো। এই দলটির আবির্ভাব ও বিকাশ বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তাদের সামনেই হয়েছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনগণ খুব ভালোভাবেই দেখেছে।

সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দেখতো, ইসলামের কলেমা একের পর এক ভালো ভালো লোকদের আকৃষ্ট করে চলেছে। সহসা এক একজন মানুষ নিজের বিবেকের চাপে বাধ্য হয়ে এই বিপ্লবী আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। যে ব্যক্তি কয়েকদিন আগেও মুহাম্মদ সা. এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করেছে, সে সহসাই মাথা নত করে দিয়েছে, যেন কেউ যাদু করেছে। আর যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে তৎক্ষণাত শুভ পরিবর্তন আসতে থাকে। তার বন্ধুতা ও শত্রুতা পাল্টে যায়। তার আদত অভ্যাস ও রুচিতে বিপ্লব এসে যায়। তার ব্যস্ততা ভিন্নরূপ ধারণ করে। ইতিপূর্বে যে সব বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল, সেগুলো পাল্টে গিয়ে নতুন বিষয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আর সে সাথেই সে অত্যন্ত সক্রিয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তার মধ্যে একটা নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটে। তার সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা জেগে ওঠে। তার বিবেক নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। তার মধ্যে উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে। যে ব্যক্তি কাফের থেকে মুসলমান হতো, তার ভেতর থেকে যেন একেবারেই নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটতো। সে নিজেও অনুভব করতো, আমি পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এবং নতুন। পরিবেশও তাকে দেখে অনুভব করতো, সে পাল্টে গেছে। খুনী সন্ত্রাসী ইসলাম গ্রহণ করে জীবনের রক্ষক হয়ে যেতো। চোর ইসলাম গ্রহণ করে আমানতদারে পরিণত হতো, ব্যভিচারী ইসলাম গ্রহণ করে নারীদের সম্ভ্রমের রক্ষকে পরিণত হতো। ডাকাত ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি ও সমঝোতার মূর্ত প্রতীক হয়ে যেত। বদমেজাজী ও বক্র স্বভাবের লোক ইসলামের ছায়াতলে এসে সহনশীল বিনয়ী ও অমায়িক মানুষ হয়ে যেত। সুদখোর এসে দানশীল হয়ে যেত। নির্বোধ ও মেধাহীন লোক এসে উচ্চ প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিচয় দিত। নিম্ন সামাজিক স্তর থেকে এসে মহত্ত্বের উচ্চ স্তরে উন্নীত হতো, যেন সে অন্য কোন জগতের প্রাণী। মনে হতো যেন মাটি দিয়ে তৈরী নয় বরং অন্য কোন উপাদানে গঠিত।

আল্লাহর এবাদতে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত, রসূলের প্রেমে পাগল, সত্যের একনিষ্ঠ সেবক, সৎকাজের উদ্যোক্তা, কল্যাণের আহ্বায়ক, অন্যায় ও অসত্যের দুশমন, যুলুমের কট্টর বিরোধী, রুকু ও সিজদায় বিনীত, অভিনিবেশ সহকারে কোরআন পাঠকারী, দিনের বেলায় সংগ্রামে লিপ্ত, রাতের বেলায় আল্লাহর সাথে একনিষ্ঠ সংলাপে নিয়োজিত, মিসকীনদের খাদ্য দানকারী, পথিকের আতিথেয়তাকারী, এতীম ও বিধবার সেবক, আড্ডাবাজী ও অবৈধ খেলাধুলা থেকে সংযম অবলম্বনকারী, বিলাসিতা ও আমোদ ফূর্তি থেকে আত্মরক্ষাকারী, বেহুদা তর্ক বিতর্ক থেকে সংযত, গাম্ভীর্য ও আত্মসম্মান বোধে উজ্জীবিত পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতীক, জনারণ্যে একাকী এবং আপন জনপদে প্রবাসী–এ সব অসাধারণ গুণ বৈশিষ্টের অধিকারীরা সমগ্র আরবের মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত না হয়ে পারে কিভাবে?

ইসলামের নিশানবাহী, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এই নিঃস্বার্থ সৈনিকেরা ছিল আন্দোলনের অবৈতনিক সার্বক্ষণিক কর্মী। তারা আখেরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে নিজের দুনিয়াবী স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত ছিল। নিজের পবিত্র লক্ষ্যের জন্য মস্তিস্কের যাবতীয় যোগ্যতা, শরীরের যাবতীয় শক্তি, পকেটের টাকা কড়ি, এমনকি প্রয়োজনের সময় নিজের ও নিজের সন্তানদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তারা কুণ্ঠিত হতোনা। তাদের না ছিল জীবিকার চিন্তা, না ছিল দৈহিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল, না ছিল রাতের ঘুমের চিন্তা, না ছিল স্ত্রী ও সন্তানদের দিকে মনোযোগ দেয়ার কোন অবসর, না ছিল খেলাধুলা ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ। তাদের একমাত্র পেশা, একমাত্র ব্যস্ততা, একমাত্র চিত্ত বিনোদন ও আমোদ ফূর্তির উপকরণ ছিল ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম। তারা হাসিমুখে শত্রুদের গালি শুনেছে, বীরত্বের সাথে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ সহ্য করেছে, আনন্দের সাথে উপোষ করেছে এবং হাসি মুখে নির্বাসনে গেছে। যখন ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছে সর্বোচ্চ মাত্রার ধৈর্য ধারণ করেছে, সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে দৃপ্ত মনে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, আহাদ আহাদ বলতে বলতে তপ্ত বালুতে শুয়ে পড়েছে, আবেগময় কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শূলে চড়েছে, আহত হয়ে পড়ে গিয়েও উড়ন্ত আত্মা শেষ বারের মতো উচ্চারণ করেছে ঃ

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "কা'বার প্রভুর শপথ, আমি সফল হয়েছি।"

এই যাদের নৈতিক চরিত্র ও ভূমিকা, তাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা হবেনা কেন? তাদের সামনে বিশ্ব মাথা নোয়াবেনা কেন?

এই মুসলিম চরিত্র প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, তা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই চরিত্রের দীক্ষাগুরু বধ্যভূমি থেকে বিদায় হবার সময় নিজের হত্যাকারীদের গচ্ছিত আমানত ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন। এই চরিত্র লাভকারীরা ব্যভিচারের অপরাধ সংঘটিত করার পর উপযাচক হয়ে অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছে এবং ইসলামী আদালতের কাছ থেকে নিজের জন্য মৃত্যুদন্ড আদায় করে ছেড়েছে, যাতে করে তারা আল্লাহর কাছে পবিত্র অবস্থায় উপস্থিত হতে পারে। এই চরিত্রকে ইসলাম গ্রহণের কয়েক মিনিট পরই যখন জনৈকা সুন্দরী যুবতী তার প্রমোদ সংগী হবার আহ্বান জানিয়েছে তখন সে এই বলে

ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হতে পারিনা। এক জেহাদী সফরে মুসলিম বাহিনী উয্‌দ গোত্রের আবাসের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক মুসলিম সৈনিক একান্ত প্রয়োজনে তাদের ওখান থেকে একটা বদনা এনেছিল। কিন্তু মুসলিম চরিত্রই তাকে তা ফেরত দিতে বাধ্য করেছিল। এ ধরনের শত শত দৃষ্টান্ত যে সমাজে প্রতিদিন সংঘটিত হতো, সে সমাজে তো প্রতিদিনই ভূমিকম্প সংঘটিত হতো।

আনসাররা নিজেদের ঘরবাড়ী ও ধনসম্পত্তি সমান দুই ভাগ করে অর্ধেক নিজের জন্য রেখে অর্ধেক নিজের মোহাজের ভাইকে দিয়ে যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা দেখে কি তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষ হতভম্ব হয়নি? এমন বিস্ময়কর সাম্য কি জনমনকে আকৃষ্ট না করে পেরেছে, যা একজন নগন্য দাস অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সাথে, দরিদ্র লোকেরা ধনীদের সাথে এবং বাস্তুচ্যূত লোকেরা মদিনার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে একই কাতারে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে? প্রত্যেকে গুরুত্ব পেয়েছে, প্রত্যেকে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে, প্রত্যেকের মতের মূল্য দেয়া হয়েছে, প্রত্যেককে দায়িত্ব বহনের ও যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ যেন এমন এক পরিবার, যার সকল সদস্য সুখ দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নেয় এবং চিন্তা চেতনায় ও কাজ কর্মে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। ক্ষুধার সময় এলে তাতে সবচেয়ে বড় অংশ গ্রহণকারী হন দলনেতা। সচ্ছলতা এলে দলনেতাই হন তাতে সবচেয়ে কম অংশ গ্রহণকারী। জাহেলী দৃষ্টিকোণ থেকে যারা উঁচু ও নিচু, তাদের মধ্যে বিয়ে শাদী হতে দেখে সমাজ অভিভূত হয়েছে। রসম রেওয়াজের ভারী বোঝা হালকা করার যে সহজ সরল পন্থা ইসলাম উদ্ভাবন করেছিল, তার দিকে জাহেলী সমাজের সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট না হয়ে পারেনা। কত ভালোবাসাপূর্ণ, হালকা, সাদাসিদে, শান্তিপূর্ণ জীবন ছিল! সত্যিকার অর্থে তা ছিল 'হায়াতান তাইয়্যেবা পবিত্র জীবন'।

মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভার স্ফূরণ ঘটছে, তাও সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেখেছে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মনমগজে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে মেধার বিকাশ ঘটে চলেছে। সারা আরব অবাক হয়ে দেখছে, তাদের মধ্যে কেউ আইনশাস্ত্রে, কেউ কৃষিতে, কেউ ব্যবসায় বাণিজ্যে, কেউ যুদ্ধ বিদ্যায়, কেউ প্রশাসনে, কেউ কূটনীতিতে, মোটকথা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে এক নতুন ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে।

এই চরিত্রের ছবি এঁকে কোরআন বারবার ইসলামের শত্রুদেরকেও এবং জনগণকেও বুঝিয়েছে যে, দেখ, সত্যের আদর্শ থেকে মানবতার যে নমুনা তৈরী হয়, তা কত সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ নমুনা। শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা এভাবেই সম্ভব। এই চরিত্রকে ইসলাম নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছে। অতপর বারবার এর তুলনা জাহেলী চরিত্রের সাথেও করেছে। আহলে কিতাব ও মোনাফেকদের চরিত্রের সাথেও করেছে। দুটোকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই বল কোন্‌টা ভাল। বাস্তবতার ময়দানে এভাবেই তুলনা হচ্ছিল। তাছাড়া জীবনের প্রতিটি অংগনেও আপনা থেকেই তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ চলছিল।

সংঘাত–সংঘর্ষের পরিস্থিতি একই সাথে দুটো উল্লেখযোগ্য ফলাফল বয়ে আনে। দ্বন্দ–সংঘাতে পড়লে কিছু লোকের চরিত্র গড়ে ওঠে আবার কিছু লোকের চরিত্র ভেঙ্গে তলিয়ে যায়। ইসলামী আন্দোলন সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে যাতে দ্বন্দ্ব–সংঘাতে পড়ে মুসলমানের চরিত্র আরো সুন্দর, সুষমা মন্ডিত ও পরিশোধিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিশুদ্ধি ও শিক্ষাদানের কঠোর ব্যবস্থার কারণে মুসলিম চরিত্রের ক্রমেই উন্নতি হয়েছে। অপর দিকে জাহেলী চরিত্র দ্বন্দ্ব সংঘাতে ক্রমশ অধোপতনের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলিম চরিত্রকে বারবার ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে সহনশীলতার শক্তি ও নীতির ওপর অবিচল থাকার যোগ্যতা গড়ে তোলা হয়েছে। কখনো কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, উস্কানিতে পড়ে উত্তেজিত হয়োনা। কখনো উপদেশ দেয়া হয়েছে, জাহেলী শক্তির নিশানবাহীদের সাথে জড়িয়ে পড়োনা, হতাশ হয়োনা, খারাপ ব্যবহারের জবাব ভালো ব্যবহার দ্বারা দাও, যুলুম ও বাড়াবাড়িকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ, কারো সাথে শত্রুতার কারণে বেইনসাফী করোনা, দুনিয়াদারদের সংশোধনের আশা পোষণ করোনা এবং তাদের পেছনে নিজের সময় নষ্ট করোনা, শত্রুদের প্রাচুর্য ও জাঁকজমক দেখে ঘাবড়ে যেওনা, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিওনা। তাদের প্রতিটি মনস্তাত্বিক উত্থান পতনের ওপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং সাথে সাথে তাদের কিসে ভালো হবে তা বুঝানো হয়েছে। রসূল সা. নিজে তাঁর জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এবং উত্তম সুযোগ বুঝে কখনো উপদেশ দিয়ে, কখনো ধমক দিয়ে, কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং কখনো সন্তোষ প্রকাশ করে মুসলিম চরিত্রের বিকাশ সাধন করেছেন। যার মধ্যে যেমন যোগ্যতা দেখেছেন, যার যেমন মেযাজের গঠন দেখেছেন, তাকে তারই প্রয়োজন মোতাবেক পরামর্শ দিয়েছেন। আর যার মধ্যে যেমন দুর্বলতা দেখেছেন, তার সামনে ইসলামের ঠিক সেই ধরনের দাবী তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া সামষ্টিক তৎপরতার ক্ষেত্রে মুসলিম জামায়াত যে ধরনের আচরণ প্রদর্শন করেছে, তার ওপর প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর কড়া সমালোচনা করেছেন। বদর ওহুদের যুদ্ধই হোক, বা হোদাইবিয়ার সন্ধিই হোক, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাই হোক, কিংবা অপবাদের ঘটনা হোক, প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার পর একদিকে তিনি শত্রুদের তৎপরতার বিবরণ জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন, অপর দিকে নিজের জামায়াতের বেপরোয়া সমালোচনা করে তাদের ভুলত্রুটিও ধরে দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারের উপায়ও বলে দিয়েছেন। তাঁর সাথীরা যদি তাদের শত্রুর সাথে অন্যায় কিছু করে তাহলে তাদের সে অন্যায়কে ঢেকে রাখতে বা সঠিক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেননি। বরং শত্রুর সামনে ভুল স্বীকার করেছেন, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। নাখলার ঘটনার জন্য তিনি সাহাবীগণকে তিরস্কার করেছেন। হযরত খালেদ যুদ্ধের সময় উচ্চস্বরে কলেমা পাঠকারীকে আন্তরিকতার সাথে নয় বরং প্রাণ রক্ষার্থে পাঠ করেছে ভেবে সন্দেহ বশত হত্যা করলে রসূল সা. তার ঐ কাজকে অপছন্দ করেছেন এবং তার দায়দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন। ইসলাম রসূল সা. ব্যতীত বাদবাকী সাহাবীগণকে নিষ্পাপ ও নির্ভুল বলে আখ্যায়িত করেনি। শুধু সামগ্রিকভাবে তাদেরকে পবিত্র, সৎ, ও সংশোধনযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। মুসলিম

চরিত্রকে সে সামগ্রিকভাবে জাহেলী চরিত্রের চেয়ে স্পষ্টতই উৎকৃষ্টতর, মহত্তর ও বিকাশমান বলেছে।

প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও বিরাজমান পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা কোন খেলা নয়। এটা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কাজ। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এবং খুবই ঠান্ডা ও উত্তেজনাহীন মস্তিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশের শক্তি অগ্রসরমানদেরকে কোমর ধরে পেছনে টানতে থাকে এবং সংশোধনকামীদেরকে নতুন করে বিগড়ে দিতে চায়। তাদের মনের ভেতর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ফাঁক ফোকর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে, যাতে নিজের বাতিল আকিদা বিশ্বাস, রসম রেওয়াজ ও আদত অভ্যাসকে কোন রকমে পুনরায় তার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া যায় এবং মানসিক গোলামী ও আপোষের কোন পথ খুঁজে বের করে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়। প্রতিকূল পবিবেশেও লড়াই করতে করতে যখন প্রবল শক্তিধর মানুষের শক্তি ও হিম্মত থেতিয়ে যায় এবং নিষ্ঠাবান লোকদেরও পা পেছন দিকে সরতে আরম্ভ করে, তখন মানুষ বিপ্লবী ধ্যান-ধারণাকে ছেড়ে পুরানো ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মূলনীতি ও আকীদা বিশ্বাসে না হলেও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, চালচলন ও বেশভূষায় বিজাতীয় প্রভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। শুধু এতটুকু পথ খুলে গেলেই বিদ্যমান পরিবেশ তাকে ক্রমশ প্রশস্ত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার সব কিছুই নিজের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নেয়। এক প্রজন্মের যুগে যদি সমাপ্ত করা না যায়, তবে পরবর্তী প্রজন্মের যুগে সমাপ্ত করে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন মুসলিম চরিত্র গঠন করার সময় এই বিপদের কথা পুরোপুরি খেয়াল রেখেছে। তাই সে চরিত্রকে ইস্পাত কঠিন রূপ দিয়েছে এবং সংরক্ষণের সর্বাত্মক ব্যবস্থা করেছে। একদিকে তাকে 'আশিদ্দাউ আলাল কুফফার' অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের মোকাবিলায় দুর্জয় শক্তি গড়ে তোলার এবং অন্যদিকে 'রুহামাউ বাইনাহুম' অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হবার শিক্ষা দিয়েছে। বিজাতির অনুকরণ, বিজাতির মানসিক গোলামী এবং বিজাতির সাথে গোপন আন্তরিক সম্পর্ক রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। মুসলমানদের মধ্যে এই মানসিক স্থিতি ও অবিচলতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই নও মুসলমানদেরকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল। আর কোথাও যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক একত্রিত হতো এবং তাদের কাছ থেকে 'বেদুঈন সুলভ' বায়য়াত গ্রহণ করা হতো (অর্থাৎ হিজরতের শর্ত আরোপ করা হয়না এমন বায়য়াত) তবে তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হতো যে, মোশরেকদের কাছ থেকে দূরে থাক এবং তাদের সাথে বন্ধুতা ও বিয়েশাদীর সম্পর্ক স্থাপন করোনা। নিজেদের আলাদা সমাজ গড়ে তোল। অমুসলিম পিতামাতার আনুগত্যের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, পিতামাতা যদি ইসলাম পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়, তবে কখনো তা মানা চলবেনা। ইসলামের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য চলেনা। এই চরিত্রের দৃঢ়তা এত বেশী ছিল যে, তা ইরানের জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতা দেখেও প্রভাবিত হয়নি এবং রোমের বিলাসবহুল জীবন দেখেও হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়নি। মুসলমানরা বড় বড় রাজ দরবারে নিজেদের বেদুঈন সুলভ চালচলন নিয়েই মূল্যবান কার্পেট পদদলিত করে মাথা না ঝুঁকিয়েই হাজির হয়েছে এবং পূর্ণ সাহসিকতার

সাথে নিজ বক্তব্য পেশ করেছে। এই চরিত্রকে যখন মানসিকভাবে পুরোপুরি মজবুত ও স্থিতিশীল করা হয়েছে এবং সব ধরনের হীনমন্যতার উর্ধে তুলে দেয়া হয়েছে, তখন রণাঙ্গনেও তারা বীরত্ব ও দৃঢ়তার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ববাসী অবাক হয়ে দেখেছে যে, এ চরিত্র সংখ্যায় কম ও সাজসরঞ্জামে অপ্রতুল হলেও তাকে ধ্বংস করা এবং তার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

অসংখ্য কট্টর দুশমন মুখে ব্যংগ বিদ্রুপ, গালাগাল, নিন্দাবাদ, অপপ্রচার ইত্যাদি করা সত্ত্বেও মনে মনে এই মুসলিম চরিত্রের প্রতি নিশ্চয়ই ঈর্ষা করতো, মুসলমানদেরকে নিজেদের চেয়ে উত্তম মনে করতো। আফসোস করতো যে, আমরাও যদি এই দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম। বিভিন্ন সময় বিরোধীরা তা স্বীকারও করেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর যখন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ান হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলো, মুহাম্মদ সা. কি নিহত হয়েছেন ? হযরত ওমর জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম তিনি জীবিত এবং তোমাদের কথা শুনছেন। তখন আবু সুফিয়ান বলেছিল, আবু কায়মা যদিও বলেছে যে মুহাম্মদ সা. নিহত হয়েছে, কিন্তু আমরা তোমাদেরকে ওর চেয়ে সত্যবাদী মনে করি। অনুরূপভাবে, হোদাইবিয়ার সন্ধির পর কোরায়েশ দূত উরওয়া ইবনে মাসউদ মুসলমানদের অভ্যন্তরে যে দৃশ্য দেখেছে এবং যেভাবে তা কোরায়েশ নেতাদের কাছে ব্যক্ত করেছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়, অমুসলিমরা সব সময়ই মুসলমানদেরকে নৈতিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতো। ইসলামের কট্টর বিরোধী হয়েও আবু সুফিয়ান রোম সম্রাটের সামনে মুহাম্মদ সা. ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিল তাও সাক্ষ্য দেয় যে, শত্রুতা করা সত্ত্বেও শত্রুরা মুহাম্মদ সা. ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতো। মদিনার তহশীলদার যখন খয়বরের ইহুদীদের কাছে রাজস্ব আদায় করতে গেল, তখন তার বন্টনের নির্ভুলতা দেখে তারা সাক্ষ্য দেয় যে. এটাই যথার্থ ন্যায়বিচার, যার ওপর আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিনিয়ত আরবের কোণে কোণে নবগঠিত মুসলিম সমাজের আশ্চার্য হাল হাকীকত নিয়ে আলোচনা চলতো। আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে কথাবার্তা হতো। মোটকথা, দু'জন মানুষ একত্রিত হলেই মুহাম্মদ সা., ইসলামী সমাজ, ইসলামী আন্দোলন ও মদিনার সরকারের সুকীর্তি ও সুখ্যাতিই হতো প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ইসলামী আন্দোলনের এই নৈতিক শক্তিই তার যুক্তি ও আবেদনকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতো। এটা ছিল মুসলিম চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের গণস্বীকৃতি এবং এই গণ-স্বীকৃতিই সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের অনুগত বানিয়ে দিত। ইসলামের দুর্বার আকর্ষণ কিভাবে চারদিকের জন মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছিল, তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি।

প্রথমে মক্কী যুগ প্রসংগে আসা যাক। খ্যাতনামা কবি তোফায়েল দাওসী যখন মক্কায় এলেন, তখন কোরায়েশরা তাকে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করে। অবশেষে তিনি নিজেই সাক্ষাত করেন এবং কেবল কয়েকটা আয়াত শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আমর বিন আবাসা রসূল সা. এর সুখ্যাতি শুনে সাক্ষাত করতে আসেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হন। রসূলের সা.-এর বাল্যবন্ধু দামাদ বিন সা'লাবা পরামর্শদাতা হয়ে আসেন এবং রসূলের মুখ থেকে কয়েকটা কথা শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেন। একটা

মরুচারী দস্যু গোত্রের যুবক আবু যর ইসলামের সুখ্যাতি শুনে মক্কায় আসেন এবং বিরোধী পরিবেশ থেকে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে রসূলের সা. সাথে দেখা করেন, দাওয়াতী বক্তব্য শোনেন এবং সত্যকে গ্রহণ করেন। তাঁর ভেতরে সহসা এক আবেগ জেগে ওঠে এবং তিনি কা'বার সামনে গিয়ে সত্যের বাণী ঘোষণা করেন। তারপর এই সত্য প্রেমের অপরাধের শাস্তি ভোগ করেন। এভাবে যারা ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে এক একজন দাওয়াতদাতা হয়ে যায়। কারো কারো দাওয়াতে তার পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যান। সুয়াইদ বিন সামেত রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং গভীরতম প্রভাবে প্রভাবিত হয়। আয়াস বিন মুয়াযও মদিনা থেকে এসে রসূল সা. এর দাওয়াতের সমর্থক হয়ে যান এবং মদিনায় ইসলামের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। নাজরান থেকে ২০ জন খৃষ্টানের এক প্রতিনিধিদল এসে রসূল সা. এর কাছ থেকে ইসলামের জ্ঞান লাভ করে এবং কোরায়েশদের অনেক অপচেষ্টা সত্ত্বেও তারা ইসলামের আলো বুকে ধারণ করে বিদায় হয়। আবিসিনিয়ায় যারা হিজরত করে গিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক ইয়ামানবাসী ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের মাধ্যমে স্বয়ং বাদশাহ নাজ্জাশীর মনও ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

মদিনায় আওস ও খাজরাজের লোকেরা তো রসূল সা. এর আগমনের আগে থেকেই দ্রুত গতিতে ইসলাম গ্রহণ করছিল। রসূল সা. হিজরত করে আসার পর তো এমন একটি বাড়ীও অবশিষ্ট ছিলনা, যেখানে ইসলামের আলো পৌঁছেনি। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, খ্যাতনামা ইহুদী আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রসূল সা. এর একটা সহজ সরল মামুলী ক্ষুদ্র ভাষণ শুনে এতই অভিভূত হয়ে যান যে, শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই ভাষণটা ছিল এই ঃ "হে মানব সকল, তোমরা সমাজে শান্তির বা সালামের বিস্তার ঘটাও, মানুষকে খাদ্য খাওয়াও, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ এবং গভীর রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়।" অনুরূপভাবে, আবু কায়েস সারমা বিন আবি আনাস নামক খৃষ্টান দরবেশ ইসলামী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেন। জুবাইর ইবনে মুতয়িম এসেছিলেন বদরের যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করতে। এই সময় রসূল সা. এর মুখে কয়েকটি আয়াত শুনেই হেদায়াত লাভ করেন। কোরায়েশদের দাস আবু রাফে দূত হয়ে মদিনায় এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায়। সে ফিরে যেতে চাইছিলনা। রসূল সা. বুঝালেন যে, দূতকে রেখে দেয়া যায়না। তুমি আগে মক্কায় ফিরে যাও। তারপর যদি মনে চায় মদিনায় চলে এস। আবু রাফে মক্কায় গিয়ে পরে আবার মদিনায় হিজরত করে চলে আসে। বনু কুরায়যার অপরাধের কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হলে তাদের মধ্যকার আমর বিন সা'দ ইসলাম গ্রহণ করে।

ইয়ামামার নেতা ছামামা বিন আছাল হানাফী বন্দী হয়ে আসেন এবং রসূলের সা. আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ওহুদ যুদ্ধ চলছে। ঠিক সেই সময় বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের আমর বিন ছাবেত ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাত লাভ করেন। খন্দক যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতে নাঈম বিন মাসউদ ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আবুল আ'স মদিনায় এসে একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। খয়বরের ইহুদীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে তাদের এক রাখাল

আসওয়াদ জিজ্ঞেস করে, কার সাথে এবং কোথায় যুদ্ধ হবে? সে যখন জানতে পারলো, মুহাম্মাদ সা. এর সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালেদ ও আমর ইবনু আ'স হোদাইবিয়ার সন্ধি ও মূতার যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় কোরায়েশদের দল ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা জাহেলিয়াতের ঘাঁটি থেকে লড়াই করতে করতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই সহসাই ইসলামী আন্দোলন তাদের আকৃষ্ট করে। ফুযালা মক্কা বিজয়ের সময় এবং শায়বা হুনায়েন যুদ্ধের সময় রসূল সা. কে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু নিজেরাই সত্যের তরবারীতে ঘায়েল হয়ে গেলো। হাওয়াযেন ও বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা এসে ইসলাম গ্রহণ করলে রসূল সা. মালেক বিন আওফের কথা স্মরণ করলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের আশা ব্যক্ত করলেন। রসূল সা. এর মনোভাব জানতে পেরে মালেক বিন আউফ গোপনে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঈ গোত্রের ওপর মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করলে হাতেম তাঈ এর মেয়ে বন্দিনী হয়ে মদিনায় এল। সে রসূল সা. এর কাছে সদাচারের আবেদন জানালো। রসূল সা. তার আবেদন গ্রহণ পূর্বক তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে বিদায় করলেন। সে ইসলামের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষিপ্ত নিজের ভাই আদী বিন হাতেমকে পুরো ঘটনা জানিয়ে মদিনায় উপস্থিত হবার উপদেশ দিল। আদী এল এবং সচোক্ষে পরিস্থিতি যাচাই করে যখন বুঝলো যে, রসূল সা. সত্যই আল্লাহর রসূল, তখন ইসলাম গ্রহণ করলো। কবিতার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ও রসূলের সা. বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কবি কা'ব বিন যুহায়ের স্বেচ্ছায় মদিনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইতিহাস খ্যাত কবিতা "বানাত্ সুয়াদ" রচনা ও আবৃত্তি করেন। আব্দুল্লাহ যুলবিজাদাইনকে দেখুন। এই যুবক ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজের চাচার ভয়ে কিছুদিন যাবত তা গোপন করে রেখেছিল। যখন দেখলো চাচার অনুমতি পাওয়ার আশা নেই, তখন চাচা, তার ধনসম্পত্তি, তার দেয়া পোষাক পরিচ্ছদ ও ঘরোয়া পরিবেশকে বিদায় জানিয়ে কম্বল পরিধান করে মদিনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। বাহরাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রের জনৈক ব্যবসায়ী মুনকিয বিন হাব্বান বাণিজ্যিক সফরে এসে কয়েকদিন মদিনায় অবস্থান করেন। বিদেশে ইসলামী আন্দোলনকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রসূল সা. এর ছিল। সেই অনুসারে মুনকিযের সাথে নিজেই এগিয়ে গিয়ে দেখা করলেন ও দাওয়াত দিলেন। মুনকিয ইসলাম গ্রহণ করলেন। বাড়ী গিয়ে পিতাকে দাওয়াত দিলে তার পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তার গোত্রের সাধারণ লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করে। বেশ কিছু লোক এমনও ছিল, যারা রাজত্ব নেতৃত্ব ও বড় বড় পদমর্যাদা ত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করেন।

এসব উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, ইসলামের জন্য ময়দান কিভাবে পর্যায়ক্রমে অনুকূল ও উর্বর হয়ে উঠছিল। প্রথমে একজন, তারপর দু'চারজন, তারপর শত শত, তারপর হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করতে করতে পুরো একটা দুনিয়া গড়ে ওঠে।

একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে তো দ্রুত ও সার্বজনীনভাবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এখানে কেবল সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির কথাই উল্লেখ করছি, যারা নিজ নিজ পরিবেশে অগ্রণী হয়েছিলেন। এদের একজন যখন ইসলাম গ্রহণ করতেন, তখন

তারা নিজ নিজ গোত্র এবং এলাকায়ও দাওয়াত দাতা হয়ে যেতেন। তারা নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা অন্য অনেককে এমনকি পুরো এক একটা গোত্রকেও আকৃষ্ট করতেন। তাছাড়া খোদ মদিনার দাওয়াতী কেন্দ্রের তৎপরতা ও আন্তর্জাতিক কর্মীদের তৎপরতা বহু লোককে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতো কিংবা তার সমর্থক ও সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। এ ধরনের সহানুভূতিও ইসলামী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে। এ ধরনের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোকেরা বিরোধীদের মধ্যে বসেও ইসলামের পক্ষে কথা বলতে পারতো এবং তাদের কথা শুনতে কারো মধ্যে কোন ধরনের বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা বাধা হয়ে দাঁড়াতোনা। এ ধরনের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোক কোরায়েশ, ইহুদী ও বেদুঈনদের মধ্যেও ছিল এবং প্রধানত তারাই হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় কোরায়েশদেরকে চুক্তি সই করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ ধরনেরই এক ব্যক্তি ওহুদ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ানকে ফিরে এসে পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিল। এ ধরনেরই এক ব্যক্তি রসূল সা. 'আবু তালেব গিরী উপত্যকায়' (শিয়াবে আবু তালেব) বন্দী থাকাকালে তাঁদের কাছে খাদ্যের একটা চালান যেতে বাধা দেয়ার বিরোধিতা করেছিল। এ ধরনের লোকেরাই এই অন্যায় বয়কট চুক্তির অবসান ঘটিয়েছিল। ইহুদী হয়েও যে মুখাইরিক ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে জীবন দিয়েছিল, সেও এই ধরনেরই এক ব্যক্তি ছিল। মোটকথা, ইসলাম গ্রহণকারীদের পাশাপাশি এ ধরনের সমর্থক - সহানুভূতিশীলদেরও একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি হতে থাকে। ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পথ সুগম করার পেছনে এই গোষ্ঠীরও কিছুটা অবদান ছিল। এদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। সারকথা হলো, ইসলামী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আহ্বায়কদের গোষ্ঠী সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদিনা ছিল তাদের সবার প্রেরণার উৎস। তার কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সত্যান্বেষীরা ইসলামের সর্বত্র কলেমার জ্যোতি নিজ নিজ বৃত্তে পৌঁছে দিচ্ছিল। মদিনা ছিল যেন সূর্য, আর তার আশ পাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ তার কাছ থেকে আলো লাভ করে পরিবেশকে করছিল আলোকিত।

এখানে আমি সংক্ষেপে এমন কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরছি, যা দ্বারা বুঝা যাবে যে, এক বা গুটিকয় ব্যক্তি কিভাবে পুরো এক একটা গোত্রকে বা অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে। একটা উদাহরণ, সম্ভবত সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল উদাহরণ হলো মদিনার যুবক সুয়াইদ বিন সামেত মক্কায় যেয়ে রসূল সা. এর কাছ থেকে কলেমায়ে তাইয়েবার আলো অর্জন করে এবং তারপর তার কাছ থেকে মদিনার অনেকে প্রভাবিত হয়। এভাবে এক পর্যায়ে মদিনা ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তোফায়েল দাওসী যদিও নিজের মেজাজের কারণে পুরো গোত্রকে তাড়াতাড়ি প্রভাবিত করতে পারেননি, কিন্তু তার কারণে ইয়ামানে ইসলামী আন্দোলন পরিচিতি লাভ করে। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের দ্বারা প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য কারো প্রেরণা ছাড়াই আশয়ার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। দামাদ বিন সা'লাবার দাওয়াতে তার পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আবু যর গিফারী ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে মক্কা থেকে ফিরলে তার দাওয়াতে তাঁর গোত্রের অর্ধেক লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। বাকী অর্ধেক রসূল সা. মদিনায় যাওয়ার পর

মুসলমান হয়। তারপর গিফার গোত্রের কাছ থেকে আসলাম গোত্রেও ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে পুরো গোত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়। মুনকিয বিন হাব্বানের মাধ্যমে বাহরাইনে ইসলামের বিস্তার ঘটে। কিছুকাল পর মুনকিয ১৪ জন সাথী নিয়ে মদিনায় এসেছিলেন। মোটকথা, ব্যাপারটা ইনজীলের সেই উক্তিটার মতই প্রতিভাত হয় যে, 'আল্লাহর রাজত্বের (সত্যের দাওয়াতের) উদাহরণ খামিরের মত। এক মহিলা আটার সাথে একটু খামির মিশিয়ে দিলে আটাই খামিরে পরিণত হয়।"

ইসলাম যেখানেই পৌঁছতো এবং কিছু লোক তা গ্রহণ করতো, সেখানেই অনিবার্যভাবে একটা সমাজই তৈরী হতো। মসজিদ শুধু নামাজের ঘর হতোনা, বরং ইসলামের যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হতো। তা হতো একাধারে শিক্ষাঙ্গন, পরামর্শস্থল, সামাজিক সমাবেশস্থল ও মেহমানখানা। মসজিদ হতে আসলে ইসলামী আন্দোলনের প্রতীক এবং মসজিদের অস্তিত্ব গোটা এলাকায় এ কথা ঘোষণা করে দেয়ারই নামান্তর হতো যে, এ জায়গা এখন "ইসলামের ঘাঁটি।" এ জন্য রসূল সা. সদ্য মুসলমান হওয়া গোত্রগুলোকে মসজিদ বানানোর নির্দেশ দিতেন। আর সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিতেন, যে এলাকায় আযানের শব্দ শোনা যায়, সেখানে যেন অস্ত্র চালানো বন্ধ রাখা হয়। এ নির্দেশ আসলে আরো মসজিদ নির্মাণের উৎসাহ প্রদানের শামিল। মুসলিম বসতিতে লোকেরা তাদের নতুন বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের একটা উপযুক্ত পন্থা হিসাবে মসজিদ বানাতো। সেখান থেকে আযানের আকারে ইসলামী আকিদা প্রচার করা হতো এবং জামায়াতে নামায আদায়ের মাধ্যমে ইসলামী সংঘবদ্ধতার প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। রসূল সা. এর উৎসাহ দানের ফলেই তাঁর জীবদ্দশাতেই মসজিদ নির্মিত হতে থাকে। বাহরাইনে শুরুতেই একটা মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদে নববীর পর প্রথম জুমা এখানেই পড়া হয়। মসজিগুলো জনগণের প্রতিষ্ঠান হতো এবং তা সরকারী অভিভাবকত্বে চলতো। মদিনা থেকে যাদেরকে কোন এলাকায় কর্মকর্তা বানিয়ে পাঠানো হতো, তারাই হতো সেখানকার মসজিদের ইমাম। যে সব গোত্র মদিনার প্রশাসনের আওতার বাইরে থাকতো, তারা তাদের মসজিদের ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে রসূল সা. এর পরামর্শ নিত। অতপর রসূলের নির্দিষ্ট করে দেয়া মাপকাঠি অনুসারে ইমাম নিয়োগ করতো। যে সব জায়গায় রসূল সা. কোন যুদ্ধে বা সফরে থাকাকালে অবস্থান করেছেন, বা নামায পড়েছেন বা কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, সে সব জায়গায় অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

চুক্তি ও সমঝোতার শক্তি

জনগণের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের যে ব্যাপক কাজ উপরোক্ত প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় তার সাথে আরো কিছু বড় বড় সহায়ক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল মদিনার রাজনৈতিক প্রভাব সম্প্রসারণ। এই প্রভাব সম্প্রসারণের কাজটা অনেকাংশে সমাধা করা হয় চুক্তি ও মৈত্রী সম্পর্কের মাধ্যমে। চুক্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে রসূল সা. কর্তৃক সরকারের প্রভাব বলয় সম্প্রসারণ এবং এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মনোযোগ দান থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যতদূর সম্ভব, যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন এবং চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি

করতে চাইছিলেন, যাতে করে এ ধরনের শান্ত পরিবেশে দাওয়াতের কাজ ভালোভাবে করা যায় এবং সামরিক উত্তেজনা মাঝখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যেখানে ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র ও শান্তি রক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে, সেখানে তো তিনি কোন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেননি। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যদি সম্ভব হতো এবং শান্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ, স্থিতিশীলতা ইসলামের দাওয়াত দেয়ার বাধাহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হতো, তাহলে তিনি সন্ধি ও সমঝোতার পথ কখনো পরিহার করেননি। খোদ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তরবারীর শক্তি দিয়ে নয়, বরং সাংবিধানিক চুক্তির জোরে সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও তার প্রভাব সম্প্রসারণের জন্য তিনি মিত্রতার সম্পর্ককে এত ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন যে, তার তুলনায় সামরিক ব্যবস্থার অনুপাত ছিল নিতান্তই কম।

চুক্তি ও মৈত্রী ভিত্তিক সম্পর্ক গড়া সহজ কাজ নয়। বিশেষত, ধর্মীয় মতভেদ ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ যখন বিদ্যমান থাকে, পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলো মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে এবং ব্যাপারটা যদি সাধারণভাবে একেবারেই পূর্ব পরিচয়বিহীন গোত্র ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত হয়, সেক্ষেত্রে এ কাজে অত্যধিক রাজনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। শ্রোতার অবস্থা, মানসিকতা ও শক্তি সম্পর্কে জানা, সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন বিশেষ সময়ে বিরাজমান শক্তির ভারসাম্যকে উপলব্ধি করা, বিরোধী জনগোষ্ঠী সমূহের প্রভাব প্রতিপত্তি পর্যবেক্ষণ করা, এমন শর্ত চিহ্নিত করা, যা কোন প্রতি পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে আলাপ আলোচনাকে প্রভাবশালী করা ইত্যাকার বহু অত্যাবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রকৃত পক্ষে রসূল সা. এই ক্ষেত্রে যে পর্যায়ের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, নেতাসুলভ দক্ষতা ও কূটনৈতিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তার নজীর কোথাও পাওয়া যায়না। নজীর পাওয়া যায়না এ জন্য যে, রসূল সা. এত সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে ইসলামী আদর্শের, নিজের নৈতিক মূলনীতির এবং নিজের রাজনৈতিক মর্যাদার এক বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি হতে দেননি। নচেত কূটনৈতিক অংগনে যেমন মারাত্মকভাবে নৈতিকতার অপমৃত্যু ঘটানো হয়, তার কারণে 'ডিপ্লোমেসী" শব্দটার দুর্নাম রটে গেছে। স্বয়ং রাজনীতি আজ একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। বলা হয়ে থাকে, রাজনীতির কোন চরিত্র নেই, এর কোনো শেষ কথা নেই। রাজনীতি এমন এক ট্যাংক, যা যেদিকে চলে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ পদদলিত করতে করতে চলে। কিন্তু রসূল সা. ডিপ্লোমেসি ও রাজনীতির অর্থ একেবারেই পাল্টে দিয়েছেন। এ কাজ দুটোকে শুধু নোংরামী থেকেই মুক্ত ও পবিত্র করেননি, বরং তাতে সততা ও এবাদতের প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছেন। ইসলামী নীতিমালা অনুসারে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, তাতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করা এবং এর মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলোকে সংঘবদ্ধ করে নিজের চারপাশে সমবেত করা আজ পুস্তকাদিতে পড়ার সময় সহজ কাজ বলে মনে হয়। কিন্তু আরবের মরুভূমিতে বাস্তবে এসব কাজ যিনি করছিলেন, তিনিই জানতেন যে, তা কত কঠিন কাজ ছিল।

চুক্তিভিত্তিক মৈত্রীর এই প্রক্রিয়ায় শুধু যে মুসলিম প্রচারকদের যাতায়াত, জনগণের সাথে অবাধ মেলামেশা এবং চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোকজনের মদিনার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের

অবারিত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপকতর প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল তা নয়, বরং তা এদিক দিয়েও ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছিল যে, এর কারণে ইসলামী নেতৃত্বের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল। সীমিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার সৃষ্ট পূন্যবান মানুষদের প্রতি জনসাধারণ যতই ভক্ত ও অনুরক্ত হোক না কেন এবং তাদের পবিত্রতায় যতই আস্থাশীল হোক না কেন, সামষ্টিক জীবনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি কখনো তাদের হাতে অর্পণ করেনা। সামষ্টিক জীবনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চিরকাল সেই সব লোকের হাতেই অর্পিত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে জনগণের ধারণা রয়েছে যে, তারা সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী। অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, জনগণ কোন দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে যে, তারা তো খুবই ভালো মানুষ, অনেক ভালো কাজ করে, জনসেবা করে ইত্যাদি। কিন্তু তাদের এই প্রশংসার মাধ্যমে তারা বুঝাতে চায় যে, দুনিয়ার কায়কারবারের জন্য ঐ ভালো মানুষেরা খুবই অযোগ্য। জনসাধারণের প্রশংসা শুনে এই শ্রেণীর লোকেরা প্রায়শ এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয় যে, আমাদের পক্ষে জনমত খুবই ভালো। তৎকালীন মুসলিম সংগঠন যদি এমন মানবীয় চরিত্র তৈরী করতো, যা ধর্মীয় দিক দিয়ে অত্যন্ত পুন্যবান ও পরহেজগার বটে, কিন্তু দুনিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীতে কোন প্রকার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে অক্ষম, তা হলে জনগণের প্রতিক্রিয়া এই হতো যে, ওরা ভালো মানুষ, ভালো ভালো কথা বলে এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের দ্বারা নতুন কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজের নেতৃত্ব দানে তারা সক্ষম হবে – এমন আশা কখনো জনগণ করতে পারতোনা। ইসলামী আন্দোলন এমন "আল্লাহ ওয়ালা" লোক তৈরী করার জন্য আসেনি, যারা ব্যক্তি হিসেবে শুধুই আল্লাহ ওয়ালা, ভালো মানুষ ও সরলমতি, কিন্তু সামষ্টিক জীবনে কর্তৃত্বশীল হবার মত রাজনৈতিক দক্ষতার অধিকারী নয়, যাদেরকে জনগণ বিকল্প ও উন্নততর নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গ্রহণ করেনা এবং যাদের দ্বারা কোন উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত তৈরী হবে বলে আশা করতে পারেনা। ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্টি করা মুসলিম নেতা ও কর্মীরা যতবেশী খোদাভক্ত ও খোদাভীরু ছিল, ততই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দক্ষতার অধিকারীও ছিল। এ ব্যাপারে তারা নিজ নিজ কাজের মধ্য দিয়েই নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। সমকালীন জনতা এভাবে পর্যায়ক্রমে রসূল সা. ও তাঁর নেতৃত্বে কর্মরত মুসলিম শক্তির নেতত্বসুলভ যোগ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হতে থেকেছে, মদিনা তাদের আশার কেন্দ্রবিন্দু হতে থেকেছে এবং এর ফলে তাদের মনও ক্রমাগত ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হতে থেকেছে। মোটকথা, দ্বীনের দাওয়াত ও রাজনৈতিক প্রভাবের সম্প্রসারণ– এই দুটো কাজ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং এতদোভয়ের সম্মিলিত প্রাণশক্তিই ইসলামী আন্দোলনকে গতিশীল করেছিল দুর্বার অগ্রযাত্রার দিকে।

আসুন, এই মূল তত্ত্বকে মনে রেখে রসূল সা. এর প্রতিষ্ঠিত সুদূর প্রসারী চুক্তি ভিত্তিক সম্পর্কগুলোর পর্যালোচনা করি। এ সম্পর্কগুলো তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল।

১. আকাবার চুক্তি

চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় আকাবার চুক্তির কথা। এ চুক্তি একাধারে ধর্মীয় অঙ্গীকার এবং রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞাও। আকাবার প্রথম বৈঠকে রসূল সা. এর হাতে হাত দিয়ে মদিনার একদল টগবগে যুবক রসূল সা. এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের স্বীকৃতি দেয়। দ্বিতীয় বৈঠকে রসূল সা. এর রাজনৈতিক নেতৃত্বের আনুগত্যের ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত হয়। মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার পথে রাস্তার দু'দিকে পাহাড়ের সমান্তরাল উঁচু প্রাচীর অবস্থিত। মিনা থেকে এক ফার্লং আগে বাম দিকের পাহাড়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা ছোট উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। এটাই সেই সুরক্ষিত জায়গা, যেখানে রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে আকাবার চুক্তি সংঘটিত হয়। মদিনায় ইহুদীদের উপস্থিতির কারণে আনসাররা ঐশী ধর্মের সাথে এবং নবুয়তের ধারাক্রমের সাথে মোটামুটি পরিচিত ছিল। প্রতিশ্রুত শেষ নবী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের জানা ছিল। ইহুদীরা যে তাদেরকে বিভিন্ন সময় ভয় দেখাতো, "সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবী এলে আমরা তাকে সাথে নিয়ে তোমাদের পরাভূত করবো", এ কথাও তাদের মনে ছিল। এভাবে আনসারদের মধ্যে একদিকে যেমন ঐশী হেদায়াতের চাহিদা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, অপরদিকে অবচেতনভাবে এই আবেগও জন্মে দিয়েছিল যে, প্রতিশ্রুত সেই নবী এলে আমরাই সর্ব প্রথম তার প্রতি ঈমান আনবো। এই সাথে আওস ও খাজরাজের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে ধারা চলে আসছিল, তাতে তারা ক্লান্ত হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার একটা যুগের জন্য অপেক্ষমান ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল এইযে, সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশের কারণে দুই গোত্র একে অপরের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলনা। তৃতীয় কোন শক্তি তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। এ সমস্ত কারণে মদিনার বুদ্ধিমান ও শান্তিপ্রিয় লোকেরা যখনই রসূল সা. এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হলো, এবং রসূল সা. এর দাওয়াত শোনার সুযোগ পেল, অমনি তাদের মন ঐ দাওয়াত গ্রহণের জন্য উৎসুক ও উদগ্রীব হয়ে উঠলো। নবুয়তের খবরাখবর তো তাদের কাছে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষ আলোচনায় তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। রসূল সা. এর সুদর্শন চেহারা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর দাওয়াতী বক্তব্যের সাথে যুক্ত হয়ে সেই মানসিক বিপ্লবকে চূড়ান্ত রূপ দিল, যার জন্য আনসারদের মনমগজ ও মেজাজ আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। সেই মুহূর্তটা ছিল একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন কতিপয় আনসার (প্রথম বায়য়াতের সময়) কোরায়েশদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে রওনা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য সফল হলে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাদের ইচ্ছাটা পাল্টে যায়। তারা কোরায়েশদের চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে মক্কার সেই উদীয়মান সূর্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যে সূর্য ইতিহাসের উদয়াচল থেকে নতুন আলোকরশ্মী নিক্ষেপ করে দিগন্ত উদ্ভাসিত করছিল।

প্রথম বারের বায়য়াতে রসূল সা. কয়েকটি আকীদাগত ও নৈতিক বিষয়ে অংগীকার গ্রহণ করেন। তারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার

করবেনা, সন্তানদের হত্যা করবেনা, কারো বিরুদ্ধে কোন অপবাদ আরোপ করবেনা, এবং সৎকাজের ব্যাপারে রসূল সা. এর আদেশ অমান্য করবেনা– এই মর্মে তাদের অংগীকার গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বায়য়াতে আনসারগণ যে ক'টা কথা সংযোজন করেন তা হলো ঃ "আমরা সর্বাবস্থায় রসূল সা. এর আদেশ শুনবো ও আনুগত্য করবো, চাই পরিস্থিতি অনুকূল হোক কিংবা বিপদ সংকুল হোক, কোন আদেশ আমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, অথবা কোন আদেশ আমাদের মতের বিরুদ্ধে যাক। আমরা আমাদের নেতার সাথে দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত হবোনা এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবোনা।

এই সংক্ষিপ্ত অংগীকারের মাধ্যমে মুহাম্মদ সা. ও আনসারদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং খোলাখুলিভাবে এই দল একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হলো। রসূলের সা. নেতৃত্বকে তারা সর্বতোভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হিসাবে গ্রহণ করলো। তারা এই মর্মেও প্রতিজ্ঞা করলো যে, নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ও পদমর্যাদাকে ছিনিয়ে নেয়ার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা। পরামর্শের মূলনীতি এরূপ স্থির হয়ে গেল যে, প্রত্যেক বিষয়ে যা সঠিক ও ন্যায়সংগত, তাই উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ব্যাপারে অংগীকার করা হলো যে, আমাদের ওপর যে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হবে, তা সারা দুনিয়ার নিন্দা সমালোচনাকে উপেক্ষা করেও বাস্তবায়িত করবো। এটা এমন একটা অংগীকার ছিল যে, এরপর এই দলের কর্তৃত্বে যে কোন ভূ–খন্ড আসুক না কেন, তার ওপর অন্য কোন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব না থাকলে এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পুরোপুরি তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকলে সেই দল তৎক্ষণাত একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে।

এই বিষয়গুলোর সাথে সাথে আরো স্থির হয় যে, রসূল সা. মদিনায় হিজরত করার পর চুক্তিবদ্ধ আনসারগণ রসূল সা. কে ঠিক এমনিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যেভাবে তারা আপন স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, মদিনার ইসলামী দলের সাথে রসূল সা. এর প্রতিরক্ষামূলক ঐক্যের চুক্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এদিক দিয়ে আকাবার চুক্তির রাজনৈতিক মূল্য আরো বেড়ে গিয়ে 'বিপ্লবী' হয়ে যায়।

এরপর রসূল সা. এর নির্দেশে মদিনার আনসারদের ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে বারোজন প্রতিনিধি বা নকীব নিযুক্ত করা হয়, যারা রসূল সা. এর কাছে দায়ী থাকবে। ইসলামী দাওয়াতের বিস্তার ও সম্প্রসারণ ছাড়াও রাজনৈতিক দায়িত্বও তাদের ওপর অর্পণ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকরের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল সা. এই নকীবগণকে বলেন, "তোমরা তোমাদের জনগণ সম্পর্কে ঠিক সেইভাবে দায়িত্বশীল থাকবে, যেমন হযরত ঈসার সামনে তার সঙ্গী হাওয়ারীগণ দায়িত্বশীল ছিল। আর আমিও আমার জনগোষ্ঠী অর্থাৎ মক্কাবাসী সম্পর্কে দায়িত্বশীল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬–৫৭, আহদে নববীকে ময়দানহায়ে জং, ডক্টর হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী, পৃঃ ৭–১০)

নকীবদের নিযুক্তির পর মদিনার যে প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরী হয়, তা শুধু ধর্মীয় ছিলনা, বরং তা হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক এবং বিপ্লবীও। এ ধরনের অবকাঠামোর স্বতস্ফূর্ত ও

স্বভাবসুলভ দাবী, তা যেন যত শীঘ্র সম্ভব, বরং প্রথম সুযোগেই রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। বাস্তবেও হলো তাই, রসূল সা. এর হিজরতের কয়েক মাস পরই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এ থেকে বুঝা গেল, ইসলামী আন্দোলন প্রাথমিক দাওয়াতের যুগ পূর্ণ করে রাষ্ট্রীয় যুগে প্রবেশ করেছিল চুক্তিরই মাধ্যমে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়।

২. সাংবিধানিক চুক্তি

রসূল সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম চুক্তি ছিল মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তনকারী চুক্তি। সম্ভবত সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটা রাষ্ট্রও কমবেশী শক্তি প্রয়োগ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি, একটা আদর্শিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তো আরো বেশী অসম্ভব। কেননা তার মূল আদর্শ গোটা পরিবেশে অসাধারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে থাকে এবং একটা অজানা পরিবেশে ও রকমারি মানুষের সহযোগিতা নিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে প্রচন্ড সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে ওঠে। মদিনার এই সাংবিধানিক চুক্তি রসূল সা. এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও নেতা সুলভ দক্ষতার এমন উদাহরণ তুলে ধরে, যার তুলনা কোথাও নেই। এই চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যে মোহাজেরগণ, আনসারদের প্রধান দুটো গোত্র আওস ও খাজরাজের মুসলিম মোশরেক ও ইহুদী ব্যক্তিগণ এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত ইহুদী গোত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত।

আসলে রসূল সা. নিজের মামা বাড়ীর দেশ হিসাবে মদিনাকে শিশুকাল থেকেই চিনতেন। শিশুকালে সেখানে গিয়েছেন এবং অবস্থান করেছেন। তারপর ইসলামের আহ্বায়ক হিসেবে মক্কার জীবনেরই শেষ দু'তিন বছর মদিনার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানকার ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা সম্পর্কে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এরপর সেখানকার অধিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়ে সাম্প্রতিকতম তথ্যাদি সরাসরি জানার যেটুকু কমতি ছিল, তিনি হিজরত করে মদিনায় আসার পর সেই কমতিও দূর হয়ে গিয়েছিল। গোটা মদিনার জনসংখ্যা তখন আনুমানিক পাঁচ হাজার ছিল এবং তারও প্রায় অর্ধেক ছিল ইহুদী। এই অধিবাসীদের মধ্যে আনসার ও মোহাজের সমেত মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ শোর বেশী ছিলনা। এই সক্রিয়, সদাজাগ্রত সচেতন ও সুসংগঠিত সংখ্যালঘুকে সাথে নিয়েই রসূল সা. পাঁচহাজার অধিবাসীকে নিজ নেতৃত্বের আওতায় নিয়ে আসেন। আনসারদের দুটো প্রধান গোত্র ১২টি শাখাগোত্রে বিভক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত। সাধারণ অধিবাসীরাও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত ছিল। কেননা আরব ও ইহুদী- উভয় জনগোষ্ঠীই দু'ভাগে বিভক্ত থাকতো এবং সব সময় কোন না কোন ব্যাপারে দু'পক্ষের কোন্দল লেগেই থাকতো। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কোন্দল-কলহে সব ক'টা জনগোষ্ঠীই অতিষ্ঠ ও শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। শান্তির এই সার্বজনীন পিপাসা মেটাতে একটা গঠনমূলক নেতৃত্বের চাহিদা তীব্র হয়ে উঠেছিল। নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণের জন্য অল্প কিছুদিন আগেই আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে মুকুট পরানোর আয়োজন চলছিল। কিন্তু সহসা রসূল সা. ও তাঁর দাওয়াতের কথা শুনে আনসারদের মনোযোগ সেদিকেই আকৃষ্ট হয়।

ইহুদীদের অবস্থাও এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের দুটো বড় গোষ্ঠী অভ্যন্তরীণভাবে দশটা উপগোত্রে বিভক্ত ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল।

স্বজাতির বাসভূমি থেকে দূরে অবস্থিত এই ইহুদীরা নিজেদের অস্তিত্ব নিপাতের আশংকায় জর্জরিত ছিল। তারপর সহসা যখন রসূল সা. আনসারদেরকে নিজের সাথে যুক্ত করে নিলেন এবং তাদের সাথে ইহুদীদের সাবেক মৈত্রী সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগলো, তখন ইহুদীরা অনুভব করলো, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রসূল সা. আল্লাহর ওহির আওতায় ইহুদীদের মনকে জয় করা ও তাদের উত্তম ভাবাবেগকে আকৃষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলে রাজনৈতিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়ে যায়। মদিনার সর্বশ্রেণীর অধিবাসীকে জানা, তাদের স্বার্থ, সমস্যা ও মনস্তত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং সবাইকে একই লক্ষ্যের দিকে চালিত করার মত বিরাট রাজনৈতিক কীর্তি এত অল্প সময়ে সমাধা করা রসূল সা. কে রাজনৈতিকভাবে এত উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে যে, তা ভাবতে গেলেও আমরা দিশেহারা হয়ে যাই।

মুসলিম দল এমনিতেই আকীদা বিশ্বাস ও নৈতিকতার দিক দিয়ে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্বে একটা অত্যন্ত অটুট ও সুদৃঢ় সংগঠনের অধিকারী ছিল। তদুপরি আকাবার বায়য়াত তাকে একটা রাজনৈতিক বিপ্লবী দলে পরিণত করেছিল। তাছাড়া আদর্শবাদী দল হওয়ার কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকাশ ও বিবর্তনের যোগ্যতাও তার ছিল, তাই এ দল সহজেই মদিনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করে। আনসার গোত্রগুলোতে কোন বিকল্প আদর্শও ছিলনা। নেতৃত্বও ছিলনা। কেননা তাদের সরদারদের বেশীর ভাগ আগেই ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ সব গোত্রের ভেতরে যে সব মোশরেক বা ইহুদী ব্যক্তি ছিল, তারা সংখ্যায় নেহাত কম না হলেও কোন বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিলনা। তারা ছিল নীরব এবং নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের অনুসারী। একটা দুটো আরব বা ইহুদী গোত্র মুসলমানদের সামনে তেমন গুরুত্বের অধিকারী ছিলনা। মদিনার অধিবাসীদের এই বিন্যাস রসূল সা. এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাই তিনি প্রাথমিক সমস্যাবলীর সমাধান করে কয়েক মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলেন। আলোচ্য চুক্তি ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিস্টদের পর্যালোচনা অনুসারে ৫৩টা ধারা সম্বলিত। ঐতিহাসিক রেকর্ডের আলোকে এই চুক্তি সম্পর্কে একটা বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই চুক্তিটা হিজরী ১ সালে পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ হয়। অন্যদের মতে, এর একাংশ ১ সালে এবং অপরাংশ বদর যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ১ থেকে ২৩ নং ধারা এবং ২৪ থেকে ৪৭ নং ধারা পর্যন্ত এর দুটো পৃথক অংশ। আমরা যদি এই দ্বিতীয় মতটাকে গ্রহণ করি, তাহলে এতেও রসূল সা. এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার নিদর্শন দেখতে পাই। রসূল সা. প্রথমে মোহাজেরগণ ও সমস্ত আনসার (অমুসলিমসহ) দের নিয়ে রাজনৈতিক অবকাঠামো গঠন করেন। এরপর ইহুদী গোত্রগুলো নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে দুর্বল ও বিপন্ন অনুভব করে থাকতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তারা একেবারেই 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় পতিত হয়েছিল। তারপর তারা যখন মুসলমানদেরকে বদরের ময়দান থেকে বিজয়ী হয়ে

ফিরতে দেখলো, যা তারা আশাই করতে পারেনি, তখন তারা হয়তো ভেবেছে যে, সময় থাকতে এখনো আমাদের মদিনার রাজনৈতিক অবকাঠামোতে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করা উচিত।

এই সাংবিধানিক চুক্তি সম্পর্কে ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকীর মন্তব্য হলো, ইতিহাসে কোথাও এর নজীর নেই। এটি অত্যন্ত উচ্চাংগের রাজনৈতিক দক্ষতার সাথে ও অত্যন্ত সতর্ক দালিলিক ভাষায় লিখিত। এতে রসূল সা. নিজের ইপ্সিত আদর্শিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলোর পক্ষে সর্বশ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। এই দলীলের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা এখানে প্রাসংগিক হবে বলে মনে হয়, যাতে এর রাজনৈতিক মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

এই দলীল শুরু করা হয়েছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" দিয়ে। এর শিরোনাম হলোঃ

"এই লিখিত দলীল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে জারীকৃত।"

এভাবে এর সূচনাতেই ইসলামের মৌলিক রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই দলীলের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক অবকাঠামো গঠিত তার কেন্দ্রীয় উপাদান মুসলমানদেরকেই রাখা হয়েছে। যেমন প্রারম্ভেই বলা হয়েছে ঃ

"কুরাইশ এবং ইয়াসরেব মুমিন এবং মুসলমান এবং যারা তাদের অনুসরণ করে এবং যারা তাদের অনুগামী হয় আর যারা তাদের সংগে জেহাদে অংশ নেয় (তাদের সকলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে)"

এতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মক্কা থেকে আগত ও মদিনার মুমিনগণ। বাদবাকীরা তাদের অনুসারী হিসেবে নাগরিকত্ব লাভ করবে। ইহুদী গোত্রগুলোকে চুক্তির অংশীদার করে "মুমিনদের সংগে" শব্দ প্রয়োগ করে রাজনৈতিক-ভাবে একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ধারা ২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত)।

এতে আরো বলা হয়েছে যে, 'মুমিনরা পরস্পরের ভাই' (ধারা-১৫)। যুদ্ধ ও সন্ধিতে সকল মুসলমানকে সমান অংশীদার ঘোষণা করা হয়েছে (ধারা-১৭)। মুসলমানদেরকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা কিসাস (হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান) বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং খুনীকে কখনো আশ্রয় না দেয়। তাই বলে কেউ যেন বাড়াবাড়ি না করে এবং যে বাড়াবাড়ি করে, তার ওপর যেন প্রতিশোধ নেয়া হয় (ধারা-১৯, ২১, ৩২)। কোন মুমিন কোন কাফেরের বদলায় কোন মুমিনের প্রাণ সংহার করতে পারবেনা। কোন মুমিনের বিরুদ্ধে কোন কাফেরকে সাহায্যও করতে পারবেনা (ধারা-১৪)। যে কোন নগন্য মুসলমানও যে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারে এবং তাকে আল্লাহর অর্পিত দায় হিসেবে সবাইকে বহন করতে হবে (ধারা-১৫)। যখন কোন মতভেদ হয়, তখন আল্লাহ ও মুহাম্মাদ সা. এর কাছ থেকে তার ফায়সালা নিতে হবে (ধারা-২৩)। খোদাভীরু মুমিনদের কর্তব্য, তারা যেন প্রত্যেক পাপাচার, অপরাধ ও অত্যাচারের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হয় (ধারা-১৩)। প্রাথমিক অংশে সংবিধানের আদর্শিক

প্রেরণাকে উজ্জীবিত করার জন্য বারবার বলা হয়েছে যে, অমুক অমুক (মুসলমান) গোত্রকে ফিদিয়া ইত্যাদির ব্যাপারে "ন্যায়নীতি" ও "ইনসাফ" অবলম্বন করতে হবে। আর তা করতে হবে "মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এর যে অর্থ প্রচলিত আছে সেই অর্থে" (ধারা ৩ থেকে ১২)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পরিভাষা "ফী সাবীলিল্লাহ" এই সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (ধারা-১৯)। অনুরূপভাবে "যুলুম" "গুনাহ" ও "সৎকাজ" এই তিনটে পরিভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (ধারা–৩৬)। সংবিধানে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, খোদাভীরু ও সংযমী মুমিনরা সবচেয়ে সঠিক পথে আছে (ধারা–২০)। "সাহায্য পাওয়া মযলুমের অধিকার" এই কথা দ্বারা একটা বিশুদ্ধ ইসলামী মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে, যা একটা আন্তমানবিক মূলনীতিও বটে। এ মূলনীতির পক্ষে সকল পক্ষের স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই সংবিধানের বক্তব্যগুলোকে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও আনুগত্যবোধ সহকারে পালন করবে, আল্লাহ তার সহায় থাকবেন (ধারা–৪২, ৪৬ ও ৪৭)।

এই দলীলে রাজনৈতিক বিষয়গুলো কত সুস্পষ্টভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে, তাও দেখুন। দলীলে সাক্ষরদাতাদের আবাসিক এলাকা অর্থাৎ মদিনা শহরের প্রায় একশো বর্গমাইল সম্বলিত মধ্যবর্তী এলাকাকে (মদিনার ভৌগলিক পরিচিতি ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভূ-খন্ড (Territory) বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে পবিত্র এলাকা হিসাবেও ঘোষণা করা হয়েছে (ধারা–৩৯)। আগে থেকেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা আমাদের অনুসারী হবে, তারা যাবতীয় নাগরিক অধিকার সহকারে সাহায্য ও সমানাধিকার লাভ করবে। যে ধারাটায় এ কথা বলা হয়েছে, তাতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ধারায় একাধারে ইসলাম গ্রহণের উৎসাহও দেয়া হয়েছে, আবার যে কোন রাজনৈতিক সংকটের প্রতিবিধানও করা হয়েছে (ধারা–১৬)। এই চুক্তির সাক্ষরদাতাদের সকলকে একটা রাজনৈতিক একক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ انهم امة من دون الناس (ধারা–১)। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন এর ২৩ নং ধারা, যাতে যে কোন মতভেদের নিস্পত্তির অধিকার দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা. কে আর কোন কলহ বিবাদ বা হত্যাকান্ড সংঘটিত হলে তাও আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সা.-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে (ধারা–৪২)। কোন আঘাত বা হত্যার বদলা গ্রহণে বাধা দেয়া যাবেনা (ধারা–৩৬)। অত্যাচারীর অত্যাচার ও হত্যাকারীর অপরাধের দায়দায়িত্ব শুধু অপরাধীর নিজের ওপর বা তার পরিবারের ওপর পড়বে (আগে অপরাধীর গোত্র গোষ্ঠী সমেত দায়ী হতো) অন্য কারো ওপর নয় (ধারা ২৫, ২৬)। রাজনৈতিক অবকাঠামোর প্রাথমিক একক ধরা হয়েছে প্রতিটি গোত্রকে এবং এটাকে মেনে নিয়েই তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা নীতির ব্যাপারে স্থির হয় যে, ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ হলে সাক্ষরকারী পক্ষগুলোর জন্য পারস্পরিক সাহায্য করা জরুরী হবে (ধারা ৪৪)। চুক্তির সাক্ষরকারী কোন পক্ষের সাথে যদি কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষরকারীকে আন্তরিকতা সহকারে সাহায্য করা সাক্ষরকারীদের সকলের কর্তব্য (ধারা ৩৭)। এই

দলীল একটি ধারার মাধ্যমে প্রতিরক্ষার কর্তৃত্বও রসূল সা. এর হাতে অর্পণ করেছে। এতে বলা হয়েছে, রসূল সা. এর অনুমতি না নিয়ে কেউ কোন সামরিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হবেনা (ধারা ৩৬)। কোন পক্ষের নিজস্ব ধর্মীয় লড়াইতে শরীকদের কোন দায়দায়িত্ব থাকবেনা (ধারা ৪৫)। শরীকদেরকে কোন সন্ধির জন্য ডাকা হলে সকলের সাথে তারাও সন্ধি করবে (ধারা ৪৫)। কোরায়েশদের সাথে যে কোন মৈত্রীর সম্ভাবনা চূড়ান্তভাবে রোধ করার জন্য এ কথাও সবাইকে স্বীকার করানো হয়েছে যে, মদিনার কোন মোশরেক (অমুসলিম নাগরিক) কোরায়েশদের জান ও মালের নিরাপত্তা দেবেনা এবং এ ব্যাপারে কোন মুমিনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা (ধারা ২০)। কোরায়েশকে এবং কোরায়েশের আশ্রয়দানকারীকে আশ্রয় দেয়া হবেনা (ধারা ৪৩)। সামরিক ব্যয় নির্বাহ সম্পর্কে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে রসূল সা. এই ধারা সংযোজন করেন যে, প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ যুদ্ধের ব্যয় নিজেই নির্বাহ করবে (ধারা ৩৭-৪৪)। কেননা তিনি জানতেন, ইহুদীরা নিজেদের অংশ দিতে কার্পণ্য করবে এবং সমষ্টিক তহবিল তাদের হাতে গেলে তারা তহবিল তছরূপ করবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে খুনের অর্থদন্ড ও যুদ্ধবন্দীর মুক্তিপণ প্রদানের দায়িত্ব আরবের প্রচলিত রীতি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোত্রের ওপর অর্পণ করা হয়। তদ্রূপ যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তার ঋণের ভারও সমষ্টিক করে দেয়া হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য বলা হয়, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ধর্ম আর ইহুদীদের জন্য ইহুদীদের ধর্ম রইল (ধারা ২৫)। আসলে মুসলমান জাতি তো ধর্ম ও রাজনীতি উভয় দিক নিয়েই একটা মাত্র একক ছিল এবং তাদের ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু খালেস রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সকল শরীক দলকে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণের স্বাধীনতা দেয়া হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৯-১২৩, আহদে নববী কা নেযামে হুকুমরানী, ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী, পৃঃ ৭৬-১১১)

এবার উল্লিখিত ধারাওয়ারি বক্তব্যগুলোকে দলীলের সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে পর্যালোচনা করুন এবং প্রতিটি অংশ নিয়ে ভাবুন যে রসূল সা. কত নৈপুন্য ও বিচক্ষণতার সাথে নিজের আদর্শকে মদিনার বহুজাতিক ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, মুসলমানদেরকে এতে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিলেন এবং রাজনৈতিক সামরিক ও বিচার বিভাগীয় সকল দিক দিয়েই নিজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কোরায়েশদের মোকাবিলা করা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব স্থির করলেন এবং সবাইকে তা মেনে নিতে সম্মত করলেন। উপরন্তু বহু সংখ্যক সম্ভাব্য আশংকার পথ আগে ভাগেই রোধ করলেন। উল্লেখ্য যে, এই চুক্তি একটা সাংবিধানিক দলীলের মর্যাদা রাখতো। এতে স্বাক্ষরকারীদের কারো যখন ইচ্ছা এই চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা চুক্তি ভংগ করার অধিকার ছিলনা। এরূপ করলে তার সেই নাগরিক অধিকারই বিলুপ্ত হয়ে যেত, যা এই ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার ভেতরে এই চুক্তির ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে যে সব ইহুদী গোত্র পরবর্তীকালে এই চুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করে, তাদের বিরুদ্ধে অবিকল সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়, যা বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রাপ্য।

প্রসংগত এখানে এই দলীলের আলোকে হিজরত ফরয হওয়ার তাৎপর্য বুঝে নেয়া দরকার। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি যে মুসলিম জাতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই জাতি অধিকতর মজবুত হোক–এটাই ছিল হিজরত ফরয হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কথা সত্য যে, আরবের গোত্রীয় ব্যবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে দু'একজন করে মুসলমান পড়ে থাকলে তাদের পরিণতি এমনও হতে পারতো যে, কিছু কিছু প্রতিরোধ ও সংঘাত করার পর অবশেষে একদিন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থায় বিলীন হয়ে যাবে অথবা যুলুম নির্যাতনের কবলে পড়ে মারা পড়বে। এ কারণেও প্রত্যেক মুসলমানকে কুড়িয়ে এনে সংঘবদ্ধ করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু এই সাথে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের স্থীতিশীলতার জন্যও সব জায়গা থেকে সকল বিচ্ছিন্ন মুসলমানের মদিনায় এসে সমবেত হওয়া জরুরী ছিল। পরে যখন এ দুটো প্রয়োজনের একটাও অবশিষ্ট রইলনা, তখন ঘোষণা করা হলো যে, "পূর্ণ বিজয় অর্জিত হওয়ায় আর হিজরতের প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ সমগ্র আরব উপদীপ যখন 'ইসলামের দেশ' (দারুল ইসলাম) হয়ে গেল, মদিনার কর্তৃত্বের অধীন এসে গেল এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য কোন এলাকাতেই কোন অবরোধ বা বাধাবিঘ্ন অবশিষ্ট থাকলোনা, তখন মদিনায় হিজরত করার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হলো।

এই চুক্তির ভিত্তিতে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মুহাম্মাদ সা. এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথমবারের মত মুসলমানরা পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত একশো বর্গমাইল এলাকায় অবাধে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পেল। সেখানে ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতাও দাওয়াতের কাজে আপনা থেকেই সহায়ক ছিল। উপরন্তু ইসলামী সরকারের উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য মদিনার আশপাশেও দাওয়াত বিস্তারের সহায়ক হলো।

৩. বিভিন্ন গোত্রের সাথে চুক্তি

মদিনাকে একটা রাজনৈতিক একক বানানো ও ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টার পাশাপাশি রসূল সা. আশপাশের গোত্রগুলোকেও সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। দু'তিনবার সাহাবায়ে কেরামের সমন্বয়ে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। হিজরতের দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ সফর মাসে রসূল সা. সশরীরে ওয়াদ্দান (মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে একটা জায়গা) গমন করেন। এখানে তিনি বনু হামযা বা বনু যামরা গোত্রের সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন। ঐ গোত্রের পক্ষ থেকে আমর বিন ফাহশী আয্ যামরী চুক্তিতে সাক্ষর করেন। (ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ ৪–২২৩; যাদুল মায়াদ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৪; রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ ১৩৮)

এর আগে মোহাজেরদের একটা দল পার্শ্ববর্তী স্থান 'ঈস্' পর্যন্ত গিয়েছিল এবং তাতে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। (রসূলে আকরাম সা. কী সিয়াসী যিন্দিগী, ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী, পৃঃ ৩৫৯) তারপর ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে (হিজরতের ত্রয়োদশ মাস) রসূল সা. পুনরায় বুয়াত (ইয়ামবু এলাকায় জুহায়নার অন্যতম পাহাড়) এলাকা সফর করেন। এখানকার জনগণের সাথেও সফল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং মৈত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃঃ

১৩৯, যাদুল মায়াদ, পৃ: ঐ) এরপর জমাদিউস সানীতে (ইয়ামবু এলাকার) যুল উশায়রা সফর করেন। সেখানে দীর্ঘদিন বনু মুদলাজ ও তাদের মিত্র বনু যামরার সাথে আলাপ আলোচনা চলে এবং তাদের সাথেও চুক্তি সম্পন্ন হয়। (ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৬; রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ ১৩৯)

পূর্বতন ঐতিহাসিকদের কারো কারো অভিমত হলো, এই সব চুক্তির ফলে এ সব গোত্র ও এলাকা প্রকৃতপক্ষে মদিনার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা অংশে পরিণত হয়েছিল। এর প্রমাণ হলো, ঐ সব চুক্তির কিছু কিছু অংশ এবং পরিভাষার সাংবিধানিক (অর্থাৎ মদিনা) চুক্তির সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু হিজরতের একেবারে প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে এ অভিমত যদি মেনে নাও নেওয়া হয়, তথাপি এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পরবর্তীকালে জুহাইনা গোত্রের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এ চেষ্টার ফলে তারা আরবের অন্যান্য গোত্রের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে। এক হাজার ব্যক্তির এক বিশাল প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করে এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। তারা বিভিন্ন যুদ্ধেও অংশ নেয়। এই গোত্রের বিভিন্ন শাখার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যোগাযোগের যে রেকর্ড রয়েছে, তা এরই প্রমাণ বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ, বনুল জুরমযকে (জুহায়নার শাখা) রসূল সা. লিখিতভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার সনদ প্রদান করেন। জুহায়নার অপর এক শাখা বনু শামাখ বা শাখ্‌কে তাদের পুরো এলাকা স্থায়ীভাবে জাইগীর হিসেবে বরাদ্দ করে দেন। অনুরূপভাবে আওসাজা বিন হারমালা জুহানীকেও তিনি তার বাসস্থান যুলমিররার নিকটে জাইগীর প্রদান করেন। আবু বসীর ও তার সাথীদের জন্য যখন হোদাইবিয়ার চুক্তির কারণে মদিনা যাওয়ার সুযোগ রইলনা, তখন তারা মক্কা থেকে হিজরত করে এই উপকূলীয় এলাকায় এসে ছিলেন। বিচিত্র নয় যে, আজুসার ন্যায় সরদারগণ তাদেরকে সাহায্য করতো এবং তারা স্থানীয় লোকদের সহায়তা নিয়েই কোরায়েশী কাফেলাগুলোর প্রতিরোধ করতো। (সিয়াসী জিন্দেগী, ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী)

সম্পর্কের আরো অগ্রগতি হলো এবং পারস্পরিক মেলামেশার কারণে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত থাকলো। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, গোত্রগুলো সামগ্রিক ভাবে ইসলামী আন্দোলনের নিশানাবাহী হয়ে গেল। উকবা জুহানীর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ আমাদের জানা। রসূল সা. এর জীবনের শেষভাগে বনী জুরমুয, বনীল হারকা এবং আমর ইবনে মা'বাদের সাথে একটা নতুন শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হলো। এতে অন্যান্য মুসলিম গোত্রের ন্যায় শর্ত আরোপিত হলো যে, নামায ও যাকাত ঠিক মত আদায় করতে হবে, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ যথারীতি দিতে হবে, ইসলাম বিরোধীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে এবং ঋণের সুদ পরিত্যাগ করতে হবে। মদিনায় জুহাইনা গোত্রের নামে একটি মসজিদও নির্মিত হয়ে গিয়েছিল নবুয়তের যুগেই। এ থেকে বুঝা যায়, বিপুল সংখ্যক জুহায়না গোত্রীয় মুসলমান হয়ে মদিনায় এসেছিল।

যে ক'টি গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, বনু গিফার তাদের অন্যতম। এ গোত্রটি তার অন্যতম সদস্য ও আদর্শ যুবক আবু যর গিফারী দ্বারা প্রভাবিত হয়। বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময় তারা রসূল সা. এর সাথে চুক্তি সাক্ষর করে। এ চুক্তির মূল কথাটা ছিল ঃ "তারা মুসলমান এবং তাদের দায় দায়িত্বও

মুসলমানদের মতই।" এই চুক্তির একাংশে যদিও এই গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, কিন্তু আমার মতে, এই গোত্র প্রকৃত পক্ষে মদিনার সামাজিক অবকাঠামোর অংশে পরিণত হয়েছিল। কাজেই তাদের এলাকাকে মদিনার আওতাধীন মনে না করার কোন কারণ নেই।

বনু যামরার এক শাখা বনুগিফার এবং আরেক শাখা বনু আবদ ইবনে আদী। এই শেষোক্ত গোত্র হারাম শরীফের সীমানার মধ্যেই বাস করতো। এই শাখা কোরায়েশদের সাথে বাধ্য হয়ে সমঝোতার সম্পর্ক বজায় রাখলেও মুসলিম সরকারের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। শুধুমাত্র একটি বিষয় বাদে অন্য সব বিষয়ে তারা রসূলে সা. এর সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে। বাদ যাওয়া বিষয়টি ছিল কোরায়েশদের সাথে যুদ্ধ করা।

আরেকটা গোত্রের নাম ছিল ফুরাইনা। আবু ইউসুফের বর্ণনা অনুসারে এদের বাসস্থান ছিল মদিনা থেকে ২০ মাইল উত্তর পশ্চিমে ফুরা নামক এলাকার কাছে। এ গোত্র ৫ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তারও আগে যখন অন্যান্য প্রতিবেশী গোত্রের সাথে মুসলিম সরকারের মৈত্রী স্থাপিত হয়, তখনই এদের সাথেও মৈত্রী গড়ে উঠেছিল। এই গোত্রের জনৈক সরদার বিলাল বিন হারেসকে কাবলিয়া (বা কাবিলের) সোনার খনিগুলো রসূল সা. জাইগীর হিসাবে প্রদান করেন। সাম্প্রতিক কালের এক খনন কার্য চালানোর সময় এখানকার কবরস্থান থেকে জাইগীর সংক্রান্ত ফরমানের একটা লিপি পাওয়া গেছে। মক্কা বিজয়ের পর ঐ সরদারকে বেশ কিছু কৃষি জমিও জাইগীর হিসাবে দেয়া হয়। এ সব তথ্য থেকে বুঝা যায়, মদিনার রাষ্ট্রপতি সা. উপকূলীয় গোত্রগুলোর প্রতি কত মনোযোগ দিয়েছিলেন। কেননা রাজনৈতিক ভূগোলের দৃষ্টিতে বিশেষ কৌশলগত এলাকাগুলো তাদের দখলে ছিল। এই সাথে জাইগীর দেয়া সংক্রান্ত ফরমান সমূহ থেকে জানা যায় যে, এ অঞ্চল শুরুতেই (অর্থাৎ এই সব গোত্রের ইসলাম গ্রহণের আগে) মদিনার সরকারের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছিল। (রসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী, ডঃ হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী)।

বনু আশজা' গোত্রটা ছিল বনু গিতফান গোত্রের একটা শাখা। তারাও বাণিজ্যিক মহাসড়কের সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করতো। মহাসড়ক অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে যখন কোরায়েশদের বাণিজ্যই থেমে গেল, তখন তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কেননা এ সব গোত্র বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর সেবা করেই জীবিকা উপার্জন করতো। অর্থনৈতিক সংকটে বাধ্য হয়ে তাদের প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে। অতপর খন্দক যুদ্ধের আগেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে চুক্তি সাক্ষর করে। তাদের পক্ষ থেকে চুক্তিতে সাক্ষর করেন নঈম বিন মাসউদ। নঈম বিন মাসউদ খন্দক যুদ্ধের সময়ই ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হন। এই জন্যই চুক্তির সময় সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেনি। তবুও চুক্তির ভিত্তি কেমন ছিল, সেটা একটা বাক্য থেকেই বুঝা যায়। বাক্যটা হলো ঃ

حالفه على النصر والنصيحة "সাহায্য করা ও হিত কামনা করার ব্যাপক ভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো।" এই গোত্রের একটা শাখা বনু আমের কাফেলাগুলোর যাত্রা বিরতিতে সহায়তা করার বিষয়ে একচেটিয়া অধিকারের লাইসেন্স

রসূল সা. এর কাছ থেকে লাভ করে। বনু আমের গোত্রের জনৈক সরদারকেও খন্দক যুদ্ধের আগে জায়গীর দেয়া হয়।

এবার উল্লেখ করবো খন্দক যুদ্ধের পর যে সব মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় তার কথা। খুযায়া গোত্রটা ইয়ামানের কাহতানের বংশধর ছিল এবং এর অনেক শাখা ছিল। মক্কার পাশে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতো। একমাত্র বনুল মুসতালিক ছাড়া এ গোত্রের অধিকাংশ শাখা মুসলমানদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতো। এর অন্যতম কারণ ছিল, জনাব আব্দুল মুত্তালিব তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। এই গোত্র হোদাইবিয়ার চুক্তির সুযোগ গ্রহণ করে প্রকাশ্যে কোরায়েশকে পরিত্যাগ করে মদিনার ইসলামী সরকারের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে। এই মৈত্রীর সুবাদেই একদিকে এই গোত্র রসূল সা. কে আহযাব যুদ্ধ তথা খন্দক যুদ্ধের ব্যাপারে কোরায়েশদের প্রস্তুতির খবরাখবর জানায়। অপর দিকে রসূল সা. মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাদেরকে একটা চিঠি দিয়ে আশ্বাস দেন যে, তাদের কোন অসুবিধা হবেনা। তিনি এই খবরও জানান যে, বনু কিলাব ও বনু হাওয়াযেন ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু সময় হওয়ার আগেই এই দুটো গোত্র বনু বকরের যুলুম নিপীড়নের শিকার হয় এবং এই যুলুম নিপীড়নই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খুযায়া গোত্রেরই একটা শাখা ছিল বনু আসলাম। তাদের নামে রসূল সা. এর প্রদত্ত যে নিরাপত্তা সনদ পাওয়া যায়, তা থেকে বুঝা যায়, তারা অপেক্ষাকৃত আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। এদের একাংশ মদিনায় হিজরত করে এসে বসতি স্থাপন করে। এদের সরদার আলহাসীন বিন আওসকে রসূল সা. জায়গীরও দিয়েছিলেন। এটা মৈত্রী সম্পর্কের দৃঢ়তারও প্রমাণ, আবার এ দ্বারা এটা মদিনার সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংযুক্তিও প্রমাণিত হয়।

তবুকের উত্তরাঞ্চলে জুযাম, কুযায়া ও আযরা নামক গোত্রগুলো বসবাস করতো, তারা তাদের বিরোধী তৎপরতা দ্বারা ইসলামী সরকারের জন্য বেশ খানিকটা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তারা মদিনার দূতের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারপর তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ভুলক্রমে কিছু নিরাপরাধ লোকও এই ব্যবস্থার কবলে পড়ে। তারা মদিনায় এসে ফরিয়াদ জানায় এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এভাবে সম্পর্কের পথও উন্মুক্ত হয়। রসূল সা. যে সব চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটা রিফায়া বিন যায়দ জুযামীর নামে লিখিত। এতে অত্যন্ত কঠোর চরমপত্র দেয়া হয়েছে। এই সরদারকে সম্বোধন করে লেখা চিঠিতে তার পুরো গোত্রকে হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, হয় তারা ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ করে আল্লাহ ও রসূলের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাক, নচেত দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে দু'মাস নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারবে। পরিস্থিতি এভাবে গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত যে আকার ধারণ করে তা ছিল এই যে, রসূল সা. তবুক থেকে ফেরার পর ৯ম হিজরীতে মালেক বিন আমের জুযামী মদিনায় এসে রসূলের সা. সাথে সাক্ষাত করে এবং নিরাপত্তার সনদ লাভ করে। এই সনদে শুধুমাত্র মুসলিম গোত্রগুলোর উপযোগী শর্তাবলীর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অনুরূপভাবে কুযায়া গোত্রের জনৈক সরদার বারীদা বিন আলখাসীর কোন এক অভিযান কালে রসূল সা. এর সাথে মদিনার বাইরে দেখা করে এবং রসূল সা. এর

কাছে নিজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরাপত্তা সনদ অর্জন করে।

৬ষ্ঠ হিজরীতে কালব গোত্রের কাছে রসূল সা. আব্দুর রহমান বিন আওফকে একটা দাওয়াতী অভিযানে পাঠান। এর ফল যেমন আশা করেছিলেন, তেমনই হয়েছিল। ঐ গোত্রের সরদার নিজের আনুগত্য প্রকাশ ও সম্পর্ক স্থিতিশীল করার মানসে নিজ কন্যাকে আব্দুর রহমান বিন আওফের সাথে বিয়ে দেন। একইভাবে রসূল সা. দুমাতুল জুনদুলের আশপাশের মালব গোত্রের নও মুসলিম সরদার হারেসা বিন বুতুনের নামেও একটা নিরাপত্তা সনদ জারী করেন। দুমাতুল জুন্দুলের শাসক উকাইদিরের সাথেও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, না ইসলাম গ্রহণ ছাড়াই জিজিয়া দিতে সম্মত হওয়ায় সরদারীতে বহাল থাকতে পেরেছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে সে বিদ্রোহী হয় এবং হযরত খালেদের হাতে নিহত হয়। পরে তার দুর্গ ও জমি উক্ত কালবী সরদার হারেসা বিন কুতুনের কর্তৃত্বে সমর্পণ করা হয়।

তায়েফবাসীর সার্বজনীন ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সারদ বিন আব্দুল্লাহ ইয়ামানী ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করে। রসূল সা. তাকে ঐ অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য সেনাপতিত্ব প্রদান করেন। রসূল সা. এরই অনুমতিক্রমে সে জারাসের দূর্গ অবরোধ করে। এই অবরোধের ফলে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আবু সুফিয়ানকে তায়েফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

ওমান নগরীতে বসবাসকারী গোত্র বনু ইজদের কাছে রসূল সা. এর দাওয়াতী চিঠি নিয়ে ৮ম হিজরীতে যান আমর ইবনুল আ'স। ওবায়েদ ও জাফর নামক দুই ব্যক্তি তাদের সরদার ছিল। বনু ইজ্‌দ ইসলাম গ্রহণ করে।

ব্যাপকভাবে প্রতিনিধি দল আগমনের বছর যে সব গোত্র স্বেচ্ছায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা কমের পক্ষে মদীনার সরকারের আনুগত্য অবলম্বন করে, সে সব গোত্রের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

এ ছাড়া সামরিক অভিযানের ফলে যেখানে কোন গোষ্ঠী আনুগত্য বা সন্ধি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, সেখানে তৎক্ষণাত সে সুযোগ দেয়া হয়েছে। মদীনার রাষ্ট্রের স্থায়ী নীতি এই যে, যুদ্ধরত কোন ব্যক্তি যখনই সন্ধির আকাংখা ব্যক্ত করবে, তখনই তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। একাধিক গোত্র যুদ্ধের ময়দানে নামার পর হয় রাজনৈতিক বশ্যতা ও অধীনতা মেনে নিয়েছে, নতুবা ইসলাম গ্রহণ করেছে। খয়বর ও সন্নিহিত এলাকার অধিবাসী ইহুদীদের ঘটনা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। তারা বিজিত হবার পর যখন ওখানেই থাকতে চাইল, তখন শর্ত স্থির করে থাকতে দেয়া হলো।

এই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে, সংঘর্ষ এড়িয়ে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলা মদিনা সরকারের কর্মকান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল। এ জন্য একটি বিভাগ ছিল। রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা এই বিভাগের জন্য বহু তৎপরতা চালান ও সফর করেন। এসব তৎপরতা ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তিপ্রিয় দৃষ্টিভংগীর জ্বলন্ত প্রমাণ। তা ছাড়া এ ব্যাপারে একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্রের দাবী ও চাহিদা জানা থাকা সত্ত্বেও রসূল সা. নীতি নির্ধারণে এত উদারতা দেখিয়েছেন যে, যে সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের পক্ষ থেকে শুধু রাজনৈতিক মৈত্রীও মেনে নিয়েছেন। আর একাধিক

ক্ষেত্রে অমুসলিম শাসক বা সরদারদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করেছেন বা স্বপদে বহাল রেখেছেন। এর উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে, সংঘাতের সম্ভাবনা যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। পরে অবশ্য অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে, অন্তত পক্ষে যে জমিটুকু ইসলামী আন্দোলনের মূল আবাসভূমির পর্যায়ে আছে, তার পারিপার্শিকতাকে পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য তাকে বিরোধী লোকজন থেকে মুক্ত করতে হবে। নচেত্‌ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে।

যে মৈত্রী সম্পর্কগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো, তার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম যেখানেই পৌঁছেছে, সেখান থেকেই মদিনার রাষ্ট্র আপনা থেকেই রাজনৈতিক আনুগত্য লাভ করেছে। অনুরূপভাবে, যেখানেই রাজনৈতিক মৈত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও অনতিবিলম্বেই ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। এর কারণ স্পষ্ট। গোত্রগুলো যখন মদিনার মুসলমানদের সাথে বেশী করে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে, তখন তারা ইসলামী জীবন বিধানের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট স্বচোক্ষে দেখে অভিভূত হয়ে গেছে, আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাও তাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পেয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতি এই ঐক্যের কারণেই দশ বারো লাখ বর্গমাইল এলাকাকে মাত্র কয়েক বছরে ইসলামের রঙে রঞ্জিত করা সম্ভব হয়েছে।

হোদাইবিয়ার সন্ধি

রসূল সা. পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে হোদাইবিয়ার সন্ধি এমন একটা ঘটনা, যার ফলে ঘটনাপ্রবাহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। এই ঘটনার ফলে ইসলামী আন্দোলন এক লাফে সার্বজনীনতার পর্যায়ে সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পায়। এই ঘটনা দ্বারা রসূল সা. এর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, নিকৃষ্টতম ও নিষ্ঠুরতম যুদ্ধরত শত্রুকে তিনি কত সহজে সমঝোতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং কয়েক বছরের জন্য তাদের হাত বেঁধে দিয়েছেন।

বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নির্বাসিত ইহুদীরা যখন খয়বর, তায়মা ও ওয়াদিউল কুরাতে গিয়ে নিজেদের আখড়া গড়ে তুললো, তখন মদিনা এক সাথে দুই শত্রুর মুখে উপনীত হলো। কোরায়েশ ও ইহুদীদের ঐক্য বিপুল সংখ্যক আগ্রাসী সৈন্যকে মদিনার সামনে এনে দাঁড় করে দিয়েছিল। খন্দক যুদ্ধ থেকে ভালোয় ভালোয় উত্তীর্ণ হবার পর রসূল সা. এর সামনে যে জটিল সমস্যা দেখা দেয়, তা হলো ঃ এই দুই শত্রুর ঐক্যকে কিভাবে ভাঙ্গা যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে মক্কার দিকে আক্রমণ চালাতে গেলে খয়বরের ইহুদীরা ও বনু গিতফান মদীনায় হামলা চালিয়ে বসতে পারে। আর যদি খয়বরের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহলে কোরায়েশ আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে। রসূল সা. অত্যন্ত নির্ভুলভাবে অনুমান করতে সক্ষম হন যে, এই দুই শত্রুর মধ্যে খয়বরের ইহুদী আখড়াই এক আঘাতে তছনছ করে দেয়া যায়। আর সেই সাথেই মক্কার কোরায়েশদেরকে সহজেই সন্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। আসলেই কোরায়েশের শক্তি ভেতর থেকে খোখ্‌লা হয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে তারা যত হাম্বিতাম্বিই করুক, প্রতিরোধের ক্ষমতা তেমন একটা তাদের ছিলনা। তাছাড়া মক্কা ও তার আশেপাশে রসূল সা. এর কিছু সমর্থকও ছিল। তাঁর কিছু কিছু পদক্ষেপ এই সমর্থকদেরকে আরো চাঙ্গা করে তুলেছিল।

রসূল সা. দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে মক্কায় খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ পাঠিয়ে সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এ কারণে আবু সুফিয়ান বলেছিল, এখন মুহাম্মদ সা. আমাদের লোকদেরকে এভাবে বিপথগামী করতে চাইছে। রসূল সা. আরো একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাহলো, মক্কার সবচেয়ে বড় নেতা আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবা রা. কে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সুফল বয়ে এনেছিল। যাহোক, এখন যে ভাবেই হোক, আরো একটা পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন ছিল এবং রসূল সা. সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ওদিকে একটা বড় রকমের সমস্যা এও ছিল যে, মুসলমানরা প্রায় ছয় বছর যাবত মক্কা ছেড়ে এসেছে। ব্যাপারটা শুধু জন্মভূমির প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং হযরত ইবরাহীম আ. এর দাওয়াতের কেন্দ্র কা'বা শরীফের সাথেও জড়িত। মুসলমানরা এই ইবরাহীমী দাওয়াতেরই নবায়ন করছে। কাজেই তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, চিরদিনের জন্য এই আদর্শিক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। কোরায়েশ এখনও পর্যন্ত মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেনা এবং দৃশ্যত: এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে মুসলমানদের ভাবাবেগ ক্রমেই অস্থির ও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ইসলামী জামায়াতের অধিকার যে হারাম শরীফের ওপর রয়েছে, সে কথা প্রকাশ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে রসূল সা. স্বপ্নে হজ্জ করার ইংগিত পেলেন। এই ইংগিত পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা বলে সর্বোত্তম সময়ে সর্বোত্তম কর্মসূচী গ্রহণ করলেন এবং সর্বোত্তম উপায়ে তার বাস্তবায়ন করলেন। তিনি একটা বিরাট দল সাথে নিয়ে হজ্জের পবিত্র মাসে ওমরা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যারা যেতে চেয়েছিল, কেবল তাদেরকেই তিনি সাথে নিলেন। এ ধরনের ১৪শো মুসলমান তাঁর সঙ্গী হলো। তিনি নুমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসীকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসকের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন এবং মুসলমানদের একটা বিরাট অংশকে মদিনার হেফাজতের উদ্দেশ্যে রেখে গেলেন। কুরবানীর সত্তরটি উট সাথে নিলেন। কোন সমরাস্ত্র নেয়া হলোনা। অত্যন্ত নীরবে যাত্রা শুরু হলো। যুল হুলায়ফাতে পৌঁছে কুরবানীর জন্তুগুলোকে চিহ্নিত করা হলো।

এই সফর একদিকে ধর্মীয় সফর ছিল। অপর দিকে এতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিকও আপনা থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্ম ও রাজনীতির এই সমন্বয় ও সমাবেশ আমরা রসূল সা. এর গোটা জীবনেতিহাসেই বিদ্যমান দেখতে পাই। তাছাড়া হজ্জের সফরে পার্থিব কর্মকান্ড বা রাজনৈতিক তৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণ বৈধ। তাই কোরায়েশদের জন্য এই হজ্জ যাত্রা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। হারাম শরীফের এই অভিযাত্রীদেরকে যদি ঠেকানো না হয় তাহলে তার অর্থ হবে, মুসলমানদের জন্য মক্কা চিরতরে উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাছাড়া নগরবাসীর মনে রসূল সা. ও তাঁর সাথীদের হারাম শরীফে আগমনের খুবই গভীর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল। ইসলামী বিপ্লবের এই আহ্বায়কদের আগমনে ইসলামী আন্দোলনের মক্কা বাসীদের মনে পুনরুজ্জীবিত হতো। জনগণও বলাবলি করতো যে, কোরায়েশদের সেই দোর্দন্ড প্রতাপ শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী সময় সন্ধি চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় মক্কার প্রতিনিধি সোহায়েল বিন আমরের

বক্তব্য থেকেও এটা পরিস্ফুট হয়ে গেছে। সে বলেছিল, আমরা যদি আপনাদেরকে কা'বা শরীফে ঢুকতে দেই, তাহলে সমগ্র আরববাসী বলবে, আমরা আপনাদের শক্তির ভয়ে পথ খুলে দিয়েছি।

রসূল সা. পথিমধ্যেই সব কথা জেনে ফেলেছিলেন। বশীর বিন সুফিয়ান নামক জনৈক খুজায়ী গোয়েন্দা উসফান নামক স্থানে এসে জানায় যে, কোরায়েশ প্রতিরোধের আয়োজন করছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, মুহাম্মাদকে সা. কখনো মক্কায় প্রবেশ করতে দেবেনা। তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য খালেদ একদল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কুরাউল গামীম পর্যন্ত এসেছে। এ কথা শুনে রসূল সা. বললেনঃ "এ হচ্ছে কোরায়েশদের দুর্ভাগ্য। ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা যদি মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াতো এবং আমাকে সমগ্র আরববাসীর সাথে বোঝাপড়া করতে একলা ছেড়ে দিত, তাহলে তাদের কী অসুবিধা ছিল? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দিত, তা হলে তাদের আশাই পূরণ হতো। আর যদি আমি জয় লাভ করতাম, তাহলে তারা ইচ্ছা করলে সবাইকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো। নচেত তাদের শক্তি রয়েছে এবং তখন যুদ্ধ করতে পারতো। তারা যদি আমাকে এ সুযোগ না দেয়, তা হলে আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে যে মহাসত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা দিয়ে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাবো, হয় এই মহাসত্য বিজয়ী হবে, নচেত আমার মাথা কাটা যাবে।" এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি সন্ধির সম্ভাবনার আভাষও দিলেন, চরম পত্রও দিলেন, এবং কোরায়েশের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার প্রতিও ইংগিত দিলেন।

অপর দিকে হজ্জযাত্রীদের কাফেলাকে ঠেকানোলেও কোরায়েশদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। দুর্নাম রটে যায় যে, তারা একটা ধর্মীয় অধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়েছে। আবার প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করলেও অভিযোগ আসে যে, নিষিদ্ধ মাসের বিধিনিষেধ ভংগ করেছে। রসূল সা. এর পক্ষ থেকে যে হারাম শরীফের পবিত্রতার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তারা যে শুধু ওমরার জন্য নিরস্ত্র অবস্থায় সফর করছেন, সে কথা সবাই জেনে গিয়েছিল। তাদের সাথে কোন অস্ত্র না থাকা এবং তাদের কুরবানীর জন্য চিহ্নিত জন্তুগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে তাদের সফরটা কী ধরনের? এই কথা বলা যায়, কোরায়েশরা অত্যন্ত জটিল অবস্থায় ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। এই নাজুক মুহূর্তে তাদের সর্বোচ্চ নেতা আবু সফিয়ান ছিল প্রবাসে। কোরায়েশ যত আস্ফালনই করুন, সন্ধি করা ছাড়া যে তাদের গত্যান্তর নেই, সে কথা অনুমান করার মত বিচক্ষণতা একমাত্র রসূলেরই সা. ছিল। নির্ভুল অনুমানের বিচক্ষণতাই পরিস্থিতি পাল্টে দিতে সক্ষম। এ ভাবেই একজন কর্মবীরের প্রজ্ঞা ও অর্ন্তদৃষ্টির সঠিক মান জানা যায়।

কোরায়েশ পুরানো জিদ ও হঠকারিতার বশে দ্রুত গতিতে মিত্র গোত্রগুলোকে, বিশেষত আহাবীশদেরকে বালদাহ নামক স্থানে সবমেত করলো।

সংগে সংগে দূতিয়ালী তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। সর্বপ্রথম খুযায়া গোত্রের সরদার বুদাইল বিন ওয়ারকা (যিনি ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন) কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাথী নিয়ে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। রসূল সা. তাকে জানালেন, "আমরা শুধু কা'বা শরীফ যিয়ারত করতে এসেছি। যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কোরায়েশরা

যুদ্ধের নেশায় মত্ত। অথচ যুদ্ধে তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবেনা। কয়েক বছরের জন্য কোরায়েশ যদি আমাদের সাথে সন্ধি করে তবে ক্ষতি কী?" এভাবে রসূল সা. তাঁর আসল বক্তব্য শুরুতেই তুলে ধরলেন। বুদাইল গিয়ে কোরায়েশদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, তোমরা তাড়াহুড়ো করোনা। মুহাম্মাদ সা. যুদ্ধ করতে আসেননি, নিছক যিয়ারতের জন্য এসেছেন। বদমেজাজী যুবকরা তো কোন কথাই শুনতে রাযী ছিলনা। তবে বয়স্ক লোকেরা সব কথা শুনলো। তারপর তারা আহাবীশ নেতা উলাইস বিন আলকামাকে পাঠালো। সে যখন কুরবানীর জন্তুর পাল মাঠে বিচরণ করতে দেখলো, তখন তার ভাবান্তর ঘটলো। সে কোরায়েশদের কাছে গিয়ে খোলাখুলি বললো, এসব তীর্থযাত্রীকে বাধা দেয়া ঠিক নয়। আমরা ও এ উদ্দেশ্যে আসিনি। আহাবীশ নেতাকে এই বলে শান্ত করা হলো যে, অন্তত আমাদের শর্তগুলো মানিয়ে নেয়ার সুযোগ দাও। এরপর কোরায়েশ উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে প্রতিনিধি করে পাঠালো। উরওয়া এসে বললো "হে মুহাম্মদ! সা. আপনি যদি নিজেরই গোত্রের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেন, তবে সেটা কোন প্রশংসনীয় কাজ হবেনা। আপনি যে সব বখাটে লোকদের একত্রিত করে নিয়ে এসেছেন, তারা কয়েক দিন পর সটকান দিলে আপনি একাকী হয়ে পড়বেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রেগে গেলেন এবং কিছুটা কঠোর ভাষায় উরওয়াকে ধমক দিলেন। আরবদের প্রচলিত নিয়মে অন্তরঙ্গ ভংগীতে কথা বলতে বলতে যখনই উরওয়া রসূল সা. এর দাড়ির কাছে হাত নিয়ে যাচ্ছিল, অমনি প্রতিবার হযরত মুগীরা ইবনে শুবা তরবারীর ছুচাঁলো অংশ দিয়ে তার হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। রসূল সা. উরওয়ার সামনেও নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেন। উরওয়া এখানে যে পরিবেশ দেখে, তাতে গভীরভাবে অভিভূত হয়ে ফিরে যায়। ফিরে গিয়ে সে বলে, "নেতার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের যে দৃশ্য আমি দেখেছি, তা কোন রাজা বাদশার দরবারেও দেখিনি। মুহাম্মাদের সা. সাথীরা তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। তার হাতের ইশারায় তারা মরতে প্রস্তুত। তাঁর সামনে কেউ উঁচু স্বরে কথা পর্যন্ত বলেনা।" উরওয়ার এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, দল কর্তৃক নেতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য পোষণই ইসলামী আন্দোলনের শক্তির আসল উৎস। ভালোবাসা ও আনুগত্য মিলিত হয়ে দুর্জয় শক্তির জন্ম দেয়। কোন দলের ভেতরে এ ধরনের পরিবেশ থাকলে তা বিরোধীদেরকে দুর্বল ও আতংকগ্রস্ত করে দেয়। এখানে নিছক কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মত পরিবেশ বিরাজ করে না যে, একে অপরের যুক্তি খন্ডনের কাজে লেগে থাকে। সভাপতিও সদস্যদের প্রতি কোন আন্তরিক সম্পর্ক পোষণ করেনা, সদস্যরাও বোধ করেনা সভাপতির প্রতি কোন হৃদয়ের টান। কেবল গঠনতন্ত্র ও নিয়মবিধির বাহ্যিক আনুগত্য করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। নেতার বিরুদ্ধে বিষোদগার, গীবত, নিন্দা, কানাঘুষা ও নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র চলে যে সব দলে, সেখানে কেমন নোংরা পরিবেশ বিরাজ করে, ভাবতেও অরুচি বোধ হয়। ইসলামী সংগঠনের ভেতরকার পরিবেশ হীতকামনা, আনুগত্য, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার পরিবেশ। এখানে প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব থাকে। তবে নেতা সবার জন্য ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কেননা তা নাহলে পরস্পরের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসার পরিবেশ যেমন সৃষ্টি হয়না, তেমনি ইসলামী সংগঠন

ইস্পাত কঠিন প্রাচীরেও পরিণত হয় না। হোদায়বিয়ার ময়দানে ইসলামী সংগঠনের এ বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত ছিল। তাই এ দৃশ্য উরওয়ার মনকে অভিভূত করেছিল আর এই প্রতিক্রিয়াই সে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে ব্যক্ত করেছিল।

আলাপ আলোচনার এই ধারাকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে রসূল সা. খারাশ ইবনে উমাইয়াকে কোরায়েশের কাছে পাঠালেন। মক্কায় অরাজক ও উচ্ছৃংখল পরিবেশ এমনিতেই বিদ্যমান ছিল। রসূল সা. এর যে উটে চড়ে খারাশ মক্কায় গিয়েছিল, উচ্ছৃংখল লোকেরা সেই উটটাকে মেরে ফেললো। সে নিজেও অতি কষ্টে জান বাঁচিয়ে ফিরে এল। এরপর হযরত উসমান রা. কে পাঠানো হলো। উচ্ছৃংখল লোকদের একটা দল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়েছিল। তারা মুসলমানদের যত্রতত্র উস্কানি দিল এবং তীর ও পাথর ছুঁড়ে মারলো। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। তবে রসূল সা. বৃহত্তর কল্যাণের তাগিদে তাদেরকে ছেড়ে দেন। মোট কথা, কোরায়েশদের যুদ্ধাংদেহী লোকেরা কোন না কোনভাবে যুদ্ধ বাধাতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ "উভয় পক্ষের হাতকে সংযত রাখলেন।" ফলে শান্তির পরিবেশটা অক্ষুণ্ন থাকলো এবং শান্তি রক্ষার চেষ্টা জয়ী হলো। হযরত উসমানকে রা. কোরায়েশরা আটকে রাখলো এবং তাঁর ফিরে আসতে খুব দেরী হয়ে গেল। অশুভ ও অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর কারণে পরিবেশ এমন ছিল যে গুজব রটে গেল, হযরত ওসমান রা. কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। রসূল সা. সংগে সংগে মুসলমানদের সমবেত করলেন এবং প্রয়োজনে আমরণ লড়াই করার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "ঘটনা সত্য হলে আমরা এদের সাথে লড়াই না করে ঘরে ফিরবোনা।" হযরত উসমানের জীবন সেদিন অত্যধিক মূলবান হয়ে গিয়েছিল। কেননা রসূল সা. এর ভাষায় পরিস্থিতি ছিল এ রকম যে, "উসমান আল্লাহ ও তার রসূলের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গেছে।" তিনি নিজের এক হাতকে উসমানের হাত বলে আখ্যায়িত করে তার ওপর নিজের পক্ষ থেকে অন্য হাত রেখে বললেন, "অংগীকার কর।" তাঁর সাথীরা এমনিতেই আবেগে অধীর ছিলেন। তারা আন্তরিকতার সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে বায়য়াত ও অংগীকার করতে লাগলেন। এই আকস্মিক মুহূর্তটা ঈমান বৃদ্ধি ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত মুহূর্ত ছিল এবং এ সময় মুসলমানরা নিজেদেরকে এত উচ্চ মানে উন্নীত করে যে, রসূল সা. বলেন, "আজকের দিন তোমরা সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এই মুহূর্তের ঈমানী জযবা ও আন্তরিকতার দরুন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেন। শুধু একজন মোনাফেক জিফ বিন কায়েস এই মুহূর্তের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। সত্যের সৈনিকদের জীবনে এরূপ অনেক মুহূর্ত আসে এবং নিষ্ঠাবান লোকদের আত্মা তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। চৌদ্দশো মুসলমান আমরণ লড়াই এর এই প্রতিজ্ঞার পুরস্কার এক ফোঁটাও রক্ত না ঝরিয়ে তৎক্ষণিকভাবে পেয়ে গেলেন। কোরায়েশরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণাত হযরত ওসমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। কেননা আসলে তারাও লড়াই এড়িয়ে চলতে চাইছিল।

মক্কা থেকে মিকরায বিন হাফ্স এলো। রসূল সা. মানুষ চেনায় কত দক্ষ ছিলেন দেখুন। দূর থেকে দেখেই বলে দিলেন। "ঐ যে এক ধাপ্পাবাজ আসছে।" অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দিলেন, ঐ লোক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কোন কিছুর মীমাংসা সম্ভব হবেনা।

অবশেষে কোরায়েশ সোহায়েল বিন আমরকে পাঠালো। তাকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, তারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। শর্ত নিয়ে জরুরী কথাবার্তা হলো। অবশেষে চুক্তি লেখার জন্য হযরত আলীর ডাক পড়লো।

এমন নাযুক মুহূর্তে চুক্তি লেখা হচ্ছিল যে, কথায় কথায় উত্তেজনা সৃষ্টির উপক্রম হতো। চুক্তির শুরুতে যখন রসূল সা. "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" লেখার নির্দেশ দিলেন, তখন সোহায়েল বললো, "রহমান রহীম" আবার কী? আমাদের নিয়ম অনুসারে শুধু "বিছমিকা আল্লাহুম্মা" (হে আল্লাহ তোমার নামে) লেখা হোক। রসূল সা. এ দাবীও মেনে নিলেন। এরপর বললেন, লেখ, "নিম্নলিখিত চুক্তি আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ও সুহায়েল বিন আমরের মধ্যে সম্পাদিত হলো।" সোহায়েল আপত্তি তুলে বললো, আমি যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল মানতাম, তাহলে আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম নাকি? আপনি শুধু নিজের নাম ও নিজের বাপের নাম লিখান। হযরত আলী "আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ" লিখে ফেলেছেন। এখন 'আল্লাহর রসূল" শব্দটা কেটে দেয়া তার কাছে মারাত্মক বেআদবী হবে ভেবে কাটতে পারলেন না। রসূল সা. কাগজটা নিয়ে নিজের হাতে ঐ কথাটা কেটে দিলেন এবং তার পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লেখে দিলেন।

সোহায়েলের এই সব ধৃষ্টতা দেখে রসূল সা. এর সাথীরা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু রসূল সা. এর সম্মানার্থে সংযম অবলম্বন করছিলেন। এবার নিম্নোক্ত শর্তাবলী লেখা হতে লাগলো ঃ

- উভয় পক্ষ দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধি মেনে চলবে।
- মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর কা'বার যিয়ারত করতে আসবে। তখন কোষবদ্ধ তরবারী নিয়ে মাত্র তিনদিন হারাম শরীফে কাটাবে।
- আরবের গোত্রগুলো দুই পক্ষের যার সাথে ইচ্ছা মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে।
- কোরায়েশদের বাণিজ্যিক কাফেলা মদিনার সীমানা অতিক্রম করার সময় পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে।
- কোরায়েশদের কেউ যদি বিনা অনুমতিতে মদিনা চলে যায়, তবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর যদি কোন মুসলমান মক্কায় আসে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবেনা।

শেষোক্ত শর্তটা মুসলমানদের মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতার সৃষ্টি করলো। পুরো মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যাবে, মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। প্রথমত এই পর্যায়ে এ ধরনের একটা আপোষ চুক্তিই অত্যন্ত বিরল ঘটনা ছিল। যে কোরায়েশ এতগুলো মানুষকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করেছে, যারা মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, যারা আজও তাদেরকে হারাম শরীফে ঢুকতে দিচ্ছেনা এবং কুরবানীর জন্তুগুলোকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, এহেন যুলুমবাজ আগ্রাসী মোশরেকদের সাথে এমন আকস্মিকভাবে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করা মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টকর ব্যাপার ছিল। তারা কাফেরদের ব্যাপারে এ যাবত একটাই মূলনীতি শিখেছে যে, "আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতা ও হিংসার সৃষ্টি হয়েছে এবং তা তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে"

এবং "ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ ফেৎনা ও অরাজকতা নির্মূল না হয়ে যায় এবং আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না হয়ে যায়।" তাদের কেবল এই সোজাসুজি ফর্মূলাটাই জানা ছিল যে, আল্লাহর কলেমা বা বাণীই উর্ধে থাকা উচিত, আর কাফেরদের কথা থাকা উচিত নীচে। হক ও বাতিলের মধ্যে আপোষের অবকাশ থাকতে পারে, তা তাদের জানা ছিল না। আসলে আদর্শকে যদি নিছক তাত্ত্বিক ও দার্শনিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাকে যদি বাস্তবতার জগতে নিয়ে এসে তা নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে সময়, সুযোগ এবং স্বপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিগুলোর অবস্থার আলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। চোখ বুঁজে একই গতিতে সোজা পথে চলতেই থাকবেন এটা সম্ভব হয় না। কোথাও থামতে হয়, কোথাও দু'কদম ঘুরে যেতে হয় এবং কোথাও নতুন রাস্তা খোঁজার জন্য দু'কদম পিছিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন ধরনের শত্রুকে পর্যায়ক্রমে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে এক এক সময় তাদের এক একজনের সাথে সাময়িকভাবে আপোষ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই ব্যাপক বাস্তব তথ্য কেবল রসূল সা. এর সামনেই দৃশ্যমান ছিল, মুসলিম সংগঠনের দৃষ্টি এতদূর পৌঁছতে সক্ষম ছিল না। তদুপরি তাদের সামনে যখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এবং 'রসূলুল্লাহ' শব্দগুলো কেটে দেয়া হলো, তখন তাদের আবেগে ঝড়তুফান সৃষ্টি না হয়ে পারেনি। উপরন্তু যখন সেই অসম ও অবিচারমূলক শর্ত আরোপ করা হলো, তখন তাদের ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখা কঠিন হয়ে গেল। রসূল সা. এই চুক্তি দ্বারা যে বড় বড় সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজছিলেন, সেগুলো কোরায়েশরাও জানতোনা। মুসলমানরাও তা বুঝতে পারেনি। বড় বড় আন্দোলনের তৎপরতাকালে কখনো কখনো এমন নাযুক মুহূর্তও আসে, যখন দল ও নেতার মাঝে ভবিষ্যতের সমস্যাবলীর উপলব্ধির দিক দিয়ে মানসিক ব্যবধান বেড়ে যায়। নেতার দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূরে, আর দল অপেক্ষাকৃত নিকটের বিষয়গুলো নিয়েই চিন্তা করে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোই সংকটজনক হয়ে থাকে এবং এইসব বিরল ক্ষেত্রেই মাত্রারিক্ত নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু সেই নেতৃত্বই আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে, যা জনমতের সর্বোচ্চ আস্থা ও সহযোগিতা লাভ করে এবং যার কোন বিকল্প না থাকে। এ ধরনের আন্তরিকতাপূর্ণ ও স্থিতিশীল নেতৃত্ব দলকে কেবল নিজের নৈতিক শক্তির বলেই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। আর দল পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও পরিস্থিতি দেখেই নেতার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।

সমস্যা দেখা দিল এই যে, ঠিক এই জটিল পরিস্থিতিতেই কোরায়েশ প্রতিনিধি সোহায়েলের ছেলে আবু জুনদুল শেকল পরা অবস্থায় মক্কা থেকে এসে হাজির হলো। তাকে মারপিট ও নির্যাতন করা হয়েছিল। সে রসূল সা. ও সাহাবীদের সামনে নিজেকে পেশ করলো। সোহায়েল বিন আমর বললো, প্রস্তাবিত শর্ত অনুসারে আবু জুনদুলই প্রথম ব্যক্তি, যাকে আপনার ফেরত পাঠাতে হবে। রসূল সা. বললেন, এখনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। কাজেই আবু জুন্দুলের ব্যাপারটা এর আওতার বাইরে থাকতে দাও। সোহায়েল বললো, তাহলে কোন আপোস হতে পারে না। এরপর রসূল সা. কোমল ভাষায় বুঝিয়ে

বললেন, "ঠিক আছে, ওকে আমার খাতিরে আমার সাথে মদিনায় যেতে দাও।" সোহায়েল মানলোনা। বাধ্য হয়ে রসূল সা. বৃহত্তর স্বার্থে এই অন্যায় আব্দার মেনে নিলেন। এবার আবু জুন্দুল সমবেত মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললো, "মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা আমাকে মোশরেকদের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছ। অথচ ওরা আমাকে ঈমান থেকে ফেরানোর জন্য আমার ওপর নির্যাতন চালাবে।" আবু জুন্দুলের এ আবেদন ঐ পরিবেশে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ছিল। কিন্তু রসূল সা. তখন অতুলনীয় ঠান্ডা মেজাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। আবু জুন্দুলকে নম্র ভাষায় বুঝালেন, "আমরা চুক্তিতে একটা কথা স্বীকার করে নিয়েছি। এখন চুক্তি ভঙ্গ করতে পারি না। তোমার ও অন্যান্য মযলুমদের জন্য আল্লাহ তায়ালা একটা মুক্তির পথ বের করবেন। একটু ধৈর্য ধারণ কর।"

মুসলমানদের অস্থিরতা ও উত্তেজনা ক্রমেই চরম আকার ধারণ করছিল। মুসলমানদের সবার মনে যেটুকু কোরায়েশ বিরোধী উত্তেজনা সঞ্চিত ছিল, তার সবটুকু বোধহয় একা হযরত ওমরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে তাঁকে দিশেহারা করে তুলছিল। এটা হযরত ওমরের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ব্যাপার ছিলনা। সত্যের দরদ ও ইসলামী আত্মাভিমানই তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। এই অস্থিরতা নিয়েই তিনি প্রথমে হযরত আবু বকরের সাথে এবং পরে রসূল সা. এর সাথে নিম্নরূপ আলোচনা করেন ঃ

হযরত ওমর রা. ঃ "হে রসূলুল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রসূল নন?"
রসূলুল্লাহ সা. ঃ "অবশ্যই। আমি আল্লাহর রসূল।"
হযরত ওমর ঃ তাহলে আমরা কি মুসলমান নই?
রসূল সা. ঃ "কেন নও?"
হযরত ওমর ঃ তবে তারা কি মোশরেক নয়?
রসূলুল্লাহ সা. কেন নয়?
হযরত ওমর ঃ তাহলে আমরা ইসলামের ব্যাপারে নতি স্বীকার করে চুক্তি করবো কেন?
রসূল সা. ঃ আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি তার কোন হুকুম অমান্য করিনি। আল্লাহও আমাকে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

হযরত ওমর এই পর্যায়ে চুপ হয়ে গেলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর ভাবাবেগ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শান্ত হলোনা। চুক্তি লেখা হলো এবং তার ওপর হযরত ওমর সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিয়ে আনুগত্যের এক অবিস্মরণীয় নজীর স্থাপন করলেন। শর্তগুলোর ব্যাপারে মন সন্তুষ্ট নাহলেও রসূলুল্লাহ সা. যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না - এই মনোভাবটাই তিনি তুলে ধরলেন স্বাক্ষর দেয়ার মাধ্যমে।

হোদাইবিয়ার এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রসূল সা. সাহাবীদেরকে কুরবানী করতে ও মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। কিন্তু অস্থিরতা, দুঃখ ও বেদনার কারণে কেউ নড়াচড়াই করলোনা। দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিলেন। তাতেও কাজ হলোনা। তৃতীয়বার নির্দেশ দিলেন। তখনও সেই অবস্থাই বহাল রইল। এ থেকেই বুঝে নেয়া যায় যে, স্বয়ং রসূল সা. এর হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দলটির মধ্যে কি ধরনের মানসিক সংকট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মানবীয় তৎপরতার ক্ষেত্রে কত বিচিত্র রকমের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তাও এই ঘটনা থেকে জানা যায়। এ অবস্থা দেখে রসূল সা. মর্মাহত হয়ে নিজ

তাবুতে চলে এলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে অনুযোগ করলেন, লোকদের কী হলো যে, আমি যে হুকুম দিলাম, তা কার্যকর হলোনা। হযরত উম্মে সালমা রা. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ চুক্তির শর্তপালনে তারা মর্মাহত। আপনি বাইরে বেরিয়ে নিজের কুরবানী করুন ও চুল কামান।' রসূল সা. উঠে বাইরে গিয়ে কুরবানী করলেন ও চুল কামালেন। এই বাস্তব পদক্ষেপ পুরো জামায়াতের লোকদের আনুগত্যের ওপর বহাল করে দিল। কিন্তু তবুও অবস্থা এমন ছিল যেন তারা পরস্পরকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। যাহোক, এটা ছিল একটা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার এবং অচিরেই তা কেটে গেল।

এ থেকেই বুঝা যায়, যুদ্ধ এড়িয়ে সমঝোতা ও আপোষের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য রসূল সা. কত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে কুণ্ঠিত হননি এবং নিজের প্রাণপ্রিয় দলের অত্যন্ত গভীর, পবিত্র ও আন্তরিক ভাবাবেগকে পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছেন।

তিনি এই চুক্তি দ্বারা বেশ বড় বড় কয়েকটা সুবিধা লাভ করলেন। প্রথমতঃ মুসলমান, মোশরেক ও সাধারণ আরবদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল। লোকদের আসা যাওয়া শুরু হলো। বহু বছর যাবত যে সব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাত ছিলনা, তারা একত্রে উঠাবসার সুযোগ পেল। মক্কায় রসূল সা. ও মুসলমানদের সম্পর্কে মোশরেকরা যে সব বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল, মুসলমানরা তা জানবার ও দূর করার সুযোগ পেতে লাগলো। তারা মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো। নিজেদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও জ্ঞানগত উন্নতির বিষয় সাধারণ মানুষকে অবহিত করার সুযোগ পেতে লাগলো। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ঘরে ঘরে খোলামেলা আলোচনা হতে লাগলো। সন্ধি পরবর্তী এই শান্তির সময়টাতে ইসলাম এত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করলো যে, বিগত আঠারো উনিশ বছরে সামগ্রিকভাবে যত লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, হোদাইবিয়ার সন্ধির পরবর্তী মাত্র দু'বছরেই তার চেয়ে অনেক বেশী লোক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমনকি খালেদ ইবনে ওলীদ ও আমর ইবনুল আসের ন্যায় কর্মবীর যুবকও এই সন্ধির পরই ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় যে সুবিধাটা অর্জিত হয়েছিল তা হলো, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক সংশোধন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজ সমাধা করার জন্য একাগ্রতা অর্জিত হলো। অভ্যন্তরীণ অংগনে নিরাপত্তা লাভের পর বিদেশী সরকারগুলোকে দাওয়াত দেয়ারও সুযোগ পাওয়া গেল।

তৃতীয় সুবিধা পাওয়া গেল এই যে, মদিনার সরকার খয়বরের ইহুদী বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোরায়েশের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। হোদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরই ইসলামী সরকার এই সমস্যার সমাধান করে ফেলতে সক্ষম হলো।

চতুর্থ সুবিধা অর্জিত হলো এই যে, আরবের সবগুলো গোত্র স্বাধীন হয়ে গেল। যে গোত্রের ইচ্ছা হবে, মদিনার সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে পারবে। এটা এমন একটা নব উন্মুক্ত দরজা ছিল যে, এর মধ্য দিয়ে বহু নতুন লোক ইসলামের অভ্যন্তরে প্রবেশ অথবা মুসলমানদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে পারতো। অথচ কোরায়েশরা

তাতে কোন বাধা দিতে সক্ষম ছিল না। বনু খুযায়া গোত্র এই সুযোগেই ইসলামী সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এটাও চতুর্থ সুবিধারই আওতাভুক্ত যে, মাত্র এক বছর পর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুসলমানরা মক্কায় গিয়ে কা'বা যিয়ারত করে এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তা ছিল পরিপূর্ণ নির্ভীকতার পরিবেশ।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, কোরায়েশের মত কট্টর দুশমনদের সন্ধিতে উদ্বুদ্ধ করাটাই ছিল রসূল সা. এর রাজনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মো'জেযা। একটা শর্তে দৃশ্যত কিছুটা নতি স্বীকার করে রসূল সা. তাতে সাফল্য ও সুযোগ সুবিধা লাভ করেন, যা কোরায়েশ ঐ সময় কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের সমর্থক ইহুদীদেরকে সামরিক ঘাঁটি খয়বরকে যে অচিরেই পতন ঘটবে এবং কোরায়েশ একলা হয়ে যাবে, তা কি তারা ভাবতেও পেরেছিল? অপরদিকে ইসলাম এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করবে, এমনকি খোদ মক্কা শহরে তার এত প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে যে, কোরায়েশদের শক্তি বর্তমান মানের চেয়ে নীচে নেমে যাবে, সেটাই বা কে অনুমান করতে পেরেছিল? আসলে এই চুক্তি ইসলামকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মক্কা জয় করার বিপ্লবী ক্ষমতা যুগিয়েছিল।

মদিনায় ফেরার সময় পথিমধ্যে সূরা ফাতাহ্ নাযিল হয়, যাতে অতীতের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের সুযোগ সুবিধার আভাষ দিয়ে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ সুসংবাদ দেন যে, তোমরা অচিরেই এমন একটা যুদ্ধে জয় লাভ করবে (খয়বরের যুদ্ধ), যাতে তোমাদের হাতে অনেক গনিমতের সম্পদ আসবে, তারপর তোমাদের অভাবনীয় সাফল্য ও বিজয় অর্জিত হবে, যা এতদিন ছিল সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আয়ত্বের বাইরে। এতে আরো বলা হয়, যদিও মক্কার মোশরেকদেরকে তোমরা আজও পরাজিত করতে সক্ষম এবং তারা অবশ্যই পালিয়ে যেত, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বহু নরনারী রয়েছে, যারা কোরায়েশদের অজান্তেই ইসলামকে মেনে নিয়েছে এবং তারা মনে মনে তোমাদের সমর্থক। এখন যুদ্ধ বেধে গেলে তারা বাধ্য হয়ে তোমাদের মোকাবিলায় আসতো এবং তোমরা তাদেরকে চিনতে না পারার কারণে আঘাত করতে। সুতরাং এটা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি দুই পক্ষকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করেছেন। বিশেষত কাফেরদের দিক থেকে যখন জাহেলী আত্মাভিমানের অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রদর্শনী করা হয়েছে এবং 'রহমানুর রহীম' ও 'রসূলুল্লাহ' শব্দ ক'টিও তাদের সহ্য হয়নি, আর যখন আবু জুন্দুলের ব্যাপারেও চরম হঠকারিতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এক পক্ষ যখন এ ধরনের বাঁকা পথ অবলম্বন করে, তখন অন্য পক্ষও নম্র ও ঠান্ডা পন্থা অবলম্বন করতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যে রসূল সা. ও মুসলমানদের ওপর স্থিরতা নাজিল করেছেন, তোমাদের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে দিয়েছেন, এবং তোমাদেরকে খোদাভীতি ও সংযমের ওপর বহাল রেখেছেন, সেটা ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ। তোমরা মোশরেকদের মোকাবেলায় এ ধরনের আচরণেরই উপযুক্ত ছিলে। নচেত তোমরাও যদি উত্তেজিত হয়ে যেতে, তাহলে সংঘর্ষ বেধে যেত এবং সহজে যে সুযোগ ও সাফল্য অর্জিত হচ্ছিল, তা হাতছাড়া হয়ে যেত।

সূরা ফাতাহ্ শুরু হয়েছে ঃ "ইন্না ফাতাহ্না লাখা ফাতহাম মুবিনা" "আমি তোমাকে সুস্পষ্ট

বিজয় দিয়েছি" এই কথাটা দিয়ে। হযরত ওমর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি যথার্থই সুস্পষ্ট বিজয়? রসূল সা. বললেন, 'হা, এটা সুস্পষ্ট বিজয়।' বস্তুত ঘটনা প্রবাহের আলোকে বুদ্ধি বিবেকের প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনেক পরে এসেছিল। এই সময় হযরত ওমর ইসলামের পক্ষে আন্তরিক সমর্থন পোষণ করার কারণে যে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি ঘটান, তার জন্য দীর্ঘ দিন নফল এবাদত করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন। এটাই আন্তরিকতার লক্ষণ। অপরদিকে হযরত আবু বকরের অবস্থা ছিল এই যে, সর্বব্যাপী অস্থিরতার সময়ও তিনি স্থির ও শান্ত থাকেন। মানবীয় সংগঠনের সদস্যদের মেযাজের এই বৈচিত্র্য সংগঠনকে একটা বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও ভারসাম্য দান করে। এর এক প্রান্তে থাকে সিদ্দীকী গাম্ভীর্য আর অপর প্রান্তে থাকে ফারুকী তেজস্বিতা ও কঠোরতা।

এবার শুনুন, চুক্তিতে যে ধারাটি যুক্ত করে তারা জয়ের আনন্দে বোগল বাজানোর উপক্রম করেছিল, সেই ধারাটিই কিভাবে তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। প্রথমত এর কারণে মক্কায় গোপনে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কেননা চুক্তি অনুসারে তাদের মদিনায় যাওয়ার পথ রুদ্ধ ছিল। আর এ কারণে কোরায়েশদের শক্তি ভেতর থেকে খোক্‌শা হয়ে যেতে লাগলো। অপরদিকে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেল। ইসলাম গ্রহণকারী আবু বছীর কোন রকমে পালিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে পৌঁছলো। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোরায়েশরা দু'জন লোক পাঠালো। রসূল সা. চুক্তি পালনের নীতিতে অটল থেকে আবু বছীরকে ফেরত দিলেন। আবু বছীরকেও তিনি এই বলে প্রবোধ দিলেন যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য একটা না একটা পথ বের করে দেবেন। অনন্যোপায় হয়ে আবু বছীর ফিরে গেল। পথিমধ্যে তিনি কোরায়েশদের পাঠানো দু'ব্যক্তির একজনকে বাগে পেয়ে তারই তরবারী দিয়ে হত্যা করে পুনরায় মদিনায় চলে এলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও নালিশ করতে মদিনায় এল। আবু বছীর রসূল সা. কে বুঝালেন যে, আপনিতো আপনার ওয়াদা পালন করেছেনই এবং আমাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করেছেন। কিন্তু আমি নিজেকে মোশরেকদের খপ্পরে ফেলে নিজের ঈমানকে বিপন্ন করতে চাইনি। কাজেই আমি নিজ দায়িত্বেই এ কাজ করেছি। আপনার ওপর এর কোন দায়দায়িত্ব বর্তেনা। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। রসূল সা. বললেন, "এই ব্যক্তি যদি কিছু লোক জোগাড় করতে পারে, তাহলে তো যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।" আবু বছীর ভাবলো তাকে বুঝি আবার মক্কায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাই তিনি গোপনে মদিনা থেকে বেরিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী ঈস নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করলেন। পরে আবু জুন্দুলও ওখানে এসে গেল। এরপর মক্কা থেকে অন্যরাও বেরিয়ে সমুদ্রতীরে চলে যেতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে এখানে সত্তর জনের এক বাহিনী গড়ে উঠলো।' মক্কাবাসীর সাথে তাদের আদর্শিক বিরোধও ছিল, আবার ব্যক্তিগতভাবে যুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে প্রতিশোধ স্পৃহাও ছিল। তারা মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিকও ছিল না যে, তাদের ওপর চুক্তি পালনের দায়দায়িত্ব বর্তাবে। তাদের এটা ছিল একটা "স্বাধীন ইসলামী ফ্রন্ট।" তারা কোরায়েশদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর ওপর গেরিলা আক্রমণ শুরু করলো। এতে কোরায়েশরা বেকায়দায় পড়ে গেল। অবশেষে তারা নিজেরাই দরখাস্ত করে চুক্তি থেকে তাদের প্রিয় শর্তটা বাদ দেয়ালো। এরপর রসূল সা. এই যুবকদেরকে

মদিনায় ডেকে নিলেন। ওদিকে মক্কা থেকে নওমুসলিমদের হিজরতের পথও উন্মুক্ত হয়ে গেল।

একটা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হলো তখন, যখন মক্কার বিশিষ্ট সরদার উকবা ইবনে আবি মুয়াইতের মেয়ে উম্মে কুলসুম হিজরত করে মদিনায় এল। তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার দু'ভাই আম্মারা ও ওলীদ উপস্থিত হলো। বিষয়টা রসূল সা. এর কাছে আনা হলো। তিনি আল্লাহর নির্দেশে উম্মে কুলসুমকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করলেন। একজন মুসলিম মহিলাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করা আর একজন মুসলিম পুরুষকে সোপর্দ করা এক কথা নয়। রসূলের সা. এই অস্বীকৃতির একটা নৈতিক মূল্য ছিল। চুক্তির ভাষাও এমন ছিল যে, নারীদের ব্যাপারে ব্যাখ্যার বিভিন্নতা বের করার সুযোগ ছিল। তাই দু'ভাই যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল, তখন কোরায়েশ ব্যাপারটাকে মেনে নিল। যেহেতু রসূল সা. সূরা মুমতাহিনার নির্দেশের অধীন এই অস্বীকৃতির সাথে সাথে আরো কয়েটা সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন, যেমন প্রত্যেক মুসলমানকে তার মক্কায় থেকে যাওয়া কাফের স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে এবং উভয় দিক থেকে মোহর দিতে হবে, তাই সামগ্রিকভাবে এ সিদ্ধান্তটা কোরায়েশের ভালো লেগেছিল।

এই হলো সেই ঐতিহাসিক হোদায়বিয়ার সন্ধি, যা ফলাফলের দিক থেকে একটা মহাবিজয় ছিল। এই চুক্তি করতে কোরায়েশকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ সংক্রান্ত সব কটা জটিল স্তর অতিক্রম করা রসূল সা. এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও নেতাসুলভ প্রজ্ঞারই পরিচায়ক ছিল। এদ্বারা পরবর্তীকালের মুসলমানরাও কেয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে থাকবে। এ সন্ধি রসূল সা. এর রাজনৈতিক দক্ষতার এক অতুলনীয় নমুনা এবং তাঁর এক অসাধারণ কীর্তি।

ওমরাতুল কাযা

হোদায়বিয়ার সন্ধ্যি চুক্তিতে স্থিরীকৃত ছিল যে, এ বছর মুসলমানরা ফিরে যাবে এবং পরের বছর এসে যিয়ারত করে যাবে। সে অনুসারে ৭ম হিজরীতে রসূল সা. সাথীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। এই সফরও প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে তা রাজনৈতিক। এর ফলে পরিবেশে গভীর প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং এর কারণে ইসলামের প্রভাব শুধু মক্কাতেই বেড়ে যায়নি, বরং সমগ্র আরবেও মুসলমানদের অবাধে মক্কায় প্রবেশের কারণে চমকপ্রদ মানসিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

একশো ঘোড়া ও ষাট (মতান্তরে আশি) উট সহ দু'হাজার ব্যক্তি রওনা হলো। অস্ত্রশস্ত্র কোষবদ্ধ অবস্থায় নেয়া হলো। চুক্তি অনুযায়ী কোরায়েশরা তিন দিনের জন্য হারাম শরীফকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হলো। কিছু কিছু কট্টর বিরোধী শহর ছেড়ে দূরবর্তী পাহাড়ে চলে গেল, যাতে এই দৃশ্য দেখতে না হয়। কিন্তু সাধারণ মক্কাবাসী, নারী ও শিশুরা কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী ইসলামী শক্তির ওমরা আদায়ের দৃশ্য দেখছিল।

প্রবেশের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রসূল সা. এর বাহক জন্তুর লাগাম ধরে একটা বিপ্লবী গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই গানের কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সেই সত্তার নাম নিয়ে প্রবেশ করছি, যার দ্বীন ছাড়া আর কোন দ্বীন নেই। সেই সত্তার নামে প্রবেশ করছি, মুহাম্মাদ সা. যার রসূল।"

"হে কাফেরের বাচ্চারা, তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়াও। দয়ালু আল্লাহ স্বীয় কিতাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ"
"যে লড়াই তাঁর পথে করা হয়, সেটাই সর্বোত্তম লড়াই। হে আমার রব, আমি তোমার কথার ওপর ঈমান রাখি।"
গানের মধ্য দিয়েই ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিল। অথচ বহু বছর যাবত মক্কা এ দাওয়াতের শব্দ থেকে বঞ্চিত ছিল। এতে জেহাদের কথাও শোনানো হচ্ছিল। আল্লাহর সেই অতিপ্রিয় নাম 'রহমান'ও এতে উচ্চারিত হচ্ছিল, যা কোরায়েশ মোটেই সহ্য করতে পারতোনা। এতে মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাতের কথাও ঘোষিত হচ্ছিল। ইসলাম বিরোধী শক্তিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় বলা হচ্ছিল, রসূলের পথ থেকে সরে দাঁড়াও এবং বাধা দেয়া বন্ধ কর। সেদিন মক্কায় বাধা দেয়ার মত কেউ ছিলনা। হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি হাত ও মুখ বন্ধ করে রেখেছিল।

রসূল সা. তাঁর দলের লোকদের হুকুম দিলেন বুক টান ও ঘাড় উঁচু করে চলতে এবং ছড়িয়ে ছড়িয়ে তাওয়াফ করতে, যাতে করে এই অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুধা ও জ্বরের কারণে মোহাজেররা দুর্বল হয়ে গেছে। কেননা আজ শত্রুকে ঘাবড়ে দেয়া প্রয়োজন। রসূল সা. বললেন, "যে ব্যক্তি আজ কাফেরদের সামনে শক্তি প্রকাশ করবে তার ওপর আল্লাহর রহমত হোক।" এ উদ্দেশ্যেই তিনি রুকনে ইয়ামানী থেকে রুকনে আসওয়াদ ধারণ ও চুম্বন করা পর্যন্ত নম্র ও ধীর গতিতে (হেটে) চলতেন এবং এই অংশে থাকাকালে দর্শক জনতা তওয়াফকারীদের দেখতে পেতনা। তারপর পরবর্তী পর্বে হালকা দৌড় দিতেন এবং এই অংশেই তওয়াফকারীদের দেখা যেত। এ থেকে বুঝা গেল যে, বিরোধী মহলে ইসলামের মোজাহেদদের যে কোন ধরনের দুর্বলতা, চাই তা শারীরিকই হোক না কেন, তা যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্য চেষ্টা করা উচিত, বরং জাঁকজমক ও শক্তি প্রদর্শন দ্বারা বিরোধীদেরকে ভীত সন্ত্রস্থ করা উচিত। এটা ইসলামী রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যে, হারাম শরীফে এবং তওয়াফের সময়ও তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই শক্তি প্রদর্শনীকে অহংকার ও দাম্ভিকতার সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। বরঞ্চ এটা সওয়াবের কাজ। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি বিনয় প্রদর্শন করা হয়, তাহলে তার ফল ফলবে ঠিক উল্টো। এই সব ছোট খাট সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল সা. সমকালীন রাজনৈতিক চাহিদার ওপর কত গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং তা পূরণ করার ওপর কত বেশী গুরুত্ব দিতেন। এই রাজনীতি তাঁর ব্যক্তিগত পদমর্যাদার জন্য নয় বরং ইসলামী ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার খাতিরেই অপরিহার্য ছিল। এ জন্য এটা ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় কাজ এবং এর প্রতিটি তৎপরতাই ছিল এবাদত।

ভেবে দেখুন, সত্য দ্বীনের আহ্বায়কদের এই সমাবেশকে যখন মক্কার জনতা দেখছিল, তখন নারী পুরুষ ও শিশুদের মনে কি ধরনের ধ্যান-ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা নিশ্চয়ই ভাবছিল, মক্কা থেকে যে ইসলামের সূচনা হয়েছিল, তারই ফসল আজ তাদের সামনে উপস্থিত। তারপর হেরাগুহা, সূর গুহা, আরকামের বাড়ী, শিয়বে আবু তালেব এবং আন্ নাদওয়ার মত ঐতিহাসিক স্থানগুলো তাদের সামনে মাথা তুলে বলছিল, দেখ, এই পুণ্যবানদের দল কত বড় ও মহান। তোমরা এদের তুলনায় কত নিকৃষ্ট ও হীন রয়ে গেছ।

মক্কার অলিগলির প্রতিটি ধুলিকণা বলছিল, এই হচ্ছে সেই ধৈর্যশীলদের দল, যাদেরকে তোমরা বিনা অপরাধে বছরের পর বছর ধরে কষ্ট দিয়েছ। দেখ, আজ তারা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। কাবার চত্তর হযরত আবু যর গিফারীর প্রথম প্রকাশ্য কলেমা উচ্চারণ ও গণপিটুনি, মক্কার মরুপ্রান্তর হযরত বিলালের আহাদ আহাদ উচ্চারণ ও লোমহর্ষক নির্যাতন, এবং দারুণ নাদওয়া রসূল সা. এর হত্যার ষড়যন্ত্রের স্মৃতি যেন একে একে তুলে ধরছিল, আর বলছিল, তোমাদের নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের শিকার সেই মহামানবের দাওয়াত আজ চারদিকে কত পরিবর্তন এনেছে তাকিয়ে দেখ! তের বছরের ইতিহাস চারদিক থেকে স্মৃতির ঢল নামাচ্ছিল। বদর ও ওহুদে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের আত্মা হয়তো রক্তিম আলখেল্লা পরে তাদের সামনে ভেসে উঠছিল এবং তাদেরকে মিনতি জানাচ্ছিল, ওহে মক্কাবাসী, তোমরাও জাগো, তোমরাও নিজেদেরকে পরিবর্তন কর, সামনে এগিয়ে যাও এবং এই বহমান পুণ্যপ্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দাও।

একদিকে মুসলমানদের এবাদতের দৃশ্য দেখে জনতা অভিভূত হয়েছে। অপরদিকে তাদের নৈতিক মান দেখেও মুগ্ধ হয়েছে। কেননা এত বিপুল সংখ্যক মানুষ মক্কা নগরীতে তিন দিন যাবত অবস্থান করেছে। অথচ চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কোন মক্কাবাসীর জানমালের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয়নি। মোশরেকরা যেভাবে তাদের ঘরবাড়ী তালাবদ্ধ করে বাইরে চলে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে তা অক্ষত ও নিরাপদ থেকেছে।

ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে যারা ঈমান লুকিয়ে মক্কায় অবস্থান করছিল, এ দৃশ্য দেখে সেদিন নিশ্চয়ই তাদের চোখ জুড়িয়ে গেছে। তাদের ভাবাবেগে নতুন শক্তির দোলা লেগেছে। তাদের মধ্যে নতুন আশা উজ্জীবিত হয়েছে। আর বিরোধীরা নিজেদেরকে চরম কোনঠাসা অনুভব করেছে। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এক অন্ধকার ভবিষ্যত।

তিন দিন ধরে মক্কা নগরীতে পুণ্যবানদের এই সমাবেশ রইল। চতুর্থ দিন সোহায়েল বিন আমর ও খুয়াইতিব বিন আব্দুল উয্‌যা রসূল সা. এর কাছে এসে বললো, "তিন দিন তো হয়ে গেছে। এখন আমার ভূখন্ড ছেড়ে চলে যান।" রসূল সা. তখন কতিপয় আনসারের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। সা'দ বিন উবাদা সোহায়েলের কথা বলার ভংগীটা সহ্য করতে পারেননি। তিনি বললেন, "শালা, এই ভূখন্ড তোরও নয়, তোর বাপেরও নয়। আমরা কখনো যাবোনা।" রসূল সা. উত্তপ্ত পরিবেশকে স্বাভাবিক করার জন্য কিছুটা রসালো বাচনভংগী অবলম্বন করলেন। তিনি এই সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই প্রসংগ টেনে তিনি বললেন, "দেখ, আমি এখানে একটা বিয়ে করলাম। এ উপলক্ষে একটু ভোজের আয়োজন করলে মন্দ কী? আমরাও খাবো, তোমরাও শরীক হবে।" কিন্তু এতে তাদের মেযাজের রুক্ষতায় কোন পরিবর্তন এলনা। তারা বললো, "আমাদের ভোজটোজের দরকার নাই। তোমরা বিদায় হও।" অগত্যা তারা আর কী করবেন? দেখছিলেন যে, গোটা পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তাদের একগুঁয়েমির কারণে রসূল সা. তাঁর দলকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের শিশু মেয়ে "ইয়া আমিন, ইয়া আমিন" (চাচা, চাচা) বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে এসে রসূল সা. কে জড়িয়ে ধরলো। সে কী হৃদয়বিদারক

দৃশ্য! রসূল সা. ঐ শিশুকে সাথে নিয়ে নিলেন এবং তার খালার কাছে অর্পণ করলেন। এই খালা ছিল যায়েদ বিন হারেসার স্ত্রী।

স্মরণ করা যেতে পারে, হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসূল সা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি তো বলেছিলেন আমরা হারাম শরীফে যাবো ও তওয়াফ করবো। সেটা তো হলোনা।" রসূল সা. তার জবাবে বলেছিলেন, "আমি কখন বলেছিলাম যে, এ বছরই তওয়াফ করবো?" বস্তুতঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির বছর অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হিজরীতে হারাম শরীফে যাওয়া ও তওয়াফ করা সম্ভব হলেও এ বছরের মত জাঁকজমকের সাথে হতোনা, হতো রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিক পরিবেশে জাঁকজমকের সাথে ওমরা আদায় করা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কাজ।

পরে এ ঘটনাটা নিয়ে যখন আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তখন জনমত যে আগের চেয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে। লোকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেয়েছে, যে মক্কা থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে তারা এবার বুকটান ও ঘাড় উঁচু করে ঢুকেছে। যে কোরায়েশ মুসলমানদের ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল, সেই কোরায়েশ তাদের সাথে সন্ধি করে নিজেদের অক্ষমতা প্রমাণ করে দিয়েছে। সুতরাং জনগণ অবশ্যই এই ধারণায় উপনীত হয়েছে যে, দেশের ভবিষ্যত মদিনার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এতে জনমতের কাছে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে! এক কথায় বলা যায়, ওমরাতুল কাযাও ইসলামের বিকাশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

জনমতের ওপর জেহাদের প্রভাব

ইতিপূর্বে আমরা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছি যে, ইসলামী আন্দোলন ও জাহেলিয়াতের মধ্যে আসল বোঝাপড়া যুদ্ধের ময়দানে নয় বরং জনমতের ব্যাপকতর ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আঠারো বিশ বছর ধরে সে বোঝাপড়া চলেছে এবং এই ব্যাপকতর ময়দানেই চূড়ান্ত ফায়সালাও হয়েছে। তবে তার অর্থ এ নয় যে, এই চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়ার ব্যাপারে সশস্ত্র জেহাদের কোন অবদানই ছিল না।

সংস্কার সংশোধন ও পুনর্গঠনে শক্তিশালী দাওয়াতী বক্তব্য নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু সামষ্টিক জীবনে আজ পর্যন্ত এমন কোন বিপ্লব সংঘটিত হয়নি, যার উদ্যোক্তারা নিজেদেরকে বাস্তব ময়দানেও বলিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী প্রমাণ করতে এবং পথের বাধা দূর ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিরোধ খতম করার জন্য প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সাফল্যের সাথে শক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়না। ধর্ম তো মানব জীবনের একটা ক্ষুদ্র জায়গার সাথে সম্পৃক্ত। স্রেফ এই ধর্ম নিয়েই যদি চলতে চান, তা হলে ওয়াজ নসিহত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষার চেয়ে বেশী কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয়না। মাথার ওপর যে ধরনের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই কার্যকর থাকনা কেন, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেভাবেই চলুক না কেন, মানুষের মনে কিছু ভালো আকিদা-বিশ্বাস ঢুকানোর অবকাশও থাকতে পারে। তাদেরকে কিছু জপতপ, মন্ত্রতন্ত্র, ওযীফা দোয়া ইত্যাদিও শেখানো যেতে পারে এবং তাদেরকে বিনয়, নম্রতা, দয়া, সহানুভূতি, ইত্যাকার সদগুণ

দিয়েও কিছুটা সজ্জিত করা যেতে পারে। একটা বাতিলপন্থী ও শোষণ নিপীড়নমূলক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতাধীন তৎপরতা চালাতে গিয়ে এবং ঐ ব্যবস্থার তৈরী করা চরম মানবতাবিরোধী পথে জীবিকা উপার্জন ও স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে বিবেকে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, সেই ক্ষতকে সারাতে সুফিবাদী পদ্ধতির ব্যক্তি কেন্দ্রিক সংস্কার ও সংশোধন প্রক্রিয়া এবং তার তৈরী পীরী মুরিদীর প্রতিষ্ঠানগুলো নানা রকমের প্রলেপ দেয়। নিকৃষ্টতম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণকারী ধর্মগুলো আসলে মানুষের পলায়নপর মনোবৃত্তিরই সৃষ্টি। সামষ্টিক জীবনে বড় বড় অপরাধ সংঘটিত করা এবং লোমহর্ষক নির্যাতন চালানোর পর সে ব্যক্তিগত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জোরে নিজের খোদাকে ও বিক্ষুব্ধ বিবেককে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু যে ধর্ম মানবরচিত বিধানের সাথে আল্লাহর জিকির ও ধ্যানের লেজুড় লাগিয়ে সন্তুষ্ট হয়না, বরং গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে চায়, তার কাজ নিছক আবেদন নিবেদন কেন্দ্রিক ওয়ায নসিহত, নিভৃত কোণে বসে আধ্যাত্মিক সাধনা এবং জনসেবার সীমিত তৎপরতায় সমাধা হয় না, বরং তার জন্য বাতিলের খাঁচা ভাঙ্গা, যুলুমবাজির প্রতিরোধ করা এবং শান্তি ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা সম্বলিত নতুন সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করা জরুরী হয়ে থাকে। সামষ্টিক জীবনে পরিবর্তন আন বিনা বাধায় অসম্ভব। আর বাধা দূর করার জন্য কেবল ওয়ায নসীহত যথেষ্ট হয়না। যাদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থকে উৎখাত করা হয় এবং যাদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করা হয়, তারা ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কোন আন্দোলন দ্বারা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে পথ থেকে না হটানো পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের স্বপ্ন কখনো সফল হতে পারেনা।

ইসলাম যখন আবির্ভূত হলো এবং আরবের জাহেলী সমাজব্যবস্থা যে মৌলিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছিল, তার ভিত্তিমূলে আঘাত হানলো, তখন শুরুতেই জাহেলী জীবন ব্যবস্থার ধারক বাহকরা বুঝতে পারলো যে, এতো একটা সর্বাত্মক আঘাত। সমগ্র ভবনটাকে ভেঙ্গে নতুন ভবন গড়ার লক্ষ্যে এ আঘাত হানা হয়েছে। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনের সর্বাত্মক বিরোধিতা করা হয়েছে এবং এর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। মৌলিক বিপ্লব ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের এরূপ দাওয়াত ও আন্দোলনের যখনই অভ্যুদয় ঘটে, তখন সমাজ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটা অংশ চলমান সময়ের চেয়ে অনেক দ্রুত চলে এবং অনেক দূরবর্তী ভবিষ্যতকে দেখতে পায়। এরা হয়ে থাকে সমাজের সবচেয়ে মেধাবী ও সবচেয়ে কর্মচঞ্চল লোক। এদের সংখ্যা সব সময় কম হয়ে থাকে এবং এরা ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী দাওয়াতকে গ্রহণ করে। তাদের বিপরীতে থাকে প্রাচীন ব্যবস্থার নেতৃত্বদানকারী ও বড় বড় স্বার্থের প্রতিভূ শ্রেণী। এই শ্রেণীটি কাল বিলম্ব না করে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা তাদের প্রভাবাধীন শ্রেণীগুলোর মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যক সমর্থককে বের করে নেয়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটা হয় বিকাশমান সংখ্যালঘু। আর শেষেরটি সংকোচনশীল ও বিভাজনরত সংখ্যাগুরু। উভয় শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত চলে। সক্রিয় শ্রেণী দু'টো চিন্তাগত ও রাজনৈতিক আখড়ায় এসে মল্লযুদ্ধ শুরু করে। আর সাধারণ জনতা বাইরে নীরব দর্শক হয়ে দেখতে থাকে কখন কার জয় পরাজয় হয় এবং খেলার শেষ ফল কী দাঁড়ায়? এই

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যত মেধাবী ও সক্রিয় লোক থাকে, তারাও ধীরে ধীরে যুদ্ধে যোগ দান করে। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ শেষ ফলের অপেক্ষায় থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই হয় প্রাচীন ব্যবস্থার অন্ধ পূজারী। তারা ভাবতেও পারেনা যে, তাদের প্রাণপ্রিয় পুরনো ব্যবস্থা কখনো পর্যুদস্ত হতে পারে। তারা যতক্ষণ সেই ব্যবস্থার ধ্বংসের লক্ষণ দেখতে না পায়, ততক্ষণ তাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন আসতেই পারেনা। এই শ্রেণীর মধ্যে বহুসংখ্যক লোক এমন হয়ে থাকে, যারা নবাগত শক্তির যুক্তি ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেউ কেউ নবাগত শক্তি জয় লাভ করুক-এমন প্রত্যাশাও করে। তবে প্রতিষ্ঠিত পুরনো শক্তির ভয়ে তারা ভীত থাকে। কেউ কেউ বিপ্লবের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে সামনে অগ্রসরও হতে চায়। কিন্তু সাবেক নেতৃত্ব তাদেরকে এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে যে, তারা নড়াচড়া করতেই সাহস করেনা। এমন লোকদের সংখ্যাও নেহাত কম নয় যারা দুই মতাদর্শের মধ্যে যেটা বিজয়ী হয় তাকে হক এবং যেটা পরাজিত হয় তাকে বাতিল মনে করে। বিশেষত দাওয়াতটা যখন ইসলামের হয়, তখন এই চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে আরো ব্যাপকভাবে ছড়ায়। জনগণের এই মানসিক অবস্থাই কোন সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক দাওয়াত গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বন্দ্ব সংঘাতের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে এই মানসিক অবস্থায় যেভাবে পরিবর্তন আসতে থাকে, সেই অনুপাতে দাওয়াতের গতি বিঘ্নিত বা সচ্ছন্দ হয়। সুতরাং যে কোন নতুন দাওয়াতের পতাকাবাহীদের জন্য পথ তখনই উন্মুক্ত হয়, যখন তারা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাতে পারে এবং প্রতিরোধকারীদের ওপর প্রবল জোরদার ও কার্যকর আঘাত হানতে পারে। ফলে জনগণ একদিকে মনে করে যে, পুরানো নেতৃত্বকে হঠানো ও পুরানো ব্যবস্থার শৃংখল ভাঙ্গা কোন অসম্ভব কাজ নয়, অপরদিকে তারা নতুন শক্তি সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারে যে, তারা যুলুমবাজ জাহেলী শক্তিকে আঘাত করার মত শক্তি রাখে। জনমতের অংগনে যখনই এ ধরনের মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে, তখন একটা সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক দাওয়াতের জন্য জনমন পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায়।

মদিনার ইসলামী সরকার ইহুদী ও কোরায়েশদের সামরিক হুমকির জবাব যে সাহস ও দৃপ্ততার সাথে দিয়েছে, তার উদ্দেশ্য তরবারীর জোরে রণাঙ্গণে কিছু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করা ছিলনা। বরং উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধংদেহী প্রতিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের সাহস যেন বাড়ে এবং মদিনার বিপ্লবী শক্তির ওপর যেন তাদের আস্থা জন্মে। এটাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইসলামী আদর্শের কাছ থেকে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভের আশা এবং জাহেলী ব্যবস্থার টেকসই ও স্থিতিশীল না হওয়ার ধারণা জনমনে সৃষ্টি হোক– এটাই ছিল এর লক্ষ্য।

সর্বপ্রথম যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন চারদিক থেকে সকলের দৃষ্টি পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল যে, দেখা যাক কে হারে কে জেতে? সবাই যখন দেখলো, মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান সৈন্য, যাদের কাছে ন্যূনতম সামরিক সরঞ্জামও ছিলনা, তারা নিজেদের চেয়ে তিনগুণ বেশী সংখ্যক বিশাল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করলো এবং আবু জাহিলসহ মক্কার বড় বড় নেতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিল, তখন সমগ্র আরবে এই হতবুদ্ধিকর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হয়ে পারেনি। ঘরে ঘরে তা নিয়ে

আলোচনা হয়েছে এবং তা জনমনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই ঘটনায় প্রথমবারের মত এই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে মদিনার ইসলামী শক্তি শুধু সারা জীবন মার খেয়ে খেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মার শান্তি লাভ করার জন্য সাধু সন্যাসী হয়ে যাওয়া লোকদের দ্বারা গঠিত নয়, বরং ঐ শক্তির হাতে একদিন না একদিন দেশের সামগ্রিক চেহারাই পাল্টে যাবে।

তারপর ওহুদের যুদ্ধ 'কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান' পর্যায়ে থাকায় তার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াও মধ্যম ধরনের ছিল। এরপর সংঘটিত হলো খন্দকের যুদ্ধ। আরব জনগণ দেখলো যে, চারদিক থেকে বিরাট বিরাট বাহিনী সর্বনাশা সয়লাভের মত ছুটে আসছে। তারপর মাস খানেক মদিনা অবরোধ করে রাখার পর এমনভাবে ছত্রভংগ হয়ে গেল যেন ভূমির একটা স্তুপকে কেউ ফু দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনা দ্বারা জনমনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল তা ছিল এই যে, মুসলিম শক্তির শেকড় এত মজবুত যে, শত্রুদের সম্মিলিত শক্তির আক্রমণেও তার ক্ষতি হয়না।

এই সব বড় বড় যুদ্ধের পাশাপাশি ছোট ছোট গোত্রীয় নেতৃত্বের দিকেও মদিনা যথাযথ মনোযোগ দিয়েছে। এসব স্থানীয় নেতৃত্ব দেশজোড়া জাহেলী নেতৃত্বের লেজুড় ছিল এবং এক এক করে এই ধরনের সমস্ত লেজুড়কে ছিন্ন করা ছাড়া জনগণকে এই নেতৃত্বের গোলামি থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব ছিলনা। এর কিছু কিছু লেজুড় তো দাওয়াতের তোড়েই ভেসে গিয়েছিল। বাকী কিছু লেজুড়কে চুক্তি ও মৈত্রী ভিত্তিক সম্পর্ক দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বাদবাকী লেজুড়গুলো যেদিক থেকেই মাথা তুলেছে, ইসলামী সরকার তৎক্ষণাত সেদিকে মনোনিবেশ করেছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহ গুড়িয়ে দিয়েছে। বিদ্রোহী, চোর, ডাকাত ও নাশকতাবাদী কুচক্রীদের বিরুদ্ধে এমন সময়োচিত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যে, যেমনটি আকাশের দুয়ারে আড়িপাতার চেষ্টারত শয়তানকে জ্বলন্ত আগুনের তীর নিক্ষেপ করে আপ্যায়ন করা হয়। মদিনার চার পাশে আইন শৃংখলাকে সর্বতোভাবে বহাল করা এবং নিশ্চিদ্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করা হয়। নচেত চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বেদুঈন গোত্রগুলো যদি বিন্দুমাত্রও ফাঁক ফোকর পেত, তবে মদিনার প্রথম সুসংবদ্ধ সরকারের অভিজ্ঞতা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। ইতিহাসের রেকর্ড দেখলে বুঝা যাবে যে, হিজরতের প্রথম বছর থেকে শুরু করে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সমগ্র সময়টা নিত্যনতুন বিদ্রোহ, অরাজকতা ও নাশকতা দ্বারা পরিপূর্ণ। কাল ওদিকে সামরিক সমাবেশ হয়েছে, তো আজ এদিকে ডাকাতদের চক্র মাথা তুলেছে। একদিন এদিকে কোন দল লুটপাট চালিয়েছে তো পরের দিন মদিনার অন্য প্রান্তে কোন অজানা আততায়ীর দল নিরীহ নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি সাধন করে উধাও হয়েছে। এদিকে কোন যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র চলছে তো ওদিকে কোন বিদ্রোহী পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। কিন্তু মদিনা খুবই সতর্ক ছিল। কোথাও প্রহরীর দল টহল দিচ্ছে, কোথাও সেনাদল পাঠানো হচ্ছে এবং কোথাও আইন শৃংখলা স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশের গ্রুপ রওনা হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে এ পরিস্থিতি আরবদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, মুসলিম শক্তি কোন বোবা বধীর ও অন্ধ শক্তি নয়, বরং তা একটা জীবন্ত, জাগ্রত ও কর্মচঞ্চল সরকার। এ সরকার চতুর্মুখী লড়াই চালিয়ে এক সাথে বহু সংখ্যক শত্রুর সাথে লড়ছে এবং

একদিন না একদিন সে জয় লাভ করবেই।

এরপর যখন মদিনায় ইহুদীদের দাপট চূর্ণ করে দেয়া হলো এবং তারপর উপযুক্ত সময়ে খয়বরের শত্রুদের দুর্গও গুড়িয়ে দেয়া হলো, তখন জনমত কিভাবে এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে দাওয়াত গ্রহণ করার দিকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে গেছে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

তারপর মক্কা বিজয়ের সাড়া জাগানো ঘটনা আরব জাতিকে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঝাঁকি দিয়ে জাহেলিয়তের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং ইসলামী আন্দোলন নবজাগরণের আযান দিয়ে ডেকে বলেছিল যে, "ওঠো, চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে, তখন কোন অন্ধেরও বুঝতে বাকী ছিলনা যে, জাহেলিয়াত ধ্বংসের সম্মুখীন।" আসলেই জাহেলীয়ত সবার চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেল। সেই সাথে সবাই বুঝে নিল যে, কোরায়েশের প্রাচীন জাহিলী নেতৃত্বের যুগও শেষ হয়ে এসেছে। একজন নির্বোধ বেদুঈনও বুঝে ফেলেছে, মুহাম্মাদ সা. এর আনীত বিধানই জ্ঞান, চরিত্র, সজীবতা, শক্তি, উন্নতি, পুনর্গঠন, শান্তি, শৃংখলা ও ইনসাফের নিশ্চয়তা দানকারী একমাত্র বিধান। জনতা তাদের মনমগজের জানালা খুলে দিয়েছে যেন ইসলামী আন্দোলনের আলো ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

এই সব সামরিক তৎপরতা নিরেট সামরিক তৎপরতা ছিলনা, বরং এ সবের ভেতর দিয়ে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার করা হতো। লড়াইগুলো নিছক তীর তলোয়ারের লড়াই ছিলনা বরং আকিদা, আদর্শ ও চরিত্রেরও লড়াই ছিল। এ সব লড়াইতে মুসলমানরা এক নতুন শ্লোগান 'আল্লাহু আকবর' চালু করেছিল। যুদ্ধের ময়দানেও তারা রুকু সিজদার সমাবেশ ঘটিয়েছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করলেও তারা শত্রুর সামনে আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ মাথা নোয়াতেও কসূর করতোনা। তাছাড়া এসব যুদ্ধের নিয়ম শৃংখলাও ছিল অভিনব ধরনের। রণাঙ্গনে তারা শাহাদাত, জান্নাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরন্তন জীবনের আকিদা বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল। এগুলোর বাসনায় প্রত্যেক মুসলমান সৈনিক মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে এগিয়ে যেত এবং হাসতে হাসতে আপন লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতো। তাদের এক চমকপ্রদ সামরিক চরিত্রও ছিল। অন্যরা গানবাদ্যের তালে তালে যুদ্ধ করতো। আর ইসলামী আন্দোলনের জানবাজ সৈনিকরা তাওহীদের শ্লোগানের আওয়াজের সাথে মার্চ করতো। অন্যরা মদ খেয়ে বাহাদুরি দেখাতো। আর মুসলিম সৈনিকরা কর্তব্যবোধের পবিত্র শরবত খেয়ে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতো। অন্যরা যুদ্ধলব্ধ গনিমতের লোভে বীরত্ব দেখাতো। আর রসূল সা. এর অনুসারীরা স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রক্তাপ্লুত প্রান্তরে লুটোপুটি খেত। অন্যরা জাতি, গোত্র ও বংশের আভিজাত্যে প্ররোচিত হয়ে আক্রমণ চালাতো, কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা শুধু সত্য ন্যায় ও ইসলামের খাতিরে লড়াই করতো। অন্যরা লড়াই এর সময় চরম পাশবিক ও নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। শত্রুকে আগুনে পোড়ানো, বেঁধে হত্যা করা, লাশের অবমাননা করা, নিহতদের মাথার খুলিতে মদ খাওয়া, কলিজা চিবানো, নারী ও শিশুদের যবাই করা, গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে দেয়া, ইত্যাদি বর্বরোচিত কর্মকান্ড ছিল তাদের নিত্যকার অভ্যাস। কিন্তু ইসলামী শক্তি এমন নজীরবিহীন বাহিনী ময়দানে নিয়ে এসেছিল, যারা লড়াই এর সময়ও মানবতার নৈতিক সীমারেখার প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করতো। তারা কাউকে কখনো আমানুষিক পন্থায় হত্যা করতোনা। লাশের অবমাননা করতোনা। নারী ও শিশুদের ওপর বাহাদুরী দেখাতোনা। বরং এসব ক্ষেত্রে নৈতিকতা বিবর্জিত শত্রুদের অন্যায় আচরণে ধৈর্য ধারণ করে নিজেদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতো। অন্যেরা বন্দীদের সাথে পশুসুলভ আচরণ করতো। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাদেরকে নিজেদের নাগরিকদের সাথে ভাই ভাই বানিয়ে রাখতো। অন্যেরা চুক্তি সম্পাদন করে তা ভঙ্গ করতো। কিন্তু মুসলিম শক্তি অত্যন্ত নাজুক মুহূর্তেও এবং চরম ক্ষতি স্বীকার করেও চুক্তি রক্ষা করতো। কাউকে আশ্রয় দিলে বা কারো দায়িত্ব নিলে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো। অন্যেরা বিজিত জনপদে ঢুকে বেসামরিক জনতার ওপর জুলুম নির্যাতন চালাতো। কিন্তু মুসলিম শক্তি তার সৈনিকদেরকে ঘরে ঢুকে কোন নাগরিককে হত্যা করা, কারো ব্যক্তিগত সহায় সম্পদ লুণ্ঠন বা আত্মসাত করা, এমনকি শত্রুর বেসামরিক নাগরিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা তোলা পর্যন্ত হারাম ঘোষণা করেছে। অন্যদের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল একটা পার্থিব কাজ। কিন্তু ইসলাম এ কাজকে একটা উচ্চাংগের এবাদত ঘোষণা করেছে।

রসূল সা. এর নির্দেশে রণাঙ্গনেও শত্রুর সামনে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতো। শত্রুর সামনে তিনটে বিকল্প পথ খোলা রাখা হতো। হয় ইসলাম গ্রহণ করে ভাই ভাই হয়ে যাও, নচেত রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার কর, নচেত রণাঙ্গনে মোকাবেলা কর। অথচ অন্যদের মধ্যে এমন কোন আদর্শিক দাওয়াত থাকতোনা। তাদের পক্ষ থেকে দুটো পথই খোলা রাখা হতো। হয় আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। নচেত যুদ্ধের ময়দানে এস।

দুই পক্ষের মধ্যের এই বিরাট পার্থক্য যুদ্ধের ময়দানে খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর এই পার্থক্য বুঝতে পেরে সমগ্র আরব জাতি বিমোহিত ও প্রভাবিত হতো। অর্থাৎ মদিনার ইসলামী সংগঠনের একদিকে দ্রুত গতিতে বিকাশ লাভ করা এবং অপরদিকে নিজেদের চরিত্র দ্বারা নিজেদের আদর্শের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা– এই দুই ধরনের সাফল্য সামরিক অভিযানগুলোর মাধ্যমে আরবের জনমতের ওপর প্রতিফলিত হতো। এই দু'ধরনের সাফল্য যতটা সত্যের দাওয়াতের পথ সুগম করতো, ততটাই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকতো। এই সাফল্য হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তীব্রতর হয়েছে। এজন্য এ সময় জনগণ ইসলামের দিকে অধিকতর দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। আর মক্কা বিজয়ের পর এই সাফল্য পুরোপুরিভাবে বিজয়ীর বেশ ধারণ করে। তাই সমগ্র আরব এক সাথে এই সংস্কারমূলক আন্দোলনের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। এই দু'টি যুগে জনগণ যেরূপ দ্রুত গতিতে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা দেখে বুঝা যায়, কোরায়েশ নেতৃত্ব জনগণের পথে কত বড় অন্তরায় ছিল। আর এই অন্তরায় সরে যাওয়া মাত্রই মানসিক বিপ্লব ঘটে গেছে। যেখানেই কোন কায়েমী স্বার্থের বিজয়ী শ্রেণী এভাবে অন্তরায় সেজে বসে থাকে, সেখানে জনগণের মধ্যে ওয়াজ নসিহতের এবং দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাব তেমন ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনা। সামগ্রিক পরিবেশকে পরিবর্তন করার জন্য -এ ধরনের বাধা দূর করা প্রয়োজন। আর এ জন্য সর্বাত্মক রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণতা রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপরই নির্ভরশীল।

সরকার স্বয়ং বিপ্লব শিক্ষা দিত

অতঃপর যে সব এলাকা সংশ্লিষ্ট গোত্রগুলোর ইসলাম গ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করার মাধ্যমে মদিনার ইসলামী সরকারের কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল, তাদেরকে যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকতে দেয়া হতোনা। বরঞ্চ তাদের কাছে ইসলামের বিস্তারিত দাওয়াত ও শিক্ষা পৌছানো হতো এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। ব্যাপারটা এ রকম ছিলনা যে, ডান্ডা ঘুরিয়ে ও শক্তির প্রদর্শনী করে কোন এলাককে দখল করা হতো এবং তারপর মানুষকে ভেতর থেকে পরিবর্তন ও সংশোধন না করে গরু ছাগলের মত তাড়িয়ে বেড়ানো হতো। সব কিছু যদি তরবারী দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করা হতো এবং ডান্ডার জোরেই যদি সব কিছুর পরিবর্তন করা হতো, তাহলে এই স্বৈরাচার মাত্র কয়েক দিন চলতো। তারপর মানুষ বিদ্রোহ করতো। আর মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বিস্ফোরণ যদি একবার ঘটতো, তাহলে সমস্ত অর্জিত সাফল্য বিনষ্ট হয়ে যেত। বস্তুত শক্তি প্রয়োগের পরিমাণ ইসলামী আন্দোলনে অন্য যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় কম ছিল এবং দাওয়াত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশী।

আদর্শবাদী সরকার মাত্রই প্রচারকেন্দ্রিক হয়ে থাকে এবং তার সমস্ত তৎপরতায় এই উদ্দেশ্যটাই অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে যে, যে আকীদা ও আদর্শের ওপর তার জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তা যেন জনগণ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে ও অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে। এই সরকারের সব ক'টা বিভাগকে তার নির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও ঐ কেন্দ্রীয় দায়িত্বও পালন করতে হয়। এ ধরনের সরকার এমন প্রতিটি জিনিস প্রত্যাখ্যান করবে, যা তার মৌলিক আদর্শের ক্ষতি সাধন করে। সে এমন অলাভজনক জিনিসকেও গ্রহণ করবে যা জনগণের মনমগজে তার মৌলিক মতাদর্শকে বদ্ধমূল করে। তাদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয়ে থাকে, জনগণ নতুন আদর্শের সাথে একাত্ম হয়ে যাক, একাত্ম থাক আন্তরিকতার সাথে। যা করণীয় তা করুক এবং যার্ বিলোপ সাধন করা দরকার তার বিলোপ সাধন করুক।

মদিনার ইসলামী সরকার একদিকে যেমন কঠিনতম যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও আশপাশের অঞ্চলে দাওয়াতী ও প্রচারমূলক দল পাঠানো অব্যাহত রেখেছে। অন্ততপক্ষে চারটে ক্ষেত্রে মদিনা থেকে দাওয়াতী কাজে গমনকারীদেরকে ঘাতকরা শহীদ করে দেয়। দাওয়াতের কাজে গিয়ে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন এমন সাহাবীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বরং বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মুসলিম শহীদদের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও বেশী। চরম নাজুক ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও এই মৌলিক কর্তব্য পালনে শৈথিল্য দেখানো হয়নি। বরং অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়েও তা চালু রাখা হয়েছে। কিছু কিছু সাহাবীকে মদিনায় কিছুদিন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরই গোত্রে দাওয়াতের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। এ ধরনের কিছু সাহাবীদের নাম হলো ঃ (১) তোফায়েল বিন আমর দাওসী (দাওস গোত্র) (২) আমুরা বিন মাসউদ (সাকীফ গোত্র) (৩) আমের বিন শাহর (হামদান) (৪) যিমাম বিন ছা'লাবা (বনু সা'দ) (৫) মুনকিয বিন হাববান (বাহরাইন) (৬) ছামামা বিন ইছাল (নাজদ)। এছাড়া কিছু কিছু গোত্র বা ব্যক্তির কাছে বিশেষ বিশেষ

দাওয়াতদাতাকে নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। যেমন হযরত আলীকে হামদান, হুযায়মা ও মাযহাজে, মুগীরা ইবনে শু'বাকে নাজরানে, দাবার বিন নাথনীসকে ইয়ামানে বসবাসকারী পারস্যবাসীর কাছে, মাহীসা বিন মাসউদকে ফিদকে, আহনাফকে সুলাইম গোত্রে, খালেদ বিন ওলীদকে মক্কায়, আমর ইবনুল আ'সকে ওমানে এবং মোহাজের বিন আবি উমাইয়াকে ইয়ামানের যুবরাজ হারেস বিন ফিলালের কাছে পাঠানো হয়।

কিন্তু ইসলামী সরকার এর চেয়ে অনেক বেশী দাওয়াতী ও প্রচারমূলক কাজ আদায় করেছে বেসরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে। ইসলামী সরকারের কর্মচারীরা নিজেদেরকে পেশাদার চাকুরীজীবী মনে করতেননা এবং তারা অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে চাকুরী গ্রহণও করতেন না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো আল্লাহর বাণী ও বিধানকে সমুন্নত করা এবং মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এ কাজ নিছক বেতনলোভী লোকদের দিয়ে করানো যেতনা। এটা কেবল ইসলামী বিপ্লবের নিস্বার্থ সেবকদের পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। তারা না কোন পদের লোভী ছিলেন, না গ্রেড ও পদোন্নতির চিন্তায় বিভোর থাকতেন। পদ ও দায়িত্বই তাদেরকে ডাকতো এবং ন্যূনতম বেতনেই তারা উচ্চতর দায়িত্ব পালন করতেন। এখানে একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে। আত্তাব বিন উসাইদকে দৈনিক এক দিরহাম বেতনে মক্কার গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। তিনি বক্তৃতায় নিজেই বলেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক এক দিরহাম পেয়েও ভুখা থাকে, আল্লাহ তাকে ভুখাই রাখুন।" (ইবনে হিশাম) তারা সব কিছুর আগে নিজের প্রিয় আকিদা ও আদর্শের আহ্বায়ক ছিলেন। মদিনার সরকার যাদেরকে কোথাও গভর্নর, বিচারক, তহশীলদার বা অর্থবিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করতো, তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাওহীদের দাওয়াতদাতা, ইসলামের শিক্ষাগুরু এবং নৈতিকতার প্রশিক্ষক হতেন। তাদেরকে যখন তাদের বিভাগীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হতো, তখন রসূল সা. তাদেরকে এই মৌলিক দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতেন। হযরত মুয়ায বিন জাবালকে ইয়ামানে আর্থিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে যখন পাঠানো হলো, তখন তাকে এ কথাও বলা হয় যে, "জনগণকে কোরআন শিক্ষা দিও এবং ইসলামের বিধিমালা শিক্ষা দিও।" তারপর তাকে বিশেষভাবে আহলে কিতাবদের প্রয়োজন অনুসারে দাওয়াতের পন্থা বুঝিয়ে দেয়া হয়। তাকে বলা হয়, "তাদেরকে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিও। এটা মেনে নিলে নামায শিখিও। তারপর যাকাতের শিক্ষা দিও।" এই সব কর্মকর্তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজ নিজ সদর দফতরে নামাযের ইমাম হতেন। তবে বড় বড় জনপদে যেখানে দায়িত্ব বন্টন না করে উপায়ই থাকতোনা, সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে সাথে নামাজের জন্যও আলাদা ইমাম নিয়োগ করা হতো। যেমন আত্তাব বিন উসাইদকে মক্কায়, উসমান বিন আবিল আসকে তায়েফে এবং আবু জায়েদ আনসারীকে ওমানে ইমাম নিযুক্ত হন।

বেসামরিক অফিসারদের সংখ্যা প্রচুর। তাই তাদের তালিকা দেয়া হচ্ছেনা। কিন্তু এই সংখ্যা ও এদের নিয়োগ এলাকা দেখলে বুঝা যায় যে, ইসলামী সরকারের বেসামরিক বিভাগ (সিভিল সার্ভিস) ইসলামের দাওয়াত বিস্তারে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া এই সব দাওয়াতদাতা আপন দায়িত্ব পালনের সময় প্রচলিত অর্থে শুধু অফিসার ছিলেন না। আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া, জাঁকজমক, জুলুম ও বাড়াবাড়ি,

জনগণ থেকে দূরে থাকা, মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে উদাসীনতা, রাস্তায় বেরুলে অন্য সবাইকে হাঁকিয়ে দূরে তাড়িয়ে দেয়া, দারোয়ান ও পাইক পেয়াদার মাত্রাতিরিক্ত ভীড় জমানো, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ, লুটপাট, ঘুষ খাওয়া, চাটুকার পরিবেষ্টিত থাকা, সরকারী অর্থের অপচয় করে ইচ্ছেমত পুরস্কার দেয়া, মদের আড্ডা জমানো, নৃত্যগীতের জলসা বসানো– এসব কিছু থেকে তারা থাকতো যোজন যোজন দূরে। এসব বেসামরিক অফিসার একেবারেই ভিন্ন ধরনের অফিসার ছিলেন। তাদের শাসন জনগণের কাছে ছিল এক অভিনব অভিজ্ঞতা। স্বল্প বেতনভোগী, সাদাসিদে জীবন যাপনকারী, সততার সাথে দায়িত্ব পালনকারী, প্রজাদের প্রতি সদয়, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি পরায়ণ, খোদাভীরু এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী আপন চরিত্র দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করতেন। তারা যখন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, তখন সে দাওয়াত শ্রোতার অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করতো। হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে যোবায়েদ ও এডেন অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। সেখানকার সবাই তার দাওয়াতে অতি দ্রুত মুসলমান হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীকে ইয়ামানের রাজবংশের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। তিনি এতটা প্রভাব বিস্তার করেন যে, তারা সবাই ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেয়। আর এই আনন্দে তিনি ৪ হাজার ক্রীতদাসকে মুক্তি দেন।

মোটকথা, সরকারের বেসামরিক বিভাগগুলো অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে ও একাগ্রতার সাথে অবিশ্রান্তভাবে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং এই ব্যাপক ভিত্তিক দাওয়াতী ও শিক্ষামূলক কাজেরই ফল ছিল এই যে, আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যেও শুধু রাজনৈতিক নয় বরং মানসিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল এবং এরই সাথে নৈতিক দিক দিয়েও আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হলো। শেষ পর্যন্ত আরবের গোটা সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলো।

জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

আরবের বিপুল সংখ্যক বেদুঈন অধিবাসী ছিল সাধারণভাবে দরিদ্র। অধিকাংশ মরুচারী গোত্র ছিল যাযাবর। পালিত পশু থেকে প্রাপ্ত যতকিঞ্চিত জীবিকা ছাড়া সশস্ত্র ডাকাতি ও লুটপাটই ছিল তাদের প্রধান উপজীব্য। শহর থেকে অনেক দূরে স্থায়ী নিবাসের অধিকারী কিছু বেদুঈন গোত্রও ছিল। তবে তারাও ছিল খুবই দরিদ্র। এসব গোত্রের শেখ ও সরদাররা অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনার বেশীর ভাগ সুফল নিজেরাই একচেটিয়াভাবে ভোগ করতো এবং সাধারণ মানুষকে করতো তা থেকে বঞ্চিত। শহর বলতে মক্কা, মদিনা, তায়েফ, সানা, হাদরামাউত ইত্যাদিকেই বুঝাতো। এগুলি বড় শহর ছিলনা। এগুলোর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবে সামগ্রিকভাবে তারা ছিল সচ্ছল ও সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যেও উঁচু নীচু শ্রেণী ছিল। উঁচু শ্রেণী নীচু শ্রেণীকে শোষণ করতো। মদিনায় ইহুদীরা ব্যবসায় ও কৃষিতে প্রধান্য বিস্তার করা ছাড়াও সুদী কারবারের জাল পেতে রেখেছিল। অনুরূপভাবে, মক্কা ও তায়েফের বড় বড় বিত্তশালী লোকেরাও অর্থোপার্জনের অন্যান্য পন্থার পাশাপাশি সুদী কারবারও করতো। উচ্চ পর্যায়ের কিছু কিছু পরিবার চরম বিলাসী জীবন যাপন করতো। গানবাদ্য, মদখুরি, প্রেমপ্রণয় ও ব্যভিচার ছিল তাদের সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অথচ আরবের সাধারণ মানুষের অভাবের কোন সীমা পরিসীমা ছিলনা।

অভাবের তাড়নায় তারা মৃত প্রাণীর গোশত পর্যন্ত খেত। পবিত্র অপবিত্র ও হালাল হারামের আদৌ কোন বাছবিচার করতোনা। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সমস্যারই যেখানে সমাধান হতোনা, সেখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উচ্চতর সমস্যার প্রশ্নই তো অবান্তর। চিকিৎসার জন্য দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা, যাদুটোনা, এবং জ্যোতিষী ও ফকীরদের কাছে ধর্না দেয়া হতো। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সীমিত। শহুরে উচ্চ পরিবারের মুষ্টিমেয় লোকের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকতো শিক্ষাদীক্ষার কার্যক্রম। সেখানকার একটা মৌলিক ও বাস্তব সমস্যা ছিল খাদ্য সমস্যা। যে জাতির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সব সময় "কী খাবো" এই প্রশ্ন নিয়েই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, তাকে কোন উচ্চতর ও মহত্তর বিষয়ের জ্ঞান দান করাও যায়না এবং মহত্তর উদ্দেশ্যে তারা কোন স্মরণীয় কাজও সমাধা করে যেতে পারেনা। যারা অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার তাদের বঞ্চনার প্রতিকার না করে কেবল ওয়ায নসিহত ও সদুপদেশ দিয়ে কেউ তাদেরকে ব্যাপকভাবে কোন আন্দোলনে সক্রিয় করতে পারেনা। কোন মতাদর্শ যদি অস্ত্রের বলে ক্ষমতাও দখল করে, কিন্তু মানুষের প্রাথমিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে না পারে, তাহলে নিছক নৈতিক সংশোধন ও পুনর্গঠনের উপদেশ গ্রহণে সাধারণ মানুষ কখনো প্রস্তুত হতে পারেনা। বরঞ্চ এ ধরনের সংস্কার ও সংশোধন ও পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাকে একটা আপদ মনে করে তা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানবতাকে জয় করতে পারবে কেবল তখনই, যখন তা আখেরাতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে এবং নৈতিক সংস্কার ও সংশোধনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও করতে পারবে। নিছক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করা যেমন মানবতাকে নৈতিক দিক দিয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল, তেমনি নৈতিক সংস্কারের কাজকে জীবনের অর্থনৈতিক দাবী ও চাহিদা থেকে পৃথক করে গ্রহণ করাও নৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়ার নামান্তর। ইসলাম উভয় প্রয়োজনকে একই সাথে পূরণ করে। রসূল সা. যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তা একদিকে যেমন হৃদয়কে ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত করে, আত্মাকে নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে, অপরদিকে তেমনি পেটের খাদ্য সরবরাহের জন্য ও সে সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে। শুরুতেই ইসলামের সংক্ষিপ্ততম নৈতিক বিধানে "ইতয়ামু মাছাকীন" অর্থাৎ দরিদ্রকে আহার করানোর বিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া অনাথ, বিধবা ও মোসাফেরকে সাহায্য করাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

আরব ছিল একটা স্বল্প উৎপাদনশীল দেশ। খনিজ, শিল্প, কিংবা গবাদি পশু সকল ধরনের সামগ্রীই ছিল নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত। সম্পদের এই সব উৎসকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা ছিল খুব জটিল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান না করে জীবনের অন্যান্য বড় বড় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিলনা। ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান, (যা পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছিল) মধ্যম পরিস্থিতিতে সম্পদকে সমাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আবর্তনশীল রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই বিধান বাস্তবায়নেরও আগে সম্পদের এই উৎসগুলো ছিল সবচেয়ে জটিল সমস্যা। একমাত্র জেহাদী তৎপরতার মাধ্যমে এই সমস্যার এমন সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়েছে যে, আর কোন বিকল্প উপায়ে এমন সাফল্যজনক সমাধান সম্ভব হতোনা।

সেই প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পরাজিত শত্রুরা অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম গনীমত হিসাবে হস্তগত করা একটা সর্বস্বীকৃত অধিকার বিবেচিত হয়ে আসছে। যুদ্ধ থামানোর জন্য মানুষ হত্যা করার চাইতে কার্যকর ও অব্যর্থ কৌশল হলো প্রতিপক্ষকে অস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম ও রসদ থেকে বঞ্চিত করা। তা ছাড়া প্রতিপক্ষের সামরিক অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়াও এর অন্যতম সাফল্যজনক কর্মপন্থা। ইসলামও গনীমতের অধিকার বহাল রেখেছে এবং সেজন্য বিশেষ ধরনের নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এখানে আমাদের পক্ষে কোন তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কার্যত এই অঙ্গিকার প্রয়োগ করে ইসলামী বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় সঞ্চিত সম্পদকে বন্ধনমুক্ত ও আবর্তনশীল করেছে। জনগণের কাছ থেকে শোষণ করা ইহুদী, সুদখোরদের সম্পদ গনীমতের বিধি অনুসারে গতিশীল হয়েছে। সাকীফ গোত্রের পুঞ্জীভূত সম্পদ তাদের মালিকানার আওতামুক্ত হয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে মদিনার আশপাশের যে সব বিদ্রোহী গোত্র অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করেছে, তাদের ধনাঢ্য নেতা ও সরদারদের সম্পদের একটা বিরাট অংশ মুসলিম বাহিনী তাদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে তাকে আবর্তনশীল করেছে।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) সম্পর্কে জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যুদ্ধের ময়দানে যে যা পেত, সে তা নিয়ে কেটে পড়তো। কেউ চুরি করতো, কেউ প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাত করতো, আর যে যত বড় ও ক্ষমতাশালী হতো, সে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ততই বড় ও উত্তম অংশ গ্রাস করতো। ইসলামী সমরনীতি সম্পূর্ণ অভিনব এক নৈতিকতার উদ্ভব ঘটালো। এই নীতি অনুসারে সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রথমে পাই পাই করে একত্রিত করা হতো। একটা সূঁচও বাদ পড়তোনা। তারপর সেনাপতির নির্দেশে তা বিলি বন্টন করা হতো। এই সম্পদ থেকে বিশ শতাংশ চলে যেত ইসলামী কোষাগারে তথা বাইতুলমালে। এর প্রধান অংশ দরিদ্র ও অভাবীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হতো। এভাবে দেশের সম্পদের একটা অবাধ আবর্তন শুরু হলো। এরপর ক্রমান্বয়ে আর্থিক বিধিবিধান চালু হওয়ার সাথে সাথে এর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হয়েছে।

এরপর ইসলামী রাষ্ট্র ভূসম্পত্তি, পশু ও বাণিজ্যিক পুঁজির মালিকদের কাছ থেকে মুসলমান হয়ে থাকলে যাকাত, অমুসলমান হলে খাজনা ও জিযিয়ার আকারে রাজস্ব আদায় করেছে। এই রাজস্ব থেকে বিশেষত যাকাত থেকে একটা বিরাট অংশ দরিদ্র শ্রেণীগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করেছে। প্রতি বছর শস্য, খেজুর ও পালিত পশুর একটা বিরাট অংশ ধনিকদের কাছ থেকে গরীবদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

তাছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শুধু আইনের জোরেই করা হয়নি। নৈতিক উপায়েও তার সুরাহার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রসূল সা. মদিনার কেন্দ্রীয় সমাজে সামাজিক সাম্যের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সৌভ্রাতৃত্বের (Economic Brotherhood) অত্যন্ত সাফল্যজনক অভিজ্ঞতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। সমগ্র আরববাসী দেখতে পাচ্ছিল যে, আপন ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত লোকজন, সর্বস্বহারা ক্রীতদাস, ক্ষুধা জর্জারিত বেদুঈন, এবং আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা যুবকদের একটি গোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণ করার পর রাতারাতি বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। একদিকে তারা বড় বড় অভিজাত সমাজপতিদের কাঁধে

কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং অকল্পনীয় দুঃসাহসিকতার সাথে চরম দাম্ভিক ও অহংকারী প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। অপর দিকে তাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট ও অভাব অভিযোগ দূর হয়ে যাচ্ছে। তারা আশ্রয় পাচ্ছে, কাজ পাচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে, পরিবহনের জন্তুও পাচ্ছে এবং বিয়ে শাদী করে সংসারীও হচ্ছে। আর ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের এই কল্যাণময় প্রভাব শুধু মদিনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ক্রমান্বয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একদিন সমগ্র আরববাসী তার সুফল ভোগ করেছে।

এই অনুপম সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সৌভ্রাতৃত্বের নয়া ব্যবস্থাকে আরবের জনগণ দূর থেকে দুনিয়ার বেহেশত হিসেবেই দেখেছে ও অনুভব করেছে। আর এই বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য যে তাওহীদের চাবিই যথেষ্ট, তাও তারা জানতো। এমতাবস্থায় নিকৃষ্টতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের যাতাকলে যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত লোকদের মনে যদি এই বেহেশতে প্রবেশ করার আগ্রহ জন্মে, তবে তাতে অবাক হবার কী আছে?

রসূল সা. আরবের সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে লক্ষ্য করে ব্যক্তিগতভাবে ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের বদান্যতা ও দানশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসাবেও পরম উদারতা ও মহানুভবতার নীতি অবলম্বন করেছেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় কখনো কোন সম্পদ সঞ্চিত হয়ে থাকতে দেননি। বরং যত শীঘ্র সম্ভব, তা স্থানীয় ও বহিরাগত অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। বাইতুলমালে কখনো কোন অর্থ পড়ে থাকতে দেননি, বরং যখনই কোন অভাবী ব্যক্তি সামনে এসেছে, তাকে যা কিছু দিতে পেরেছেন দিয়েছেন। রসূল সা. এর কাছে আসল গুরুত্ব ছিল মানুষের। সম্পদকে তিনি মানবতার সেবক মনে করেছেন। এমনকি অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, বাইতুলমালে এবং নিজের কাছে কিছু না থাকায় সাহায্য প্রার্থীকে দেয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

তাঁর দানশীলতার খ্যাতি শুনে দুস্থ পল্লীবাসী ও মরুচারী বেদুঈনরা দূর দূরান্ত থেকে মদিনায় ছুটে আসতো এবং তাঁর অবারিত দানে কৃতার্থ হয়ে ফিরতো। এ ঘটনা সুবিদিত যে, একবার জনৈক বেদুঈন এলো এবং রসূল সা. এর চাদর টেনে ধরে ধৃষ্টতার সাথে বললো, "হে মুহাম্মাদ, সা. এই সমস্ত সম্পদ তো আল্লাহর। তোমার মা বাপের সম্পত্তি থেকে কিছু দিতে হচ্ছেনা। দাওনা আমার উটের পিঠ বোঝাই করে।" দয়ার সাগর রসূল সা. এক মুহূর্ত চুপ থেকে তারপর শান্তভাবে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, এই সব সম্পদ আল্লাহর, আমি তাঁরই বান্দা।" তারপর ঐ বেদুঈনকে এক উট বোঝাই জব ও এক উট বোঝাই খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সে খুব খুশী হয়ে বিদায় হলো। আর একবার বাহরাইন থেকে এত বেশী পরিমাণ রাজস্ব এল, যার সমান রাজস্ব আর কখনো মদিনায় আসেনি। রসূল সা. মসজিদে নব্বীর চত্তরে তা স্তুপ করে রাখলেন। অতঃপর যারা আসতে লাগলো, তাদেরকে একে একে দিতে থাকলেন। তারপর কাপড় ঝেড়ে উঠে বাড়ী চলে গেলেন। এ ধরনের দানের ঘটনা মদিনায় প্রায়ই হতো এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকেরা এসে উপকৃত হতো। এ সব লোক নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ইসলামী সরকারের বদান্যতার কাহিনী বর্ণনা করতো আর সে সব কাহিনীতে অভিভূত হয়ে কত লোক যে ইসলামে দীক্ষিত হতো, কে তার ইয়ত্তা রাখে।

মহানবীর সা. বদান্যতার আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক ব্যক্তি এসে নিজের আর্থিক দুর্গতি বর্ণনা করে কেঁদে ফেললো এবং সাহায্য চাইল। রসূল সা. অদূরে পাহাড়ে বিচরনত এক পাল ছাগল তাকে দিয়ে দিলেন। লোকটা এই অভাবনীয় দান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজ গোত্রে গিয়ে বলতে লাগলো, "তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। মুহাম্মাদ সা. এমন দান করেন যে, গরীবের আর কোন দুঃখ অবশিষ্ট থাকেনা।" (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া)। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলেন, "রসূল সা. আমাকে তিনশো বকরী দান করেছেন। এর ফলে আমার মনের অবস্থা এমন হলো যে, আগে আমার কাছে তাঁর চেয়ে অপ্রিয় কেউ ছিলনা। আর এখন তাঁর চেয়ে প্রিয় কেউ নেই।" এ প্রসঙ্গেই নিম্নের চরনটি আবৃত্তি করা হয়ঃ

هو الذى لا يتقى فقرا اذا يعطى ولو كثر الانام وداموا

"তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি দান করতে
গিয়ে নিজে নিস্ব হয়ে যাওয়ার
ভয় করেন না, চাই যত লোকই তাঁর কাছে
আসুক এবং আসতে থাকুক।"

দানশীলতার এই সর্বব্যাপী খ্যাতির ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, হোনায়েনের গনীমত বন্টন করে তিনি যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁর কাছে জনৈক বেদুঈন এল এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললোঃ আমাকেও কিছু দিন। রসূল সা. পেরেশান হয়ে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন যে, "এই জংগলে যত গাছ আছে, ততগুলো উটও যদি আমার থাকতো, তবে আমি তার সবই তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কার্পণ্য করতেও দেখতেনা, আমার ভেতরে অবাস্তব কথা বলার মনোভাব এবং সাহসের অভাবও দেখতেনা।" (বোখারী শরীফ)

হীনমনা লোকেরা এই বদান্যতাকে টাকার জোরে হৃদয় জয় করা এবং ঘুষ দিয়ে সমর্থক বানানোর চেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত লোকদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদেরকে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দেয়া ইসলামের অন্যতম নীতিগত ও আদর্শগত দাবী। মানব সমাজের যে শ্রেণীগুলো উচ্চতর শ্রেণীর অত্যাচারে ও শোষণের দরুন এমন নিদারুণ অভাবে জর্জরিত হয় যে, তারা জীবনের উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শিক চাহিদার দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায়না, এমন শোচনীয় সংকটে পতিত লোকেরা তো আল্লাহর কাছেও কৃপা লাভ করে। আরবের অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের পরিস্থিতিরই শিকার ছিল। তাদের কলেমা তাইয়েবার মত খাদ্যবস্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল। ইসলামের অর্থনৈতিক ভ্রাতৃত্বের কল্যাণে মদিনাবাসী সম্ভবত প্রথমবারের মত শরীরের মৌলিক প্রয়োজনের উর্ধে উঠে জীবনের আধ্যাত্মিক চাহিদার কথা ভাববার এবং মহৎ নৈতিক মূল্যবোধগুলো লালনের অবকাশ পেয়েছিল। অর্থনৈতিক সংস্কার ইসলামের বিস্তৃতির পথ সুগম করেছিল। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ পরে অর্জিত হয়েছিল যখন তার সমস্ত আইন কানুন ও নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু তার প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখেই জনগণ মদিনার প্রতি আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, এখান থেকে আমরা শুধু সত্যের আলো নয়, বরং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও পাবো।

রাষ্ট্রনায়কের সুদূর প্রসারী সম্পর্ক

কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাই থাক না কেন এবং সে যত উচ্চস্তরের আদর্শিক কাজই করুক না কেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপকতা তাকে সাফল্য লাভে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। সাধারণ কায়কারবার থেকে শুরু করে আদর্শবাদী বিপ্লব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন সামষ্টিক কাজে এমন লোক খুব কমই সাফল্য লাভ করতে পারে, যার সাধারণ মানবিক সম্পর্কের দৌড় খুবই সংকীর্ণ, যে ঘরকুনো ও অসামাজিক। বংশীয় ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও মৈত্রী, সুখদুঃখের সাহচর্য, পারস্পরিক সাক্ষাত ও সালাম কালাম ইত্যাদি মানুষের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা বাড়ায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবচেতনভাবে বহু বড় বড় আদর্শিক কাজের ধারা পাল্টে দেয় এবং এর কারণে বহু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গৃহীত হয়ে থাকে। এক কথায় বলা যায়, সাধারণভাবে মানুষের নেতৃত্বদানে সেই ব্যক্তিই সফল হয়ে থাকে, যার সম্পর্কের পরিধি ব্যাপক, নিজে এই সম্পর্ককে আরো ব্যাপক ও প্রশস্ত করে এবং প্রত্যেক সম্পর্কের দাবী পূরণ করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা রসূল সা. এর সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রতি নজর দেই তখন তার সব ধরনের সম্পর্কের পরিধি অত্যন্ত প্রশস্ত দেখতে পাই। সেই সাথে তার বন্ধুত্ব ও সাধারণ ব্যক্তিগত সম্পর্কও ক্রমবর্ধমান দেখতে পাই। এই সব সম্পর্ক থেকে কোন এক পর্যাযে তাকে বিদায় নিতে ইচ্ছুকও দেখা যায়না এবং কোন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক বক্তিত্বের মত সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় তার কোন অনীহা ও অবজ্ঞাও চোখে পড়েনা। বরং সকল সম্পর্ককে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বজায় রাখেন, তার অধিকার ও দাবী পূরণ করেন এবং তাকে স্থিতিশীল রাখেন। বহুদূরের আত্মীয়তার সম্পর্ককেও তিনি এত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, তিনি মুসলিম বাহিনীকে মিশর জয় করার সময় সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যাবহার করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, হযরত ইসমাঈল আ. এর মাতা হযরত হাজেরা একজন মিশরীয়। তাই তোমাদের ওপর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সুরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। রসূল সা. এর এই সুপ্রশস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ইসলামী আন্দোলনের বিকাশ ও ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

এই সম্পর্কগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। এতে বুঝা যাবে কিভাবে তা ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল এবং তা কিভাবে ইসলামী বিপ্লবকে সহজতর করেছিল। আমরা তাঁর সম্পর্ককে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করবো ঃ

১. বংশীয় সম্পর্ক

রসূল সা. এর বংশীয় ধারা নিম্নরূপ ঃ

মুহাম্মদ সা. (১) ইবনে আব্দুল্লাহ (২) ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (৩) ইবনে হাশিম (৪) ইবনে আব্দুল মানাফ (৫) ইবনে কুসাই (৬) ইবনে কিলাব (৭) ইবনে মুররা (৮) ইবনে কা'ব (৯) ইবনে লুই (১০) ইবনে গালেব (১১) ইবনে ফেহের (১২) ইবনে মালেক (১৩) ইবনে নাযর (১৪) ইবনে কিনানা (১৫) ইবনে খুযায়মা (১৬) ইবনে মুদরাকা (১৭) ইবনে ইলিয়াস (১৮) ইবনে মুযার (১৯) ইবনে নাযার (২০) ইবনে মুসাদ (২১) ইবনে আদনান (২২) ইবনে উদ্ (২৩) ইবনে মুকওয়াম (২৪) ইবনে নাখুর, ইবনে তায়যাহ,

ইবনে ইয়ারাব, ইবনে ইয়াশজাব, বিন নাবিত, বিন ইসমাইল, বিন ইবরাহীম।

রসূল সা. জানিয়েছেন যে, আদনানের পরে হযরত ইসমাইল আ. পর্যন্ত নামগুলো তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। ঐতিহাসিকগণ ঐ নামগুলো সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আদনানের সাথে রসূল সা. এর সম্পর্ক একুশতম বংশীয় স্তরে অবস্থিত। সময়ের ব্যবধান ১১৫৮ বছরের। আরব গোত্রগুলোর সাথে রসূল সা. এর সম্পর্ক কোন না কোন স্তরে গিয়ে মিলিত হয়।

আদনানের ছেলে উক্ (মুয়াদের ভাই) ইয়ামানের গাসসান নামক অঞ্চলে গিয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং আশয়ারী গোত্রে বিয়ে করে। এই অঞ্চলে ইসলাম খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে। ইয়ামানের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু প্রতিনিধি দল রসূল সা. এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে আশয়ারীদের দলও ছিল। নাযার (২০ নং পূর্ব পুরুষ) এর চার ছেলে ছিল। তন্মধ্যে আনমারের সন্তানরা নাজদ ও হেজাজে বসতি স্থাপন করে। আয়াদের সন্তানেরা ছুগুরে ও তার আশপাশে বসবাস করে। আর মুযার (১৯ নং) এবং রবীয়া আরবের মধ্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

এবার সেইসব খ্যাতনামা গোত্রের পরিচয় নেয়া যাক, যারা রসূল সা. এরই সমগোত্রীয় এবং এসব গোত্রের নাম সীরাত, ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ

বনু তামীম-তামীম বিন মারদ বিন উদ বিন তানজা বিন ইলিয়াস (১৮) এর বংশধর।
বনু গিতফান- গিতফান বিন সা'দ বিন ইলিয়াস (১৮) এর বংশধর।
বনু আশজা-আশজা বিন গিতফান বিন সা'দ বিন ইলিয়াস (১৮) এর বংশধর।
বনু যুবিয়ান- যুবিয়ান বিন বুয়াইয বিন রায়েশ বিন গিতফান- ইলিয়াস এর বংশধর।
বনু ফারাযা- ফারায বিন যুবিয়ান.................ইলিয়াস এর বংশধর।
বনু হাওয়াযেন- হাওয়াযেন বিন মানসূর বিন ইকরামা বিন হাসফান বিন কায়েস ঈলান বিন ইলিয়াস এর বংশধর।
বনু সা'দ- সা'দ বিন বকর বিন হাওয়াযেন........... ইলিয়াস এর বংশধর।
বনু সাকীফ- সাকীফ বিন হাওয়াযেন...... ইলিয়াস এর বংশধর।
বনু সালীম- সালীম বিন মানসূর....... ইলিয়াস এর বংশধর।
বনু হুযায়েল- হুযায়েল বিন মুদারিকা-(১৭ নং)।
বনু হাওন- হাউন বিন খুযাইমা (১৬ নং)।
ওয়াইশী- ওয়াইশ বিন কারাহ বিন হাউন বিন খুযাইমা।
আযালী- আযাল বিন কারা................... খুযাইমা পর্যন্ত।
বনু আসাদ- আসাদ বিন খুযাইমা................... খুযাইমা পর্যন্ত।
বনু নাযার- নাযার বিন কিনানা (১৫ নং)।
বনু কিনানা ঐ ।
বনু মুসতালিক – মুসতালিক (খুযাইমা) বিন আবদ মানাত বিন কিনানা (১৫ নং)।
আল আহাবীশ- আহাবীশ বিন কিনানা।
বনু মালেক – মালেক (১৩ নং) বিন নাযার বিন কিনানা।
কুরাইশ- ফেহের বা কুরাইশ (১২ নং) বিন মালেক।

বনু মুহারিব– মুহারিব বিন ফেহের।
বনু তাইম– তাইম বিন গালেব (১১ নং) বিন ফেহের।
বনু আওফ– আওফ বিন লুয়াই (১০ নং) বিন গালেব।
বনু আমের– আমের বিন লুয়াই।
বনু হারস– হারস বিন লুয়াই।
বনু হাসীস– হাসীস বিন কা'ব (৯ নং) বিন লুয়াই।
বনু সাহম– সাহম বিন কা'ব।
বনু জুমাহ– জুমাহ বিন কা'ব।
বনু আদ্দী– আদ্দী বিন কা'ব।
বনু কিলাব– কিলাব (৭নং) বিন মুররা (৮নং)।
বনু তাইম– তাইম বিন মুররা (নং ৮)।
বনু মাখযূম– মাখযূম বিন মুররা।
বনু কুসাই– কুসাই (৬নং) বিন কিলাব।
বনু যুহরা– যুহরা বিন কিলাব।
আসদী– আসাদ বিন আব্দুল উয্যা বিন কুসাই (৬নং)।
মুত্তালিবী– মুত্তালিব বিন আব্দ মান্নাফ (৫নং)।
বনু উমাইয়া– উমাইয়া বিন আব্দুশ্ শামস বিন আবদ মানাফ।
নাওফিলিউন– নাওফিল বিন আবদ মানাফ।
বনু হাশেম– হাশেম বিন আবদ মানাফ।

এই সুদীর্ঘ বংশীয় ধারাক্রম এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, রসূল সা. এর বহু উঁচুস্তরের ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন হযরত ওমর রা. এর বংশধারা যাররাহ বিন আদ্দী বিন কা'ব (৯ নং) এবং হযরত আবু উবাইদা বংশীয় সম্পর্কে জাররাহ বিন আদ্দীর সাথে যুক্ত। রসূল সা. এর মাতা হযরত আমেনা ওহব বিন আবদ মানাফ বিন যোহরা বিন কিলাব (৭নং) এর বংশধর। একই কিলাব বিন মুররার ভাই তাইমের বংশোদ্ভূত ব্যক্তি হযরত আবু বকর। আশারায়ে মুবাশ্শারা অর্থাৎ জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস মালেক বিন উহাইব বিন মানাফের মাধ্যমে রসূল সা. এর সাথে সম্পৃক্ত। কা'বা শরীফের চাবি রক্ষক উসমান বিন তালহা আব্দুদ্দার বিন কুসাই (৬নং) এর বংশোদ্ভূত। আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত আরেকজন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম বিন খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আবদুল উয্যা বিন কুসাই (৬নং) এর বংশধর। অনুরূপভাবে হযরত খাদীজা তাহেরা খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যা বিন কুসাই এর মেয়ে। ওয়ারাকা বিন নাওফেল বিন খুয়াইলিদ তাঁর ভাই। হারেস বিন মুত্তালিব বিন আবদ মানাফের (৫নং) তিন ছেলে আবু উবাইদা (বদরের শহীদ) তুফাইল ও হাসীন বিখ্যাত সাহাবী। ইমাম শাফেয়ীর বংশধারাও মুত্তালিবের সাথেই যুক্ত। হযরত ওসমান উমাইয়া বিন আবদুশ্ শামস বিন আবদ মানাফের বংশধর।

রসূল সা. এর চাচা ক'জন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। দু'জনের বিবরণ জানাই যায়না। এক চাচা দিরার আগেই মারা যান। তাঁর চাচাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ খুবই

উল্লেখযোগ্য। এরা ইসলামের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং এদের বিবরণও সংরক্ষিত রয়েছে।

এক চাচা হারেস ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেই মারা যান। তাঁর চার ছেলে নওফেল, আব্দুল্লাহ, রবীয়া ও আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই রবীয়া বিন হারেসের হত্যার প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী ছেড়ে দিয়েই রসূল সা. সর্বপ্রথম মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষণা করেন, জাহেলী যুগের সকল খুনের প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণের দাবীর আজ বিলোপ সাধন করা হলো।

এক চাচা ছিলেন আবু তালেব, যিনি রসূল সা. এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন। ইসলামী আন্দোলনের বাইরে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করেন। আজ এমন কাউকে পাওয়া যাবেনা, যার আবু তালেবের সুযোগ্য সন্তান হযরত আলী, জাফর ও আকীলের নাম জানা নেই। আবু তালেবের দুই মেয়ে উম্মে হানী এবং জুমানাও ইসলাম গ্রহণ করেন। মে'রাজের ঘটনা উপলক্ষে হযরত উম্মে হানী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

এক চাচা ছিলেন হযরত হামযা, যিনি ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর লাশের সাথে হিন্দা অত্যন্ত হিংস্র আচরণ করে। এই চাচাই রসূল সা. এর সাথে কৃত আবু জাহেলের অশোভ আচরণের প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন।

এক চাচা ছিলেন হযরত আব্বাস। তিনি শুরু থেকেই অভিভাবক সুলভ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত, আকাবার বায়য়াতের আলোচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আনসারদেরকে তাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেন। তাছাড়া মক্কায় থেকে গিয়ে তিনি রসূল সা. কে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন। যখন সংঘাত সংঘর্ষের স্পর্শকাতর সময়টা পার হয়ে গেল, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে মদিনায় যাত্রা করেন।

এক চাচা যুবায়ের ইসলামের আবির্ভাবের আগেই ইন্তিকাল করেন। অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিলেন এবং হিলফুল ফুযুলের প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

এক চাচা ছিল আবু লাহাব। এই চাচা ইসলামের শুধু কট্টর বিরোধীই ছিলনা, বরং বিরোধী শিবিরের সক্রিয় সেনাপতিও ছিল। তার স্ত্রীও ইসলামের ঘোর দুশমন ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে রসূল সা. কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সবার আগে থাকতো। আবু লাহাব অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি ভোগ করে। সে প্লেগে মারা যায়। তিন দিন পর্যন্ত তার লাশ পড়ে থেকে পঁচতে থাকে। কেউ ধারে কাছেও যায়নি। শেষ পর্যন্ত দেয়ালের ওপার থেকে পাথর নিক্ষেপ করে লাশ ঢেকে দেয়া হয় এবং ঐ পাথরের স্তূপকেই কবরে পরিণত করা হয়। আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় রশীর ফাঁস লেগে শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটে। আবু লাহাবের দুই ছেলে কাফের অবস্থায় মারা যায় এবং দুইজন হোনায়েন যুদ্ধের সময় রসূল সা. এর আনুগত্য অবলম্বন করে। তার কন্যা দিরা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

রসূল সা. এর ফুফুদের মধ্যে একজন ছিলেন কুযায়ের বিন রবীয়া (আবদে মানাফের বংশধর) এর স্ত্রী উম্মে হাকীম রায়দা। তার সন্তান আমের মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। আমেরের ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আমেরও সাহাবী হন এবং হযরত উসমানের খেলাফত আমলে খোরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। এই উম্মে হাকীমেরই মেয়ে আরওয়া ছিলেন হযরত উসমানের মাতা। অপর ফুফু ছিলেন উমাইমা। তার বিয়ে হয়েছিল জাহশ বিন রুবাবের সাথে। তার এক মেয়ে উম্মে হাবীবা আব্দুর রহমান বিন আওফের স্ত্রী ছিলেন। অপর মেয়ে হামনার প্রথম বিয়ে মুসয়াব ইবনে উমাইরের সাথে এবং দ্বিতীয় বিয়ে তালহা বিন আব্দুল্লাহর সাথে হয়। দ্বিতীয় বিয়ে থেকে জন্ম নেয়া দুই সন্তান মুহাম্মাদ ও ইমরান ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানী হন। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে নিজের মামা হযরত হামযার সাথে সমাহিত হন। তৃতীয় ফুফু ছিলেন আতেকা, যিনি বদর যুদ্ধের আগে একটা স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন নিয়েই কোরায়েশ মহলে এই বলে অনেক ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয় যে, "এখন বনু হাশেমের মেয়েরাও নবুয়ত দাবী করা শুরু করেছে।" চতুর্থ ফুফু ছিলেন হযরত সফিয়া। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় হারেস বিন হারব ইবনে উমাইয়ার সাথে এবং দ্বিতীয় বিয়ে হয় আওয়াম বিন খুয়াইলিদের সাথে। এই বিয়ে থেকেই জন্ম নেন আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য যুবায়ের। সায়েব ইবনুল আওয়ামও তাঁর গর্ভজাত সন্তান।সায়েব বহু জেহাদে অংশ নিয়েছেন। হযরত হামযার লাশ পড়ে থাকতে দেখে এবং তার সাথে অমানুষিক আচরণ দেখে তিনি ধৈর্যের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পঞ্চম ফুফু বাররা আব্দুল আসাদ বিন হিলালের স্ত্রী ছিলেন। আবু সালমা তাঁরই সন্তান ছিলেন। এই আবু সালমা উম্মুল মুমীনীন উম্মে সালমার প্রথম স্বামী ছিলেন। আর এক ফুফু আরওয়ার স্বামী ছিল উমাইর উহাইব। তার সন্তান তুলাইব যখন তাকে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানান তখন তিনি প্রচন্ড আবেগের বশে বলেন ঃ 'তোমার জন্য তোমার মামার ছেলে সর্বাধিক সেবা ও সাহায্যের হকদার। আল্লাহর কসম, আমরা নারীরা যদি পুরুষদের মত ক্ষমতাশালী হতাম, তা হলে আমরা তাকে রক্ষা করতাম এবং তার শত্রুদেরকে সমুচিত জবাব দিতাম।"

এ কথাগুলোর পেছনে ঈমানী জযবাও সক্রিয় ছিল, একজন ফুফুর অকৃত্রিম স্নেহও ছিল। রসূল সা.-এর বংশজাগত সম্পর্কের আরো কিছু দিক রয়েছে। তবে এখানে আমরা শুধু তাঁর যে সব আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামী আন্দোলনের সাথে কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কিত ছিল সেগুলোই তুলে ধরেছি। এ কথা সত্য যে, সংঘাত সংঘর্ষ মৌলিক ও আদর্শিক হওয়ার কারণে বড়ই কঠিন ও জটিল ছিল। কোরায়েশরা এ ক্ষেত্রে খুবই দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত বিরোধী শিবির খুলে রেখেছিল। কিন্তু আত্মীয়তার এই সম্পর্কগুলো ভেতরে ভেতরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বনু হাশেম সার্বিকভাবে অন্যদের তুলনায় অধিকতর সহনুভূতিপূর্ণ আচরণ করে। আত্মীয়তার কারণেই আবু জাহলের জুলুম দেখে হযরত হামযার মাথায় খুন চড়ে যায় এবং তিনি জাহেলিয়ত ছেড়ে রসূল সা. এর সঙ্গী হয়ে যান। অবরোধের সময় আবু জাহল শিয়াবে আবু তালেবের দিকে খাদ্য যেতে বাধা দিলে আবুল বুখতারী তাতে আপত্তি জানায়। হযরত আব্বাস নীরবে মক্কায় থেকে সহযোগিতা করেন। কোরায়েশদের বৈঠকাদিতেও মাঝে মাঝে আত্মীয়তার কারণে কেউ কেউ রসূল

সা. এর পক্ষপাতিত্ব দেখাতে থাকে। কেউ কেউ রসূল সা. মক্কার বাইরে গিয়ে আরবদের মধ্যে কাজ করে সফল হয়তো হোকগে এই মর্মে মত দেয়। সে ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য কোরায়েশদেরই সাফল্য হবে বলেও মন্তব্য করা হয়। তারপর বহু বছরের জেদাজেদীর পর মক্কা বিজিত হলে লোকেরা রসূল সা. কে "একজন মহানুভব ভাই এবং মহানুভব ভাই এর ছেলে" বলে আখ্যায়িত করে। এই আত্মীয়তা অন্য দিক দিয়েও প্রভাব বিস্তার করে। রসূল সা. এর আপনজনেরা যুদ্ধবন্দী হয়ে এসে রাতের বেলা বন্ধনগুলোর ব্যথায় আহ্ উহ্ করতে থাকলে তাঁর ঘুম হারাম হয়ে যায়। মক্কায় দুর্ভিক্ষ হলে তাঁর মন গলে যায় এবং খাদ্য শস্য ও নগদ সাহায্য পাঠান। মক্কা জয় করার পর তাঁর অধিবাসীদেরকে মুক্ত হস্তে দান করেন।

২. মদিনায় মাতুল সম্পর্ক

রসূল সা. এর পিতা জনাব আব্দুল্লাহর মা ফাতেমা বিনতে ওমর মদিনার খ্যাতনামা গোত্র বনু নাজ্জারের বংশোদ্ভূত ছিলেন। তারও আগে তাঁর পরদাদা হাশেমও খাজরাজ গোত্রের এক মহিলা হিন্দ বিনতে আমর বিন সা'লাবাকে বিয়ে করেছিলেন। এ কারণে রসূল সা. এর পিতা আব্দুল্লাহ মদিনায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ঘটনাক্রমে এক বাণিজ্যিক সফরে মদিনাতেই তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন। রসূল সা. এর মাতা আমেনা আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করা ও স্বামীর কবর দেখার উদ্দেশ্যে তাঁকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সাথে নিয়ে মদিনায় যান। সেখানে তিনি একমাস অবস্থান করেন। দারুন নাবেগাতে থাকতেন। হিজরত করে যখন মদিনায় যান, তখন ৪৭ বছর আগের সেই স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে যায়। বৈঠকাদিতে কখনো কখনো বলতেন, মামা বাড়ীতে আনিসা নামে একটা মেয়ে তার খেলার সাথী ছিল। দুর্গের একটা পাখি বসতো আর ছেলে মেয়েরা তাকে উড়িয়ে দিত। ঐ ঘরে আমার মা অমুক জায়গায় বসতো এবং পিতার কবর অমুক জায়গায় ছিল। রসূল সা. একথাও জানিয়েছিলেন যে, বনু নাজ্জারের একটা পুকুরে তিনি ভালো সাঁতার কাটা শিখেছিলেন। ঐ সফরেই মক্কায় ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে তাঁর মায়ের ইন্তিকাল হয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পরবর্তীকালে যখন মদিনার সাথে ইসলামী আন্দোলনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, তখন এই সম্পর্ক নিশ্চয়ই তাতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মদিনার লোকেরা, বিশেষত বনু নাজ্জারের লোকেরা তাঁকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মনে করতো এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বনু নাজ্জার অধিকতর উৎসাহী ছিল। ঐ গোত্রের ছোট ছোট মেয়েরা গান গেয়ে তাঁকে স্বাগতম জানাচ্ছিল।

৩. দুধ খাওয়ার সম্পর্ক

জন্ম হবার পর রসূলল সা. দিন কয়েক তিনি আবু লাহাবের দাসী সাওবিয়ার দুধ পান করেন। স্থায়ী দুধমাতা হবার সৌভাগ্য লাভ করেন বনু হাওয়াযেনের হালীমা সা'দিয়া। হালীমার বড় মেয়ে হাযযাফা (ডাক নাম আশ্শাম্মা) শিশুকালে রসূল সা. এর সেবা করেছিলেন। হোনায়েন যুদ্ধে হাযযাফা যখন বন্দীনী হয়ে এল, সামরিক প্রহরীদেরকে বললো, "আমি তো তোমাদের নেতার বোন। রসূল সা. এর কাছে তাকে আনা হলে তিনি

আনন্দের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানান। তার সামনে তিনি চাদর বিছিয়ে দেন। তিনি আবেগে অভীভূত হয়ে পড়েন এবং বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার এখানেও থেকে যেতে পার, আর ইচ্ছা করলে তোমাকে তোমার গোত্রে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। সে গোত্রে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে রসূল সা. তাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিদায় জানান। সে ইসলামও গ্রহণ করেছিল।

এই দুধমায়ের সম্পর্কের দোহাই দিয়েই বনু হাওয়াযেন গোত্র হোনায়েন যুদ্ধের পর নিজেদের বন্দী মুক্তির আবেদন জানায়। তিনি বনু হাশেমের সমস্ত বন্দীকে তৎক্ষণাত মুক্ত করে দেন এবং তাঁর দেখাদেখি সাহাবীরাও নিজ নিজ বন্দীদের ছেড়ে দেন।

৪. নিজের মেয়েদের বিয়ে

যয়নবের বিয়ে মক্কাতেই আবুল আসের সাথে সম্পন্ন হয়। আবুল আসের মা হযরত খাদীজার সৎ বোন ছিলেন। অর্থাৎ রসূল সা. তার খালু ছিলেন। যয়নব ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তার পরে তার স্বামী আবুল আসও ইসলাম গ্রহণ করে ও মদিনায় আসে। তাদের সাবেক সম্পর্ক বহাল থাকে। স্বামী স্ত্রীতে গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। এমনকি মক্কাবাসী তালাক দিতে চাপ দেয়া সত্ত্বেও আবুল আস যয়নবকে তালাক দেয়নি। এই কারণে আবুল আসকে কাফের থাকা কালে মুসলমানদের অনুমতি নিয়ে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয় এবং তার থেকে দখলীকৃত বাণিজ্যিক পণ্য ফেরত দেয়া হয়।

রুকাইয়ার বিয়েও মক্কায় হযরত ওসমানের সাথে সম্পন্ন হয়। এই দম্পতিই সর্বপ্রথম একত্রে হিজরত করেন। দ্বিতীয় হিজরীতে রুকাইয়া মারা গেলে ৩য় হিজরীতে রসূল সা. আল্লাহর নিদের্শে উম্মে কুলসুমকেও হযরত ওসমানের সাথে বিয়ে দেন। পর পর দুই মেয়ে বিয়ে করার কারণে তাকে 'যিন্নুরাইন' বলা হয়। হযরত ফাতিমাকে রসূল সা. হযরত আলীর সাথে বিয়ে দেন। আবুল আ'স ব্যতীত ইসলামী আন্দোলনের এই দু'জন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং রসূল সা. এর ঘনিষ্ঠ সাথী বংশীয় সম্পর্ক ছাড়াও বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে রসূল সা. এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। এই আত্মীয়তা ইসলামী আন্দোলনের বিরাট কাজ পরিচালনায় সহায়ক হয়েছিল।

৫. রসূল সা. এর বৈবাহিক সম্পর্ক

যেহেতু রসূল সা. এর বৈবাহিক সম্পর্ক বিষয়ে উগ্র ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য দার্শনিকরা অনেক আপত্তি তুলেছেন, তাই আমাদের ভেতরকার একটা মহল এই বাস্তব ব্যাপারটাকে নিয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে যান। তারা ভাবেন, রসূল সা. এতগুলো বিয়ে করলেন, আর ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিল, এ লজ্জা রাখি কোথায়? এ জন্য সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই।

সর্ব প্রথম যে কথাটা মনে বদ্ধমূল করা প্রয়োজন তা হলো, মানবেতিহাসের প্রথম যুগটা ছিল বংশবৃদ্ধির যুগ। সেই যুগটাকে আমরা রসূল সা. এর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাই। বিস্তীর্ণ ভূখন্ড তখন জনশূন্য ও অনাবাদী পড়ে থাকতো। জীবিকার উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও খোলা পড়ে থাকতো। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মানবজাতির মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেরণা অত্যন্ত জোরদার ছিল। এ জন্য সে যুগের যে কোন সভ্যতা বা

ধর্মের দিকে তাকানো হোক না কেন, বহু বিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শরীয়তের বিধানগুলিও এর অনুমতি দিয়েছে। বহু নবী একাধিক বিয়ে করেছেন। মাত্র দু' একজন দেখা যায়, গৃহ সংসার পরিত্যাগ করে সার্বক্ষণিক দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ নবীই সাংসারিক জীবন যাপন করেছেন এবং সর্বাত্মকভাবে করেছেন। রসূল সা. বংশবৃদ্ধি ও বহু বিবাহের এই যুগেরই শেষভাগে অবস্থান করেন। তাঁরই সময় থেকে সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে বহু বিবাহের সংখ্যা সীমিত করার নির্দেশ আসে।[১] রসূল সা. যে সব বিয়ে করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতির ভিত্তিতেই করেছেন।

দ্বিতীয়ত রসূল সা. এর অধিকাংশ বিয়ে যৌন আকাংখা নিবৃত করার উদ্দেশ্যে নয় বরং ইসলামী আন্দোলন, দেশ ও জাতির কল্যাণের খাতিরেই করেছেন। এ সব বিয়ে প্রধানত রাজনৈতিক ছিল। রসূল সা. স্বয়ং বলেছেন, "আমার কোন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নেই। (দারামী) অর্থাৎ নিছক যৌন তাড়না আমাকে কোন স্ত্রী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেনা। প্রকৃত পক্ষে রসূল সা. সঠিক অর্থে দুটো বিয়েই করেছেন ঃ একটা হযরত খাদীজার সাথে এবং দ্বিতীয়টা হযরত আয়েশার সাথে। অন্যান্য বিয়ের পেছনে কিছু অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক দাবী কার্যকর ছিল। এইসব দাবী পূরণের খাতিরে রসূল সা. নিজের ব্যস্ততম জীবন ও অত্যন্ত দরিদ্র অর্থনীতির ওপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে মানবতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

এখানে লক্ষণীয়, যে যুবক ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অতুলনীয় সংযম, শালীনতা ও লজ্জাশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, আর তাও একটি সমাজে-যেখানে মদ ও ব্যভিচার সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছিল, যে যুবক ২৫ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর সাধারণ ভোগবাদী অভিরুচি অনুসারে কোন উঠতি যৌবনা তরুণীর পরিবর্তে ৪০ বছরের

---

[১] এই সীমাবদ্ধ করণের নির্দেশে একাধিক বিয়ের শেষ সীমা চার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই সাথে ন্যায়বিচারের কড়া শর্ত আরোপ করে এক বিবাহের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু একাধিক বিয়েকে হারাম করা হয়নি। সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ রাখার প্রয়োজন কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে রয়েছে এবং থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, সর্বপ্রথম কারণ এই যে, ইসলাম যৌনতার স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারকে সর্বতোভাবে বন্ধ করতে চায় এবং এজন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। এরূপ ব্যবস্থায় সেই সব লোকের জন্য একাধিক বিয়ের সুযোগ রাখা জরুরী ছিল, যারা অধিকতর যৌন ক্ষমতার অধিকারী। এই বাস্তব প্রয়োজনকে পাশ্চাচাত্য দেশে উপেক্ষা করার ফল হয়েছে এই যে, এক স্ত্রীর সাথে বহু উপপত্নী রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরন্তু বেশ্যাবৃত্তির ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছে এবং তা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়াই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এমনকি "অবাধ প্রেম প্রণয়" নামে সম্মত ব্যভিচারের এমন তান্ডব চলছে যে, তার তুলনায় বিচার করলে ইসলামের বহু বিবাহ ব্যবস্থা অবশি বহুগুণ শ্রেয় মনে হবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ক্ষেত্র বিশেষে সন্তানের আকাংখা একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে। তৃতীয় কারণ এক স্ত্রীর স্বামী রোগব্যাধি হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে রুগ্ন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিপদে নিক্ষেপ না করে স্বামী তার স্বাভাবিক চাহিদা চরিতার্থ করতে পারে। চতুর্থ কারণ এই যে, অনেক সময় গোত্রীয় ও পারিবারিক রাজনীতি, শক্তিবৃদ্ধি, প্রতিশোধের ধারাবাহিকতা, উত্তরাধিকারের ঝামেলা এবং এতিম ও বিধবাদের পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান বিয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, প্রাচীন বা আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা অর্জনের একমাত্র পন্থা হিসেবে একাধিক বিয়ে অনেক সময় ফলপ্রসূ হয়েছে।

এক বিধবাকে নির্বাচন করে শুধু এ জন্য যে, এটা তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর সহায়ক এবং তারপর জীবনের শ্রেষ্ঠ ২৫টি বছর সেই একই মহিলার সাথে কাটিয়ে ৫০ বছর পূর্ণ করে, তাঁর সম্পর্কে কি এমন হীন ধারণা পোষণ করা যায়, যা আপত্তি উত্থাপনকারীরা পোষণ করে থাকে? আরো লক্ষণীয় যে, বিয়ের আধিক্যের সময়টা তাঁর জীবনে ৫৫ থেকে ৫৯ বছরের মাঝে অবস্থিত এবং আরবের মত গরম দেশে এই বয়সে যৌন আবেগ থিতিয়ে যেতে আরম্ভ করে। ওদিকে স্ত্রীদের বয়স দেখুন, দু'জন ছাড়া সবার বয়স বিয়ের সময় ২০ বছরের ওপরে ছিল। আর পাঁচজনের বয়স তো ৩৬ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ছিল। প্রশ্ন এই যে, রসূল সা. এর জন্য যুবতী ও সুন্দরী মেয়ের কি অভাব ছিল?

এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীদের ভাবা উচিত ছিল যে, তিনি নিজের ঘাড়ের ওপর কত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছিলেন। তার না ছিল দিনের বেলায় এক মুহূর্তের স্বস্তি, আর না ছিল রাতে এক মুহূর্তের বিশ্রাম। তিনি মানুষকে পর্দার ন্যায় মহান ও কল্যাণময় বিধান দান করেছিলেন (এই বিধান নিয়েও ইউরোপীয়রা নাক সিটকায়) এবং মানুষকে নিজের দৃষ্টি ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর বেশীর ভাগ সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাবলী নিয়ে ভাবতে ভাবতে কেটে যেত এবং রাতেও নিভৃত সময়গুলোতে নামায পড়তে পড়তে তাঁর পা ফুলে যেত। এহেন ব্যক্তি সম্পর্কে কিভাবে ঐ সব আজে বাজে কথা ভাবা যায়?

তাছাড়া ভোগবাদী রাজা বাদশাহ ও বিজেতাদের কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তাঁর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়না। তিনি যুলুমবাজ এবং স্বৈরাচারীও নন। মদ, গানবাজনা ও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছেদেও তার কোন আগ্রহ নেই। বরঞ্চ তিনি মানব সমাজকে এই সব ভোগবাদী আমোদ প্রমোদ থেকে পবিত্র করেছেন। তিনি না স্ত্রীদেরকে আরাম আয়েশের উপকরণ সরবরাহ করে দিয়েছেন, না তাদেরকে রেশম ও স্বর্ণের অলংকার দিয়ে সজ্জিত করেছেন। বরঞ্চ নিজের দরবেশ সুলভ জীবনের যাবতীয় বৈশিষ্ট তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছেন। তাদেরকে তিনি এতটা আদর সোহাগ কখনো করেননি, যাতে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন আন্দোলনের স্বার্থের চেয়েও অগ্রাধিকার লাভ করে, কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নীতিও পরিত্যাগ করার প্রয়োজন পড়ে। বরঞ্চ এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে তিনি কঠোরভাবে শাসিয়েছেন। এক পর্যায়ে তো ভরণপোষণের মান উন্নত করার দাবী তোলায় তাদেরকে তিনি খোলাখুলিভাবে বলে দেন যে, এই দরিদ্রাবস্থায় আমার সাথে থাকতে পারলে থাকো, নচেত আমি বিদায় করে দিতে প্রস্তুত। এই সব পরিস্থিতি একত্রে মিলিত হয়ে কি এই নিরর্থক আপত্তিকে খন্ডন করেনা?

রসূল সা. এর একাধিক বিয়ের পেছনে যে বিশেষ প্রয়োজনগুলো কার্যকর ছিল তা নিম্নরূপঃ

গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এইযে, এতে বংশীয় আভিজাত্যের বৃত্ত খুবই সীমাবদ্ধ এবং এর সীমারেখাগুলো খুবই মজবুত রাখা হয়। গোত্রীয় মানস আপন ও পরের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভেদাভেদ করে। এহেন পরিস্থিতিতে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত গোত্র পরস্পরের সাথে যুক্ত করার জন্য যেখানে বিশ্বজোড়া মতবাদের প্রয়োজন, সেখানে নেতার ব্যক্তিত্বও এমন হওয়া চাই, যা সবার কাছে না হলেও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের কাছে প্রিয় ও

আপন। আরবে কার্যত সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক কাজ করা এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিলনা, যার নিজস্ব কোন মর্যাদাবান গোত্র নেই। তবে ঐ কাজকে সাফল্যের পর্যায়ে নেয়ার জন্য আন্ত গোত্রীয় সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল এবং এই রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্র বিশেষে বৈবাহিক সম্পর্ক সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল।

উদাহরণ স্বরূপ, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার কথাই ধরুন। ইনি বনুল মুসতালিক গোত্রের মহিলা ছিলেন। গোটা গোত্র ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ডাকাতি ও লুটতরাজের জন্য কুখ্যাত। স্বয়ং হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা ছিল ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাত সর্দার। এই গোত্র প্রথম দিন থেকেই ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে কট্টর শত্রুতা শুরু করে। তারা কোন শৃংখলাও মানতে প্রস্তুত ছিলনা, কোন আপোষ চুক্তিতেও সম্মত ছিলনা। তবে প্রত্যেক ব্যাপারে ইসলামী সরকারের কট্টর বিরোধিতা করতে সব সময় প্রস্তুত থাকতো। অবশেষে এই শক্তিকে সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা দমন করা হয়। হযরত জুয়াইরিয়া বন্দিনী হয়ে আসেন। অতপর রসূল সা. এর সাথে যখন তার বিয়ে হলো, তখন ঐ গোত্রের সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেয়া হলো। মুসিলম সৈন্যরা মনে করলো, ওরা এখন রসূল সা. এর শ্বশুরালয়ের আত্মীয়, ওদেরকে বন্দী করে রাখা যায়না। এই বিয়ের বরকত দেখুন, গোত্রের প্রতিটি লোক ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে শান্তিপ্রিয় ও আইনশৃংখলার অনুগত হয়ে গেল। কেননা মদিনার শাসক এখন তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এমতাবস্থায় এ সব কাজ আর করা যায়না।

অনুরূপভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার ব্যাপারটা ধরুন। নাজদ অঞ্চলটা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা কোরায়েশদের জন্য ইরাক যাতায়াতের একটা বাণিজ্যিক পথ নাজদ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। অথচ সেখানে ইসলামের দাওয়াত একেবারেই অকার্যকর প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছিল। এখানকার লোকেরা ৭০ সদস্য বিশিষ্ট একটা দাওয়াতী দলকে শহীদ করে দিয়েছিল। তাছাড়া নাজদবাসী একাধিকবার ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করেছিল। হযরত মায়মুনা নাজদের সরদারের স্ত্রীর বোন ছিলেন। রসূল সা. এর সাথে তার বিয়ে হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ পাল্টে গেল এবং নাজদ মদিনার প্রভাবাধীন হতে লাগলো। তাছাড়া তাঁর একাধিক বোনের বিয়ে হয় অত্যন্ত মান্যগণ্য সরদারদের সাথে।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবার ব্যাপারটাও তদ্রুপ। ইনি কোরায়েশের প্রধান সরদার আবু সুফিয়ানের মেয়ে ছিলেন। এই বিয়ের পর আবু সুফিয়ান আর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে ময়দানে আসেননি। এই বিয়ে আবু সুফিয়ানের শত্রুতার তেজই শুধু কমায়নি, বরং তা অনেকাংশে মক্কা বিজয়ের পথও সুগম করেছে।

অনুরূপভাবে হযরত সফিয়ার কথা বিবেচনা করুন। ইনি একজন শীর্ষস্থানীয় ইহুদী সরদার হুয়াই বিন আখতাবের মেয়ে। তার সাথে রসূল সা. এর বিয়ে হওয়ার পর ইহুদীদের বিরোধিতার তেজ এমনভাবে থিতিয়ে যায় যে, তা আর মাথা চাড়া দেয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে পারেনি। হযরত সফিয়া রসূল সা. এর অনুমতিক্রমে ইহুদী আত্মীয়দেরকে আর্থিক সাহায্যও করতেন।

হযরত হাফসার বিয়ের পটভূমিকায় অন্যান্য কার্যকারণ ছাড়া এটাও ছিল অন্যতম যে ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য রসূল সা. যে ক'জন বিশিষ্ট সহচরকে নিজের ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন, তন্মধ্যে চারজন ছিলেন প্রধান। এদের মধ্যে আবু বকরের মেয়ে হযরত আয়েশাকে রসূল সা. বিয়ে করেন, হযরত আলীর সাথে নিজের মেয়ে ফাতেমার বিয়ে দেন, হযরত উসমানের সাথে পর পর দুই মেয়ে বিয়ে দেন এবং হযরত ওমরের মেয়ে হাফসাকে নিজে বিয়ে করেন। হযরত ওমরকে এই আত্মীয়তার বৃত্তের বাইরে রাখা যেতনা। এভাবে ভবিষ্যতের নেতাদেরকে তিনি আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন।

হযরত সওদা বিনতে যামায়া ছিলেন মদিনার বনু নাজ্জারের মেয়ে। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় সাকরান বিন আমরের সাথে। এই সাকরানের ভাই ছিলেন হোদায়বিয়ার সন্ধিতে কোরায়েশদের প্রতিনিধি সোহায়েল বিন আমর। সাকরান মারা গেলে রসূল সা. সোহায়েলের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার খাতিরে তার বিধবা ভ্রাতৃবধু ৫০ বছর বয়স্কা সওদাকে বিয়ে করেন। হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর এই বিয়ে করে রসূল সা. নিজের একাকীত্বও ঘুচান।

রসূল সা. বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আরো একটা অনিবার্য প্রয়োজন পূরণ করার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। সেটি হলো পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের মধ্যেও মহিলাদের দ্বারাই দাওয়াতী কাজের প্রচলন এবং এজন্য কিছু মহিলা নেতা ও কর্মীর সৃষ্টি। ইসলামী পর্দা ব্যবস্থাকে বহাল রেখে এ প্রয়োজন পূরণ করতে হলে তাঁর জন্যে একাধিক বিয়ে করা জরুরী ছিল এবং নিজের স্ত্রীদেরকে ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা মহিলাদের মধ্যে বিস্তারের কাজে নিয়োগ করা অপরিহার্য ছিল। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই কোরআনে রসূল সা. এর স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, ও হযরত উম্মে সালমা মহিলাদের মধ্যে দাওয়াত ও দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন করেন। অন্যান্য স্ত্রীগণ নৈতিক দিক দিয়ে নিজেদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নারী সমাজের কাছে তুলে ধরেন।

কখনো কখনো রসূল সা. কে দ্বিতীয় পক্ষের মন রক্ষার জন্যও বিয়ে করতে হয়েছে। যেমন নিজের ফুফাতো বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহশকে তিনি অনেক অনুরোধ করে যায়েদ বিন হারেসার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ দ্বারা বংশীয় আভিজাত্যের সংকীর্ণ সীমারেখাগুলো ভাঙাই কাম্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এই বিয়ে ব্যর্থ হয় এবং তালাক সংঘটিত হয়। এর ফলে হযরত যয়নবের মর্মাহত হওয়ার ব্যাপারটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা এবং তাতে রসূল সা. নিজেকে কিছুটা দায়ী বলে অনুভব করেন। এই সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান ছিল যয়নবকে রসূল সা. এর বিয়ে করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা বাধা ছিল একটা ভ্রান্ত জাহেলী কুসংস্কার। তখনকার সমাজে পালিত পুত্রকে আপন পুত্রের মতই দেখা হতো। যায়েদ বিন হারেসাকে রসূল সা. নিজ পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা অবৈধ ও রীতিবিরোধী মনে করা হতো। আল্লাহ এই রীতির বিলোপ সাধন করে যয়নবকে রসূল সা. এর সাথে বিয়ে দেন।

একটু আগে আমি উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে বিয়ে করার রাজনৈতিক স্বার্থকতা বর্ণনা করেছি। কিন্তু ঐ বিয়ের পেছনেও ভগ্নমনকে প্রবোধ দেয়ার একটা ইচ্ছা সক্রিয়

ছিল। তার বিয়ে হয়েছিল ওবায়দুল্লাহর সাথে এবং তারই সাথে তিনি হিজরত করে আবিসিনিয়া চলে যান। সেখানে স্বামী খৃষ্টান হয়ে যায় এবং মদে অভ্যস্ত হয়ে মারা যায়। উম্মে হাবীবা ইসলামের ওপর অবিচল থেকেছেন। কিন্তু প্রবাসকালে স্বামীর ইসলাম ত্যাগ ও মৃত্যু তার জন্য মর্মঘাতী ব্যাপার ছিল। তাই রসূল সা. আমর বিন উমাইয়া আয্‌-যামরীকে বিশেষ দূত হিসাবে নাজ্জাশীর কাছে পাঠান এবং তার মাধ্যমে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। উম্মে হাবীবা এত খুশী হন যে, সুসংবাদদাতা শাহী দাসীকে নিজের অলংকার দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেই বিয়ে পড়ান। উম্মে হাবীবা নিজের মামাতো ভাই খালেদ বিন সাঈদকে নিজের উকীল নিয়োগ করেন। নাজ্জাশী নিজে চারশো দিনার মোহরানা দিয়ে দেন এবং ভোজের আয়োজন করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মদিনায় পুনরায় বিয়ে পড়ানো হয় এবং ওলিমা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুরূপভাবে উম্মুল মাসাকীন যয়নব বিনতে খুযায়মা ইবনুল হারেস হেলালিয়া (বনু বকর) রসূল সা. এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাওয়ার পর রসূল সা. তাকে বিয়ে করেন। এটা ছিল পুরোপুরি পারিবারিক ঘটনা এবং ভগ্নমনকে প্রবোধ দেয়ার পাশাপাশি এখানে পারিবারিক দিকটাও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

রসূল সা. সর্বমোট এগারোটা বিয়ে করেছেন। এর চেয়ে বেশী বিয়ের কথা যে সব বর্ণনায় রয়েছে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। এঁদের মধ্যে হযরত খাদীজা হিজরতের পূর্বে (নবুয়তের দশম বছর) এবং যয়নব বিনতে খুযায়মা বিয়ের মাত্র তিন মাস পর ৩য় হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। রসূল সা. এর শেষ বয়সে এক সাথে ৯ জন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন। এদের মধ্যে একজন হযরত সওদা চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে দৈহিক কামনা বাসনার উর্ধে ছিলেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসার কারণে রসূল সা. আর কোন বিয়ে করেননি। সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় আইনে তিনি একটা বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল, চারটের বেশী কোন স্ত্রী থাকলে তাকে তালাক দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু রসূল সা. কে অতিরিক্ত স্ত্রীদেরকে কাছে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমের কারণ ছিল এই যে, রসূল সা. এর স্ত্রীগণকে দ্বীনী প্রয়োজনের আলোকে উম্মুল মুমিনীন আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ স্ত্রীগণের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। তখন তাদের কাউকে যদি রাসূল সা. তালাক দিতেন, তবে তারা একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে যেত।

এবার রসূল সা. এর বিয়েগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব লক্ষ্য করুন। এ সব বিয়ের কল্যাণে রসূল সা. একদিকে মক্কায় গোত্রসমূহ ও মোহাজেরদের সাথে এবং অন্যদিকে সাধারণ গোত্রগুলোর সাথে যে সখ্যতা গড়ে ওঠে, তার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য আমি সংশ্লিষ্ট গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করছি ঃ

(১) বনু আসাদ বিন আবদুল উয্‌যা (২) বনু আমের (৩) বনু তামীম (৪) বনু আদী (৫) বনু মাখযুম (৬) বনু উমাইয়া (৭) বনু আসাদ বিন খুযায়মা (৮) বনু মুসতালিক (৯) আরব ইহুদী সম্প্রদায় (১০) বনু কিলাব (১১) বনু কান্দা।

এই সব গোত্রের এলাকাগুলোকে যদি ভৌগোলিক বিভক্তির আলোকে দেখা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, রসূল সা. এর ব্যক্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে আন্তগোত্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় গোত্রের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের রূপ ধারণ করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য যে সর্বব্যাপী ঐক্যের চাহিদা জন্মেছিল, তা পূরণ করার যোগ্য হয়েছিলেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কগুলো বিদ্রোহাত্মক প্রবণতাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছিল। এমনকি যুগ যুগ কাল থেকে চলে আসা বহু শত্রুতাও এর দ্বারা খতম হয়ে গিয়েছিল। এখন ভেবে দেখা উচিত যে, সমগ্র বিশ্বমানবতার কাম্য যে সুবিচার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব, তা অর্জনের জন্য যদি আরবের গোত্রীয় পরিবেশে বহুবিবাহ সহায়ক হয়, তবে তা কেন করা হবেনা? আর তা নিয়ে এত হৈ চৈ এরই বা কারণ কী?

প্রকৃতপক্ষে সুক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, এটা ছিল রসূল সা. এর বিরাট ত্যাগ ও কুরবানী যে, তিনি মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে নিজের অসংখ্য ব্যস্ততার পাশাপাশি শেষ বয়সে নিজের ঘাড়ে এত বেশী দাম্পত্য বোঝা চাপিয়ে নিয়েছিলেন এবং নিজের দরিদ্র দশায় এত কষ্টে পরিবারের ভরণ পোষণের দাবি পুরণ করেছেন। এটা কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারেনা যে, উল্লিখিত সার্বিক পরিস্থিতিতে বিয়ে করার পর কোন মানুষের পক্ষে আমোদ ফূর্তিতে কাটানো দূরে থাক, একটা মুহূর্ত শ্রান্তির জীবন যাপন করাও সম্ভব হতে পারে। এ জন্যই বলেছি, রসূল সা. নিজের মহত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের খাতিরে এতগুলো বিয়ে করে আসলে মস্ত বড় ত্যাগ ও কুরবানীরই পরিচয় দিয়েছেন।

বলতে গেলে এর দ্বারা রসূল সা. এর যে সর্বব্যাপী ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে , তা ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য ও বিজয়ের পথ সুগম ও তাকে ত্বরান্বিত করেছে এবং জনগণের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়াকে সহজতর করে দিয়েছে।

জনতার স্বতস্ফূর্ত অগ্রযাত্রা

যে কোন বিপ্লবী আদর্শবাদী আন্দোলনের ন্যায় রসূল সা. পরিচালিত আন্দোলনকে দু'টো বড় পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে ইসলামী আন্দেলন নিজে জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদেরকে ডাকতো। আর দ্বিতীয় পর্বে জনতা স্বউদ্যোগে ও স্বতস্ফূর্তভাবে সামনে এগিয়ে এসেছে এবং ইসলামের দরজায় করাঘাত করে বলেছে, আমরা ভেতরে আসতে চাই। এই শেষোক্ত পর্বটা সম্প্রসারণের পর্ব। এই পর্ব যখন আসে তখন সমস্ত প্রতিরোধের অবসান ঘটে এবং সমস্ত নেতিবাচক মনোভাব ময়দান ছেড়ে পালায়। কিন্তু এই পর্বে পৌঁছা পর্যন্ত রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। একদিকে তাত্বিক দাওয়াতের ময়দানে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যুক্তি প্রমাণের শক্তি আমাদেরই পক্ষে। অপর দিকে নৈতিকতার ময়দানে অকাট্যভাবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ইসলামের তৈরী মানবতা ও মনুষ্যত্বের মডেলই শ্রেষ্ঠতম মডেল। তৃতীয় দিকে রাজনৈতিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কুশলতার দিক দিয়েও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কিভাবে সমকালীন সমাজের সাথে লেনদেন করতে হয় তা আমরা জানি। চতুর্থ দিকে যুদ্ধের ময়দানেও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিরোধের প্রাচীর কিভাবে ভাংতে

হয় এবং যুলুমবাজদের কিভাবে উৎখাত করতে হয় তা, আমাদের জানা আছে। রসূল সা. ও তাঁর সাথীরা মানুষের মনে প্রচন্ড জোরে ধাক্কা দিয়েছেন, ঝাকি দিয়েছেন ও দোলা দিয়েছেন, মানুষের ভাবাবেগকে পক্ষে টেনেছেন, ভাগ্যবান আত্মাগুলোকে স্বমতে দীক্ষিত করে বুকে টেনে নিয়েছেন, শান্তিপ্রিয় গোত্রগুলোকে সন্ধি ও শান্তি চুক্তির আওতাভুক্ত করেছেন এবং যে শত্রুরা যুদ্ধ চায় তাদের দাপট চূর্ণ করে পথ পরিষ্কার করেছেন। এত সব কিছু করার পরই সেই সময়টার সমাগম ঘটেছিল যখন জনগণ চারদিক থেকে নতুন আশার কেন্দ্রবিন্দু মদিনার দিকে ছুটে এসেছে।

এ পর্বটা বা যুগটার সূচনা হয় "আমুল উফুদ" বা "প্রতিনিধিদল সমূহের আগমনের বছর" থেকে অর্থাৎ যে বছর ইসলাম গ্রহণের জন্য, রাজনৈতিক আনুগত্যের অঙ্গীকার করার জন্য অথবা নিছক অনুসন্ধান চালিয়ে পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ও বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল এসেছিল, সেই বছর থেকে। এই সময় সর্বত্র ইসলামের পিপাসা লেগে গিয়েছিল, এবং একটা সাড়া ও চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। এ সময়টা মক্কা বিজয় থেকে শুরু করে তিন বছর অর্থাৎ ৯ম ও ১০ম হিজরী জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বলা যেতে পারে যে, এ সময়টা ছিল বিশ্বমানবতার মুক্তিদূতের সা. রোপণ করা ফসল ফলনের মৌসুম। আমরা যদিও সংক্ষিপ্ত করতে চাই। কিন্তু নবী জীবনের এ অধ্যায়টা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিনিধিদলগুলো নিয়ে আলোচনা না হলেই নয়। কেননা প্রতিনিধি দলগুলোর আগমন, আলাপ আলোচনা ও প্রতিক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। এ বিবরণ থেকে এও জানা যাবে যে, রসূল সা. এর কাছে কিভাবে জনতার ঢল এসেছিল। সীরাতের বিভিন্ন পুস্তকে মদিনায় আগত প্রতিনিধিদলের সংখ্যা কমের পক্ষে ১৫ এবং সর্বাধিক ১০৪ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এই সব দলের মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দলের বিবরণ দেব। আর এর মধ্য থেকেও মাত্র কয়েকটি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেব। উল্লেখ্য যে, প্রতিনিধি দলের আগমন যদিও মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরীতে ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু একটা দুটো দলের আগমন ৫ম হিজরী থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা সেই সময় থেকেই শুরু করছি ঃ

১. মুযাইনা গোত্রের প্রতিনিধি দল

এটি একটি সুবৃহত গোত্র। কিছুটা ওপরে গিয়েই কোরায়েশদের সাথে তাদের বংশধারা মিলে গেছে। প্রখ্যাত সাহাবী নুমান বিন মুকরিন এই গোত্রেরই লোক। হিজরী ৫ম বছর এই গোত্রের প্রায় চারশো লোক রসূল সা. এর দরবারে হাজির হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। সম্ভবত এটাই ছিল সর্ব প্রথম মদিনায় আগমনকারী প্রতিনিধি দল। মদিনা থেকে ফেরার সময় তাদেরকে পাথেয় হিসেবে প্রচুর খেজুর দেয়া হয়।

২. বনু তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল

এ দলটিও প্রাথমিক যুগে খুবই জাঁকজমকের সাথে এসেছিল। গোত্রের বড় বড় নেতা আকরা বিন হাবেস, যাবারকান, আমর ইবনুল আহতাম, নঈম বিন ইয়াযীদ এবং উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী ও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দলের আগমনে মদিনায় উৎসবের আমেয অনুভূত হয় এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারা মসজিদে প্রবেশের সময় অনেকটা

অমার্জিতভাবে রসূল সা. এর কক্ষের কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকছিল ঃ " ও মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ! সা. বাইরে এস।" এই ঘটনা উপলক্ষে সূরা হুজরাত নাযিল হয় এবং মুসলমানদের ভদ্র ও মার্জিত আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়। তারা যদিও ইসলাম গ্রহণের মনোভাব নিয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু আরবীয় আভিজাত্যবোধ তাদের স্বভাবে তখনো অক্ষুণ্ন ছিল। তারা অভিলাষ প্রকাশ করলো যে, উভয় পক্ষের বাগ্মী ও কবিদের মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোক। আসলে আরবের অভিজাত শ্রেণীর গোত্রগুলোর স্বভাবই এ রকম ছিল যে, বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার দিক দিয়ে কাউকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর না দেখে তার নেতৃত্ব তারা মেনে নিতে পারতোনা। তাই রসূল সা. মেধার প্রতিযোগিতার এই প্রস্তাব মঙ্গলজনক হবে ভেবে মেনে নিলেন।

বনু তামীম গোত্রের নামকরা বক্তা ছিল আতারিদ বিন হাজের। সে নিজ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, ধনবল ও জনবল ইত্যাদির প্রশংসা করে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিল। ভাষণের শেষে বললো, "যারা আমাদের সমকক্ষ হবার দাবীদার, তারা এ ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরুক।"

রসূল সা. এর ইংগিতে ইসলামী আন্দোলনের এক বক্তা ছাবেত বিন কায়েস পাল্টা ভাষণ দিতে উঠলেন। তিনি এক উদ্দীপনাময় ভাষণে ইসলামী আন্দোলনের গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে তার দাওয়াতের দিকটাকে জোরদার করে প্রকাশ করলেন এবং এটাকেই ইসলামী সমাজের গৌরবের প্রধান উৎস বলে অভিহিত করলেন।

এরপর বনু তামীমের খ্যাতনামা কবি যাবারকান বিন বদর একটা কবিতা আবৃত্তি করলো। তার একটা বাক্য হলো।

"আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ। কেউ আমাদের সমকক্ষ নয়। আমাদের মধ্যে রাজা রয়েছে। আমরা উপাসনালয় নির্মাণ করি।"

এ সময় ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কবি হাসসান বিন ছাবিত উপস্থিত ছিলেন না। তাঁকে ডেকে আনা হলো। রসূল সা. বললেন, "ওঠো হাসসান, এই কবির কবিতার জবাব দাও।" জবাবে হাসসান যে কবিতা পাঠ করলেন তা ইবনে হিশাম উদ্ধৃত করেছেন। প্রতিনিধিদল স্বীকার করলো, তাদের বক্তা ও কবির চেয়ে রসূল সা. এ কবিতা ও বক্তা শ্রেষ্ঠ। অতপর সমগ্র দল ইসলাম গ্রহণ করলো।

৩. বনু আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল

মুনকিয ইবনে হাব্বানের মাধ্যমে বাহরাইনে ইসলাম প্রচারের কাজ আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ক্রমেই ইসলামের প্রসার ঘটতে লাগলো। ৫ম হিজরীতে ১৩ জনের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় এল। রসূল সা. এর প্রশ্নের জবাবে তারা যখন বললো, আমরা রবীয়ার গোত্রের লোক, তখন তিনি তাদেরকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন। তারা বললো, "আমরা অনেক দূরবর্তী এলাকার অধিবাসী। পথিমধ্যে মুযার পৌত্তলিকরা বাস করে। নিষিদ্ধ চার মাসে ছাড়া চলাফেরা করা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটা কথা বলে দিন, যা আমরা ও আমাদের গোত্রের সবাই পালন করবো। রসূল সা. তাওহীদ, নামায, রোযা ও গনিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর পথে দেয়ার

আদেশ দিলেন, মদ বানাতে নিষেধ করলেন এবং বাহরাইনে এ কাজে ব্যবহৃত চার রকমের পাত্রের নামোল্লেখ করে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। প্রতিনিধি দল বাহরাইনের অনৈসলামিক সামাজিক প্রথা সম্পর্কে রসূল সা. এর নির্ভুল জ্ঞান দেখে অভিভূত হয়ে গেল। আমূল পরিবর্তনকারী একটি আন্দোলনের নেতা দাওয়াতের আওতাভুক্ত এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না রাখলে কাজই চালাতে পারেনা। রসূল সা. নিজের ব্যক্তিগত সফর এবং মক্কা ও মদিনায় প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত লোকদের কাছ থেকে এ সব জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

এই প্রতিনিধি দলে জারূদ ইবনুল আলা নামক একজন খৃষ্টানও ছিল। সে বললো, আমি একটা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। তা ছেড়ে আপনার ধর্ম গ্রহণ করলে আপনি কি নিরাপত্তা দিতে পারবেন? (অর্থাৎ আখেরাতে কোন বিপদ ঘটবেনা তো?) রসূল সা. বললেন, "হ্যাঁ, আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি। কেননা আমি যে ধর্মের আহ্বান জানাচ্ছি তা তোমাদের চেয়ে উত্তম।" জারূদ তৎক্ষণাত মুসলমান হয়ে গেল। তার স্বধর্মীয় সাথীরাও ইসলাম গ্রহণ করলো।

৪. বনু সা'দ গোত্রের প্রতিনিধি

এই গোত্র যিমাম বিন সা'লাবাকে প্রতিনিধি করে মদিনায় পাঠালো। এই উষ্ট্রারোহী প্রতিনিধি বেদুঈনদের মত হাবভাব নিয়ে মসজিদে নববীতে ঢুকে সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমাদের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবের ফরবন্দ কে? সবাই রসূল সা. এর দিকে ইংগিত করলো। সে কাছে গিয়ে বললো, "ওহে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। কয়েকটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবো। কিছু মনে করবেনা"। রসূল সা. তাকে অনুমতি দিলেন। সে কসম খাইয়ে খাইয়ে তাওহীদ, রিসালাত নামায রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি কি এ সবের শিক্ষা দিয়ে থাকেন? রসূল সা. এক একটি করে জবাব দিলেন। সমস্ত জবাব পাওয়ার পর বললো, আমার নাম যিমাম বিন সা'লাবা। আমার গোত্র আমাকে পাঠিয়েছে। আমি যাচ্ছি। আপনি আমাকে যা যা বললেন তা আমি হুবহু মেনে নিলাম একটুও কম নয়, বেশীও নয়। আমার গোত্রকেও শুধু এগুলোই জানাবো।" তারপর উটে চড়ে রওনা হয়ে গেল। তার যাওয়ার পর রসূল সা. বললেন, "এই ব্যক্তি যদি সত্যি বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে যাবে।"

গোত্রে ফিরে গিয়ে সে জোরে শোরে দাওয়াত দিল এবং বললো, "ওহে জনগণ! আমি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। লাত ও উযযার কোন মূল্য নেই। লোকেরা তাকে ভয় দেখালো যে, "সাবধান, এ ধরনের কথাবার্তার কারণে তোমার ওপর দেবদেবীর অভিশাপ না পড়ে এবং উন্মাদ কিংবা কুষ্টরোগে আক্রান্ত হয়ে না যাও।" যিমাম বললো, "আল্লাহর কসম, ওরা কোন লাভও করতে পারেনা, লোকসানও নয়।" সন্ধ্যার আগেই সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলো

৫. আশয়ারী গোত্রের প্রতিনিধি দল (ইয়ামান)

আশয়ারী ইয়ামানের একটা সম্ভ্রান্ত গোত্র। আবু মূসা আশয়ারী রা. এই গোত্রের লোক ছিলেন। মক্কী যুগে তোফায়েল বিন আমর দাওসী ও আবিসিনিয়ার মোহাজেরদের মাধ্যমে

তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। এ সব দাওয়াতে প্রভাবিত তিন ব্যক্তি হিজরতের সংকল্প নিয়ে রসূল সা. কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও ইসলামী আন্দোলনকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে মদিনা রওনা হলো।

সফর ছিল সামুদ্রিক। পথিমধ্যে প্রতিকূল বাতাসের কবলে পড়ে জাহাজ আবিসিনিয়ার তীরে গিয়ে ভিড়লো। এখানে তারা প্রথম হিজরতকারী দলের সাক্ষাত পেল। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তারা হযরত জাফরের সাথে কতিপয় নও মুসলিম আবিসীনীয়কে সাথে নিয়ে মদিনায় রওনা হলো। ৭ম হিজরীতে খয়বর বিজয়ের সময় তারা রসূল সা. এর দরবারে হাজির হয়। তারা এত আবেগাপ্লুত ছিল যে, মদিনার সীমানায় পৌঁছেই তারা এই বলে গান গাইতে থাকে–

"আগামী কালই আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের সাথে মিলিত হব।"

রসূল সা. খবর পেয়ে তাঁর সাথীদের কাছে বললেন, "তোমাদের কাছে ইয়ামান থেকে কিছু লোক আসছে, (সম্ভবত) তারা অত্যন্ত কোমল হৃদয় সম্পন্ন লোক। ইয়ামানবাসী ঈমানেও পরিপক্ক, কৌশলেও নিপুণ।"

এরপর তাদের সাথে সাক্ষাত হলো, আলাপ আলোচনা হলো, প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হলো। তাদের ইসলাম গ্রহণে মদিনায় এক নতুন সাড়া পড়ে গেল।

৬. দাওস গোত্রের প্রতিনিধি দল (ইয়ামান)

আমরা আগেই বলেছি, তোফায়েল দাওসী মক্কার প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। গোত্রে ফিরে গিয়ে তিনি খুব জোরে শোরে দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন, তাঁর পিতা ও স্ত্রী তো তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করেন। গোত্রের অন্যরাও কিছুটা প্রভাবিত হন। কিন্তু গোত্রে নৈতিক অধোপতন ও ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তোফায়েলের মাত্রাতিক্তি তেজস্বিতা ও আবেগের কারণে তাঁর দাওয়াতী কাজে তেমন অগ্রগতি হয়নি। তাই রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং গোত্রের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ তুলে দোয়া চাইলেন। রসূল সা. তাকে কোমল ও নম্র পন্থায় দাওয়াত দিতে বললেন এবং দাওস গোত্রের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। এবার তোফায়েল গিয়ে দাওয়াত দিতে শুরু করলে নতুন পথ খুলে গেল। ৫ম হিজরীতে অনেক গৃহে ইসলামের আলো প্রবেশ করলো। ৭ম হিজরীতে এই গোত্রের ৮০টা পরিবার হিজরত করে মদিনায় এসে গেল। এই হিজরতকারীদের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রার মত ব্যক্তিও ছিলেন।

৭. সুদা গোত্রের প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের যায়েদ বিন হারেস সুদাই সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং গোত্রে ফিরে গিয়ে যথেষ্ট দাওয়াতের কাজ করেন। ৮ম হিজরীতে ১৫ ব্যক্তির এক প্রতিনিধি দল সমগ্র গোত্রের পক্ষে হয়ে রসূল সা. এর সাথে দেখা করে। সা'দ বিন উবাদা তাদের মেহমানদারী করেন। তিনি তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাই শুধু করেননি, বরং তাদের পোশাকের ব্যবস্থাও করেন। তারা রসূল সা. এর কাছে ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের

অঙ্গীকার করেন এবং গোত্রের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তুতির কথা জানান। এই প্রতিনিধি দল ফেরত যাওয়ার পর দ্রুত গতিতে দাওয়াতের কাজ চলে। বিদায় হজ্বের সময় এই গোত্রের প্রায় একশো ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল।

এই ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী সময়ে আগত প্রতিনিধি দলগুলোর বিবরণ। মক্কা বিজয়ের পরে তো চারদিক থেকে জনতার সয়লাব আসতে থাকে। ৯ম থেকে ১০ হিজরীতে যে সব প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে, এবার তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হচ্ছে ঃ

৮. সাকীফ প্রতিনিধি দল (তায়েফ)

রসূল সা. যখন বিজয়ের সফর থেকে মদিনায় ফিরে যান, তখন উরওয়াহ্ বিন মাসউদ সাকাফী উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ ও বনী সাকীফ গোত্রে ইসলামের বিস্তার ঘটানোর সংকল্প প্রকাশ করেন। রসূল সা. সাকীফ গোত্রের স্বভাবগত দাম্ভিকতার প্রেক্ষাপটে তাকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন এবং আশংকা প্রকাশ করেন যে, তারা তোমাকেই হত্যার চেষ্টা করতে পারে। হযরত উরওয়ার নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাই তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করে রসূল সা. এর কাছে থেকে দাওয়াতী কাজের অনুমতি গ্রহণ করেন। মদিনা থেকে ফিরে গিয়েই তিনি নিজের বাড়ীর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু নিজের ধারণার বিপরীত তিনি চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হতে দেখলেন। এরই একটি তীরে বিদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। বনু সাকীফ এই যালেম সুলভ অপকর্মটা করলো বটে, তবে এটা তাদের বিবেককে একটা প্রচন্ড ঝাঁকিও দিল। তারা পরিস্থিতিকে ঠান্ডা মাথায় পর্যালোচনা করতে বাধ্য হলো। মাস খানেক পর তারা একটা বৈঠক আহ্বান করলো, এ বৈঠকে পরিস্থিতির বাস্তবতা পর্যালোচনার পর তারা যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলো তা হলো, ইসলামের অনুগত হয়ে যাওয়া সমগ্র আরব জাতির সাথে কি আমরা একাই মোকাবিলা করতে সক্ষম? অবশেষে স্থির হলো, মদিনায় একজন দূত পাঠানো হবে। কিন্তু একজন দূতের পরিবর্তে পুরো একটা প্রতিনিধিদলই পাঠানো হলো। উসমান বিন আবিল আস, আওস বিন আওফ, বাহায বিন খাবশা (বনু মালেকের প্রতিনিধি) হাকাম ইবনে ওমর এবং শুরাহবীল ইবনে গায়লান (মিত্র গোত্রগুলোর প্রতিনিধি) দলের অন্তর্ভুক্ত হলো। তায়েফের সরদার আবদ ইয়ালীল তাদের দলনেতা হয়ে মদিনায় গেল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বারো বছর আগে যে ব্যক্তি রসূল সা. এর দাওয়াত শুনতেই চায়নি এবং শহরের বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করিয়েছিল, সেই ব্যক্তিই এই আবদ ইয়ালীল।

রসূল সা. তবুক থেকে মদিনায় ফিরে আসার পর এই প্রতিনিধি দল মদিনায় পৌঁছলো। তাদের জন্য মসজিদে নববীর কাছেই শিবির স্থাপন করা হলো। খালেদ বিন সাঈদ উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচক নিযুক্ত হলো।

এই আলোচক অদ্ভুত অদ্ভুত শর্ত পেশ করলো। একটা শর্ত ছিল এই যে, তাদের 'লাত' নামক মূর্তিকে তিন বছরের মধ্যে ভাঙ্গা যাবেনা। তারপর এই সময়কে কমাতে কমাতে তারা এক মাসের পর্যায়ে নিয়ে এল। ওটা যে নিছক একটা স্থবীর পাথর, তা তাদের মন তখন মানতে চাইছিলনা। তারা এ আশংকাও প্রকাশ করলো যে, তাদের মূর্তি যদি জানতে

পারে যে তাকে ভাঙ্গা হবে, তাহলে সে সমগ্র দেশবাসীকে মেরে ফেলতে পারে। হযরত ওমর রা. এতক্ষণ চুপচাপ থেকে কথা শুনছিলেন। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি আবদ ইয়ালীলকে বললেন, "কী সব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলছ? তোমাদের এ সব উপাস্য তো পাথর ছাড়া আর কিছু নয়।" আবদ ইয়ালীল উত্তেজিত হয়ে বললো, "ওহে খাত্তাবের ছেলে, আমরা তোমার সাথে কথা বলতে আসিনি। আমরা কথা বলছি আল্লাহর রসূলের সাথে।" রসূল সা. যখন এ সমস্ত শর্তের একটাও রাখলেন না, তখন তারা অগত্যা এই শর্ত দিল যে, মূর্তি যদি ভাংতেই হয় তবে তা আমাদের দিয়ে যেন ভাংগানো না হয়। রসূল সা. তাদের এ শর্ত মেনে নিলেন। অতপর মূর্তি ভাংতে আবু সুফিয়ান বিন হারব, ও মুগীরা ইবনে শু'বাকে নিযুক্ত করা হলো।

এরপর তারা শর্ত দিল যে, আমাদেরকে নামায পড়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। রসূল সা. বললেন, যে ধর্মে নামায নেই, তাতে কোনই কল্যাণ নেই।

প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য এ আবেদনও জানালো যে, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদেরকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। ব্যভিচার না করে তো আমাদের উপায়ই থাকে না। তারপর তারা বলতে লাগলো, "আমাদের জন্য সুদী কারবারের সুযোগটা উন্মুক্ত রাখা হোক আর মদ খাওয়ার অনুমতিও দেয়া হোক।"

ভাবখানা এই যে, রসূল সা. যেন একটা দোকান খুলে বসেছেন। যার যতটুকু সদাই কেনার দরকার কিনবে, আর বাকীটা কিনবেনা। রসূল সা. এই দাবীগুলোর জবাবে কোরআনের আয়াত পড়ে পড়ে জানিয়ে দিতে লাগলেন যে, এ সব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বিধান, কারো মনগড়া বিধান নয়। যখন এই সব অন্যায় শর্ত প্রত্যাখ্যাত হলো, তখন প্রতিনিধি দল পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আমরা যদি ইসলামের আইন না মানি, তাহলে আমাদের পরিণতিও একদিন মক্কাবাসীর মত হবে। তাই বাধ্য হয়ে তারা মাথা নোয়ালো এবং চুক্তি লেখানো হলো। রসূল সা. শুধু দুটো ব্যাপারে তাদেরকে কিছুটা রেয়াত দিলেন। প্রথমত কিছুদিনের জন্য তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হবেনা এবং তাদেরকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবেনা। কিন্তু ইসলাম যখন তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হতে লাগলো তখন একে একে সব দাবীই তারা স্বতস্ফূর্তভাবে পূরণ করতে লাগলো। বলাবাহুল্য রসূল সা. আশাও করেছিলেন তাই।

প্রতিনিধি দলে উসমান ইবনে আবিল আস ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান যুবক। তিনি অবসর সময়ে পড়াশুনা করে ইসলাম ও ইসলামী বিধানের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতেন। তাকেই আমীর নিযুক্ত করা হলো। তারা তায়েফে ফিরে গিয়ে প্রথমে নাটকীয়ভাবে চরম বিরোধী মনোভাব পেশ করতে লাগলো যে, মুহাম্মাদ সা. আমাদের ওপর অত্যন্ত অগ্রহনযোগ্য শর্তাবলী পেশ করেছে। কাজেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। দুদিন পর্যন্ত ভয়ংকর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করতে লাগলো। অবশেষে তায়েফবাসী আপনা থেকেই বলতে লাগলো, "আমরা মুহাম্মাদ সা. এর সাথে কেমন করে লড়বো। সমগ্র আরব তো এখন তার আদেশেই চলছে। যাও, সে যা যা বলে মেনে নাও। এভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করার পর প্রতিনিধি দল আসল কথা খুলে বলল। তারা বললো, আসলে আমরা মুহাম্মদ সা. কে খোদাভীতি, সততা, সত্যবাদিতা ও দয়ায় খুবই উঁচুমানে উন্নীত পেয়েছি। আমাদের সফর খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে।

মূর্তি ভাঙ্গার জন্য আবু সুফিয়ান ও মুগীরাকে প্রতিনিধি দলের সাথেই তায়েফে পাঠানো হলো। তারা যখন মূর্তি ভাঙ্গার কাজ শুরু করলো তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা এটা দেখার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো যে, ভাঙ্গার কাজে লিপ্তদের কপালে কি ঘটে? কোন কোন মহিলা ভয়ে কেঁদেই ফেললো। তারা ভেবেছিল যে, হয়তো আকাশ ভেংগে মাটিতে পড়বে। তাদের কেউ কেউ কবিতা আবৃত্তি করে করে বললো, "ঐ সব কাপুরুষদের জন্য কাঁদো যারা নিজেদের দেবমূর্তিকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছে এবং কোনই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।"

যে তায়েফ একদিন রসূল সা. কে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, সেই তায়েফেই আজ রসূলের সা. ইংগিতে তাদের জাহেলী ব্যবস্থাকে তাদেরই চোখের সামনে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছিল।

লক্ষ্যণীয় যে, তায়েফ (মক্কার মতই) জাহেলী ব্যবস্থার একটা প্রাচীন ঘাঁটি ছিল। রসূল সা. অবরোধ আরোপ করার পর শুধু এই ভেবে অবরোধ প্রত্যাখ্যান করেন যে, ইসলামের দেশজোড়া পরিবেশের মধ্যে থেকে বনুসকীফ নিজেদের জন্য আলাদা দ্বীপ বানিয়ে তো আর টিকে থাকতে পারবেনা। কাজেই রক্তপাতের কী দরকার? মক্কা যদি সত্যের সামনে মাথা নত করে থাকে, তাহলে মক্কার অধীন তায়েফ কতদিন মাথা না নুইয়ে থাকতে পারবে? রসূল সা. এর পরিবর্তে যদি অন্য কোন যুদ্ধবাজ বিজেতা হতো, তাহলে একবার সৈন্য নিয়োগ করে অন্তত নিজের মর্যাদার খাতিরেই যুদ্ধের বিজয়কে চূড়ান্ত করতো এবং তায়েফে রক্তের বন্যা বইয়ে দিত। কিন্তু রসূল সা. যেহেতু অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া রক্তপাত পছন্দ করতেন না, তাই তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে দিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পরে যখন সকীফ ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে, তখন সেচ্ছায় আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে এবং একটা গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য এটাই অধিকতর ফলপ্রসূ হতে সক্ষম। পরবর্তীতে হয়েছিলও তাই।

৯. বনু হানফিয়ার প্রতিনিধি দল

এরা ইয়ামামা অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ছুমামা বিন ইছালের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর তারা মদিনায় এসে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

কুখ্যাত ভন্ড নবী মুসাইলিমা কাযযাবও এই দলের সাথেই এসেছিল। সে অনেক আজে বাজে কথা বলতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে বললো, মুহাম্মদ সা. যদি স্থির করেন যে, আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন, তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। আসলে নবূয়তে মুহাম্মদীর অসাধারণ সাফল্য দেখে এই ব্যক্তি লোভাতুর হয়ে উঠেছিল। সে ভেবেছিল, কিছু সাহিত্যিক বক্তব্যকে ওহি বলে চালিয়ে দেয়া যাবে এবং তারপর নবুয়ত দাবী করলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কিন্তু সে একথা বুঝতে পারেনি যে, সেই চারিত্রিক শক্তি সে কোথায় পাবে, যা ২০ বছর ধরে সব রকমের বিরোধিতার পাহাড় ডিংগিয়ে চলে এসেছে? এ সব চিন্তাভাবনার কারণেই তার মাথায় ব্যবসায়িক বুদ্ধি এসেছিল। তার বক্তব্য ছিল যে,

হয় আমার সাথে বাণিজ্যিক সমঝোতা কর, নচেত আমি নিজেই নবুয়তের দোকান খুলে বসবো।

রসূল সা. তার মানসিকতা ধরে ফেলেছিলেন। তাঁর হাতে খেজুরের একটা শীষ ছিল। সেটা দেখিয়ে তিনি বললেন, আমি তো এই শীষটা দেয়ার শর্তেও কারো বাইয়াত নিতে চাইনা। অর্থাৎ ইসলাম কোন দোকান নয় যে তার মাধ্যমে কেউ ব্যক্তিগত উপার্জনের সুযোগ নেবে। সত্যকে সত্য মেনে নিয়ে কেউ আসে তো আসবে। কোন শর্ত আরোপ করা চলবেনা।

প্রতিনিধিদল বিফল হয়ে ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে মুসায়লিমা সত্যই নবুয়তের দাবী তুললো। তার ধর্মে নামায মাফ এবং মদ ও ব্যভিচার হালাল ছিল।

১০. বনু তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দল

'তাই' গোত্রের প্রতিনিধি দল যায়েদ আল খাইলের নেতৃত্বে উপস্থিত হয়। রসূল সা. তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। সরদারসহ সমগ্র দল ঐ দাওয়াত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন। যায়েদ আল খাইল একাধারে কবি ও বক্তা ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন বীর যোদ্ধাও ছিলেন। রসূল সা. তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন "আরবের যত লোকেরই প্রশংসা আমার সামনে করা হয়েছে, বাস্তবে দেখতে গিয়ে তাকে ঐ প্রশংসার চেয়ে কম গুণের অধিকারী পেয়েছি। কিন্তু যায়েদ আল খাইল তার ব্যতিক্রম। কেননা তার যা কিছু প্রশংসা শুনেছি, তার ভেতরে তাঁর চেয়ে বেশী গুণাবলী দেখতে পেয়েছি।"

আদী ইবনে হাতেমও এই গোত্রেরই নেতা ছিলেন। ধর্মে তিনি খৃষ্টান ছিলেন। রসূল সা. এর বিরুদ্ধে তার মনে তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত ছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু সহসা মুসলিম বাহিনী ইয়ামান অঞ্চলে পৌঁছে গেলে তিনি পালিয়ে সিরিয়া চলে গেলেন। তাঁর বোন গ্রেফতার হয়ে মদিনায় নীত হলে রসূল সা.-এর ভালো ব্যবহার ও অন্যদের সার্বিক চারিত্রিক সততা দেখে অত্যন্ত অভিভূত হন। তিনি আদীকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন যেন মদিনায় যায় এবং রসূল সা. এর সাথে দেখা করে। কারো কারো মতে আদী তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথেই মদিনায় গিয়েছিলেন। যাই হোক, মদিনায় পৌঁছে তিনি যে প্রশ্নটির সমাধান খুঁজছিলেন তা হলো, মুহাম্মদ সা. একজন রাজা, না নবী! মদিনায় এসে মসজিদেই রসূল সা. এর সাথে তার সাক্ষাত হলো, তারপর তিনি মসজিদ থেকে বেরুলেন এবং আদীকে নিজ বাড়ীর দিকে নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে এক বুড়ি রসূল সা. এর সাথে কথা বলতে চাইল। তিনি তাকে অনেকখানি সময় দিলেন এবং মনোযোগের সাথে তার কথা শুনলেন। বাড়ীতে গিয়ে নিজে মেঝের ওপর বসে আদীকে গদীর ওপর বসালেন। এই দুটো জিনিস দেখেই আদী নিশ্চিত হলো যে, তিনি আল্লাহর রসূল, নিছক দুনিয়াবী রাজা বাদশাহ নন। তারপর রসূল সা. এর কথাবার্তা তাঁকে আরো নিশ্চিত করলো।

আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে রসূল সা. বুঝে নিলেন আদীর মনে আর কী কী জটিলতা রয়েছে। অতপর তিনি সেগুলো এক এক করে পরিষ্কার করলেন। পৃথিবীতে এক ধরনের

লোক থাকে, যারা সত্যকে দ্রুত উপলব্ধি করে। কিন্তু তার সফলতার বাস্তব সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা এবং দ্রুত কোন ফল লাভ হতে পারে কিনা, সে ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চায়। আদী ছিলেন এ ধরনেরই এক ব্যক্তি। রসূল সা. তার মনের এই অবস্থাটা ধরতে পেরে বললেন, তুমি হয়তো ইসলামের অনুসারীদের বর্তমানে দারিদ্র দেখেই ইসলাম গ্রহণে ইতস্তত করছ। আল্লাহর কসম, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন মুসলমানদের মধ্যে সম্পদের ফোয়ারা ছুটবে এবং এত প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, সম্পদ নেয়ার লোকই পাওয়া যাবেনা। আর যদি মুসলমানদের সংখ্যা কম এবং তার শত্রুদের সংখ্যা বেশী দেখে তুমি দ্বিধান্বিত হয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহর কসম, সেই দিন আসন্ন, যখন এক মহিলা একাকিনী উটে সওয়ার হয়ে সুদূর কাদেসিয়া থেকে এই মসজিদ দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে পৌঁছে যাবে। হয়তো বা তুমি অমুসলিমদের ক্ষমতা ও প্রতাপ বেশী দেখে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ পাচ্ছনা। কিন্তু আল্লাহর কসম, তুমি স্বয়ং অচিরেই শুনতে পাবে, মুসলমানরা ব্যাবিলনের প্রাসাদগুলো দখল করে নিয়েছে। এই দিক দিয়ে যখন আদীর সন্দেহ দূর হলো, তৎক্ষণাত তিনি নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের হাতে সমর্পন করলেন। উপরোক্ত আলাপ আলোচনা থেকে যে ক'টা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় তা হলো ঃ

– ইসলাম শুধু নৈতিক সংস্কার ও সংশোধনেরই আহ্বান জানায়না, বরং তার কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যেমন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক বিপ্লবও। আখেরাতের কল্যাণকে সে পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করেনা।

– রসূল সা. ইসলামী আন্দোলনের দূরতম ভবিষ্যত সম্পর্কেও আগাম ধারণা রাখতেন। কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে কোথায় পৌঁছতে হবে, সেটা শুরুতেই তাঁর সামনে স্পষ্ট থাকতো।

– ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে জনগণকে এ মর্মে আশ্বস্ত করা অত্যন্ত জরুরী যে, আন্দোলনের বাস্তব সাফল্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং ইপ্সিত ইসলামী বিপ্লব কোন আকাশ কুসুম কল্পনা নয় বরং তা আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতই অবধারিত বাস্তবতা। এটা না করতে পারলে জনগণের একটা বিরাট অংশ ইসলামের দাওয়াতকে ধ্রুব সত্য জেনেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

– ইসলামী আন্দোলন যদি সাফল্য ও পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তার অনিবার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, (১) অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের বিপুল উন্নয়ন ও তার সুফলের ন্যায়সংগত বন্টন নিশ্চিত হওয়ার কারণে কোন অভাবী ও পরমুখাপেক্ষী লোকের অস্তিত্বই থাকবেনা, (২) রাজনৈতিক দিক দিয়ে এত শক্তিমান ও স্থিতিশীল সরকার গঠিত হবে যে, শত্রুরা তাঁকে সহজেই গ্রাসযোগ্য মনে করবেনা। বরঞ্চ এই সরকার তার বিরোধী মহলের সমস্ত দর্প চূর্ণ করতে সক্ষম হবে, (৩) অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা এমন মানে উন্নীত হবে যে, কোন মহিলাও যদি দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একাকিনী ভ্রমণ করে এবং মানুষের লোকালয়ের কাছ দিয়ে যায়, তবে তার জান, মাল ও সম্ভ্রম কোন দিক থেকেই হুমকির সম্মুখীন হবেনা। এই হচ্ছে একটা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক গুণবৈশিষ্ট।

১১. বনুল হারস-এর প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলটি ছিল নাজরান অঞ্চলের। এই সব এলাকায় হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (১০ম হিজরীতে) ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপত্তা পাবে। তারা দাওয়াত গ্রহণ করে। হযরত খালেদ তাদেরকে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও আহকামের শিক্ষা দানের জন্য কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেন এবং চিঠির মাধ্যমে রসূল সা. কে সাফল্যের খবর জানান। মদিনা থেকে চিঠির জবাবে বলা হয়, এখন ফিরে এস এবং ঐ গোত্রের কিছু গণমান্য লোককে সাথে করে নিয়ে এস। এই আদেশ তৎক্ষণাত প্রতিপালিত হয়।[২]

এই গোষ্ঠীটি সেই জাহেলী যুগেও কিছু উত্তম নৈতিক মূল্যবোধ মেনে চলতো। প্রতিনিধি দলটি যখন এল, তখন রসূল সা. তাদেরকে কথা প্রসংগে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা সব সময় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে জয় লাভ করে থাক এবং কখনো পরাজিত হওনা। এর কারণ কী?" তারা বললো, "আমরা কারো বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় আগ্রাসী পদক্ষেপ নেইনা। এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কোন যুলুম শুরু করিনা। যখন লড়াই করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিই, তখন তা থেকে কেউ সরে আসিনা এবং অনৈক্য সৃষ্টি করিনা। বরং ঐক্য বজায় রাখি।" রসূল সা. তাদের এই কৌশলকে সমর্থন জানালেন।

প্রতিনিধি দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কয়েস বিন হাসীনকে গোত্রের আমীর নিয়োগ করা হলো।

১২. নাজরানের প্রতিনিধি দল

মানবতার পরম হিতৈষী মহামানব সা. কলম দিয়েও ইসলামী দাওয়াতের অনেক কাজ করেছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা দলের কাছে তিনি চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। এ ধরনের একটা চিঠি তিনি নাজরানের খৃষ্টানদের কাছেও পাঠিয়েছেন। এ চিঠিতে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিম্নরূপ দাওয়াত দেন ঃ

"ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মা'বুদ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর বান্দাদের দাসত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করা এবং আল্লাহর দাসদের প্রভুত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রভুত্বের আনুগত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। এ দাওয়াত যদি মানতে না চাও, তবে তোমাদের জিযিয়া দেয়া (অর্থাৎ রাজনৈতিক আনুগত্য কর) অবশ্য কর্তব্য। সেটাও যদি অমান্য কর তবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো।" বিশপ চিঠি পড়েই ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে প্রথমে কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করলো। তারপর সমগ্র এলাকার জনগণকে ডাকলো। এলাকায় তিহাত্তরটি জনপদ ছিল

---

২. হযরত খালেদের এই চিঠির হুবহু উদ্ধৃতি ইবনে হিশাম দিয়েছেন। এতে হযরত খালেদ নিজের অবস্থানের কারণ বর্ণনা করে রসূল (সা) এর আদেশের বরাত দেন। এ প্রসংগে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "আমি তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছি, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর শিক্ষা দিচ্ছি।" এরপর আবার তিনি বলেন "এ কাজ আমি রসূল (সা) এর আদেশ অনুসারেই করছি।" এরপর পুনরায় লিখেছেন যে, "আমি তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছি, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সা) সুন্নাহর শিক্ষা দিচ্ছি।" এই চিঠিটা পড়ার সময় মনে হলো, সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের যে সব দলীল পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটাই রসূলের সুন্নাহকে ইসলামের একটা মৌলিক উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাকে মেনে নেয়া অপরিহার্য গণ্য করে।

এবং লোকসংখ্যা এত বেশী ছিল যে, এক লাখ লড়াকু যে কোন সময় বেরিয়ে আসতে পারতো। প্রধান প্রধান খৃষ্টান নেতাদের ধারণা ছিল, ইসমাঈল আ. এর বংশধরদের মধ্য থেকে যে শেষ নবীর আগমনের কথা, ইনিই হয়তো তিনি। গণ পরামর্শের পর স্থির হলো, প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় নেতাদের একটা দল মদিনায় যাবে, চিঠির লেখকের সাথে কথাবার্তা বলবে এবং পরিস্থিতি যাচাই করবে। এই দলে শুরাহবীল, আবদুল্লাহ ও হাব্বারকে নিয়োগ করা হলো। এটি ছিল রাজনৈতিক আনুগত্য জ্ঞাপনকারী, কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানকারী, এবং এর বিনিময়ে নিরাপত্তা ও অধিকার সংক্রান্ত একটা ফরমান বা ঘোষণাপত্র পেয়ে প্রত্যাবর্তনকারী প্রথম প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দল নিরাপত্তার সনদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলে বিশপ ও প্রধান সরদাররা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যান। তারা সনদকে পথিমধ্যেই বিশপের হাতে তুলে দেন এবং বিশপ পথ চলতে চলতে তা পড়তে থাকেন। তার চাচাতো ভাই বশীর বিন মুয়াবিয়াও সনদটি এমন তন্ময় হয়ে পড়তে লাগলো যে, উটের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। নিচে পড়ে গিয়ে সে বেএখতিয়ার বলে ফেললো" যে ব্যক্তির কারণে আমরা এত মুসিবতে পড়ে গেছি, তার সর্বনাশ হোক।" কথাটা যে সে রাসূল সা.কে ইংগিত করে বলেছে, তা সুস্পষ্ট। তাই বিশপ তাকে কঠোরভাবে বললো, "এ কী বলছ তুমি? আল্লাহর কসম, সেতো আল্লাহর প্রেরীত নবী।" আর যায় কোথায়! কথাটা শোনা মাত্রই বশীরের মধ্যে বিপ্লব এসে গেল। সে বললো, "তাহলে আল্লাহর কসম, আমি এক্ষুনিই তার দরবারে উপস্থিত হচ্ছি।" বিশপ তার পিছে পিছে উটনী হাকিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, আরে আমার কথা শোনো। আমার কথার অর্থটা বুঝে নাও। আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কথাটা বলে ফেলেছিলাম। বশীর কোন কথাই শুনলোনা। বললো, "তুমি একজন বিশপ। তুমি যা বলেছ তা ভুল হতে পারেনা।" সংকল্পে অনড় বশীর রসূল সা. এর কাছে পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেই তবে ক্ষান্ত হলো এবং মদিনাতেই বাস করতে লাগলো। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সৌভাগ্যদান করেন।

কারয বিন আলকামা সম্পর্কেও প্রায় এ ধরনেরই ঘটনা বর্ণিত আছে।

প্রতিনিধি দল স্থানীয় সরদারগণসহ নাজরানে ফিরে এলে সেখানকার আরেকজন সংসারবিরাগী খৃষ্টান দরবেশ সমস্ত ঘটনা শুনে অভিভূত হলো। নতুন নবীর আবির্ভাবের খবর শুনে সেও আবেগোদ্দীপ্ত হয়ে মদিনায় চলে গেল। নিজের একটা পেয়ালা, একটা লাঠি ও একটা চাদর সে রসূল সা. কে উপহার হিসেবে দিয়ে নিজের ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করলো। তারপর সে কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক শিক্ষা অর্জন করলো। তারপর রসূল সা. এর অনুমতি নিয়ে ফিরে আসার ওয়াদা করে নাজরান গেল। কিন্তু রসূল সা. এর জীবদ্দশায় আর ফিরে আসতে পারেনি।

কনস্টান্টিনোপলের রাজার ভক্তিভাজন ও খৃষ্টান জনগণের মধ্যে ব্যাপক সুখ্যাতির অধিকারী নাজরানের বিশপ আবুল হারেস পুনরায় একটা প্রতিনিধিদল নিয়ে মদিনায় গেল। খৃষ্টান মুফতী ও বিচারক আয়হাম, আব্দুল মাসীহ আকের ও ২৪ জন বিশিষ্ট নেতা এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, এই বিশপ মূলত বনু বকর বিন ওয়ায়েলের বংশোদ্ভূত

একজন আরব ছিল। কিন্তু খৃষ্টান হওয়ার পর সে ধর্মীয় জ্ঞান ও এবাদাতের দিক দিয়ে এত উন্নতি লাভ করে যে, সে স্বয়ং খৃষ্টানদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত নেতায় পরিণত হয়।

তারা দিন কয়েক মদিনায় কাটালো। খৃষ্ট ধর্ম অনুসারে তারা মসজিদে নববীতে নামায পড়তে চাইলে কোন কোন সাহাবী বাধা দেন, কিন্তু রসূল সা. অনুমতি দেন।

তাদের আগমনে স্থানীয় ইহুদীরা ভীষণভাবে তৎপর হয়ে উঠলো এবং এর ভেতরে অনর্থক নাক গলিয়ে নানা রকমের কূটতর্ক তুললো। ত্রীত্ববাদ ও হযরত ঈসা আ. এর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা হলো। প্রত্যেক ব্যাপারেই কোরআনের আয়াত দিয়ে তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হলো। সাথে সাথে ইহুদীদের সংশয়ও উস্কে দিল যে রসূল সা. ঈসা আ. এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে নিজের উপাসনা করিয়ে নিতে চান। এর জবাবও আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সা. কোরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ যাকে কিতাব, শাসনব্যবস্থা ও নবুয়ত দান করেন, তাকে কখনো জনগণের উদ্দেশ্যে এ কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়নি যে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও। তারপর ইহুদী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে এ বিতর্কও চলে যে, হযরত ইবরাহীম কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইহুদীদের দাবী ছিল যে, তিনি ইহুদী ছিলেন। আর খৃষ্টানদের দাবী ছিল যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। কোরআন অত্যন্ত সাদাসিদে ভাষায় ও তর্কাতীত ভংগীতে এ বিতর্কের মীমাংসা করে দেয় যে, "হে আহলে কিতাব, তোমরা ইবরাহীম আ. সম্পর্কে অনর্থক তর্কে লিপ্ত হও কেন? অথচ তাওরাত ও ইনজীল উভয়ই তার পরে নাযিল হয়েছিল। (এই দুইখানা গ্রন্থ থেকেই ইহুদী ও খৃষ্টান এই দুই জাতির উদ্ভব ঘটেছিল।) তিনি তো ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। বরং একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি কখনো মোশরেক ছিলেন না। ইবরাহীমের নীতির যথার্থ অনুসারী শুধু রসূল সা. ও তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণ"। স্বয়ং হযরত ঈসা আ. এর মর্যাদা কোরআনে এই বলে তুলে ধরা হয়েছে যে, "আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদম আ. এর মতই।"

নাজরানের প্রতিনিধি দলের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা অনড় মনোভাব হয়তো ছিল। অনেক সময় সদুদ্দেশ্য নিয়েও মানুষ পুরানো ধ্যানধারণার প্রতি অনুগত থাকে। কিন্তু ইহুদীদের কুমতলবপূর্ণ যোগসাজস এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। নিষ্প্রয়োজন কূটতর্ক ও কুটতর্কজনিত হঠকারিতা সত্য গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল। এ জন্য কোরআন তাদের সামনে নিষ্পত্তির একটা চরম পন্থা তুলে ধরেছে। সেটি হলো 'মুবাহালা'। রসূল সা. কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তাদেরকে বলে দাও "এসো আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে ডেকে নেই এবং নিজেরাও ময়দানে নামি। অতপর আল্লাহর কাছে নিজেদের সম্পর্কে ফায়সালা কামনা করি এবং মিথ্যুকদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করি।" বস্তুত যখন কোন সত্যবাদীর ওপর মিথ্যাচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তখন তার পক্ষে এর চেয়ে কষ্টদায়ক ব্যাপার আর কিছু হতে পারেনা। এরূপ পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তায়ালা নিষ্পত্তির এই পন্থা নির্ধারণ করেন যে, উভয় পক্ষ প্রকাশ্য জনতার সামনে আল্লাহর ফায়সালা চাইবে। পরদিন ভোরে রসূল সা. নিজের প্রাণপ্রিয় মেয়ে ফাতেমা, জামাতা হযরত আলী ও নিষ্পাপ দৌহিত্রদেরকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। মদিনাবাসীর জন্য এটা ছিল একটা অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ও একটা বিরাট ঘটনা যে,

সত্যের একজন আহ্বায়ক তার গোটা পরিবার পরিজনকে মোবাহালার ময়দানে নিয়ে এসেছেন। কত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল! খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঘাবড়ে গেল যে, উনি যদি সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাকেন, তা হলে এই মোবাহালায় আমাদের নাম নিশানাও মুছে যাবে। তারা এ বিতর্কে আর অগ্রসর না হয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রস্তাব দিল এবং জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণের ভারও রসূল সা. এর ওপরই ছেড়ে দিল। পরদিন এই মর্মে আদেশ নামা লিখে দেয়া হলো যে, খৃষ্টানরা পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করবে। তাদের লোকজন ও ধনসম্পদ যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থায় বহাল থাকবে। তাদের বর্তমান অধিকারগুলোর কোন রদবল করা হবেনা। তাদের ধর্মীয় পুরোহিতদের (বিশপ ও সন্যাসী) মধ্যে কোন পরিবর্তন করা হবেনা। ধর্মীয় সম্পত্তিগুলোর মালিকানা ও অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা হবেনা। জাহেলী যুগের অপরাধগুলোর ওপর আর পাকড়াও করা হবেনা। মুসলিম বাহিনী তাদের ভূমিতে প্রবেশ করবেনা। দুনিয়াবী রাজা- বাদশাহদের মত তাদের জনগণকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হবেনা। যালেম ও মাযলুমের মাঝে ইনসাফ করতে হবে। কেউ সুদ খেলে তার দায় দায়িত্ব কেউ নেবেনা। একজন অপরজনের পাপের ফল ভোগ করবেনা। এত বড় জনসংখ্যার ওপর মাত্র বাৎসরিক দুই হাজার উকিয়া পরিমাণ পোশাক পরিচ্ছদ কর হিসেবে ধার্য হলো।

নাজরানের দুটো প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত এ বিবরণ খানিকটা মিশ্রিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষেই অধিকতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু রসূলের সা. নিরাপত্তা সূচক ঘোষণাপত্র সম্ভবত প্রথম দলই পেয়েছিল। কেননা দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক বিষয়ের চেয়ে ধর্মীয় বিষয়ের উপস্থিতি অধিকতর। এতে প্রধানত ধর্মীয় পুরোহীতদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই ঘোষণপত্রে নাজরানবাসীকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং খৃষ্টীয় ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। এই ঘোষণাপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সা. রাজনৈতিক পরিমন্ডলে শুধু শাসনব্যবস্থার আনুগত্য চাইতেন এবং সেটা পেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কোন সম্প্রদায়কে তার ধর্ম পালন থেকেও বিরত রাখতেন না, কারো ওপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাস জোরপূর্বক চাপিয়েও দিতেন না। বরঞ্চ সংখ্যালঘুদেরকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতেন। ইসলামী আন্দোলন ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঈমান ও মতামতের পরিবর্তন কেবল যুক্তির বলেই করতো, তবে সে তার সামষ্টিক বিধানকে রাজনৈতিক শক্তি দ্বারাই প্রয়োগ করতো। লক্ষ্য করুন, প্রথম ঘোষণাপত্রে সূদখোরিকে নিরাপত্তার বাইরে রাখা হয়েছে এবং তা একটা বেআইনী ও অপরাধমূলক কাজ। ধর্ম তার আসল আলোচ্য বিষয়ই ছিলনা। কেননা তা ধর্মের চেয়েও অনেক বড় জিনিস। রসূল সা. এর জারীকৃত এই ঘোষণাপত্র চিরদিনের জন্য উম্মতের অবশ্য পালনীয় আইনের মর্যাদা রাখে। এ ঘোষণাপত্র থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্ম পালনকারী সংখ্যালঘুদের প্রতি কত উদার। পৃথিবীর আর কোন আইন, বিধান ও সভ্যতা সংখ্যালঘুদের প্রতি এত উদারতা দেখিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত পেশ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল মদিনা থেকে বিদায় নেয়ার সময় রসূল সা. কে অনুরোধ করে যে,

আপনার কোন বিশ্বস্ত কর্মকর্তাকে জিযিয়া আদায় করে আনার জন্য আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। রসূল সা. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে পাঠালেন এবং তাকে 'আমীনুল উম্মাহ' বা 'উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি' খেতাবে ভূষিত করেন। হযরত আবু উবায়দা কর আদায়ের সাথে সাথে ঐ এলাকায় ইসলামী দাওয়াতের বিস্তৃতির জন্যও সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। ফলে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, নাজরানের অধিবাসীরা দুটো প্রধান প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল ঃ খৃষ্টান ও উম্মী (নিরক্ষর)। খৃষ্টানরা রাজনৈতিক আনুগত্যের অংগীকার দিয়ে নিষ্পত্তি করে। কিন্তু উম্মীরা ইসলাম গ্রহণ করে। সম্ভবত প্রথম প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরীর শেষ ভাগে এবং ২য় প্রতিনিধি দল ১০ম হিজরীর প্রথম ভাগে এসেছিল।

১৩. বনু আসাদের প্রতিনিধি দল

বনু আসাদ নামক গোত্রটি যাবতীয় সামরিক তৎপরতায় কোরায়েশদের সহযোগী ছিল। ৯ম হিজরীতে এই গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূল সা. এর নিকট এসে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানায়। তবে এই জানানোর ভংগীতে আরবদের স্বভাবগত দাম্ভিকতার কিছু রেশ ছিল। তারা খানিকটা কৃতিত্ব প্রদর্শনের ভংগীতে রসূল সা. কে বললো, "আপনি তো কোন প্রচারক দল আমাদের কাছে পাঠাননি। আমরা আপনা থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।" এই মনোভাব রদ করার জন্য রসূল সা. এর কাছে ওহি এল ঃ "নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে একটা অনুগ্রহ হিসাবে আমার কাছে পেশ করোনা। বরঞ্চ এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে ইসলামের পথে চালিত করেছেন।" তারপর এই প্রতিনিধি দল পাখি দ্বারা ভাগ্য জানা ও ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা এবং পাথর নিক্ষেপ করে পণ্য চিহ্নিত করা (অর্থাৎ মূল্য নির্ধারণের পর নেতা কর্তৃক দূর থেকে পণ্য বা জিনিসের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং যে পণ্যটির গায়ে পাথর লাগে, সেটিকে নিজের জন্য মনোনীত করা) সম্পর্কে ইসলামের বিধান জানতে চায়। রসূল সা. এ সবের বিরোধিতা করেন। সবার শেষে তারা জানতে চায়, চিঠি লেখা জায়েজ কিনা? রসূল সা. বললেন, এটা তো কোন একজন নবীই চালু করেছেন। এর চেয়ে ভালো বিদ্যা আর কি হতে পারে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফত আমলে এই গোত্রের তালহা বিন খুয়াইলিদ নামক এক ব্যক্তি মিথ্যা নবুয়তের দাবী তুলেছিল।

১৪. বনু ফাযারার প্রতিনিধি দল

বনু ফাযারা একটা শক্তিশালী ও অহংকারী গোত্র ছিল। এই গোত্রেরই সদস্য উয়াইনা বিন হিসন একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে রসূল সা. এর তবুক থেকে ফেরার পথে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করে। রসূল সা. তাদের কাছে এলাকার সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তারা জানায়, দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। দুর্ভিক্ষের দরুন ফসল, গবাদিপশু, বাগবাগিচা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং শিশুরা অপুষ্টিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। তারা রসূল সা. এর কাছে দোয়া চাইলো। রসূল সা. বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং দোয়া কবুল হলো।

১৫. বনু আমেরের প্রতিনিধি দল

এটি ছিল আরবের প্রখ্যাত গোত্র কায়েস আইলানের শাখা। এদের তিনজন নামকরা সরদার ছিল ঃ আমের বিন তুফায়েল, আরবাদ বিন কায়েস এবং জাব্বার বিন সালমা। এই তিন সরদারের মধ্যে প্রথম দু'জন ছিল পদলোভী। বিশেষত আমের আগেই নানা রকমের দুষ্কর্মের সাক্ষর রেখেছে। এবারও তারা রসূল সা. কে হত্যা করার এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র পাঁকিয়ে এসেছিল। প্রতিনিধিদল রসূল সা. এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে "সাইয়েদুনা" (আমাদের প্রভু) বলে সম্বোধন করলো। রসূল সা. তার কথা বলার এই ভংগীর বিরোধিতা করে বললেন, "সাইয়েদ বা প্রভু শুধু আল্লাহ, আর কেউ নয়।" এরপর তারা আরো কিছু চাটুকার সুলভ কথাবার্তা বললে রসূল সা. পুনরায় সতর্ক করে বললেন, "কথা বলার সময় আমাদের সাবধান থাকা উচিত যেন শয়তান আমাদেরকে বিপথগামী করতে না পারে। চাটুকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করার কত সযত্ন প্রয়াস। আমের বিন তোফায়েল রসূল সা. এর আন্দোলনকে নিছক ক্ষমতা লাভের রাজনীতি ও সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টা বলে মনে করেছিল। এ জন্য তারা যথারীতি দরকষাকষি করার জন্য শর্ত দিলঃ

১. আপনি বেদুঈনদের ওপর শাসন চালাবেন আর আমাকে শহরে শাসন চালাতে দেবেন।

২. নচেত, আপনার পরে আমাকে শাসক নিয়োগ করুন।

৩.অথবা আমি গিতফানকে সাথে নিয়ে মদিনায় হামলা চালাবো।

আমের আরবাদকে বলেই রেখেছিল যে, আমি মুহাম্মাদ সা. কে কথায় মশগুল রাখবো, তুমি সুযোগ বুঝে কাজ সমাধা করবে। কিন্তু রসূল সা. এর ভাবগাম্ভীর্যের প্রভাবে সে হতভম্ব হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। উভয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। রসূল সা. উভয়ের মনের ভাব বুঝতে পেরে দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! ওদের ক্ষতি থেকে বাঁচাও।" এর অনতিকাল পরেই আমের প্লেগের কবলে পড়ে মারা যায় এবং আরবাদ বিন কায়েস বজ্রাঘাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

১৬. বনু আযরা গোত্রের প্রতিনিধি দল

নবম হিজরীর সফর মাসে এই গোত্রের বারো ব্যক্তি রসূল সা. এর দরবারে উপস্থিত হয়। হামযা বিন নোমান এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেঃ "আমরা আযরার বংশধর। মায়ের দিক থেকে আযরা ছিল কুসাই এর ভাই।" রসূল সা. পরম আনন্দের সাথে তাদের "আহলান ওয়া সাহলান" বলে স্বাগত জানালেন। তারা সবাই সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করলো। রসূল সা. তাদেরকে সুসংবাদ শুনালেন, সিরিয়ায় রোম সাম্রাজ্যের রাজত্ব বিলুপ্ত হবে এবং হিরাক্লিয়াস পালিয়ে যাবে। রসূল সা. তাদেরকে জ্যোতিষীদের নিকট থেকে ভবিষ্যতের খবর জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করলেন এবং একমাত্র হযরত ইবরাহীমের শেখানো কুরবানী ছাড়া অন্য সমস্ত কুরবানী পরিত্যাগ করতে বললেন। যাওয়ার সময় প্রতিনিধি দলকে রীতি মোতাবেক পাথেয় দেন।

১৭. বাল্লী গোত্রের প্রতিনিদি দল

এই গোত্রের বসতি এলাকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই গোত্রের প্রতিনিধিরা তাদের নেতা রুয়াইফি বিন ছাবেতের সাথে রসূল সা. এর কাছে

এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা মদিনায় তিন দিন অবস্থান করে। অতপর রওনা দেয়ার সময় রসূল সা. তাদেরকে খেজুর ও পথখরচ দেন।

১৮. কান্দা গোত্রের প্রতিনিধি দল

এটি ইয়ামান অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। এই গোত্রের ৬০ বা ৮০ ব্যক্তি মূল্যবান রেশমী কাপড় পরে হযরত আশায়াস বিন কায়েসের নেতৃত্বে মদিনায় পৌঁছে। রসূল সা. তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি মুসলমান হয়ে গিয়েছ? তারা জবাব দিল, হাঁ। রসূল সা. বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তাহলে এই রেশম পরে এসেছ কেন? প্রতিনিধিদল তৎক্ষণাৎ রেশমের পোশাকগুলো খুলে ফেলে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ঈমানী দৃঢ়তার দুর্লভ দৃষ্টান্ত পেশ করলো।

১৯. আয্দ গোত্রের প্রতিনিধি দল

বনু আয্দ গোত্রও ইয়ামানের অধিবাসী ছিল। সারদ বিন আব্দুল্লাহ আযদীর নেতৃত্বে তাদের দল রসূল সা. এর দরবারে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত সারদ গোত্রের আমীর নিযুক্ত হন।

২০. জারশের প্রতিনিধি দল

ইয়ামানের অধিকাংশ এলাকা তখন ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী লোকও ছিল। জারাশ শহরটিও ছিল বিদ্রোহীদের দখলে। হযরত সারদ আযদীর নেতৃত্বে একদল মুসলিম বাহিনী দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ আরোপ করে বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করে। জারাশ মুসলিম বাহিনীর দখলে আসার পর তার প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে।

২১. হামাদানের প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দল একশো বিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মালেক বিন নামত, আবু সাওর, মালেক বিন আনফা সালমানী, উমায়ের বিন মালেক খারেকী (অথবা আমর ইবনে মালেক) এবং যিমাম বিন মালেক প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালেক বিন নাম্ত রসূল সা. এর দরবারে কবিতা পাঠের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করেন। রসূল সা. তাঁকেই গোত্রের মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করেন। হামাদান অঞ্চলে প্রথমে হযরত খালেদকে দাওয়াতী অভিযানে পাঠানো হয়। কিন্তু ৬ মাস পর্যন্ত কোন সাফল্য আসেনি। এরপর রসূল সা. একটা চিঠি দিয়ে হযরত আলীকে পাঠান। হযরত আলী সেখানে গিয়ে জনসমাবেশে চিঠিটা পড়ে শোনান। লোকেরা তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী একটা চিঠির মাধ্যমে রসূল সা. কে এ বিবরণ লিখে জানালে তিনি সিজদায় গিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং মাথা তুলে বলেন, "আসসালামু আলা হামাদান।" (হামাদানের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।)

২২. ফারওয়া জুযামীর দূতের আগমন

ফারওয়া ছিলেন মুয়ান অঞ্চলের রোম সাম্রাজ্য কর্তৃক নিযুক্ত গবর্ণর। এখানে সিরিয়া ও আরব উভয় অঞ্চলের অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে তিনি

নিজের পদ ও জীবন উভয়কে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে ইসলামে প্রবেশ করেন। একজন দূত পাঠিয়ে রসূল সা. কে নিজের ইসলাম গ্রহণের খবরও জানান এবং রসূল সা. কে একটা সাদা খচ্চর উপহার পাঠান। রোম সরকার এ খবর জানার পর তাকে গ্রেফতার করে আফরা নামক স্থানে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। আল্লাহ তার এই বান্দাকে এমন মজবুত ঈমান দিয়েছিলেন যে, তিনি গবর্ণরের আসনে থেকে উঠে হাসতে হাসতে হাসতে শূলের কাষ্ঠে গিয়ে দাঁড়ান।

২৩. তুজীব গোত্রের প্রতিনিধি দল[৩]

এটা ইয়ামানের কান্দা গোত্রের একটা শাখা। এরা আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলামের দাবী অনুসারে জীবন গড়ে তুলছিল। তেরো ব্যক্তির এক প্রতিনিধি দল যাকাতের সম্পদ ও পশু সাথে নিয়ে মদিনায় আসে। তারা এসে বলে, আমাদের সম্পদে আল্লাহর যে অংশ রয়েছে, তা নিয়ে এসেছি। রসূল সা. বললেন, এ সব সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং এলাকার লোকদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তারা বললো, স্থানীয় লোকদেরকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট রয়েছে, সেটাই নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রা. স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, "হে রাসূল! তুজীবের প্রতিনিধি দলের মত আরবের আর কোন প্রতিনিধি দল আসেনি। রসূল সা. বললেন, "হেদায়াত আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। তিনি যার জন্য কল্যাণ চান তার মন ঈমান দিয়ে ভরে দেন।"

তারা রসূল সা. এর কাছে কিছু প্রশ্ন উথাপন করলো এবং তার লিখিত জবাব নিয়ে গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গেল।

এই দলে বনী উবদীর এক যুবক ছিল। প্রতিনিধি দল তাকে নিজেদের জিনিসপত্র ও পশুদের তদারকীতে নিয়োজিত রেখে গিয়েছিল। রসূল সা. তাকে বিশেষভাবে ডাকেন। সে বললো, আমার শুধু একটাই অনুরোধ, আপনি আমার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। রসূল সা. তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করলেন। পরবর্তীকালে যখন ইয়ামানে ইসলাম পরিত্যাগের হিড়িক পড়ে, তখন এই যুবক তার সমগ্র গোত্রকে ইসলামের ওপর সামাল দিয়ে রাখে।

রসূল সা. এই দলকেও উপহার স্বরূপ প্রত্যাবর্তনের পথখরচ দেন।

২৪. বনু সা'দ হুযাইমের (কুযায়া) প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের কয়েক ব্যক্তি একটি প্রতিনিধি দলের আকারে রসূলের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলের নির্দেশে হযরত বিলাল এই দলকে পথখরচ হিসেবে কিছু রূপো উপহার দেন। তাদের ফিরে যাওয়ার পর সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

২৫. বাহরা গোত্রের প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণ

এটাও ইয়ামান অঞ্চলের একটা গোত্র ছিল। তেরো ব্যক্তির একটা দল মদিনায় এসে

---

৩. এই গোত্রেরই এক দুষ্কৃতিকারী কিনানা বিন বিসর হযরত ওসমানের খুনী ছিল। এই নামেরই কাছাকাছি আরেকটি গোত্রের নাম তাজওয়াব, যা হিময়ার রাজবংশোদ্ভুত। হযরত আলীর খুনী ইবনে বিলহাম এই শেষোক্ত গোত্রের লোক।

ইসলাম গ্রহণ করে। কয়েক দিন অবস্থান করে ইসলামের বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পর তারা ফিরে যায়। তাঁদেরকেও রীতি মোতাবেক পথখরচ দেয়া হয়।

২৬. যী মাররা গোত্রের প্রতিনিধি দল

সরদার হারেস ইবনে আওফের নেতৃত্বে এই গোত্রেরও ১৩ জন মদিনায় পৌছে। তারা নিজেদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে রসূল সা. কে জানায়, আমরা লুয়াই বিন গালেবের বংশধর এবং আপনার সাথে আমাদের বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। রসূল সা. তাদের কাছে তাদের এলাকার অবস্থা জানতে চান। তারা সেখানকার দুর্ভিক্ষের এক করুণ চিত্র তুলে ধরে এবং তাঁর দোয়া চায়। রসূল সা. তৎক্ষণাৎ দোয়া করেন। গোত্রে ফিরে গিয়ে তারা জানতে পারে যে, রসূল সা. যেদিন দোয়া করেছেন, ঠিক সেই দিনই বৃষ্টি হয়েছিল, এবং যমীন শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য তারা কয়েকদিন মদিনায় থাকেন এবং তারপর বিদায় হন। তাদেরকে পথখরচ দেয়া হয়।

২৭. খাওলান গোত্রের প্রতিনিধিদল

দশ ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত এ প্রতিনিধি দলটি আগেই ঈমান এনে পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে রসূল সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়। জাহেলিয়ত যুগে তারা "আম্মে উন্স" নামক দেবতার পূজো করতো। তারা জানায়, এখন শুধু প্রবীণ লোকেরা ঐ দেবতার পূজো করে। তারা গিয়েই ঐ দেবমূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে। অতীতে এই দেবতার নামে কত বড় বড় কুরবানী দেয়া হতো এবং কী কী অনুষ্ঠান করা হতো, তাও তারা জানায়। অবস্থানকালে তারা ইসলামী জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে। বিদায়কালে তাদেরকে পথখরচ দেয়া হয়।

২৮. মোহারেব গোত্রের প্রতিনিধি দল

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ গোত্রটি অত্যন্ত বদমেযাজী ও অসচ্চরিত্র ছিল। প্রাথমিক যুগে যখন রসূল সা. গোত্রে গোত্রে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, তখন এই গোত্রের কাছেও দাওয়াত পৌছান। কিন্তু তারা অত্যন্ত অশোভন আচরণ করে। দশ ব্যক্তি সমন্বিত একটি দল তওবা করে রসূল সা. দরবারে হাজির হয়। এক সমাবেশে একবার রসূল সা. এক ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পেরে তার দিকে অভিনিবেশ সহকারে তাকালেন। লোকটি বুঝতে পারলো এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে বললো, "হে রসূল, আপনি বোধহয় আমাকে চিনে ফেলেছেন। উক্কায বাজারে আপনি একবার আমার সাথে দেখা করেছিলেন। আমি তখন আপনার সাথে খুবই অন্যায় আচরণ করেছিলাম এবং আপনার দাওয়াত খুবই অশোভন পন্থায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। হে রসূলুল্লাহ! আমার সাথীদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে আপনার কট্টর দুশমন ছিল না। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমাকে ঈমান ও আনুগত্যের তওফীক দিয়েছেন।" অতপর সে রসূল সা. কে তার পূর্ববর্তী জীবনের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার অনুরোধ জানায়। রসূল সা. বললেন, "ইসলাম গ্রহণের ফলে কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"

২৯. গাসসান গোত্রের প্রতিনিধি দল

গাসসান যদিও বংশগতভাবে আরব গোত্র ছিল। কিন্তু খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করার কারণে রোম

সম্রাটের পক্ষ থেকে আরব অঞ্চলের ওপর শাসন চালাতো। ১০ম হিজরীতে এই গোত্রের তিন ব্যক্তি মদিনায় এসে রসূল সা. হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা জানায়, আমাদের গোত্রের লোকেরা বর্তমানে যে পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, তা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবেনা। রসূল সা. তাদেরকে পথখরচ দিয়ে বিদায় করলেন। তারা গিয়ে আবার দাওয়াত দিল। কিন্তু তাও বিফলে গেল। তিনজনই পরিস্থিতির চাপে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা গোপন রাখলেন। এদের একজন ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় হযরত আবু উবাইদার সাথে সাক্ষাত করেন এবং ইসলামের ওপর নিজের অবিচল আস্থার কথা ব্যক্ত করেন। অন্য দু'জন তার আগেই মারা গিয়েছিলেন।

৩০. সালামান গোত্রের প্রতিনিধি দল

হাবীব ইবনে ওমর সহ এ গোত্রের সাত ব্যক্তি সমন্বিত প্রতিনিধি দল মদিনায় আগমন করে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে রসূল সা. বলেন, সময়মত নামায পড়া সর্বোত্তম সৎ কাজ। তারাও দুর্ভিক্ষাবস্থার বর্ণনা দিয়ে দোয়া চায়। রসূল সা. দোয়া করেন। পরে জানা যায় যে, তাদের অঞ্চলে ঐ দিনই বৃষ্টি হয়েছিল।

৩১. বনী ঈস গোত্রের প্রতিনিধি দল

এরাও ছিল ইয়ামান অঞ্চলের লোক। তাদের গোত্রও এসেছিল দশম হিজরীতে। তারা প্রশ্ন করলো ঃ "আমরা ইসলাম প্রচারকদের কাছ থেকে শুনেছি, যে হিজরত করেনা তার ইসলাম কবুল হয় না। আমাদের অবস্থা এই যে, গৃহপালিত পশু আমাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। ওগুলো সাথে নিয়ে হিজরত করা কঠিন। তাই হিজরত যদি করতেই হয় তবে আমরা ওসব বিক্রি করে চলে আসি।" ঈমানী জযবা ও প্রেরণা দেখুন যে, একটু ইশারা করলেই নিজেদের জন্মভূমি ও সহায় সম্পদ ছেড়ে চলে আসতে প্রস্তুত। রসূল সা. বললেন, যেখানে থাক, আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক। প্রাথমিক যুগে যখন ইসলামের কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও সারা দেশে দাওয়াতের কাজ করার জন্য লোক তৈরীর প্রয়োজন ছিল, তখন হিজরত করে কেন্দ্রে চলে আসা ফরয করা হয়েছিল। সে স্তর পার হয়ে গেছে। এখন আন্দোলনের শক্তি সারা দেশে ছড়িয়ে থাকুক এবং নিজ নিজ এলাকায় দাওয়াতের বিস্তৃতি ঘটুক—এটা কাম্য বিধায় হিজরত এখন আর জরুরী নেই। এই দ্বিতীয় যুগটার সাথেই এই নির্দেশ যুক্ত যে, "বিজয়ের পর আর হিজরতের আবশ্যকতা নেই।"

৩২. গামেদ গোত্রের প্রতিনিধি দল

দশম হিজরীতে গামেদ গোত্রের দশ ব্যক্তি সম্বলিত প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। তাদেরকে কোরআন শেখানোর জন্য রসূল সা. উবাই ইবনে কা'বকে নির্দেশ দেন। তারপর তাদেরকে পথখরচ দিয়ে বিদায় দেন।

৩৩. বনুল মুনতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি দল

এই গোত্র থেকে নাহীক বিন আসেম ও লাকীত বিন আমের নামক প্রতিনিধিদ্বয় মদিনায় আগমন করে। তারা যখন মসজিদে নববীতে আসে, তখন রসূল সা. খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা শেষ হলে লাকীত দাঁড়িয়ে কেয়ামত ও বেহেশ্ত দোজখ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে।

রসূল সা. তার বিশদ জবাব দেন। তারপর নবীগণ ও পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নও সে করে। গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রসূল সা. রাখেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি সরাসরি বলেন, অদৃশ্য জ্ঞান শুধু আল্লাহই রাখেন।

৩৪. আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল

আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রথম প্রতিনিধি দলের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, যারা ৫ম হিজরীতে এসেছিল। এই গোত্রের দ্বিতীয় দল মদিনায় এসেছিল দশম হিজরীতে। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

৩৫. তারেক বিন আব্দুল্লাহ ও তার সাথী

তারেক বিন আব্দুল্লাহ ইতিপূর্বে একবার আলমাজায বাজারে রসূল সা. কে ইসলামের দাওয়াত দিতে দেখেছিলেন। তখন তাঁর পিছে পিছে তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব ছুটছিল আর লোকদেরকে বলছিল, "তোমরা ওর কথা শুননা। ও মিথ্যাবাদী" (নাউযুবিল্লাহ)। এই তারেক বিন আব্দুল্লাহ পরবর্তীকালে রাবযা থেকে কয়েকজন সাথী নিয়ে খেজুর কিনতে মদিনায় এল। তারেকের অবস্থান স্থলের কাছ দিয়ে রসূল সা. যাচ্ছিলেন। তিনি তারেকের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। অতপর খেজুরের বিনিময়ে তার কাছ থেকে একটা উট কিনে নিলেন। ওয়াদা করে এলেন যে, উটের মূল্য বাবদ খেজুর শীগগীর পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে তারেক ও তার সাথীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল যে, না জেনে শুনে বাকীতে উট দিয়ে দিলাম। দাম পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। তারেকের কাফেলার সহযাত্রী জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা বললেন, "এই ব্যক্তির উজ্জ্বল চেহারা আমি দেখেছি। সে কখনো ধোকাবাজ হতে পারেনা। সে যদি উটের দাম না দেয় তবে আমি দাম দিয়ে দেব।" কিছুক্ষণ পরই এক ব্যক্তি খেজুর নিয়ে এল। সে উটের দাম বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর আলাদা এবং উপহার স্বরূপ আরো কিছু খেজুর আলাদাভাবে দিল। এভাবে রসূল সা. কাফেলার মন জয় করে ফেললেন। পরে তারা যখন শহরে এল, তখন রসূল সা. মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং সদকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। এভাবে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পথ সুগম হয়ে গেল।

৩৬. বনু যুবায়েদ গোত্রের প্রতিনিধি আমর বিন মাদীকারাব

বনু যুবায়েদ গোত্র যখন ইসলাম সংক্রান্ত প্রচারনা শুনতে পেল, তখন তারা তাদের সরদার আমর বিন মাদীকারাবের কাছে গিয়ে বললো, "আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, হেজাযে মুহাম্মাদ সা. নামক এক ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছে। আপনি গিয়ে একটু খোঁজ নিন। দেখুন খবরটা সত্যি নাকি মিথ্যে। সে যদি আপনার মতে যথার্থ নবী হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সবাই তার ওপর ঈমান আনবো। আমর বিন মাদীকারাব এল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। তবে রসূল সা. এর ইন্তিকালের পর সে মুরতাদ হয়ে যায়।

৩৭. হিময়ার রাজবংশের দূত

হিময়ার ছিল একটা রাজ পরিবার। তার পক্ষ থেকে জনৈক দূত একটা চিঠি নিয়ে এল। এই চিঠিতে হারস বিন আবদ কিলাল, নঈম বিন আবদ কিলাল, নোমান যুরুয়াইন, মায়াফির ও হামদানের ইসলাম গ্রহণের খবর লেখা ছিল। রসূল সা. এই চিঠির বিস্তারিত

জবাব লিখে একটা চিঠি হিমিয়ারের রাজ পরিবারের নামে পাঠালেন। এতে তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও বিধানসমূহ লিখে দিলেন। মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা ও অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ লিপিবদ্ধ করলেন। তা ছাড়া জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থন করে লিখলেন, যারা ইহুদী বা খৃষ্টান থাকতে চায় তাদের ধর্ম বলপ্রয়োগে পাল্টানো যাবেনা। চিঠিতে এ কথাও লিখলেন যে, 'যুরয়া যী ইয়াযানের নিকট আমাদের প্রতিনিধি মুয়ায্ বিন জাবাল, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ, মালেক বিন উবাদা, উকবা বিন নামার, মালেক বিন মুররা ও আরো কিছু লোক পাঠানো হচ্ছে। এই দলের নেতা মুয়ায বিন জাবাল। এই দল আমার নির্দেশ পৌছাবে এবং যাকাত ও জিযিয়া আদায় করে নিয়ে আসবে।"

৩৮. নিখা গোত্রের প্রতিনিধি দল

নিখাও ইয়ামানেরই একটা গোত্র। অধিকাংশ বর্ণনা মোতাবেক এটা সর্বশেষ প্রতিনিধি দল, যা একাদশ হিজরীর মুহাররম মাসে মদিনায় আসে। এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দুইশো। আসলে এরা সবাই হযরত মুয়ায্ ইবনে জাবালের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূলের সা. সাথে সাক্ষাতের দুর্বার আকাংখার কারণে তারা মদিনায় আসে। এখানে এসে তারা রসূল সা. এর কাছে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের রিপোর্ট দেয়। দলের জনৈক সদস্য নিজের কিছু স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞেস করে এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর ফিরে যায়।

উল্লিখিত প্রতিনিধি দলগুলো এমন ধারাবাহিকভাবে এবং এত বিপুল সংখ্যায় আসতে থাকে যে, তা থেকে সূরা নাসরের "আল্লাহর দ্বীনে লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে" এই আয়াতাংশের প্রকৃত মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। আসল ব্যাপার এই যে, মানুষ মাত্রই ইসলামের প্রতি স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত ঝোঁক অনুভব করে থাকে। তদুপরি রসূল সা. কোরআনের অতুলনীয় ও অকাট্য যুক্তি এবং মনমগজ দখলকারী বাচন ভংগীর মাধ্যমে ইসলামকে তুলে ধরেছিলেন। তার পাশাপাশি তিনি নিজের পবিত্র জীবন ও বাস্তব চরিত্র দ্বারা ইসলামের সত্যতার এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেশ করেছিলেন যে, মানুষ তাতে দীক্ষিত ও প্রভাবিত না হয়েই পারেনি। সাধারণ মানুষের সামনে ইসলাম গ্রহণের পথে একটা বাধাই অবশিষ্ট ছিল। সেটা হলো সাবেক জাহেলী নেতৃত্ব। এই বাধা অপসারিত হওয়ার পর যখন সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, মদিনার ইসলামী শক্তি একটা অজেয় শক্তি এবং তা দ্বারা মানব জাতির কোন অকল্যাণ সংঘটিত হবার ভয় নেই, বরং প্রতিনিয়ত নিরেট কল্যাণই সাধিত হচ্ছে, তখন সত্য ও ন্যায়ের জন্য তাদের বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারা নিজেদের ভেতর থেকেই সত্যের এই আলোয় অবগাহনের তীব্র পিপাসা অনুভব করলো। আর এই পিপাসায় অস্থির হয়েই মদিনার দিকে ছুটলো এবং সেখান থেকে তারা আপন পিপাসা নিবৃত করলো।

এভাবেই চারদিকে আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়লো এবং অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

আন্তর্জাতিক দাওয়াতের সূচনা

রসূল সা. এর হাতে গড়া যে দলটি ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, তার কর্মক্ষেত্র শুধু দেশীয় ও জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং তা এমন

'খায়রা উম্মাহ' বা শ্রেষ্ঠ দল ছিল, যাকে সারা পৃথিবীর ও সর্বকালের 'মানিবজাতির কল্যাণার্থে' আবির্ভূত করা হয়েছিল, এবং যাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সাক্ষী বানানো হয়েছিল। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে সত্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ ও সৌভ্রাতৃত্বের বিধান বাস্তবায়নের পথ প্রদর্শক বানানো হয়েছিল। শুধু আরবদের সংস্কার সংশোধন এবং তাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘবদ্ধ করাই তাঁর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ লক্ষ্য ছিলনা, বরং তার লক্ষ্য ছিল একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং যাবতীয় উপায় উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সারা পৃথিবীর সকল জাতি ও দেশকে ইসলামী বিধান বাস্তবানের আহ্বান জানানো। ঐ রাজতান্ত্রিক যুগে আল্লাহর যে কোটি কোটি বান্দা ছোট ছোট শ্রেণী ও পরিবারের গোলামীর যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল, যাদের না ছিল বিচার স্বাধীনতা, না ছিল অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, এবং না ছিল কোন রাজনৈতিক অধিকার। তাদের নির্যাতিত নিস্পেষিত অবস্থা সম্পর্কে কোন সংস্কারমূলক আন্দোলন কিভাবে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে। পারস্য সম্রাটের কাছে লেখা চিঠিতে রসূল সা. নিজেই স্বীয় দাওয়াতের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলকে এই বলে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, "আমি সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আল্লাহর প্রেরিত দূত বা রসূল।"

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা রাজতন্ত্র ও ধর্মীয় পুরোহিতদের হাতে অসংখ্য আঞ্চলিক জাতি সত্তায় বিভক্ত মানবতার জন্য আন্তর্জাতিক যুগের উদ্বোধন খোদ রসূল সা. এর হাতেই করিয়েছেন। একটি মাত্র সত্য ও ন্যায়ের কলেমা সমস্ত ভৌগলিক, বংশীয়, ভাষাগত ও রাজনৈতিক বিভাজনকে উপেক্ষা করে অতি দ্রুত গতিতে সমকালীন সুসংবদ্ধ দুনিয়ার তিনটে মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদ সা. কে ঠিক এমন সময় এই আন্তর্জাতিক দাওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে, যখন বারুদ, ছাপাখানা ও বাষ্পীয় শক্তির আত্মপ্রকাশের দিন খুব বেশী দূরে ছিল না। সমগ্র পৃথিবী নতুন উপায় উপকরণের বলে একটা শহরে পরিণত হতে যাচ্ছিল। পাঁচ সাতশো বছর বিশ্ব ইতিহাসের বিশাল অঙ্গনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। রসূল সা. এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার মাত্র কয়েক শতাব্দী পর বস্তুগত দিক দিয়ে দুনিয়ার সীমান্তগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছিল। এই সময়টার আগমনের উপযুক্ত সময় পূর্বে ইসলামের সত্য বিধান কায়েমের আন্তর্জাতিক দাওয়াত প্রচারিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মানব জাতি ক্রমশ বস্তুগতভাবে যতই পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর হবে, মানসিক, আদর্শিক ও নৈতিক দিক দিয়েও ততই এক সূত্রে গ্রোথিত হতে থাকবে। মধ্যবর্তী এ সময়টা দাওয়াতের সম্প্রসারণ এবং বিশ্বের জাতিগুলোকে নতুন যুগের জন্য প্রস্তুত করার ব্যাপারে যথেষ্ট হতোনা। এ কথা সত্য বটে যে, আন্তর্জাতিক যুগের ধারা সে সময় মুসলিম বিপ্লবী শক্তির আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়ে বস্তুবাদী শক্তির খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। কেননা ইসলামী শক্তি তখন পর্যন্ত ইতিহাসে নিজের একটা প্রভাবশালী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখলেও তার বিপ্লবী দাওয়াতের তেজ ও উদ্দীপনা বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু তা সত্বেও নতুন যুগ ইসলামী আন্দোলনের কাছ থেকে পেয়েছিল মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মানবিক সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী জ্ঞানবিজ্ঞানের যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি, প্রকৃতিকে জয় করার বাসনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও অধিকারকে সম্মান প্রদর্শন, মতামত প্রকাশ ও কথা বলার

স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, ন্যায় বিচারের মৌলিক নীতিমালা এবং আরো কিছু উচ্চতর মূল্যবোধ। এসব জিনিস বস্তুবাদী মানসিকতার আওতায় এসে বিকৃতি ও অস্পষ্টতার শিকার হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় ভালো ও কল্যাণের যেটুকু পাওয়া যায়, সেটুকু বিশ্বমানবতার করুণা রসূল সা. এরই অবদান। কোন কোন সত্যনিষ্ঠ প্রাচ্যবাদী লেখকও এ কথা স্বীকার করেছেন।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলন নিজের মৌলিক প্রকৃতি অনুসারেই দাবী জানায় যে, তার দাওয়াত আরবের চতুসীমায় বন্দী না থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। সাথে সাথে এটা একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে যে, ইসলাম আরবের বাইরেও বিস্তৃতি লাভ করুক। অন্যথায় আরবে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটা সরকারের নিরাপদে টিকে থাকাই সম্ভব ছিলনা। কেননা সে ক্ষেত্রে একটা ইসলামী রাষ্ট্রকে চারদিক থেকে অনৈসলামী রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকতে হতো। বিশেষত রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্য সব সময় আরব ভূখণ্ডের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিত। কিছু কিছু আরব ভূখন্ড তাদের দখলে ছিল এবং কতিপয় আরব গোত্রকে তারা কিনে নিয়ে ব্যবহারও করতো। আর রোম সরকারের সাথে তো মদিনার সংঘর্ষও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

রসূল সা. ইসলামী আন্দোলনকে যে দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যান, তা আমাদের জন্য বিস্ময়কর। মাত্র ১৩ বছরে প্রাথমিক দাওয়াত দিয়ে আন্দোলন পরিচালনাকারী কর্মী বাহিনী তৈরী করার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেন। তারপর কার্যত ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন করেন আট বছরে। তারপর নিজ জীবনেই বাকী ২ বছরে আশপাশের রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যগুলোর কাছেও দাওয়াত পৌছিয়ে দেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত হোদায়বিয়ার সন্ধি দেশের ভেতরকার সংঘাত ও সংঘর্ষগুলো থেকে তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে আরবের বাইরেও দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দেয়। ৭ম হিজরীর ১লা মুহাররম উমরাতুল কাযা সম্পন্ন করার অব্যবহিত পর রসূল সা. দূতের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর শাসকদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। আজকের যুগে এটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে হয় যে, রসূল সা. অন্যান্য দেশের জনগণের পরিবর্তে শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন কেন। এর কারণ সুস্পষ্ট। সে যুগের রাজা বাদশাহদের সামনে প্রজাদের আদৌ কোন অধিকার ছিল না। তাদের এমন কোন মৌলিক স্বাধীনতা ছিলনা, যাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। তাছাড়া ঐসব রাজা বাদশাহ এমন সুযোগ দিতে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলনা যে, ভিন্ন দেশের লোকেরা এসে তাদের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে তাদের বর্তমান ধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রচলিত ধর্মমতের ওপর। তারা ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতা নিয়েই দেশ শাসন করতো। তাছাড়া যেখানে শুধু ধর্মের পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের সার্বিক পরিবর্তন কাম্য, মানুষের রুচি, মানদন্ড, মূল্যবোধ সবকিছুই যেখানে পাল্টে যাওয়ার আশা করা হয় এবং ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে যেখানে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করত নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী আকাংখ্যা জাগিয়ে তোলা হয়, সেখানে রাজা বাদশাহরা তাদের প্রজাদের মধ্যে নীরবে ইসলাম বিস্তারের সুযোগ দেবে এটা কিভাবে সম্ভব? সেকালের রাজতান্ত্রিক

শাসকরা পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন প্রভু হয়ে বসেছিল এবং তাদের অনুমতি ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়তে পারতোনা। এ কারণেই রসূল সা. সরাসরি শাসকদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং দাওয়াতী চিঠিগুলোতে তাঁদেরকে তাদের জনগণের প্রতিনিধি আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর জনগণের ভালো মন্দের দায় দায়িত্ব অর্পণ করতেন। বিভিন্ন রাজা মহারাজাকে রসূল সা. সংশ্লিষ্ট জাতির 'নেতা' বলে সম্বোধন করতেন। পারস্যের সম্রাটকে ও মুকাওকিসকে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, "তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তোমার সমগ্র জাতির পাপের ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।"

রাজা বাদশাহদেরক চিঠি লিখতে গিয়ে একদিকে তিনি যেমন প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলতেন, অর্থাৎ সিল মারার জন্য আংটি তৈরী করান এবং তাতে "মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ" শব্দটা খোদাই করান। অপরদিকে তেমনি নিজের একটা স্বতন্ত্র রীতি ও পদ্ধতি চালু করেন। প্রত্যেক চিঠি "বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম" দিয়ে শুরু করতেন। অতএব প্রেরক হিসাবে নিজের নাম এবং যাকে চিঠি পাঠান তার নাম লেখাতেন। অতপর ন্যূনতম, অত্যন্ত মাপাজোপা ও সতর্ক ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতেন। সেই যুগের প্রেক্ষাপটে যে কূটনৈতিক ভাষা তিনি চিঠির জন্য অবলম্বন করেন, তা রসূল সা. এর মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরে যে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। যেমন এই সব চিঠিতে তিনি অতি সংক্ষেপে এই বাক্যটি ব্যবহার করেন যে, "ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে।" এর আরো একটা অর্থ এই হয় যে, আনুগত্য কর, শান্তি পাবে। 'শান্তি পাবে' কথাটার তাৎপর্য এই যে, এটাই শান্তির একমাত্র পথ বা উপায়। এর অন্য একটা তাৎপর্য এমন যে, তার ভেতরে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। অর্থাৎ যদি ইসলাম গ্রহণ না কর বা আনুগত্য না কর, তাহলে তোমার বিপদ আছে। মাত্র দুটো শব্দ। অথচ তা কত ব্যাপক অর্থবোধক। অনুরূপভাবে, "তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে তোমাকে সমগ্র জাতির পাপের ফল ভোগ করতে হবে।" এ কথাটাও দ্ব্যর্থবোধক। একটা হলো ধর্মীয় অর্থ এবং তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাকেই দায়ী হতে হবে। অপরটি রাজনৈতিক অর্থ এবং সেটি এই যে, এর রাজনৈতিক পরিণাম তুমি ইহকালেই ভোগ করবে। এ ধরনের দ্ব্যর্থবোধক শব্দ রসূল সা. এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন না যে, বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যাক এবং উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যা করার অবকাশ থেকে যাক (নাউযুবিল্লাহ)। বরং একই বাক্যে একই সাথে উভয় অর্থই বুঝানো হতো। এত কম শব্দ দ্বারা এত ব্যাপক অর্থ বুঝানো রসূল সা. এর 'বালাগাত' বা ভাষাগত আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। তাছাড়া তিনি প্রত্যেক শাসককে চিঠি লেখার সময় তার ধর্ম এবং তার বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে মানানসই ভাষা প্রয়োগ করতেন। একটা গৎ বাঁধা ভাষা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন না। তাছাড়া প্রত্যেক শাসকের কাছে তিনি সেই দেশের ভাষা জানে এমন দূত পাঠাতেন।[৪]

---

৪. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বাণিজ্যোপলক্ষে দেশ বিদেশ সফর করে নানা ভাষা রপ্ত করে রেখেছিলেন। আবার কাউকে কাউকে রসূল (সা) বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বিদেশী ভাষা শিখতে বলতেন।

এই সব চিঠি প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য তো ছিল ইসলামের দাওয়াত প্রদান। কিন্তু এ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রনায়কদেরকে তিনি এসব চিঠির মাধ্যমে এ কথাও বুঝিয়ে দিতেন যে, আরব তখন আর আগের মত কোন অরক্ষিত বিচরণ ক্ষেত্র নয়। বরং তা একটা সুসংবদ্ধ সরকারের অধীনে পরিচালিত দেশ, এ সরকার সব ধরনের চ্যালেঞ্জ দিতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম। এ সরকার কারো হুমকিতে বা চোখ রাঙানিতে ভয় পায়না। একটা পরাক্রান্ত, চৌকস ও সদাসতর্ক সরকার সেখানে সক্রিয় রয়েছে।

এবার আমি সংক্ষেপে বর্ণনা দিচ্ছি কিভাবে বিভিন্ন বিদেশী শাসকের নিকট দাওয়াতী চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং তার ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে।

১- আমর বিন উমাইয়া যামরীর রা. মাধ্যমে আবিসিনিয়ার রাজা আসাম (বা আসহামা) বিন আবজার নাজ্জাশীকে রসূল সা. একটা লিখিত দাওয়াত নামা পাঠান। চিঠিতে ইতিপূর্বে আবিসিনিয়ার মোহাজেরদের কথা বিশেষত হযরত জাফর তাইয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাজেরদেরকে নিরাপদে রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। অতপর তাতে স্বয়ং বাদশাহকে ও এবং তাঁর মাধ্যমে রাজার সভাসদদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

নাজ্জাশী আগে থেকেই ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হযরত জা'ফরের হাতেও তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটা চিঠিও তিনি রসূল সা. এর নিকট প্রেরণ করেন। নিজের ছেলে আরহাকে তিনি দূত বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এ কথাও জানালেন যে, রসূল সা. যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে আদেশ করেন, তবে তিনি হাজির হতে প্রস্তুত।[৫]

২- আলা বিন হাযরামীর মাধ্যমে রসূল সা. ইরান সম্রাটের করদাতা ও বাহরাইনের শাসক মুনযির বিন সাভীকে দাওয়াতনামা পাঠান। মুনযির তো ইসলাম গ্রহণ করলেনই, উপরন্তু তাঁর প্রজাদেরও একটা বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি জবাবী চিঠিতেও নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানান এবং তার প্রজাদেরও একাংশ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেন। সেই সাথে এ কথাও জানান যে, কিছু কিছু প্রজা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়না, বরং ইহুদী বা খৃষ্টান থাকতে চায়। মদিনা থেকে আবার চিঠি পাঠানো হয় যে, যারা ইহুদী ও খৃষ্টান থাকতে চায়, তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মে থাকতে দেয়া হবে। তবে তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে হবে।

৩- জীফর ও আব্দ এরা দু'জন আম্মানের বাদশাহ জীফারের ছেলে ছিলেন। আমর ইবনুল আ'সের মাধ্যমে দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। আমর ইবনুল আ'স প্রথমে ছোট ভাই আবদের সাথে সাক্ষাত করেন। আবদ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালান। তিনি তার কাছ থেকে জানতে পারেন যে, নাজ্জাশী মুসলমান হয়ে গেছেন, তথাপি তার জনগণ তাকে রাজত্ব থেকে উৎখাত করেনি এবং বিশপও পাদ্রীরাও তাকে বাধা দিতে পারেনি। এমনকি

---

৫. সম্ভবত ইনি সেই নাজ্জাশী নন, যার সামনে মোহাজেরগণ হাজির হয়েছিলেন, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং রসূল (সা) মদিনায় তার গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। আসাম তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহন করেন। যাহোক, এ ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

রোম সম্রাটও এ ঘটনা জানার পর কোন পদক্ষেপ নেননি। বরঞ্চ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের পর হিরাক্লিয়াসকে কর দেয়াও বন্ধ করেছে। সে হযরত আমর ইবনুল আসের কাছ থেকে রসূল সা. এর প্রধান প্রধান শিক্ষাও জেনে নেয়। এ আলোচনার পর আবদের মনে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জন্মে। কিন্তু সে আক্ষেপ করে বলতে লাগলো, আমার বড় ভাইও যদি ইসলাম গ্রহণে সম্মত হতো এবং আমরা দু'জনে একত্রে মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে ভালো হতো। এরপর দরবার অনুষ্ঠিত হলো। দরবারে দুই ভাই এর উপস্থিতিতেই মদিনার দূত সীল করা চিঠি খুলে দিলেন। উভয় ভাই চিঠি খুলে পড়লো। তারপর কয়েকটি প্রশ্ন করা হলো। প্রশ্নের জবাবে আমর বললেন, কোরায়েশরা বাধ্য হয়ে রসূল সা. এর আনুগত্য গ্রহণ করেছে। আর রসূল সা. এর দল এমন লোকদের নিয়ে গঠিত, যারা ভালোমত চিন্তাভাবনা করে ও বুঝে শুনে রসূল সা. এর পাশে সমবেত হয়েছে। এরপরও জীফার বাদশাহ দ্বিধান্বিত রইল। কিন্তু তাঁর দুই ছেলেই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সেই রাজ্যের বিপুল সংখ্যক প্রজাও।

৪- মুনযির বিন হারেস বিন আবু শিমার দামেস্কের খৃষ্টান শাসক ছিল। মদিনা থেকে সালীত বিন আমর দাওয়াতী চিঠি নিয়ে যায়। সেও রসূল সা. এর আন্দোলনকে দুনিয়াবী রাজনীতি মনে করে এবং শর্ত দেয় যে, ইসলামী সরকারে অর্ধেক অংশ থাকবে আমার। পরে তার আয়ুস্কাল দ্রুত কমে আসে। রসূল সা. যখন তার সম্পর্কে প্রতিবেদন পেলেন তখন বললেন, সে এক ইঞ্চি বা একটা খেঁজুর পরিমাণ জমি চাইলেও আমি তা দিতে প্রস্তুত নই। ইসলামী রাষ্ট্র যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার প্রতি ইঞ্চি পবিত্র আমানত।

৬- জারীহ বিন মিত্তা মুকাওকিস ইস্কান্দারিয়া সহ সমগ্র মিশরের খৃষ্টান রাজা ছিল। রসূল সা. তার দরবারে দূত বানিয়ে পাঠালেন হাতেব ইবনে আবি বালতায়াকে। তিনি চিঠিও পৌঁছালেন এবং কথাও বললেন। তিনি মৌখিকভাবে যে বক্তব্য রাখলেন, তা এত নির্ভিক ও বেপরোয়া ছিল যে, তা থেকে বুঝা যায়, রসূল সা. কি ধরনের বলিষ্ঠ চরিত্র ও মনমানসের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ইসলামের ছাঁচে গঠন করেছিলেন। মুকাওকিসকে সতর্ক করার জন্য হাতেব বলেন, "এই ভূখণ্ডে আগেও এক ব্যক্তি জন্মেছিল, যে আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু বলে হুংকার ছেড়েছিল। অবশেষে সে আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই ভূখণ্ডের পরবর্তী অধিপতি হিসেবে আপনাদের উচিত পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা। এমনটি হতে দেয়া উচিত নয় যে, অন্যেরা আপনাদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।" তারপর যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিয়ে বললেন, "আমরা আপনাদেরকে হযরত ঈসা আ. এরই সঠিক ও আসল ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এটা নতুন কোন ধর্ম নয়।" মুকাওকিস ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত না হলেও নবী সা. এর চিঠিকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলো এবং তাকে হাতির দাঁতের তৈরী কৌটায় রেখে কোষাগারে সংরক্ষণ করলো। তারপর রসূল সা. এর কাছে দুলদুল নামক বিখ্যাত খচ্চরসহ বেশ কিছু উপঢৌকনাদিও পাঠালো। চিঠির জবাবে সে লিখলো, আমি জানি, "শেষ নবীর আগমন এখনো বাকী। তবে আমার ধারণা, তিনি সিরিয়ায় জন্ম নেবেন।"

৭- হিরাক্লিয়াস রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সম্রাট ছিল। তার রাজধানী ছিল

কনষ্টান্টিনোপল। রসূল সা. দিহয়া বিন খলীফা কালবীকে দাওয়াতী চিঠি দিয়ে তার কাছে প্রেরণ করেন। দিহয়া বাইতুল মাকদাসে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন। হিরাক্লিয়াস মদিনার দূতের সম্মানে বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করলো এবং রসূল সা. সম্পর্কে বহু খুটিনাটি বিষয় সে জিজ্ঞাসা করলো। তাছাড়া সে আরো আদেশ জারী করলো যে, এ অঞ্চলে মক্কার আর কোন ব্যক্তি থেকে থাকলে তাকে আমার কাছে আনা হোক। ঘটনাক্রমে এই সময় রসূল সা. এর বিরোধী শিবিরের নেতা আবু সুফিয়ান বাণিজ্যিক সফরে ওখানে ছিল। তাকে তার সব ক'জন বাণিজ্যিক সাথীসহ দরবারে ডেকে আনা হলো। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে বললো, "আমি আবু সুফিয়ানকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো। সে যদি কোন প্রশ্নের ভুল উত্তর দেয়, তাহলে তোমরা বলে দিও।" আবু সুফিয়ান বলেছে, "আমি যদি আশংকা না করতাম যে, সাথীরা আমার মিথ্যার জারিজুরি ফাঁস করে দেবে, তাহলে আমি এই সুযোগে কিছু মনগড়া কথা বলে দিতাম।" কিন্তু আল্লাহ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দিলেন যে, রসূল সা. সম্পর্কে তাঁর কট্টর দুশমনের মুখ দিয়েও সত্য কথাই বেরুলো। হিরাক্লিয়াস রসূল সা. এর বংশবৃত্তান্ত, পরিবার, চরিত্র, রসূল সা. এর ঘনিষ্ঠ সাথীদের অবস্থা, তার উন্নতির দ্রুততা, যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা, ইসলামের শিক্ষা এবং অন্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। সকল প্রশ্নের জবাবে আবু সুফিয়ানের দেয়া তথ্যগুলো জেনে নিয়ে হিরাক্লিয়াস বললো, "আবু সুফিয়ান, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই ব্যক্তি একদিন আমি যে জায়গায় বসে আছি, এ জায়গারও মালিক হবে। আহা, আমি যদি সেই নবীর কাছে হাজির হতে পারতাম এবং তাঁর পা ধুয়ে দিতে পারতাম!" এরপর রসূল সা. এর চিঠি পড়া হলো। সভাসদরা এতে খুবই বিরক্তি প্রকাশ করলো। কেননা হিরাক্লিয়াসের মানসিক অবস্থা দেখে তারা আগেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারা মক্কার প্রতিনিধিদেরকে তাড়াতাড়ি বের করে দিল।

হিরাক্লিয়াসের সাথে কথোপথনের ফলে স্বয়ং আবু সুফিয়ানের মনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ পড়ে গেল।

৮- খসরু পারভেজ ছিল ইরানের সম্রাট এবং অগ্নি উপাসক। রসূল সা. আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. কে তার কাছে দূত বানিয়ে দাওয়াতী চিঠি দিয়ে পাঠালেন। খসরু পারভেজ দাম্ভিকতার আতিশয্যে রসূলের সা. চিঠি এই বলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো যে, আমাদের একজন প্রজার এমন দুঃসাহস হলো কি করে? হতভাগা খসরু জানতোনা আরব জাহান কত বড় বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এবং সেখানে কত জোরদার আদর্শিক শক্তি বিকশিত হচ্ছে। খসরু পারভেজ তার ইয়ামানস্থ গভর্ণর বাযানকে নির্দেশ দিল, চিঠির লেখককে অবিলম্বে গ্রেফতার করে নিয়ে এস। বাযান একটা সেনাদল পাঠালো রসূল সা. কে গ্রেফতার করে আনতে। সেনাদল যখন তায়েফ পৌঁছলো, তখন সেখানকার শীর্ষ নেতারা খুব খুশী হলো। তারা ভাবলো, এবার তাদের প্রিয় জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার শত্রুর (মুহাম্মাদের) মুল্যোৎপাটিত হবে। এই সেনাদল মদিনায় পৌঁছলো এবং তার নেতা রসূল সা. কে জানালো, তারা রসূল সা. কে গ্রেফতার করতে এসেছে পারস্য সম্রাটের নির্দেশক্রমে। রসূল সা. তাদেরকে বললেন, কাল সকালে এসে আবার সাক্ষাত কর। পরদিন সকালে তারা এলে রসূল সা. তাদেরকে জানালেন, "আজ রাতে আল্লাহ তোমাদের

সম্রাটকে তার ছেলের হাতেই হত্যা করিয়েছেন। যাও, খবরটা সত্য কিনা খোজ নাও। খবরের সত্যতা এবং রসূল সা. এর শিক্ষা ও চরিত্রের মাহাত্ম্য জানার পর বাযান ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তার দেখাদেখি দরবার ও এলাকার আরো অনেকে ঈমান আনলো।

রসূল সা. পারস্য সম্রাট কর্তৃক তাঁর চিঠি ছিড়ে ফেলার খবর শুনে বললেন, "সে আসলে নিজের সাম্রাজ্যকেই টুকরো টুকরো করেছে।" মনে হয়, আল্লাহ তায়ালার ফায়সালাই রসূলের সা. মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল। কেননা এর মাত্র দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যেই চার পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সুদৃঢ়, বিশালায়তন ও অত্যন্ত বিলাসবহুল সাম্রাজ্য ইসলামের কাছে পরাজিত হলো। প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ কলহকোন্দলই এই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ছেড়েছিল।

এ ছাড়া অন্য যে সব ছোটখাট রাজ্যের শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো হয়েছিল, তাদের একজন তো ছিলেন রোম সম্রাজ্যের গভর্ণর ফারওয়া বিন ওমর, যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরিণামে পদ ও প্রাণ দুটোই হারিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন নাজদের শাসক ছামামা ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তৃতীয়জন জাবালা গাচ্ছানী ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। চতুর্থজন দুমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদার ইসলাম গ্রহণ করেন। ৫ম জন যুল কিলাহ হিময়ারী হিময়ার গোত্রের রাজা ছিলেন। তিনি নিজেকে খোদা বলে দাবী করতেন এবং প্রজাদেরকে সিজদা করতে বলতেন। অবশেষে ইনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর ফারুকের শাসনামলে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে দরবেশের জীবন যাপন করার জন্য মদিনায় আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের আনন্দে আঠারো হাজার দাসদাসীকে মুক্ত করে দেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলি থেকে জানা যায়, ইসলামী দাওয়াতের এই কলমী সংগ্রাম থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে এবং তা ইসলামের প্রসার ও বিকাশ সাধনে খুবই সহায়ক হয়েছে। প্রথমত এ দ্বারা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে ইসলামের দাওয়াত একটা আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়ে পরিগণিত হলো। দ্বিতীয়ত একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষমতাসীন শাসক এই সব চিঠির কল্যাণে এমন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে, যখন মুসলমানরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে খুবই অনগ্রসর ছিল। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাম একটা সত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম। ইসলাম গ্রহণকারী এই ক্ষমতাসীন শাসকদের সাথে সাথে তাদের প্রজারাও ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। রসূল সা. এর চিঠি পেয়েও যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের মনের ওপরও এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। তা ছাড়া চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক যুগের সূচনা হয়, তা দেশের ভেতরেও পরিবেশ অনুকূল করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এই অভিযানের সবচেয়ে বড় যে উপকার হয় তা এই যে, মুসলমানদের সামনে শুরু থেকেই একটা সুপরিসর কর্মক্ষেত্র উপস্থিত হয়ে যায় এবং তাদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা বিরাট ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সমগ্র আরবে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও মুসলিম মোজাহেদরা ক্ষান্ত হয়নি, ভোগ বিলাসে মত্ত হয়নি এবং তাদের মনে এ ধারণা জন্মেনি যে, যা কিছু করণীয় ছিল, তা করে ফেলেছি। বরং তাদের আকাংখা ও অভিলাষ

আরো বেড়ে গেছে। নিজের সাথীদেরকে দূতিয়ালী কর্মকান্ডে নিযুক্ত করে রসূল সা. তাদেরকে অনাগত দিনের দায়দায়িত্ব বহনের চমৎকার প্রশিক্ষণ দিয়ে ফেলেছিলেন। তারা অজানা অচেনা পরিবেশে, জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংগনে এবং ভাবগম্ভীর শাহী দরবারে উপস্থিত হতেন এবং প্রকাশ্য মজলিসে আলাপ আলোচনা ও ভাষণ দানের অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন। তারা সমকালীন শাসক-প্রশাসকদের মনস্তত্ব বুঝার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন। তারপর তারা যে বিশ্বস্ততা, ধৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা, আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ও সরলতা সহকারে সত্য প্রকাশের জন্য যে দৃপ্তদা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে আরো শাণিত করেছে এবং তাদের চরিত্রকে আরো সতেজ ও উজ্জ্বল করেছে।

রসূল সা. সূচিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই অসম্পূর্ণ দাওয়াতী অভিযানকে সম্পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত সাথীগণ এবং তাঁর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দল।

সর্বশেষ বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

যে কোন বিপ্লব যখন দ্বন্দ্বসংঘাতের সব কয়টা স্তর অতিক্রম করে এবং প্রাচীন নেতৃত্বের দর্প চূর্ণ করে চূড়ান্ত সাফল্যের স্বর্ণ যুগে উপনীত হয়, তখন এই সাফল্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে কোন কোন হীনমনা লোক ভেতরে ভেতরেই ক্ষুব্ধ হতে থাকে। তারপর সুযোগ পেলেই সর্বশেষ ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বিপ্লবের সয়লাবের সামনে বালুর বাঁধ দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ইসলামী বিপ্লবও এ ধরনের একটা অনাকাংখিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। কোরায়েশ, ইহুদী ও স্থানীয় নেতৃত্বের শক্তি যখন বিলুপ্ত হলো এবং জনগণ ইসলামের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, তখন একটা সর্বশেষ বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ নতুন আকারে দেখা দিল। কিছু লোক ভাবলো, "এটা কেমন কথা যে, একজন লোক নবুয়তের দাবী তুলে আত্মপ্রকাশ করলো, গুটিকয় লোক তার সমর্থক হলো, দ্বন্দ্বসংঘাত করলো এবং তারপর আজ সেই লোকটাই সারা আরবের শাসক হয়ে বসলো। আমরাও এই পদ্ধতিটা যাঁচাই করে দেখলে ক্ষতি কী?" বিশেষত এই লোকগুলো যখন যাকাতের বিপুল সম্পদ মদিনার দিকে যেতে দেখতো, তখন তাদের মনটা লোভাতুর হয়ে উঠতো। মুসলমানদের মধ্যে যারা আন্তরিকভাবে নয়, বরং নেহাত পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়েছে এবং এখনো তাদের মনে বিরোধী মনোভাব ধূমায়িত হচ্ছে, তাদেরকে তারা চিনতো। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তারা শেষ খেলাটা খেলবে বলে মনস্থ করলো। তারা একথা ভালো করেই জানতো যে, এখন জাহেলী ধ্যানধারণা ও পৌত্তলিক মতবাদের ওপর ভর করে আর কোন আন্দোলন করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর একত্ব, ওহি, নবুয়ত ও আখেরাত সংক্রান্ত আকীদা বিশ্বাস সমগ্র পরিবেশটাকে পুরোপুরিভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই তারাও নিজেদের নকল মালে এইসব লেবেল এঁটে সাজিয়ে একটা দোকান খুলে মানুষকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই বেকুফরা জানতোনা যে, বাজারে কোন নতুন মুদ্রা চালাতে হলে শুধু একটা নকল নকশা ছাপানোই যথেষ্ট নয়, বরং সে জন্য খাঁটি ধাতুরও প্রয়োজন। ইসলামের মুদ্রায় যে ধাতু ব্যবহৃত হতো (অর্থাৎ ইসলামের তৈরী জনশক্তি) তাও ছিল স্বতই নির্ভেজাল ও খাঁটি। (রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের যারা জাহেলী যুগে ভালো ছিল, ইসলামেও তারাই ভালো।) তদুপরি দশ বিশ

বছর ধরে তাকে চুল্লীতে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মরিচামুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা সাধারণত সূক্ষ্মদর্শী হয়না। তারা কেবল নিজেদের পছন্দনীয় স্বার্থই দেখে। কোন কিছু অর্জনের পেছনে যে ত্যাগ ও কুরবানী দেয়া হয়, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করেনা। মোটকথা, ইতিহাসের এই চিরসত্যটাই ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পুনরায় সত্য হয়ে দেখা দিল যে, প্রত্যেক জনপ্রিয় ও জনকল্যাণমুখী আন্দোলন এবং প্রত্যেক মহান ব্যক্তিত্বকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই সক্রিয় হয়ে থাকে। রসূল সা. পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দেয়া এ ধরনের কুচক্রী ষড়যন্ত্রীদের সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

১- ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, একটা প্রতিনিধি দলের সাথে জনৈক মুসাইলিমা বিন হাবীব ওরফে মুসাইলিমা কায্যাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা) মদিনায় এসেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে জাঁকজমক দেখে তার মধ্যে তীব্র ক্ষমতার মোহ জেগে উঠেছিল। সে রসূল সা. এর কাছে একটা চিঠি লিখে ইসলামী সরকারের ক্ষমতার অংশীদারী চেয়ে বসলো এবং হুমকিও দিল। রসূল সা. তার দাবী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে অধীর হয়ে সে নবুয়তের দাবী করে বসলো। সে একজন সাহিত্যিক তো ছিলই। কোরআনের আয়াতের বাচনভংগীর অনুকরণ করে মিত্রাক্ষরান্ত শব্দ দিয়ে বাক্য বানিয়ে বানিয়ে সে অশিক্ষিত মরুচারীদের শুনাতো। যেহেতু কিছু লোক এখনো জাহেলিয়তের সাথে সম্পর্ক রাখতো এবং তারা ইসলামী শিক্ষাদীক্ষায় তখনো তেমন পরিপক্কতা লাভ করেনি, তা ছাড়া আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিদ্বেষ ও অহমবোধ তখনো কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, তাই কিছু না কিছু অনুসারী তার ভাগ্যে জুটেই গেল। তাছাড়া তার মনগড়া ওহিতে নামায মাফ এবং ব্যভিচার ও জুয়া বৈধ করে দেয়া হয়েছিল, তাই পাপিষ্ঠ শ্রেণীর লোকেরা তার চারপাশে ভীড় জমালো। ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার তৈরী করা এই শক্তি হযরত আবু বকরের আমলে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২- মুসাইলিমার প্রতিবেশী এক মহিলাও নবুয়তের দাবী তুললো। সাজাহ নাম্নী এই মহিলার সাথে মুসাইলিমা সাক্ষাত করে এবং গোপন আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে যোগসাজশ গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মুসাইলিমার মধ্যেই তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। মুসাইলিমার অশ্লীল সাহিত্য সাজাহকে যৌনতার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরে মুসলমানদের সাথে লড়াইতে মুসাইলিমা নিহত হলে সাহাজ তওবা করে ও আমরণ ইসলামের ওপর বহাল থাকে।

৩- বিদায় হজ্জের পর ইয়ামানের উর্বর ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ববহ অঞ্চলে আসওয়াদ আনসী নবুয়ত দাবীর মাধ্যমে বিদ্রোহ করে। তার আসল নাম ছিল যুলখিমার আবহালা বিন কা'ব। মাযহাজ গোত্র থেকে সে কিছু অনুসারী পেয়ে যায়। নাজরান এলাকায়ও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রভাব বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল তার যাদুমন্ত্র ইত্যাদি। ইসলামী সরকারের কিছু বেসরকারী কর্মকর্তা এবং দাওয়াতী কর্মীদেরকে সে হত্যা করায় এবং কতক লোককে সে নিজ এলাকা থেকে বহিষ্কার করে। রসূল সা. পার্শ্ববর্তী কর্মকর্তাদেরকে শক্তি সঞ্চয় পূর্বক এই বিদ্রোহ দমন করার নির্দেশ পাঠালেন। সে জনৈক ইরানী বংশোদ্ভূত মুসলমানকে হত্যা করিয়ে তার সুন্দরী স্ত্রীকে জোরপূর্বক দখল করে।

এই মহিলা পরিপক্ক ঈমানদার ছিলেন। তাঁর সাহায্যে ইসলামী সরকার আসওয়াদকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। রসূল সা. এর ইন্তিকালের মাত্র দু'একদিন আগে এই কুচক্রী খতম হয় এবং তার সহযোগীরাও নির্মূল হয়। তবে তার ছড়ানো বিভ্রান্তির প্রভাব হাযরামাওত থেকে তায়েফ পর্যন্ত ছড়ায় এবং হযরত আবু বকরের খেলাফত আমলের প্রথম ভাগেই তার পুরোপুরি উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়।

৫- আম্মানের শাসক হাওয়া বিন আলীর স্থলাভিষিক্ত লাকীত বিন মালেক আযদীর মাথায়ও নানা রকমের গোমরাহীর কীট কিলবিল করতে শুরু করেছিল।

এইসব অপশক্তি বিভিন্ন এলাকায় মাথা তুলতে পেরেছিল নিছক আশপাশের পুরনো জাহেলিয়ত পূজারী, মোনাফেক, অপরাধ প্রবণ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া ও সূদের পুরানো ভক্ত, ইসলামের এককেন্দ্রিক শক্তির পরিবর্তে পুরানো গোত্রবাদে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যাকাত দিতে অনিচ্ছুক, মদিনায় যাকাতের সম্পদ যেতে দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং ছোট ছোট নেতৃত্বের মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিবর্গের আসকারা পেয়ে। এসব স্বার্থপর পুরানো পাপীদেরকে এই অপশক্তিগুলো সংগঠিত করেছিল এবং জাহেলিয়তের মরনোন্মুখ শক্তি আপন আধিপত্য পুনর্বহালের শেষ চেষ্টা চালিয়েছিল।

কিন্তু রসূল সা. এর তৈরী করা নেতৃত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও কঠোর হস্তে এসব অপশক্তিকে দমন করে এবং আরবের সকল মানুষকে অটুট শৃংখলার বন্ধনে আবদ্ধ করে।

ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সম্মেলন

হজ্জ হচ্ছে ইসলামের একটা উঁচু মানের মৌলিক এবাদত। যে কা'বা শরীফ ও তার পবিত্র চত্তর ছিল হযরত ইবরাহীমের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু, যে হারাম শরীফের প্রতিটি অনুপরমাণুতে ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান স্মৃতি ক্ষোদিত রয়েছে, যার আকাশে বাতাসে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এর দোয়া গুঞ্জরিত হচ্ছে এবং যার সমগ্র পরিবেশে স্বয়ং রসূল সা. এর জীবন ও কর্মের স্মৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেই কা'বা শরীফ এই হজ্জের মাধ্যমেই চিরদিনের জন্য ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের বিশ্বজোড়া কেন্দ্রে পরিণত হলো। প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানের জন্য সারা জীবনে কমের পক্ষে একবার এই কেন্দ্রে নির্দিষ্ট হজ্জের দিনে হাজিরা দেয়া, হজ্জের করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করা, হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করা, পূর্বতন নবীদের জীবনেতিহাস আলোচনা করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, সারা বিশ্ব থেকে আগত ইসলামী ভাইবোনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সর্বাত্মক বিনয়ের সাথে নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা ফরয। হজ্জ ফরয করার এই আদেশ জারী হয় ৯ম হিজরীতে।

রসূল সা. এ বছরই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কে আমীরুল হজ্জ তথা হজ্জ প্রতিনিধি দলের নেতা বানিয়ে তিনশো সাহাবীসহ মক্কায় পাঠালেন যেন তিনি নিজের নেতৃত্বে হজ্জ সম্পন্ন করান। প্রসংগত এই হজ্জ সম্পর্কে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি। কেননা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই এই ঘটনা ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীককে রা. আমীর বানানোর পাশাপাশি হযরত আলী রা. কেও অন্য একটা দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছিল। সেটি হলো, তিনি যেন সূরা তওবার প্রথম চল্লিশ আয়াত হজ্বের সমাবেশে পড়ে শোনান এবং আল্লাহর নাযিল করা জরুরী ঘোষণাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। প্রথম ঘোষণা ছিল এই যে, যারা সাবেক জাহেলী ও পৌত্তলিক ব্যবস্থার ওপর বহাল থেকে রসূল সা. বা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল, তাদেরকে আরো চার মাস সময় দেয়া হচ্ছে। এই চার মাস পর এ ধরনের সমস্ত চুক্তি আল্লাহর হুকুমে বাতিল হয়ে যাবে।

এই চার মাসের মধ্যে তাদেরকে নিজ নিজ কর্মপন্থা স্থির করে নিতে হবে যে, তারা কি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করবে, না যুদ্ধ করবে, না ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান হিসেবে বসবাস করবে। অর্থাৎ এখন ইসলামী রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে স্বাধীন সত্তা বহাল রেখে নিজের দাবী ও চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়, এ ধরনের চুক্তি বাতিল করার জন্যও প্রকাশ্যে ঘোষণা করা জরুরী ছিল। তাছাড়া চার মাসের সময় প্রতিপক্ষকে দেয়া হয়েছিল, যা যথেষ্ট ছিল। এ সুযোগও দেয়া হয়েছিল যে, কোন মোশরেক যদি এই সময়ে মদিনায় এসে ইসলামকে বুঝতে চায়, তবে সে নিরাপদে আসা যাওয়ার সুযোগ পাবে। তা ছাড়া মোশরেকদের মধ্য থেকেও যারা সততার সাথে চুক্তি মেনে চলেছিল, তাদেরকে বাড়তি এই সুবিধা দিয়েছে যে, তাদের চুক্তি চার মাস পর বাতিল হবেনা বরং নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। আসল চাপ ছিল সেই মোশরেকদের ওপর, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা ও যুদ্ধ চালিয়েছে, সংঘর্ষ চালাতে গিয়ে সমস্ত নৈতিক নিয়ম নীতি লংঘন করেছে, বারবার ওয়াদা খেলাফ করেছে এবং মানবতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের যাবতীয় রীতি ভংগ করেছে। এরা ছিল সেই সব মোশরেক, যারা হকের পথে চলতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, যারা আল্লাহর দ্বীনের খুত ধরার চেষ্টা করেছে, যারা রসূল সা. কে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হয়েছে এবং যারা সব সময় প্রথম আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধায়।

দ্বিতীয় ঘোষণা ছিল, ভবিষ্যতে আর কোন মোশরেককে কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী বানানো হবেনা। তৃতীয় ঘোষণা ছিল, ভবিষ্যতে আর কোন মোশরেক হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবেনা। এ বিষয়ে হযরত আলী রা. রসূলের পক্ষ থেকে এ কথাও জানালেন যে, এখন থেকে কোন ব্যক্তি কা'বা শরীফে উলংগ হয়ে তওয়াফ করতে পারবেনা। চতুর্থ ঘোষণা, আল্লাহর পক্ষ থেকে চারটি নিষিদ্ধ মাস বহাল রাখা হলো এবং এ মাসগুলোতে বিন্দুমাত্রও কোন রদবদল করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। কথা প্রসংগে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, মোশরেকরা যতই অপছন্দ করুক, আল্লাহ তার এই দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার জন্যই তার রসূলকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

কেউ কেউ হযরত আলীর রা. এই অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে নানা রকমের আজগুবী ও উদ্ভট কথা বলে থাকে। অথচ ব্যাপার ছিল শুধু একটুকু যে, রসূল সা. হযরত আবু বকর রা. কে আমীর বানানোর মাধ্যমে নিজের স্থলাভিষিত করেছিলেন, আর হযরত আলীকে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত সচিব বা দূত হিসাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও

রাজনৈতিক ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সরকার পরিচালনার বিষয়টি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা আছে, তারা জানেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করে উপায়ান্তর থাকেনা। সরকারের একজন গভর্ণর থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ প্রয়োজনে আলাদা দূত পাঠাতে হয়।

এবার আমরা সেই বিশাল হজ্জ সমাবেশের বিবরণ দেব, যাতে রসূল সা. সশরীরে যোগদান করেছিলেন এবং যেখানে ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির এক সমুদ্র তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতে থাকে। দশম হিজরীতে যখন রসূল সা. হজ্জের সংকল্প করলেন, তখন সকল এলাকায় খবর পৌছানো হলো। ইসলামী বিপ্লবের বীর সেনানীদের কাফেলা চারদিক থেকে মদিনায় সমবেত হতে লাগলো। এই সফরে উম্মুল মুমিনীনগণের সকলেই রসূল সা. এর সাথে যান। যুল হুলায়ফা থেকে তিনি এহরাম বাঁধেন এবং এখান থেকেই তিনি সেই ঐতিহাসিক শ্লোগান তোলেন, যা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া সকল হাজীর অন্তরাত্মা থেকে উত্থিত হয়ে থাকে। সেই শ্লোগান হলো ঃ "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা........।" অর্থাৎ আমরা হাজির, হে আল্লাহ আমরা হাজির। সকল প্রশংসা তোমার, সকল নিয়ামত তোমার, সমস্ত রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।"

পথিমধ্যে যেখানেই কোন পাহাড়ে ওঠানামা করতে হয়েছে, সকলে সমস্বরে "লাব্বায়ক লাব্বায়কা"।

মক্কার কাছাকাছি গিয়ে "যীতুয়া"তে তিনি কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করলেন। তারপর মুসলমানদের এই বিশাল জনসমুদ্রকে সাথে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি প্রথমে তওয়াফ করলেন। তারপর সাফা ও মারওয়ায় গেলেন। সেখান থেকে কা'বার দিকে ফিরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। ৯ই জিলহজ্জ ওয়াদিয়ে নামেরায় উপস্থিত হলেন। দুপুরের পরে আরাফাত ময়দানে উপনীত হলেন। সেখানে পাহাড়ের ওপর আরোহন করে 'কুসওয়া' নামের উট্নীর পিঠের ওপর বসে খুতবা দিলেন। চারদিকে মুকাবিবররা দাঁড়িয়েছিল, যারা প্রতিটা বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছিল। এভাবে রসূল সা. এর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ সমবেত প্রত্যেক ব্যক্তির কানে পৌছে যাচ্ছিল।

আজ রসূল সা. এর মনে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি বিরাজ করছিল। আজ তাঁর সারা জীবনের শ্রমের ফসল এক লাখ চুয়াল্লিশ মতান্তরে এক লাখ চব্বিশ হাজার মুসলমান তার সামনে উপস্থিত।

ইসলামী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক মেনিফেষ্টো

এই সময় রসূল সা. দুটো ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রথমটা ৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের পাহাড়ের ওপর থেকে। দ্বিতীয়টা ১০ই জিলহজ্জ মিনায়। এই দুটো ভাষণের বক্তব্য কিছু কিছু বর্ণনায় একাকার হয়ে গেছে।

এই দুটো ভাষণ একাধিক কারণে অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। প্রথমত, রসূল সা. সবচেয়ে বড় ইসলামী সমাবেশে ভাষণ দেন এবং এমন সময় দেন, যখন তাঁর লাগানো সত্যের কলেমার চারাগাছটি বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়ে ফল দিতে শুরু করেছে। প্রচন্ড

বিরোধিতার যুগ অতিক্রম করে এত বড় সাফল্য লাভ স্বয়ং জীবন ও চরিত্রের এক বিরাট পরীক্ষা হয়ে তাকে। এ পরিস্থিতিতে তিনি না হয়ে কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি হলে এবং নিছক রাজনৈতিক সাফল্য ও বিজয় অর্জনকারী একজন বিজেতা হলে যাবতীয় ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে উঠতো এবং দম্ভ ও অহংকারে নিজেকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করে ছাড়তো। রসূল সা. ছাড়া অন্য কোন স্বার্থপর ব্যক্তি এই পর্যায়ে পৌছলে ধার্মিকতার সমস্ত আলখেল্লা দূরে ছুড়ে ফেলতো এবং ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতো। কিন্তু রসূল সা. কে আগের চেয়েও বেশী বিনয় এবং আগের চেয়েও বেশী আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত যেহেতু রসূল সা. স্বীয় প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এত বড় মুসলিম সমাবেশে তাঁর ভাষণ দিতে পারার এটাই শেষ সুযোগ, তাই এতে তিনি বিদায়ী নির্দেশাবলী সম্বলিত ওসিয়ত পেশ করেছিলেন, যার প্রতিটি শব্দ মূল্যবান। তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের এই পূর্ণতার স্তরে পৌছে যাওয়ার পর ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির নামে কোন বাণী বা কোন মেনিফেস্টো দেয়ার এটাই ছিল উপযুক্ত সময়। তাই তিনি এ দায়িত্বটা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। চতুর্থত এ ভাষণ দুটো রসূল সা. এর শ্রেষ্ঠ বাগ্মীতার স্বাক্ষর এবং তাঁর সর্বোত্তম অলংকার সমৃদ্ধ ভাষণ সমূহের অন্যতম। এ দ্বারা এই মহান ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, এই ভাষণ দুটোর একাংশ সুনির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সমস্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট, আর এক অংশ আন্তর্জাতিক মেনিফেস্টো সম্বলিত। মূল বক্তব্যই এই বিভক্তিকে স্পষ্ট করে দেয়।

আরাফাতের ভাষণ

- সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা শুধু তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। তাঁর নিকটই নিজেদের গুনাহখাতা মাফ চাই। তাঁরই কাছে অনুশোচনা পেশ করি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির ক্ষতিকর তৎপরতা ও নিজেদের অন্যায় কর্মকান্ড থেকে তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেন, তাকে কেউ বিপদগামী করতে পারেনা। আর আল্লাহ যাকে হেদায়ত লাভের সুযোগ দেননা, তাকে কেউ সরল ও সঠিক পথে চালাতে পারেনা।

-আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রসূল।

- হে আল্লাহর বান্দারা, আমি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি ও উৎসাহিত করছি।

- আমি কল্যাণময় কথা দ্বারা আমার বক্তব্য শুরু করছি।

- হে জনতা, তোমরা আমার কথাগুলো মনোনিবেশ সহকারে শোন। আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছি। কেননা এ বছরের পর তোমাদের সাথে এই স্থানে আমার আর সাক্ষাত হবে বলে মনে হয়না।

- হে জনমন্ডলি, তোমাদের একের জীবন ও সম্পদ অপরের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের প্রভুর নিকট পৌছে যাওয়া পর্যন্ত এ বিধান মেনে চলবে। তোমাদের এই মাস এই শহর এবং তোমাদের এই দিন যেমন পবিত্র ঠিক তেমনি।

- জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কথা পৌছে দিয়েছি। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো।

- যার হাতে কারো কোন জিনিস আমানত রয়েছে, সে যেন তা তার মালিকের কাছে পৌছে দেয়।

- জাহেলিয়ত যুগের সুদগুলো বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাসের সুদ রহিত করলাম।

- জাহেলি যুগের সমস্ত খুনের বদলার দাবী রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমের বিন রবীয়ার খুনের দাবী রহিত করলাম। জাহেলিয়ত যুগের সমস্ত পদ পদবী ও সম্মান বাতিল করা হলো। কেবল কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়কের পদ এবং হাজীদেরকে পানি সরবরাহের পদ- এই দুটো পদ বহাল থাকবে।

- ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের বদলা একশো উট। এ ক্ষেত্রে একশো উটের বেশী দাবী করলে তা হবে জাহেলী রীতি।

- হে জনমন্ডলি, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর শয়তান আর আশা করেনা যে এই ভূখণ্ডে তার আনুগত্য করা হবে। কিন্তু তোমরা যে গুনাহগুলোকে হালকা মনে কর, তাতে যদি শয়তানের আনুগত্য কর, তবে তাতেও সে খুশী হবে।

- হে জনমন্ডলি, হারাম মাসগুলোর রদবদল করা অধিকতর কুফরির কাজ। এক বছর তাকে হারাম এবং আরেক বছর হালাল গণ্য করে আগ পিছ করে কোন মতে গুণতি পূরণ করার মাধ্যমে কাফেররা আরো বেশী গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।

- নিশ্চয় আবর্তনের পথ ধরে মহাকাল আজ তার সেই প্রারম্ভিক বিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করেছে, যেখানে সে আল্লাহ কর্তৃক আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিনে ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মাস সুনিশ্চিতভাবে বারোটাই। যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তখন থেকেই তাঁর অদৃষ্ট লিপিতে মাসের সংখ্যা এভাবেই লেখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে চার মাস নিষিদ্ধ। তিনটে মাস ধারাবাহিক-জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহাররম। আর একটার অবস্থান একাকী অর্থাৎ রজব মাস, যা জমাদিউস সানী ও শাবানের মাঝখানে অবস্থিত।

- জেনে রেখ, আমি কথা পৌছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো।

- হে জনতা, তোমাদের নারীদেরকে তোমাদের ওপর কিছু অধিকার দেয়া হয়েছে।

তোমাদেরও তাদের কাছে কিছু অধিকার প্রাপ্য রয়েছে। তোমাদের স্বামীদের শয়নকক্ষে তোমরা ছাড়া আর কাউকে আসতে না দেয়া তোমদের কর্তব্য। তোমরা পছন্দ করনা এমন কোন ব্যক্তিকে তোমাদের অনুমতি ছাড়া বাড়ীতে ঢুকতে দেয়া তোমাদের স্ত্রীদের পক্ষে অনুচিত। কোন নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজ করা স্ত্রীদের উচিত নয়। যদি তারা তা করে তবে তোমাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন যে, তাদের সংশোধনের জন্য তাদের কাছ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে পার। এরপর তারা অনুগত হয়ে চললে তাদেরকে নিয়মানুযায়ী খোরপোশ দেয়া তোমাদের দায়িত্ব। নিশ্চয়ই মহিলারা তোমাদের অধীন। তারা নিজেদের কল্যাণের জন্য নিজেরা কিছু করতে পারেনা। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমনাত হিসেবে নিজেদের সাথী বানিয়েছে এবং তাদের দেহকে আল্লাহরই আইন অনুসারে ভোগ করে থাক। কাজেই নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দান কর।

- জেনে রেখ, আমি আমার কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ, তুমিও সাক্ষী থেকো।

হে জনতা, মুসলমানরা পরস্পরের ভাই ভাই। এক ভাই এর সম্মতি ছাড়া তার সম্পদ অন্য ভাই কর্তৃক গ্রহণ করা বৈধ নয়।

- সাবধান, আমি কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ। তুমিও সাক্ষী থাকো।

- আমার পরে এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পরিত্যাগ করে তোমরা কাফের সুলভ জীবন গ্রহণ করে একে অপরের গলা কাটতে শুরু করে দিওনা।

- আমি তোমাদের কাছে এমন একটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা মেনে চললে তোমরা বিপদগামী হবেনা। সেটি হলো আল্লাহর কিতাব।

- সাবধান, আমি কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ, তুমিও সাক্ষী থাকো।

- তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। বল, তোমরা কী বলবে? লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মাতের শুভ কামনায় যা কিছু করা উচিত, তা আপনি করেছেন। সত্যের ওপর থেকে সমস্ত পর্দা তুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর আমানতকে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।"

- হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক।

- যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন এই কথাগুলো অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়। হয়তো বা কিছু উপস্থিত লোকের চেয়ে কিছু অনুপস্থিত লোক এ কথাগুলোকে অধিকতর ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে এবং সংরক্ষণ করবে।

- হে জনতা, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য উত্তরাধিকারের স্থায়ী অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পত্তি ওসিয়ত করা জায়েজ নয়।

- যার বিছানায় সন্তান জন্ম নেবে সন্তান তারই। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।"

- যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া আর কাউকে পিতা বলে মেনে নেবে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মনিব ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বলবে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত! কেয়ামতের দিন তার কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা।

- তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি নেমে আসুক।

মিনার ভাষণ

- হে জনমন্ডলী, আমার পর আর কোন নতুন নবী আসবেনা। তোমাদের পরও কোন নতুন উম্মাত জন্ম নেবেনা। সুতরাং মনোযোগ দিয়ে শোন এবং আপন প্রতিপালকের দাসত্ব কর। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়। রমযানের রোযা রাখ। সম্পদের যাকাত সাগ্রহে দিতে থাক। হজ্জ আদায় কর এবং আপন নেতা ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা আল্লাহর জান্নাতে যেতে পার।'

আন্তর্জাতিক মেনিফেস্টো হিসাবে এই দুটি ভাষণে রসূল সা. যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা মানবীয় চিন্তা ও কল্পনার অতীত। বরঞ্চ আর কোন মেনিফেস্টো কার্যত এই মেনিফেস্টোর মত এত উঁচুমানের মানুষ তৈরী করতে পারেনি। এতে আল্লাহর একত্বের বিপ্লবী আকীদা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর দাসত্বও এবাদতকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌল চালিকা

শক্তিরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের জন্য পরস্পরের জানমাল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং হত্যাকান্ডের শাস্তি মৃত্যুদন্ড অপরিহার্য করা হয়েছে। সুদখোরীর জাহেলী রীতিকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাগৈসলামিক যুগের প্রতিশোধ ও পাল্টা-প্রতিশোধের অব্যাহত ধারাবাহিকতাকে রহিত করা হয়েছে। জাহেলী যুগের পদমর্যাদা ও খেতাব খতম করা হয়েছে। এতে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার নির্ধারিত হয়েছে। পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত করা হয়েছে। নারীদেরকে আল্লাহর আমানত আখ্যায়িত করে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে জরুরী আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর কিতাবকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহর একত্ব ও মানবজাতির পিতার এককত্বের ভিত্তিতে মানবীয় ঐক্যের ধারণা দেয়া হয়েছে। ভৌগলিক ও বংশীয় ভেদাভেদকে নিরর্থক এবং সততা ও খোদাভীতিকে সম্মান ও মহত্বের মানদন্ড বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যখনই এবং পৃথিবীর যে স্থানেই ইসলামী আন্দোলন চলবে এবং ইসলামী ব্যবস্থা চালু হবে, তার ভিত্তি এই অটল ও অটুট মতাদর্শগুলোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ মেনিফেষ্টো ইসলামের মৌলিক মেনিফেষ্টো এবং মানবজাতিকে এর দিকে ডাকা যেতে পারে। আর এই মেনিফেষ্টোর বিরুদ্ধে জীবনের যে কাঠামো তৈরী হবে, তা অনৈসলামিক হবে এবং কোন খাঁটি মুসলমান তা গ্রহণ করতে পারেনা। এই মেনিফেষ্টোকে আমরা আমাদের যে কোন নেতৃত্বের তৎপরতা যাচাই করার কষ্টিপাথর বানাতে পারি এবং আমাদের প্রত্যেক সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে এর আলোকে মূল্যায়ন করতে পারি। এ মেনিফেষ্টোর দর্পণে আমরা নিজেদের চেহারাও দেখতে পারি, অন্যান্য অনৈসলামিক সমাজব্যবস্থাকেও দেখতে পারি।

এ হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবীর শেষ ভাষণ। এ ভাষণ তিনি আমাদের উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন। এ ভাষণ রসূল সা. এর ওসিয়ত স্বরূপ। এর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরার পর রসূল সা. দরদভরা কণ্ঠে বলেছেন, আমি আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি। এ কথাটা পড়ে আমাদের সাবধান ও সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের এ যাবতকার আচরণে অনুতপ্ত হয়ে এবং অনৈসলামিক ব্যবস্থার দাসত্বের জিঞ্জীর ছুড়ে ফেলে দিয়ে রসূল সা. এর জীবনাদর্শের অনুসারী হওয়া উচিত। যে ব্রত সফল করার জন্য রসূল সা. এত কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, যে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কোন নজীর পাওয়া যায়না, সেই ব্রত সফল করতে আমাদেরও এগিয়ে আসা উচিত।

রসূল সা. সুষ্ঠু ও শান্তভাবে হজ্জ আদায় করলেন। হজ্জ পালনরত সকল মুসলমানের সাথে দেখা সাক্ষাত করলেন। লোকেরা বহু প্রশ্ন করলো। অতঃপর বিদায়ী তওয়াফের মাধ্যমে এই পবিত্র সফর সমাপ্ত করলেন।

এ ছিল ইসলামের পূর্ণতা অর্জনের দৃশ্য। দেড় লাখ মানুষের এই উদ্দীপনাময় ও স্বতস্ফূর্ত সমাবেশ যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, তা এই যে, ইসলামী আন্দোলন আসল বিজয় অর্জন করেছিল জনমতের যুদ্ধে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরিবর্তন সাধনের সংগ্রামে। আর ভেতরের এই পরিবর্তনই বাইরের গোটা জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিল।

রসূল সা. এর তীরোধানের পর

এ পর্যন্ত আমরা রসূল সা. এর পরিচালিত আন্দোলনের ফলাফল তুলে ধরলাম। এর পর বেশী দিন অতিবাহিত না হতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তাঁর প্রশিক্ষিত ও প্রতিপালিত মুসলমানরা এ কাজ অব্যাহত রাখে এবং ইসলামী আন্দোলন দশ পনেরো বছরের মধ্যেই বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বিদায়ী হজ্জে রসূল সা. যেভাবে অংশগ্রহণ করেন, যেভাবে তিনি আপন সাথীদের সম্বোধন করেন এবং যে ভাষায় তিনি ওসিয়ত করেন ও আবেদন জানান, তা থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, রসূল সা. সামষ্টিকভাবে সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে 'গাদীরে খুম' নামক পুষ্করিনীর পাশে যাত্রা বিরতির সময় বিশিষ্ট সাথীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো একটা ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিদায়ের মনোভাব আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ভাষাও ছিল এমন যে, শোনলে কান্না এসে যায়। প্রথমে চিরাচরিত রীতি অনুসারে আল্লাহর প্রশংসা করেন। তারপর বলেন ঃ

"হে জনমন্ডলী, আমি একজন মানুষ। হয়তো খুব শীগগীরই আমার কাছে আল্লাহর আহ্বায়ক এসে যাবে এবং তার ডাকে সাড়া দেব। আমি দুটো দায়িত্বের দুটো বোঝা তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। তার একটা আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা, আলো ও হিকমত। এরপর কোরআন সম্পর্কে উদ্দীপনা ও সতর্কতামূলক বেশ কিছু কথা বলেন। তারপর বলেন, দ্বিতীয় বোঝাটি হলো, আমার পরিবারের লোকেরা। আমার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করার আহ্বান জানাই।"

নবীগণকে অতিমানব ও অমানব আখ্যায়িত করে যারা নানা ধরনের গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত করেছিল, তাদের সেই সব গোমরাহী দূর করার জন্য তিনি নিজেকে মানুষ বলে আখ্যায়িত করেন। যে নবীগণ শেরকের মূল্যোৎপাটন ও আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে, অতিরঞ্জকরা সেই নবীদেরকেই আল্লাহর সন্তান আখ্যায়িত করে তাদেরকে আল্লাহর অংশ ও চিরঞ্জীব সত্তা বলে গণ্য করেছে। রসূল সা. নিজের বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আগে নিজের সাথীদেরকে এই বলে সতর্ক করেন যে, আমি মানুষ। তাই অন্যান্য মানুষের মত আমার ওপরও আল্লাহর আইন চালু হবে। তারপর তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে কোরআন অনুসরণের নির্দেশ দেন এবং এটাকে একটা দায়িত্বের বোঝা বলে অভিহিত করেন। তিনি সেই সাথে নিজের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কেও মুসলমানদের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেন। কেননা রসূল সা. এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর মূল্যবান শিক্ষাসমূহের আমানতদার। এ দিক থেকে তারা উম্মতের জন্য ইসলামী শিক্ষার উৎস। অপর দিকে তাদের জন্য তিনি কোন ধন সম্পদ রেখে যাননি এবং তাদের ভবিষ্যতকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে গেছেন। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, রসূল সা. এর পর তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর বিরাট গুরুদায়িত্ব বর্তে। কিন্তু তীব্র আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তিনি এ বিষয়ে কোন স্পষ্টোক্তি না করে ইংগিতের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন।

এই ভাষণেই অথবা পরবর্তী অন্য কোন ভাষণে রসূল সা. সাধারণ মুসলমান ও সাহাবায়ে কেরামকে আরো একটা কথা একটা অসাধারণ প্রয়োজনের আলোকে বলেছিলেন। ব্যাপারটা ছিল এই যে, হযরত আলীর সাথে যে ক'জন সাহাবীকে ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল, তাদের কোন ব্যাপারে হযরত আলীর সাথে কিছুটা মতভেদের সৃষ্টি হয়ে যায়। আসলে বড় বড় কাজের সময় কখনো কখনো এমন কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মেজাজের পার্থক্যের সাথে সাথে মতেরও অমিল ঘটে যায়। কখনো কখনো তিক্ত বা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের দরুন অন্তরে অস্থায়ীভাবে হলেও ক্ষোভ বা অসন্তোষ দানা বাধে। মানুষের দ্বারা তৈরী সংগঠন, চাই তা খালেছ ইসলামী কাজের জন্যই সংগঠিত হোক কিংবা তার নেতৃত্বে নবীদের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক মানুষই বহাল থাকুক, মানুষের যাবতীয় স্বভাবসুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকবে- এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। মতপার্থক্য ও আবেগের সংঘাত একটা আপাদমস্তক সৎ, সত্য নিষ্ঠ, নির্মল ও নিখুঁত সমাজেও দেখা দিতে পারে। এ জন্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য সেই সব মহানুভব, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও উদার লোকদের প্রয়োজন, যারা মতবিরোধ দেখা দেয়া সত্ত্বেও খাপ খাইয়ে চলতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের সংগঠনেও কখনো কখনো বিরোধ দেখা দিত। কিন্তু তাদের অসাধারণ সহনশীলতার কারণেই এই বিরোধ সত্ত্বেও সহযোগিতা অব্যাহত থাকতো। তিক্ততা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও তা হতো সাময়িক। এ ক্ষেত্রেও এ ধরনেরই একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত হযরত বারীদার মনে বিরোধের প্রভাব এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, তিনি রসূল সা. এর কাছে হযরত আলীর বিরুদ্ধে নালিশ করে দিলেন। কিন্তু হযরত আলীর ন্যায় প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ সৃষ্টি হওয়া, তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া, ব্যক্তিগত মনোকষ্টের রূপ নেয়া এবং তারপর রসূল সা. এর কাছে অভিযোগ আকারে উপস্থাপিত হওয়া কিছুটা জটিল ব্যাপারই ছিল। অভিযোগটা শুনে রসূল সা. ব্যথিত হন এবং চেহারার রং পাল্টে যায়। এই প্রেক্ষাপটে তিনি তার চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে কারো নাম উল্লেখ না করেই বললেন, "আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ। আর যে আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার সাথে তুমিও শত্রুতা পোষণ কর।"

এ কথা সবার জানা যে, যে আন্দোলনে রসূল সা. যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, হযরত আলীও তাতে সর্বস্ব উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। একই দাওয়াতের আহ্বায়ক, একই মিশনের পতাকাবাহী, একই চিন্তাধারার অনুসারী এবং একই পথের পথিক, উপরন্তু এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যে, উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ব্যবধান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এমন দু'জনের একজনকে ভালোবাসা ও অপর জনের প্রতি বিক্ষুব্ধ থাকা কিভাবে সম্ভব? রসূল সা. ও তার ঘনিষ্ঠতম সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কই ছিল। আকীদা, আদর্শ ও লক্ষ্যের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গোটা সংগঠন গভীরভাবে আবদ্ধ ছিল। বিশেষত এর প্রথম কাতারের ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে রসূল সা. বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ভেদাভেদ করে কাউকে ভালোবাসা ও কারো প্রতি মনোকষ্ট পোষণ করার কোন সুযোগই ছিলনা। রসূল সা. কষ্ট পেয়েছিলেন এজন্য যে, যে দলকে তিনি বছরের পর বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে যদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এত দুর্বল হয়ে থাকে, তার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের

প্রতি অসন্তোষ ও ক্ষোভ পোষণ করা হয় এবং মতভেদের কারণে ব্যক্তিগত দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তা হলে এই বিশাল লক্ষ্য নিয়ে মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হবে কি করে ?

এ সময় রসূল সা. দেখতে পাচ্ছিলেন নিজের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। তিনি এই চিন্তায়ই মগ্ন ছিলেন যে, এখন সমস্ত দায়িত্বের বোঝা এই সংগঠনের কাঁধের ওপরই অর্পিত হতে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে রসূল সা. এর পরিবর্তে নেতৃত্বের এই সারির পেছনেই চলতে হবে, যার ভেতরে রসূল সা. নিজের বিশ্বস্ততম সাথীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং যার প্রতিটি ব্যক্তিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ঐ কথাটা বলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, কিছু লোক ঐ উক্তির ভেতর থেকেই রসূলের সা. পরবর্তী খলিফা নিয়োগের দর্শন খুঁজে বের করেছে। এটা কিভাবে বের করা হলো, তা আমার বুঝে আসেনা।

এ আলোচনাটা এসে গেল নিতান্তই আনুসংগিকভাবে। নচেত আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়টা ফুটিয়ে তোলা যে, সমগ্র বিদায় হজ্বের সফরকালেই রসূল সা. অনুভব করছিলেন যে, এখন তাঁর পরকালের সফর আসন্ন প্রায়। এই অনুভূতির আলোকেই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও ওসিয়ত করতে থাকেন।

একাদশ হিজরীর সফর মাসের শুরু থেকেই রসূল সা. এর পবিত্র আত্মা আখেরাতের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। একদিন তিনি ওহুদে চলে গেলেন এবং ওহুদের শহীদদের জন্য সিজদায় গিয়ে দোয়া করলেন। ফিরে এসে পুনরায় নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"হে জনমন্ডলী, আমি তোমাদের আগেই বিদায় নিয়ে যাবো এবং আল্লাহর কাছে তোমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। আল্লাহর কসম, আমি এখানে বসেই হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি, আমাকে বিভিন্ন সাম্রাজ্য জয়ের চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ দাওয়াতের ফলে বিভিন্ন রাজ্য বিজিত হবে।) আমি এ আশংকা করিনা যে, তোমরা আমার পর মোশরেক হয়ে যাবে। আমার আশংকা শুধু এই যে, তোমরা পার্থিব স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংঘাতে পড়ে যাবে।"

তারপর মধ্যরাতে বাকী'র গোরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য মাগফেরাত কামনা করেন এবং বলেন, "আমিও শীগগীরই তোমাদের সাথে এসে মিলিত হব।" তারপর একদিন বিশেষভাবে বিশিষ্ট সাথীদেরকে জমায়েত করে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের অভিনন্দন! আল্লাহ তোমাদের আপন করুণায় অভিষিক্ত করে রাখুন। তিনি তোমাদের মনের কষ্ট দূর করে দিন। তোমাদেরকে জীবিকা দিন। তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে উন্নতি দিন। তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিচ্ছি, তোমাদেরকে আল্লাহরই তত্ত্বধানে সোপর্দ করছি এবং তোমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে সতর্ক হবার আহ্বান জানাই। কেননা আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী। দেখ, আল্লাহর জনপদগুলোতে তাঁর বান্দাদের মধ্যে অহংকার ও দাম্ভিকতার আচরণ করোনা। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও তোমাদেরকে বলেছেনঃ "আখেরাতের সেই গৃহ আমি ঐ সব লোকের জন্যই নির্দিষ্ট করেছি, যারা

পৃথিবীতে অহংকার ও অরাজকতা ছড়াবার ইচ্ছা পোষণ করেনা। আর পরকালের সাফল্য তো মুত্তাকীদের জন্যই।" তোমাদের সকলের ওপর এবং ইসলাম গ্রহণ পূর্বক আমার বায়য়াতে অন্তর্ভুক্ত লোকদের সকলের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।"

বাকী'র কবরস্থান থেকে ফিরে আসার পর মাথায় হালকা ব্যথা শুরু হলো। ২৯শে সফর এক মৃত ব্যক্তির জানাযায় যাওয়া আসা করায় মাথা ব্যথা বেড়ে গেল। রোগের প্রাথমিক হাল্কা অবস্থায় এগারো দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে এসে নিজেই নামাযের ইমামতি করতে লাগলেন। রোগ বৃদ্ধির ফলে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে থাকেন এক সপ্তাহ। এরপর রোগ আরো বৃদ্ধি পেলে অন্য সকল স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশার কক্ষে চলে আসেন।

রোগের দরুন তিল তিল করে মৃত্যু পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন– এরূপ অবস্থায়ও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বের কথা তিনি ভোলেননি। তবুক ও মুতার যুদ্ধের উদ্দেশ্য তখনো সফল হতে বাকী। সামান্য শৈথিল্য দেখালেই শত্রুরা আসকারা পেয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। তাই এই পরিস্থিতিতেই ২৬শে সফর মুসলমানদেরকে রোম অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। পরের দিন হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে এই অভিযানের সেনাপতি মনোনীত করলেন। তাকে বললেন, "যাও, আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পিতার শাহাদাতের স্থানে পৌঁছে যাও এবং আল্লাহকে যারা অমান্য করে তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা কর। তিনি নিজ হাতে পতাকা তৈরী করে হযরত বারীদা বিন খুসাইব আসলামীর হাতে দিলেন। একেতো অল্প বয়স্ক, তদুপরি রসূল সা. এর মুক্ত গোলাম ও পালিত পুত্র যায়েদের ছেলে হওয়ার কারণে হযরত উসামার নিযুক্তি নিয়ে কেউ কেউ কানাঘুষা করতে লাগলো যে, বড় বড় আনসার ও মোহাজের থাকতে এই কিশোরকে কেন সেনাপতি নিয়োগ করা হলো। বিষয়টি রসূল সা. এর কানে গেলে তিনি নিদারুণভাবে মর্মাহত হলেন এবং প্রবল কষ্ট সত্ত্বেও মাথায় পট্টি বেঁধে মসজিদে উপস্থিত হলেন। তারপর গাদীরে খুমের অনুরূপ ভাষণ দিলেন, তিনি বললেন ঃ

"আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা উসামা সম্পর্কে নানা কথা বলেছ। ইতিপূর্বে তার বাবাকে সেনাপতি নিয়োগ করা সম্পর্কেও তোমরা আপত্তি তুলেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম, সে তার যোগ্য ছিল। তারপর তার ছেলেও এ কাজের যোগ্য। যায়েদ বিন হারেসাও আমাদের কাছে সবার চেয়ে প্রিয় ছিল। আর তার ছেলে উসামাও আমাদের কাছে এখন সবার চেয়ে প্রিয়।"

ইতিপূর্বে (ইন্তিকালের পাঁচ দিন আগে) মাথায় সাত মশক পানি দিয়ে গোসল করেছেন। এই গোছলে শরীরটা একটু হালকা হলে তাঁকে ধরাধরি করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিনি সাহাবীদের সমাবেশে সর্বশেষ ভাষণ দিলেন। বললেন ঃ

"তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবীদের ও পুন্যবান লোকদের কবরকে পূজা করতো। তোমরা এরূপ করোনা। আমার তীরোধানের পর আমার কবরকে পূজার জায়গায় পরিণত করোনা। যারা নবীদের কবর পূজা করবে, তাদের ওপর আল্লাহর মারাত্মক গযব নেমে আসা অবধারিত। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের

কাছে সত্য বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি স্বয়ং এর সাক্ষী।"
তারপর নামায পড়ালেন এবং নামাযের পর আবার বললেন ঃ
"আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে সাবধান করছি। তারা ছিল আমার দেহের পোশাক এবং আমার পথের সম্বল। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তোমাদের ওপর তাদের অধিকার দেয়া বাকী রয়েছে। অন্যেরা উন্নতি লাভ করবে। কিন্তু আনসাররা যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যাবে। আনসারদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদের কদর দিও। আর যারা ভুল করে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিও। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, সে ইচ্ছা করলে দুনিয়া ও তার চিত্তবৈভব গ্রহণ করতে পারে, অথবা আল্লাহর কাছে তার জন্য যা কিছু আছে তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বান্দা আল্লাহর কাছেত তার জন্য নির্ধারিত যা ছিল তাই গ্রহণ করে নিল।"

রুগ্নাবস্থায় রসূল সা. যা কিছুই বলতেন, তাতেই সাধারণভাবে বিদায়ী মনোভাব প্রকাশ পেত। কিন্তু উপরোক্ত ভাষণের শেষ বাক্য কয়টিতে খুবই স্পষ্ট ইংগিত ছিল। হযরত আবু বকর রা. এটা তৎক্ষণাত বুঝে ফেললেন এবং অধীরভাবে কাঁদতে লাগলেন।

এক পর্যায়ে তিনি নামাযের জামায়াতে হাজির হতেও অক্ষম হয়ে পড়লেন। তখন তিনি হযরত আবু বকর রা. কে নিজের জায়গায় ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে গেল। লোকেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে বারবার মসজিদে নববীর চারপাশে চক্কর দিতে থাকলে রসূল সা. হযরত আলী রা. ও হযরত ফযল বিন আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে এলেন এবং মিম্বরের সর্বনিম্ন ধাপে বসে একেবারেই সর্বশেষ ভাষণটি দিলেন এভাবে ঃ

"হে জনমন্ডলী, জানতে পারলাম যে তোমরা আমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন, তাদের কেউ কি চিরজীবী হয়েছেন? আল্লাহর কাছে আমাকেও যেতে হবে, তোমাদেরকেও যেতে হবে। আমি ওসিয়ত করছি, প্রথম যারা হিজরত করেছে, তাদের সাথে সদাচরণ কর এবং মোহাজেররাও যেন পরস্পরের সাথে সদাচরণ করে।" এরপর সূরা আল আসর পড়লেন এবং বললেন ঃ "সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে চলে। যে কাজে বিলম্ব প্রয়োজন, তাতে তাড়াহুড়ো করোনা। কেউ তাড়াহুড়ো পছন্দ করলেই আল্লাহ তাড়াহুড়ো করেননা। আমি ওসিয়ত করছি যে, আনসারদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। তারা তোমাদের আগেই মদিনাকে নিজেদের মাতৃভূমিতে পরিণত করেছে এবং ঈমান আনাকে নিজেদের দায়িত্ব গণ্য করেছে। তারা কি তোমাদেরকে তাদের ফসলে শরীক করেনি? তারা কি তোমাদেরকে জায়গা দেয়ার জন্য নিজেদের বাড়ীকে প্রশস্ত করেনি? তারা কি নিজেদের প্রয়োজন উপেক্ষা করেও তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়নি? তোমরা নিজেদেরকে তাদের ওপর অগ্রাধিকার দিওনা। আমি আগে চলে যাবো। তোমরা পরে এসে আমার সাথে মিলিত হবে। হাউজে কাওসারে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

এই ভাষণগুলোকে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু একটি মত এই যে, এই সব বক্তব্য একই ভাষণের অংশ। সম্ভবত এই মতটিই সঠিক।

সোমবারের দিন[৬] রসূল সা. এর স্বাস্থ্য শেষ বারের মত একটু স্বাভাবিক হলো। তিনি মেসওয়াক করলেন। পর্দা তুলে সমবেত সাহাবাদেরকে এক নজর দেখলেন এবং মুচকি হাসলেন। এর কয়েক মুহূর্ত পরই তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فِىْ الرَّفِيْقِ الاَعْلٰى

সেই সাথে হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে মহান আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

আজ সেই মহান সত্তা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, যিনি মানব জাতিকে নব জীবন দান করেছিলেন এবং যিনি মানব জাতির কাফেলাকে দস্যুদের কবলমুক্ত করে সঠিক পথে বহাল রাখার জন্য ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করেছিলেন অথচ দুনিয়ার জীবনে তার কোন বদলা নেননি।

রসূল সা. এর ঘনিষ্ঠতম ও সারা জীবনের সাথীদের জন্য এই মর্মান্তিক ঘটনা কতদূর শোকাবহ ছিল, তা কল্পনা করাও দুসাধ্য। যারা রসূল সা. কে এক নজর দেখেও নতুন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতেন, তাদের চোখে আকাশ পৃথিবী নিশ্চয়ই ঘুরপাক খেয়েছিল। তাদের কাছে হয়তো মনে হয়েছিল সমগ্র মানবেতিহাস ওলট পালট হয়ে গেছে। হযরত ওসমান রা. নির্বাক এবং হযরত আলী নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। হযরত ওমর মস্তিস্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস তো শোকাহত হয়ে মারাই গেলেন।

এই ভয়াবহ বিয়োগান্ত ঘটনা এমনিতেও ছিল এক শোকের পাহাড়। তদুপরি এটি সংঘটিত হলো এক চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে। একদিকে রোম সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে আগ্রাসনের আশংকা বিরাজ করছিল এবং সে জন্যই উসামার বাহিনী রওনা হচ্ছিল। অপরদিকে ইসলাম ত্যাগ ও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির হিড়িক চলছিল। তৃতীয় দিকে ইসলামী আন্দোলন পার্শবর্তী রাজ্যগুলোকে দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে খানিকটা হুমকিও দিয়ে রেখেছিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এ সমস্যাও ছিল যে, মোনাফেকির অবদমিত সমস্যাটা পুনরায় মাথা চাড়া দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রসূল সা. এমন সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, তারা অবিলম্বেই নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত ও অশান্ত মনকে শান্ত করে ফেললো। হতাশা ও অস্থিরতাকে কাটিয়ে বিদায় করে নিজেদের গুরুদায়িত্ব পালনের চিন্তায় মনোনিবেশ করলো। রসূল সা. এর ন্যায় ব্যক্তির ইন্তিকালে শোক পালন করার চাইতে অনেক বেশী গুরু দায়িত্ব তাঁর অনুসারীদের জন্য এই ছিল যে, তারা এই আন্দোলন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থীতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে, যা এরূপ পরিস্থিতিতে সামান্য শৌথিল্য দেখালেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি বহু বছর যাবত সমগ্র আন্দোলনের প্রাণশক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং সকল

---

৬. ইন্তিকালের তারিখ নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কোন রেওয়ায়েতে ১লা, কোন রেওয়ায়েতে ২রা, কোন রেওয়ায়েতে ১২ এবং কোন রেওয়ায়েতে ১৩ই রবিউল আউয়াল উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তারিখ হচ্ছে ১২ই রবিউল আউয়াল।

সাহাবীর পরিপূর্ণ আস্থা ও গভীর ভালোবাসার পাত্র ছিলেন, তাঁর আকস্মিক তীরোধানে সহসাই অত্যন্ত মারাত্মক শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এই শূন্যতাকে যথাসময়ে পূরণ না করলে ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিতে পারে। রসূল সা. এর হাতে গড়া মুসলিম সংগঠনটি নিজেদের দায়িত্ব সচেতনতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার নজীরবিহীন প্রমাণ এভাবে দিল যে, তৎক্ষণাত এই শূন্যতাকে পূরণ করে ফেললো এবং শৃংখলার বন্ধনকে মোটেই শিথিল হতে দিলনা। রসূল সা. এর স্থলাভিষিক্ত কে হবে, তা নিয়ে কোন দ্বন্দ্বসংঘাত হলোনা, তলোয়ার চালাচালিও হলোনা, কোন হৈ হাঙ্গামা হলোনা, সাকীফায়ে বনু সায়েদা চত্তরে মুসলিম জামায়াতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পরামর্শের জন্য বসলেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ইসলামের শুরায়ী তথা পরামর্শ ভিত্তিক গণতন্ত্রের আওতায় হযরত আবু বকর সিদ্দিককে প্রথম খলিফা নির্বাচন করা হলো। পরে মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশে সর্বসম্মতভাবে ঐ ফায়সালাকে অনুমোদন করা হলো।

রসূল সা. এর ইন্তিকালের পর রসূলের মহান দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটানো এবং রসূলের সূচিত অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করতে যে দৃঢ়তা অন্তর্দৃষ্টি ও দক্ষতার পরিচয় হযরত আবু বকর দেন এবং যেভাবে হযরত ওমর, ওসমান, আলী ও নেতৃস্থানীয় অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর সহযোগিতা করেন, মানবেতিহাসে তার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যাবে। রসূল সা. এর হাতে গড়া এই মানুষটি প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনিই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম নমুনা। নিঃস্বার্থ, সুদক্ষ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে তার কোন জুড়ি ছিলনা। কঠিনতম পরিস্থিতিতেও তিনি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলতেন না।

ইতিহাস সাক্ষী যে রসূল সা. এর তৈরী করা এই দল ও তার নেতারা কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী আন্দোলনকে দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং রসূল সা. এর জীবদ্দশায় ও তার পরে এই কাজের গতিতে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায়নি।

হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের ওপর দরূদ ও সালাম পাঠাও!

পৃথিবীতে আজ যদি মুসলমানের অস্তিত্ব বজায় থেকে থাকে, তবে তা এই মহান ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ফল। সত্য ও ন্যায়ের বাণী যদি আমাদের মনমগজে সক্রিয় হয়ে থাকে, তবে তা এই পবিত্র সত্তার পরিশ্রমেরই ফল। মানব জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁর কাছে যদি কোন আদর্শ ও কর্মসূচী থেকে থাকে, তাহলে তা মুহাম্মাদ সা. এরই সাধনা ও সংগ্রামেরই সুফল। আজ যদি আমাদের বুকে ইসলামী আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের আকাংখা দানা বাঁধে, তবে এই প্রিয় নবীর ত্যাগ তিতীক্ষার পবিত্র স্মৃতির কল্যাণেই দানা বাঁধবে। ইসলামী আন্দোলনের পদ্ধতি ও মহান আল্লাহর প্রেরিত এই পথ প্রদর্শকের বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকেই তা জানা সম্ভব। মানব জাতিকে আজ যদি কেউ নৈতিক মূল্যবোধ এবং সাফল্যের শাশ্বত মূলনীতি শিখাতে চায়, তবে সেটা স্বয়ং মুহাম্মদ সা. এর কাছ থেকেই অর্জন করতে হবে। রসূল সা. এর মত দাওয়াত দাতা, শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং নেতা যদি দুনিয়ায় না আসতো, তাহলে এই মূর্খতা ও অজ্ঞানতার ঘোর তমস্যা থেকে আজকের পৃথিবীকে মুক্ত করা সম্ভব হতোনা। তাই বলা যায়, রসূলই সা. ছিলেন সমগ্র ইসলামী বিপ্লবের মূল প্রাণশক্তি।

মহানবী সা. আমাদের ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে নিজেকে যে ভয়ংকর শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন এবং বাতিলের সাথে লড়াই করতে গিয়ে যে প্রাণান্তকর কষ্ট সহ্য করেছেন এবং কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই নিজের যথাসর্বস্ব এই পথে বিলিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর ইতিহাসের একটা নয়া যুগ, একটা পবিত্র সভ্যতা, ও একটা বিশাল আন্তর্জাতিক জাতি বা উম্মাত সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তার নিত্যনতুন জগত গড়ে তুলেছেন, সেই অসামান্য ও অসাধারণ কীর্তির জন্য আমাদের সমগ্র বিশ্ব মানবতা তার এই মহান বন্ধু ও অনুগ্রাহকের কাছে ঋণী। এত বড় উপকারের বিন্দুমাত্রও বিনিময় দান করতে আমরা অক্ষম। তাই হে মহান আল্লাহ! আমরা তোমারই কাছে আবেদন জানাই, তুমি আমাদের কৃতজ্ঞতার মনোভাবকে কবুল কর এবং তোমার রহমতের সীমাহীন ভান্ডার থেকে আমাদের পক্ষ থেকে এই অসামান্য অবদানের উপযুক্ত বদলা তাঁকে দান কর। রসূল সা. এর আত্মার ওপর রহমত, বরকত, ও শান্তি নাযিল কর, তাঁর মর্যাদা সমুন্নত কর এবং রসূল সা. এর দাওয়াত ও আন্দোলনকে পুনরায় বিজয় দান কর, বিস্তৃতি দান কর এবং তোমার আরো অধিক সংখ্যক বান্দাকে ইসলামী বিধানের কল্যাণ ও সুফল দ্বারা উপকৃত ও সমৃদ্ধ কর। তোমার কাছে এই মিনতিও জানাই যে, লেখককে এবং প্রত্যেক মুসলিম বান্দাকে রসূল সা. এর দাওয়াতের পবিত্র আমানত বহন করার তৌফিক দান কর এবং তাকে সমগ্র মানব জাতির নিকট পৌঁছানোর সৌভাগ্য দান কর। রসূল সা. এর চালু করা ইসলামী আন্দোলনকে আরো একবার জীবন্ত ও বাস্তব সত্যে পরিণত কর। রাসূল সা. এর উপস্থাপিত ন্যায় বিচার ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে রসূল সা. এর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার সংগ্রামে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের সৌভাগ্য আমাদের সবাইকে দান কর। কেননা তাঁর উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

কাজ এখনো অসম্পূর্ণ

এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তিনি আমার মত নগন্য বান্দাকে এই মহান কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন যে, আমি তাঁর এই শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনী ও জীবনের কীর্তি সমূহের একটা ঝলক পেশ করতে পেরেছি। এই কাজে আমি আমার সেই সুযোগ্য পূর্বসূরীদের কাছে অত্যধিক ঋণী, যারা এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থাবলী লিখে গেছেন। এছাড়া এ যুগের দু'জন গবেষক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং ডক্টর হামীদুল্লাহ সিদ্দীকী এম, এ, পি, এইচ,ডি'র কাছে আমি অত্যধিক ঋণী। এ দু'জনের কাছ থেকেই আমি এমন আন্দোলনমুখী দৃষ্টিভঙ্গী পেয়েছি, যা নবী জীবনীর অনেক নতুন দিক আমার সামনে উন্মোচিত করেছে। আমি আশা করি, এ পুস্তক পড়তে গিয়ে পাঠক কিছু নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন। আমি এই কাজে বিশেষভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগানোর জন্য শ্রদ্ধেয় প্রকাশকের কাছেও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ এই প্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্চারকারী বন্ধুদেরকে সকলকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন।

এ যাবত এ কাজটি যে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে চলে এসেছে, তা বড়ই শোচনীয়। কতবার কাজ হাতে নিয়েছি, আবার দীর্ঘ বিরতি পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। অনেক সময় মাসের পর মাস এক অক্ষরও লেখা হয়নি। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে বারবার শক্তি ও উৎসাহ যুগিয়েছে। একদিন সহসা মাথায় এই খেয়াল এল, সম্ভবত এটাই আল্লাহর ইচ্ছা যে, যে মহান সত্তার জীবন বৃত্তান্ত দুনিয়ার মানুষের কাছে পেশ করার বাসনা পোষণ করছি, তাঁর অভিজ্ঞতার শতভাগের বা হাজার ভাগের এক ভাগও তো আমার অর্জন করা দরকার। নচেত লেখায় সেই প্রাণস্পন্দন কোথা থেকে আসবে? এই খেয়াল আসার পর ইচ্ছাশক্তি এতটা মজবুত হলো যে, যখনই যেটুকু পেরেছি, কাজ এগিয়ে নিয়েছি। পুস্তকের শেষার্ধে বেশীর ভাগই বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখতে হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আমি এ কাজে নিজের সমস্ত শক্তি নিশেষ করে দিয়েছি। এ কারণেই আমার আশা যে, আল্লাহ এ কাজটা কবুল করবেন এবং একে আমার মুক্তি ও কল্যাণের উপায় বানাবেন।

প্রস্তাবিত নীল নকশা অনুসারে এ কাজ যতখানি করতে চাই, বর্তমান পুস্তকে সে তুলনায় কাজের অনেক খানি বাকী রয়েছে। সম্ভবত দু' তিন খন্ডে গিয়ে ঠেকবে। আসলে আপাতত একটি মাত্র দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছি। এটা এ দিক দিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত যে, এতে রসূল সা. এর সংগ্রামী জীবনের বিবরণ অনেকাংশে এসে গেছে। তবে কোন কোন দিক দিয়ে এটা সংক্ষিপ্ত। কেননা নবী জীবনের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আভাষও এতে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আমি এ আশংকাও করছি যে, কেউ কেউ এ দ্বারা কোন ভুল বুঝাবুঝিতে পড়ে যায় কিনা। এই যে কাজ বাকী রয়েছে, তা জানিয়ে দেয়া জরুরী।

অবশিষ্ট কাজ নিম্নরূপ ঃ

– যে ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে রসূল সা. এর জন্ম হয়েছে তার বিবরণ।

– রসূল সা. এর দাওয়াত ও তাঁর লক্ষ্যের বিশ্লেষণ। তিনি মানব জীবনে কোন্ কোন্ মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। রসূলের দাওয়াতের ধরন ও তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি।

– রসূল সা. এর নেতৃসুলভ প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা।

– রসূল সা. এর দাওয়াতের ফলে কি ধরনের মানুষ জন্ম নিয়েছিল?

– নারী সমাজ কিভাবে রসূল সা. এর সংগ্রামে সহযোগিতা করেছে?

– একটা স্বতন্ত্র খণ্ডে রসূল সা. এর সমগ্র সংস্কারমূলক কাজের বিবরণ এমন ভাবে পেশ করার ইচ্ছা আছে, যা দ্বারা আধুনিক যুগে উপকৃত হওয়া যাবে। রসূল সা. যে সব নতুন মূলনীতি, কর্মকুশলতা ও পর্যায়ক্রমিকতার সাথে জীবনের বিভিন্ন দিককে গড়ে তুলেছেন, বিভিন্ন নিবন্ধের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে হবে। যেমন খোদায়ী কর্মকৌশলের প্রকাশ, সমাজের নবীন ও প্রবীণদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন, গণচরিত্র গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কার, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তার স্থীতিশীলতা ও দৃঢ়তা, রাজনৈতিক অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ সমাজ ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন, ইসলামী সুবিচার ব্যবস্থার প্রচলন, নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন, এবং অন্যান্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপের তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ।

– রসূল সা. এর ইসলামী সরকারের প্রতিরক্ষা ও সামরিক তৎপরতা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ।

– আপত্তি উত্থাপনকারীদের আপত্তির জবাবে একটা আলাদা খন্ড লেখারও সম্ভাবনা রয়েছে। ঘটনাবলী, ব্যক্তিবর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলোর মতভেদ নিরসনে গবেষক সুলভ দৃষ্টি দান।

- নবীর জীবনী লেখার উৎসসমূহ এবং এ বিষয়ে এ যাবত কৃত কর্মের পর্যালোচনামূলক দৃষ্টি দান।

– এই সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র প্রস্তুত করার ইচ্ছা আছে, যা সামনে থাকলে ঘটনাবলী বুঝা সহজতর হবে। এ ক্ষেত্রে দেশে বেশ কিছু মূল্যবান কাজ হয়েছে। একে আরো এগিয়ে নেয়ার ইচ্ছা আছে। এমনও হতে পারে যে, রসূল সা. এর জীবনী ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে একটা আলাদা মানচিত্র তৈরী করা হবে। পুস্তকে লিখিত বিভিন্ন তথ্যকে একটা প্রাচীর মানচিত্রে একত্রিত করার ইচ্ছা আছে।

– এই পুস্তকের অনুবাদ অন্তত ইংরেজী, বাংলা, আরবী ও হিন্দীতে করানোর ইচ্ছা আছে। এভাবে এর উপকারিতা আরো বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ যেন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার তৌফিক দেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরনাদির সংস্থান ও অনুকুল পরিবেশ বিশেষ রহমত দ্বারা সৃষ্টি করে দেন।

নঈম সিদ্দীকী

মার্চ, ১৯৬০

পরিশিষ্ট – ১

নবী জীবনের ঘটনাবলী ঃ কালগত ধারা বিন্যাস

পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়গুলোতে মোটামুটিভাবে কালগত ধারাবিন্যাস করা হয়েছে। তবে খুঁটিনাটি বিষয়গুলোতে এই ধারাবিন্যাসের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন সময়কার ঘটনাবলীকে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনী শাস্ত্রে ঘটনাবলীর কালগত ধারাবাহিকতা খুবই গুরুত্ববহ। এই প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে নিম্নের নকশাটি পরিশিষ্ট হিসেবে পুস্তকের অর্ন্তভুক্ত করা হচ্ছে, যাতে করে এক নজরে নবী জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যে যে কারণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিন ও তারিখ সম্পর্কে মতভেদ ঘটে তা নিম্নরূপ ঃ

রসূল সা. এর নবুয়ত লাভের পূর্বেকার ঘটনাবলীকে "আমুল ফীল" "তথা "হস্তিবাহিনীর কা'বা আক্রমণের সন" বা রসূল সা. এর জন্মের সনের হিসেব অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং এই সব সনকে খৃষ্টীয় সনের সাথে সমন্বিত করা হয়। হস্তিবাহিনীর সন–১ এবং রসূল সা. এর জন্মের সন–১ যদিও মোটামুটিভাবে একই সন, কিন্তু হস্তিবাহিনীর সনের প্রথম দিন ছিল হস্তিবাহিনীর আক্রমণের দিন। (অর্থাৎ ১৭ই মুহাররম বৃহস্পতিবার)। পক্ষান্তরে রসূল সা. এর জন্মের সন হস্তী সন শুরুর ৫০ বা ৫৫ দিন অর্থাৎ প্রায় দু'মাস পর শুরু হয়। উভয় সনের এই পার্থক্যকে ঐতিহাসিকগণ ও বর্ণনাকারীগণ হয় পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করেছেন, নয়তো তারা উল্লেখ করেননি যে, কোন সন বুঝাচ্ছেন। এরফলে একটি বছর শুরু হচ্ছে রবিউল আউয়াল থেকে, অপরদিকে প্রচলিত চন্দ্র বছর শুরু হয় মুহাররম থেকে। এভাবে হিসাবের গোলমাল বেড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ যদি জন্মের বছরের শুরু মহাররম মাস থেকে ধরা হয়, তাহলে হিজরত সংঘটিত হয় চতুর্দশ জন্ম বছরে। কিন্তু যদি বছরের শুরু রবিউল আওয়াল থেকে ধরা হয়, তাহলে হিজরত সংঘটিত হয় জন্ম সনের ত্রয়োদশ বছরে। ঐতিহাসিকগণ উভয় সনই লিখেছেন।

হযরত ওমর রা. নিজ খেলাফত যুগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামী হিজরী সন চালু করেন ১৭ হিজরীর ২০শে জমাদিউস সানী তারিখ বৃহস্পতিবার। এর আগে হিজরী সন নিয়মিতভাবে চালু ছিলনা এবং ঐ সন অনুসারে ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ রেওয়াজও ছিলনা। এ জন্য সহীহ হাদীস গ্রন্থ সমূহে কোন্ ঘটনা কোন্ হিজরী সনে ঘটেছিল, তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়না। হিজরী সনকে গ্রহণ করার পর সাবেক ঘটনাবলীর কালগত ধারাবিন্যাস হিজরী সন অনুসারে করা হতে থাকে।

এরপর হিজরত থেকে যে চন্দ্রবর্ষ গণনা শুরু হয়, তাও দু'ভাগে গণনা করা যায়। একটা হলো, হিজরতের মাস, রবিউল আউয়াল থেকে বর্ষের গণনা শুরু করা। অপরটি হিজরতের বর্ষ গণনা করে চন্দ্র বর্ষের প্রচলিত প্রথম মাস মুহাররম থেকেই গণনা শুরু করা। এর অর্থ দাঁড়ায়, প্রথম হিজরী বর্ষ রবিউল আউয়াল থেকে যিলহজ্জ পর্যন্ত দশ

মাসের গণনা করা হবে। হাদীস বিশারদগণ, সীরাত লেখকগণ ও ঐতিহাসিকগণ হিজরী বর্ষকে এই দু'ভাগেই গণনা করেছেন। কিন্তু বর্ষকে কিভাবে গণনা করা হয়েছে , সেটা সুস্পষ্টভাবে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তারিখের সাথে যে দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই দুটোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। দুটোর মধ্যে যেটির নির্ভরযোগ্যতা পাওয়া যায় অথবা রেওয়ায়েতের মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়, সেটিকে ভিত্তি করে অপর দিকটা হিসাব করে স্থির করা হয়।

সবচেয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় ক্যালেণ্ডার ও বিভিন্ন বর্ষধারার সমন্বয় করতে গিয়ে। কেননা ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে কোন নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার বা বর্ষধারার উল্লেখ নেই। ক্যালেন্ডারের এই হেরফের এ কারণেও বেড়ে যায় যে, বিভিন্ন সৌরবর্ষ ছাড়াও খোদ্ খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারও কখনো কখনো এক সাথে একাধিক চালু থাকতো; একটা সৌর ক্যালেন্ডার, অপরটা চন্দ্র ক্যালেন্ডার। তাছাড়া খৃষ্টীয় ও অন্যান্য ক্যালেন্ডারের নিয়মে রদবদল হতে থাকতো। এখন কয়েক শতাব্দি পর দিন ও তারিখের সমন্বয়ের হিসাব করতে গেলেই বিভিন্ন দিক দিয়ে মতভেদের অবকাশ সৃষ্টি হয়ে যায়।

কিছু কিছু ঘটনা ও কর্মকান্ডকে তার সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ সহকারে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়নি। কোরআন ও হাদীসের আলোকে শুধু এতটুকুই নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে, কোন ঘটনা অমুক ঘটনার আগে বা পরে ঘটেছে। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা (যেমন তায়াম্মুমের অনুমতি, নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে তথা মুত্য়া বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা, পর্দার বিধান বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন চুক্তি, যুদ্ধ ও সেনাদল প্রেরণ) সম্পর্কে তারিখ নির্ণয় ছাড়া নিছক ভাসাভাসা কালগত ধারাবাহিকতা স্থির করার ব্যাপারেও হাদীসের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী।

মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, রসূল সা. এর জীবনের সবকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বিশদভাবে সুনিশ্চিত দিন তারিখ নির্ণয়সহ পেশ করা কঠিন। বড় বড় সীরাত লেখক, মুফাসসির, হাদীসবিশারদ, ফেকাবিদ— যারা সুখ্যাতি সম্পন্ন তথ্য অনুসন্ধান করতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যেও দিন তারিখ নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে ও বিপক্ষে দীর্ঘ যুক্তিতর্ক রয়েছে।

বর্তমান সীরাত গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে আমি এই সব মতভেদ ও ক্যালেন্ডারের হিসাব নিয়ে যথাসাধ্য অধ্যয়ন, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তাগবেষণার পর একটা নির্দিষ্ট মত 'আলোচ্য ঘটনাসূচী'তে স্থির করে দিয়েছি এবং গুরুত্বপূর্ণ মতবেধগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। সব ক'টা ভিন্নমতকে সবিস্তারে উল্লেখ করে পাঠককে বিব্রত করা যেমন সমীচীন ছিলনা, তেমনি তার অবকাশও এখানে ছিল না। এ কাজ যদি করাও হয়, তবে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে করা দরকার। আমাদের এই 'ঘটনাসূচী'তে হিজরতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীকে হয় 'আমুল ফীল' (হস্তি বাহিনীর আগ্রাসন বর্ষ) অথবা রসূল সা. এর জন্ম বর্ষের হিসাব অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে, নচেত নবুয়ত বর্ষ হিসাবে কোথাও কোথাও রাসূল সা. এর বয়সকেই সময় নির্ণয়ের মাপকাঠি ধরা হয়েছে।

(১) রসূল সা. এর জন্ম দিন	বসন্তকালের সোমবার (এই দিন সম্পর্কে মতৈক্য রয়েছে) তারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল, হস্তি বর্ষ-১, (হস্তিবাহিনীর আক্রমণের ৫০ দিন পর) মোতাবেক ২২শে এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ, ১লা জৈষ্ঠ, ৬২৮ বিক্রমাব্দ সুবহে সাদেক (সূর্যোদয়ের পর)। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে ১২ই রবিউল আউয়াল।	তাবারী ও ইবনে খালদুন ১২ রবিউল এবং আবুল মিকদাদ ১০ই রবিউল আওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু সোমবার সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। অথচ সোমবার ৯ই রবিউল আউয়ালেই পড়ে। তাই মুহাম্মদ তালাত বেগ (আরব ঐতিহাসিক) এবং কাযী সুলায়মান মানসূর পুরী পঞ্জিকার হিসাব নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করার পর ৯ই রবিউল আউয়ালের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। মিশরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে বলেছেন, রসূল সা. এর জন্ম তারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দে। আল্লামা শিবলী নোমানীও এই মতকে সমর্থন দিয়েছেন। তবে গ্রেগরিয়ান নিয়মে দিনটা হয় ২২শে এপ্রিল। এই নিয়মের অধীন ১৭৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে নতুন খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার চালু হয়েছে। প্রাচীন ক্যালেন্ডারের নিয়মানুসারে ঐ দিনটি নির্দ্ধারিত হয়েছে ১৯শে এপ্রিল সন জুলিয়ান ৫২৮৪ অব্দ। রসূল সা. এর জন্ম হস্তিবাহিনীর আক্রমণের ৫৫ দিন পর না ৫০ দিন পর হয়েছিল, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে, তা দৃশ্যত ৫০দিন পরের মতটাই সঠিক বলে মনে হয়। আসাহাহুস্ সিয়ার গ্রন্থকার মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরি ৮ বা ১২ই রবিউল আউয়াল উল্লেখ করেছেন, তবে যুক্তিতর্কের উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ ১লা মুহাররম এবং খৃষ্টীয় তারিখ হিসাবে ১২ বা ১৫ই ফেব্রুয়ারী উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাকের মতে ১২ই রবিউল আউয়াল রাত অতিবাহিত হওয়ার পর রসূল সা. এর জন্ম হয়। আমার দৃষ্টিতে ৯ই রবিউল আউয়ালের মতটাই অগ্রগণ্য মনে হয়।
(২) দুধ খাওয়ার মেয়াদ শুরু	৪ মাস বয়সে	জন্মের ২ বা তিন দিন পর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছাওবিয়ার দুধ কয়েকদিন পান করেন। নিয়মিত দুধ খাওয়ার মেয়াদ তিনি ধাত্রী হালিমার বাড়ীতেই কাটান। এই বাড়ী মরুভূমির ভেতরে অবস্থিত।
(৩) রসূল সা. এর মায়ের ইন্তিকাল	৬ বছর বয়সে।	
(৪) রসূল সা. দাদার ইন্তিকাল	৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে।	
(৫) প্রথম সিরিয়া সফর (চাচা আবু তালেবের সাথে)	১২ বছর ২ মাস বয়সে।	খৃষ্টান সন্যাসীর বুহায়রার সাথে সাক্ষাত হয় এই সফর কালেই।
(৬) ফুজ্জার যুদ্ধে প্রথম অংশ গ্রহণ	১৫ বছর বা কিছু বেশী বয়সে।	
(৭) ফুজ্জার যুদ্ধে দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ	প্রথমবারের কিছুকাল পরে। সময় অজ্ঞাত।	

(৮) সংস্কারমূলক সংগঠন হিলফুল ফুযুলে যোগদান	১৬ বছর বয়সে।	
(৯) সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর ব্যবসায়ী হিসেবে	২২ বা ২৫ বছর বয়সে।	
(১০) হযরত খাদীজার সাথে বিয়ে	২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে।	
(১১) রহস্যময় ঘটনাবলীর সূচনা	নবুয়তের ৭ বছর আগে, ৩৩ বছর বয়সে।	
(১২) সালিশ নির্বাচিত হওয়া	৩৫ বছর বয়সে।	কা'বা শরীফের সংস্কারের সময় হজরে আসওয়াদ পুনস্থাপন নিয়ে বিরোধ বাধে। সবাই তাকে বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করে সালিশ মানে। তিনি বিরোধের চমৎকার নিষ্পত্তি করেন।
(১৩) নবুয়ত লাভ	৪০ বছর ১১ দিন বয়সে। ৯ই রবিউল আউয়াল জন্ম সন ৪১, মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী, ৬১০ খৃষ্টাব্দ, সোমবার।	এই তারিখটা নিয়েও বিস্তর মতভেদ রয়েছে। একটি মতানুসারে চন্দ্র বর্ষের ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৪০ বছর ৬ মাস ১৬ দিন এবং সৌর ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৩৯ বছর ৩ মাস ১৬দিন বয়সে। নবুয়তের খোদায়ী ঘোষণা হেরা পর্বত গুহায় নাযিল হয়। তারিখটা ছিল কারো মতে ২৫শে রমযান, কারো মতে ১৩ই রবিউল আউয়াল। খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১২ই ফেব্রুয়ারী ও ৬ই আগষ্ট ৬১০ খৃষ্টাব্দও বলা হয়েছে। তবে এই সমস্ত মতভেদ পঞ্জিকার হিসেবের জটিলতা থেকে উদ্ভূত। অস্পষ্টতার আরো একটা কারণ এই যে, নবুয়তের ঘোষণা এবং কোরআন নাযিল হওয়ার সময়টা হাদীসের বর্ণনাতেই দু' রকমের। যাদুল মায়াদে ৮ তারিখ লেখা হয়েছে। কিন্তু পঞ্জিকার হিসেব অনুসারে সোমবার পড়ে ৯ তারিখে। নবুয়াতের ঘোষণা দেয়া হয় এভাবে যে, হযরত জিবরীল গুহার ভেতরে তাঁর সামনে এসে বললেন, "সুসংবাদ নিন। আপনি আল্লাহর রসূল। আর আমি জিবরীল।" হযরত জিবরীলকে এভাবে প্রকাশ্যে দেখে তিনি কিছুটা ভড়কে যান এবং হযরত খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা দেন।
(১৪) নামায ফরয হওয়া (ফযর ও আছরের দুই দুই রাকায়াত)	৯ই রবিউল আউয়াল নবুয়ত লাভের দিন।	
(১৫) কোরআন নাযিল হওয়ার সূচনা	১৮ই রমজান, নবুয়ত বর্ষ-১ শুক্রবার (রাত্রে) মোতাবেক ১৭ই আগষ্ট, ৬১০ খৃ:।	এ পর্যায়ে সূরা আলাক নাযিল হয়। তাবারী ১৭ ও ১৮ এই দুটো তারিখই লিখেছেন। কিন্তু পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে ১৮ই রমযান শুক্রবার হয়।
(১৬) গোপন দাওয়াতের কাজ শুরু	নবুয়ত বর্ষ ১ থেকে ৩ পর্যন্ত।	আরকাম মাখযুমীর সাফা পাহাড়ে অবস্থিত বাড়ীটি ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় প্রায় ৪০ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। শহরের বাইরে গিয়ে গোপনে নামায পড়া হতো।

(১৭) নবুয়তের ঘোষণা (প্রথম ভাষণ)	নবুয়ত বর্ষ -৩ (শেষের দিকে)।	
(১৮) বিরোধিতার প্রথম যুগ (ঠাট্টা বিদ্রুপ, অপপ্রচার, ও অল্প স্বল্প নির্যাতন)	নবুয়ত বর্ষ-১ থেকে ৫ পর্যন্ত বিস্তৃত।	আবু তালেবের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য কোরায়েশ প্রতিনিধি দলের আলোচনা অব্যাহত। বিরোধিতার জন্য নানা রকম কৌশল উদ্ভাবন।
(১৯) প্রচন্ড বিরোধিতার দ্বিতীয় যুগ (সর্বব্যাপী যুলুম নিপীড়ন)	৫ থেকে ৭ম নবুয়ত বর্ষ।	
(২০) আবিসিনিয়ায় হিজরত	জন্ম বর্ষ ৪৫ এর রজব মাস, নবুয়ত বর্ষ-৫	
(২১) হযরত হামযা ও হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ	নবুয়ত বর্ষ-৬	হযরত ওমর রা. হামযার তিন দিন পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, নবুয়তের দ্বিতীয় বছর হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ করেন।
(২২) রসূল সা. এর গোত্র বনু হাশেমের নজরবন্দী ও অবরোধ "শিয়াবে আবু তালেব" নামক পার্বত্য উপত্যকায়	১লা মুহররম, ৭ম নবুয়ত বর্ষ, ৪৭তম জন্ম বর্ষ,মঙ্গলবার।	
(২৩) নজরবন্দী ও অবরোধের অবসান	নবুয়ত বর্ষ-৯ এর শেষ ভাগ বা নবুয়ত বর্ষ ১০ এর প্রথম ভাগ।	
(২৪) "শোকাবহ বছর" আবু তালেব ও হযরত খাদীজার ইন্তিকাল	নবুয়ত বর্ষ-১০	আবুতালেবের মৃত্যুর ৩ বা ৫ দিন পর হযরত খাদীজা রমজান মাসে ইন্তিকাল করেন।
(২৫) তায়েফ সফর	জমাদিউস সানী জন্ম বর্ষ -৫০ নবুয়ত বর্ষ-১০।	মতান্তরে ২৬-২৭ শওয়াল, নবুয়ত বর্ষ-১০।
(২৬) মেরাজ	২৭শে রজব, জন্মবর্ষ-৫০ নবুয়ত বর্ষ-১০ সোমবার (রাত্রে)।	
(২৭) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ	২৭শে রজব, জন্মবর্ষ-৫০ নবুয়ত বর্ষ-১০, সোমবার (রাত্রে)।	
(২৮) মদিনায় ইসলামের সূচনা	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ-৫০। নবুয়ত বর্ষ-১০।	আয়াস বিন মুয়ায সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
(২৯) ৬ জন মদীনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ	যিলহজ্জ, জন্মবর্ষ -৫১। নবুয়ত বর্ষ-১১।	
(৩০) প্রথম আকাবার বায়য়াত (১২ ব্যক্তি)	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ-৫২। নবুয়ত বর্ষ-১২।	
(৩১) দ্বিতীয় আকাবার বায়য়াত (৭৫ ব্যক্তি)	জিলহজ্জ, জন্মবর্ষ-৫৩। নবুয়ত বর্ষ - ১৩।	
(৩২) হিজরত ক. মক্কা থেকে সূর পর্বত গুহা	২৬শে সফর (রাত) জন্ম বর্ষ- ৫৩ নবুয়ত বর্ষ-১৩ ।	এই ঘটনার সময় রসূল সা. বয়স ৫৩ পার হয়ে ৫৪-তে এবং নবুয়তের ১৩ বছর পার হয়ে ১৪ বছরে পদার্পণ করে।

খ. সূর পর্বত গুহা থেকে যাত্রা শুরু	১লা রবিউল আউয়াল সোমবার, মোতাবেক ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৬২১ খৃঃ।	
গ. কোবায় উপস্থিতি	৮ই রবিউল আউয়াল জন্ম বর্ষ-৫৩, নবুয়ত বর্ষ-১৩ মোতাবেক, ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ সোমবার।	
ঘ. কোবা থেকে মদিনায় যাত্রা ও মদিনায় প্রবেশ	১২ই রবিউল আউয়াল হিজরী বর্ষ-১ নবুয়ত বর্ষ-১৪ শুক্রবার।	বনুসালেম গোত্রের এলাকায় জুমুয়ার নামায আদায় করেন। কারো কারো মতে তিনি ১৪ দিন কোবায় অবস্থান করেন।
(৩৩) মসজিদ নববীর ভিত্তি স্থাপন	রবিউল আউয়াল হিজরী বর্ষ-১।	
(৩৪) ফরয নামাযের রাকাত বৃদ্ধি	রবিউস সানী, হিজরী-১	জোহর, আসর ও এশার চার চার রাকাত নামায ফরয করা হয়।
(৩৫) মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভ্রাতৃত্ব	হিজরী বর্ষ-১ এর প্রথম তিনমাস।	হযরত আনাসের বাড়ীতে ভ্রাতৃত্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে রসূল সা. এর সামনে ৯০ জন আনসার ও মোহাজেরের উপস্থিত।
(৩৬) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মদিনার জনগণের পারস্পরিক সাংবিধানিক চুক্তি সম্পাদন।	হিজরী বর্ষ-১। -এর মধ্যভাগ।	
(৩৭) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন শুরু	হিজরতের ৭ম মাসের শুরুতে	সামরিক মহড়া ও টহলদানের জন্য একের পর এক তিনটে সেনাদল প্রেরণ-(১) সপ্তম মাসে হযরত হামযার নেতৃত্বে ৩০ ব্যক্তির সেনাদল সাইফুল বাহ্‌র পর্যন্ত চলে যায়। (২) ৮ম মাস শওয়ালে ৬০ বা ৮০ জনের বাহিনী উবাইদা ইবনুল হারেসের নেতৃত্বে রাবেগ পর্যন্ত গমন করে। (৩) নবম মাস জিলকদে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ২০ জনের সেনাদল খায়বার পর্যন্ত যায়। এর পর রাসূল সা. স্বয়ং একটি দল নিয়ে ওয়াদ্দান পর্যন্ত যান। এই বাস্তব পরিস্থিতির কারণে জেহাদের অনুমতি সম্বলিত বিখ্যাত আয়াত হিজরী ২ সালে নাযিল হয়েছে- এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত হতে পারিনি। হিজরী ২ সালে আসলে সশস্ত্র জেহাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আগে সংঘর্ষে যাওয়া থেকে বিরত থাকা হতো। কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই কোন না কোন আয়াত নাযিল হওয়া দরকার ছিল। এ জন্যই জেহাদের অনুমতি সম্বলিত আয়াত হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলিম জামায়াতের মন দাওয়াতের ধৈর্যের যুগ থেকে অনাগত জেহাদের যুগের দিকে স্থানান্তরিত হোক এবং তারা যেন মদিনায় পৌঁছা মাত্রই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত ও বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করে।

(৩৮) হযরত আয়েশার রসূলের হেরেমে আগমন	শওয়াল-১ম হিজরী।	
(৩৯) দু'জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ সাবেক ইহুদী আলেম আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং খৃষ্টান সন্যাসী আবু কায়েস সারহা।	হিজরী বর্ষ-১।	
(৪০) জেহাদের অনুমতি (সক্রিয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি)	১২ই সফর, হিজরী বর্ষ-২, বা হিজরতের ১ বছর ২ মাস ১দিন পর।	
(৪১) রসূল সা. এর প্রথম সশরীরে সামরিক ও রাজনৈতিক সফর ওয়াদ্দান অভিযান	সফর মাস হিজরী-২ হিজরতের ১২শ মাসে।	
(৪২) বহিরাগত গোত্রগুলোর সাথে চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী- বনু যামরা, বুয়াতবাসী, - বনু মুদলিজ	সফর থেকে জমাদিউস সানী-হিজরী-২।	ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে এটাও জানা যায় যে, জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী জুহাইনী বনু যামরা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আগে থেকেই মদিনার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক রাখতো।
(৪৩) কারয বিন জাবের ফেহরীর ডাকাতি (শত্রুর প্রথম আগ্রাসী তৎপরতা)	রবিউল আউয়াল হিজরী-২।	
(৪৪) নাখলার ঘটনা (মুসলিম সেনাদলের সাথে প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ)	রজবের শেষ ভাগ, হিজরী-২ ।	আমর বিন হাযরামী নামক একজনন কাফের নিহত। উট ও মালপত্র সমেত ২ জন বন্দীকে মদিনায় আনয়ন। রসূল সা. কর্তৃক এই সংঘর্ষে অসন্তোষ প্রকাশ।
(৪৫) সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-২।	
(৪৬) আযানের প্রচলন	হিজরী-২।	
(৪৭) যাকাত ফরয হয়	হিজরী-২।	
(৪৮) কেবলা পরিবর্তন	১৫ই শাবান, হিজরী-২ সোমবার।	
(৪৯) রমযান মাসের রোযা ফরয হয়	১লা রমযান, হিজরী-২ বুধবার।	যেহেতু অধিকাংশ বর্ণনা মোতাবেক বদর যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ১৭ই রমযান শুক্রবার ছিল, তাই হিসাব অনুযায়ী ১লা রমযান বুধবার হওয়ারই কথা। এ জন্য যে বর্ণনায় ১লা রমযান রবিবার বলা হয়েছে, সেটি আমরা বাদ দিয়েছি।
(৫০) ঈদুল ফেতরের নামায জামায়াতে পড়া ও ফেতরা দেয়ার বিধান চালু	১লা শওয়াল, হিজরী-২।	
(৫১) বদর যুদ্ধ (সর্বপ্রথম নিয়মিত যুদ্ধ) - মদিনা থেকে যাত্রা -যুদ্ধ	৮ই রমযান, হিজরী-২ বুধবার, অথবা ১২ই রমযান	জটিল সমস্যা এইযে, যুদ্ধের দিন ও তারিখ সম্পর্কে অনেকাংশে মতৈক্য থাকলেও মদিনা থেকে যাত্রার তারিখ কারো মতে ১২ই এবং

ঘটনা	সময়	মন্তব্য
-মদিনায় বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন -		কারো মতে ৮ই রমযান। যারা ৮ তারিখ লেখেন তারা ঐ দিন সোমবার বলে উল্লেখ করেন। অথচ ১৭ তারিখ শুক্রবার হলে ৮ তারিখ কিছুতেই সোমবার হতে পারেনা। তাই আমরা ৮ই রমযানের বর্ণনায় বুধবার এবং ১২ই রমযানের বর্ণনায় শনিবার উল্লেখ করেছি। তবে যে বর্ণনায় ১৭ই রমযানকে মংগলবার বলা হয়েছে, সেটিকে সঠিক মেনে নিলে ১লা ও ৮ই রমযান রবিবার হওয়ারই কথা।
(৫২) হযরত আলী ও ফাতেমার বিয়ে	বদরযুদ্ধের পর হিজরী-২।	
(৫৩) বনুকাইনুকা অবরোধ	শওয়ালের মাঝামাঝি থেকে যিলকদের প্রথম ভাগ পর্যন্ত-হিজরী-২।	
(৫৪) হযরত ওমরের মেয়ে হাফসার সাথে রাসূল সা. এর বিয়ে	হিজরী-৩।	
(৫৫) হযরত উসমান ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে (রসূল সা. এর মেয়ে)	হিজরী-৩।	
(৫৬) মদের প্রথম নিষেধাজ্ঞা	হিজরী-৩।	
(৫৭) কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা	হিজরী-৩ সাল।	
(৫৮) ইমাম হাসানের জন্ম	হিজরী-৩ সাল।	
(৫৯) ওহুদ যুদ্ধ ঃ মদিনা থেকে যাত্রা	৫ শওয়াল, হিজরী-৩। জুমার নামাযের পর।	
-যুদ্ধ	৬ই শওয়াল-শনিবার।	
- হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান বাহিনীকে ধাওয়া	৭ই শওয়াল রবিবার	
(৬০) সুদ ত্যাগের প্রাথমিক নির্দেশ	ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর	সূরা আল-ইমরান আয়াত- ১৩০ দেখুন।
(৬১) এতিমদের সম্পত্তি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী	ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর।	
(৬২) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন	হিজরী-৩, ওহুদ যুদ্ধের পর।	
(৬৩) বিয়ের আইন, স্বামীস্ত্রীর অধিকার মোশরেক মহিলা বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা	হিজরী-৩।	
(৬৪) হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মার রা. সাথে রসূল সা. এর বিয়ে	হিজরী-৩ এর শেষ ভাগ।	ওহুদ যুদ্ধে বিধবা হন।
(৬৫) রজী'র দুর্ঘটনা (দশ সদস্য বিশিষ্ট দাওয়াতী দলের শাহাদাত)	সফর, হিজরী-৪।	
(৬৬) বনু নযীরের যুদ্ধ	রবিউল আউয়াল হিজরী-৪।	

(৬৭)	উম্মুল মুমিনীন যয়নম বিনতে খুযায়মার ইন্তিকাল	৪র্থ হিজরীর প্রথম ভাগ।	বিয়ের মাত্র দুতিন মাস পর ইন্তিকাল করেন।
(৬৮)	পর্দার বিধান কার্যকর	১লা যিলকদ, হিজরী-৪. শুক্রবার।	
(৬৯)	মদের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ	হিজরী-৪।	
(৭০)	দ্বিতীয় বদর অভিযান	যিলকদ, হিজরী-৪।	আবু সুফিয়ান তার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে আসেনি, যুদ্ধ হয়নি।
(৭১)	দুমাতুল জান্দাল অভিযান	রবিউল আউয়াল হিজরী-৫।	
(৭২)	বনুল মুসতালিক অভিযান	৩রা শাবান, হিজরী-৫।	
(৭৩)	তায়াম্মুমের বিধান নাযিল	বনুল মুসতালিক সফরে	
(৭৪)	হযরত জুয়াইরিয়ার সাথে রসূল সা. এর বিয়ে	শাবান, হিজরী-৫।	
(৭৫)	হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা	শাবান, হিজরী-৫।	
(৭৬)	ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ও দম্পতির পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত বিধান ও পর্দার বিস্তারিত বিধান প্রবর্তন	হিজরী-৫। (হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনার পর)	
(৭৭)	আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ	শওয়াল বা যিলকদ হিজরী-৫।	
(৭৮)	মদিনায় দাওস গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন	হিজরী-৫	৭০/৮০টি মুসলিম পরিবারের এক বিশাল দল মদিনায় এসেছিল।
(৭৯)	বনু কুরায়যার উচ্ছেদ	যিলহজ্জ, হিজরী-৫।	
(৮০)	হযরত যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রসূল সা. এর বিয়ে	হিজরী- ৫।	
(৮১)	নাজদের সরদার ছামামা বিন আছাল হানাফীর ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-৬।	
(৮২)	হোদায়বিয়ার সন্ধি	জিলকদ, হিজরী-৬।	
(৮৩)	হোদায়বিয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন	জিলহজ্জ, হিজরী-৬।	
(৮৪)	খালেদ বিন ওলীদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণ	জিলহজ্জ, হিজরী-৬।	
(৮৫)	আন্তর্জাতিক দাওয়াতের সূচনা (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের নামে চিঠি প্রেরণ)	১লা মুহাররম হিজরী-৭। বুধবার।	
(৮৬)	খয়বরের যুদ্ধ	মুহাররম, হিজরী-৭।	
(৮৭)	হযরত সফিয়ার সাথে রসূল সা. এর বিয়ে	মুহাররম হিজরী-৭।	
(৮৮)	আবিসিনিয়ার মোহাজেরদের প্রত্যাবর্তন	খয়বর বিজয়ের সময় হিজরী-৭।	

(৮৯)	সাইফুল বাহর নামক স্থানে স্বাধীন মুসলিম শিবির স্থাপন	হিজরী-৭ এর শুরু।	হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রসূল সা. মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মদিনায় আশ্রয় দিতে অসমর্থ ছিলেন। তাই আবু জানদাল ও আবু বসীর সহ বেশ কিছু নির্যাতিত মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে সাইফুল বাহারে সমবেত হন।
(৯০)	সাইফুল বাহারের জওয়ানদের পথ থেকে কোরায়েশ কাফেলার ওপর গেরিলা আক্রমণ	সফর, হিজরী-৭।	
(৯১)	ওমরাতুল কাযা	যিলকদ, হিজরী-৭।	
(৯২)	বিয়ে ও তালাকের বিধান প্রবর্তিত	হিজরী ৭।	
(৯৩)	হযরত মায়মূনার সাথে রসূল সা. এর বিয়ে (মক্কায়)	হিজরী ৭।	
(৯৪)	জাবালা গাসসানীর ইসলাম গ্রহণ	হিজরী ৭	
(৯৫)	মূতার যুদ্ধ	জমাদিউল উলা হিজরী ৭	
(৯৬)	মক্কার মোশরেকদের পক্ষ থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ	রজব, হিজরী ৮।	
(৯৭)	**মক্কা অভিযানঃ**		
	- মদিনা থেকে যাত্রা-	১০ রমযান, বুধবার। ৮ম হিজরী।	বিশস্ত সূত্রে এও জানা যায় যে, রসূল সা. ১৮ই রমযান পর্যন্ত মদিনায় ছিলেন।
	- মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ-	২০শে রমযান	এ হিসাবে মক্কা প্রবেশের তারিখ ২৯ বা ৩০শে রমযান হওয়ার কথা।
	- নাখলায় অবস্থিত উযযার মন্দির ধ্বংস করার জন্য খালেদের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ	২৫ রমযান হিজরী-৮।	
	- সুয়া' মন্দির ধ্বংস করার জন্য আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ	রমযান, হিজরী-৮।	
	- মানাত মন্দির ধ্বংসের জন্য সা'দ আশহালীর নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ	রমযান, হিজরী-৮।	
	- মক্কায় অবস্থান	৯ই শওয়াল পর্যন্ত।	অন্য বর্ণনা অনুসারে ১৮ই শওয়াল পর্যন্ত।
	- হোনায়েন যুদ্ধ	শওয়াল, হিজরী-৮।	
	- তায়েফ অবরোধ	শওয়াল যিলকদ ১৮ থেকে ২০ দিন	মাকলুলের বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ দিন ব্যাপী অবরোধ।
	- জারানায় গনীমত বন্টনের পর জারানার ওমরা	জিলকদ, হিজরী-৮।	

(৯৮)	সূদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির আইন	মক্কা বিজয়ের সময় হিজরী-৮।	সূদের সমস্ত দাবী বাতিল (বাকারা ঃ ২৭৮)
(৯৯)	মদিনায় সাদার প্রতিনিধি দলের আগমন	হিজরী-৮।	
(১০০)	রসূল সা. এর কন্যা হযরত যয়নবের ইন্তিকাল	হিজরী-৮।	
	- রসূল সা.এর ছেলে হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকাল	হিজরী-৮।	
(১০১)	যাকাত ব্যবস্থা। যাকাত আদায় কারীদের প্রথম নিয়োগ	মুহাররম, হিজরী-৯।	
(১০২)	তবুক যুদ্ধ	রজব, হিজরী-৯। মোতাবেক নভেম্বর ৬৩৫ খৃঃ।	
	- মদিনা থেকে যাত্রা শুরু	বৃহস্পতিবার।	
(১০৩)	জিযিয়ার বিধান	তবুক অভিযান কালে	এক বর্ণনা অনুযায়ী তবুকের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে চালু হয়।
(১০৪)	মসজিদে যিরার ভস্মীভূত	তবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর।	
(১০৫)	দুমাতুল জানদালের শাসক উকাইদিরের ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-৯।	
(১০৬)	কা'ব বিন যুহাইরের ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলাম গ্রহণ	হিজরী-৯।	'বানাত, সুয়াদ' শীর্ষক কবিতা উপস্থাপন
(১০৭)	এ বছর মদীনায় আগত কয়েকটি প্রতিনিধি দল ঃ		
	আযরার প্রতিনিধি দল-	সফর, হিঃ ৯।	
	- বাল্লীর প্রতিনিধি দল-	রবিউল আউয়াল হিঃ ৯।	
	- খাওলানের প্রতিনিধি দল-	শাবান, হিঃ ৯।	
	- সাকীফের প্রতিনিধি দল-	হিঃ ৯।	
(১০৮)	হজ্জ ফরয হয় হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে প্রথম হজ্জ	৯ই জিলহজ্জ, হিঃ ৯	বিভিন্ন হাদীসে ৬,৭,৮,৯ ও ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয় বলে উল্লেখ আছে। তবে ৯ম হিজরীর বর্ণনাই আমার দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য। কেউ কেউ বলেন, কাফেরদের ক্যালেন্ডার ব্যবহারের দরুন জিলকদ মাসে এই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ মতটি দুর্বল।
(১০৯)	হযরত আলীর মাধ্যমে মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও সমস্ত অমেয়াদী চুক্তি বাতিল ঘোষণা-	১০ রবিউস সানী জিলহজ্জ, হিজরী-১০	সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা নিয়েও মতভেদ আছে যে, এটি আরাফার দিন না কুরবানীর দিন (৯ই জিলহজ্জ না ১০ই জিলহজ্জ) হয়েছিল। কোরআন ও হাদীসের আলোকে আমার মতে ১০ই জিলহজ্জের মতই অগ্রগণ্য।

(১১০)	মোহারেবের প্রতিনিধি দল মোহামেদের প্রতিনিধিদল	হিজরী-১০	অন্যান্য প্রতিনিধি দলেরও বেশীর ভাগ ৯ ও ১০ম হিজরীতে মদিনায় আসে। তবে তাদের আগমনের সঠিক সময় চিহ্নিত করা দুরূহ।
	খাওলানের প্রতিনিধি দল-	শাবান, হিঃ ১০।	
	নাইসানের প্রতিনিধি দল-	রমযান-হিজরী ১০।	
	বনু হারেস বিন কা'বের প্রতিঃ দল	শওয়াল, হিঃ ১০।	
	সালামের প্রতিনিধি দল	ঐ ঐ।	
(১১১)	শেষ রমযানে রসূল সা. কর্তৃক বিশ দিন এ'তে কাফ	রমযান, হিঃ ১০।	
(১১২)	রসূল সা. এর সাথে মুসায়লামা কাযযাবের পত্রালাপ	হি ঃ ১০।	
(১১৩)	**বিদায় হজ্জ :** মদিনা থেকে যাত্রা	২৬ জিলকদ, হিঃ ১০ শনিবার, জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়।	এ ব্যাপারেও তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে আমি যেটা গ্রহণ করেছি, ওটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
	- যুল হুলাইফায় অবস্থান	শনি ও রবিবারের মধ্যবর্তী রাত।	
	- এহরাম বাঁধা	রবিবার (জোহরের সময়)।	
	- যী তুয়াতে অবস্থান	রবিবার রাত, ৪ জিলহজ্জ হিঃ ১০।	
	- যীতুয়া থেকে মক্কা রওনা	৫ই জিলহজ্জ, ফজরের নামাজে পর।	ছানিয়াতুল আলীলা দিক থেকে রসূল সা. এর মক্কা প্রবেশ।
	- মসজিদুল হারামে প্রবেশ	৫ই জিলহজ্জ, দুপুর।	বনু আবদ মানাফ গেট দিয়ে রসূল সা. এর প্রবেশ।
	- মক্কার বাইরে ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান		সকল সাহাবীর রসূল সা. সাথে অবস্থান, মিনায় রাত্রি যাপন।
	- মিনায় যাত্রা	৮ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার দুপুর।	
	- মিনা থেকে আরাফাত যাত্রা	৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার সূর্যোদয়ের পর।	আরাফাতের পূর্ব প্রান্তে নামিরার পথ দিয়ে প্রবেশ।
	- হজ্জের খুতবা বা ভাষণ দান	৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার জোহরের পর।	কুসওয়া নাম্নী উটনীর পিঠের ওপর থেকে ভাষণ দান।
	- আরাফায় অবস্থান	৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার জোহর ও আছরের নামাজের পর।	এখানে রসূল সা. মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি সহকারে দোয়া করেন।
	- আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে যাত্রা	৯ই জিলহজ্জ, বাদ মাগরিব।	মাযবীন রাস্তা ধরে প্রত্যাবর্তন
	- মুযদালিফা থেকে		

- মাশায়ারে হারাম যাত্রা	১০ই জিলহজ্জ ফজরের নামায বাদ।	এখানে রসূল সা. কাঁদাকাটি সহকারে যিকর ও দোয়া করেন।
- মাশায়ারে হারাম থেকে মিনা অভিমুখে যাত্রা	১০ জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে।	
- পাথর নিক্ষেপ	১০ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর দুপুর পর্যন্ত।	এই সময়ে রৌদ্র প্রখর হয়ে গিয়েছিল।
- মিনায় ভাষণ (কুরবানীর দিন)	১০ই জিলহজ্জ, দুপুরের পূর্বে।	
- কুরবানী	ভাষণের পর।	কুরবানীর একশো উটের মধ্য থেকে ৬১টি নিজ হস্তে যবাই করেন। বাকী গুলোকে হযরত আলীর হাতে সমর্পন। এরপর মাথা কামালেন।
- মিনা থেকে মক্কা যাত্রা-	১০ই জিলহজ্জ মাথা কামানোর পর।	মক্কা পৌঁছে জোহরের পূর্বে কা'বা তওয়াফ করলেন।
- মক্কা থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তন	শেষ দিন।	রাত কাটান মিনায়।
- মিনার দ্বিতীয় ভাষণ	১১ই জিলহজ্জ।	এ ভাষণের বিষয় আবু দাউদে উল্লেখ আছে।
- মিনা থেকে মুহাসসাব বা আবতাহ্ যাত্রা।	১৩ই জিলহজ্জ মংগলবার।	রাতে মক্কা যেয়ে বিদায়ী তওয়াফ করেন।
- মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন	১৩ ও ১৪ই জিলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত।	
(১১৪) নাখা'র প্রতিনিধি দলের আগমন	মুহাররমের মধ্যবর্তী সময় ,১১ হিঃ	রসূল সা. এর জীবদ্দশায় আগত সর্বশেষ প্রতিনিধি দল
(১১৫) উসামা বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ	২৬ সফর, হিঃ ১১।	রসূল সা. নির্দেশে সর্বশেষ সামরিক অভিযান
(১১৬) রসূল সা. এর মৃত্যুব্যাধি শুরু	সফরের শেষ ভাগ হিঃ ১১ । (সম্ভবতঃ ২৯ সফর)	নির্ভরযোগ্য মতে, রোগাক্রান্ত থাকার মেয়াদ ১৩ দিন।
(১১৭) রোগের চরম আকার ধারণ (হযরত আয়েশার কক্ষে ইন্তিকাল পর্যন্ত সাত দিন অবস্থান)		
(১১৮) মসজিদে নববীতে জামায়াতে সর্বশেষ নামায ও সর্বশেষ ভাষণ	ইন্তিকালের ৫ দিন আগে বৃহস্পতিবার জোহরের নামায	বিভিন্ন হাদীসে একাধিক ভাষণের উল্লেখ রয়েছে। তবে সম্ভবত এই একই ভাষণে ঐ সব কথা বলেছেন।
(১১৯) ইন্তিকাল	১২ই রবিউল আউয়াল হিঃ ১১ সোমবার দুপুরের আগে ।	সোমবার সম্পর্কে সবাই একমত। কিন্তু তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ ১ তারিখ, কেউ ২ তারিখ, আবার কেউ ১৩ তারিখও বলেছেন।

(১২০)	দাফন (হযরত আয়েশার কক্ষে কবর তৈরী)	১৩ই রবিউল আউয়াল ও ১৪ই রবিউল আউয়ালের মধ্যবর্তী রাত।	আসল সমস্যা হলো, ৯ই জিলহজ্জ যে শুক্রবার ছিল, তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর ভিত্তিতে হিসাব করলে ১২ই রবিউল সোমবার ছাড়া অন্য কোন দিন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেবল একাধারে তিনটে চন্দ্রমাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তবেই তা সম্ভব। তবে কেউ কেউ বলেন, বিরল হলেও তা সম্ভব। তাছাড়া মক্কা ও মদিনায় আবহাওয়াগত কারণে চাঁদ দেখায় এক দিনের ব্যবধান হওয়াও সম্ভব।

●

পরিশিষ্ট–২

যে যে ঘটনা সর্ব প্রথম ও সবার আগে

- নবুয়তের সূচনাঃ ৯ই রবিউল আউয়াল, জন্মবর্ষ বা বয়স–৪১।
- কোরআন নাযিল হওয়ার সূচনাঃ সূরা আলাক, ১৮ই রমযান, নবুয়ত বর্ষ–১।
- সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ পূর্বক রসূল সা. এর সহকর্মীরূপে যোগদানকারী।

  ১. নারী ও পুরুষের সম্মিলিতভাবেও এবং শুধু নারীদের মধ্যেও সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা রা.।

  ২. পরিপক্ক জ্ঞান সম্পন্ন ও সচেতন স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর রা.।

  ৩. নবীন যুবকদের মধ্যে হযরত আলী রা.।

  ৪. দাস শ্রেণীর মধ্যে হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. (রসূল সা. এর গোলাম ও পরে মুক্ত)

- হযরত খাদীজার পরে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাঃ লুবাবা বিনতুল হারেস। ইনি হযরত আব্বাসের স্ত্রী ছিলেন।
- হযরত আরাকামের বাড়ী কেন্দ্রিক দাওয়াতের সময় প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীঃ আকেল বিন বুকাইর রা.।
- ইসলামী অন্দোলনের প্রথম কেন্দ্রঃ সাফা পর্বতে অবস্থিত দারে আরকাম (হযরত আরকামের বাড়ী)
- সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাষণ ঃ সাফা পর্বতে নবুয়তের তৃতীয় বছর।

সর্বপ্রথম যে আয়াতে কাফেররা ক্ষিপ্ত হয়–

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

"তোমরা এবং তোমরা আল্লাহর বিকল্প হিসেবে যাদের উপাসনা করছ তারা দোজখের কাষ্ঠ।" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৮)

- রসূল সা. এর পর যে সাহাবী সর্বপ্রথম নিজের ইসলাম প্রকাশ করেন, তিনি হচ্ছেন হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত তামীমী।
- সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পরিবার ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের পরিবার।
- সর্বপ্রথম যে মহিলা আশৈশব মুসলিম পিতামাতার কোলে বেড়ে ওঠেন ঃ হযরত আয়েশা রা.।

- ইসলামী উদ্দীপনায় সর্বপ্রথম অনিচ্ছাকৃত হত্যা ঃ হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাতে জনৈক কাফের নিহত হয়। ঘটনাটা ছিল এই যে, মক্কার বাইরে গিয়ে মুসলমানরা নামায পড়ছিল। কাফেররা এই সময় তাদেরকে উত্যক্ত করলে হযরত সা'দ একখানা হাড্ডি তাদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। হাড্ডিটা গায়ে লেগে এক কাফের তৎক্ষণাত মারা যায়।
- রসূল সা. এর ভাষায় হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূত আ. এর পর সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে হিজরতকারী মুসলিম দম্পতি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী রসূল সা. এর মেয়ে রুকাইয়া ও জামাতা হযরত উসমান রা.
- ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম উত্তোলিত পতাকা ঃ হজরত বারীদা আসলামীর হাতে উত্তোলিত পতাকা। এ সময় তিনি হিজরতে যাচ্ছিলেন।
- যে সাহাবী সর্বপ্রথম কাবা শরীফের সামনে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে কাফেরদের গণপিটুনির শিকার হন, তিনি হচ্ছেন হযরত আবু যর গিফারী রা.।
- যিনি সর্বপ্রথম নিজের ইসলাম গ্রহণকে জোরদারভাবে প্রকাশ করেন, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.।
- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করায় সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে নামায পড়া শুরু হয় ঃ হযরত ওমর রা.।
- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফেররা সর্বপ্রথম অনুভব করে যে, ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, তিনি হচ্ছেন হযরত হামযা রা.।
- সর্বপ্রথম মদিনার মুসলিম নেতা, যিনি মক্কার কাফেরদের হাতে মার খানঃ হযরত সা'দ বিন মুয়ায রা.।
- হারাম শরীফে শাহাদাত লাভকারী প্রথম মুসলিম ঃ হযরত হারেস বিন আবি হালা।
- চরম নির্যাতনে শাহাদাত বরণকারী প্রথম মুসলিম মহিলাঃ হযরত ইয়াসারের স্ত্রী ও হযরত আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া রা.।
- যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বনু হাশেমের বিরুদ্ধে কাফেরদের বয়কট চুক্তি বাতিল করার চেষ্টা চালান ঃ হিশাম বিন আমর বিন রবিয়া।
- সর্বপ্রথম যে মুসলিমের চোখ ইসলামের পথে শহীদ হয় ঃ হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা.। কোরায়েশদের মজলিশে লাবীদের একটা ইসলাম বিরোধী কবিতায় তিনি আপত্তি করলে তাঁর চোখ ফুটো করে দেয়া হয়।
- সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরতকারী মুসলমান ঃ হযরত আবু মুসলিমা রা.।
- প্রথম মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগকারী ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী উবাইদ বিন জাহশ। ওখানে গিয়ে সে খৃষ্টান হয়ে যায়।

- ইসলামের প্রতিরক্ষায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী ঃ হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.। আব্দুল হারেসের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাদলে তিনি শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন। কিন্তু এতে কেউ হতাহত হয়নি।
- ইসলামের প্রতিরক্ষায় সর্বপ্রথম অসি চালনাকারী ঃ হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম।
- আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বার হিজরতে প্রথম মোহাজের ঃ হযরত জাফর বিন আবু তালেব।
- রসূল সা. এর দাওয়াতে প্রভাবিত মদিনার প্রথম যুবক ঃ সুয়াইদ বিন সামেত।
- হিজরতের পর মদীনায় সর্বপ্রথম ওফাতপ্রাপ্ত আনসারী সাহাবী ঃ কুলসূম ইবনুল হাদাম, যার কোবাস্থ বাড়ীতে রসূল সা. হিজরতের পর কয়েকদিন অবস্থান করেন।
- মদিনায় ওফাত প্রাপ্ত প্রথম মোহাজের ঃ হযরত ওসমান ইবনে মাযউন রা.
- ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তিতে সংঘটিত প্রথম ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড (নারী) ঃ আসমা বিনতে মারওয়ান খাতামিয়া। এই মহিলা স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে সব সময় রসূল সা. এর বিরুদ্ধে উস্কানী দিত এবং কুৎসা রটাতো। এক পর্যায়ে তার ইসলাম গ্রহণকারী ভাই হযরত উমাইর বিন আদী আল খাতামী উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করে। (রমযান, হিঃ ২)
- ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তিতে সংঘটিত সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড (পুরুষ) ঃ ইহুদী আবু গাফলা। সে রসূল সা. ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম মিথ্যা অপপ্রচারে লিপ্ত থাকতো। হযরত আলেম ইবনে উমায়ের আনসারী উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেন।
- মদিনায় সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষক নিয়োগ ঃ হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইরকে (ইবনে উম্মে মাকতুম সহযোগে) রসূল সা. আনসার প্রতিনিধি দলের সাথে মদিনায় পাঠান। (নবুয়ত বর্ষ–১৪)

  আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতে সর্বপ্রথম বায়াতকারী আনসারী সাহাবী ঃ বারা বিন মারূর।
- মদিনায় সর্বপ্রথম সামষ্টিক কোরআন শিক্ষার আসরঃ মসজিদে বনী রিযীকে অনুষ্ঠিত হয়। (সম্ভবত এটি কোন পূর্ণাঙ্গ মসজিদ ছিলনা। কেবল নামায পড়ার জায়গা ছিল।
- সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ মসজিদ নির্মাণ ঃ মসজিদে কোবা, এটি ৮ থেকে ১১ই রবিউল আউয়াল, হিজরী ১ সালে নির্মিত হয়।
- রসূল সা. এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম জুমার নামায ঃ হিজরী ১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে বনী সালেম গোত্রের এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে নামাযীর সংখ্যা ছিল একশো জন।
- মদীনায় এক সাথে গোটা গোত্রের ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা ঃ বনু আব্দুল আশহাল। এই গোত্রের কেবলমাত্র এক ব্যক্তি কিছু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

- ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে টহল দেয়ার জন্য বহির্গত সর্ব প্রথম সেনাদল ঃ হযরত হামযার নেতৃত্বে গঠিত সেনাদল হিজরতের ৭ম মাসে সাইফুল বাহর পর্যন্ত টহল দেয়।
- ইসলামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় সর্ব প্রথম পতাকা বহনকারী ঃ আবু মুরছাদ আল-গানাবী।
- রসূল সা. এর প্রথম প্রত্যক্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপঃ ওয়াদ্দান বা আবওয়া অভিযান। হিজরতের দ্বাদশ মাসে এটি সংঘটিত হয়।
- মদীনায় রসূল সা. এর নিযুক্ত প্রথম ভারপ্রাপ্ত শাসক ঃ সা'দ বিন উবাদা রা. (ওয়াদ্দান অভিযানের সময়)।
- রসূল সা. এর সওয়ারীতে প্রথম পতাকা ওড়ানোর গৌরবের অধিকারী ঃ হযরত হামযা, ওয়াদ্দান অভিযানে।
- কোরায়েশের পক্ষ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর প্রথম আগ্রাসী তৎপরতা পরিচালনাকারী ঃ কারয বিন জাবের ফেহরীর ডাকাতি (রবিউল আউয়াল হিঃ ২)।
- প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ যাতে শত্রুপক্ষীয় একজন নিহত হয় ঃ নাখলা অঞ্চলে টহলরত সেনাদলের সদস্য ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ তামিমীর তীর নিক্ষেপে জনৈক কাফের নিহত হয়। (রজব, হিঃ ২)
- গণিমত ও বন্দী সব মদিনায় নিয়ে আসার প্রথম ঘটনা ঃ নাখলা অঞ্চলের উপরোক্ত ঘটনা।
- আযানের সূচনা ঃ হিজরী ২ সালে।
- কা'বা শরীফে প্রথম আযান ঃ মক্কা বিজয়ের সময় হযরত বিলাল কর্তৃক প্রদত্ত।
- সর্বপ্রথম মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ঃ মুসাইলামা কাযযাব।
- সর্ব প্রথম লিখিত নিরাপত্তা পত্র, যা রাসূল সা. প্রদান করেন ঃ সুরাকা বিন জা'শাম এর জন্য (হিজরতের সফরের সময়)।
- দুনিয়ার প্রথম আনুষ্ঠানিক লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ঃ হিঃ ১ সনে মদিনায় রসূল কর্তৃক রচিত ও প্রবর্তিত।
- মদিনার বাইরে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম মৈত্রী চুক্তি ঃ বনু যামরার নেতা আমর বিন ফাহশী যামরীর সাথে বা বনু যামরা গোত্রের সাথে।
- ইসলাম গ্রহণের দায়ে প্রথম ক্রুশবিদ্ধ হয়ে শহীদ ঃ হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও যায়দ বিন দাসনা (মক্কার নিকটবর্তী) তানয়ীমে)
- মদীনায় ইহুদীদের প্রথম বিদ্রোহাত্মক ও বিশ্বাস ঘাতকতামূলক তৎপরতা ঃ বনু কাইনুকা কর্তৃক জনৈক মুসলিম নারীকে প্রকাশ্যে বাজারে উলংগ করে দেয়ায় ইহুদী-মুসলিম দাংগা।

- প্রথম মুক্ত ইসলামী শিবিরঃ সাইফুল বাহরে হযরত আবু বসীর ও আবু জানদাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবির।
- মক্কা বিজয়ের সময় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ঃ আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব।
- প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঃ বদর যুদ্ধ (রমযান হিঃ ২)।
- সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে আনসার ও মোহাজেরগণ একত্রে অংশগ্রহণ করেন ঃ বদর যুদ্ধ।
- বদরের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর প্রথম তিনজন লড়াকু মোজাহেদ ঃ হযরত আলী, হযরত হামযা, হযরত ওবায়দা বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব।
- বদর যুদ্ধে প্রথম নিহত শত্রু ঃ আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ।
- বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের মুক্ত গোলাম মিহজা।
- মদিনায় বদর জয়ের সুসংবাদ বাহক প্রথম দূত ঃ যায়দ বিন হারেসা রা.।
- প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায ঃ ১লা শওয়াল হিজরী -২।
- ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম দূত, যাকে পথিমধ্যে হত্যা করা হয় ঃ হারেস বিন উমাইর আযদী। সিরিয়ার শাসনকর্তা শুরাহ্‌বীল বিন আমর গাসসানী তাকে হত্যা করে।
- রসূল সা. প্রদত্ত প্রথম বীরত্বের খেতাব ঃ হযরত খালেদ বিন ওলীদকে প্রদত্ত "সাইফুল্লাহ" খেতাব (মূতার যুদ্ধ, হিঃ ৮)।
- সরকারী চিঠিপত্র ও দলীলে প্রথম সিল ব্যবহার ঃ ১লা মুহাররম, হিঃ ৭।
- ইসলামী বিধানের অধীনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক শালিশীর ঘটনা ঃ হিজরী ৫ সালে ইসলাম রাষ্ট্র ও বনু কুরাইযার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।
- ইসলামী যুগে প্রথম যে সাহাবীকে সালিশ নিয়োগ করা হয় ঃ হযরত সা'দ বিন মুয়ায।
- রসূল সা. এর কাছে প্রেরিত প্রথম রাজকীয় উপহার ঃ বাদশাহ্ নাজ্জাশী কর্তৃক প্রেরিত উপহার।
- আরবের মোশরেকদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির উপহার রসূল সা. গ্রহণ করেন ঃ আবু সুফিয়ান (হোদায়বিয়ার সন্ধির যুগে)
- প্রথম সাবেক গোলাম, যাকে সেনাপতি বানানো হয়' যায়দ বিন হারেসা (মুতার যুদ্ধ)।
- যে যুদ্ধে সর্ব প্রথম বাইতুল মালের জন্য এক পঞ্চমাংশ বের করা হয় ঃ বনু কাইনুকা বা বনু কুরাইযার যুদ্ধ।
- কলেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণকারী কাফেরকে হত্যার প্রথম ঘটনাঃ জুহায়না অভিযানকালে উসামা ইবনে যায়দের হাতে নাহীক বিন মারদুস নিহত হয়। (রমযান ঃ হিঃ ৭)

- সর্বপ্রথম মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সাময়িকভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় আক্রান্ত হয় ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে।
- রসূল সা. এর হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি ঃ হারেস বিন আয্–যাম্মা (ওহুদ যুদ্ধ)।
- প্রথম জান্নাতবাসী শহীদ, যিনি একবারও নামায পড়া ও রোযা রাখার সুযোগ পাননি ঃ হযরত উসাইরিম রা.। বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের এই ব্যক্তি ওহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করে তৎক্ষণাত জেহাদে অংশ গ্রহণ করেন এবং শাহাদাত পান।
- প্রথম শহীদ, যিনি মৃত্যুর পূর্বে নামায পড়ার সন্নাত চালু করেন ঃ হযরত খুবাইব রা.
- বীরে মাউনার ঘটনার প্রথম শহীদ ঃ হারাম ইবনে মিলহান রা. (হযরত আনাসের মামা)
- প্রথম "সালাতুল খাওফ" (ভয়ের নামায) পড়া হয় ঃ উসফান বা যাতুর রিকার যুদ্ধে।
- প্রথম নামাযী, যার গায়ে তিনটে তীর বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামায ছাড়েননি ঃ আব্বাদ বিন বাশার (যাতুর রিকা যুদ্ধ)
- মদিনায় প্রথম মুরতাদ ঃ হারেস বিন সুয়াইদ বিন সামেত। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান অবস্থায় অংশ গ্রহণ করার পরও সে মুরতাদ হয়ে যায়। তবে মুজাযযার বিন যিয়াদ বালাভীকে হত্যা করে মক্কায় পালিয়ে যায়। পরে মদিনায় এলে গ্রেফতার ও নিহত হয়।
- যুদ্ধের ময়দানে ভুলক্রমে জনৈক মুসলমানের হাতে নিহত প্রথম মুসলমান ঃ হিশাম বিন ইসাবা (উবাদা বিন সামেতের হাতে)।
- সর্বপ্রথম শত্রু পক্ষীয় গুপ্তচর গ্রেফতার ও নিহত হয় ঃ বনুল মুসতালিক যুদ্ধে।
- প্রথম মুসলমান যুবক, যে স্বীয় মোনাফেক পিতাকে হত্যা করার জন্য রসূল সা. এর কাছে অনুমতি চায় ঃ তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই।
- হযরত আয়েশাকে অপবাদ সংক্রান্ত ঘটনার তথ্য জ্ঞাপনকারী প্রথম ব্যক্তি ঃ মিসতাহ বিন আসাসার মাতা।
- হযরত আয়েশার সতীত্বের পক্ষে প্রথম সাক্ষীঃ পুরুষদের মধ্য থেকে উসামা বিন যায়দ, মহিলাদের মধ্য থেকে বারীরা রা. এবং রসূল সা. এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যয়নব বিনতে জাহাশ।
- ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শরীয়ত সম্মত শাস্তির প্রথম প্রয়োগ ঃ হাসসান বিন সাবেত, মিসতাহ বিন আসাসা ও হিমনা বিনতে জাহাশের ওপর।
- সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে মুসলমানদের একাধিক নামায একাদিক্রমে কাযা হয় ঃ খন্দক যুদ্ধে।
- শত্রুর শক্তি খর্ব করার জন্য সর্বপ্রথম সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ঃ নঈম ইবনে মাসউদের মাধ্যমে খন্দক যুদ্ধে এই প্রচেষ্টা চালানো হয়।

- প্রথম মুসলিম তীর নিক্ষেপক, যিনি একাকী ডাকাতদের একটি দলকে পরাজিত করেন ঃ সালামা ইবনুল আকওয়া।
- সর্বপ্রথম রসূল সা. এর মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্ত কবিতা আবৃত্তির ঘটনা ঃ হোনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে রসূল একাকী হয়ে যান। তখন তিনি নিজের সাদা খচ্চরে চড়ে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে থাকেনঃ

اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ

اَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِب

অর্থাৎ "আমি নিসন্দেহে নবী। আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।"

- সর্বপ্রথম যাকাত বিভাগীয় কর্মচারী নিয়োগ ঃ মুহাররম ৯ম হিজরী।
- সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনী কামান ব্যবহার করে দুর্গ ভাংগে ঃ তায়েফ অভিযানে।
- সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দী বিনিময়, যা মদিনার ইসলামী সরকার ও মক্কাবাসীর মধ্যে সংঘটিত হয় ঃ নাখলা অভিযানে ধৃত দু'জন যৌথ বন্দী আত্তাব বিন আব্দুল্লাহ ও হাকাম বিন কায়সারের বিনিময়ে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাযওয়ানকে মুক্ত করা হয়।
- সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে মোজাহেদদেরকে ঘোড়ার অংশ দেয়া হয় ঃ বনু কুরায়যা যুদ্ধ।
- সর্বপ্রথম জিযিয়া গ্রহণের নির্দেশ ঃ তবুক যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়।
- সর্বপ্রথম জিযিয়ার প্রশ্নে মতৈক্য হয় ঃ দুমাতুল জান্দালের শাসকের সাথে (তবুক অভিযান কালে)।
- সর্বপ্রথম বিপুল পরিমাণ জিযিয়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত ঃ নাজরানের খৃষ্টানরা ইসলামী সরকারকে বাৎসরিক দু'হাজার পোশাক এবং প্রয়োজনের সময় সামরিক সরঞ্জাম ধার দেয়ার অংগীকার করে।
- সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি, যিনি হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় আদৌ কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেননি ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.।
- সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হোদায়বিয়ার চুক্তির পর কুরবানী ও চুল কামানোর ব্যাপারে মুসলমানদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময় রসূল সা. কে প্রবোধ দেন ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রা.
- সর্বপ্রথম যে কবি রসূল সা. এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে ঃ মক্কা বিজয়ের পর কা'ব বিন যুহায়ের উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার জন্য "বানাত্ সুয়াদ" শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন এবং রসূল সা. তাকে নিজের চাদর পুরস্কার স্বরূপ দান করেন।

- রসূল সা. তাকে কর্তৃক সর্বপ্রথম 'কুনুতে নাযেলা' পাঠ ঃ রজী ও বীরে মাউনার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর। এই দুটি ঘটনায় শত্রুরা দাওয়াতী ও শিক্ষামূলক প্রতিনিধি দলের সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে। (হি ঃ ৪)
- সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলাদের রণাঙ্গণে আগমন ঃ ওহুদ যুদ্ধে (হিঃ ৩)
- প্রথম শাসক, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ঃ আসম বিন আবজার, আবিসিনিয়ার বাদশাহ।
- সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে রসূল সা. এই বলে প্রশংসা করেন যে, তার সম্পর্কে যে সুনাম তিনি শুনেছেন, তিনি তার চেয়েও মহৎ তিনি তাঈ গোত্রের সরদার যায়দুল খায়র, পূর্বনাম যায়দুল খায়ল।
- প্রথম অনারব নওমুসলিম, যাকে ইসলাম গ্রহণের কারণে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয় ঃ মুযান নামক স্থানে কর্মরত উত্তর আরবের রোমক গভর্ণর ফারওয়া জুযামী।
- ওহুদ যুদ্ধে প্রথম মোশরেক সম্মুখ যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দাতা ঃ তালহা।
- ওহুদ যুদ্ধের সম্মুখ সমরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী প্রথম মুসলমান ঃ হযরত আলী।
- ওহুদ যুদ্ধের প্রথম নিহত শত্রুঃ তালহা।
- প্রথম গর্ব প্রকাশ, যা রসূল সা. পছন্দ করেছিলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধে রসূল সা. এর তরবারী হাতে পেয়ে আবু দুজানার গর্বে বুক ফুলিয়ে চলা।
- ইসলামে প্রথম হজ্জ ঃ নবম হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে।
- প্রথম বিদেশে যুদ্ধ ঃ মূতার যুদ্ধ (জমাদিউস সানী, হিঃ ৮)।
- তায়েফের সাকীফ গোত্র থেকে ইসলামের শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে মদিনায় আগত প্রথম ব্যক্তি ঃ উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী।

পরিশিষ্ট – ৩

ইসলামী আন্দোলনে জনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি

● রসূল সা. এর ইসলামী সংগঠনের প্রথম সহযোগীঃ (১) হযরত খাদীজা, (২) হযরত আবু বকর (৩) হযরত আলী (৪) হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা.।

● হযরত আবু বকরের দাওয়াতী প্রচেষ্টার ফলে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ৫ জন ঃ (১) হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (২) হযরত ওসমান ইবনে আফফান (৩) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (৪) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (৫) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস।

● দাওয়াতের প্রথম তিন বছরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ৪৬ ব্যক্তি ঃ (১) খাব্বাব ইবনুল আরত তামীমী (২) সাঈদ বিন যায়দ (দারুল আরকাম কেন্দ্রিক আন্দোলনেরও পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন) (৩) ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব (৪) লুবাবা বিনতুল হারেস (হযরত খাদিজার পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা) হযরত আব্বাসের স্ত্রী (৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (কারো কারো মতে, ইনি ইসলাম গ্রহণকারী ৬ষ্ঠ ব্যক্তি) (৬) উসমান ইবনে মাযউন (ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্দশ ব্যক্তি) (৭) আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (ইসলাম গ্রহণকারী একাদশ বা দ্বাদশ ব্যক্তি। মতান্তরে তিনি ৭ম) মাখযুমী (ইবনে হাজারের মতে, ইনি উসমান ইবনে মাযউন, উবায়দা ইবনুল হারেস, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও আবু সালমার সাথে একত্রেই দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (৮) আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী (৯) আবু উবাইদা বিন আমের আল জাররাহ (হযরত ওমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন) (১০) কুদামা ইবনে মাযউন (১১) উবায়দা বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব (১২) জাফর বিন আবু তালেব (১৩) আসমা বিনতে উমায়েস (১৪) আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (১৫) আবু আহমদ বিন জাহাশ (১৬) সায়েব বিন উসমান বিন মাযউন (১৭) মুত্তালিব বিন আযহার (১৮) রমলা বিনতে আবি আওফ, মুতালিব ইবনে আযহারের স্ত্রী (১৯) উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস (সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের ভাই) (২০) আসমা বিনতে আবি বকর (২১) আয়েশা বিনতে আবি বকর (২২) হযরত আইয়াশ বিন আবি রবীয়া (আবু জাহলের ভাই) (২৩) আসমা (আইয়াশের স্ত্রী) (২৪) সুলাইত বিন আমর (হযরত আবু বকরের বর্ণনা অনুসারে, ইনি দারুল আরকাম যুগের পূর্বের মুসলমান) (২৫) মাসউদ বিন রবীয়া (দারুল আরকাম যুগের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী) (২৬) খুনাইস বিন হাদ্দাফা (২৭) আমের বিন রবীয়া (২৮) হাতেব ইবনুল হারস জুমহী (২৯) ফাতেমা বিনতে মুহাল্লাল, হাতেবের স্ত্রী (৩০) খাত্তাব ইবনুল হারেস (৩১) ফুকাইহা, খাত্তাবের স্ত্রী (৩২) মুয়াম্মার বিন হারেস (হযরত ওমরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইনিই তার বোনকে কোরআন পড়াতেন। ওয়াকেদীর মতে, তার স্থান দশ জনের পর। ইবনে খাসয়ামার মতে, ৩৮ জনের পর।) (৩৩) নঈম বিন আব্দুল্লা, বনু আদীর সদস্য (চতুর্থ বা পঞ্চম ইসলাম গ্রহণকারী, কিন্তু পিতার ভয়ে ঈমান গোপন

রাখেন) (৩৪) খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (ইমাম যুহরীর মতে, তাঁর স্থান ৪৪তম) (৩৫) আমীনা (বা হামিনা) বিনতে খালাফ, খালেদ বিন সাঈদের স্ত্রী। (৩৬) হাতেব বিন আমর (৩৭) ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ, বনী আদীর মিত্র (৩৯) খালেদ বিন হিযাম (হযরত খাদীজার ভ্রাতুষ্পুত্র) (৪০) আমের বিন মালেক (দারুল আরকামে ইনিই প্রথম বায়য়াত করেন) (৪১) আকেল বিন বুকায়ের (৩৫ বা ৩৬ তম স্থান) (৪২) খালেদ বিন বুকায়ের (৪৩) আমের বিন বুকায়ের (৪৪) আম্মার বিন ইয়াসার (পিতা ইয়াসারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন) (৪৫) সুমাইয়া (আম্মারের মাতা) (৪৬) সুহায়েব বিন সুফান রুমী, ইবনে জাদয়ানের মুক্ত গোলাম।

- আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারীদের সংখ্যা ঃ ১২ জন পুরুষ, ৪ জন স্ত্রী,
  (মোট ১৬ জন)
- দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় মোট সংখ্যাঃ ৮৩ জন।

এ সময় যারা মক্কায় থেকে যান, তাদের সংখ্যা অন্তত পক্ষে আবিসিনিয়া গমনকারীদের সমান হবে। তাই মোট সংখ্যা দেড়শোর ওপরে হবে।

● মদিনায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পতাকাবাহীদের সংখ্যা ছিল মোট ৮ জন।

এরা সর্বপ্রথম রসূল সা. এর কাছে বায়য়াত করেন। (১) বারা বিন মারূর (২) কা'ব বিন মালেক (৩) আবদুল হাইছাম মালেক বিন তায়হান (৪) আসাদ বিন যারারা (৫) রাফে বিন মালেক (৬) কুতবা বিন আমের (৭) উকবা বিন আমের (৮) জাবের বিন আবদুল্লাহ।

(সুবিদিত বর্ণনা অনুসারে আকাবায় প্রথম বায়য়াত গ্রহণ করেন ৬ জন। ওয়াকেদীর মতে আসাদ বিন যারারা এবং যাকওয়ান বিন আব্দুল কায়েস আকাবার প্রথম বায়য়াতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

● আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতে অংশ গ্রহণ কারীগণঃ মোট ১২ ব্যক্তি অংশ নেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত উপরোক্ত আনসারীগণ পুনরায় আসেন এবং নিজেদের সাথে আরো ৫ জনকে নিয়ে আসেন। নবাগতরা হলেন ঃ (১) মুয়ায বিন হারেস (২) আওফ বিন হারেস (৩) যাকওয়ান বিন আবদুল কায়েস (৪) ইয়াযীদ বিন সা'লাবা (৫) উয়াইমির বিন মালেক।

● আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতে অংশগ্রহণকারীগণ ঃ এবারে সর্বমোট ৭৩ জন নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।

● (আকাবার তৃতীয় বায়য়াতের সময়) মক্কার শেষ যুগে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যাঃ আবিসিনিয়ার মোহাজের ৮৩ এবং আকাবার বায়য়াতকারী আনসারী ৭৩ ছাড়াও মক্কায় কিছু মুসলমান ছিল। অনুরূপ, মদিনাতেও এমন কিছু মুসলমান থাকতে পারে, যারা নবুয়তের ১৩তম বর্ষের হজ্জে নাও এসে থাকতে পারে। এভাবে আনুমানিক মোট সংখ্যা আড়াই শো হতে পারে। এই সাথে যদি নাজরান ও গিফার (গিফার গোত্রের প্রায় অর্ধেক অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল) এবং ইয়ামানের নও মুসলিমদের সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে আরবের সর্বমোট মুসলমানদের সংখ্যা তিনশোর কম হবেনা।

● **হিজরতের অব্যবহিত পর মদিনার মুসলমানদের সংখ্যা (আনুমানিক) ঃ**

বনুসালেম গোত্রের এলাকায় সর্বপ্রথম যে জুমার নামায পড়া হয়, তাতে একশো মুসলমান শরীক হয়েছিল, একথা সুবিদিত। যারা শরীক হতে পারেনি, সেই সব নারী ও রোগীদের সংখ্যা ধরলে মদিনার মুসলমান জনসংখ্যা কমের পক্ষে তিনশো হওয়ার কথা।

একথাও সুবিদিত যে, রসূল সা. আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য একেবারে প্রথম দিকে যে সভা ডেকেছিলেন, তাতে ৯০ জন অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে উভয় পক্ষের লোক ছিল অর্ধেক অর্ধেক। এই সম্মেলনে আনসারদের মধ্য থেকে সম্ভবত সচ্ছল লোকদেরকেই রাখা হয়েছিল, যারা নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার ভেতরে অন্তত একজন করে মোহাজেরের স্থান সংকুলান করতে পারে। এখানে নারীরা শরীক ছিলনা। তাই এই সম্মেলন থেকেও উপরোক্ত অনুমান সঠিক বলেই ধারণা জন্মে।

● **বদর যুদ্ধের সময় মদিনায় মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা ঃ**

একথা সবার জানা যে, মদিনার আনসারদের মধ্যে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রে এ ব্যাপারে কোন বাধা ছিলনা। এ কথাও সুবিদিত যে, হিজরত থেকে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় দু'একজন করে মোহাজেরের আগমন অব্যাহত ছিল এবং তাদের মোট সংখ্যা মোটামুটি কম ছিলনা। বুয়াত অভিযানে রসূল সা. এর সাথে দু'শো মোহাজের ছিল। অনুরূপভাবে, যুল উশাইর অভিযানেও তাদের সংখ্যা ১৫০ থেকে ২০০ এর কাছাকাছি ছিল। এই সব প্রাথমিক অভিযানে রসূল সা. শুধু মোহাজেরদেরকেই কাজে লাগাতেন।

কেননা আকাবার বায়য়াত অনুসারে আনসারগণ শুধু মদিনার ভেতরে প্রতিরক্ষামূলক কাজে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যুদ্ধে যোগদানকারী মোহাজেরদের সংখ্যাই যদি ২০০ হয়ে থাকে, তাহলে মোট সংখ্যা আরো কিছু বেশীই হবে। কমের পক্ষে আড়াই শো ধরে নেয়া যেতে পারে।[১] আনসারদের সংখ্যা এর দ্বিগুণ হওয়ার কথা। অর্থাৎ সর্বমোট সংখ্যা সাত আটশো হতে পারে।[২]

---

১. সাধারণভাবে যে কোন জনবসতিতে পুরুষদের সামরিক অনুপাত $\frac{১}{৪}$ এবং $\frac{১}{৫}$ হওয়ার কথা। কিন্তু দুই কারণে মদিনার মোহাজেরদের অবস্থা ভিন্নতর ছিল। প্রথমত, আরবের গোত্রীয় সমাজে সাধারণত প্রত্যেক পুরুষই লড়াকু হতো এবং এর ব্যতিক্রম খুব কমই হতো। তদুপরি মোহাজেরদের ঈমানী ও বিপ্লবী প্রেরণা থাকার কারণে তারা সর্বক্ষণ জীবন ও মৃত্যুর সংঘাতের মধ্যে জীবন যাপন করতো। এর ব্যতিক্রম কেউ ছিলনা বললেই চলে। তাছাড়া মোহাজের সমস্ত পরিবার পরিজন নিয়ে আসেনি। নারীদের উপস্থিতিও কম ছিল এবং বুড়ো লোকেরা বেশীর ভাগ মক্কায় থেকে গিয়েছিল। এই দুটি কারণে আমরা এভাবে অনুমান করেছি।

২. বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদিনায় রসূল (স) তিনবার আদম শুমারি করিয়েছিলেন। প্রথমবার লোক সংখ্যা ছিল পাঁচশো, দ্বিতীয়বার ৭-৮ শো এবং তৃতীয়বার হাজারের কিছু বেশী। আমাদের ধারণা, প্রথম আদম-শুমারী মোহাজেরদের পুনর্বাসনের সময় অথবা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের শুরুতে করা হয়ে থাকতে পারে। এরপর কোন গুরুতর পদক্ষেপ গ্রহণের সময় (যেমন সিরিয়া প্রত্যাগত কোরায়েশী বাণিজ্যিক কাফেলার গতিরোধ করা) পুনরায় জনশক্তি যাচাই করা হতে পারে। তৃতীয় আদমশুমারী সম্ভত এক বছর পর আবু সুফিয়ানের প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকির সম্মুখীন হয়ে করা হয়ে থাকবে।

বদর যুদ্ধের মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা দেখে অনেকে বিভ্রাটে পড়ে যেতে পারে। তবে আমাদের গবেষণা মোতাবেক রসূল সা. যখন মদিনা থেকে ৩১৪ জন সাথীকে নিয়ে বেরিয়ে যান, তখন কোন আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ-সংঘর্ষের আশংকা তিনি করেননি। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক কাফেলাকে প্রতিরোধ করা। তাছাড়া তাড়াহুড়োর ভেতরে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল বিধায় সওয়ারীর ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ খুবই কম ছিল। অথচ মদিনার মুসলিম অধিবাসীরা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশী সওয়ারী ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারতো। যে যোদ্ধা সংখ্যা জোগাড় করা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী যোদ্ধা সংগ্রহ করাও সম্ভব ছিল। এর প্রমাণ এই যে, বদরযুদ্ধে সর্বমোট ৮৬ জন মোহাজের শরীক ছিলেন। অথচ ইতিপূর্বে কোন কোন টহল অভিযানেও মোহাজেরদের মোট সংখ্যা ২০০ পর্যন্ত দেখা গেছে। সুতরাং আমাদের অনুমান এই যে, বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে মদিনায় মোট মুসলমান জনসংখ্যা ৭/৮ শোর কাছাকাছি ছিল। এর মধ্য থেকে ৪/৫ শো লড়াকু যোদ্ধা সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু বদর যুদ্ধে পুরো সামরিক শক্তি শরীক হতে পারেনি। কারণ সমগ্র সামরিক শক্তিকে যোগদান করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে একটা বাহিনী সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য রসূল সা. এর সাথে গিয়েছিল মাত্র।

বনু কাইনুকার অভিযান থেকেও আমাদের এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পর এই পাষণ্ড ও বর্বর ইহুদী গোত্রটিকে ঘেরাও করা হয় এবং তারা পর্যুদস্থ হয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে যেতে সম্মত হয়। জানা যায়, এই গোত্রের লড়াকু শক্তি ৬০০ যুবক নিয়ে সংগঠিত ছিল। তাদেরকে ১৫ দিন যাবত অবরুদ্ধ করে রেখে পর্যুদস্থ করতে মুসলিম বাহিনীর কমের পক্ষে ৪/৫ শো যোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

● বদর যুদ্ধের সময় সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের সার্বিক জনসংখ্যা ঃ (আনুমানিক)

মদিনার সাত আটশো জনের সাথে আমরা যদি আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মোহাজেরগণ, নাজরান, ইয়ামান, গিফার গোত্র, বাহরাইন ও অন্যান্য অঞ্চলে ও গোত্রে বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা যোগ করি, তাহলে সম্ভবত মোট জনশক্তি এক হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশী হবে।

- বিভিন্ন যুদ্ধে ও অভিযানে মুসলিম জনশক্তির সংখ্যা ঃ [৩]
- ওহুদ যুদ্ধ– ৬৫০ মতান্তরে ৭০০[৪]
- দ্বিতীয় বদর অভিযান– (যুদ্ধ হয়নি) ১৫১০।
- দুমাতুল জানদাল অভিযান (যুদ্ধ হয়নি) ১০০০।
- খন্দক যুদ্ধ– ৩০০০।
- হোদায়বিয়ার সফর – ১৪০০।

---

৩. পরবর্তী যুগের ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির হিসাব করতে হলে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অভিযান সমূহে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যার আলোকেই তা জানা যাবে।

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর তিন শো মোনাফেক সাথী বিদায় হয়ে যাওয়ার পর....।

- **খয়বরের যুদ্ধ**– ১৪২০ (২০ জন মহিলাসহ)।
- **মূতার যুদ্ধ**– ৩০০০।
- **মক্কা অভিযান**– ১০,০০০।
- **হোনায়েন যুদ্ধ** ও তায়েফ অবরোধ– ১২,০০০।
- **তবুক অভিযান**– ৩০,০০০।
- **বিদায় হজ্জের** সহযাত্রী– ১,২৪০০০, মতান্তরে ১,৪৪০০০।[৫]

● **ইসলামী** আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির পর্যালোচনা করার সময় একথাও মনে রাখতে হবে যে, রসূলের সা. বিপ্লবী সংগ্রামে মহিলারাও শুরু থেকেই অর্ন্তুক্ত ছিল। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য তারাও নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। মক্কার অগ্নিপরীক্ষায় তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরতের সময়ও তাদের অনেকে সহযাত্রী হয়েছে। এমনকি সম্ভাব্য জেহাদেও তারা সহযোগী হয়েছেন। বরঞ্চ এটা মহিলাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, রসূল সা. এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনা, রসূল সা. কে প্রবোধ দেয়া, এবং তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানকারীও একজন মহিলাই ছিলেন, অর্থাৎ হযরত খাদীজা। বস্তুত রসূল সা. যে সর্বাত্মক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা মহিলাদের সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিলনা। পারিবারিক ক্ষেত্র যদি কোন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহলে কাজের গতি অত্যধিক শ্লথ হয়ে যায়। রসূল সা. পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের নিকট থেকেও প্রেরণা, অর্থ, শ্রম ও ত্যাগ পুরো মাত্রায় অর্জন করেছে। আসলে এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র নিবন্ধের প্রয়োজন। তবে আপাতত এটা স্থগিত রাখছি। এখানে সংক্ষেপে শুধু ইসলামী আন্দোলনের মহিলাদের অনুপাত কেমন ছিল, তাই দেখাতে চাই। প্রথম তিন বছরের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ৫৬ জনের মধ্যে ১২ জন ছিলেন মহিলা। আবিসিনিয়ায় প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফা হিজরতে তাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫ ও ১৭, তৃতীয় আকাবার বায়য়াতের অধিবেশনে ২ জন মহিলা আনসারীও ছিলেন। রসূল সা. এর পূর্বে যারা মদিনায় হিজরত করেন, তাদের মধ্যেও কমের পক্ষে দশজন মহিলা ছিলেন।

সমাপ্ত

---

[৫] কোন কোন রেওয়ায়েতে এর সংখ্যা আরো বেশী বলা হয়েছে।

কতিপয় তথ্যসূত্র

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর।
২. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
৩. সহীহ মুসলিম (শরহে সিরাজুল ওয়াহাব)।
৪. মিশকাত শরীফ– (শরহ ঃ আশয়াতুল লাময়াত)।
৫. সুনান আবু দাউদ।
৬. শামায়েলে তিরমিযী।
৭. রিয়াদুস সালেহীন।
৮. যাদুল মায়াদ ঃ আল্লামা হাফেজ ইবনুল কাইয়েম।
৯. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া– আহমাদ আল খতীব কাসতালানী।
১০. সীরাতুন্নবী ঃ ইবনে হিশাম।
১১. কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবু উবাইদ আল কাসেম।
১২. রহমাতুল্লিল আলামীন ঃ বিচারপতি শাহ মুহাম্মাদ সুলায়মান, সালমান মানসুরপুরী।
১৩. আসাহ্হুস সিয়ার ঃ মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরি।
১৪. সীরাতুন্নবী ঃ শিবলী নুমানী।
১৫. সীরাতুল মুস্তাফা– মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দালুভী।
১৬. সীরাত খাতামুল আম্বিয়া– মুফতী মুহাম্মদ শফী।
১৭. কাসাসুল কুরআন ঃ চতুর্থ খণ্ড– মাওলানা মুহাম্মদ হিফযুর রহমান।
১৮. আরযুল কুরআন ঃ সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী।
১৯. তারীখুল ইসলাম ঃ (প্রথম খন্ড) মাওলানা আবদুল কাইয়ুম নাদভী।
২০. ফাজরুল ইসলাম ঃ আহমদ আমীন মিসরী।
২১. ফিকহুস্ সীরাহ ঃ মুহাম্মদ আল গাযালী।
২২. নাশরুত্তীব – মাওলানা আশরাফ আলী থানবী।
২৩. উমদাতুল আখবার ফী মদিনাতুল মুখতার– আল্লামা শেখ আহমাদ বিন আবদুল হামীদ আব্বাসী।
২৪. নবীয়ে আকরাম সা. কী সিয়াসী জিন্দেগী– ডঃ আবদুল হামীদ সিদ্দীকী
২৫. আহদে নববীকে ময়দানহায়ে জং– ঐ।
২৬. আহদে নববী কা নিযামে হুকুমরানী – ঐ।
২৭. সীরাতে পাক– বশীর মুহাম্মদ শারেক।
২৮. Muhammad at Madina- মন্টোগোমারী ওয়াট।
২৯. Muhammad at Makka- ঐ।
৩০. Spirit of Islam : জাস্টিস আমীর আলী।
৩১. Muhammad the Prophet –মৌলবী মুহাম্মদ আলী এম.এ।
৩২. Life of Mohammad- হাফেজ গোলাম সরওয়ার।
৩৩. Mohammad the Prophet- এফ, কে, খান দুররানী।

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২